

বনফুল

রচনাবলী ০৮

বনফুল রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

সম্পাদনা ঃ
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
সহযোগী ঃ
শ্রীশুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ-রূপায়ণ ঃ
শ্রীশৈলেন শীল
শ্রীসমরেশ বসু

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞা
সুদীপ প্রিণ্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২

প্রকাশক ঃ
মুরলীধর ঘটক
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

উপন্যাস :

কবিতা :

ডানা

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

।। এক ।।

কবি এবং বৈজ্ঞানিক বেরিয়েছেন পরিভ্রমণ করতে। সঙ্গে আছেন বন্ধু রূপচাঁদ মৌলিক। রূপচাঁদ কবিও নন, বৈজ্ঞানিকও নন, অথচ উভয় জগতেই গতিবিধি আছে কিঞ্চিৎ। উভয় জগতেরই রূপ রস গন্ধ তাঁকে আকুল করে। কিন্তু মাত্রা হারিয়ে ফেলেন না তিনি কখনও। বিদগ্ধ ব্যক্তি, কিন্তু তাল-বোধ আছে। অর্থাৎ আত্মহারা হন, কিন্তু ঠিক সময়ে আপিস যেতে ভুল হয় না। সেদিন তিন বন্ধু বেরিয়েছিলেন পক্ষী পর্যবেক্ষণে। শুধু তাই নয়, মনস্থ করেছেন, বরাবরই বেরুবেন যতদিন না পক্ষী-পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। বাতুল বৈজ্ঞানিক প্রলুব্ধ করেছেন কবিকে, এবং এই দুই উন্মাদকে সামলাবার জন্যে বেরিয়েছেন রূপচাঁদ। তিনজনেই পকেটে দূরবীন। কবির মনশ্ছন্দবীণ অবিরাম-গুঞ্জরিতভাব, বৈজ্ঞানিক সর্বদা চকিতদৃষ্টি একাগ্র, রূপচাঁদ স্থির-মস্তিষ্ক বস্তুতান্ত্রিক।

কবির মনে কবিতা জাগছিল।

নির্মল নীল শীতের আকাশ, ঝলমল করে সোনালি আলো,
টলমল করে সবুজ সোহাগ দিগন্ত-ছোঁয়া প্রান্তরে
কোথা তুমি ওগো, ঢাল গো ঢাল—
মরকত মণি কি আবেগে দেখ চুম্বিছে নীলকান্তরে।
যব-গম-ছোলা-মটর-মহিমা
ছাড়ায়ে যেতেছে উপমার সীমা
ধরার ধূসর ধূলি উজলিয়া
সবুজের শিখা উঠেছে জ্বলিয়া
প্রাণের দীপালী জ্বলে জ্বলজ্বল কি চঞ্চল অশান্ত রে।
কোথা তুমি ওগো, ঢাল গো ঢাল,
টলমল করে সবুজ সোহাগ দিগন্ত-ছোঁয়া প্রান্তরে
নির্মল নীল শীতের আকাশে ঝলমল করে সোনালী আলো।

"শুনুন"

কবি বৈজ্ঞানিকের দিকে ফিরে চাইলেন। দেখলেন, তিনি একটা ঝোপের পাশে গুঁড়ি মেরে বসে আছেন। চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছে। হাতছানি দিয়ে ডাকলেন আবার। ডেকেই দূরবীন লাগালেন চোখে। তারপর চুপি-চুপি বললেন, "বারবেট একটা, আস্তে আস্তে আসুন। ওই যে, এই দিকটায় ঘুরে আসুন, ওই দেখুন।"

তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশ অনুসরণ করে কবিও লাগালেন দূরবীন। পাখি দেখা গেল না, কিন্তু বটের পাতাগুলি কি অপরূপ। এমন করে আর কোনোও দিন দেখা হয়নি তো।

"উড়ে গিয়ে ওই নিমগাছটায় বসল গিয়ে। আসুন, এই দিক দিয়ে যাওয়া যাক।"

ক্ষিপ্রগতিতে উঠে প্রায় দৌড়ে ছুটলেন বৈজ্ঞানিক নিমগাছটার দিকে। কবিও ছুটলেন।

'কুড় কুড় কুড় কুড় কুড়, কুডুরুক, কুডুরুক, কুডুরুক।'

ডেকে উঠল পাখিটা।

"ওইটেই ডাকছে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"চমৎকার ডাক তো। নাম কি ওর?"

বৈজ্ঞানিক আস্তে আস্তে আর একটু এগিয়ে একটা ঝোপের ধারে গুঁড়ি মেরে বসেছিলেন। কবিও এগুলেন সেদিকে।

"ওর নামটা কি?"

বৈজ্ঞানিক ফিসফিস করে তর্জন করে উঠলেন, "চুপ, কথা বলবেন না।"

দূরবীনে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসেছিলেন তিনি। হঠাৎ কবির দিকে উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে বললেন, "নীচের দিকের ওই ছোট্ট ডালটা বেঁকে আছে, ওর ওপরে দেখুন।"

কবি দূরবীন লাগালেন, কিন্তু পাখি দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন রুক্ষমাথা ময়লা-কাপড়-পরা একটা বুড়ি, হেঁট হয়ে কাঠ কুড়োচ্ছে।

"উড়ে গেল আবার। দেখতে পেলেন?"

"না।"

"ইউক্যালিপ্‌টাস গাছটায় বসল। চলুন, যাওয়া যাক।"

"কি নাম পাখিটার?"

"ইংরেজীতে বলে বারবেট। অনেক রকম বারবেট আছে। এ অঞ্চলে আর এক বারবেট আছে, তার ইংরেজী নাম হচ্ছে কপারস্মিথ। বৈজ্ঞানিক নাম Xantholaema Haemucephala। বাংলা নাম বসন্তবউরি। সবুজ রঙ, তার ওপর হালকা সাদার ডোরা কাটা বুকের কাছটায়। ছোট পাখিটার মাথায় আর বুকে লাল। বড়টার মাথার রঙ তামাটে। ছোট পাখিটার অনেকগুলো দেশী নাম আছে—গয়লাবুড়ি, ভগীরথ, কল্লাপাখি, ভোকারে পাখি। ওই শুনুন, ছোট পাখিটা মানে, গয়লাবুড়ি ডাকছে।"

'টংক্ টংক্ টংক্ টুক্ টুক্ টুক্—'

"কাঁসারিরা বাসন তৈরি করবার সময় যেমন শব্দ করে অনেকটা সেইরকম, নয়?"

'কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক।'

'টংক্ টংক্ টংক্ টুক্ টুক্ টুক্।'

বন-বাদাড় ভেঙে হনহন করে এগিয়ে চলেছেন বৈজ্ঞানিক। কবি চলেছেন পিছু পিছু। তাঁর মনে কবিতা জাগছে।

গাছের ডালে সবুজ পাতার ফাঁকে
গয়লাবুড়ি থাকে।
পরনে তার সবুজ ডুরে
গান করে সে মিষ্টি সুরে
আকাশ জুড়ে গানের ছবি আঁকে।
প্রবীণ বুড়ি নয় সে মোটে
ছোট্ট পাখি কি ছটফটে
সহজ চোখে যায় না দেখা তাকে,
ফুড়ুৎ করে পালায় উড়ে

সুর ঢালে সে আকাশ জুড়ে
পালিয়ে বেড়ায় বনের আঁকে বাঁকে।
মাথায় বুকে লালের টিকা
জ্বলছে যেন অগ্নি-শিখা
স্বপ্ন যেন গাছের ফাঁকে ফাঁকে,
ও ভগীরথ, কি সুর হেনে
কোন্ গঙ্গা আনবে টেনে
সারাটা দিন ডাকছ তুমি কাকে!

চলতে চলতে কবি আর একবার দূরবীন লাগালেন চোখে। পাখি দেখা গেল না, দেখা গেল সেই বুড়িটাকে। নোংরা বুড়ি। দারিদ্র্যজীর্ণ। দেখে মায়া হয়, কিন্তু বড় বেমানান। এখানে ও কেন? মহত্ত্ব যেখানে বিগলিত হয়ে পড়ছে শত ধারায়, সেইখানে গিয়ে ও স্নান করে আসুক। রূপের আসরে ওকে মানাচ্ছে না একটুও।

নিমডালে ঝরিতেছে সবুজের ঝরনা
বলে যেন, সর্ না, ওড়ে বুড়ি সর্ না।
না যদি সরিস্ তবে
চল্ সেই উৎসবে
ছুটে চল্ সেই দেশে
যেথা কেউ পর না।

ফুল যেথা ফুটে আছে
থরে থরে কাননে
হাসি করে ঝিকি-মিকি
নয়নে ও আননে
যেথা জোনাকির ঝাঁকে
পরীরা লুকিয়ে থাকে
দারিদ্র্যে করে যারা
বিচিত্র-বর্ণা
ছুটে চল সেই দেশে
যেথা কেউ পর না।

বুড়ি মিলিয়ে গেল, নিমগাছ মিলিয়ে গেল, সহসা কবির অন্তর জুড়ে বেজে উঠল নতুন একটা সুর। সেই চিরন্তন না-পাওয়ার সুর, অন্তরের অন্তস্থল থেকে কারণে অকারণে যা উৎসারিত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

কোথায় তুমি, কোথায় তুমি ওগো,
ওগো আগুন, ওগো আমার শিখা,
অন্তরালে লুকিয়ে আছ কোথা
সরাও সখি, সরাও যবনিকা।

আবছায়াতে লুকিয়ে থেকে থেকে
সবার চোখে বেড়াও দেখে দেখে
সবার সুরে আমায় ডেকে ডেকে
ভোলাও শুধু নিপুণ চতুরিকা।
ভুলছি আমি দুলছি নানা দোলায়
বাসছি ভাল নতুন করে রোজই
কিন্তু সখি এরই মধ্যে জেনো
মনে মনে চলছে তোমার খোঁজই
ভুলিনি তো সেই কত কাল আগে
রাঙিয়েছিলে আমায় রাঙা ফাগে
যদিও আজ স্বপন সম লাগে
রক্ত-রঙে মর্মে আছে লিখা
সরাও সখি, সরাও যবনিকা

একটা আমগাছের ডালে পরগাছা হয়েছিল। লাল লাল তার পাতা। সেইটে কবির চোখে পড়ল হঠাৎ। উৎসুক উন্মুখ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেই দিকে, মনে হল, আকাঙ্ক্ষিতাকে পাওয়া যাবে বুঝি ওই বর্ণোৎসবের মাঝখানে।

"ওদিকে কি দেখছেন, এই দিকে আসুন। পাখিটা উড়ে গিয়ে আবার কাঁঠালগাছটায় বসেছে। এইবার দেখা যাবে বোধ হয়।...দেখুন দেখুন দেখুন, দেখতে পেলেন?"

এক ঝাঁক ছোট্ট পাখি উড়ে গেল। উড়ে গিয়ে বসল দূরের আমগাছটায়।

"মিনিভেট।"—উল্লাসিত মুখে বলে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। তারপর ঘাসের উপরেই বসে পড়লেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে। কবির দিকে আবার ফিরে চাইলেন। দৃষ্টি উৎফুল্ল।

"মিনিভেট। বাংলা নাম সয়ালী, এগুলো ছোট সয়ালী। অনেকগুলো এসে বসেছে, দেখতে পাবেন এখনই। ওই গাছটার ওপরই ফোকাস করুন। উড়লেই দেখবেন পেটের নীচে ডানার নীচে টুকটুকে লাল। পিঠের ওপরটা কালচে গোছের, মানে—গ্রেইশ ব্রাউন, দেখুন ভাল করে।"

কবি চোখে দূরবীন লাগিয়ে আমগাছের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন।

"দেখেছি। বাঃ, চমৎকার তো! কি নাম বললেন?"

"সাত সয়ালী।"

"পছন্দ হল না, আমি ওর নাম দিচ্ছি আলতা-পরী—"

কবি আবার চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "চলুন, এবার বারবেটটাকে দেখবার চেষ্টা করা যাক।"

দুজনে এগুলেন আবার কাঁঠালগাছের দিকে।

কবি গুনগুন করছিলেন মনে মনে—

শীতের মাসে গোপন পথে
আসলো কি ফাগুন
ডালিম-ফুলী আলতা-পরী
ছাই-চাপা আগুন।

"বসে পড়ুন ওইখানে। ওই তালগাছটার দিকে কাঁটালগাছের যে ডালটা বেঁকে রয়েছে, ওইখানে বসে আছে বসন্ত-বউরি। ভারি অস্থির পাখি—ওই জায়গাটায় ফোকাস করে থাকুন, দেখতে পাবেন।"

বসবার স্থানটা অবশ্য ভাল ছিল না। বড্ড ঢালু। বাঁ দিকে খেজুরগাছের ঝোপ একটা, বৈজ্ঞানিক নির্বিকারচিত্তে তার পাশেই বসে পড়েছিলেন। দামী প্যান্টটা যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল ছিল না। কবিরও মনে বিকার নেই, কিন্তু বসবার সুবিধা পেলেন না বলেই দাঁড়িয়ে দূরবীন লাগালেন চোখে। পাখিটা উড়ে গেল। বৈজ্ঞানিক চটে উঠলেন।

"বলছি, বসে পড়ুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভয়ানক চালাক পাখি, কেউ দেখছে ঘুণাক্ষরে জানতে পারলে তক্ষুনি উড়ে পালাবে। আবার গিয়ে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছটায় বসল। চলুন, আবার যেতে হবে অনেকটা।"

চলতে লাগলেন দুজনে।

বৈজ্ঞানিকের মনে হল, এই ফাঁকে কবিকে মিনিভেট সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দান করলে সময় কাটবে।

বললেন, "দেখুন, ওই যে মিনিভেটগুলো দেখলেন, ওগুলোর মেয়ে আর পুরুষ কিন্তু একরকম নয়। পুরুষদের যেমন ডানা আর পেটের নীচে লাল, মেয়েদের তেমনই আবার হলদে।"

কবি উত্তর দিলেন, "আমার কারবার পাখির রূপ নিয়ে, মেয়ে-পুরুষ নিয়ে নয়। ব্যাকরণ নিয়ে আমি তত মাথা ঘামাই না। আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়, তা হলে আমি বলব—

আলতা-পরী আলতা-পরী
রঙ্গনিপুণ রঙ্গিণী
সঙ্গে করে বেড়াও নিয়ে
বাসন্তী-রঙ সঙ্গিনী।"

বৈজ্ঞানিক হাসলেন, কবিও হাসলেন। ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তাঁরা।

"চমৎকার দেখা যাচ্ছে এইবার। লাগান, লাগান, দূরবীন লাগান, বাঃ!"

কবি দূরবীন লাগিয়ে দেখতে পেলেন এইবার।

"দেখেছি। বারবেট? উঁহু, ভাল নাম তো নয়। তবে একে পরীও ঠিক বলা চলে না। অনেকটা চক্রবর্তী-চক্রবর্তী ভাব। ওর উচ্ছ্বসিত স্বর শুনলে মনে হয়, কোনও কলস্বরা কিশোরী বুঝি। তবে রঙ আছে গায়ে। পিঠটা সবুজ, মাথাটা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না—হ্যাঁ, দেখেছি এইবার, তামাটে। আবার ঘুরে বসল, বুকটা দেখা যাচ্ছে, মাথারই মত প্রায়। চোখে হলুদ চশমা, ঠোঁটও হলদে... উড়ে পালাল...."

বাহিরে প্রবীণ চক্রবর্তী
অন্তরে তুমি কিশোরী কলস্বরা
গানের তুবড়ি আকাশে ছোটাও
সুরের ফুলকি ওড়ে গিটকিরি-ভরা

উৎসের মতো শূন্যে ছড়ায়ে পড়ে
সবুজ পুচ্ছ পাতার আড়ালে নড়ে।
হলুদ রঙের চশমা দেখিয়া চোখে
কে বুঝিবে তুমি চঞ্চলা চতুরিকা
মর্ত্যে থাকিয়া বিহর স্বর্গলোকে
অন্তর ভরি সুর-স্বপনের শিখা
অতি অপরূপ ছদ্মবেশের তলে
ঊর্ধ্বমুখেতে রঙিন আলোতে জ্বলে।

কবি কবিতা ভাঁজছিলেন মনে মনে, আর বৈজ্ঞানিক বলে চলেছিলেন, "এই বারবেটগুলো কোথায় বাসা বাঁধে জানেন তো? গাছের ডালে গর্ত করে। ওদের গায়ে অত রঙ, ডিমগুলো কিন্তু সাদা হয়...ওই দেখুন দেখুন দেখুন—"

মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক হলুদ রঙের পাখি উড়ে গেল।

"বান্‌টিং—"

"বাংলা নাম কি?"—কবি জিজ্ঞেস করলেন।

"জানা নেই। শীতকালে এরা এ দেশে আসে দলে দলে। ধানক্ষেতে জোয়ারিক্ষেতে বাজরাক্ষেতে দলে দলে নামে। খুব ফসল নষ্ট করে এরা। কিন্তু চমৎকার দেখতে। গাছপালার ওপর যখন দল বেঁধে বসে, তখন সবুজের মাঝখানে হলুদের সে যে কি অদ্ভুত শোভা হয়। এদের দুটো জাত সাধারণত দেখা যায়, এক জাতের মাথাটা কালো আর এক জাতের মাথাটা লাল, বুঝলেন, কিন্তু এদের সোনার মতো হলুদ রঙটাই এদের বৈশিষ্ট্য। ছোট পাখি, আমাদের চড়ুইপাখির মতো।"

কবি বললেন, "এরাই সোনাপাখি নয় তো? ঠাকুরমার কাছে ছড়া শুনতাম—

ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়লো
বর্গী এল দেশে
সোনাপাখিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।"

"ঠিক বলেছেন, এরা সোনাপাখিই।"

বৈজ্ঞানিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্ষণকালের জন্য, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলেন একবার কবির মুখের দিকে।

"তা হতে পারে, ঠিক বলেছেন। ওই দেখুন, আর একদল উড়ে যাচ্ছে, সেই দলটাই বোধ হয়।"

কবি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, সোনার মেঘ উড়ে যাচ্ছে যেন একটা।

সোনার স্বপন নামছে নাকি
মর্ত্যভূমে
তাই কি ধরা অর্ঘ্য সাজায়
সবুজ ধানে যব-গোধূমে
নীল আকাশে আত্মহারা তাই কি রবি

তাই কি জাগে কবির চোখে রূপের ছবি
গাছের ডগায় নদীর চড়ায়
মায়ের মুখের মধুর ছড়ায়
শিশুর ঘুমে?

"চমৎকার, না?"—বৈজ্ঞানিক বললেন।

কবি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সোনার মেঘ উড়ে চলে গেল দৃষ্টির ওপারে। বৈজ্ঞানিক বললেন, "ওদের ডিমও খুব সুন্দর শুনেছি। ফিকে সবুজ রঙের, মিউজিয়মে দেখেছি একবার।"—এই পর্যন্ত বলে বৈজ্ঞানিকের খেয়াল হল, "রূপচাঁদকে তো দেখছি না! কোথা গেল সে?"

এদিক ওদিক চেয়ে কবি বললেন, "তাই তো কোথা গেল?"

"চলুন দেখি।"

দুজনে বেরুলেন রূপচাঁদের খোঁজে।

"ওগুলোকে চেনেন নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ, ছাতারে।"

"হিন্দী নাম কাচবাচিয়া, কেউ কেউ সাতভাইও বলে, কিন্তু যেরকম কচবচ করে সর্বদা, ইংরেজী সেভেন সিস্টার্স নামটাই বেশি লাগসই বলে মনে হয়, কি বলেন? কিন্তু ভারি মিল আছে ওদের নিজেদের মধ্যে, বাজে ছোঁ মেরে যদি নিয়ে যায় একটাকে, বাকিগুলো পালিয়ে যায় না, বাজের পিছু পিছু ছোটে, অনেক সময় ছাড়িয়েও আনে। এমনও দেখা গেছে যে, ওদের দলকে যখন খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখা যায়, তখন একটাকে ছেড়ে দিলে সেটা আবার ফিরে আসে খাঁচার মধ্যে। পরস্পর খুব ভাব, দুপুরে গাছতলায় দেখবেন, এ ওর মাথা খুঁটে দিচ্ছে। এদের নিয়ে আপনারা কবিতা লেখেন না, কিন্তু যাদের নিয়ে লেখেন, তাদের সঙ্গে এদের খুব নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কোকিল যেমন কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, চাতক আর বউ-কথা-কও তেমনিই ডিম পাড়ে এদের বাসায়। এদের ডিম দেখলে কিন্তু কবিত্ব জাগবে আপনার মনে। পাখির ডিম নিয়ে আমি যে প্রবন্ধটা ফেঁদেছি, তাতে—দেখুন দেখুন, একটা ফড়িং ধরেছে। পোকা খুব খায়, ফল পেলেও ছাড়ে না—"

বৈজ্ঞানিক ছাতারে প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে চলেছিলেন। কবির মনে কিন্তু একটি কথাই কেবল আটকে গিয়েছিল, ওদের মধ্যে ভারি ভাব এবং এইটেকেই কেন্দ্র করে মনের মধ্যে গুনগুন করছিল দুটো লাইন—

নিজেদের মাঝে এত স্নেহ আছে নাকি
ধরার ধুলার ধূসরবরণ পাখি?

হঠাৎ রূপচাঁদকে দূরে দেখা গেল।

একা নয়, সঙ্গে একটি মেয়েও রয়েছে। আর একটু কাছে আসতে দেখা গেল, মেয়েটি তরুণী। আরও একটু কাছে গিয়ে নজরে পড়ল, একটা ঘড়া বসানো রয়েছে মাটিতে।

কবি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কি?"

স্মিতমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রূপচাঁদ উত্তর দিলেন, "রস।"

"কি রস?"

"মধুর।"

তারপর আরও কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে থেকে বললেন, "জিরেন কাটের খেজুর-রস। সব যোগাড় করে তোমাদের খোঁজেই যাচ্ছিলাম। পেয়ালা তিনটে গেল কোথায়?"

দেখা গেল, এই বনের মধ্যে রূপচাঁদ তিনটে কাচের পেয়ালাও যোগাড় করেছেন।

মেয়েটির দিকে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন, "আপনিই পরিবেশন করুন তা হলে।"

মেয়েটি খুব সপ্রতিভভাবে মাথা নেড়ে ঘড়া থেকে রস ঢালতে লাগল পেয়ালায়। বৈজ্ঞানিক চোখে দুরবীন লাগিয়ে কি যেন একটা দেখছিলেন, এসব দিকে লক্ষ্যই ছিল না তাঁর। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন অপরিচিতা মেয়েটির দিকে। লাবণ্যময়ী তরুণী।

শীতের সোনালি রোদে জেগেছে স্বপনপুরী
লেগেছে রঙের নেশা চোখে হায়,
রঙিন স্বপনলোকে মন যেন ঘুরে মরে
ঘুরে ঘুরে বারে বারে কারে চায়!

রঙ জাগে ফুলে ফুলে প্রভাতের আলোকে
রঙ জাগে পাখিদের পালকে
আকাশের নীলে আর মাঠ ভরা সবুজে
রঙের তুফান জাগে,—তবু যে

কিছুতে ভরে না মন, আরও চাই আরও চাই—
বাকি যেন আছে কিছু কি যেন কি মেলে নাই
তাই কি উঠিল ফুটি রূপসীর আঁখি দুটি
শ্যামল বনের পটভূমিকায়!

শীতের সোনালি রোদে জেগেছে স্বপনপুরী
লেগেছে রঙের নেশা চোখে হায়,
কি যেন কি পাই নাই কি যেন কি বাকি আছে
ঘুরে ফিরে বারে বারে মন গায়!

"নিন।"

কবি আত্মস্থ হলেন। দেখলেন ফেনায়িত রসের পেয়ালা তুলে ধরেছে সে। কবির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "খুঁজতে বেরিয়েছিলাম পাখি, পেয়ে গেলাম সাকী।"

মেয়েটি হাসলে একটু—ম্লান বিষণ্ণ হাসি, কবির মনে হল।

বৈজ্ঞানিক চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন, "বাঃ, সাদা-পেট ফিঙে দেখেছি একটা। দেখবেন ওই দূরের আমগাছটায় নিচু ডালে বসে আছে, ওদিকে নয়, এই দিকে, চলুন, আর একটু এগিয়ে যাওয়া যাক বরং, এখান থেকে দেখতে পাবেন না আপনি, চলুন।"

"রসটা খেয়ে যান।"

"ও ধন্যবাদ—দিন।"

এক নিশ্বাসে ঢকঢক করে রসটা খেয়ে ফেললেন বৈজ্ঞানিক। পেয়ালাটা মাটিতে নামিয়ে কবির দিকে চেয়ে বললেন, "চলুন, সাদাপেট ফিঙে চট করে দেখা যায় না। রূপচাঁদ, যাবে নাকি?"

রূপচাঁদ একটি গাছের গুঁড়ির উপরে বসে তারিয়ে তারিয়ে চুমুকে চুমুকে রস খাচ্ছিলেন। বললেন, "তোমরা এগোও, আমি যাচ্ছি।"

।। দুই ।।

বৈজ্ঞানিকের নাম অমরেশ সেনগুপ্ত। বৈজ্ঞানিক হবার যোগ্যতা আছে। সুযোগও ঘটেছে। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, ধনী শ্বশুরের একমাত্র জামাই। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ডিগ্রীও আছে একটা—জীব-বিদ্যা বিষয়ে। সাধারণ লোক হলে চাকরি করতেন। অমরেশের পক্ষে চাকরি যোগাড় করা শক্তও হত না খুব। অমরেশ কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তি। চাকরির ঘানিতে ঘুরে বাঁধা-মাপের বরাদ্দ জ্ঞান-তৈলটুকু নিষ্কাশন করে তৃপ্ত থাকবার মতো মন তাঁর নয়। প্রকৃতির বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি। জ্ঞান আহরণ করতে চান। উৎসুক উৎকর্ণ আছেন সর্বদা। থাকা সম্ভব হয়েছে, কারণ অর্থাভাব নেই। পিতৃকুল শ্বশুরকুল—উভয়কুল থেকেই তাঁর তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ এসে জুটেছে, তা অনায়াসেই অনর্থ সৃষ্টি করতে পারত, যদি অমরেশ সাধারণ লোক হতেন। তিনি যা করতে চাইছেন, তা-ও অবশ্য সনাতন মল্লিকের মতে অনর্থক। তিনি মফস্বলে নিজেদের জমিদারিতে একটি চিড়িয়াখানা বানাতে চান। তাতে জীবিত এবং মৃত নানারকম পাখি থাকবে। তাঁর ধারণা, এ দেশে পক্ষীবিষয়ে সম্যক গবেষণা এখনও হয়নি। বিদেশি সাহেবেরা চাকরি করবার ফাঁকে ফাঁকে যিনি যতটুকু পেরেছেন করে গেছেন। উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনও অনেক কিছু করা দরকার। এমন অনেক ছোট পাখি তিনি দেখতে পাচ্ছেন, যাদের শ্রেণী ঠিকমত নির্দিষ্ট হয়নি এখনও। পাখিদের বার্ষিক গতিবিধি সম্বন্ধেও সব তথ্য পুরো জানা যায়নি বলে তাঁর বিশ্বাস। তাঁর আকাঙ্ক্ষা, এই সব বিষয়ে আলোকপাত করবেন। পাখিদের নতুন নতুন শ্রেণী আবিষ্কার করবেন—তাদের ঠোঁট, পালকসংখ্যা, পায়ের গড়ন প্রভৃতি থেকে। কলকাতা থেকে সম্প্রতি এসে পারিপার্শ্বিকতা কেবল পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি আজকাল। ঠিক কোন্ রাস্তাটা ধরবেন ঠিক হয়নি এখনও, মাথার মধ্যে নব নব প্রেরণা ভিড় করছে কেবল। আর একটা সুবিধা হয়েছে—ছেলেপিলে হয়নি। তৃতীয় সুবিধে—স্ত্রী রত্নপ্রভাও অসাধারণ মহিলা। অত্যন্ত কুৎসিত। কালো রঙ, বলিষ্ঠ গঠন। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ফজলি আম। খুব কম কথা বলে। চোখ দুটি বেশ বড় বড়। সেই চোখ দুটি কখনও কুঞ্চিত কখনও বিস্ফারিত করে মনোভাব প্রকাশ করে সে। কথা ক্বচিৎ বলে। যখন বলে, তখনও শোনা যায় না ভাল করে। কণ্ঠস্বর ধরা, ভাঙা ভাঙা। মনে হয়, সর্দি হয়েছে। লেখাপড়া জানে না বিশেষ। অমরেশের কার্যকলাপ নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে সে। খামখেয়ালী দামাল ছেলের দুরন্তপনা উপভোগ করেন যেমন স্নেহময়ী জননী, রত্নপ্রভাও তেমনই উপভোগ করে উদ্দামপ্রকৃতি স্বামীর শিশুসুলভ উচ্ছৃঙ্খলতা। কিন্তু নীরবে। কথার কলরবে বা কচকচিতে অমরেশের শান্তি বিঘ্নিত করে না কখনও। নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে সে খুবই সচেতন।

অমরেশের মতো বিদ্বান রূপবান স্বামীর সহধর্মিণী হবার মতো কি-ই বা তার আছে। সে কেবল প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে, অমরেশের যাতে কোনও রকম কষ্ট না হয়। খাবার, বিছানা, বই, যন্ত্রপাতি, পাখিগুলি, এই সবের সুনিপুণ তদারক করে অমরেশের খামখেয়ালী ছন্নছাড়া জীবনকে কথঞ্চিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার প্রয়াস পায় সে। ক্রীতদাসীর মতো সেবা করে। কিন্তু বাইরে থেকে ঘুণাক্ষরে বুঝতে দেয় না যে, সে ক্রীতদাসী। তার কালো কালো মাংসল মুখখানি দেখলে মনে হয়, খুব গম্ভীর রাশভারী লোক সে। সে যে মনে মনে অত কুণ্ঠিত ভীরু, বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। অমরেশও মনে মনে তাকে ভয় করেন। শুধু তাই নয়, রত্নপ্রভার বুদ্ধি যে তাঁর চেয়ে অনেক কম, এ কথা অমরেশ যেন মানেনই না মনে হয়। পক্ষীতত্ত্ববিষয়ক নানা বক্তৃতা অসঙ্কোচে তিনি করে যান রত্নপ্রভার কাছে। রত্নপ্রভাও গম্ভীরমুখে শোনে বসে বসে। সেদিন যেমন হচ্ছিল। রত্নপ্রভা গম্ভীরমুখে বসে সুপুরি কুচিয়ে যাচ্ছিল, আর অমরেশ বলে চলেছিলেন অনর্গল।

"দেখ, ভাবছি, আরও কতকগুলো রেডস্টার্ট ধরব। ধরে তাদের পায়ে ছোট ছোট লোহার রিঙ পরিয়ে দেব। ওদেশে আজকাল অ্যালুমিনিয়মের রিঙ পরায়, কিন্তু এখানে তো তা পাওয়া যাবে না। লোহার রিঙই পরাব। দোয়েলগুলোর পায়ে যেমন পরিয়েছিলাম। রেডস্টার্টগুলোর পায়েও পরাতে হবে। কেন বুঝতে পেরেছ?"

রত্নপ্রভা বললে, "তুমি যে দোয়েল পাখির জীবনচরিত লিখবে বলেছিলে, তার কি হল?"

অমরেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন ক্ষণকালের জন্য। আমাদের দেশি পাখিদের জীবনের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে তা নিয়ে প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে তাঁর। দোয়েল নিয়ে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সাধনাটাকে কিছুতেই একাগ্র রাখতে পারছেন না এবং এজন্য নিজেই তিনি মনে মনে সচেতন হয়ে আছেন। রত্নপ্রভাও সেটা লক্ষ্য করেছে দেখে লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি। স্কুলের ছেলেরা পড়ায় অবহেলা করে শিক্ষকের কাছে যেমন নানা ছুতো দেখায়, অমরেশের উত্তরটা অনেকটা সেইরকম শোনাল।

"শীতকালে দোয়েল পাখির দেখাই পাচ্ছি না যে। ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না। মাঝে মাঝে দেখতে পাই এক-আধ বার। যখন যতটুকু দেখছি, টুকে রাখছি। শীতকালে উইন্টার ভিজিটারদের নিয়ে আলোচনা করলে ক্ষতি কি। কি বল?"

ধরাগলায় রত্নপ্রভা বললে, "তা বেশ তো"—বলে গম্ভীরভাবে সুপুরি কুচিয়ে যেতে লাগল।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আবার বৈজ্ঞানিক,—"ওই রেডস্টার্টগুলো থাকে হিমালয় অঞ্চলে। শীতকালে এই দিকে চলে আসে। এখানে ওদের ধরে যদি পায়ে রিঙ পরিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে ওরা যখন আবার হিমালয়ে ফিরে যাবে, তখন চেনা যাবে ওদের। তখন যদি আমরা ও অঞ্চলে যাই, কিংবা কোনো লোক রাখি ওদের লক্ষ্য করবার জন্যে, তা হলে বোঝা যাবে, ওরা ঠিক কখন ফেরে, এ দেশে থেকে ও দেশে যেতে ওদের কত সময় লাগে। এই টাইম ফ্যাক্টারটা খুব দরকারি বুঝলে? তারপর জানতে হবে, কেন ওরা ফেরে? হিমালয় থেকে অবশ্য পালিয়ে আসে শীতের চোটে। শীতকালে খাদ্যাভাবও ঘটে। কিন্তু ডিম পাড়বার জন্যে সেখানে আবার ফেরে কেন? এ হতে পারে, গরম দেশে ওদের ডিম ফোটে না ভাল করে। আমাদের দীঘিচাকের কাছে যে বিঘে দশেক বাগানটা আছে, হরিশবাবু সেটা বন্দোবস্ত নিতে

চাইছেন। কিন্তু আমি ভাবছি, দেব না। ওটা সমস্তটা জাল দিয়ে ঘিরে ওর মধ্যে শতখানেক রেডস্টার্ট আটকে রাখতে চাই। দেখি, ওরা এ দেশে ডিম পাড়ে কি না! বুঝলে, করব কি, খানিকটা ছকে রেখেছি, এই দেখ।"—প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ বার করে রত্নপ্রভাকে বোঝাতে লাগলেন তিনি, কি ভাবে বাগানটাকে ঘিরতে হবে। রত্নপ্রভাও এমন গম্ভীরভাবে ঝুঁকে দেখতে লাগল, যেন সে বড় ইঞ্জিনীয়ার একজন।

বাইরে ডাক শোনা গেল, "অমরবাবু বাড়ি আছেন?"

কবির কণ্ঠস্বর।

"কে, আনন্দবাবু নাকি? আসুন, ভেতরে আসুন।"

সুপুরির সরঞ্জাম নিয়ে রত্নপ্রভা অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল।

কবি ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বারান্দায়।

"আরে মশাই, এ কি রক্তরক্তি কাণ্ড! ছি ছি, করেছেন কি!"

বেরিয়ে এলেন বৈজ্ঞানিক।

"ও, ওটা একটা রেডস্টার্ট ডিসেক্ট করেছি—"

"কেন?"

"দেখতে চাই, ওর সেক্স অর্গ্যানস্ ঠিক পরিপুষ্ট হয়েছে কিনা!"

"তা দেখবারই বা দরকার কি?"

"তা হলে অনেক কথা বলতে হয়। ভেতরে আসুন।"

"আহা, অমন সুন্দর পাখিটাকে কেটে ছিঁড়ে কি করেছেন বলুন দেখি? কি নাম বললেন?"

"রেডস্টার্ট—হিন্দী নাম থিরথিরা। ল্যাজটা ওর থরথর করে কাঁপে সাইড টু সাইড। সাধারণত পাখিরা ল্যাজ ওপরের দিকে খাড়া করে তোলে, যেমন দোয়েল—এদের ল্যাজ পাশাপাশি কাঁপে। তাছাড়া এরা বুক-ডন দেয় এমন সুন্দর—"

"কিন্তু ওর লিঙ্গ নিয়ে অত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন আপনি?"

"বলছি, বসুন না।"

দুজনে ঘরের মধ্যে এসে বসলেন।

শুরু করলেন অমরবাবু।

"পাখিরা এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায়, জানেন তো! হিমালয় থেকে এ দেশে অনেক পাখি চলে আসে শীতকালে। আবার শীত শেষ হলে তারা ফিরে যায় হিমালয়ে. সেইখানেই তাদের জন্মভূমি। সেইখানে গিয়েই তারা বাসা করে, ডিম পাড়ে বাচ্চা হয়। শীতের দেশের পাখি এ দেশে কক্‌খনও ডিম পাড়ে না, এই একটা মজা। ডিম পাড়বার সময় হলে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে আবার স্বদেশে ফিরে যায় সব। কেন ফিরে যায়, কি করে ফিরে যায়, এটা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা মস্ত গবেষণার বিষয়। গড্‌উইন বলে এক পাগলা বিশপের অদ্ভুত ধারণা ছিল। তিনি বলতেন, পাখিরা চাঁদে যায়। গিল্‌বার্ট হোয়াইটের মতো বৈজ্ঞানিকও বিশ্বাস করতেন যে, শীতকালে সোয়ালোরা পুকুরে কাদার নীচে চলে যায়। এসব কথা কিন্তু বিশ্বাস করে না কেউ আজকাল। আজকালকার থিয়োরি হচ্ছে যে পাখিরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়, তার কারণ, পাখির ভিতরে এবং বাইরে দুজায়গাতেই আলো আছে। দিন যত বড় হতে থাকে পাখিদের গায়ে আলো তত বেশি লাগে। সেই আলোর প্রভাবে তাদের

সেক্স অর্গ্যান্স পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তারা স্বদেশে ফিরে যায়। এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে যে স্টেরাইল পাখিদের ফিরে যাবার তাগিদ থাকে না। এ-ও দেখা গেছে যে, যখন তারা শীতের দেশ থেকে এ দেশে আসে তখন তাদের সেক্স অর্গ্যান্স খুবই অপরিপুষ্ট, তারপর কিছুদিন তাদের এভিয়ারিতে কৃত্রিম আলোতে রেখে এবং আলোর পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রমাণ করেছেন একজন যে, তাদের সেক্স্ অর্গ্যান্স পরিপুষ্ট হয়ে উঠল। এরও অবশ্য নানা ব্যতিক্রম দেখা গেছে পরে, আমি তাই দেখছিলাম যে, এই রেডস্টার্টটার সেক্স অর্গ্যান্স কি রকম। কয়েকটা রেডস্টার্ট ধরেওছি। তাদের আল্‌ট্রাভায়োলেটে এক্স্‌পোজ করে দেখব কি দাঁড়ায়।"

"কি দাঁড়ায় তা তো একজন বৈজ্ঞানিক দেখেছেন বললেন, আবার কেন?"

"বিজ্ঞানে পরের মুখে ঝাল খাওয়া চলে না। প্রত্যেক জিনিসটি নিজে পরীক্ষা করে দেখতে হয়—"

বৈজ্ঞানিক স্মিতমুখে চাইলেন কবির দিকে।

"পরীক্ষা করে জানতে চান, এক-জাতের পাখি শীতকালে আর এক দেশে যায় কেন?"

"হ্যাঁ।"

"সেইজন্যে অমন সুন্দর পাখিটাকে কেটে ছিঁড়ে একাক্কার করেছেন?"

"নিশ্চয়। তাতে ক্ষতি কি?"

"আমি জানি, কেন যায়।"

"জানেন?"

কৌতূহলভরে জ্বলজ্বল করে উঠল বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি।

"কেন, বলুন তো?"

"টানে।"

"টানে? হোয়াট ডু ইউ মীন? কিসের টানে?"

"প্রাণের টানে। অনবরত টানাটানি চলছে, দেখতে পাচ্ছেন না? শুধু পাখি কেন, যখন যেদিকে বেশি টান পড়ে, তখন সেই দিকে সবাই চলে যাই আমরা। চেয়ে দেখুন, বিশ্ব জুড়ে অবিরাম এই টানাটানি চলেছে। দিন।"

"কি?"

"কাগজ পেন্সিল।"

"কি হবে?"

"দিন না।"

কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেন কবি। বৈজ্ঞানিক বেরিয়ে গেলেন তাঁর ব্যবচ্ছেদিত রেডস্টার্টটার তদারক করতে। অনেক কিছু করতে হবে তাঁকে এখন। ওভারি দুটোকে ফ্রিজ্ করে মাইক্রোটোম দিয়ে কেটে মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে। সেগুলোর ফোটো তুলে রাখতে হবে। তা ছাড়া দুটো ছোট ছোট ঘরে দু দল রেডস্টার্ট রেখেছেন, এক দলকে রেখেছেন অন্ধকারে, আর এক দলকে আল্‌ট্রাভায়োলেট আলোর মধ্যে। সেগুলোর খবর নিতে হবে একবার। পাখিগুলোকে খেতে দিয়েছে কি না, কে জানে! চাকরগুলো মাইনে নেয় একগাদা কিন্তু কাজ কিছু করে না প্রথমত জানে না, দ্বিতীয়ত জানতে চায় না। ভারি ফাঁকিবাজ সব।

মুঙ্গিটা পাখির খাবার এনেছে কি না তারও ঠিক নেই। বীট্‌ল্‌ সেদিন চিনিয়ে দিয়েছেন তাকে। রেডস্টার্টগুলো বীট্‌ল্‌ খেতে খুব ভালবাসে। গুটিপোকাও খুব খায়, ফড়িং হলেও চলে, নিদেনপক্ষে পিঁপড়ে। কিন্তু খুঁজে আনে তবে তো.....। এই দেশে পাখি পোষার এই এক মহাঝঞ্ঝাট, বাজারে পয়সা ফেললে তাদের খাবার কিনতে পাওয়া যায় না। ও দেশে যায়। এ দেশে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে, ছাতু খাওয়ান। আশ্চর্য এদের বুদ্ধি! পাখি কি মানুষ যে, ছাতু খাবে!

হনহন করে গেলেন তিনি বাগানের পিছন দিকটায়। সেখানে তক্তা, কাচ, লোহার জাল, সুতোর জাল, তাঁবু প্রভৃতি নানা সরঞ্জামের সহায়তায় বাগানের দুটো অংশ গাছপালা সমেত ঢেকে বিরাট দুটো খাঁচায় পরিণত করেছেন। অন্ধকারের ভিতর যে রেডস্টার্টগুলোকে রেখেছেন, সেখানটা সম্পূর্ণ ঢাকা আছে প্রকাণ্ড একটা তাঁবুতে। তার ভিতর কম-পাওয়ারের একটা ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে, খাবার দেওয়ার সময় সেটা জ্বালা হয় কেবল। সেইখানটায় গেলেন তিনি আগে। কান পেতে রইলেন তাঁবুর বাইরে। অতি সন্তর্পণে। বাসর-ঘরেও অত সন্তর্পণে লোকে আড়ি পাতে না। 'হুইট...হুইট...হুইট' ওই যে ডাকছে! বড় করুণ বলে মনে হল। খেতে পায়নি নাকি? আহা, কোন্‌ সুদূর থেকে এসেছে বেচারারা, কাশ্মীরঅঞ্চলে হিমালয়ের কাছে বাড়ি ওদের...বৈজ্ঞানিকের নিষ্ঠুর কৌতূহল করুণার্দ্র হয়ে উঠল ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই। পরমুহূর্তেই মনে হল, পাখির ডাক জিনিসটা অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত! আমাদের কথা দিয়ে কিছুতে প্রকাশ করা যায় না তা। 'কুহু' বললেই কি কোকিলের কলকণ্ঠের সবটা বোঝানো যায়? রেডস্টার্টের দুটো 'হুইট'-এর মাঝখানে ওই যে কেমন একটু শব্দ আছে, যা তৈলহীন সাইকেলের চাকার শব্দের মতো অনেকটা, তা ভাষায় কিছুতেই লেখা যায় না। একই পাখির একই ডাককে আমরা বলছি 'চোখ গেল', সাহেবেরা বলছে 'ব্রেন ফিভার', বেহারীরা বলে 'পিউ কাঁহা', মারহাট্টীরা 'পাওসালা'। অথচ ডাক একই। আচ্ছা, এদের গলার স্বরের গ্রাফ রাখলে কেমন হয়?....অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। গ্রাফের কথাই ভাবতে লাগলেন। পাখিগুলোকে ধরে ধরে ফোনোগ্রাফের মতো কোনো যন্ত্রের সামনে যদি রাখা যায়, কিন্তু তা হলে তারা ডাকবে কি? মনের আনন্দে ওরা ডাকে, ধর-পাকড় করলে ডাকবে না বোধ হয়, অবশ্য চেষ্টা করলে ক্ষতি নেই। খুট করে শব্দ হতেই বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন মুঙ্গি দাঁড়িয়ে আছে।

"কি রে, পাখিদের খাইয়েছিস?"

"হাঁ বাবু, কিন্তু কাল থেকে আমি আর পারব না হুজুর। মল্লিকবাবু আজ আমাকে মারবার জন্যে তেড়ে এসেছিলেন। তাঁর বাগানে আমি আর ঢুকব না।"

"তাঁর বাগানে যাস কেন? আমাদের নিজেদের কত বড় বাগান রয়েছে—"

"আমাদের বাগানে ছোট ছোট ফড়িং কই?"

"নেই?"

"না।"

হঠাৎ সমস্যাটা খুব জটিল বলে মনে হল তাঁর কাছে। তাঁর বাগানে ফড়িং নেই, অথচ মল্লিকবাবু ফড়িং ধরতে দেবেন না, পয়সা দিলে বাজারে ফড়িং পাওয়া যাবে না... মহা মুশকিল তো। পাখিগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে নাকি শেষকালে? না, তাই বা কি করে হয়?.....

"আমাদের বাগানে ফড়িং নেই?"

"দুটো চারটে—"

"খুঁজে দেখেছিস ভাল করে?"

"খুব খুঁজেছি হুজুর।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন বৈজ্ঞানিক। আড়চোখে চেয়ে সরে পড়ল মুঙ্গি। খামখেয়ালী পাগল লোকে হঠাৎ কখন কি করে বসেন বলা যায় না। অমরবাবু আর একবার কান পেতে শুনলেন। হুইট— হুইট— হুইট—ঠিক ডাকছে। মল্লিক লোকটাকে এখন কি করে বাগানো যায়? লোকটার কেন যে এমন অকারণ রাগ বোঝা শক্ত। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়িতে তাস-পাশার যে আড্ডা বসে, তাতে যোগ দেবার জন্যে দু-একদিন আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু অমরবাবু যাননি। অন্য কোনো কারণে নয়, খেলতে পারেন না বলে যাননি। একটা কীর্তনের দল এসেছিল একদিন তাঁর বাড়িতে, শুনতে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সেবারও যাননি। কীর্তন-টির্তন ভালই লাগে না মোটে। মনে হয় মৃদঙ্গ বাজিয়ে অকারণে কতকগুলো লোক হুল্লোড় করছে গানের নাম করে। এই সব কারণেই চটলেন নাকি ভদ্রলোক? হয়তো। অন্যায় কিন্তু—অত্যন্ত অন্যায়। তিনি কি চান, আমি পড়াশোনা পরিত্যাগ করে ভাল না লাগলেও তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাস খেলব আর কীর্তন শুনব? তা না হলে আমার পাখির ফড়িং খাওয়া বন্ধ করে দেবেন? অন্যায়—অত্যন্ত অন্যায়। এই ধরনের চিন্তা করতে করতে হনহন করে ফিরছিলেন তিনি। আবার এবং ক্রমাগত ভাবছিলেন, মল্লিক লোকটাকে কি করে বাগানো যায়। নানারকম উপায়ের কথা চিন্তা করছিলেন, কিন্তু যে মোক্ষম উপায়টি অবলম্বন করলে অবিলম্বে সব ঠিক হয়ে যায়, সেটি ছিল তাঁর কল্পনারও বাইরে। শ্রীযুক্ত সনাতন মল্লিক তাঁরই কর্মচারী। তাঁদের হরিপুরা জমিদারির ম্যানেজার তিনি। মুঙ্গি যে বাগানটায় ঢুকতে পায়নি, সেটা অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু তিনি—মানে অমরবাবু নিজে যদি একটি চিঠি লিখে তাঁকে অনুরোধ করতেন, তা হলে সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু তিনি তা লেখবার কল্পনাও করলেন না। মনিবত্বের সুযোগ নিয়ে মল্লিকের বাগানে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লোক ঢুকিয়ে ফড়িং সংগ্রহ করবেন, এ তাঁর কল্পনাতীত। মল্লিকের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি কেবলই ভাবছিলেন, এ রকম করার অর্থটা কি। আমার এই গবেষণাটা যে ঠিক কি জাতীয়, তাই বোধ হয় ধারণা নেই ওঁর। উনি বোধ হয় ভাবছেন, ছেলেখেলা হচ্ছে একটা। পাখিদের এই বার্ষিক গতি-বিধি যে কত রহস্যময়, তা একদিন বুঝিয়ে বললে বোধ হয় আপত্তি করবেন না আর। পাখিরা যে কিসের টানে এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যায়, তা ঠিকমতো নির্ণয় করতে পারলে বিজ্ঞান-জগতে হৈচৈ পড়ে যাবে একটা। এই নিয়ে পৃথিবীর কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক মাথা ঘামিয়ে সারা হচ্ছেন, কত লোক গবেষণা করার সুযোগই পাচ্ছেন না, আর তিনি তাঁর বাগানে ফড়িং ধরতে দেবেন না, এ কি কথা হল। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বোঝেননি ভদ্রলোক। কিংবা মুঙ্গি হয়তো তাঁর বাগানের গাছে-টাছে হাত দিয়েছে। কিছুই বিচিত্র নয়....। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ মল্লিক-প্রসঙ্গ ভুলে গেলেন একেবারে। একটু দূরে ঘাসের উপর পালক পড়ে রয়েছে একটা। প্রায় ছুটে গিয়ে তুলে নিলেন সেটাকে। দোয়েলের পালক। সাদায় কালোয়—এই তো। অনেক রকম পাখির পালক সংগ্রহ করা আছে তাঁর, দোয়েলের পালক পাননি ইতিপূর্বে। তাঁর এই পালক-সংগ্রহটি একটু বিশেষ ধরনের সংগ্রহ। এতে যে সব পালক তিনি রেখেছেন, তা কুড়িয়ে-পাওয়া পালক। পাখি মেরে তার গা থেকে ছিঁড়ে আর এক ধরনের সংগ্রহ আছে তাঁর—প্রাইমারি

সেকেন্ডারি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগ করে। কিন্তু এই কুড়িয়ে-পাওয়া পালকের আকর্ষণ অন্য রকম, বিস্ময় আলাদা। নানা পাখির ডিমও সংগ্রহ করেছেন তিনি, কিন্তু এই হঠাৎ-কুড়িয়ে-পাওয়া পালক তাঁকে যত আনন্দ দিয়েছে, তত আর কিছুতে পাননি তিনি। দোয়েলের পালক কুড়িয়ে পাননি তিনি ইতিপূর্বে! মনের আনন্দে ছুটলেন তিনি বাড়ির দিকে। রত্নাকে দেখাতে হবে। ফিরেই কিন্তু কবির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কবি যে বৈঠকখানায় বসে আছেন, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি।

"শুনুন।"

"কি?"

"কবিতা। এক দেশ থেকে আর এক দেশে কেন চিরন্তন চলেছে এই যাওয়া-আসা, তারই কবিতা।"

"পড়ুন।"

১

ধূলি-ধূসরিত ধরার পানে
লক্ষ যোজন দূরের সূর্য
আলোক পাঠায় কিসের টানে।
তৃষিত ধরণী লক্ষ মুখেতে পান করে সেই আলোক-ধারা
লক্ষ ছন্দে গাহে আনন্দে আপনার মনে পাগলপারা
পাখির পালকে গাছের পাতায়
ঝলকে চমকে পুলকে ব্যথায়
আত্মহারা
অন্ধকারেতে জ্বালায় তারা

কণায় কণায় তাহার তনুর
সপ্ত বরণ ইন্দ্রধনুর
বর্ণমালা
উজাড় করিয়া হয় যে ঢালা
কেন কে জানে,
ধূলি-ধূসরিত ধরার পানে
লক্ষ যোজন দূরের সূর্য
আলোক পাঠায় কিসের টানে।

২

জানি না আবার সূর্য পানে
লক্ষ যোজন দূরের পৃথিবী
অর্ঘ্য পাঠায় কিসের টানে!

শূন্য আকাশ পূর্ণ করিয়া ভঙ্গিমা তার কত যে ওঠে
বন-বনান্ত হয় মুখরিত নব নব কত সুরের চোটে
মাটির কালোয় পড়ে যায় সাড়া
বন্দী রঙেরা পেয়ে যায় ছাড়া
সবাই ছোটে
লক্ষ বরণ ফুলেতে ফোটে;
মাটির মানুষ আকাশের দিকে
দু বাহু তুলিয়া রহে অনিমিখে
কি গান গাহে
কিসের আশায় কাহারে চাহে
কেন কে জানে
জ্বলন্ত-শিখা সূর্য পানে
স্নিগ্ধ শ্যামল কোমল পৃথিবী
অর্ঘ্য পাঠায় কিসের টানে।

কবিতা পাঠ করে কবি চেয়ে রইলেন স্মিতমুখে।

বৈজ্ঞানিক কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে তিনি বললেন, "আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেছে কিন্তু।"

"কি?"

"রবি ঠাকুরের টানে নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর 'লিপি' কবিতাটার ভাব চুরি করে ফেলেছি।"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ওকে ঠিক চুরি বলে না। কবিতা খুব ভাল হয়েছে আপনার। একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন, কবিতা বিজ্ঞান নয়। আপনি যে টানের গানে উচ্ছ্বসিত, বৈজ্ঞানিকের কাজই সেই টানের কারণ নির্ণয় করা যুক্তি-সহ উপায়ে। সূর্য কেন পৃথিবীর দিকে আলো পাঠায় আর পৃথিবী থেকে আকাশে এত গান গন্ধ গুঞ্জন কেন ওঠে, তার অনেক কারণ বিজ্ঞান বার করেছে, অনেকগুলোর পারেও নি। কিন্তু পারবে একদিন।"

বৈজ্ঞানিকের এই বালক-সুলভ আত্মপ্রত্যয়ে কবির মুখে একটা অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠল। প্রতিবাদ করলেন না। কি হবে প্রতিবাদ করে! তাঁর মনে শুধু গুনগুন করে উঠল কবিতার দুটো লাইন।—

কোন্ চতুরিকা কোন্ পথে আসি
করে যায় কত ছলনা
তার কতটুকু জান বল না!

হয়তো ব্যঙ্গোক্তি করতেন একটা। কিন্তু বাধা পড়ে গেল তাতে। দ্বারপ্রান্তে গোটা তিনেক চাকরের আবির্ভাব হল। দুজনের হাতে খাবারের সরঞ্জাম আর একজনের হাতে চায়ের। পিছনে রত্নপ্রভা। তিনি গম্ভীরভাবে দুজনের সামনে খাবার সাজিয়ে দিয়ে পাশের টেবিলটায় দাঁড়িয়ে চা ছাঁকতে লাগলেন, মুখে একটি কথা নেই। ক্ষুধিত বালকের মতো খেতে লাগলেন বৈজ্ঞানিক। দুটো রসগোল্লা একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে সেগুলি গিলতে না গিলতেই একটা কচুরিতে

লাগালেন কামড়। কবি এ সময়ে খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, এ সময়ে খাওয়া অভ্যাসও নয় তাঁর! কিন্তু এতগুলি রসবস্তুকে অবহেলা করলে রসবোধেরই যেন অপমান করা হবে—এই ধরনের একটা মনোভাব নিয়ে অথচ শিল্পী-জনোচিত সাবধানতার সহিত তিনি অগ্রসর হলেন। রত্নপ্রভা দুজনের সামনে চায়ের পেয়ালা রাখতেই বৈজ্ঞানিকের একটা কথা মনে পড়ে গেল সহসা। চায়ের সঙ্গে স্টোভের এবং স্টোভের সঙ্গে কেরোসিন তেলের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগই সম্ভবত বিস্মৃত-অপনোদনের কারণ হল।

"যাঃ—ছি—ছি! কটা বেজেছে?"

চেয়ার ঠেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং রত্নপ্রভার দিকে চাইতে লাগলেন অপরাধী বালকের মতো। বর্ধমানের বাইরে এমন সীতাভোগ কি করে হওয়া সম্ভব—কবি চিন্তা করছিলেন, তাঁর চিন্তাধারা ছিন্ন হল এতে।

"কি হল আপনার আবার?" —একটু বিরক্তকণ্ঠেই তিনি প্রশ্ন করলেন।

"কেরোসিনের পার্‌মিটের জন্যে একটা লোক পাঠাবার কথা ছিল, ছি ছি, একদম ভুলে গেছি।"

"লোক পাঠিয়ে পার্‌মিট আনিয়ে নিয়েছি আমি।"—ধরা-গলায় রত্নপ্রভা বললেন।

"তাই নাকি? বাঃ, গোটাচারেক সিঙাড়া দাও তা হলে?"

কবিও বলে উঠলেন, "ওহো, আমিও বা করছি কি! আমার বাড়িতে কয়লা একেবারেই নেই। আজ উনুন ধরবে না, আপনার কাছে যদি পাওয়া যায় কিছু এই আশায় বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে।"

বৈজ্ঞানিক রত্নপ্রভার দিকে চাইতেই রত্নপ্রভা বললেন, "আমাদের কিছু বেশি কয়লা আছে, আমি দিচ্ছি ব্যবস্থা করে।"—বলেই বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে রূপচাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

"আনন্দ আছ নাকি?"

"আছি, এস।"

রূপচাঁদ মৌলিক প্রবেশ করলেন। গলায় পাকানো চাদর, বগলে একটি প্যাকেট। এসেই তিনি কবির দিকে এক নজর চেয়ে একটি চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, পাশের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম রয়েছে। উঠে গিয়ে নিজেই এক কাপ চা ছেঁকে নিলেন। চায়ে একটা বড়গোছের চুমুক লাগিয়ে কবির দিকে আর এক নজর চেয়ে বললেন, "এরকম ভাবে কতদিন চালাবে বল দিকি আনন্দ?"

"কি রকম ভাবে?"

"পরিবারকে উনুন-গোড়ায় বসিয়ে রেখে কয়লা আনতে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ প্রায় ঘণ্টা দুই আগে, আর এখানে বসে দিব্যি রসগোল্লা ওড়াচ্ছ। তোমার জ্বালায় আমি আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে পারিনি এখনও। পথেই তোমার ঝিয়ের সঙ্গে দেখা, সে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। তার মুখেই শুনলুম সব।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি! গেলাম বৈজুমলের কাছে। মণ চারেক কয়লা পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি। কয়লা নিয়ে ফিরে দেখি, তখনও তুমি ফেরোনি। তখন মনে হল, নিশ্চয়ই পাখির খপ্পরে

পড়েছ। বৈজ্ঞানিক মশায়ের সঙ্গে আমারও একটু দরকার আছে, তাই সোজা এখানেই চলে এলাম, এখনও বাড়ি ঢুকিনি।"

বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল শুধু। বস্তুত, কথা বলবার মতো অবস্থা তখন তাঁর নয়। শেষ সিঙাড়াটি মুখে পুরে চর্বণ করছিলেন তিনি তখন। কবি স্মিতহাস্যে প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন রূপচাঁদের দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ— তোমার কর্তব্য তুমি করেছ, এতে আর বলবার কি আছে!

"ছ'টাকা বারো আনা লেগেছে। ছ'টাকা কয়লার দাম আর বারো আনা কুলি। টাকাটা দিতে ভুলে যেও না। কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা, আমিই আনিয়ে নেব এখন তোমার গিন্নীর কাছ থেকে।"

খানিকটা চা দিয়ে মুখবিবরটা পরিষ্কার করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক হাঁকলেন, "ওরে, কে আছিস?"

একটা ছোঁড়া চাকর এসে দাঁড়াল।

"আর এক ডিশ খাবার নিয়ে আয়। বল্, রূপচাঁদবাবু এসেছেন।"

"কাজের কথাটা বলে নিই আগে"—শুরু করলেন রূপচাঁদ।

"কি কথা?"

"সবজিবাগে নদীর ধারে তোমার যে বাড়িটা পড়ে আছে, সেটা দেবে আমাকে?"

"সেটা তো পড়ো বাড়ি।"

"একখানা ঘর হলেই চলবে। সেই মেয়েটির জন্যে—"

"সে মেয়েটি আছে নাকি এখনও, কে বল তো মেয়েটি?"—কবি বলে উঠলেন। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি।

"তা থাকতে পারেন তিনি আপত্তি নেই! তবে—"

একটু ইতস্তত করে থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক।

"তবে আবার কি, খোলসা করেই বল না। শহরের বাইরে তোমার ওই পড়ো বাড়িতে কারও পক্ষে থাকা এমনিতেই শক্ত, তবে মেয়েটি নেহাত নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে—ধর্মশালায় দু' দিনের বেশি তো থাকতে দেবে না।"

"পড়ো বাড়ি বলেই ওটা বেশি দরকারী আমার কাছে। ওর পাশেই যে বাঁশঝাড়টা আছে। তাতেই কেটুপা (Ketupa) দেখেছিলাম একদিন...ওখানে মাঝে মাঝে যাই আমি রাত্রিবেলা।"

"কেটুপা কি আবার?"

"হুতুম প্যাঁচা।"

রূপচাঁদ নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল বৈজ্ঞানিকের দিকে, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক চিকমিক করতে লাগল কেবল।

তারপর বললেন, "বেশ তো, সে যখন দরকার তোমার, যেও।"

"উনি আপত্তি করবেন না তো তাতে?"

"কিছুমাত্র না।"

"মেয়েটি কে, কোথা থেকে এল?"—কবি প্রশ্ন করলেন আবার।

রূপচাঁদ রহস্যময় দৃষ্টি মেলে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "বার্মা রেফিউজি।"

বৈজ্ঞানিক উঠে গিয়ে দোয়েলের পালকটি তুলে রাখছিলেন তাঁর পালক-সংগ্রহের মধ্যে। রাখতে গিয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নীলকণ্ঠের পালকটি নূতন করে বিস্মিত করছিল যেন তাঁকে। প্যারাডাইস ফ্লাই-ক্যাচারের ল্যাজের লম্বা পালকটিও ছিল তাঁর সংগ্রহের মধ্যে, সেটির দিকেও স্নেহভরে চাইছিলেন তিনি মাঝে মাঝে। সেই অদ্ভুত সুন্দর পক্ষী-দম্পতিকে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি যেন চোখের সামনে—হিন্দী নামটিও চমৎকার—দুধরাজ, সত্যিই যেন রাজারাণি, বাদশা-বেগম বললে আরও ভাল হয়। আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক পালক দেখে যেতে লাগলেন তিনি......ঘুঘু, শকুনি, শিকরে, টিয়া, বটের, তিত্তির...কত রকম পালক......

কবি জিজ্ঞেস করলেন, "বার্মা রেফিউজি মানে? খুলেই বল না।"

"মানে, জাপানীর ভয়ে বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছে। রাস্তায় বাপ মা ভাই বোন মরে গেছে সব, ডাকাতের হাতে পড়েছিল আসামের জঙ্গলে। এই মেয়েটি পালিয়ে রক্ষা পেয়েছে কেবল! গায়ের গয়না বিক্রি করতে করতে এতদূরে এসে পৌঁছেছে। রাত্রে জাহাজঘাটে এসে নেবেছিল, তারপর ধর্মশালা খুঁজতে খুঁজতে ভুল রাস্তা ধরে শহরের বাইরে গিয়ে পড়ে। তোমরা সকালে যখন পাখি দেখছিলে, তখন আমি খেজুর-রসের চেষ্টায় এগিয়ে দেখি, বাগানের ধারে পুলটার ওপর মেয়েটি বসে আছে ম্লানমুখে। বাগানের ও-পাশে শিবু মিত্তির থাকে, তার কাছ থেকে পেয়ালা আনতে যাচ্ছিলাম। ফেরবার মুখে দেখি, তখনও বসে আছে মেয়েটি। এগিয়ে গিয়ে পরিচয় নিলাম। তারপর তো জানই সব—"

কবি বললেন, "আহা, ভারি বিপদে পড়েছে তো মেয়েটি।"

কবির মনটা সত্যই ভারাক্রান্ত হয়ে এল। রূপচাঁদ নিবিষ্টচিত্তে চা খেতে লাগলেন। আর এক ডিশ খাবারও এসে পড়ল।

কবি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটি কি এখানেও থাকবে নাকি?"

রূপচাঁদ জবাব দিলেন না প্রথমটা। মনে হল, এ বিষয়ে কবির সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক নন তিনি ততটা। কবি কিন্তু নাছোড়বান্দা লোক।

"মেয়েটি কি এখানেই থাকবে নাকি?"

রূপচাঁদ জবাব না দিয়ে আর পারলেন না।

"কি করে বলব বল?"

"এ দেশে ওর আত্মীয়স্বজন আছে নাকি কেউ?"

"জানি না তো। আমাকে কেঁদে কেটে ধরেছে একটা আশ্রয় যোগাড় করে দেবার জন্যে। চেষ্টা করছি, তারপর কি হয় কে জানে!"

"ওই পড়ো বাড়িতে ও একলা থাকতে পারবে?"

"তা কি পারে কখনও!"

"কে থাকবে তা হলে ওর সঙ্গে?"

রূপচাঁদ জবাব দিলেন না, একমনে কচুরি চিবোতে লাগলেন। কথাটা আরও চাপা পড়ে গেল, বৈজ্ঞানিক ফিরে এসে যখন রূপচাঁদের প্যাকেটটা তুলে বললেন, "এটাতে কি?"

"ওটা একখানা শাড়ি।"

"শাড়ি? ও—"

বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল এর বেশি আর অগ্রসর হল না। তিনি প্যাকেটটা টেবিলে রেখে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কবি প্রশ্ন করলেন, "শাড়ি? কার জন্যে শাড়ি কিনলে?"

"শাড়ি আবার কার জন্যে কেনে লোকে। পরিবারের জন্যে। রমেনদের দোকানে দেখলাম টাঙানো রয়েছে, দামটা শস্তা মনে হল, নিয়ে যাচ্ছি, গিন্নীর যদি পছন্দ হয়, রেখে দেওয়া যাবে।"

বৈজ্ঞানিক হঠাৎ ফিসফিস করে বলে উঠলেন, চুপ চুপ, একটা চোরপাখি এসেছে—চেস্টনাট-বেলিড্ নুটহ্যাচ্। দেখবেন? ওই আমগাছে রয়েছে। গাছের ডালে ডালে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়—"

বৈজ্ঞানিক তাড়াতাড়ি দুরবীনটা নিয়ে চোখে লাগালেন। কবিও গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। রূপচাঁদ আর একটি কচুরি মুখে পুরলেন।

।। তিন।।

কবি-গৃহিণী মন্দাকিনী অতিশয় চাঁছা-ছোলা প্রকৃতির লোক। কবিত্ব-টবিত্বর ধার ধারে না বিশেষ। অতিশয় স্বাভাবিক নারী-জীবন যাপন করে থাকেন ভদ্রমহিলা। অনেকগুলি সন্তানের জননী, নানারকম রান্নায় সিদ্ধহস্ত। উলবোনা, সেলাই করাও শিখেছিলেন এককালে; কিন্তু আজকাল ওসব নিয়ে বসবার সময়ও নেই, পয়সাতেও কুলোয় না। সংসারের ন্যায্য খরচই কুলোতে পারে না, ওসব শৌখিন খরচ করবেন কোথা থেকে! কর্তা 'রিটায়ার' করার পর থেকে বিসর্জন দিতে হয়েছে ওসব। কবি ছিলেন অধ্যাপক। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। শহরে বাড়িখানা আছে, জমি-জমাও আছে কিছু। যা পেন্‌শন পান তাতে কুলিয়ে যায়। কিন্তু কোনোক্রমে। সংসারের সমস্ত ভার মন্দাকিনীর উপর। আজকাল ঝি-চাকর পাওয়া যায় না, একা হাতে মন্দাকিনীকেই সব করতে হচ্ছিল এতদিন। বাসন-মাজা, ঘর-নিকানো, রান্না, সাবান-কাচা সমস্তই করছিলেন। সম্প্রতি রূপচাঁদ একটি ঠিকে ঝি যোগাড় করে দিয়েছেন। এত কাজ একা করা সম্ভব হচ্ছিল তার কারণ বাড়িতে এখন লোকজন কম। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কনিষ্ঠটি ব্যতীত আর সবই কন্যা। তাদের বিয়েও হয়ে গেছে। সবাই এখন শ্বশুরবাড়িতে। ছেলে মন্টুর বয়স বছর দশেক, মামার বাড়িতে থেকে সে স্কুলে পড়ে। মামীর সে খুব প্রিয়, মামী তাকে ছাড়তে চায় না। উপস্থিত স্বামীকে নিয়েই মন্দাকিনীর সংসার। তবু কিন্তু মন্দাকিনীর অবসর নেই। তিনি সংসারের কাজ নিয়েই থাকেন, ও ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না তাঁর। সংসারকে কেন্দ্র করেই তাঁর যত ঘোরা-ফেরা। রান্নার অবসরে কখনও ভাঁড়ার গোছাচ্ছেন, কখনও বড়ি দিচ্ছেন, কখনও আচার করছেন, কখনও আমসত্ব। চিনি আজকাল দুর্লভ হয়েছে, চিনি পেলে জ্যাম জেলি করার শখও আছে, তা ছাড়া আছে হাড়-পাঁজরা বের-করা একটি গাই। মন্দাকিনী শখ করে তার নাম রেখেছেন সুন্দরী। দু'বেলায় মেরে-কেটে গরুটি সের খানেক দুধ দেয় কি না সন্দেহ, কিন্তু তাতেই মন্দাকিনী গদগদ। দিবারাত্রি গরুটির সেবা করে চলেছেন। কখনও তাকে ফ্যান খাওয়াচ্ছেন, কখনও নাদা পরিষ্কার করছেন, কখনও জাব মেখে দিচ্ছেন, কখনও গোবর পরিষ্কার

করছেন। সুতরাং 'ড্রইং-রুম' বলে যদিও তাঁদের একটি ঘর আলাদা করা আছে এবং সেখানে যদিও মাঝে মাঝে অধ্যাপক মশায়ের বন্ধু-বান্ধবদের অভ্যাগম ঘটে, কিন্তু মন্দাকিনীর সেখানে গিয়ে বসবার অবসর নেই। তাঁকে সেখানে মানায়ও না ঠিক। তাঁর বেশবাস কথাবার্তা, হাব-ভাব সমস্তই সেকালে ধরনের। কিছুকাল আগে পর্যন্ত রীতিমত অন্তঃপুরিকাই ছিলেন, অচেনা লোকের সামনে বেরুতেন না। ইদানীং অবশ্য বেরোন, কিন্তু স্বস্তি পান না। কোনও মহিলার সমাগম হলে আনন্দবাবুর ডাকাডাকিতে মাঝে মাঝে তাঁকে 'ড্রইং-রুমে' এসে বসতে হয়, কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতে পারেন না তিনি সেখানে। রান্নাঘরে ডালটা চড়িয়ে এসেছেন, না নাড়লে ধরে যাবে, কিংবা গোয়ালঘরে সুন্দরীর নাদায় হয়তো জল নেই—এই ধরনের একটা কিছু তাঁর মনে পড়ে যায়, আর তখনই তিনি উঠে আসেন। কোনও ব্যক্তি-বিশেষের দিকে ঘটা করে মন দিতে পারেননা তিনি। আনন্দবাবুর দিকে মনোযোগ দেওয়াটাও খুব একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয় তাঁর কাছে। তিনি স্বামী আছেন আছেন, তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার কোনও প্রয়োজন অনুভব করেন না মন্দাকিনী। তিনি যা রাঁধবেন স্বামীকে তাই খেতে হবে, স্বামী কি খেতে পছন্দ করেন, তা বিচার করবার সময় নেই তার। গেরস্থ ঘরে অত পছন্দ-অপছন্দর বায়নাক্কা তুললে সংসার চালানো যায় না—মন্দাকিনীর এই ধারণা। আনন্দবাবুও এই নিয়ে বকাবকি করেন না আর। যা পান মুখ বুজে খেয়ে নেন। স্ত্রী সম্বন্ধে আনন্দবাবুর ধারণা সংস্কৃত-যুগ-ঘেঁষা। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।' পত্নী একটা সামাজিক প্রয়োজন। শৌখিন আসবাবের মতো কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখবার বস্তুও যেমন নয়, অনাদরে আবর্জনার মতো আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবার জিনিসও নয়। অতিশয় পবিত্র এবং প্রয়োজনীয়। আনন্দবাবু বকাবকি করেন না আর। পেন্‌শনটি পাওয়ামাত্র মন্দাকিনীর হাতে দিয়ে দেন। মন্দাকিনীর ফরমাশ অনুসারেই বাজারের জিনিসপত্র কিনে আনতে হয় তাঁকে। তাঁর যে একটা আলাদা সত্তা আছে, আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে, আলাদা জগৎ আছে, তা মন্দাকিনী গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন বলে মনে হয় না। স্বামী তাঁর জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, সুতরাং তাঁর জীবন অনুসারেই স্বামীকে চলতে হবে। অন্য রকম যে কিছু হওয়া সম্ভব, তা মন্দাকিনীর কল্পনাতীত। তাঁর সুন্দরী গাই এবং স্বামী আনন্দমোহনকে ঠিক যদিও এক দৃষ্টিতে দেখেন না তিনি, কিন্তু হাবভাব থেকে মনে হয়, দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেকটা এক রকমই। তবে স্বামীকে তিনি যে অবজ্ঞার চোখে দেখেন, তাও নয়। তাঁর মঙ্গলের জন্য ব্রত-উপবাস করেন, তাঁর শরীর কিসে ভাল থাকবে সেজন্য তাঁর সশঙ্ক চিন্তার অন্ত নেই। তাঁর সম্বন্ধে গৌরববোধও আছে যথেষ্ট। তিনি যে কত বড় বিদ্বান অধ্যাপক, কত বড় কবি—এ সম্বন্ধে মন্দাকিনী খুবই সচেতন। তাঁর প্রতিবেশিনী হালদার-গিন্নীর কাছে অত্যুক্তিপূর্ণ অনেক গল্প করেন তিনি এ নিয়ে। না, স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা নেই মন্দাকিনীর মোটেই। তিনি যেমন মা-ষষ্ঠী মানেন, বারবেলা মানেন, ভূত-প্রেত কবচ-মাদুলি মানেন, স্বামীকেও তেমনি দেবতা বলেই মানেন। পায়ে পা ঠেকে গেলে প্রণাম করেন, পাদোদকও খান দরকার হলে। যে ব্যক্তিটির সঙ্গে প্রায় ছত্রিশ বৎসর পূর্বে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, সেই আনন্দমোহন তরফদার যে সম্পূর্ণরূপে তাঁরেই আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য জন্মজন্মান্তরের জের টেনে এ জন্মেও আবির্ভূত হয়ে তাঁর কপালে সিন্দুর দান করেছেন—এ সম্বন্ধে মন্দাকিনীর কোনও সন্দেহ নেই। আকাশ নীল, বরফ ঠান্ডা—এসব যেমন স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আনন্দমোহন তরফদারও তেমনই একমাত্র মন্দাকিনী দেবীর প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুত—এই তাঁর ধারণা। মন্দাকিনীকে অতিক্রম করে আনন্দমোহনের আর একটা সত্তা থাকা সম্ভব কি না

এবং সেটা কি রকম তা নিয়ে তিনি কোনও দিন মাথা ঘামাননি, তাঁর ঘরের চৌকিটা চতুষ্পদ না হয়ে অষ্টপদ হলে কি রকম হত তা নিয়ে যেমন তিনি মাথা ঘামান না কখনও।

বলা বাহুল্য, মন্দাকিনী মাথা না ঘামালেও আনন্দমোহনের আর একটা বিশিষ্ট সত্তা ছিল। সেই বিশিষ্ট সত্তার প্রধান লক্ষণ সৌন্দর্য-বোধ, এবং প্রধান আকাঙ্ক্ষা রূপ-পিপাসা। এইজন্যেই তিনি কাব্যচর্চা করেন, এইজন্যেই তিনি পক্ষীতত্ত্ব নিয়ে মেতেছেন এবং ঠিক এইজন্যেই বার্মা-ফেরত যুবতীটির কালো চোখের চকিত দৃষ্টিতে তাঁর মনের আকাশে যে বর্ণসম্ভার ফুটে উঠল তা সৌন্দর্যে ইন্দ্রধনুকেও ছাড়িয়ে গেল এক নিমেষে।

তাঁর মানসলোকের এই সব খবর মন্দাকিনী কখনও রাখেননি, রাখবার দরকারই হয়নি তাঁর। স্বামী সম্বন্ধে যে খবরগুলি তিনি জানেন, সেইগুলিই পর্যাপ্ত তাঁর পক্ষে। তিনি জানেন, আনন্দমোহন কাছা-খোলা প্রকৃতির লোক, কিন্তু সর্ববিষয়ে সর্দারি করতে যাওয়া চাই। তিনি জানেন, আনন্দমোহনের ধাতটা কোফো, কিন্তু রাত্রে মাথার দিকে জানালা খুলে শোবার লোভটা প্রচুর। তিনি জানেন, তরকারিতে বেশি মসলা দিলে আনন্দমোহনের পেট খারাপ হয়, কিন্তু আনন্দমোহনের ইচ্ছেটা বাড়িতে রোজই তেল-ঘি-মসলা-ওলা গরগরে তরকারি হোক। তিনি জানেন, আনন্দমোহন বাইরের লোকের কথায় নাচবার জন্যে পা-টি সর্বদা বাড়িয়ে আছেন, অথচ নাচের 'ন' পর্যন্ত জানেন না তিনি। এই 'রিটায়ার' করবার পর সেদিন যেমন হল। নিতাইবাবুর কথায় নেচে পোস্ট-অফিস থেকে টাকা বের করে শেয়ারে মনোহারী দোকান খুললেন। মন্দাকিনী পইপই করে বারণ করেছিলেন, কিছুতেই শুনলেন না। ফলে টাকাগুলি গেছে। তিনি জানেন যে, আনন্দমোহন যেটি দরকারী কাজ সেটি কিছুতে করবেন না। দিস্তা দিস্তা কাগজ কিনে ছাইভস্ম কত কি যে রোজ লিখে যাচ্ছেন পাতার পর পাতা, অথচ সেজো মেয়েটার জ্বর হয়েছে খবর পেয়েও একটি চিঠি লেখেননি সেখানে। আনন্দমোহন-চরিত্রের এই সব কথা মন্দাকিনী জানেন। রঘুবংশ বিষয়ে তাঁর থীসিস যে বিদ্বৎ-সমাজে কতটা সুখ্যাতি লাভ করেছে, অধ্যাপক হিসাবে তাঁর বিদ্যাবত্তা, তাঁর অধ্যাপনা কৌশল, তাঁর চরিত্রমাধুর্য যে ছাত্র-সমাজকে কত মুগ্ধ করে রেখেছে, তাঁর সৌন্দর্যবোধ, রসোচ্ছলতা, সাবলীল কবিত্বশক্তি যে যে-কোনও কবিযশোপ্রার্থীর ঈর্ষার বিষয়—এসব খবর মন্দাকিনী জানতেন না, জানবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। এই বুড়ো বয়সে তাঁর স্বামী যে তাঁর মেয়ের বয়সী কোনও মেয়েকে দেখে আত্মহারা হয়ে পড়তে পারেন—এ কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল মন্দাকিনীর পক্ষে। ইদানীং অমরবাবুর পাল্লায় পড়ে পাখির হুজুকে মেতেছেন এবং দূরবীন কিনেছেন—এই তিনি জানতেন। এই দুঃসময়ে অত টাকা খরচ করে দূরবীন কেনাতে আপত্তি ছিল তাঁর। জামাইষষ্ঠীতে ছোট জামাইকে ভাল করে তত্ত্ব দেওয়া হয়নি গেল বছর, এ বছরও যদি না দেওয়া হয়, তা হলে কুটুমবাড়িতে আর মান থাকবে না। কিন্তু হুজুকে মাতলে তো ওঁর জ্ঞান থাকে না—দুম করে অত টাকা খরচ করে দূরবীন কিনে বসলেন একটা! দূরবীন দিয়ে কাক আর শালিখ দেখে কার কি হবে? আনন্দমোহন-চরিত্রের যতটুকু তিনি জানতেন, তাতে তাঁর এ আচরণ বেমানান হয়নি কিছু। কিন্তু তিনি দূরবীন দিয়ে পাখি ছাড়া অন্য কিছুও যে দেখছেন, এ তিনি ভাবতেও প্যারেননি, কারণ আনন্দমোহন চরিত্রের এ অংশটুকু অজ্ঞাত ছিল তাঁর কাছে। তাই সেদিন যখন বেলা একটা পর্যন্ত আনন্দমোহন বাড়ি ফিরলেন না, তখন এ কথা ভাবা মন্দাকিনীর পক্ষে অসম্ভব ছিল যে, তিনি ওই বার্মা-ফেরত মেয়েটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চাকর খুঁজে বেড়াচ্ছেন দুপুর রোদে টো-টো করে।

আনন্দমোহন সত্যিই কিন্তু চাকর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। নিজের বাড়ির জন্যে হলে খুঁজতেন না, কিন্তু এর জন্যে খুঁজছিলেন। ওই আশ্রয়হীনা মেয়েটির হিতার্থে কিছু একটা করার জন্যে তাঁর সমস্ত চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। তাঁর মনে হচ্ছিল, করিৎকর্মা রূপচাঁদ নিপুণ দক্ষতা-সহকারে সব করে ফেলছে, তিনি কিছুই পারছেন না, তিনি হেরে যাচ্ছেন। মেয়েটির চোখে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ। রূপচাঁদ তার বাড়ি যোগাড় করে দিয়েছে, চৌকি যোগাড় করে দিয়েছে, একটা হোটেল থেকে খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। দাই কিংবা চাকর যোগাড় করতে পারেনি এখনও। সকালবেলা অমরেশের সঙ্গে পক্ষী-পর্যবেক্ষণ করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল যে, আগরপুরে তাঁর এক ছাত্র মহেশলাল আছে। মহেশলাল বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। তার বাড়িতে তার বিয়ের সময় তিনি গেছেনও একবার। মনে হল, মহেশলাল ইচ্ছে করলে অনায়াসে একটা চাকর যোগাড় করে দিতে পারে। কথাটা যখন মনে হল, তখন অমরবাবু সোচ্ছ্বাসে বক্তৃতা করছিলেন নীলকণ্ঠ পাখির বিষয়ে। বক্তৃতার মাঝখানেই আগরপুর অভিমুখে রওনা হয়ে পড়াটা অশোভন হবে বিবেচনা করে আনন্দবাবু বক্তৃতা শুনছিলেন। বক্তৃতার দু-চারটে কথা তাঁর মনে আটকেও ছিল। নীলকণ্ঠ পাখি যে ব্যাঙ খেতে খুব ভালোবাসে, সাপ পেলেও ছাড়ে না, এ খবর দুটো অদ্ভুত মনে হয়েছিল তাঁর। অমরেশবাবু বলছিলেন, শীতকালে ওর সৌন্দর্য ঠিক বুঝতে পারবেন না। মার্চ মাস পড়লে তখন দেখবেন ওর বাহার। চতুর্দিকে শোরগোল তুলে সঙ্গিনীকে ঘিরে ঘিরে কত রকম কসরৎই যে ও দেখাবে তখন দেখবেন। সোঁ করে আকাশে উড়ে যাবে অনেক দূর পর্যন্ত, তারপর 'ডাইভ' (Dive) করার মতো করে সঙ্গিনীর দিকে সোজা নেবে আসবে আবার, উচ্ছ্বসিত কলরবে নীল রঙের বাহার ছড়িয়ে। অমরবাবু আর একটা পাখি দেখিয়েছিলেন শ্রাইক (Shrike), বাংলা নাম ক্যারকাটা। অদ্ভুত ধরনের পাখিটা। ছাই-ছাই রঙ, টেলিগ্রাফের তারের উপর বসে ছিল ঘাড় বেঁকিয়ে। শুধু চতুর নয়, পাখিটার ভাবভঙ্গিতে কুটিল ভাবও ফুটে উঠেছিল একটা। কুহু কুহু করে একটা কোকিল ডাকছিল। কবির হঠাৎ মনে হয়েছিল, ক্যারকাটা পাখিটা যেন ঘাড় বেঁকিয়ে মনে মনে বলছে—

ডাকছ ডাকো—কুহু কুহু কুহু
শুনছে সবাই হুঁ হুঁ—

অমরবাবু পাখির বাসা নিয়েও কি দু-চার কথা বলেছিলেন, কিন্তু তার সব কথায় মন দিতে পারছিলেন না তিনি। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, রূপচাঁদের চোখ এড়িয়ে আগরপুরের দিকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারলে বাঁচেন যেন তিনি। রূপচাঁদের চোখ-এড়ানো দুঃসাধ্য হয়নি, কারণ আপিসের সময় হতেই রূপচাঁদ চলে গেলেন। বেগ পেতে হয়েছিল বৈজ্ঞানিককে নিয়ে। তাঁর বক্তৃতা আর কিছুতেই থামে না। তাঁর বক্তৃতা যে খারাপ লাগছিল তা নয়; খুবই ভাল লাগছিল, কিন্তু ভাল করে মন দিয়ে শুনতে পারছিলেন না কিছুতে। অদ্ভুত একটা দোটানার মধ্যে পড়েছিলেন। শীতকালের রোদে আমবাগানটা আশ্চর্যরকম ভাল লাগছিল, ঝোপে-ঝাড়ে গাছের আড়ালে-আবডালে নতুন চেনা পাখিদের আবার দেখতে পেয়ে সমস্ত মনটা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল বার বার, অমরবাবুর উৎসাহের ছোঁয়াচ লেগে বিহঙ্গ জগতের নানা রহস্য সম্বন্ধে উৎসুক হয়েও উঠেছিলেন তিনি, কিন্তু অন্তরের নেপথ্যলোকে ওই মেয়েটি কি যে মায়ার প্রভাব বিস্তার করছিল, কিছুতেই তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

....কবি ফিরলেন যখন, তখন একটা বেজে গেছে। মন্দাকিনী তাঁর পথ চেয়ে অনাহারে চিন্তিত

মুখে বসে ছিলেন। নানারকম দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তাঁর। সম্ভব অসম্ভব নানারকম। মনে হচ্ছিল, কোথায় কোন্ বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শুয়োর বাঘ সাপ-খোপ কত কি আছে, কামড়ে দিলেই হল। ছেলেবেলায় বুনো শুয়োর-চেরা একটা লোক দেখেছিলেন, তার রক্তাক্ত ছবিটা বার বার মনে জাগছিল। বাঘে ধরে নিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। চিন্তিত হয়ে বৈজ্ঞানিকের বাড়িতেও লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বাড়িতে ছিলেন না। পথ চেয়ে শঙ্কিত চিত্তে বসে ছিলেন মন্দাকিনী। স্বামীকে সশরীরে ফিরতে দেখে শঙ্কা অন্তর্হিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী হয়ে উঠলেন।

"কি আক্কেল তোমার। কোথা ছিলে এতক্ষণ?"

"একটা পাখির পেছনে পেছনে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলাম—"

"পাখির পেছনে? গরুর পেছনে পেছনে যাওয়া যায়, পাখির পেছনে পেছনে গেলে কি করে? উড়ছিলে নাকি?"

কবি স্ত্রীকে চিনতেন, প্রত্যুত্তর করলেন না। ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন।

মন্দাকিনী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "কি পাখি?"

"একটা নতুন ধরনের পাখি। এর আগে দেখিনি কখনও। শ্রাইক একটা।"

"কি?"

"শ্রাইক, বাংলা নাম কুরকুটি।"

ক্যারকাটা নামটা ঠিক মনে পড়ল না কবির।

"কুরকুটি?"

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মন্দাকিনী স্বামীর দিকে। দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী। কবি তাঁর দিকে পিছন ফিরে নীরবে জামা-কাপড় ছাড়তে লাগলেন। জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, "আমি চান করব না।"

"পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধুলোয় ভরতি, চান না করেই খাবে? গরম জল তো উনুনে বসানোই রয়েছে, চান করতে আর কতক্ষণ লাগবে?"

"বেশ, দাও তা হলে।"

নিজের তেতলার ঘরটাতে একা শুয়ে ছিলেন কবি চুপ করে। খেয়ে এসে লেপটি গায়ে ঢাকা দিতেই তন্দ্রা এসেছিল। কিন্তু কিসের একটা শব্দে তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। চোখ পড়ল, দেওয়ালের চুনবালি খসে পড়েছে একটা জায়গা থেকে। পৈতৃক পুরনো বাড়ি। বহুদিন মেরামত করানো হয়নি। এই চিন্তার সূত্র ধরে গুটি গুটি আরও যেসব চিন্তা মনের প্রত্যন্তপ্রদেশে উঁকি দিতে লাগল, তা ভয়াবহ। চুন, বালি, সিমেন্ট, পারমিট, রাজমিস্ত্রি, ভারা...। তাড়াতাড়ি লেপ ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। উঠেই জানালাটা খুলে দিলেন: জানালাটা খুলে দিতেই চোখে পড়ল নীলাকাশ এবং সেই নীলাকাশের পটভূমিকায় একটা ন্যাড়া আমড়াগাছ। আমড়াগাছের উঁচু ডালে বসে আছে একটা নীলকণ্ঠ পাখি। আকাশের দিকে মুখটা ঈষৎ তুলে পড়ন্ত রোদটা উপভোগ করছে যেন প্রাণ ভরে। জানালাটির ধারেই কবির লেখার জায়গা, তার নীচেই লেখবার সরঞ্জাম ছিল সব। চেয়ারটি টেনে কবি বসে পড়লেন। বাড়ির জীর্ণ সংস্কারের কথা মনে রইল না আর। একদৃষ্টে তন্ময় হয়ে বসে রইলেন তিনি পাখিটার দিকে চেয়ে। ঠিক পাখিটার দিকেও চেয়ে নয়, পাখিটাকে কেন্দ্র করে তাঁর মন কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল অনন্ত আকাশে। একটু পর আর একটা নীলকণ্ঠ এসে বসল। প্রথম নীলকণ্ঠটা যেখানে বসে ছিল,

তার নীচের ডালটায়। অতিশয় নির্বিকারভাবে, যেন সে প্রথম নীলকণ্ঠটাকে দেখতেই পায়নি। প্রথম নীলকণ্ঠটা কিন্তু উচ্ছ্বসিত কলরবে ডেকে উঠল। এত উচ্ছ্বসিত যে, তা কর্কশ কি মধুর, তা বিচার করবার আর অবসর রইল না, উচ্ছ্বাসের তোড়ে ভেসে গেল কবির মন। তারপরই সে উড়ল ডানা মেলে। বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইলেন কবি খানিকক্ষণ। তারপর কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করে দিলেন হঠাৎ—

বাদামী রঙের ছাই মেখে গায়ে
আত্মগোপন করেছ মিছে
ও নীলকণ্ঠ, রঙ যে তোমার
উপছে পড়েছে ডানার নীচে
আ মরি মরি
পাশে বসে আছে সোহাগী সখীও নীলাম্বরী!
সয় না তর
খুলে যায় মন খুলে যায় ডানা
কণ্ঠে জাগে যে কলস্বর.......
দেখি তখন
এ কি স্বপন...
ঘন-নীল আর ফিকে-নীল আর আবছা-নীল
সাগরের নীল, আকাশের নীল, নীল-নিখিল
ফোয়ারার মতো অনন্ত নীলে ছড়িয়ে পড়ে
চমক-লাগানো নীলের ঝড়ে,
ঊর্ধ্বে নিম্নে আগে ও পিছে,
বাদামী রঙের ছাই মেখে গায়ে
আত্মগোপন করেছ মিছে।

কবিতাটা লিখে কবি চোখ তুলে দেখলেন, পাখি দুটো চলে গেছে· চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। মেয়েটির মুখটা মনে পড়ে গেল। কি অদ্ভুত শ্যামল স্নিগ্ধতা ওতপ্রোত হয়ে আছে তন্বী দেহটিতে। যখন চাকরটাকে নিয়ে গেলেন, তখন তার চোখে মুখে ফুটে উঠল কি আনন্দ। অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন কবি অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। কাগজ কলম নিয়ে আবার শুরু করলেন লিখতে।—

বল না বোঝাব সখি কি করে
তোমার অঙ্গ ভরি কি মাধুরি মরি, মরি
তোমার নয়ন কোণে কি আলো যে ঠিকরে!
সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে
অরূপ-লোকের মায়া রূপলোকে এসে যেন
অতিশয় দ্বিধা-ভরে থেমেছে।
থমথমে চারিদিক,—চুপ চুপ চুপালি
মেঘেতে লেগেছে রঙ সোনালি ও রূপালি

ভূপালী না ভৈরবী চোখে ওর কি ভাষা
তৃপ্তি না পিপাসা
কল্পনা-বীণা বাজে আকুল ছন্দা যে
মুঞ্জরি উঠিয়াছে রজনী-গন্ধা যে
শ্যামল তন্বী তনু-শিখরে
বল না বোঝাব সখি কি করে।

লেখা শেষ করে কবি বসে রইলেন। অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। অন্ধকার নামতে লাগল চতুর্দিকে। তার সঙ্গে স্বপ্নও।

।। চার ।।

"বসে পড়ুন, ওইখানেই বসে পড়ুন—"

বৈজ্ঞানিক ফিসফিস করে গর্জন করে উঠতেই বসে পড়লেন কবি। শহরের বাইরে অনেক দূরে এসে পড়েছিলেন তাঁরা, নদীর ধারে ধারে বক আর বাটানের দল দেখতে দেখতে। উদ্দেশ্য— নদীটা পেরিয়ে কিছু দূরে যে বিলটা আছে, সেইখানে গিয়ে শীতের অতিথি কাদা-খোঁচার দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন কবির।

কবি বসে পড়তেই বৈজ্ঞানিক হামাগুড়ি দিয়ে সরে এলেন তার কাছে।

"ওই দেখুন হলদে খঞ্জন একটা—Yellow Wagtail—এরা উইন্টার ভিজিটার—"

"কোথা থেকে আসে?"

"রাশিয়া থেকে। গ্রীষ্মকালে এরা Ural Mountains থেকে কামস্কাট্‌কা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে, আফগানিস্থানের উত্তরেও কিছু কিছু দেখা যায়। অতদূর থেকে ওরা উড়ে আসে এ দেশে।"

কবি সবিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন ছোট্ট পাখিটিকে। ল্যাজ দুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কামস্কাট্‌কার পাহাড়ের আগ্নেয়গিরির খবর ও রাখে নাকি? সোভিয়েট বিপ্লবের আঁচ লেগেছে নাকি ও গায়ে? দেখলে তো মনে হয়, এ দেশের শ্যামাঙ্গিনী মেয়ে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "খঞ্জন কিন্তু আরও চার রকম আছে, White Wagtail, Large Pied Wagtail, Grey Wagtail, Yellow Headed Wagtail. এর মধ্যে Large Pied Wagtail এ দেশেরই বাসিন্দা, সব সময়ে থাকে। শুনুন, ডাকছে, শুনতে পেলেন?"

কবি ধমকে উঠলেন, "পেয়েছি। আপনি একটু চুপ করুন তো।"

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, কবি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন খঞ্জন পাখিটার দিকে তন্ময় হয়ে। মনে হচ্ছে, একটা অপরূপ কিছু দেখছেন যেন তিনি। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন দুজনে।

বৈজ্ঞানিক সহসা আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"ওই দেখুন।"

"কি?"

"দোয়েল। শীতকালে বড় দেখা যায় না। ওই ঝোপটার ধারে টপ করে নামল। পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে বোধ হয়। চলুন, ওঠা যাক।"

আবার দুজনে চলতে শুরু করলেন। ঝোপটার কাছাকাছি এসে বৈজ্ঞানিক বললেন, "দাঁড়ান একটু, আমি দোয়েলটাকে দেখে আসি ভাল করে। ও বোধ হয় ওই ঝোপটাতেই থাকে।"

কবি দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে পড়ল, একটা ফিঙে বসে আছে টেলিগ্রাফ পোস্টের উপর। চমৎকার মিষ্টি সুরে ডাকছে। আর একটা ফিঙে উত্তর দিচ্ছে তেমনই মিষ্টি সুরে। কবির মনে হল, বিশ্ব জুড়ে এই চলেছে অহোরাত্র। অন্তরতমকে ডাকছে সবাই। নিরন্তর চলেছে এই ডাকাডাকি—গানে গন্ধে বর্ণে। ডানার কথা মনে পড়ল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন খানিকক্ষণ। দূরের শিমুলগাছটায় প্রকাণ্ড একটা শকুনি এসে বসল। বিরাট পাখি। শকুনি সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছে হল। ঘাড় ফিরিয়ে বৈজ্ঞানিককে দেখতে পেলেন না। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? হঠাৎ দেখতে পেলেন, প্রায় লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন তিনি ঝোপটার পাশে, এবং উদগ্রীব হয়ে কি দেখছেন। কবি এগিয়ে গেলেন।

"কি দেখছেন?"

"দেখতে পেলাম না ঠিক। পালাল। চলুন।"

"শিমুলগাছটায় শকুনি বসেছে একটা—"

"ও, কই?"

"ওই যে—!!"

বৈজ্ঞানিক দুরবীন লাগিয়ে দেখলেন একবার।

তারপর বললেন, "এটা হচ্ছে White-Bengal Vulture. পিঠের ওপর সাদা আর গলায় কলারের মতো সাদা আছে, দেখুন। এইটেই সাধারণত দেখা যায়, আর এক রকমও দেখা যায়, Long-Billed Vulture–Gyps Indicus–এদের ঠোঁট আর একটু লম্বা হয়, পিঠের কাছে সাদা নেই। লাল-গলা শকুনিও আছে এক রকম, দেখেছেন নিশ্চয়, সেগুলোর নাম King Vulture, পণ্ডিচেরি ভাল্চারও বলে কেউ। বামুন শকুনিও বলে।"

কবি কিন্তু ভাবছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কথা। তাঁর মনে হচ্ছিল, শকুনির ছদ্মবেশে এ যেন আর কেউ। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা মনে হল। মনে হল, সেকালে রোমে কার্নিভালের সময় সকলে যেমন ছদ্মবেশ পরে বেরুত, এ বোধ হয় তেমনই একটা ঘটনা। শকুনির ওই জবড়জঙ্গ পোশাকের অন্তরালে হয়তো লুকিয়ে আছে কোনও রাজপুত্র বা রাজকন্যা। যে খঞ্জনটা এখনই দেখলেন, তার ওই চটুল চঞ্চল গতি, মিষ্টি মিহি সুর, ওই স্বর্ণাভ কান্তি—এ কি শুধু পাখির?

বৈজ্ঞানিকের একটা কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। গত বার শকুনির ডিম সংগ্রহ করতে পারেননি তিনি। এবার করতে হবে। শীতের গোড়ার দিকে অনেক সময় ডিম পাড়ে ওরা। হনহন করে এগিয়ে চললেন শিমুলগাছটার দিকে।

"ওদিকে কোথা চললেন আবার? বিলের রাস্তা তো এই দিকে—"

"শকুনির কোনও বাসা আছে কি না, দেখে আসি চলুন না। ওদের বাসা চিনতে দেরি হয় না। আর একটা মজা কি জানেন। ওরা অনেক সময় চার পাঁচটা বাসা করে, হয় একই গাছে কিংবা পাশাপাশি গাছে, কিন্তু ডিম পাড়ে মাত্র একটি। বাসা করেছে কি না দেখে আসি চলুন।"

কবির মনে হল, তড়বড়ে লোকটার পাল্লায় পড়ে প্রাণ যাবে দেখছি। নিজের চিন্তাধারা ছিন্ন হওয়াতে বিরক্তও হয়েছিলেন তিনি একটু!

"আপনি যান মশাই, আমি এইখানেই বসছি—"

বৈজ্ঞানিক চলে গেলেন। কবি একটা উঁচু ঢিপির উপর গিয়ে বসলেন। তিন-চারটে হলদে খঞ্জন উড়ে এসে বসল আবার একটু দূরে। কি অদ্ভুত সুন্দর পাখি। চঞ্চলা চপলা নৃত্যপরা অথচ পলাতকা। ওই মেয়েটির সঙ্গে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কাছাকাছি আছে অথচ কত দূরে, মনে হয়, নাগালের বাইরে। মনে হয়, বাইরে যা দেখা যাচ্ছে, ও তা নয়, ও যেন অন্য কিছু। সেই অন্য-কিছুর আভাস ধরা পড়েছে কবির মনে। মনের অবর্ণনীয় অনুভূতিটা ছন্দে গাঁথবার চেষ্টা করতে লাগলেন।—

ও খঞ্জন, ও খঞ্জন
কবির চোখে পড়ল ধরা
মূর্তি তোমার নিরঞ্জন।

অগ্নি-গিরির তপ্ত খবর
মিষ্টি সুরে আঁকছ যে
নীল্‌চে ধূসর ওড়না দিয়ে
হলদে শাড়ি ঢাকছে যে
নৃত্যপরা চলছ ছুটে
চলচ্ছবি উঠছে ফুটে
পুচ্ছ-দোলায় কোন্ সে গানের
তালটিকে ঠিক রাখছ যে,
ও খঞ্জন!

প্রিয়ার চোখে তোমার চলার
দোল দোলানো
হঠাৎ-পাওয়ার পুলক তুমি
মন-ভোলানো
নয়কো খাঁচায় নয়কো নীড়ে
মনের বীণার মধুর মীড়ে
লুকিয়ে বেড়াও দৃষ্টি এড়াও
কিন্তু আবার ডাকছ যে
ও খঞ্জন!

ঝরনাতলায় নদীর ধারে
তীর বনেতে
তোমার নাচের আসর জমে
নিরজনেতে
একটু সাড়া পেলেই পালাও

হাওয়ার বুকে ঢেউ তুলে দাও
কবির মনে কিন্তু তুমি
পালিয়ে গিয়েও থাকছ যে
ও খঞ্জন !

নিজের কবিতায় নিজেই তন্ময় হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে কে বলে উঠল, 'ক্যেউ'। চমকে উঠলেন কবি। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, কিছু দেখতে পেলেন না। অদ্ভুত মিষ্টি স্বর। মনে হল, মানুষের কণ্ঠে যেন কয়ে উঠল কেউ। তারপর হঠাৎ দেখতে পেলেন। সামনের আমগাছে বসে আছে হলদে পাখিটা। মাথাটি কালো, ডানার ধারে ধারে কালো, ঠোঁটটি লাল, বাকি সবটা হলদে। চমৎকার হলদে, স্বর্ণসন্নিভ। মনে পড়ল বৈজ্ঞানিক দেখিয়ে দিয়েছিলেন একদিন, ইংরেজী নাম Oriole, বাংলা নাম বেনেবউ। আর এক রকম আছে, তার মাথাটাও নাকি হলদে। বেনেবউ? নামটা অবশ্য খুবই লাগসই। ধনী বণিকগৃহিণীর সর্বাঙ্গ সোনায় মোড়া, কালো মুখটি ঢাকতে পারেননি কেবল সোনা দিয়ে, পান খেয়ে ঠোঁট দুটি হয়েছে টকটকে লাল। লাগসই হলেও নামটা বেশি বস্তুতান্ত্রিক। ওর মধ্যে পরস্ত্রীকাতরতারও ছোঁয়াচ রয়েছে যেন একটু, কবির মনে হল। তার চেয়ে সোজাসুজি 'হলদে পাখি' নামটা মন্দ নয়। কিন্তু অমন চমৎকার স্বর্ণকান্তির, অমন চঞ্চল সজীবতার কোনও মর্যাদাই ফুটছে না ও নামে। 'কনক সখি' নাম দিলে কেমন হয়? বেনেবউ উড়ে এসে বসল কাছের একটা ডালে। কবির মনে গুঞ্জন করে উঠল কবিতা।—

কনক সখি, কনক সখি,
সবাই তোমায় বলছে ও কি!
শালিক চড়াই কাক ছাতারে
সক্কলকে হকচকিয়ে
বণিক বধূ কেবল তুমি
গয়না বেড়াও চকমকিয়ে?

মিথ্যা কথা, তুমি কেবল
ভ্রমরকেশী কাজল-চোখী
সবুজ পাতায় লুকিয়ে বেড়াও
কনক সখি, কনক সখি।

কবি সামনের দিকে চেয়ে দেখলেন, খঞ্জনগুলো উড়ে গেছে। কনক সখিও উড়ে গেল। আর একজন এসে বসলেন সামনের সরু ডালটায়। বাদামী রঙের পাখি, ল্যাজের কাছটায় পিঠের দিকে যেন আগুনের ঝলক।

একটু উড়লেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেটা। গলার কাছে মাথার উপর কালো। রেডস্টার্ট একটা। থরথর করে ল্যাজটা কাঁপিয়ে হঠাৎ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে যেন অভিবাদন জানাল কবিকে। তারপর পিঠটা ফিরিয়ে বসল। ভাবটা যেন, আমাকেও ভাল করে দেখ, তোমার কনক সখির চেয়ে দেখতে নেহাৎ খারাপ নই আমিও। বৈজ্ঞানিক সেদিন বলেছিলেন, মনে পড়ল, এরা কাশ্মীর অঞ্চল থেকে শীতকালে এ দেশে আসে। কবির মনে আবার জাগল কবিতা—

যে দেশেই থাক নাকো তুমি মোর মিতা গো
অঙ্গকে ঢেকে রাখ বাদামী বা সবুজে
কাব্যলোকেতে তুমি চির-পরিচিতা গো
কবিকে ঠকাতে সখি পারবে না কভু যে।
কাশ্মীরী রাশিয়ান ইরানী বা তুরানী
পেশোয়াজ ওড়না বা অঞ্চল-ঘুরানী
ওগো মন-চুরানী
ওগো মঞ্জুরাণী,
যে বেশেই আস-নাকো চিনি তোরে তবু যে।

হঠাৎ বন বাদাড় ভেঙে হুড়মুড় করে বৈজ্ঞানিক এসে হাজির হলেন।

"শকুনির বাসা দেখেছি একটা। শকুনির সম্বন্ধে আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওদের বাচ্চাকে ওরা কেমন করে খাওয়ায় জানেন? ওরা নিজেরা যে মাংস খেয়ে আসে তাই উগরে দেয় বাচ্চার মুখে ছোট ছোট গুলির মতো আকারে। অদ্ভুত নয়?"

কবির কাব্যলোকে বজ্রপাত হল যেন।

"চলুন, ওঠা যাক।"

বিলের উদ্দেশ্যে আবার বেরুলেন দুজনে। দুজনে নীরবেই যাচ্ছিলেন। বৈজ্ঞানিক হঠাৎ বললেন, "পাখির বাসা আর তাদের সন্তান-পালন দুটো ব্যাপারই অদ্ভুত। পাখির বাসা অনেকেরই নজরে পড়ে সন্তান-পালনটা লক্ষ্য করে না অনেকে। বাবুই পাখির বাসা দেখেছেন নিশ্চয়, দর্জি পাখিদের বাসাও চমৎকার! সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে ধনেশ পাখির বাসা। গাছের গুঁড়ির গর্তে ওরা বাসা করে। সেই গর্তে স্ত্রী-ধনেশ ঢুকে নিজের মল ঠোঁটে করে নিয়ে গর্তের মুখটা বুজিয়ে ফেলে—"

"মল? তার মানে?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন কবি।

"জিনিসটা ঠিক কি বলা শক্ত। কেউ কেউ বলেন, নিজের droppings নিয়েই ওরা গর্তের মুখটা বোজায়, আবার কারও মতে সে সময় ওদের গা থেকে চটচটে একরকম রস বেরোয় আঠার মতো, তাই দিয়ে বন্ধ করে মুখটা। সে যাই হোক, স্ত্রী-ধনেশ গর্তের মুখটা বুঝিয়ে বন্দিনী করে ফেলে নিজেকে। নিজের মুখটা বার করবার মতো ছোট্ট একটু ফাঁক থাকে শুধু। যতদিন সে ডিমে তা দেয়, ততদিন বাসা ছেড়ে বেরোয় না। পুরুষ-ধনেশ তখন সেই ছোট্ট ফাঁক দিয়ে স্ত্রীকে খাইয়ে যায়। তারপর ডিম ফুটে বাচ্চা হলে স্ত্রী-ধনেশ দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে। ভাঙা দেওয়াল আবার জুড়ে দেয়। যতদিন না বাচ্চারা বড় হয়, ততদিন তারা বন্দী অবস্থায় থাকে। স্ত্রী পুরুষ দুজনে মিলে তখন খাওয়ায় তাদের সেই ছোট ফাঁক দিয়ে। অনেকটা আমাদের আঁতুর-ঘরের মতো, নয়? ফটিক জল, বেনেবউ এদের বাসাও চমৎকার—"

কবির কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। অন্যমনস্ক কবি ঘাড় হেঁট করে চলেছেন। বৈজ্ঞানিক আড়চোখে কবির মুখের দিকে আর একবার চেয়ে চুপ করে গেলেন। কবিকে মনে মনে একটু ভয় করেন তিনি। অদ্ভুত লোক! তুচ্ছ একটা জিনিস নিয়ে বিরাট একটা কিছু গড়ছেন হয়তো। এই ধরনের লোককে বোঝা শক্ত। প্রকৃতির

সম্বন্ধে এঁদের কৌতূহল খুব, কিন্তু যা দেখবেন তা মানবেন না, তাকে ঘিরে কিম্ভূত-কিমাকার একটা কিছু করা চাই। না করতে পারলে তৃপ্তি হয় না কিছুতে। পাখিকে পরী করবার জন্যে ব্যস্ত। স্ত্রী-ধনেশকে বন্দিনী রাজকন্যা-টন্যা ভাবছেন হয়তো, কে জানে! আড়চোখে আর একবার চাইলেন তিনি কবির দিকে। কবি ঘাড় হেঁট করে চলেছিলেন আপন মনে। আবার একটা রেডস্টার্ট এসে বসল সামনের গাছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "একটা রেডস্টার্ট এসেছে, দেখুন।"

কবি বললেন, "ওর একটা বাংলা নাম দিন।"

"কবিতায় ঢোকাতে পারছেন না বুঝি? কবিতা লিখেছেন ওকে নিয়ে?"

"লিখিনি, তবে—ওই পালাল! কবিতা চাই নাকি?"

মুখে মুখেই একটা ছড়া বানিয়ে ফেললেন তৎক্ষণাৎ—

তড়িৎসম ত্বরিত গতি
নয়কো তবু তুরঙ্গিনী
ভঙ্গীভরে পালায় ছুটে
পক্ষী না এ কুরঙ্গিনী?
ছন্দভরে অঙ্গ দোলায়
এক নিমেষে মনকে ভোলায়
আগুন জ্বলে ডানার তলে
উড়ন্তিকা সুরঙ্গিনী।

বৈজ্ঞানিক বলে উঠলেন, "বাঃ, চমৎকার! অদ্ভুত শক্তি আপনার!"

কবি বললেন, "আপনার প্রশংসা করবার শক্তিও তো কম নয় দেখছি। পাখিটার নাম ফুলকি রাখলে কেমন হয়?"

"বেশ তো।"

"ছোট পাখি বড় নাম মানাবে না। আগুনের আভাও আছে—গায়ে। ওড়া মাত্রই ল্যাজের কাছটায় আগুন জ্বলে উঠল যেন। কি চমৎকার!"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ইংরেজীতে ওর আর একটা নাম আছে—ফায়ার টেল। রেডস্টার্ট কথাটার মানেও তাই।"

বৈজ্ঞানিকের কেবলই চেষ্টা কবির মনকে কি করে বিজ্ঞান-মুখী করা যায়। করতে পারলে—তাঁর বিশ্বাস—বিস্ময়কর একটা কিছু করে ফেলতে পারে লোকটা। তাঁর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে বললেন, "এইটুকু ছোট পাখি কতদুর থেকে এসেছে! আশ্চর্য নয়? মাইগ্রেশন ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। ভারি রহস্যময়। যে কাদাখোঁচাদের আমরা দেখতে যাচ্ছি, সেগুলো সবই প্রায় শীতের অতিথি, এ দেশে থাকে না। অথচ কেন আসে বোঝা যায় না ঠিক। অনেকে বলেন, শীতকালে ওদের বাসভূমিতে খাবার পাওয়া যায় না, রোদ থাকে না, তাই ওরা চলে আসে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঠিক একই জাতের পাখি ওদেশে আবার থেকেও যায় কতকগুলো, তাই—"

কবি হেসে বললেন, "বললাম তো সেদিন, ওরা প্রাণের টানে আসে।"

"প্রাণের টানটাই বা কেন হয়?—বিজ্ঞানের তাই প্রশ্ন। বিজ্ঞান মনে করে, নিশ্চয়ই কোনো

অবস্থা-বিপর্যয়ের জন্যে একদল পাখি তাদের আবাসভূমি থেকে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এই যে যেমন ধরুন না, ওই ভদ্রমহিলা যেমন বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছেন। ওটাকে আপনি যদি টান বলেন, তা হলে কি ঠিক হবে? জাপানী বোমা না পড়লে কি উনি আসতেন? পাখিদের সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকেরা তেমনই মনে করেন যে, ওদের চলে আসবারও নিশ্চয় কোনো কারণ আছে—কোনও অদৃশ্য বোমা আছে—সেইটে আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানের কাজ।"

বৈজ্ঞানিক উৎফুল্ল দৃষ্টিতে চাইলেন কবির দিকে। তাঁর মনে হল, ওই মেয়েটির উপমা দিয়ে ব্যাপারটা বোধ হয় স্পষ্ট করতে পেরেছেন তিনি কবির কাছে। কবির মনে কিন্তু যা ঘটল, তা একটু অন্যরকম। মেয়েটির কথা উত্থাপিত হওয়াতে কবির কল্পনা-কাননে একটা নতুন ফুল ফুটে উঠল যেন।

তিনি বললেন, 'টানটা কি সব সময়ে প্রত্যক্ষ দেখা যায়? মেয়েটি বিশেষ করে এই অঞ্চলেই এল কেন, এর কারণ ও নিজেও হয়তো জানে না ভাল করে। আপনি বলেছেন, জাপানী বোমার ভয়ে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু অন্য জায়গাতেও যেতে পারত। এখানে আসবার মানে কি?"

বৈজ্ঞানিকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "আমি যদি বলি অ্যাক্সিডেন্ট?"

কবি ফিরে চাইলেন বৈজ্ঞানিকের দিকে। হাসি উপচে পড়তে লাগল তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে।

"এইটেই প্রত্যাশা করেছিলাম। এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট আবির্ভাবটাই তো আপনারা অ্যাক্সিডেন্টের কোঠায় ফেলে দিয়েছেন।"

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা এখন বাদ দিন, আপনার মতে তা হলে ও মেয়েটির এখানে আসার কারণ কি?"

"প্রারব্ধ। তার মানেই অদৃশ্য টান।"

বৈজ্ঞানিক হেসে ফেললেন এবার।

"ওটা কি একটা যুক্তি হল, আপনিই বলুন।"

যুক্তির তো প্রয়োজন নেই আমার। নিজের অহঙ্কারকে তৃপ্ত করবার জন্যেই যুক্তির দরকার। আমি মেনে নিতে চাই, ওতেই আমার তৃপ্তি। একটা অদৃশ্য টানে মেয়েটি এখানে এসেছে—এইটে ভেবেই আমার সুখ। বাজে যুক্তির কচকচিতে দরকার কি আমার?"

বৈজ্ঞানিকের ঈষৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

"আপনার দরকার না থাকতে পারে, বিজ্ঞানের দরকার আছে।"

"কবি আর একটু হেসে বললেন, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক কে জানেন?"

"আপনিই বলুন কে।"

"কবি। যে কবি বলতে পারে—

> ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
> ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্
> ভবতু ভবতীহময়ি সততমনুরোধিনী
> তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্।

অনবদ্য সৌন্দর্যের পায়ে লীলাময়ী প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে কৃতার্থ হয় যে, সে-ই কবি, সে-ই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, সৃষ্টিরহস্যের সারমর্ম সে-ই বুঝেছে।"

তর্কটা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হত কিন্তু তারা বিলের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন—রূপচাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আচ্ছা লোক তো তোমরা হে, নৌকো নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি কখন থেকে, তোমাদের পাত্তাই নেই! আশ্চর্য কাণ্ড!"

কবি বললেন, "দেরি অমরবাবুর জন্যে। উনি খানিকক্ষণ দোয়েলের পিছু পিছু ঘুরলেন, তারপর শকুনির বাসা খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।"

"চি-হুইট্ চি-হুউট্ চিহ্ চিহ্ চিহ্—"

একটি পাখি ডেকে উঠল।

"কি বলুন তো?"

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চাইলেন। মিনিট খানেক আগে তর্ক করে মনে যে তিক্ততা এসেছিল, সেটা মধুর হয়ে উঠল পাখির ডাকে।

কবির উত্তর দেওয়ার আগেই বৈজ্ঞানিক বলে উঠলেন "দুর্গা টুনটুনি। পুরুষটা ডাকছে। ব্রিডিং প্লুমেজ (Breeding Plumage) দেখুন কেমন সুন্দর। ব্রিডিং সিজ্‌নে ওদের এই রকম রঙ হয় গায়ে, অন্য সময়ে থাকে না। দেখুন, ওই যে—"

কবি চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন, কুচকুচে কালো ছোট একটি পাখি আকাশের দিকে মুখ তুলে ডেকে চলেছে চি-হুইট্ চি-হুইট্ চিহ্-চিহ্। আগাগোড়া সব কালোও নয়। ডানা দুটো কালো, ঘন-নীলও আছে খানিকটা, টকটকে লালও আছে গলার পাশে। মুগ্ধ হয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলে উঠলেন, "মধু খেয়ে থাকে ওরা। তাই ওদের মৌ-চোষাও বলে কেউ কেউ। এ দেশে তিন রকম দেখা যায়—নর্থওয়েস্টার্ন-ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ান-সিলোনিজ আর আসাম-বার্মা রেস। আমার বিশ্বাস, আরও আছে দু-এক রকম। রঙের ঈষৎ তারতম্য শুধু। ওদের ওয়ার্বলার (Warbler) বলে ভুল করবেন না যেন। ঠোঁটটা লক্ষ্য করুন, একটু বাঁকা, মধু খায় কিনা।"

রূপচাঁদ বললেন, "বক্তৃতাটা নৌকোয় যেতে যেতে করলে কেমন হয়?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।"

নৌকায় আরোহণ করলেন তিনজন। নৌকা ছেড়ে দিল। রূপচাঁদ বললেন, "ফ্লাস্কে করে চা এনেছিলাম, ঠাণ্ডা হয়ে গেল বোধ হয়। ওরে বান্ছা ঢাল কাপে কাপে।" বালক-ভৃত্যটি কাপে কাপে চা ঢালতে লাগল। রূপচাঁদ একটি টিফিন-কেরিয়ার থেকে টোস্ট, ওম্‌লেট আর কেক বার করলেন।

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন, "এত কাণ্ড করেছেন আপনি!"

কবি বললেন, "রূপচাঁদের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা রকম।"

রূপচাঁদ একবার বৈজ্ঞানিকের এবং একবার কবির মুখের দিকে চাইলেন শুধু। চোখের পাতাগুলো মিটমিট করল দু-চার বার। কোনও কথা বললেন না।

টোস্টে কামড় দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন কবি—"বাঃ, চমৎকার রুটি তো! নলিনী এ রকম রুটি করছে নাকি আজকাল? আমাদের যা দিচ্ছে, তা—"

রূপচাঁদ বললেন, "নলিনী নয়, ফিরপো।"

"ফির্‌পো? ফির্‌পোর রুটি পেলে কোথা?"

"পুলিশ সাহেবের জন্য আসে। আমি একখানা করে নিই।"

"আমরা পাই না?"

কবি বললেন বটে, কিন্তু তিনি এ কথা ভাল করেই জানেন যে এই মফস্বলে রোজ ফির্‌পোর রুটি খাওয়ার মতো অবস্থা তাঁর নয়। রূপচাঁদেরও সে কথা অবিদিত নেই। তবু তিনি বললেন, "বেশ চাও তো পাবে।"

বৈজ্ঞানিক দু-টুকরো টোস্টের মাঝখানে খানিকটা ওম্‌লেট পুরে বাঁ হাতে ধরে সেটা কামড়াচ্ছিলেন আর বিলটার চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। তাঁর কোটের উপর পাঁউরুটির গুঁড়ো পড়েছিল, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না।

রূপচাঁদ তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনারও চাই না কি?"

"কি?"

"ফির্‌পোর রুটি!"

"রুটি? ও, আচ্ছা জিজ্ঞেস করব রত্নাকে।"

সমস্ত পাঁউরুটিটা মুখে পুরে দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলেন চারদিকে।

কবি প্রশ্ন করলেন রূপচাঁদকে, "বার্মা-রেফিউজি সেই ভদ্রমহিলাটির খবর কি?"

"কার? ডানার? খবর ভালই। তুমি একটা চাকর যোগাড় করে দিয়েছ শুনলাম।"

"হ্যা। ওর নাম ডানা নাকি?"

"তাই তো শুনেছি। ছেলেবেলায় এক মেম নার্স ওর নাকি নামকরণ করেছিলেন Diana। বাংলায় সেটা ক্রমশ ডানা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

চমৎকার নাম তো! ডায়না ডানা—দুটোই চমৎকার।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি। তাঁর মনশ্চক্ষে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল গ্রীক দেবী ডায়েনার শবরী-রূপ। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চঞ্চলা ডায়েনা ধনুর্বাণ হস্তে শিকারের পিছু পিছু ছুটে বেড়াত বনে বনে, যার কঠিন হৃদয় বিগলিত হয়েছিল এন্ডিমিয়নের প্রেমে, কবিকল্পনায় যার রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল নিত্য নবীন বনশ্রীতে, উন্মুখ মাতৃত্বের জগদ্ধাত্রীরূপে, সৃষ্টির আবেগ-মহিমায়, জীবনের দুর্জয় প্রকাশে, চরাচরব্যাপী বিকশিত প্রাণ-সম্পদে...মনে হল, এই ডায়েনাই বোধ হয় আমাদের দেশের অনন্তযৌবনা উর্বশী, মৃত্যুর সমুদ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে বারবার প্রাণ-লক্ষ্মীর মূর্ত প্রতীক রূপে; এই ডায়েনাই বোধ হয় ডানা মেলে উড়ে আসছে অনন্ত কাল ধরে মৃত্যু-পরিকীর্ণ পৃথিবীর দিকে, সঞ্জীবিত করছে তাকে নবীন প্রাণধারায়, উজ্জীবিত করছে নব নব প্রেরণায়....

"বাঃ, চমৎকার! আশাই করিনি এটা।"

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

"অস্‌প্রে (Osprey) একটা। দেখুন, দেখুন কত বড় মাছ ধরেছে দেখুন।"

কবি দেখলেন, চিলের মতো প্রকাণ্ড একটি পাখি আকাশে উড়ছে। দু'পায়ে করে একটা মাছ ধরে আছে। সূর্যের আলো লেগে মাছটার গা থেকে ঠিকরে পড়ছে রৌপ্যদ্যুতি, ফুলঝুড়ি-উৎসব হচ্ছে যেন শূন্যে। পাখির বুকটা সাদা, তার উপর একটা কালো দাগ।

বৈজ্ঞানিক আবার বললেন, "এর সংস্কৃত নাম উৎক্রোশ। ডাক্তার সত্যচরণ লাহা কুররীও বলেছেন, কালিদাসে এর উল্লেখ আছে নাকি।"

একটা করুণ আর্তস্বর ফুটে উঠল আকাশে। সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে পড়ে গেল, কালিদাসের সেই শ্লোকটা।

তথেতি তস্যা প্রতিগৃহ্যবাচং রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাৎ চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ।

সীতাকে নির্বাসন দিতে যাচ্ছিলেন যখন লক্ষ্মণ, তখন কুররীর মতো করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করেছিলেন সীতা। কবি সবিস্ময়ে শুনছিলেন। সত্যিই বড় করুণ ডাক। অমন বিশাল বলিষ্ঠ পাখি, আকাশে ডানা মেলে উড়ছে, তার অমন করুণসুরে ডাকবার কারণ কি?। কবির মনে হল, ওই আকাশচারী বিহঙ্গকে নিতান্ত আধিভৌতিক প্রয়োজনে বার বার মাটিতে নেমে আসতে হচ্ছে বলেই সম্ভবত, ওর কণ্ঠ থেকে বিলাপধ্বনি নির্গত হচ্ছে।

রূপচাঁদও দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "প্রচুর হাঁস এসেছে দেখছি। একদিন ডাক্‌-রোস্টের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না।"

বৈজ্ঞানিক হাসলেন একটু। বললেন, "আমারও এবার ইচ্ছে আছে কতকগুলো হাঁসকে stuff করানো। ট্যাক্সিডার্‌মিস্টের কাছে পাঠাতে হবে।"

হঠাৎ কয়েকটা কয়েকটা পাখি অপ্রত্যাশিতভাবে উড়ল এক জায়গা থেকে। গতিটা সরল রেখায় নয়, এঁকেবেঁকে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "স্নাইপ। হিন্দিতে চাহা বলে। এরা শীতকালে আসে। এরা থাকে ইউরোপে আফ্রিকায় কাশ্মীরে। সাইবিরিয়াতেও।" তারপর তিনি বক্তৃতা করতে লাগলেন স্নাইপ কত রকমের আছে।

"সত্যিকার স্নাইপ অনেকে চেনে না, বুঝলেন। Sandpiper বা Snippetগুলোকে স্নাইপ বলে মনে করে অনেকে, এরাই প্রচুর ঘুরে বেড়ায় কি না, এ দেশের নদীর ধারে, বিলে, ঝিলে। প্রত্যেকেই ল্যাজ দোলায়। আসল স্নাইপের গায়ের রঙ অদ্ভুত সুন্দর। পাণ্ডুর পিঙ্গল মেটে সাদা বাদামীর অদ্ভুত সমন্বয়। মনে হয়, চমৎকার ছিটের পট্টির কোট গায়ে দিয়ে আছে যেন। ল্যাজের দিকে পাণ্ডুরের সঙ্গে কমলা রঙের আভাস বিশেষ লক্ষণীয়। ঠোঁটটা বেশ লম্বা। কাদা খোঁচাতে হয় কিনা। যে সব পাখিদের খুঁচিয়ে খাবার সংগ্রহ করতে হয়, তাদের ঠোঁট লম্বা। হুপো দেখেছেন? হুপোর মুখটা যেন একটা গাঁইতি। Sandpiper-দের পায়ের পাতা ঈষৎ জোড়া, এদের তা নয়, বুঝলেন, শুনছেন?"

বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "কাদাখোঁচা নামটা শুনে দমে গেলেন বুঝি? কবিতা লেখা যাবে না বোধ হয় এদের নিয়ে।"

"তা যাবে না কেন? রূপচাঁদ, তোমার পকেটে কাগজ পেনসিল আছে কি?"

"পকেট-বুক আছে, তাতে পেনসিলও আছে একটা।"

"দাও তো!"

"ওতে কবিতা লিখবে?"

"ক্ষতি কি।"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ কবির দিকে। তারপর পকেট-বুকটা বার করে দিলেন। কবি সঙ্গে সঙ্গে কবিতা শুরু করে দিলেন দেখে বৈজ্ঞানিক রূপচাঁদের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

"বুঝলেন রূপচাঁদবাবু, স্নাইপদের ল্যাজের আকৃতি অনুসারে এদের আবার ফ্যান-টেল, পিন-টেল এই দু-রকম শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে—"

রূপচাঁদ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, "রোস্ট করলে কি স্বাদের কোনও তফাত হয়?"

বৈজ্ঞানিক হেসে ফেললেন, "না, তা হয় না—"

"তবে শ্রেণীবিভাগ জেনে আর লাভ কি বলুন! আচ্ছা, ওই দূরে ওগুলো কি বলুন তো?"

"বক। বকও তিন রকম দেখা যায়, সাধারণত এ অঞ্চলে ইগরেট—"

"ওগুলো চখা বোধ হয়, দেখুন তো।"

রূপচাঁদ বিলের অন্য আর একটা দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখালেন।

"হ্যাঁ, ওগুলো চখা। ব্রাহ্মিনি ডাক্‌স্।"

"একদিন আসতে হবে বুঝলেন।"

"বেশ তো, ব্যবস্থা করুন না একদিন।"

রূপচাঁদ ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, নৌকা বাঁধবার মতো সুবিধাজনক কোনও স্থান আছে কি না। বৈজ্ঞানিকও ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন যে, জলচর পাখিদের নিজের চোখে যদি পর্যবেক্ষণ করতে হয় তা হলে এখানে একটা মাচা বাঁধা দরকার হবে জলের উপর, মাছ ধরবার জন্যে অনেকে যেমন করে। ছোট ডিঙিও রাখতে হবে একটা। দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলেন আবার। মনে হল, টিলও (Teal) আছে—ছোট বড় দু-রকমেই আছে কি? রত্নার সঙ্গে আজ গিয়েই পরামর্শ করতে হবে—এখানে কাছাকাছি একটা ছোট ঘর বেঁধে দুজনেই থাকি যদি—

কবি বলে উঠলেন, "হয়েছে, শুনুন—

কাদাখোঁচা কাদাখোঁচা
কিসে তুমি কম বা
অঙ্গে আছে তো রঙ
পুচ্ছেতে আছে ঢঙ
নও মোটে খাঁদা বোঁচা
ঠোঁটটি তো লম্বা।
বাইরেতে ধোয়া-মোছা
মেনকা ও রম্ভা
কাদা ঘাঁটে চুপি চুপি
বহু সতী বহু-রূপী;
—কুন্তী ও অম্বা
না হয় যদি বা ওঁচা
তবে তোর কাদাখোঁচা
কিসের শরম বা!"

বৈজ্ঞানিক বলে উঠলেন, "বাঃ! বেশ হয়েছে।"

কবি বললেন, "কবিতা লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হচ্ছিল। উইন্টার ভিজিটার যে কটি দেখলাম—ফুলকি, খঞ্জন, কাদাখোঁচা প্রত্যেকেই ল্যাজ দোলায়—কেন বলুন তো?

আমাদের ছোকরা বাবুরা যেমন বেড়াতে গিয়ে কোঁচা দুলিয়ে বা ছড়ি দুলিয়ে বেড়ায়, এরাও তেমনি বিদেশে বেড়াতে এসেছে কিনা, তাই বোধ হয় ল্যাজ দোলাচ্ছে—"

"না, ঠিক তা নয়।"

ঈষৎ হেসে বৈজ্ঞানিক ভাবতে লাগলেন, এর কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি না।

দূরবীনে নিবদ্ধদৃষ্টি রূপচাঁদ চুপ করে বসে ছিলেন। কবিও চুপ করে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। শীতের সোনালী রোদ বিলের কালো জলে লুটিয়ে পড়েছে যেন, আত্মহারা হয়ে উজাড় করে দিচ্ছে যেন নিজের সমস্ত সৌন্দর্য। এক ঝাঁক পাখি—চার পাঁচটা—জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ওগুলো Tern' বাংলায় গাংচিল বলে। আর ওই যে ওপরে শূন্যে পাখা দুটো বিস্তার করে জলের দিকে মাথা নিচু করে আছে ওটা হল মাছরাঙা—Pied King Fisher, White-breasted King Fisherও দেখতে পাবেন এখনই, চমৎকার নীল—বুকে চকোলেটের মাঝখানে সাদা—"

কবি কোনও উত্তর দিলেন না দেখে বৈজ্ঞানিকও চুপ করে গেলেন। একটা নিবিড় নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল সহসা। দাঁড়ের ছপছপ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

সহসা উৎক্রোশের আক্ষেপধ্বনিটা ভেসে এল আবার। কবি চোখ তুলে দেখলেন, পক্ষ বিস্তার করে উড়ে চলেছে বিরাট পাখিটা। কবির মনে হল, ও যেন বলছে—

শুনেছি তাহার স্বর
    চিত্ত মোর হয়েছে উধাও
পাখায় করেছি ভর
    ছেড়ে দাও মোরে ছেড়ে দাও—

।। পাঁচ ।।

রূপচাঁদ মৌলিক সেদিন স্ত্রীকে একটি রঙিন শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন, আবার এক জোড়া দুল নিয়ে এলেন। আপিস থেকে ফিরে পাকানো চাদরটি গলা থেকে নামিয়ে আলনায় রাখতে রাখতে খুব রহস্যময় দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাইলেন একবার। তারপর আপন মনে হাসলেন, আর একবার রহস্যময় দৃষ্টিতে চাইলেন স্ত্রীর দিকে, তারপর বললেন, "ভারি দাঁওয়ে একটা জিনিস পেয়ে গেছি আজ—"

স্ত্রী বকুলবালা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন, "কি?"

"তোমার পছন্দ হবে কি, দেখ তো।"

দুল জোড়া বার করলেন। পছন্দ যে হবেই, তাতে রূপচাঁদ মৌলিকের সন্দেহ ছিল না। স্ত্রীকে চিনতেন তিনি। বকুলবালার দৃষ্টিতে একটা বিস্মিত আনন্দ ফুটে উঠলেও অনুযোগ-মিশ্রিত ভর্ৎসনার সুরে তিনি বললেন, "আমার দুলের অভাব কি, সেদিনই তো কানপাশা কিনে দিলে এক জোড়া, আবার দুল কিনতে যাওয়া কেন? তোমার যত সব--"

বকুলবালা ঈষৎ নাচের ভঙ্গীতে আয়নার দিকে ফিরে পুনরায় বেণী-রচনায় মন দিলেন। প্রতিবারই এই ধরনের মেকি ভর্ৎসনা করে থাকেন বকুলবালা। রূপচাঁদ ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হাসিটা গোপন করে কণ্ঠস্বরে প্রায়-অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর ফুটিয়ে বললেন, "ওসব বাজে কথা রাখ দিকি, তোমার পছন্দ হয়েছে কি না, তাই বল।"

"পছন্দ না হবার কি আছে। কিন্তু কি দরকার ছিল এখন ওসব বাজে খরচ করবার? সেদিন অত দাম দিয়ে শাড়ি কেনারই বা কি দরকার ছিল?"

"আমার খুশি আমি বাজে খরচ করব। আমার বাজে খরচ করতে ভাল লাগে।"

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, "তোমাকে কিনে দেব না তো কাকে কিনে দেব বল তো?"

ছোট খুকীর মতো আবদার-তরল কণ্ঠে বকুলবালা বললেন, "আমার চকোলেট এনেছ?"

"নিশ্চয়। মর্টনের লজেন্‌জও এনেছি এক শিশি।"

"কই দাও—"

রূপচাঁদ কোটের পকেট থেকে লজেন্‌জ এবং চকোলেটের শিশি বার করে দিলেন। পঁয়ত্রিশ-বর্ষ বয়স্কা স্থূলাঙ্গিনী বকুলবালা লজেন্‌জ এবং চকোলেট মুখে পুরে ছোট খুকীর মতো বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে বেণী দুলিয়ে।

রূপচাঁদ আর একটু হেসে কোটের বোতামগুলি খুলতে লাগলেন নীরবে। এই খুকী-প্রকৃতির স্ত্রীটিকে রূপচাঁদ মৌলিক বুদ্ধিবলে প্রায় খাঁচার মধ্যে বন্দিনী করে রেখেছেন বললেই হয়। খাঁচা অবশ্য দেখতে সাধারণ খাঁচার মতো নয়। কিন্তু শাড়ি, গহনা, লজেন্‌জ, চকোলেট, মিছে কথা, রাগ-অনুরাগের অভিনয় প্রভৃতি দিয়ে যে পরিবেশ তৈরী করেছেন তিনি, তা বকুলবালার পক্ষে দুরতিক্রম্য। এই পরিবেশের ওপরে কি আছে তা জানবার পর্যন্ত কৌতূহল নেই তাঁর। মাঝে মাঝে সিনেমা দেখবার ইচ্ছে হয়, এবং সে ইচ্ছে প্রকাশ করবামাত্র রূপচাঁদ মৌলিক নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশে বসিয়ে তাঁকে সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে আসেন। শহরের এমন জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন, যেখানে আশেপাশে বাঙালী প্রতিবেশী কেউ নেই। বাঙালী প্রতিবেশীদের, বিশেষ করে প্রতিবেশিনীদের, বড় ভয় করেন রূপচাঁদ। তাঁর ধারণা, হিতৈষীর ছদ্মবেশে এঁরা বাড়ির ভেতর ঢুকে হাঁড়ির খবর নেন, তারপর কথায়-বার্তায় ঠারে-ঠোরে আচারে-ব্যবহারে এমন একটা জটিল কুৎসিত ব্যাপার করে তোলেন যে, পারিবারিক শান্তিটুকু নষ্ট হয়ে যায়। নিজের স্ত্রীকে তিনি কখনও কারও বাড়ি যেতে দেন না, কারও স্ত্রী তাঁর বাড়িতে আসে এ-ও তিনি পছন্দ করেন না। বকুলবালাও করেন না, স্বামীর মতে সায় দিতেই তিনি ভালবাসেন। এইটে রূপচাঁদ মৌলিকের একটা অসাধারণ কৃতিত্ব। বিবাহিত স্ত্রীকে এমনভাবে মুঠোর মধ্যে আনা সহজ কাজ নয়। এই দুঃসাধ্য কাজ তিনি করতে পেরেছেন দুটো কারণে। প্রথম কারণ, বকুলবালার সঙ্গে বাইরের জগতের কোনো যোগ নেই, তিন কুলে কেউ নেই তাঁর, ছেলেপিলে হয়নি, হবার সম্ভাবনাও নেই। বিয়ের বছর তিনেক পরে একবার তিনি সন্তান-সম্ভবা হয়েছিলেন, কিন্তু সন্তানটির স্বাভাবিক পরিণতিতে ব্যাঘাত ঘটল। জরায়ুতে না এসে ভ্রূণটি থেকে গেল টিউবে। নিপুণ অস্ত্রোপচারের ফলে প্রাণে বেঁচে গেলেন বকুলবালা কোনোক্রমে। কিন্তু তাঁর জরায়ু এবং টিউব কেটে ফেলতে হল। ভবিষ্যতে সন্তান হবার কোনও সম্ভাবনাও রইল না আর। দ্বিতীয় কারণ, বকুলবালা লেখাপড়া জানেন না। সুতরাং রূপচাঁদকে

সত্যিসত্যিই বকুলবালার জীবন-সর্বস্ব হয়ে পড়তে হল। বকুলবালার জীবনে রূপচাঁদই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় পুরুষ। আর একটি পুরুষ এ বাড়িতে আসে অবশ্য মাঝে মাঝে। রূপচাঁদের সহকারী উমেশবাবুর ছেলে চন্ডি। স্কুলে পড়ে ছেলেটি। বকুলবালার পাখি দেখতে সে আসে। তারও পাখি পোষার খুব শখ। পাখি দেখবার জন্যে স্কুল থেকেও পালিয়ে আসে সে মাঝে মাঝে। রূপচাঁদ যদিও ব্যাপারটা খুব পছন্দ করেন না, কিন্তু আপত্তিও করেন না তেমন।

রূপচাঁপ কৃতবিদ্য মার্জিতরুচি ভদ্রলোক। পাঞ্জাবি-রুমাল-সর্বস্ব ভদ্রলোক নন, শক্ত সমর্থ পুরুষমানুষ তিনি। নিজের মতে নিজের পথে চলতে পেলে তিনি জীবনে ঠিক কি যে হতেন, তা আন্দাজ করে লাভ নেই। উপস্থিত তিনি হয়েছেন বকুলবালার স্বামী এবং পুলিশ সাহেবের আপিসের বড়বাবু। এবং এই উভয়বিধ প্যাঁচোয়া 'পরিস্থিতি'র মধ্যেও স্বকীয় বুদ্ধিবলে নিজের পৌরুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। গৃহে স্ত্রী এবং আপিসে সাহেব দুই-ই তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। জীবনের এই দুটি অনিবার্য বাধাকে নিজের আয়ত্তাধীন করে রূপচাঁদ গোপন পথে নিজের পছন্দ অনুযায়ী জীবনযাপন করে থাকেন—এইটেই বর্তমানে তার বিশেষত্ব।

স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে রূপচাঁদ মৌলিকের ধারণাটা কি ধরনের, তা তিনি একবার বহুদিন আগে তাঁর বন্ধু আনন্দমোহনকে লিখেছিলেন। কলেজ-জীবন থেকেই আনন্দমোহনের সঙ্গে রূপচাঁদের বন্ধুত্ব। মাঝে অনেকদিন দেখাশোনা হয়নি। জীবনের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে ঘুরতে আবার দুজনের দেখা হয়েছে এখানে অনেক দিন পরে। চিঠিপত্র অবশ্য চলত মাঝে মাঝে। একটি চিঠিতে স্ত্রীলোকপ্রসঙ্গে একবার তিনি লিখেছিলেন, দেখ ভাই আনন্দমোহন, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তোমার মনোভাবটা কেমন কুয়াশাচ্ছন্ন বলে মনে হল। আমার মতবাদ (দর্শনও বলতে পার) ও বিষয়ে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ। চুনি, পান্না, হীরা, মুক্তা প্রভৃতি মণিমাণিক্যের সঙ্গে নারীর নামও করা উচিত। রমণী সত্যিই রত্ন-বিশেষ, রত্ন-শ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাকে নিয়ে নানারকম কবিতা লিখতে পার, আপত্তি করব না; কিন্তু একটি কথা ভুলো না যে, রত্নের মতোই তাকে আহরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। এই আহরণের এবং রক্ষণাবেক্ষণের নানা পদ্ধতি মানুষ যুগে যুগে আবিষ্কার করেছে। কখনও তাকে প্রহার করেছে, কখনও হারামে পুরেছে, কখনও দাসী বানিয়েছে, কখনও দেবী বলেছে, কখনও তার স্বাধীন সত্তার গুণগান করে স্বাধীনতা দেওয়ার নামে শত সহস্র বন্ধনে বেঁধেছে, কখনও ছিনিয়ে এনেছে, কখনও বিবাহ করেছে, কখনও কবিতা লিখেছে—কত রকম করেছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যটি হচ্ছে—আহরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ। প্রেমের কবিতার জন্মও হয়েছিল বোধহয় ওই একই কারণে। ভারি মনোরম ফাঁদ ওটি, সকলে যদিও ফাঁদ পাততে জানে না। তোমার ও কৌশলটা জানা আছে, কিন্তু ওটি ফাঁদ মাত্র—এই কথাটি মনে রেখো। ওটা নিয়েই দিশাহারা হয়ে পড়ো না, কারণ ওটা মীনস্ (means), এন্ড (end) নয়। যখন তখন আত্মহারা হয়ে তুমি বেসামাল হয়ে পড়, তাই তোমার বন্ধুভাবে কথাটা বললাম। যদি অবধান কর, অনেক বাজে বখেড়ার হাত থেকে রেহাই পাবে।

বলা বাহুল্য, আনন্দমোহন অবধান করেননি, কারণ তিনি ভিন্ন জাতের লোক।

প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে স্ত্রী-রত্নবিষয়ক এবম্বিধ জহুরীর কোষাগারে বকুলবালারূপে অমূল্য রত্ন এসে যখন কায়েমী আসন গেড়েছিল, তখন রূপচাঁদ প্রথমটা একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলেন বটে; কিন্তু একটানা ঘাবড়ে থাকবার লোক তিনি নন। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্যকরূপে খাপ খাইয়ে

নিজের তরী নানা ঘাটে ভিড়িয়ে এসেছেন তিনি এতকাল অসামান্য দক্ষতাসহকারে। বকুলবালা একা যে তাঁর পারুষ্যের ক্ষুধা মেটাতে অক্ষম, এই সত্যটি বকুলবালার কাছ থেকে গোপন করতে না পারলে তাঁর ক্ষুধা যে অতৃপ্তই থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত—এ কথা বিবাহের কিছুদিন পরেই বুঝেছিলেন তিনি। বিবাহিত স্ত্রীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও শক্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এমনই নিখুঁত ছিল যে, বিদ্রোহ করার কল্পনাও তিনি করেননি। বরং ঠিক উলটো পথ ধরেছিলেন। বকুলবালা এবং নিজের ক্ষুধার মাঝখানে যে গোপনতার জাল তিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার প্রায় পনেরো আনাই বকুলবালা-আরতি। বকুলবলার অজস্র প্রশংসা করে, তাঁকে অযাচিত উপহার কিনে দিয়ে রূপচাঁদ তাঁর সচেতন মানসের চতুর্দিকে যে রঙিন কুয়াশা সৃজন করেছিলেন, তা ভেদ করে সত্যের সন্ধান করবার মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি বকুলবালার ছিল না। বকুলবালার নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, স্বামী তাঁর এবং একান্তই তাঁর। এত সাবধানতা সত্ত্বেও বায়ুবাহিত বীজের মতো দু-একটা উড়ো খবর কুয়াশাজাল ছিন্ন করে মাঝে মাঝে বকুলবালার কর্ণকুহরে যে না ঢুকত তা নয়; কিন্তু রূপচাঁদ এমন সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন যে, সেই উড়ো খবরের বীজ বকুলবালার মনে বিষবৃক্ষে পরিণত না হয়ে অমৃতবৃক্ষেই রূপান্তরিত হত। রূপচাঁদ বকুলবালাকে বুঝিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে না জানি কি রহস্যময় একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে তাঁকে দেখামাত্রই অধিকাংশ স্ত্রীলোক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং চেষ্টা করে তাঁকেও আকৃষ্ট করতে। কিন্তু বকুলবালার মতো স্ত্রী ঘরে থাকতে—হুঁঃ! বকুলবালা গদগদ হয়ে পড়তেন। তিনি কল্পনা করতেন, অদৃশ্য একটা যুদ্ধক্ষেত্রে রূপচাঁদ অহরহ যেন যুদ্ধ করছেন এবং প্রতিবারেই জয়ী হচ্ছেন। সবাই তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই আত্মসমর্পণ করছেন না। বকুলবালা-প্রেমবর্মে আচ্ছাদিত থাকতে কেউ কিছু করতে পারছে না তাঁর। নিজের স্বর্গ-সুখেই ছিলেন বকুলবালা।

জলযোগান্তে মৃদু হেসে রূপচাঁদ বললেন, "আবার এক ফ্যাসাদে পড়া গেছে, বুঝলে?"

"কি ফ্যাসাদ?"

"বার্মা-ফেরৎ একটা মেয়ে এসে জুটেছে। শুধু জোটেনি, ঘাড়ে পড়েছে।"

"বার্মা-ফেরৎ মেয়ে? বার্মা কোথায়, কতদূর এখান থেকে?"

স্মিতমুখে ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন রূপচাঁদ। সহধর্মিণীর বিরাট অজ্ঞতায় চমকে গেলেন একটু মনে মনে। খুশিও হলেন পরমুহূর্তে।

"বার্মা অনেক দূর। মগের মুলুক। সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে আজকাল। জাপানীরা বোমা ফেলছে।"

"ও!"—চোখ দুটো বড় হয়ে গেল বকুলবালার।

"সেই বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছে মেয়েটি। পথে বাপ ভাই মা বোন—সব মরে গেছে। জুটেছে এখানে এসে। অমরেশের বাসায় আছে। অমরেশ কেন যে এসব জোটায়! এখন আমাকে বলছে—তুমি ভাই, সব ঠিক করে দাও ওর।"

"তুমি কি ঠিক করে দেবে?"

"বাসা-টাসা, দাই-চাকর—এই সব আর কি। আমি অমরেশকে বললাম, তুমি নিজের বাসায় ঠাঁই দিয়েছ, বাকিটুকু তুমিই কর না। কিন্তু ও তা শুনবে! না-ছোড় লোক। আমাকে বলছে—তুমি পুলিশের লোক, তুমি সহজে ব্যবস্থা করতে পারবে। দেখ দিকি কি আপদ!"

স্বামী-গর্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বকুলবালার মুখে।

"আহা, করেই দাও না। বিদেশ বিভুঁয়ে এসে কষ্টে পড়েছে বেচারী। বাপ-মা মরে গেছে?"

"সব।"

"বিয়ে হয়নি?"

"না।"

"আহা! দাও একটা ব্যবস্থা করে।"

"মেয়েমানুষ কিনা! এখনই চট করে কে কি বলে বসবে। ও হ্যাঁ, ভাল কথা, আনন্দকে দিয়ে তোমার মুনিয়া পাখির বিষয়ে ছোট্ট একটা ছড়া লিখিয়ে এনেছি।"

"সত্যি?"

নতুন খেলনার লোভ দেখালে শিশুর চোখ দুটো যেমন আনন্দে আগ্রহে জ্বলজ্বল করে ওঠে, বকুলবালারও তেমনই উঠল।

"কই, পড় না শুনি।"

বকুলবালার সময় কাটাবার জন্যে নানারকম পাখি কিনে দিয়েছেন তাঁকে রূপচাঁদ। টিয়া, চন্দনা, বুলবুলি, ময়না, শ্যামা, মুনিয়া। এই সূত্রেই অমরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে। তারপর আলাপ অবশ্য গাঢ়তর হয়েছে। পাখির সম্বন্ধে যতটা না হোক, অমরেশবাবু লোকটির সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। প্রাক্তন বন্ধু আনন্দও এসে জুটে যাওয়াতে জমে উঠেছে ব্যাপারটা। কবিকে দিয়ে কবিতাটা অনেকদিন আগেই লিখিয়ে রেখেছিলেন তিনি। এখন তাক মাফিক কাজে লাগালেন।

"কই, পড়—"

"দাঁড়াও সিগারেটটা ধরাই আগে।"

ধীরে-সুস্থে সিগারেটটা বার করলেন। ধীর-সুস্থে ঠুকলেন সেটাকে টেবিলের উপর, ধীরে-সুস্থে দেশলাই কাঠিটা বার করে ধরাতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু বকুলবালার তর সইল না আর। হাত থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা কেড়ে নিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে ঠোঁট ফুলিয়ে বেণী দুলিয়ে বললেন, "না তুমি পড় আগে।"

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেললেন রূপচাঁদ। এই-ই তিনি চাইছিলেন। বকুলবালার মনটা যেদিকে যখন ঝোঁকে, সেই দিকেই তখন ছোটে অবিলম্বে। অন্য দিকে তখন ফিরে চায় না, ফেরবার সামর্থ্য থাকে না। হঠাৎ অনেকদিন আগেকার একটি ছবি মনে পড়ল রূপচাঁদের। এই ছবিটা প্রায়ই মনে পড়ে তাঁর। বকুলবালা-চরিত্রের একটা ভয়ঙ্কর দিক আবিষ্কার করেছিলেন সেদিন তিনি। ঈর্ষার প্ররোচনায় বকুলবালা যে খুন পর্যন্ত করতে পারে, এ কথা তার আগে কল্পনাতীত ছিল রূপচাঁদের। বকুলবালা সত্যিই খুন করেছিলেন। অবশ্য মানুষকে নয়, একটা রামছাগলকে। অনেকদিন আগে একটা রামছাগলের ছানা কিনে দিয়েছিলেন তিনি বকুলবালাকে। কিন্তু রামছাগলটা তাঁরই বেশী ন্যাওটা হয়ে পড়ল কোনও অজ্ঞাত কারণে—সম্ভবত, তার পরমায়ু ফুরিয়েছিল বলে। তিনি যখন আপিস থেকে আসতেন, তখন সেটা তাঁরই আশেপাশে ঘুরঘুর করে বেড়াত। বকুলবালা ডাকলেও তাঁর কাছে যেত না। তখন শীতকাল। একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি, রামছাগলটা তড়াক করে এসে বিছানায় উঠল এবং যে জায়গাটায় বকুলবালা শোন, সেই জায়গাটায় বসল এসে বাগিয়ে। লম্বা লম্বা কান দুটি নেড়ে

সরল চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা ভাষা ফুটিয়ে তুলল, যার অর্থ—রূপচাঁদের মনে হল—লেপটা জড়িয়ে দাও না আমার গায়ে। রূপচাঁদ লেপটা জড়িয়ে দিলেন তার গায়ে। সে আরও গুটিসুটি হয়ে ঘেঁষে এসে বসল। কিছুক্ষণ পরেই এলেন বকুলবালা—এবং যেমন তাঁর প্রাত্যহিক রীতি—ছেলেমানুষের মতো হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে রূপচাঁদকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন—

"এ কি, লেপের তলায় এ কে?"

"ছাগলটা এসে ঢুকেছে।"

"বেরো, বেরো, বেরো, পোড়ারমুখো"—হিড়হিড় করে টেনে সেটাকে বাইরে নিয়ে গেলেন। রূপচাঁদ প্রত্যাশা করছিলেন, ছাগলটাকে বার করে দিয়ে বকুলবালা তখনই আবার ঢুকবেন লেপের তলায় এসে। কিন্তু বকুলবালা ফিরলেন না। কয়েক মিনিট পরে আর্তকণ্ঠের একটা 'ব্যা' শব্দ শুনে উঠতে হল রূপচাঁদকে। বারান্দায় বেরিয়ে দেখলেন, বকুলবালা মাছ-কাটা বড় বঁটিটা দিয়ে ছাগল-ছানাটাকে কাটছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আগুন, মাথার কাপড় সরে গেছে, কুন্তল আলুলায়িত। সে ভয়াবহ মূর্তি। ঈর্ষাপীড়িত হলে বকুলবালা যে কতদুর পর্যন্ত যেতে পারেন, সেই দিন চকিতের মধ্যে বুঝেছিলেন তিনি, আর সেই দিন থেকে মনে মনে ভয়ও করেন তিনি তাঁকে।

"পড় না ছড়াটা!"

রূপচাঁদ মানিব্যাগের ভিতর থেকে কাগজের টুকরোটি বার করে পড়ে শোনালেন—

মুনিয়া রে মুনিয়া
কথা যা রে শুনিয়া
গায় কটা ফোঁটা আছে
আয় দেখি গুণিয়া।
পতঙ্গ ধরিয়াছে পক্ষীর বেশ কি
ছটফটানির তোর নেই আর শেষ কি
সারা গায়ে অপরূপ রেশমের গালচে
কখনও সবুজ রঙ কখনও বা লালচে
কখনও পান্না তুই
কখনও বা চুনিয়া
মুনিয়া রে মুনিয়া।

কবিতা শুনে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

"বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো! ভাল করে লিখে দাও তুমি একটা কাগজে, খাঁচাটার গায়ে সেঁটে রাখব।"

"আচ্ছা, সিগারেটটা খেয়ে নিই, দাঁড়াও।"

"না, আগে লেখ তুমি।"

রূপচাঁদ চেয়ে রইলেন স্ত্রীর মুখের দিকে। অবুঝ শিশুর দৃষ্টি চোখের চাহনিতে।

"তুমি আনন্দবাবুকে বলে আমার মদনলাল, যমুনা আর সোহাগীর নামেও ছড়া লিখিয়ে এনো, কেমন? প্রত্যেকের খাঁচার গায়ে সেঁটে দেব, বেশ?"

রূপচাঁদ স্ত্রীকে চিনতেন। বাগ্‌বিতণ্ডায় আর সময় নষ্ট না করে লিখতে শুরু ছড়াটা। বকুলবালা উন্মুখ আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলেন।

।। ছয় ।।

কবি একাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেদিন আপন মনে। অমরবাবু রূপচাঁদ কেউ সঙ্গে ছিলেন না। ভোরে উঠেই দুজনে কোথায় যে বেরিয়ে গেছেন, তা বলতে পারলে না কেউ। রত্নপ্রভা বললেন, "পাশের গ্রামে কোনও পাখিওলার কাছে গেছেন সম্ভবত—"

কবি একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিছুদূর গিয়ে নজরে পড়ল, সজনে গাছে ফুল ধরেছে। গোছা গোছা সাদা সাদা ফুল। আর একটু এগিয়ে গেলেন—পাতাগুলোও কি চমৎকার! আশেপাশে চেয়ে দেখলেন, চাকুন্দা গাছে লম্বা লম্বা শুঁটির মতো ফল ধরেছে। কিছুদিন আগেই হলদে হলদে ফুলের গোছায় ভরতি ছিল সব। এখনও ফুল আছে দু-চারটে, কিন্তু ফলের সংখ্যাই বেশি। শুভ্র সুন্দর ধুতরো ফুলগুলোও আর নেই, কন্টকিত ফল দেখা দিয়েছে। একটা কথা মনে পড়তেই এগিয়ে গেলেন তিনি। একটু দ্রুতপদেই গেলেন। কিছুদিন আগে একটা ঝোপের মধ্যে ঘন বেগুনী রঙের ফুলের ছড়া দেখেছিলেন। বড় বড় দুলের মতো দুলছিল যেন বনলক্ষ্মীর অলকগুচ্ছ। গিয়ে দেখলেন, একটিও নেই, তার জায়গায় সিম ঝুলছে গোছা গোছা। মনে হল, শীতের সময় যে সব ফুলের দল এসেছিল চলে গেছে তারা। মনে পড়ল, বাগানে রঙ্গন কুন্দর গাছে যে মহোৎসব পড়েছিল কিছুদিন আগে, তাও আর নেই। ফুটছে বটে দু-চারটে ফুল, কিন্তু জোয়ার নেবে গেছে। স্থলপদ্মও ফুটছে না আর। জবাও খুব কম। গাঁদা আর বিদেশী মরশুমী ফুলেদেরই ভিড় এখন। শীতকালে যেমন এক দল বিদেশী পাখি আসে আবার চলে যায়, তেমনিই এক দল ফুলও আসে আবার চলে যায়। বিদেশী পাখিরা চলে যায়। কিন্তু রেখে যায় কি কিছু? যায় কি না জানা নেই। শীতের ফুলেরা ফল রেখে যায়, কিন্তু কোথায় যায় ওরা? তাও জানা নেই। ফুলই ফলে পরিণত হয়—এ বৈজ্ঞানিক সত্যটাকে মন যেন মানতে চায় না। বরং ভাবতে ভাল লাগে যে, দু জাতের জিনিস ওরা। এক দল আসে আর এক দল চলে যায়। এক দলের কর্তব্য শেষ হয়, শুরু হয় আর এক দলের। প্রথম দলই দ্বিতীয় দলে পরিণত হয়—চুল-চেরা হিসেব করে ঠিক করেছে যারা, তারা বেনে। হিসেবটাও নিখুঁত নয় সব সময়ে। তবু ছাড়বে না, তর্ক করবে। হিসাবের খুঁটিনাটিতে মত্ত হয়ে কি করে যে দিন কাটায় ওরা! না, হিসাব নিয়ে মাথা-ঘামানো কবির কাজ নয়। প্রাণ তাতে সাড়া দেয় না। যে আবির্ভাব সমস্ত সত্তাকে উতলা করে তোলে, তার সত্য রূপ হিসাব করে দেখা যায় না, দেখা যায় কবির দৃষ্টি দিয়ে....এই ধরনের খাপছাড়া ভাবনা ভাবতে ভাবতে আপন মনে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি।

....হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, শহরের বাইরে অনেক দূর এসে পড়েছেন। খাতা পেন্সিল সঙ্গে এনেছিলেন। অনেক কবিতার লাইন মনে আসে, কিন্তু হারিয়ে যায়। এবার থেকে টুকে রাখবেন ঠিক করেছেন। ওরা যখন কেউ সঙ্গে নেই আজ, আপন মনে কবিতাই লেখা যাবে কোথাও বসে। একটা আমবাগানের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন তিনি। দেখলেন, একটা গাছের তলায় রোদ

এসে পড়েছে বেশ। নিজের র‍্যাপারটা বিছিয়ে তার উপর বসলেন। মনে হল, মন্দাকিনী দেখলে কুরুক্ষেত্র করতেন। মুচকি হাসলেন একটু।

....দূরে নদীর চর দেখা যাচ্ছে। সবুজের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে কে যেন। মাঝে মাঝে সরষে ফুল। বিরাট একটা সবুজ মখমলের গালিচায় সোনার চুমকি জ্বলছে অজস্র। এক ঝাঁক পাখি এসে বসল সামনের গাছটায়। বসেই আবার উড়ল। আবার বসল আর একটা গাছে। দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন। দেখে চিনতে পারলেন। অমরবাবু চিনিয়ে দিয়েছেন সেদিন। এই দেশে 'পাওয়াই' বলে। ময়না এক জাতের। ইংরেজী নাম Grey headed Myna। মাথা পিঠ ধূসর রঙের, পেটের তলা বাদামী, ঠোঁটটি কালচে গোছের। শীতকালে আসে। কবির মনে হল, মানুষদের মধ্যেও এক জাত আছে, যারা ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশে—সন্ন্যাসীর দল, বেদুইনের দল। তারা মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দেখা দেয়, হয় ভিক্ষা করতে, না হয় রাহাজানি করতে। এ পাখিগুলোও তেমনই বোধ হয়। পাওয়াই নাম না দিয়ে বেদুইন নাম দিলে বোধ হয় বেশি মানায়। আর একবার তাঁর মনে হল, আমাদের ভাষায় সব পাখির নাম সুন্দর নয়। নতুন নামকরণ করা উচিত। আবার উড়ল ময়নার দল। উড়ে চলে গেল দৃষ্টির ওপারে। কোনও চিহ্ন আর রইল না তাদের। কবির মনে জাগল কবিতা—

আকাশেতে ওড়ে নিশি
ওড়ে কত দিন
ওড়ে পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে
শকুনি সারস কাক,
অদৃশ্য ঘোড়া চড়ে
ওড়ে বেদুইন
কিন্তু আকাশে কোনও
থাকে না তো চিন্।
উড়ে সব চলে যায়
চিহ্ন থাকে না হায়
চেয়ে থাকে মহাকাল
শান্ত প্রবীণ
নির্মল মহাকাশ
নাই কোন চিন্।

চুপ করে বসে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ। স্বপ্নালোক মূর্ত হয়ে উঠল যেন চারিদিকে। অনামা শব্দ, অজানা-গন্ধ, চকিত স্পর্শ...তার ওপার থেকে পরিচিত জগতের টুকরো টুকরো খবর ভেসে আসছে। দূরে ঘুঘু ডাকছে করুণ সুরে। কুটুর কুটুর করে বুলবুলিরা ডাকছে মাঝে মাঝে পাশের ঝোপটায়। আবার নীরব হয়ে গেল সব। আবার চোখে ভেসে উঠল দূর দিগন্তের মায়া-মরীচিকা—হ্যাঁ, যদিও সবুজ, তবু মরীচিকাই—কাছে গেলে থাকে না। দূর থেকে প্রলুব্ধ করে শুধু...হঠাৎ চোখে পড়ল, সামনের কলকে ফুলের গাছে কোকিল বসে আছে একটা। এতক্ষণ দেখতে পাননি। দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন। কুচকুচে কালো পালক। কালো গরদ যেন। সবুজ ঠোঁট। লাল চোখ। চুপ করে বসে আছে গুটিসুটি হয়ে। কবির মনে হল, ধ্যান-মগ্ন। মনে

হল, ও কোকিল নয়—আলোক-পিপাসী অন্ধকার। অমানিশার টুকরো একটা। পালিয়ে এসেছে আলোর দেশে।

পিক-রূপে অন্ধকার আলোর তপস্যা করে
আলো চায় কালো,
চঞ্চুতে সবুজ-স্বপ্ন, নয়নে অনল-ভাতি
বলে—আলো জ্বালো,
হে দেবতা, জ্বালো আলো—সপ্তবর্ণ-সম্মিলন-ভাতি—
দূর হোক অন্ধকার দুর্বিষহা ভয়ঙ্করী রাতি
অবারিত হোক দৃষ্টি জীবনেতে জাগুক প্রভাতী
আলো দাও আলো—

হঠাৎ তীক্ষ্ণ সুরে ক্যাঁক ক্যাঁক ক্যাঁক করে উঠল কে যেন। কবি চেয়ে দেখলেন, পাশের গাছটা থেকে উড়ে গেল জংলা-শাড়ি পরা কোকিলা। ওর সঙ্গিনী বোধ হয়। পরমুহূর্তেই কোকিলও উড়ে গেল। তপোভঙ্গ হল তার। দূরে কোমল মধুর কণ্ঠে শোনা যেতে লাগল তার মিনতি—কুক্, কুক্, কুক্, কু—

খাতা পেন্সিল পড়ে রইল ঘাসের উপর। সামনের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন কবি। এক ঝাঁক সবুজ টিয়া বসল সামনের বকুল গাছটায়। দূরদিগন্তের সবুজ মরীচিকাই নবরূপে ভোলাতে এল নাকি তাঁকে? নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তিনি। হ্যাঁ, সমস্ত মরীচিকাই! ডানার কথা মনে পড়ল সহসা। অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন খানিকক্ষণ। কল্পনালোকে ঘন অরণ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেলেন যেন। সমস্ত চিত্ত জুড়ে একটি কথাই বাজতে লাগল কেবল—হোক মায়া, হোক মরীচিকা, তবু সুন্দর। কালই যে কবিতার দুটো লাইন এসেছিল তাঁর মনে কিন্তু যা তিনি শেষ করেননি, সেই দুটো লাইনই গুনগুন করে এল আবার—

ভ্রমর আসিয়া কানে কানে কহে কুন্দর
তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর

এল, আবার চলে গেল। শেষ করতে ইচ্ছা হল না। মনে হল, অসমাপ্ত জিনিসেরও না-বলা বাণী আছে একটা। তা অব্যক্তরূপেই বিকশিত। চুপ করে বসে রইলেন। যে রোদের ফালিটা পিঠের উপর ছিল এতক্ষণ কোলের উপর পড়ল সেটা এসে। দুষ্টু ছেলে যেন একটা। এতক্ষণ, পিঠের উপর ঝুলছিল, কোলে এসে বসল এবার। আলোক-শিশু। কোথা থেকে এল এ? গাছের কোন ফাঁকটা দিয়ে এল দেখতে গিয়ে আর একটা জিনিস চোখে পড়ে গেল। অমরবাবু চিনিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। চোর-পাখি। দূরবীন তুলে সবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন। পেটের তলাটা বাদামী, অনেকটা আরশোলার মতো রঙ। পিঠের রঙটা ইঁদুরের মতো। ছোট্ট চৌকোণা ল্যাজটি। ডালে ডালে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। ডালটা ঠোকরাচ্ছেও কাঠঠোকরার মতো। বাঃ হঠাৎ কেমন ঘুরে গেল ডালের নীচের দিকে! খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কবি খাতা পেন্সিল তুলে নিলেন।

আরশোলা-রঙ পেটের তলায়
ইঁদুরের রঙ পিঠে
তবু গাই তার জয়

নামটা তাহারে বঙ্গবাসীরা
দেয়নি যদিও মিঠে
তবু সে তুচ্ছ নয়।

আকাশের সাথে মিতালি যে তার
মেলতে জানে সে ডানা
করে না সে চাক্‌রি তো
পাশাপাশি বসে কাঠঠোক্‌রার
খায় সে পোকার খানা
সরল স্বোপার্জিত।

চোরা-বাজারের সঙ্গেতে তার
নেই কোনও পরিচয়
চেনে না কালো-বাজার
ডালে ডালে শুধু হামাগুড়ি দেয়
পাতায় পাতায় নয়
আমি জয় গাই তার।

আমার কাব্যে চোরা-পাখি তুমি
চতুরিকা চঞ্চরী
গোপন-সঞ্চারিণী
অদৃশ্য পথে আনোগোনা কর
অন্তর মন ভরি'
আমি যে তোমারে চিনি।

কবিতাটা শেষ করে কবি আবার চেয়ে দেখলেন উপরের দিকে। চলে গেছে চতুরিকা পাখি। ওরা থাকে না, চলে যায়। আসা আর যাওয়া দুটোই সত্য। পাওয়া আর হারানো, মিলন আর বিরহ, অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে বিশ্বকবির ছন্দে! আমরা একটাকে আঁকড়ে ধরি, অন্যটাকে মানতে চাই না। তাই হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাই বার বার। হাহাকার ওঠে জগৎ জুড়ে।

'কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক' আর্তস্বরে হাহাকার করে উঠল কে যেন। কবি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, আর একটা পাখি। অচেনা পাখি। উঠে পড়লেন। দূরের উঁচু ডালটায় বসল। দূরবীন দিয়ে দেখলেন, ভাল বোঝা গেল না। এগিয়ে গেলেন একটু। এবার দেখা গেল। নতুন ধরনের শ্রইক (Shrike) নিশ্চয়, কারণ চোখের উপর কালো টানা রয়েছে। 'কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক'— চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল আবার পাখিটা। দূরের একটা গাছে গিয়ে বসল। সেখান থেকে উড়ল দুটো পাখি। সঙ্গী পেয়ে গেল বোধ হয় প্রথমটা।

কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক—বসন্ত-বউরি ডাকছে। টংক টংক টংক—ডেকে চলেছে ভগীরথ। তার সঙ্গে জাল বুনে চলেছে ঘুঘুর করুণ সুর। কয়েকটা চিল ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার

উপর মন্থরগতিতে। অদ্ভুত পরিবেশ! বিহ্বল কবি বসে পড়লেন একটা ঝোপের ধারে। বাঁশপাতি পাখিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক যেন বাঁশের পাতা। ছিপছিপে দেহ, আর পাতলা সবুজ রং। দূরবীন দিয়ে দেখলেন, শুধু সবুজ নয়, ঈষৎ হলুদেরও আমেজ আছে। নীলেরও আভাস আছে মুখের কাছটায়, বিশেষত গলায়। ঘাড়ের কাছে সোনালি। চোখের কাছে কালো, গলায় কালো কণ্ঠি, চোখ লাল, ঠোঁট কালো। ল্যাজের থেকে লম্বা সরু পালক বেরিয়ে এসেছে একটি। রূপসী। হঠাৎ মনে হল দুটো লাইন—

ফলের মধ্যে নাসপাতি
পাখির মধ্যে বাঁশ-পাতি।

তখনই মনে হল, মিলের জন্যেই লাইন দুটো মনে এল নাকি? নাসপাতির সঙ্গে সত্যি সত্যি কিছু কি মিল নেই ওর কোনখানে? আছে বইকি। রঙের মিল তো অনেক আছে। স্বভাবেরও মিল আছে হয়তো। ছিপছিপে চটুলা কিশোরীর মতো দেখতে, স্বভাবও হয়তো অম্লমধুর। কবিতাটা আর একটু বাড়াবেন কি না ভাবছিলেন, কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আর একজন। সামনে ছোট্ট একটা ডাল হাওয়ায় দুলছে। ডালের উপর ওটা কি? নাচছে নাকি? বাঃ, চমৎকার তো! মনে পড়ল বইয়ে ছবি দেখেছিলেন। অমরবাবু বলেওছিলেন এর কথা। কুলো পাখি নিশ্চয়। না হয়ে যায় না। ছোট্ট পাখিটি, চড়ুই পাখির মতন। দূরবীনে নিবদ্ধ দৃষ্টি হয়ে বসে রইলেন মুগ্ধ হয়ে। বাঃ, নাচের কি বাহার! উড়ে গেল। খাতা খুলে বসে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

হাওয়ার দোলে বাহা বাহা
ছোট্ট শাখী
ফুরফুরিয়ে
উঠছে দুলে,
তার উপরে নাচছে আহা
ছোট্ট পাখি
ল্যাজ ঘুরিয়ে
প্যাখম তুলে।
আলোয় মাখা সবুজ ডালে
আপন মনে নাচছে তালে
পালকগুলি যাচ্ছে ঘুরে
প্রাণের সুরে গানের সুরে
সকল ভুলে।
চোখের উপর কি সুন্দরই
মরি মরি
চন্দনেরি
তিলক শোভে,
ওড়নাখানা তার পোশাকী
পরল নাকি
চড়াই পাখি
নাচের লোভে!

কালচে রঙে সাদার ছিটে
মানিয়েছে বেশ লাগছে মিঠে
পুচ্ছ-পাখার বাহার দিয়ে
হচ্ছে মনে লাফিয়ে গিয়ে
আকাশ ছোঁবে।
বুঝবে না তো আকাশ-ছোঁবার অর্থ কি, ও
কুলো পাখি? মিথ্যা কথা, নর্তকী ও।

কবিতা শেষ হতে না হতেই আর একটা তীক্ষ্ণ-মধুর ডাকে সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি। ঢেউ-খেলানো তীক্ষ্ণ মধুর একটানা ডাক একটা। সুরের 'গ্রাফ' (graph) যেন এঁকে-বেঁকে মূর্ত হচ্ছে শ্রুতিলোকে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। ঘাড় তুলে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ দেখতে পেলেন নীল রঙের পাখিটাকে। চিনতে পারলেন। মাছরাঙা। White-breasted King Fisher। তখনই মনে হল—পক্ষীবিদ্‌রা এর সাদা বুকটাকেই এত প্রাধান্য দিয়েছেন কেন? গায়ে তো ওর রঙের অভাব নেই? খাতা খুলে আবার শুরু করলেন কবিতা।

বাজাই তোমার রূপের ডঙ্ক
হে বর্ণাঢ্য মৎস্য-রঙ্ক
ধন্য হয়েছে তোমারে পাইয়া
খাল বিল নদ নদীরা,
পক্ষীবিদেরা করেছে লক্ষ্য
কেবল তোমার শুভ্র বক্ষ
জানি না কেন যে দেখে নি চাহিয়া
তব লাল-নদী খদিরা।
কবির চক্ষু বর্ণ মগ্ন
স্বপ্ন, স্বপ্ন কেবল স্বপ্ন—
মাতায়ে তুলেছে উন্মুখ হিয়া
বর্ণ-বহুল মদিরা,
ভেসেছে মনের ময়ূরপঙ্খী
কার সন্ধানে সে নিঃশঙ্কী
অজানা নদীতে উজান বাহিয়া
চলেছে উতলা অধীরা।

পাখিটা উড়ে চলে গেল। কবি ভাবতে লাগলেন ওর 'হোয়াইট-ব্রেস্টেড্' নাম হল কেন? অমরবাবু কাছে থাকলে হয়তো একটা ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। কবির মনে হল, সেকালে পক্ষীবিদেরা পাখি মেরে মেরে পক্ষী-বিজ্ঞান চর্চা করতেন। ওর ধপধপে সাদা বুকটায় বন্দুকের তাক করবার সুবিধে হত বলেই বোধ হয় ওই নাম দিয়েছিলেন তাঁরা। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। শিস দিলে কে? পাখি? একটা পাখি নদীর দিকে উড়ে যাচ্ছে দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ উঠে চলতে লাগলেন নদীর দিকে। প্রায় ছুটতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, কি একটা হাতছাড়া হয়ে গেল যেন। নাগালের বাইরে চলে গেল চিরদিনের মতো। কিছুদূর গিয়ে

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন কিন্তু। মাঠে ছোট ছোট মাকড়সার জালে শিশিরবিন্দু পড়ে ছোট ছোট মুক্তোর জালের মতো হয়েছে, চারিদিকে ছড়ান রয়েছে অজস্র। প্রখর দিবালোকে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অদ্ভুত একটা কথা মনে হল তাঁর। এই নির্জন প্রান্তরে কাল রাত্রে দেবকন্যারা আসেনি তো? লাস্যলীলা-অবসানে চলে গেছে হয়তো ভোরবেলা। ফেলে গেছে তাদের কবরীর জালাবরণ! যে পাখিটার অনুসরণ করে একটু আগে চলছিলেন, তার কথা ভুলেই গেলেন। সবিস্ময়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাথা হেঁট করে চললেন নদীর দিকে। মিষ্টি মিহি আর একটা সুর শুনে একটু পরেই কিন্তু উপরের দিকে চাইতে হল আবার। একদল কালো কালো ছোট ছোট পাখি উড়ছে। দূরবীন দিয়ে দেখেই চিনলেন। কমন সোয়ালো (Common Swallow)। এর সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন সেদিন অমরবাবু। এদেরই সম্বন্ধে বোধ হয় সেই পাদরি বৈজ্ঞানিক গিল্‌বার্ট হোয়াইট বলেছিলেন যে, এরা শীতকালে কাদার নীচে চলে যায়। আসলে কিন্তু শীতকালে এরা এ দেশে আসে। ও দেশে থেকে গ্রীষ্মকালে। ইংরেজী প্রবাদটাও মনে পড়ল—One swallow does not make a summer। দূরবীন দিয়ে দেখলেন আবার। ল্যাজটা অনেকটা ফিঙের মতো, পেটের কাছে সাদাটে, গলার নীচেটা বাদামী, পিঠটা কুচকুচে কালো, ছোট্ট ঠোঁট, মুখটি সুন্দর। দেশী নাম আবাবিল। কি চঞ্চল! এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। আবার একটা কবিতা জাগল মনে। অন্তরলোকে কবিতার প্রস্রবণ বইছে আজ। খাতা আর বার করলেন না। মনে মনেই চলল রচনা।

শীতের অতিথি আবাবিল,
নূতন আকাশে ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
ঘুরে ঘুরে দেখে খাল বিল,
গ্রাহ্য করে না আশে পাশে ওড়ে
শকুনি গৃধিনী কাক চিল,
কি চায় কি চায় ঠিকানা না পায়
বিশ্রাম নেই এক তিল,
শীতের অতিথি আবাবিল।

ডানার কথা মনে পড়ল। ও মেয়েটিও তো অতিথি এ দেশে। ওর মনও কি চঞ্চল হয়ে উঠেনি এই আবাবিলদের মতো? হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। খঞ্জন, ফুলকি, কাদাখোঁচা, আবাবিল, উৎক্রোশ সকলেই কেমন যেন উন্মনা অস্থির, কি যেন খুঁজছে সবাই। ডানা কি চুপ করে আছে? কি খুঁজছে ও? কাকে খুঁজছে? কি ভাবে খুঁজছে? ওর কালো চোখের দৃষ্টিতে যে আলোর ঝলক দেখেছিলেন সেদিন, তা ভাষা-ভরা কিন্তু তার অর্থ কি? কবির সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে উঠল, কাঁপতে লাগল ছন্দভরে। পরমুহূর্তেই নতুন একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হল কিন্তু। সামনে সাঁকো একটা। অত্যন্ত পল্‌কা বলে মনে হল। কয়েকটা বাঁশ আর তক্তা দিয়ে তৈরি। আস্তে আস্তে খুব সন্তর্পণে পার হলেন। পার হয়েই সবুজের রাজ্য। গম যব ছোলার ক্ষেত। ও কিসের শব্দ? ভারি মিষ্টি তো! উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আবার শব্দ হল। কোন্ পাখি এ? এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, কিছুই দেখতে পেলেন না। একজন চাষাকে দেখা গেল দূরে। কাস্তে হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে তাকেই প্রশ্ন করলেন, "কি পাখি ডাকছে বলতে পার?"

"ভরত।"

ভরত! ভরদ্বাজ! সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতে গাইতে ছোট্ট একটি পাখি উড়ল গমের ক্ষেত থেকে। সোজা উঠল খানিক দূর আকাশে, তারপর থেমে গেল শূন্যে, ডানা দুটো কাঁপতে লাগল, দেখা যেতে লাগল দোদুল্যমান পা দুটো, গানের ঝরনা ঝরতে লাগল চতুর্দিকে।

ভরত—স্কাইলার্ক—শেলী-ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক!

অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। সোঁ করে পাখিটা নেবে এল আবার। অদৃশ্য হয়ে গেল গমের ক্ষেতে। সুর শোনা যেতে লাগল সবুজের আড়াল থেকে, মনে হল, গম ক্ষেতই গান গাইছে বুঝি। ভরত! ভারতবর্ষের সঙ্গে যার নাম গাঁথা? ভারতের কাব্যে পুরাণে ধর্মে রূপকথায় অমর হয়ে আছে যে নাম! সুরের প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক।

চাষাটি ঘাস কাটতে আরম্ভ করেছিল। কবি তার কাছে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে বসবার মতো জায়গা হবে একটু কোথাও?"

"আমার ওই মাচায় গিয়ে বসতে চান তো বসতে পারেন।"

কাছেই ছোট মাচাটি। কবি তার উপর উঠে বসলেন। আবার উড়ল একটা ভরত পাখি। বাদামী রঙের ছোট্ট পাখিটি। দূরবীন দিয়ে দেখলেন কবি। বাদামী রঙ, তার উপরে ঘন-বাদামীর পোঁচ চারিদিকে, অনেকটা বাঘের গায়ের মতো। তাই বোধ হয় সংস্কৃত নাম ব্যাঘ্রাট। অপরূপ গানে আবার পূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। পরিপূর্ণ হয়ে উঠল কবির মন। মূর্ত হয়ে উঠল যেন অতীতের মাধুরী সুরের অপ্সরা-রূপে। ইতিহাসের গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশতে লাগল ছন্দের চটুল গিটকিরি। কবি দু'হাত তুলে প্রণাম করলেন এই অদ্ভুত সুরস্রষ্টাকে। তারপর খাতা বার করে লিখতে লাগলেন—

প্রণাম জানা প্রণাম জানা মহৎ-ও ক্ষুদ্রে
জলতরঙ্গ বাজায় ও যে সবুজ সমুদ্রে,
বিষ্ণুশর্মা চিনত ওকে, চিনত বাল্মীকি
রাম-সীতা ওর আত্মীয় যে—তোরাই ভুলবি কি?
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

শকুন্তলার পুত্র ভরত—ভারতবর্ষ যার,
হরিণ-পাগল ভরত ঋষির গল্প চমৎকার,
নাট্য শাস্ত্র লিখল ভরত,—ভরত বিহঙ্গ
সবুজ ক্ষেতে ছন্দে মেতে করছে কি রঙ্গ
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

সবুজ করে সবুজতর গিটকিরি ছন্দে
উড়ছে সোজা আকাশপানে মনের আনন্দে
থামিয়ে ডানা মাতিয়ে দিয়ে শূন্য-উষরকে
তখ্‌খুনি ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে সবুজ ভূস্বর্গে
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

বৃহস্পতির পুত্র যিনি মুনি ভরদ্বাজ
অঙ্গিরা যাঁর ঠাকুরদাদা—তিনিই বুঝি আজ
সুরের ধারায় শুষ্ক ধরায় করেন নিষিক্ত
নতুন করে করেন প্রমাণ আপন ঋষিত্ব
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

অরূপ দোলা দুলছে এ কি মর্ত্যে নন্দনে
আকাশ মাটি পড়ল বাঁধা সুরের বন্ধনে
স্বপ্ন এবং বাস্তবেতে প্রভেদ ঘুচে যায়
রোদের সোনায় সবুজ দোলে সুরের ব্যঞ্জনায়
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

কবিতাটা লিখে অনেকক্ষণ বসে রইলেন কবি। মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি যেন চলে গেছে। ভারি দুর্বল বোধ করতে লাগলেন। চোখ বুজে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ বসে রইলেন। মুদিত চোখের সামনেও মূর্ত হতে লাগল অপরূপ কি যেন একটা, যা অবর্ণনীয় কিন্তু অনুভূতি-গোচর। যখন চোখ চাইলেন, তখন সেই চাষা চলে গেছে। কত বেলা হয়েছে, কে জানে! চারিদিকে চেয়ে দেখলেন আবার। সবুজ, সবুজ কেবল সবুজ। সরষে ফুলে স্বর্ণকান্তি ঠিকরে পড়ছে দূরে। আরও দূরে নির্মল নীল আকাশ নুয়ে পড়েছে। দিগন্তরেখায়—সবুজ আর নীল মিশেছে যেখানে—সেখানে শিখিকণ্ঠকান্তি কোন্ ময়ূর গলা বাড়িয়ে দিয়েছে ওখানে! ভরদ্বাজ ডাকছে। মনে হচ্ছে, মিষ্টি-কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক পড়ছে যেন কে। সহসা তাঁর মনে হল একটা বিরাট কিছুর সামনে বসে আছেন তিনি। যা ঐশ্বর্যময় কিন্তু অনাড়ম্বর, দিগন্তপ্রসারী কিন্তু নিকটতম, যা সমৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। আবার কবিতা জাগল মনে—

বহমান নদীতীরে উন্মুক্ত আকাশতলে
বসে আছ কোন্ মহারাজ,
নাহি কোনও তূর্যনাদ উচ্চ বাদ-প্রতিবাদ
তুচ্ছ ‘সাজ্ সাজ্’।
ঘনশ্যাম সিংহাসনে বসে আছ আপনা পাশরি
রূপে রসে পরিপূর্ণ নানা ছন্দে বাজিয়ে বাঁশরী
শুভ মাঙ্গলিক-মন্ত্র উচ্চারিছে শতকণ্ঠ ভরি’
শত ভরদ্বজ
হে জনক নির্বিকার, হে রাজর্ষি আসক্তি-বিহীন,
তোমারে প্রণাম করি আজ।

কবিতাটা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হত, কিন্তু বাধা পড়ল অপ্রত্যাশিত ভাবে।

“আরে, আপনিও এখানে?”

বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে চেয়ে দেখলেন কবি। মাঠের সরু পথ বেয়ে গমক্ষেতের ভিতর দিয়ে বৈজ্ঞানিক আসছেন। তাঁর পিছনে রূপচাঁদ আর একজন লোক। কাছে আসতে

দেখা গেল, রূপচাঁদের এক হাতে বন্দুক, আর এক হাতে থলি। অচেনা লোকটির হাতে ঢাকা-দেওয়া খাঁচা একটি। কবি খাতাটি পকেটে পুরে মাচা থেকে নেমে পড়লেন।

"আপনাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি একা একাই বেরিয়ে পড়েছিলাম আজ। রূপচাঁদ, তুমি আপিস যাওনি? কটা বেজেছে?"

রূপচাঁদ নিজের হাত-ঘড়িটি দেখে বললেন, "বারোটা। আজ রবিবার।"

"ও। কোথা গিয়েছিলে তোমরা?"

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন।

"আমি বেরিয়েছিলাম লিয়াকতের উদ্দেশে। কোয়েলের সন্ধানে।"

"কোয়েল? কোকিল?"

"না, সে কোয়েল নয়। এ হচ্ছে কিউ ইউ এ আই এল—Quail! বটের। ওরাও উইন্টার ভিজিটার কিনা। আপনাকে দেখাবার জন্যেই বিশেষ করে বেরিয়েছিলাম। লিয়াকৎ বটের পোষে আমি জানতাম, তার কাছ থেকেই আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্য ভাল, ওদিকের ধান-ক্ষেতেও কিছু পেয়ে গেলাম আসবার সময়। রূপচাঁদবাবুর বন্দুকও ছিল। দেখবেন? দেখাও তো লিয়াকৎ।"

লিয়াকৎ সাবধানে বটের পাখিটিকে বার করলে খাঁচা থেকে। এত সাবধানে, এত সন্তর্পণে, যেন পাখি নয়, অপরূপ নিধি।

"এটা পুরুষ। তার চিহ্ন হচ্ছে গলায় এই কালো দাগ। অনেকটা নোঙরের মতো, নয়? মেয়েদের গলা সাদা। মেয়েগুলো আকারেও একটু বড়। মেয়েদের গলার সাদাটা বুশ কোয়েল (Bush Quail), রেন কোয়েল (Rain Quail), পেন্টেড বুশ কোয়েল (Painted Bush Quail), এগুলোতে আরও স্পষ্ট। বাটন কোয়েল (Button Quail) বলে আর এক রকম পাখি আছে, তারা আসলে অবশ্য কোয়েল নয় মোটেই, তাদের ল্যাজ নেই। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি, গোড়াতেই সেটা বলা উচিত ছিল, কোয়েলদের বিশেষত্ব হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন, ল্যাজ নেই, তা ছাড়া এই দেখুন চারটে করে আঙ্গুল। বাটন কোয়েলদের ল্যাজ নেই কিন্তু আঙ্গুল তিনটে, তাই তারা আসল কোয়েল নয়। এটার নাম হচ্ছে কমন গ্রে কোয়েল (Common Grey Quail),এরাই শীতকালে এ দেশে বেশি আসে। এর আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে ডানায়। এই দেখুন এগুলোকে পিনিয়ন কুইল (Pinnion Quill) বলে, এর রঙটা লক্ষ্য করুন, ড্র্যাবের (Drab) ওপর বাফের (Buff) দাঁড়ি দাঁড়ি। ড্র্যাবকে কি বলবেন বাংলায়? কটা? বাফ বোধ হয় মানুষের চামড়ার রং, না? এই বিশেষত্বটা অন্য কোয়েলদের তেমন নেই। কোয়েল আছে অনেক রকমের। বুশ কোয়েলই কয়েক রকমের আছে। বাস্টার্ড কোয়েল (Bustard Quail), রেন কোয়েল, জাপানীজ কোয়েল (Japanese Quail) আছে অনেক রকম।"

কবি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখছিলেন। ছোট্ট জীবন্ত ফানুস যেন একটা।

"বিদেশ থেকে আসে এরা? কতদূর থেকে?"

"বহুদূর। আফ্রিকা, সেন্ট্রাল এশিয়া, ওয়েস্ট এশিয়াও। এদের জ্ঞাতিগুষ্টিদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে গুড ফ্লায়ার্স (Good-fliers)—ওড়ন্দাজ বললে বাংলাটা ভুল হবে কি?"

বৈজ্ঞানিক মুচকি হেসে চাইলেন কবির দিকে।

কবি জিজ্ঞেস করলেন, "এইটুকু পাখি অত উড়তে পারে?"

"নিশ্চয়। লোহিত সাগর, ভূমধ্য-মহাসাগর পার হয়ে চলে আসছে। ভেবেই দেখুন না। সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে যেগুলো আসে, আর বেশির ভাগ সেখান থেকেই আসছে। তাদের আবার হিমালয় পার হতে হয়। পথে অবশ্য মারা পড়ে অনেকে। কিন্তু অদ্ভুত, নয়?"

বৈজ্ঞানিক চাইলেন রূপচাঁদের দিকে।

রূপচাঁদ বললেন, "খেতেও অদ্ভুত?"

"তা ঠিক মানুষের কবলে এরাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি পড়ে পাখিদের মধ্যে। আপনি কটা পেয়েছেন ?"

"বেশি নয়, গোটা-বিশেক হবে। চাখা চলবে। আপনার বাড়িতেই সন্ধেবেলা জমা যাবে সকলে, কি বলেন, আপনার বাইরের দিকের ওই বাবুর্চিখানাটায় সব ব্যবস্থা করবেন। আমিই রাঁধব। আনন্দ, তুমি আসছ তো?"

"আসব। কিন্তু বেশি ঝাল দিও না।"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে দেখলেন তাঁর দিকে একবার, কোনো জবাব দিলেন না।

বৈজ্ঞানিক মনে মনে বিব্রত হলেন একটু। সন্ধ্যার সময় একটা প্রবন্ধ ফাঁদবেন ভেবেছিলেন ডিম সম্বন্ধে। মুখে তবু বললেন, "বেশ তো, আসবেন। রত্না সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

চলতে শুরু করলেন আবার সবাই।

লিয়াকৎ অমরবাবুর দিকে চেয়ে বললে, "আমাকে এবার ছুটি দিন তবে। এঁর দেখা তো হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, এবার তুমি যাও। তিতিরের কথা মনে থাকে যেন।"

"হ্যাঁ, সে আমি যোগাড় করে দেব। যোগীন্দরের আছে এক জোড়া।"

কবি লিয়াকতের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি বটের পুষেছেন কেন? খাবার জন্যে?"

উত্তর দিলেন বৈজ্ঞানিক।

"না না লড়াই করবার জন্যে। মুরগীর লড়াই যেমন হয়, আগে বুলবুলির লড়াই যেমন হত, তেমনই বটেরেরও লড়াই হয়। পুরুষগুলো ভারী ঝগড়াটে। তিতিরও খুব লড়ে। লিয়াকতের বটের চ্যাম্পিয়ন এ অঞ্চলে।"

লিয়াকৎ সগর্বে নিজের বটেরটির দিকে তাকিয়ে চুমকুড়ি দিলে একবার। সঙ্গে সঙ্গে বটেরটা যেন বলে উঠল, "ঠিক তো ঠিক।"

লিয়াকৎ বটেরকে খাঁচায় পুরে সেলাম করে চলে গেল।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চাইলেন কবির দিকে।

"অদ্ভুত শিখিয়েছে তো লিয়াকৎ! শুনলেন ডাকটা? ইংরেজরা এ ডাককে কেউ বলে ওয়েট মি লিপ (Wet me lip), কেউ বলে ডিক-বি কুইক (Dick-be-quick)। ফাঁকা মাঠে জঙ্গলের কাছাকাছি এই ডাক শুনে শিকারীরা বুঝতে পারে যে, বটের আছে। ওদের ওড়বার সময় একটা বিশেষ ধরনের শব্দও হয়, হুররররর গোছের। ধান-ক্ষেতে সেই শব্দ শুনেই আমরা টের পেলাম, বটেরা আছে। অনেক পাখিরই ওড়বার সময় একটা শব্দ হয়। ঘুঘুদের হয়, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়—"

বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতায় বাধা পড়ল। ভরত-পাখি ডেকে উঠল একটা। বিস্মিত আনন্দে থেমে গেলেন হঠাৎ তিনি ব্যায়ত আননে।

"ভরত! দেখেছেন?"

"দেখেছি। কবিতাও লিখেছি একটা"—বিস্মিতমুখে উত্তর দিলেন কবি।

"ও, দ্যাট্‌স অল রাইট—এবার বটেরকে নিয়েও লিখুন।"

"সেটা কাবাব খাওয়ার পর হবে"—কবির দিকে আড়চোখে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন, "কাবাবে আর কাব্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।"

কবি হাসলেন একটু। তারপর বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "শীতকালের পর ওরা এ দেশ থেকে চলে যায় সব?"

"কিছু কিছু থেকেও যায়। ডিমও পাড়ে এ দেশে। ওদের ডিমও দেখতে চমৎকার। বাদামীর ওপর চকোলেটের ছিট-ছিট। তাই তো মনে হয় যে, ফুল্‌কি, মানে রেডস্টার্ট, হয়তো ডিম পাড়তে পারে এ দেশে, যদি ধরে রাখা যায়। রেডস্টার্ট তিন রকম আছে বলেছি কি আপনাকে? ব্ল্যাক, হোয়াইট ক্যাপ্‌ড্‌ (White capped), প্লাম্‌বিয়াস (plumbeous)–আমরা ব্ল্যাকটাকেই দেখতে পাই।"

কবির কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। আড়চোখে চেয়ে দেখলেন একবার তাঁর দিকে। মাথা হেঁট করে চলেছেন ভদ্রলোক। নীরবে পথ অতিবাহন করতে লাগলেন তিনিও। কবির মনে হচ্ছিল, এতক্ষণ বেশ ছিলেন তিনি স্বপ্নের হাট ভেঙে গেল হঠাৎ। অমরেশবাবুর বিজ্ঞান আর রূপচাঁদের বন্দুক সব লণ্ডভণ্ড করে দিলে যেন। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর রূপচাঁদের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি বললেন, "শুনবে নাকি কবিতা?"

"কি বিষয়ে?"—প্রশ্ন করলেন বৈজ্ঞানিক।

"বটের।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। এর মধ্যেই হয়ে গেল নাকি?"

কবি আবৃত্তি করলেন—

পার হয়ে হিমালয় সাগর করিয়া জয়
উড়ে আসে ছোট ছোট পক্ষী-ফানুস
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে সোজা গতি
বটের তো নয় ওরা,—পালকের প্রজাপতি
শীতের অতিথি সব,—আহা, কি চমৎকার!
আমরাও করে থাকি যথোচিত সৎকার
ঝোপে ঝাড়ে উৎসুক
বসে থাকি উন্মুখ
হাতে লয়ে বন্দুক
সভ্য মানুষ
কাবাব কোপ্তা কারি করে ফেলি রকমারি
ছিল যা একটু আগে রঙিন ফানুস।

বৈজ্ঞানিক সোল্লাসে বলে উঠলেন, "বাঃ!"

কবির দিকে মিটমিট করে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন, "আমাকে ঝাল দিতে মানা করলে, নিজে কিন্তু বেশ ঝাল দিয়েছ তো!"

।। সাত।।

নিস্তব্ধ নীরব রাত্রি। সবজিবাগের পড়ো বাড়িটাতে রাত্রির রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে যেন। ডানা বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছে। শুয়ে জেগে আছে, ঘুম আসছে না কিছুতেই। ভয় করছে না। যে নিষ্ঠুর ভাগ্যবিপর্যয় অতি-দ্রুত আঘাতের পর আঘাত হেনে তার আত্মীয়-স্বজন সহায়-সম্পদকে অবলুপ্ত করেছে, ভয়কেও অবলুপ্ত করেছে সে-ই। আর ভয় করে না। স্বয়ং মৃত্যুকে সামনে মূর্ত দেখলেও চমকে ওঠবার মতো মানসিক সজীবতা তার আর নেই। অন্তত মনে হচ্ছে, নেই। সমস্ত মনটা অসাড় হয়ে গেছে। যে অদৃষ্ট-দেবতা এক নিমেষে তার সমস্ত অতীত জীবনটাকে ভেঙে চুরে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দিয়ে গেছেন, তার এই বিধ্বস্ত বর্তমানের কোনও ভবিষ্যৎ আছে কি না, তিনিই তা জানেন। এ জীবনের কোনও ভবিষ্যৎ থাকা উচিত কি না, তিনিই তা ঠিক করবেন। ডানার যেন কোনও দায়িত্ব নেই, দায়িত্ব বহন করবার শক্তিও নেই। খরস্রোতের মুখে আত্মসমর্পণ করেছে সে, যেখানে গিয়ে ঠেকবে সেইখানেই তার স্থান। সে আপত্তি করবে না উল্লসিত হবে না, মেনে নেবে।

সবজিবাগের পড়ো বাড়িটা ঠিক নদীর ধারে। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নালোকে শুভ্র সৈকত দেখা যাচ্ছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা বিঘ্নিত হচ্ছে মাঝে মাঝে অতিক্ষীণ দূরাগত হংস-কাকলীতে। দূর নদীর চরে হাঁসের মেলা বসেছে বোধ হয়। চিত্রটা কল্পনায় পরিস্ফুট হওয়ামাত্র মনটা হাঁসের পাখায় ভর করে উড়ল যেন মহাশূন্যে। মনে হল, সেও যেন সত্যি উড়ে চলেছে আলোক আঁধারে সূর্যকিরণে ঝড়ের মেঘে। জন্ম-জন্মান্তরের মাঠ পাহাড় সমুদ্র বনানী পেরিয়ে কোথায় চলেছে সে? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল খানিকক্ষণ। 'ওয়াক্' করে শব্দ করে উঠল রাতের বক। নড়ে চড়ে শুল সে আবার। রাত্রি কত হয়েছে কে জানে! আনন্দবাবু যে চাকরটাকে দিয়ে গেছেন সে বাইরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে অঘোরে। রূপচাঁদবাবু, আনন্দবাবু দুজনেই লোক ভাল—হঠাৎ মনে হল ডানার। রূপচাঁদবাবু সাহায্য না করলে তাকে আরও কত জায়গায় যে ভেসে ভেসে বেড়াতে হত অনিশ্চিতভাবে! দুপুরের রোদ মাথায় করে আনন্দবাবু তার জন্যে চাকর খুঁজে নিয়ে এলেন দূরের এক গ্রাম থেকে। অত বড় অধ্যাপক একজন। ভাল লোক দুজনেই। কিন্তু তখনই তার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। যেন তার সদাজাগ্রত অন্তরাত্মা সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলে—সত্যিই ভাল লোক কি, সত্যিই কি নিঃস্বার্থপর? মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরীর কথা। সে যখন বি. এ. পরীক্ষা দেয়, প্রফেসার চৌধুরী দু বেলা তার বাড়িতে আসতেন তাকে সাহায্য করবার জন্য। একান্তভাবে সাহায্যও করেছিলেন। তাঁর সাহায্য না পেলে সে কিছুতেই ফার্স্ট ক্লাস অর্নাস পেত না কিন্তু তবু প্রফেসার চৌধুরীর সম্বন্ধে তার মনে যে ধারণা আছে, তা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়। মনে পড়ল রিসার্চ স্কলার ভাস্কর বসুর কথা শান্ত সৌম্য বলিষ্ঠ মূর্তিটা স্পষ্ট ভেসে উঠল চোখের উপর...তার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধও হয়েছিল। ভাস্করের সম্বন্ধে তার মনে কোনো গ্লানি নেই, কোনো মোহও নেই। কোথায় সে এখন? এই ভীষণ আবর্তে কোথায়

তলিয়ে গেছে কে জানে! ঠিকানাও জানা নেই যে খোঁজ করবে। খোঁজ করবার প্রেরণাও নেই মনে। তার মুদিত নয়নের সামনে এলোমেলো নানা স্মৃতির টুকরো, অসম্বদ্ধ বহু প্রশ্নের আভাস ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল জলস্রোতের খড়কুটোর মতো। তার মনে হচ্ছিল, সবই বৃথা, সবই অর্থহীন। কোনো কিছুই তার মনে বিশেষ কোনো সাড়া তুলছে না। তার মনে হচ্ছিল বটে, তুলছে না, কিন্তু তুলছিল। অতি সঙ্গোপনে অবচেতন-লোকে তুলছিল। তার বিধ্বস্ত চেতনার নেপথ্যালোকে অগোচরে জাগছিল নতুন আশার অঙ্কুর, নতুন কৌতূহলের ঔৎসুক্য। সে বুঝতে পারছিল না। সমস্ত শোক, সমস্ত বিপদ, সমস্ত ঝঞ্ঝার অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তি ক্ষতে প্রলেপ দেয়, ক্ষতিকে পূর্ণ করে, শোকের তীক্ষ্ণতাকে রূপান্তরিত করে সান্ত্বনার প্রশান্তিতে, সে প্রাণশক্তি তার অন্তরেও কাজ করে চলেছিল অগোচরে।

...নদীর দিক থেকে দুম দুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল কয়েকটা, সচকিত হয়ে উঠে বসল সে। তার আপাত ঔদাসীন্যের পরদাটা ছিঁড়ে গেল হঠাৎ যেন। সেই ফাঁক দিয়ে তার মন নিমেষে নীত হল আসামের জঙ্গলে, যে জঙ্গলে ডাকাতের হাতে পড়েছিল তারা। ডাকাতদের হাতে বন্দুক ছিল। সেই বন্দুকের গুলিতেও তার বাবা, সৎ-মা আর ছোট সৎভাইটি মারা যায়।...নিবিড় জঙ্গল, অদ্ভুত একটা লতার ঝোপ, তীব্র গন্ধ একটা, সামনে একটা এবড়ো-খেবড়ো রুক্ষ পাথর প্রকাণ্ড তার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে সে। কেমন করে পালিয়ে কি ভাবে যে ঝোপটায় ঢুকেছে, তা বুঝতে পারছে না। অনেকক্ষণ বসে রইল।....তারপর মনে হল, এমন ভাবে বসে থাকাটা অনুচিত হচ্ছে, ওদের কি হল দেখি....আমাদের দলটাই বা কত দূরে! পরের গ্রামে গরুর গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় এবং আগে থাকতে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে সহজে পাওয়া যাবে—এই আশায় বাবা দলের কাউকে কিছু না বলে একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন রাত্রে। যে লোকটা গোপনে খবর দিয়েছিল,-.সেই হয়েছিল পথপ্রদর্শক। ওই অঞ্চলেরই একজন লোক। সে-ই এই জঙ্গলে এনে ঢুকিয়েছিল। সে যে ডাকাতদের গুপ্তচর তা পরে বোঝা গেল। অতীতের সেই ভীষণ কয়েকটা ঘণ্টা আবার ফিরে এল যেন, ডানার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল বার বার। জঙ্গলের তীব্র গন্ধটা আবার অনুভব করতে লাগল সে যেন প্রত্যক্ষ চেতনায়.....সেই রুক্ষ পাথরটা সে যেন আবার স্পষ্ট দেখতে পেলে। পাথরটার আড়ালে অনেকক্ষণ বসে ছিল সে। কোনও হিংস্র জন্তু কিন্তু আসেনি। কেবল সাপের মতো কি যেন একটা চলে গিয়েছিল পাশ দিয়ে, সাপ হোক, যাই হোক, কিছু বলেনি। দংশন করল বিবেক। বিবেকের দংশনে অধীর হয়েই সে বেরিয়ে এল পাথরের আড়াল থেকে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। ডাকাতদের দল চলে গেছে নাকি? সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে মেরে এগুতে লাগল সে। চারিদিকে অন্ধকার, কিছু দেখা যাচ্ছে না, কোনো শব্দ নেই। একটু এগিয়ে হতাশ হয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল। চোখ বুজে এল আবার, সজাগ হয়ে থাকবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও। তারপর হঠাৎ যখন চোখ খুলল তখন সকাল হয়ে গেছে, পাখির ডাকে সারা বন মুখরিত। সে একটু বিস্মিত হল লজ্জিত হল। এত দুঃখে এমন ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যেও ঘুম আসে! কিন্তু এসেছিল। আশ্চর্য! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, উঠে একটু এগিয়েই দেখতে পেলে, তিনটি মৃতদেহ পড়ে আছে সারি-সারি। তার বাবার মায়ের আর ভাইটির। তিনজনেই উলঙ্গ। ডাকাতেরা কাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। স্তম্ভিত হয়ে কতক্ষণ সে যে দাঁড়িয়ে ছিল, তা তার মনে নেই...তারপর কেন যে তাদের ছেড়ে এসেছিল, তাও ভাল মনে পড়ছে না,—হ্যাঁ, পড়েছে, তাদের সৎকারের

ব্যবস্থা করবার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল সে বন থেকে। ভেবেছিল, কাছাকাছি কোনও লোকালয় যদি পাওয়া যায়, তা হলে হয়তো কোনও ব্যবস্থা হতে পারবে। কিছুদূর গিয়ে পথ পেয়েছিল একটা। সেই পথ দিয়ে কিছুক্ষণ চলবার পর একটা মিলিটারি লরি দেখা গেল। হাত তুলতে থামলও সেটা। নির্বিচারে বিনা দ্বিধায় সেইটেতেই উঠে পড়ল সে। 'টমি'তে ভর্তি ছিল। একটু দূরে গিয়ে একটা গ্রামে ঢুকেই নেবে পড়তে হয়েছিল। 'টমি'দের ন্যক্কারজনক অতি আপ্যায়ন সহ্য করতে পারছিল না সে। মনে হয়েছিল, এরাই সভ্যতার বড়াই করে? এদের দেশের মিস মেয়ো নাক তুলে কথা বলে? গ্রামে দেখা হল কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে শবদেহগুলির সন্ধান করে সৎকার করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাকে সাহায্য করলেন অনেক এবং একটা ট্রেনে তুলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। বললেন, এই ট্রেনটায় না গেলে ভবিষ্যতে আর যাওয়াই হবে না সম্ভবত। তাঁরা প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন কি না কে জানে!

দুম দুম দুম দুম—আবার বন্দুকের আওয়াজ হল। হাঁসের কলরব বেড়ে উঠল যেন। উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল ডানা। এখানেও ডাকাত পড়বে নাকি? নির্জন নদীতীরের পড়ো বাড়িতে অসম্ভব নয় কিছু। কিন্তু কি লোভে আসবে এখানে ডাকাত! বাড়িটা পড়ো—সেও তো নিঃস্ব। পরমুহূর্তেই মনে হল সে যে নিজেই একটা লোভনীয় বস্তু। সোনা-রুপো, মণি-মাণিক্য, জরি-জহরতের চেয়েও ঢের বেশি মূল্যবান। তার অঙ্গ অলঙ্কৃত করবার সুযোগ পায় বলে তো মূল্য ওসবের। তাকে কেন্দ্র করেই তো উতলা হয়েছে মানুষের বাসনা যুগে যুগে...রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড—মহাকাব্য মহাযুদ্ধ—সবই তো তাকে কেন্দ্র করেই। দানব-মানব-দেব সবাই লোলুপ আগ্রহে চেয়ে আছে তারই দিকে। 'টমি'গুলোর কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল ইরানী সেই ভদ্রলোকের দৃষ্টি....ভয় নয়, একটা সূক্ষ্ম গর্ব তার সারা মনে সঞ্চারিত হতে লাগল ধীরে ধীরে। বিছানার উপর হাঁটু মুড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসেছিল সে। হাত দুটি কোলের উপর ছিল। হঠাৎ সে হাত দুটি তুলে এলায়িত কুন্তলটা ঠিক করে নিলে..... ক্ষণিকের জন্যে অনুভব করলে আয়নার অভাব...তারপর উৎকর্ণ উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল দ্বারের দিকে! অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে একটা। তার গণ্ডে অলকে গ্রীবাভঙ্গীতে তার অজ্ঞাতসারেই ফুটে উঠল বিজয়িনীর মাধুরী-মহিমা!...মানুষের গলার শব্দ—হ্যাঁ, একাধিক মানুষের।

"আমাদের ভাগ্য ভাল। অনেক রকম পাওয়া গেছে। গীজ যে পাওয়া যাবে তা আশাই করিনি।"

ডানা উঠে এসে জানালাটা খুলে দিলে। জানালার নীচেই খানিকটা বাগানের মতো ছিল এক কালে। সেখান থেকে সিঁড়ি নেবে গেছে নদীর তীরের দিকে। সেখানে বাঁধানো চাতাল আছে একটা, লোহার বেঞ্চিও আছে খান কয়েক। সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন, ডানা দেখতে পেলে। একজনের হাতে প্রকাণ্ড একটা পেট্রোম্যাক্স্-জাতীয় আলো। টর্চও প্রত্যেকের হাতে। তাদের মুখ দেখা না গেলেও কথা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল!

"কটা কি পাওয়া গেল গুনে দেখবে না?"—গলার আওয়াজে ডানা বুঝলে রূপচাঁদবাবু।

বৈজ্ঞানিক সোৎসাহে বললেন, "বেশ তো।"

নিজেই গুনতে শুরু করলেন।

"নাকি হাঁস পাঁচটা, লালশর গোটা তিনেক, বারহেডেড গীজ চারটে।"

"গীজের দেশী নাম নেই কোনও?"—কবি প্রশ্ন করলেন।

"রাজহাঁস বলে অনেকে। ও, আপনাকে সব দেশী নাম বলতে হবে বুঝি? গড! এই পাঁচটা হচ্ছে লেসার হুইস্লিং টীল, মানে শরাল হাঁস বলা হয় যাকে।"

কবির দিকে চেয়ে হাসলেন বৈজ্ঞানিক।

মুঙ্গি পাশে দাঁড়িয়েছিল, বললে, "এখানে সিল্হি বলে।"

বৈজ্ঞানিক ঝুঁকে আরও কয়েকটা হাঁস আলাদা করতে করতে বললেন, "এগুলো হচ্ছে ব্রাহমিনি ডাক্স—মানে চখা। এ পাঁচটা হচ্ছে আর এক জাতের লালশর, আর এগুলো সব টীল—কয়েক রকমই আছে দেখছি। বাইজোভ—পীনটেলও পাওয়া গেছে দেখছি। এটা কী? স্মিউ—বাঃ, চমৎকার! এটাকে স্টাফ করাতে হবে।"

কবি ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন জানলার দিকে।

"উনি উঠেছেন দেখছি।"

বৈজ্ঞানিক জিব কাটলেন অপ্রস্তুত মুখে।

"ছি ছি, অন্যায় হয়ে গেছে। আমার মনেই ছিল না। ছি খুব অন্যায় হয়েছে।"

রূপচাঁদের অধরে এমন অদ্ভুত একটা হাসির আভাস ফুটে উঠেছিল যার সম্যক অর্থ করা একটু কঠিন। চতুরতা, ব্যঙ্গ, লোভ, আঘাত-ঔদাসীন্য এবং আরও অনেক কিছুর সমন্বয় তা।

কবি বললেন, "উঠেই পড়েছেন যখন, তখন চলুন না, যাওয়া যাক বারান্দার ওপর। এখানে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকার দরকার কী?"

"কোনও অর্থ হয় না"—বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন।

"না না, সেটা কি ঠিক হবে?"—বৈজ্ঞানিক প্রতিবাদ করলেন তাড়াতাড়ি। "এত রাত্রে একজন ভদ্রমহিলাকে এমনভাবে বিব্রত করা, বিশেষত তাঁর সঙ্গে যখন আলাপ নেই মোটে। হয়তো ভাবতে পারেন যে, আমরা তাঁর দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে—"

"আপনারা শিকার করতে বেরিয়েছিলেন বুঝি!"—কপাট খুলে বেরিয়ে এল ডানা।

"অনেক পাখি মেরেছেন তো? কি ওগুলো—সব হাঁস নাকি?"

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টি। ডানার এই অতিসাধারণ প্রশ্নের অন্তরালে তিনি যেন বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসুর আকৃতি প্রত্যক্ষ করলেন।

"শুনবেন ওদের পরিচয়?"

"বেশ তো।"

"এই মুঙ্গি, নিয়ে আয় ওগুলোকে বারান্দার ওপর।"

সবাই এগিয়ে গেলেন বারান্দার দিকে। মুঙ্গি হাঁসগুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে সাজাতে লাগল। এক ধারে একটা ভাঙা টুল ছিল, তার ওপরে রাখা হল পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনটা।

"যে বেঞ্চিটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা কোথায়?"—রূপচাঁদ প্রশ্ন করলেন ডানাকে।

"ভিতরে আছে। বার করব?"

"আপনি করবেন কেন? আমরা করছি"—তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন কবি। রূপচাঁদও গেলেন। দুজনে মিলে বার করে নিয়ে এলেন বেঞ্চিটাকে। কবি যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, আরব্য উপন্যাসের একটা রজনী যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে হঠাৎ। তিনি যেন হারুন-অল-রসিদ। অনেকক্ষণ থেকেই একটা অস্পষ্ট ভাব তাঁর মনে সঞ্চরণ করছিল। হঠাৎ সেটা কবিতার রূপে মূর্ত হল।

উতলা রজনী কিসের গন্ধে,
গভীর রাতের গোপন ব্যথায়
অতনু শিল্পী অশোনা ছন্দে
কি রাগিণী গাহে অরূপ গাথায়।
এ কি অশ্রুত মোহন ছন্দ
এ কি অস্ফুট গোপন গন্ধ
কোন্ কাননের এ অচেনা ফুল
এ কবিতা লেখা কাহার খাতায়।
মদির হয়েছে নিবিড় রজনী
অধীর হয়েছে কবির চিত্ত
অসম্ভব কি হবে সম্ভব?
চির-অনিত্য হবে কি নিত্য?
হয়তো খুলিবে দুয়ার বন্ধ
হয়তো দৃষ্টি লভিবে অন্ধ
প্রত্যাশা-ভরা আকুল 'হয়তো'
অন্ধকারকে ছন্দে মাতায়।

ডানা কবির দিকে চেয়ে বললে, ''বসুন।''

''আপনি বসুন আগে''—সন্ত্রমসহকারে উত্তর দিলেন কবি।

ডানা বসল গিয়ে। ডানা বসতেই রূপচাঁদও বসে পড়লেন তাঁর পাশে। ঈষৎ ইতস্তত করে সসঙ্কোচে কবিও বসলেন আর এক পাশে।

বৈজ্ঞানিক হাঁসগুলোকে আবার শ্রেণীবিভাগ করে সাজিয়ে ফেলছিলেন। সাজানো হয়ে যাবার পর উপবিষ্ট শ্রোতাদের দিকে চেয়ে হাতে হাত ঘষে বললেন তিনি, ''সত্যিই কি হাঁসের বিষয় কিছু শুনবেন আপনারা? ভাগ্যক্রমে এক সোয়ান (Swan) ছাড়া আর সব রকমই পাওয়া গেছে দেখছি, এমন কি ড্যাবচিক (Dabchick) মানে পানডুবি পর্যন্ত, যা অনেকে টীল বলে ভুল করে।''

''বেশ তো, বলুন না''—ডানা বললে।

''বলবার আগে হাঁসের সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু বলা দরকার। জলচর পাখিমাত্রেই হাঁস নয়। হাঁসের কয়েকটা লক্ষণ আছে। ঠোঁট সোজা, ঠোঁটে দাঁতের মতো খাঁজ-খাঁজ আছে ওপরে নীচে দু জায়গাতেই, পায়ের গোছ খুব লম্বা নয়, পায়ের সামনের তিনটে আঙুল জোড়া, আর একটা ছোট্ট আঙুল পেছনের দিকে আছে। এই দেখুন পানকৌড়ির পায়ের আঙুল জোড়া নয়; যদিও সাঁতার কাটবার জন্যে প্রত্যেক আঙুলে (web) আছে। হাঁসের শ্রেণীবিভাগ নানা রকম আছে। কিন্তু ফিন (Finn) সাহেব মোটামুটি চেনবার জন্যে যে ভাগটা করেছেন সেটা মন্দ নয়।''

রূপচাঁদ ডানার কানে ফিসফিস করে বললেন, ''লম্বা লেক্‌চার ঝাড়বেন বলে মনে হচ্ছে।'

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার হাঁসগুলোকে দেখছিলেন। রূপচাঁদের কথা শুনতে পেলেন না তিনি। হঠাৎ ফিরে শুরু করলেন বক্তৃতা।

''ফিন সাহেব হাঁসদের চারটে ভাগ করেছেন—Swan, Goose, Mergansers, Ducks,

Swan এ দেশে প্রায় দেখা যায় না। এদের বিশেষত্ব হচ্ছে আকারে বড়, গলাটা খুব লম্বা। Goose-এর গলাও লম্বা, কিন্তু এদের নাকের ছ্যাঁদাটা ওপর-ঠোঁটের ঠিক মাঝামাঝি আছে। বার-হেডেড গুজের এই দেখুন। দেহের এবং গলার তুলনায় মাথাটা ছোট। ঠোঁটও ছোট এবং একটু কম চওড়া। হাঁসদের ঠোঁটের মাঝখানে একটা নখের মতো থাকে, এই দেখুন। এদেরটা একটু বড় হয়। ঠোঁটের খাঁজও দাঁতের মতো, ঘাস কাটবার উপযোগী। এরা সাধারণত নদীর ধারে চরে বেড়ায় কিনা। এদের গায়ের রঙেরও বিশেষত্ব আছে। হয় বাদামী গোছের, না হয় পাঁশুটে, আর প্রত্যেক পালকের ধারটা একটু ফিকে রঙের, সেই জন্যে সর্বাঙ্গে একটা ডুরে-ডুরে ভাব। এরা সাধারণত উত্তর-মেরুতে থাকে। শীতকালেও বড় একটা দক্ষিণ অঞ্চলে আসে না। তবে আমাদের দেশে এই Bar-headed Goose ছাড়া আর এক রকম Grey Goose দেখা যায় শীতকালে। গীজ আরও আছে কয়েক রকম। Red-breasted Dwarf, White-fronted, Pink footed তবে এ দেশে দেখা যায় না বড়। এদের সকলেরই পা হয় হলদে, আর একটু লম্বা গোছেরই, কারণ ডাঙায় হেঁটে বেড়াতে হয় কিনা। হাঁসদের তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে Mergansers। এদের বিশেষত্ব সরু ছুঁচলো ঠোঁট, নাকের ছ্যাঁদা মাঝখানে নয়, wind-pipe-এর নীচের দিকে ফাঁকা একটা কৌটোর মতো জিনিস থাকে, Bulla Ossea। এরা খুব সাঁতার কাটে, ভাল ডাইভারও। মাংসে আঁশটে গন্ধ। এরা সাধারণত আমিষ-ভোজী। এদের জাতের আমরা একটা পেয়েছি—স্মিউ (Smew)। এরাও সাধারণত আসে না এ দেশে। তারপর আসুন, চতুর্থ শ্রেণীর হাঁস—Ducks। এদের বিশেষত্ব গলা লম্বা নয়, নাকের ছ্যাঁদা মাঝখানে নয়—except in golden eye–ঠোঁটও ছুঁচলো নয়। এরা অনেক রকম species-এর হয়—ঊনত্রিশ রকম। এইগুলোই সাধারণত দেখি আমরা। ফিন সাহেব এদের আবার তিন ভাগ করেছেন। এক ভাগ ডাইভিং—এরা প্রায় জলেই থাকে, দ্বিতীয় ভাগ Pedestrian and Perching–অর্থাৎ ডাঙাতেও আসে মাঝে মাঝে, গাছেও দেখা যায়। আর তৃতীয় ভাগ হচ্ছে Surface feeders । এরা সাধারণত জলে ডুবে খাদ্য সংগ্রহ করে না, কিংবা গাছেও চড়ে না।"

"সংক্ষেপ করুন"—রূপচাঁদ বললেন। তারপর তিনি ডানার কানে কানে কি বলতেই ডানা উঠে পড়ল এবং বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে বললে, "এক মিনিট। আসছি এক্ষুণি"-- বলেই চলে গেল ভিতরে।

"কেন, কি হল?"—বিস্মিত বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন।

"একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বললাম। চায়ের সব সরঞ্জাম কিনে দিয়ে গেছি। চা হলে আরও জমবে।"

বৈজ্ঞানিক মুচকি হাসলেন একটু। যদিও ফাল্গুন মাস পড়ে গেছে, তবু শেষরাত্রে বেশ শীত এখনও। একটু গরম চা পেলে যে ভালই হয়, এ কথার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারলেন না তিনি। কিন্তু বাধা পড়াতে তিনি যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, তা তাঁর হাসি থেকেই বোঝা গেল। হেঁট হয়ে আবার পাখিগুলোই সরিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগলেন তিনি।

কবি একদৃষ্টে মৃত হাঁসগুলির দিকে চেয়েছিলেন। বিচিত্র-পক্ষ পাখির দল। কি সুন্দর! উন্মুক্ত ডানায় উড়ে বেড়াত নীল আকাশের নীচে। আর উড়বে না। বৈজ্ঞানিকের সত্যসন্ধানের এই পথটাই কি ঠিক পথ? কেটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে কতটা খবর পাওয়া যায়! তা ছাড়া সত্য কি কেবল চোখে দেখবার জিনিস? অমরবাবুর বিজ্ঞানচর্চার এই সব নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে

আগে আগে খুব কষ্ট হত তাঁর। এখন আর হয় না। সহ্য হয়ে গেছে। হঠাৎ নিজের মনের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। এখন শুধু যে কষ্ট হচ্ছে না তা নয়, আনন্দ হচ্ছে। এই মৃত মরাল-মরালীর স্তূপের উপর পা রেখেই তো তিনি উঠতে পেরেছেন মানসীর মন্দিরে এই নিবিড় নিশীথে। এই হাঁসগুলো না মরলে কি সম্ভব হত এই নৈশ অভিযান? দেবী-পূজায় এরা বলি। নতুন দৃষ্টিতে স-সম্ভ্রমে চেয়ে রইলেন তিনি মরা হাঁসগুলোর দিকে। রাজহংসটার দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। হঠাৎ মনে পড়ল, ব্যাধশরাহত ক্রৌঞ্চমিথুনই তো আদি কবিতার উৎসব। সেই ক্রৌঞ্চমিথুন কি মরেছে? ওই রাজহংসটাকে মৃতের দলে ফেলে দিলে তো সব ফুরিয়ে গেল। ও মরেনি, চিরকাল ও প্রেরণা যোগাবে কবির মনে! কবিতা জাগতে লাগল ধীরে ধীরে। তন্ময় হয়ে ছন্দের মালা গাঁথতে লাগলেন তিনি।

রাজহংস আকাশচারী
　　নীল আকাশের বার্তা যাচে
নীল আকাশের খবর কি চাও?
　　তাও তো পাবে তাহার কাছে।
স্বচ্ছ নদীর সবুজ মাঠের
মানস-সরের অচিন ঘাটের
গোপন কথা সেই তো জানে
　　ফল যে খোঁজে কল্প-গাছে।
হিমালয়ের তুঙ্গ চূড়ায়
　　মহাদেবের জটায় পাকে
কলস্বরা গঙ্গা যেমন
　　সোহাগ ভরে জড়িয়ে থাকে
সন্ধ্যা-ঊষায়, তড়িৎ জ্বালায়
ইন্দ্রধনুর বর্ণমালায়
চন্দ্রতারার স্বপ্নলোকে
　　রূপ ঢালা হয় কিসের ছাঁচে
সেই তো জানে সরস্বতীর
　　পায়ের তলায় কি রঙ আছে।

রূপচাঁদ একটি সিগারেট ধরিয়ে চতুর্দিক ধূমাচ্ছন্ন করে কি যে ভাবছিলেন, তা তিনিও বুঝতে পারছিলেন না স্পষ্ট করে। একটা কুয়াশাচ্ছন্ন অজানা পথের প্রান্তে সংশয়াকুলিত চিত্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি যেন। স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আশা করছিলেন পাবেন!

।। আট ।।

ডানা ভিতর থেকে এসে আবার বসল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলেন বৈজ্ঞানিক—

"এইবার আমরা যে সব হাঁস পেয়েছি, সেইগুলোকে দেখি আসুন। এই যে পাঁচটা দেখছেন এগুলো হল Lesser Whistling Teal–বাংলায় শরাল হাঁস বলে, হিন্দী সিল্‌হী। এরা হচ্ছে Ducks যারা Pedestrian এবং Perching, অর্থাৎ হেঁটে বেড়াতে পারে, গাছেও চড়ে। এদের সঙ্গে Goose–এর খানিকটা সাদৃশ্য আছে। এদের ঠোঁট এবং গোছ প্রায় সমান হয়। স্ত্রী পুরুষ দেখতে এক রকম, গায়ে বেশ রঙ আছে। Whistler চার রকম হয়। এগুলো হচ্ছে Lesser Whistling Teal, Large Whistlerও আছে এক রকম। আরও দু' রকম আছে—Wandering Whistler এবং Spotted Whistler—তারা এ দেশে আসে না, East Indies—এ থাকে। হুইস্‌লার ছাড়াও আরও কয়েক রকম Pedestrian Perching হাঁস আছে, যেমন চখা—আমরা পেয়েছি; নাকি হাঁস—আমরা পেয়েছি। Common Sheldrake—শাহ্ চখা এ দেশে আসে না প্রায়, Cotton Teal—পেয়েছি, বাংলায় এদের বলে ঘাংরিয়েল, হিন্দী গিররি। সবচেয়ে ছোট Duck এরা। শীতকালে খুব আসে। এ দেশে থাকেও। এ দেশে ডিমও পাড়ে। এদের শ্রেণীতে আরও দু' রকম আছে, Wigeon আমরা পাই নি, আর Mandarin Ducks এ দেশে আসেই না। আচ্ছা, আর কি কি Ducks পাওয়া গেছে দেখা যাক—Pedestrian Perching-এর মধ্যে Lesser Whistling Teal, চখা, Cotton Teal."

রূপচাঁদ আর একটি সিগারেট ধরালেন।

কবি বললেন, "Pedestrian Perching-এর বাংলা করুন কিছু। বড় খটমট শোনাচ্ছে। আমি ভেবে একটা ঠিক করেছি। Swan-গুলোকে মরাল, Goose-দের রাজহংস, Mergansers না কি বললেন—"

"হ্যাঁ। আমরা একটা পেয়েছি,—এই যে, স্মিউ (Smew)।"

"চমৎকার দেখতে তো!"

"চমৎকার। এদের আরও দু রকম আছে, Goosander আর Red-breasted Merganser, সে দুটো দেখতে আরও চমৎকার। এরা বরফের দেশে সমুদ্রের জলে থাকে, এ দেশে আসে না। এদের স্ত্রী-পুরুষ আলাদা আলাদা রঙের হয় আর দুজনেই দেখতে সুন্দর।"

কবি বললেন, "তা হলে এদের বিচিত্র-হংস নাম দেওয়া যেতে পারে এবং Duck-দের শুধু হংস।"

"বাঃ তা হলে তো চমৎকার হয়। Ducks-দের মানে হংসদের তিনটে ভাগ আছে—Diving Ducks, Pedestrian and Perching এবং Surface Feeding Ducks."

কবি বললেন, "Diving Ducks ডুবুরি হাঁস, Pedestrian and Perching-দের ভূমিচর ও তরুচর বললে মন্দ কি! Surface Feeding Ducks কি রকম?"

"তারা খাদ্য সংগ্রহের জন্যে ডুবও দেয় না, কিংবা গাছেও চড়ে না। এরা জলের ওপর থেকে কিংবা মাঠে যা সামনে পায় খায়। শভলারের (Shoveller) ঠোঁট তো অদ্ভুত, জলে ঠোঁট ডুবিয়ে যা পায় শুষে নেয়।"

"তা হলে এদের সম্মুখভোজী বলুন, সামনে যা পায় খায়।"

"হ্যাঁ, বেশ হবে।"

ডানা কতকগুলো হাঁসকে দেখিয়ে বললে, "ওইগুলো টীল বললেন না?"

"হ্যাঁ ওগুলো কটন টীল। টীল মানে ছোট হাঁস। এ অনেক জাতের আছে। এই এগুলো দেখুন— Lesser Whistling Teal, এই দেখুন এদের ল্যাজের ওপর দিকে মেরুন রঙের ছোপ রয়েছে। Large Whistling Teal-এর ক্রীম রঙ থাকে এখানটায়। তা ছাড়াও এ দুটোও দেখুন Teal কিন্তু এরা ও-জাতের নয়, এরা হল আনন্দবাবুর নামকরণ অনুসারে সম্মুখভোজী, কমন টীল (Common Teal) যাকে বেলে হাঁস বলে। সম্মুখভোজীদের দশ রকম আছে। তার মধ্যে পাঁচরকমের স্ত্রী-পুরুষ অনেকটা একরকম দেখতে— Wood-Duck. Pink Head, Marbled Teal. Shoveller, Pintail। আমরা Pintail পেয়েছি। এর কথা পরে বলছি। স্ত্রী পুরুষ দেখতে আলাদা আলাদা—Mallard, Gadwal, Bronze cap Teal। এই Teal তিন রকম। Common Teal, Andaman Teal আর Oceanic Teal। শেষের দুটো এ দেশে পাওয়া যায় না। আমরা পেয়েছি কমন টীল। আর এক রকম আছে—Garganey। এদের Blue-winged Teal-ও বলে। এটা কি?—বাঃ চমৎকার! একটা Spot-bill-ও পেয়েছি দেখছি, এও হচ্ছে Mallard জাতের, Indian Mallard বলে কেউ কেউ, এর বিশেষত্ব— দুটো কমলা রঙের ফোঁটা ঠোঁটের দুপাশে কপালের কাছে। আর ডগাটা হলদে। এই দেখুন। পালকের প্যাটার্নটা অনেকটা আঁশ-আঁশ গোছের—সুন্দর, নয়?"

"ওগুলো কি বললেন?"—ডানা প্রশ্ন করলেন।

"নাকি হাঁস—Comb-Duck। এরা হচ্ছে Pedestrian and Perching, কি নাম করলেন এর আনন্দবাবু?"

"ভূমিচর ও তরুচর। একসঙ্গে ভূ-তরু-চরও করা যায়।"

"মন্দ নয়। চলতি ভাষায় এদের 'নাকটা' বলে। এদের পুরুষদের নাকের কাছে একটা উঁচু ঢিবির মতো থাকে, দেখতে পাচ্ছেন? Breeding Season-এ এটা আরও উঁচু হয়ে ওঠে। অধিকাংশ হাঁসই শীতের সময় এ দেশে আসে, এরা কিন্তু এ দেশেরই বাসিন্দা। ডিমও পাড়ে এ দেশে, গাছের গুঁড়ির ফাটলে বা গর্তে ডিম পাড়ে।"

কবি বাধা দিলেন।

"ডিমের কথা যাক্‌ এখন। পাখিদের পরিচয় শেষ করুন আগে।"

"আচ্ছা বেশ, ডিম নিয়ে আর একদিন আলোচনা করা যাবে। ও নিয়ে প্রবন্ধই লেখবার ইচ্ছে আছে একটা।"

ডানা আর একটা হংস-স্তূপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "এগুলো কি?"

"এ দেশে ওগুলোকে লালশর বলে। অর্থাৎ লাল মাথা। কিন্তু মজা আছে, সবগুলো এক জাতের নয়। Diving Ducks, মানে ডুবুরি-হংসদের মধ্যে যেগুলো লালশর তাদের Pochard বলে। তিন রকম আছে—Red-crested Pochard, বাংলায় এদের পুরুষটাকে অনেক জায়গায় দুমার বা ডুমার বলে। এদের পাও হয় লাল বা অরেঞ্জ। এরা শুধু ডুব-সাঁতারই দেয় না, মাঠে চরেও। এদের সকলেরই সাদা রঙের Wing-Bar আছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার লালশর—Red-headed Pochard-এর এই Wing-Bar নেই।"

"Wing-Bar কি আবার?"

"এই যে ডানার এই পালকগুলোকে Wing-Bar বলে। Red-headed Pochard-এর এটা নেই। ডুবুরি-হাঁসদের মধ্যে এই হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর লালশর। এদের বাংলায় ভূতিহাঁসও

বলে, ইংরেজী White-eyed Pochard। এদের পুরুষগুলোর চোখের বিশেষত্ব সাদা চোখ। এদের পেটের নীচেও একটা সাদা ওভাল (oval) প্যাচ আছে, এই দেখুন। যখন ওড়ে তখন দেখা যায়। ডুব-সাঁতার কাটতে এরা প্রায় অদ্বিতীয়। ডানায় এক-আধটা ছররা লাগলে এদের ধরা শক্ত। এমন ডুব-সাঁতার কেটে কেটে লুকিয়ে বেড়াবে যে, পাত্তাই পাওয়া যাবে না। এরা নির্জন স্থানেই থাকতে ভালবাসে। ধানের ক্ষেতেও চরতে দেখেছি ভোরবেলা। উত্তর-মেরুর কাছাকাছি জায়গা থেকে এরা প্রতি বছর শীতের সময় আসে এ দেশে। এই তো গেল ডুবুরিদের মধ্যে, লালশর ভূমি-তরু-চরদের মধ্যেও আছে। Wigeon-এর উল্লেখ আগেই করেছি, Wigeon-কেও কোথাও কোথাও ছোট লালশর বলে। আর এইটে দেখুন, ইনি হচ্ছেন সম্মুখভোজী, একেও লালশর বলে, কিন্তু ইনি হচ্ছেন Pink-headed Duck। গোলাপী লালশরও বলে কেউ কেউ। কি চমৎকার রঙ দেখেছেন! এ কিন্তু একেবারে এদেশী পাখি। ওয়াঘাঃ ওয়াঘাঃ ওয়াঘাঃ—এই ধরনের ডাক—আর একটা কথা বলে নি—শুধু লালশর নয়, নীলশর—সবুজশরও আছে। ডুবুরি হাঁসদের মধ্যে যাকে Eastern White-eye বলে, তার মাথা হচ্ছে Dark glossy green। এ দেশে আসে না। পুলিনবিহারীদের মধ্যে নীল বা সবুজ মাথা নেই তেমন। সম্মুখভোজীদের মধ্যে আছে, Mallard-এর মাথা সবুজ, হিন্দীতে কিন্তু নীলশির বলে।"

ডানা মুখের সামনে বাঁ হাত রেখে হাই তুলতেই বৈজ্ঞানিকের মনে হল, বিষয়টা বোধ হয় হৃদয়রোচক করতে পারছেন না তিনি। ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়ার মতো হয়ে যাচ্ছে। অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। একটা হাঁস তুলে বললেন, "আচ্ছা, ওটার কি বিশেষত্ব চোখে পড়ছে কোনও?"

সকলের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন, কোনও উত্তর বা উত্তরের আভাস কারও মুখে দেখতে পেলেন না। রূপচাঁদ গুম হয়ে বসে ছিলেন তাঁর ধূমাচ্ছন্ন চিন্তালোকে। বৈজ্ঞানিকের কথা তাঁর কানে যাচ্ছিল কি না সন্দেহ। উন্মনা কবি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক চিন্তায় আবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মনে পড়ছিল রঘুবংশ। ইন্দুমতী যখন স্বয়ংবরসভায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ মানসে প্রত্যেক রাজাই বিভিন্ন রকম প্রয়াস পেয়েছিলেন। কেউ আন্দোলিত করেছিলেন লীলাকমল, কেউ ঘাড় বেঁকিয়ে কেয়ূরের প্রান্ত-লগ্ন-মালাটি ঠিক করেছিলেন, কেউ কনক-পাদপীঠে নখরাঘাত করে করেছিলেন ইঙ্গিত, অঙ্গুলি আন্দোলন করে রত্নাঙ্গুরীচ্ছটায় মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন কেউ, কেউ নিজের রত্নশোভিত মুকুটে হাত দিয়েছিলেন, কেউ বামস্কন্ধ ঈষৎ উন্নমিত করে প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর বৃষস্কন্ধ, কেতকীপত্র ছিন্ন করেছিলেন কেউ অধীরচিত্তে। কিন্তু এর কোনটাই তো সম্ভব নয় এখন। তাঁর মনে হচ্ছিল স্বয়ংবরসভাতেই এসেছেন তিনি, ইন্দুমতীও এসেছেন, কিন্তু কি করে তাঁকে মনোভাব জানাবেন! এ কি অদ্ভুত পরিস্থিতি!

বৈজ্ঞানিকের কথায় চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল তাঁর। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, অমরবাবু একটা মরা হাঁস তুলে ধরে আছেন। চকোলেট রঙের মাথাটা ঝুলে পড়েছে একধারে। ডানাটা বিচিত্র! অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ।

ডানা বললে, "ওর ল্যাজটা একটু বেশি ছুঁচলো মনে হচ্ছে।"

"ঠিক বলেছেন। এর নামই পিন-টেল (Pintail)—এর ল্যাজের জন্য। বাংলায় এর নাম

হচ্ছে দিগ-হাঁস, শোলঞ্চও বলে কেউ কেউ। পশ্চিমেরা বলে সিংক-পার। এর মাংস খেতে খুব চমৎকার। এরা আসে উত্তরমেরু থেকে। এখানে কটন টিলকে অনেকে দীঘৌচ বলেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এইগুলোই দীঘৌচ। বাংলা দিগ-হাঁসের সঙ্গে বেশ মিল হয়। না? এটা পুরুষ, মেয়েটা এত সুন্দর নয়। মাথায় এ রকম চকোলেট রঙ নেই, এ রকম Bronze-green, Wing-Barও নেই।"

একটু হেসে তারপর বললেন, "পক্ষীসমাজে পুরুষরাই বেশি অলঙ্কৃত।"

বলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

"সব সময় অবশ্য নয়। প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের মেয়েটাও কম সুন্দর নয়। তা ছাড়া, এই হাঁসেদের মধ্যে যাদের Mergansers বললাম, আনন্দবাবু যাদের বিচিত্র-হংস নাম দিলেন, তাদের Female-গুলো চমৎকার। এই যে স্মিউটা দেখছেন, এর সঙ্গিনীও কি কম সুন্দর? তার মাথাটা বাদামী, কালো নয় এর মতো। Goosander-ও তাই। শাহ চখার স্ত্রী-পাখিটাই বোধ হয় বেশি সুন্দর। সাধারণ চখার স্ত্রী-পাখিটার গলায় কেবল কণ্ঠী নেই, কিন্তু আর সবই এক। মানে—"

অপ্রস্তুত মুখে চুপ করে গেলেন। যদিও এটা অবিসম্বাদিত সত্য যে পক্ষী-সমাজে পুরুষরাই বেশি সুন্দর, তবু নিজে পুরুষ হয়ে একজন মহিলার সামনে জোর গলায় তা প্রকাশ করার মধ্যে কেমন যেন একটু অভব্যতা প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথাটা স্পষ্টভাবে মনে হওয়ামাত্র সব গুলিয়ে গেল তাঁর।

"সবচেয়ে বড় হাঁসটা কি বললেন?"—ডানাই প্রশ্ন করলে আবার।

"ও, ওটা বার-হেডেড গুজ (Bar-headed goose), এটাও পুরুষ। স্ত্রীদের মাথায় এই কালো দাগটা থাকে না। এদের গায়ের রঙ ডগমগে নয়, দেখেছেন? বেশ আভিজাত্য আছে। এদেরই আর একটা জাত এ দেশে আসে, তাদের Grey Lag বলে। তাদের গায়ের ধূসর বর্ণ একটু বেশি। Grey Lag-এর বাংলা হচ্ছে কলহংস, সংস্কৃত কাদম্ব। এরা যখন আকাশে ওড়ে, মনে হয় মালা উড়ে যাচ্ছে একটা। অনেক সময় লম্বা রেখায় ওড়ে, অনেক সময় আবার V-shaped, চমৎকার দেখায়। ডাকও চমৎকার। এরা নিশাচর। দিনের বেলা বিশ্রাম করে, রাত্রে চরতে বেরোয়। দল বেঁধে আকাশপথে উড়ে যায় তখন ডাকতে ডাকতে। একজন ইংরেজ লেখক তা শুনে লিখেছেন, থ্রিলিং।"

"তার চেয়ে ঢের ভাল করে বলেছিলেন কালিদাস।"

কবি বলে উঠলেন হঠাৎ। বৈজ্ঞানিক যে বাজে কচকচিতে ডানার সমস্ত মনোযোগ দখল করে রেখেছেন, এ যেন সহ্য হচ্ছিল না তাঁর।

"কি বলেছেন?"

"কামঞ্চ হংসবচনংমণি-নূপুরেষু, মণি-নূপুরের নিক্কণের সঙ্গে তিনি উপমিত করেছেন হাঁসের ডাককে। আমরা যে চোখে রাজহংসকে দেখি, সে চোখে সাহেবরা, দেখতে পারবে না ওকে। আর ওর সঙ্গে জড়িত করেছি দময়ন্তীকে, সরস্বতীকে, যক্ষের বিরহ বেদনাকে, হিমালয়ের স্বপ্নকে, আকাশের অনন্তকে। লীলাঞ্চিতা মদালসার রূপমাধুরী, বধূদুকূল, সন্নতাঙ্গী গৌরীর মঞ্জীরধ্বনি—কত কি জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে! শুধু 'থ্রিলিং' বললে কিছুই বলা হয় না।"

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন, "বিজ্ঞানের ভাষা একটু সংযত কিনা। তার কেবলই ভয় হয়, পাছে সে এমন কিছু বলে ফেলে, যা সে প্রমাণ করতে পারবে না। কাব্যের তো সে দায়িত্ব নেই।"

"কে বললে নেই? কাব্যও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে সত্য যাচাই করবার যন্ত্র আপনাদের কাছে না থাকতে পারে, রসিকের কাছে আছে।"

ডানার চোখের দৃষ্টিতে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল।

"ওগুলো চখা বুঝি? চমৎকার রঙ তো!"

যদিও প্রশ্নটা অবান্তর তবু ডানা দেখলে, প্রশ্ন করা ছাড়া তর্কের মোড় ফিরিয়ে দেবার আর কোনো উপায় নেই।

"হ্যাঁ। ইংরেজীতে বলে ব্রাহমিনি ডাক্‌স্।"

কবি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "সংস্কৃতে চক্রবাক।"

মৃদু হেসে ডানা বললে, "সংস্কৃতে ওর আর একটা নাম বোধ হয় রথাঙ্গনামা। নয়?"

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন কবি।

"আপনি সংস্কৃত জানেন?"

"হ্যাঁ। বি. এ-তে আমার সংস্কৃত ছিল। কালিদাসের শ্লোক মনে আছে এখনও।"

বলেই সে আবৃত্তি করে দিলে—

অত্র বিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নামন্যোন্যদত্তোৎপলকেশরাণি
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্তিনা তে ময়া প্রিয়ে সস্পৃহ মীক্ষিতানি।

আবৃত্তি করেও কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়ল একটু। নিজের বিদ্যা জাহির করার মতো শোনাল যেন। কিন্তু এদের কাছে আত্মপরিচয় না দিয়েও সে পারলে না কিছুতে। মনে হল, কেন দেবে না?

কবি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন শুধু ডানার দিকে। বৈজ্ঞানিকও বিস্মিত হয়েছিলেন। অতিশয় অবহেলাভরে তিনি যে আশ্রয়হীনাকে এই পড়ো বাড়িটাতে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, সে যে হঠাৎ এমন ভাবে কালিদাস আবৃত্তি করতে পারবে, তা তিনি প্রত্যাশাই করেননি। রূপচাঁদও করেননি। শুধু বিস্মিত নয়, চমকে গিয়েছিলেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে একদৃষ্টে তিনি চেয়েছিলেন ডানার দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টি চকচক করছিল।

ডানা সামলে নিয়েছিল নিজেকে।

অতিশয় স্বাভাবিক কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলে আবার, "আচ্ছা কবিরা যে কল্পনা করেছেন, চখাচখীরা সমস্ত দিন একসঙ্গে থাকে কিন্তু রাত্রে দুজনে নদীর দুপারে চলে যায়, এর কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে কি?"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "না! বরং এ নিয়ে ঠাট্টাই করেছেন দু-একজন। তবে দিনের বেলায় যে ওরা একসঙ্গে থাকে, মানে জোড়ায় জোড়া থাকে, তাতে কোনও ভুল নেই। নদীর ধারে গেলেই দেখতে পাবেন।"

বৈজ্ঞানিকের এই কথায় কবি প্রতিবাদ করলেন না। কবি ল্যান্ডরের সেই বিখ্যাত লাইনটা মনে পড়ে গেল তাঁর—I strove with none, because none was worth my strife।

তাঁর মনে হল, এই সব বৈজ্ঞানিকেরা অতি অদ্ভুত রকম শিশু-প্রকৃতির লোক, সামান্য মাটির পুতুল নিয়ে মেতে থাকে, আকাশের দিকে চাইবার অবসর পায় না। উচ্চাঙ্গের ভাবে পরিপূর্ণ হলে মানুষের মুখভাব যেমন হয়, কবির মুখভাব তেমনই হয়ে উঠল। ডানার মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল তাঁর, তিনি নিজেও কি একটা খেলনা দেখে আত্মহারা হয়ে পড়েননি? কিন্তু তখনই তাঁর মন এ অভিযোগের জবাব দিলে কবিতায়। তাঁর মনে গুনগুন করে উঠল—

তুচ্ছ ক্ষুদ্র খেলনা নয় ও
আকাশ নেমেছে উহারই কাছে
নয়নে রয়েছে নীলের আভাস
চাহনীতে ওর বিজলী নাচে
গুচ্ছ গুচ্ছ কালো কেশ-পাশে
নিবিড় মেঘের মহিমা প্রকাশে
মহা-আকাশের অন্ত-হীনতা
ওই তনু-দেহে লুকায়ে আছে।

কবিতাটা আরও কিছুদুর অগ্রসর হত হয়তো, কিন্তু চা এসে পড়ল। রূপচাঁদ একটি কথা বলেননি এতক্ষণ। চা আসাতে ঈষৎ নড়ে চড়ে বসলেন। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ফেলে দিলেন সেটা এবং চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে চা খেতে লাগলেন নীরবে। চা-পর্ব নীরবেই সমাধা হল। বৈজ্ঞানিক একটু ইতস্তত করছিলেন, হংসবিষয়ক বক্তৃতায় অগ্রসর হওয়াটা এর পর শোভন হবে কি না।

কিন্তু ডানাই প্রশ্ন করলে আবার, "আচ্ছা, কালিদাস যে বলেছেন চক্রবাক উৎপল কেশর খায়, তা সত্যি নাকি?"

"জানি না। আমি যতদূর জানি, ওরা সব খায়। গুগলি শামুক পোকা-মাকড়, ছোট ছোট সরীসৃপ, এমন কি মড়া পর্যন্ত।"

"মড়া খায়?"

"আমি নিজের চোখে খেতে দেখিনি। বইয়ে পড়েছি।"

কবি হেসে বললেন, "ঠিকই পড়েছেন। একটা কথা কিন্তু পড়েননি এবং বিজ্ঞানের বইয়ে সম্ভবত তা পাবেনও না। সেটা শুনে রাখুন। যে চখা-চখীরা উৎপল-কেশর খায়, নিশীথে যাদের মাঝখান দিয়ে বিরহের নদী বয়ে যায়, মত্তমাতঙ্গদের সংস্রব বর্জন করে যারা, তাদের নাগাল বৈজ্ঞানিক পায়নি কখনও, শিকারীর গুলিতে মারা পড়েনি সেই হিরণ্য-হংসদম্পতি আজও।"

বৈজ্ঞানিক গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "কিন্তু এক জায়গায় তারা ধরা পড়েছে শুনেছি।"

"কোথায়?"

"কবির কল্পনাজালে।"

রূপচাঁদ বৈজ্ঞানিকের মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে সিগারেট ধরালেন।

ডানার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৌতুকের দীপ্তিতে।

কবি বললেন, "নিশ্চয়।"

তারপর হেসে বললেন কবিতাতে—

"কল্পনা-জাল অল্প না জেনো
নাহিক গণ্ডি পরিধি তার
অবাঙ্ মানস-গোচরও তাহাতে
ধরা পড়ে যায় বারংবার।"

ডানা বলে উঠল, "বাঃ, বেশ কবিতা তো! কার লেখা?"

চুপ করে রইলেন কবি। তাঁর হৃৎপিণ্ডটা বক্ষ-পঞ্জরে মাথা কুটতে লাগল হঠাৎ। কিন্তু মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুল না তাঁর। নীরবে বসে রইলেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "উনিই বানালেন বোধ হয়। চমৎকার কবিতা লিখতে পারেন উনি। পাখি নিয়েই কত কবিতা লিখেছেন।"

"তাই নাকি! দেখাবেন আমাকে? কবিতা বড় ভাল লাগে আমার।"

কবির মনে হল, কল্প-লোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। মন্দাকিনীর কল্লোল শোনা যাচ্ছে, ভেসে আসছে পারিজাতের গন্ধ। ক্ষণিকের জন্য তাঁর চোখের সামনে থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল যেন সব। খানিকক্ষণ পরে যখন আত্মস্থ হলেন, তখন শুনলেন, বৈজ্ঞানিক শরাল-হাঁস আর বালি-হাঁসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে চলেছেন, ডানা নিবিষ্টচিত্তে শুনছে। রূপচাঁদ নীরবে ধূম উদ্‌গীরণ করে নিজের চতুর্দিকে আবার একটা অস্পষ্টলোক সৃজন করে বসে আছেন তার মধ্যে।

হঠাৎ মধুরকণ্ঠে গান গেয়ে উঠল কে যেন অন্ধকারের ভিতর থেকে। সংস্কৃত গান, সেই পুরাতন সংস্কৃত শ্লোকটা—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।।

চমকে উঠলেন সবাই।

রূপচাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল আরও।

বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "এখানে আর কেউ আছে নাকি?"

"আমার তো জানা নেই, আর কেউ আছে। আনন্দবাবু যে চাকরটা দিয়ে গিয়েছিলেন, সে-ই আছে কেবল। ওই যে।"

চাকরটা একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব।

"তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি?"

"না তো।"

"ও তবে কে?"

"জানি না।"

"মুঙ্গি, দেখে আয় তো, আলোটা নিয়ে যা। নদীর ধারে আউট-হাউসটার দিক থেকেই গানটা আসছে মনে হচ্ছে।"

মুঙ্গি আলোটা নিয়ে চলে যেতেই অন্ধকার হয়ে গেল বারান্দাটা। অদ্ভুত অনুভূতিময় অন্ধকার। মনে হল, অন্ধকারের পরতে পরতে যেন অদৃশ্য বিদ্যুৎ সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলছে না, কিন্তু ডানার মনে হচ্ছে, তার চারদিকে যেন আছড়ে পড়ছে অনুক্ত ভাবের অসংখ্য তরঙ্গ। দূরে অন্ধকারের ভিতর থেকে উদাত্ত মধুর কণ্ঠে সংস্কৃত গানটা তখনও

ভেসে আসছিল। হঠাৎ থেমে গেল সেটা। একটু পরেই দেখা গেল, মুন্সি ফিরছে, তার পিছু পিছু আর একটি লোক। লোকটি কাছে এসেই নমস্কার করলে সকলকে। অদ্ভুত চেহারা। খুব লম্বা। মাথায় বড় বড় চুল, মুখে গোঁফ-দাড়ি। খালি পা। গায়ে কালো কম্বল জড়ানো একটা। শ্যামবর্ণ। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং প্রশান্ত। ব্যক্তিটির অসাধারণত্ব লেখা রয়েছে তার চোখের দৃষ্টিতে।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?"

"আমি একজন পথিক। সন্ধ্যাবেলায় এসেছি এখানে। রাত্রের মতো আশ্রয় নিয়েছি ওই পড়ো ঘরটাতে।"

পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিলে। রূপচাঁদ এটা প্রত্যাশা করেননি। আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল তাঁর কপাল।

"কোথা থেকে আসছেন আপনি?"

"সংগ্রামপুর থেকে।"

"সন্ধ্যার সময় সেখান থেকে আসবার কোনও ট্রেন তো নেই।"

"আমি হেঁটে এসেছি।"

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরটা শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। ত্রিশ মাইল হেঁটে আসবার কল্পনাও কেউ করে না আজকাল, বিশেষত ট্রেন আসে যখন সেখান থেকে।

"কোথায় যাবেন আপনি?"—বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন।

"তা ঠিক করিনি এখনও।" তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, "আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, ওই পড়ো ঘরটাতে কাটিয়ে যেতে পারি দিন কতক। নদীর ধারটা ভাল লাগছে বেশ।"

ওই কথায় কবির অন্তর পুলকিত হল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "বাড়ি কোথায় আপনার?"

"কোথাও নেই।"

"কি করেন?"

"কিছুই করি না।"

এর পর কি জিজ্ঞাসা করবেন জিজ্ঞাসা করাটা সঙ্গত হবে কি না—কবি ভেবে পেলেন না। চুপ করে রইলেন।

রূপচাঁদ বললেন, "চলে কি করে আপনার?"

"কি চলবার কথা বলছেন?"

"পেট।"

"পোস্ট-অফিসে আমার কিছু টাকা আছে, তার সুদ থেকে চলে।"

কথাটা বলে যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল লোকটি, পোস্ট-অফিসে টাকা থাকাটা যেন অপরাধ। আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন সবাই। লোকটিই নীরবতা ভঙ্গ করলে।

"আমি যদি কয়েকদিন ওখানে থাকি, আপত্তি আছে কি আপনাদের? যদি আপত্তি থাকে, কাল সকালেই আমি চলে যাব।"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে ইনি এখানে থাকেন, এঁর যদি অসুবিধা না হয়।"

ডানার দিকে চাইলেন তিনি। সকলেই তার দিকে চাইলেন। ডানা দেখছিল লোকটিকে। আপাতদৃষ্টিতে তার লম্বা চুল, কুঞ্চিত ঘন গোঁফ-দাড়ি, গায়ে কম্বল-জড়ানো, খালি পা, দেখলে ভয় হবার কথা। কিন্তু কিছুমাত্র ভয় করছিল না ডানার। একটা অদ্ভুত আশ্বাস যেন ক্ষরিত হচ্ছিল লোকটির চোখের দৃষ্টি থেকে। অতি পবিত্র, অতি নির্মল, অত্যন্ত আনন্দময় একটা জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছিল যেন। ভয় হচ্ছিল না, বরং মনে হচ্ছিল, নির্ভরযোগ্য একটা কিছু পাওয়া গেল। রূপচাঁদ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন ডানার দিকে। চোখাচোখি হতেই তিনি বামচক্ষুটা ঈষৎ বুজে এবং মাথাটা ঈষৎ নেড়ে যে ইঙ্গিতটা করলেন, তার মর্ম ডানা যে বুঝতে পারলে না তা নয়, কিন্তু বুঝতে না পারার ভান করল। বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে সে বললে, "না, আমার কিছু অসুবিধা হবে না। বরং কাছাকাছি একজন ভদ্রলোক যদি থাকেন, ভালই তো।"

আগন্তুক এর পর দাঁড়িয়ে রইল আরও মিনিট খানেক।

তারপর বলল, "এবার আমি যেতে পারি কি?"

বৈজ্ঞানিক তাড়াতাড়ি বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। আপনাকে এমনভাবে ডেকে এনে দাঁড় করিয়ে রাখাটা অন্যায় হয়েছে আমাদের। কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।"

প্রতি-নমস্কার করে আগন্তুক চলে গেলেন। তারপরই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল একটা। পরমুহূর্তেই বোঝা গেল, রাত্রি শেষ হয়েছে, অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। সহসা পাখিরা কলরব করে উঠল একযোগে । ঐকতান-বাদন শুরু হয়ে গেল যেন। মনে হতে লাগল, নাটকের নতুন অঙ্ক আরম্ভ হবে এইবার।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে কবির দিকে ফিরে বললেন, "শুনছেন?"

"কি?"

"ওই যে, ওই যে।"

কবি শুনতে পেলেন এইবার। মধুর গিটকিরিভরা একটা সুর। মনে হল, প্রভাতে আলো যেন কাঁপছে। বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন তিনি। নূপুরের নিক্কণ, বাঁশির সুর, তার মাঝে মাঝে শিস দিচ্ছে যেন কেউ, সেতারের মীড়ের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া আরও কত কি—যা অবর্ণনীয়, মিনতি-ভরা আহ্বান, সোহাগ-ভরা আবেদনের সঙ্গে প্রাণ-ভরা বলিষ্ঠ সঙ্গীতময় পৌরুষের কি অদ্ভুত সমন্বয়।

কবির মুগ্ধভাবটা বৈজ্ঞানিক উপভোগ করছিলেন। যে কৃতিত্বটা তাঁরই, সুরের নয়। উন্মনা কবি উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে ছিলেন স্বচ্ছায়মান অন্ধকারের দিকে, যেন প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করছিলেন অদ্ভুত এই সুর-সমন্বয়কে। আশা করেছিলেন, নিজের অজ্ঞাতসারেই কোনও অপরূপ অপ্সরাকে দেখতে পাবেন বুঝি এইবার। ঘাড় ফেরাতেই চোখাচোখি হল বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে।

তিনি বললেন, "দোয়েল।"

"ও।"

"দেখেছেন কখনও?"

"না।"

"চলুন, দেখিয়ে দিই।"

তারপর ডানার দিকে ফিরে বললেন, "আচ্ছা, চলি এবার আমরা। অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, মাপ করবেন।"

তারপর কবির দিকে ফিরে বললেন, "চলুন।"

সোৎসাহে নেবে পড়লেন দুজনেই বারান্দা থেকে।

মুন্সি মরা হাঁসগুলোকে পুরতে লাগল বোরার মধ্যে।

মুন্সিও যখন চলে গেল তখন রূপচাদ কথা কইলেন।

"আমি অবাক হয়ে গেছি। শুধু অবাক নয়, ভয় পেয়ে গেছি একটু।"

"কেন?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে ডানা।

"আপনার সংস্কৃত শুনে। সত্যি আপনি বি. এ. পাস করেছেন?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাতে ভয় পাবার কি আছে?"

হাসি-ভরা দৃষ্টি মেলে ডানা চেয়ে রইল রূপচাঁদের দিকে।

"সতিাই নেই?"

রূপচাঁদের চোখের দৃষ্টিতেও হাসির ঝলক খেলে গেল একটু।

নিমগাছের একটা উঁচু ডালে বসে ডাকছিল দোয়েলটা। কবি আর বৈজ্ঞানিক দুজনেই বসে ছিলেন একটা ঝোপের ধারে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে। কবি দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন, আর বৈজ্ঞানিক বলে চলেছিলেন ফিসফিস করে—

"আমার মতে কোকিলের ডাক নয়, দোয়েলের ডাকই এ দেশে বসন্তের আগমন ঘোষণা করে। কোকিল তো এ দেশে বারো মাসই ডাকছে। দোয়েল কিন্তু শীতকালে ডাকে না তেমন, বসন্ত পড়লে ডাকে। বাই দি বাই, আমরা যাকে কোকিল বলে থাকি, ইংরেজীতে তার নাম Cuckoo নয়, Koel। হিন্দিতে কোয়েলই বলে। ইংরেজীতে যার নাম Indian Cuckoo—বাংলায় তিনি হচ্ছেন 'বউ কথা কও'; একটু গরম পড়লে সেগুলোর ডাক শোনা যাবে আমবাগানে।"

কবি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন দোয়েলের গান। বৈজ্ঞানিকের কথা তাঁর কানে ঢুকছিল কিন্তু মনে প্রবেশ করছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল—

আমরা কেবল সদরে গলিতে
ধূলায় পঙ্কে কাদায় পলিতে
রঙ-বেরঙের নানান থলিতে
নানান রকম স্বার্থ ভরিয়া
করি কলরব করি বাড়াবাড়ি
করি হুড়োমুড়ি করি তাড়াতাড়ি
করি মারামারি করি কাড়াকাড়ি
অপরের শির লক্ষ্য করিয়া
কাদা ছুঁড়ি আর ইঁট মারি।
শাখার শিখরে ও দোয়েল পাখি
চটিয়া গিয়াছ তাই তুমি নাকি
পুচ্ছটি বুঝি তাই থাকি থাকি
আকাশের দিকে ধরিতেছ তুলি

হানিতে চাহিছ সবার প্রাণেতে
তীব্র মধুর তীক্ষ্ণ তানেতে
অবাধ সুরের 'মেশিন গান'-এতে
মর্ম-ভেদিনী এ কি গোলা-গুলি
গিটকারি-ভরা টিটকারি।

কবির মনে হল, শীতের তীক্ষ্ণতা হঠাৎ কমে গেছে যেন। কনকনে পুবে হাওয়ার ভিতরও ভেসে আসছে যেন দক্ষিণা বাতাসের আমেজ। মানসপটে ভেসে উঠল, কর্ণিকার মুকুলের গুচ্ছ বিকাশোন্মুখ হয়ে উঠছে অশোক-শাখা মুকুলভারনম্র। আকুল নয়নে তিনি খুঁজতে লাগলেন কোথায় নবমল্লিকার দল, কোথায় পদ্মবন...

"এদের নিকট-আত্মীয় শ্যামা মানুষের কাছে ঘেঁষে না বড়।"

কবি শুনলেন, বৈজ্ঞানিক বলে চলেছেন, কতক্ষণ থেকে বলে চলেছেন কে জানে!

"এরা কিন্তু খুব মানুষ-ঘেঁষা। বাগানে প্রায়ই দেখতে পাবেন। এমন কি এরা ডিমও পাড়ে আমাদেরই ঘরের কাছাকাছি। সেবার আমার মালীর ঘরের পেছনের দিকের কার্নিশে দেখেছিলাম ওদের বাসা। ডিম ওদের—"

বাধা পড়ল। পাশের ঝোপ ভেদ করে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হলেন মল্লিক, সনাতন মল্লিক, তাঁর হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ভদ্রলোকের কাপড়ে লেগেছে অজস্র চোর-কাঁটা। পাঞ্জাবির পকেটটা কি লেগে যেন ছিঁড়ে গেছে। ঝুলছে। এঁদের দেখতে পেয়ে হাত কচলাতে কচলাতে অতিশয় কাঁচুমাচু ভঙ্গীতে এগিয়ে এলেন তিনি। বৈজ্ঞানিকের মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "কাল সন্ধে থেকে আপনাকে খুঁজছি।"

"আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম এঁদের নিয়ে। কেন, কিছু দরকার আছে নাকি?"

"আপনার পাখির জন্যে যে ফড়িং দরকার তা তো আমি জানতাম না, সত্যি বলছি, জানতামই না। মুন্সি ব্যাটা মিছিমিছি লাগিয়েছে আমার নামে মায়ের কাছে। তিনি কাল একটা চিঠি দিয়েছেন আমাকে। কি আশ্চর্য, সামান্য ব্যাপার, আমাকে একটু বললেই চুকে যেত। ফড়িঙের ভাবনা কি, আমার বাগানে তো যথেষ্ট ফড়িং, দেখুন তো মিছিমিছি কি কাণ্ড।"

বৈজ্ঞানিক বুঝতে পারছিলেন না ব্যাপারটা ঠিক।

বললেন, "কি চিঠি, কে দিয়েছে?"

"এই যে দেখুন না, সামান্য ব্যাপার, ছি ছি!"

একটি ছোট চিঠি বার করে দিলেন তিনি।

রত্নপ্রভার চিঠি। রত্নপ্রভা গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে লিখেছেন---

সবিনয় নিবেদন,

ওঁর পাখির জন্য ফড়িং যোগাড় করে দেবার ভার আপনাকে নিতে হবে। যদি না পারেন কাজে ইস্তফা দিন, আমরা অন্য ব্যবস্থা করব।

ইতি রত্নপ্রভা

বৈজ্ঞানিক ছোট্ট একটু শিস দিয়ে চুপ করে গেলেন। তারপর আড়চোখে চাইলেন একবার সনাতনবাবুর দিকে। শুধু অবাক নয়, অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কি যে বলবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না।

মল্লিক বলে চলেছিলেন, "সামান্য ফড়িঙের জন্যে এত কাণ্ড করার দরকারটা কি ছিল মুন্সির।"

অকারণে গলাটা ঝেড়ে বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমি এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না। তবে এটা ঠিক, আমার পাখিগুলো ফড়িঙের অভাবে মরে যাচ্ছে। গোটা পাঁচেক মরে গেছে।"

"আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।"

"ধন্যবাদ। বিশ্বাস করুন, এ চিঠির কথা আমি কিছু জানতাম না।"

তাঁর একবার ইচ্ছে হল যে বলেন, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু রত্নপ্রভার আত্মসম্মান তাতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে ভেবে চুপ করে গেলেন। মল্লিক দন্ত বিকশিত করে হেসে ফেললেন খুব খানিকটা।

তারপর বললেন, "উনি মনিব, আমি চাকর, হুকুম দেবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ওঁর নিশ্চয় আছে। কিন্তু সামান্য ফড়িং, দেখুন দিকি।"

বৈজ্ঞানিক অপ্রতিভমুখে চুপ করে রইলেন।

"এই কথাটা বলবার জন্যেই খুঁজছি আপনাকে কাল থেকে। এক-আধটা নয়, প্রচুর ফড়িঙের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আজই লাগিয়ে দেব ছোঁড়াগুলোকে। মুন্সিকে দেবেন পাঠিয়ে, সেও ধরবে। ফড়িঙের আবার ভাবনা! আচ্ছা, চলি এবার তবে।"

নমস্কার করে মল্লিক চলে গেলেন।

কবির দিকে চেয়ে একটু হেসে বৈজ্ঞানিক আবার শুরু করতে যাচ্ছিলেন, "হ্যাঁ, দোয়েলের ডিমের কথা হচ্ছিল। এদের ডিম চমৎকার দেখতে, বুঝলেন?"

কবি হেসে উত্তর দিলেন, "এখন একটি কথা ছাড়া আর সমস্তই অবান্তর মনে হচ্ছে আমার কাছে।"

বৈজ্ঞানিক একটু থমকে গেলেন।

"সে কথাটি কি?

"বসন্ত এসেছে। যার সম্বন্ধে কবি কালিদাস বলেছেন—

দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামা পবনঃ সুগন্ধিঃ
সুখাং প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে।"

উদ্ভাসিত চক্ষে বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "ও, সার্টেনলি।"

।। নয় ।।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন অমরবাবু। সত্যি সত্যি পাখির গান রেকর্ড করা যাবে তা হলে এইবার।... বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মিস্টার নিকল্‌সন্, মিস্টার কক আর তিনি। শহর থেকে অনেক দূরে, সমস্ত কোলাহলের বাইরে। সঙ্গে আছে পার্লোফোন কোম্পানির সাউন্ড-ভ্যানটা, তার ভিতরে আছে গান রেকর্ড করবার সমস্ত আধুনিক সরঞ্জাম। খুব ভাল মাইক্রোফোন আছে, মাইক্রোফোনের সঙ্গে লাগাবার তারও আছে প্রচুর। ভ্যানের ভিতরে বসে সুইচ লাগিয়ে দিলেই লাউড-স্পিকার বেজে উঠবে। বনের ভিতর মাইক্রোফোনের সামনে যত

রকম শব্দ হচ্ছে, শোনা যাবে সব। পাখির গানও। অনায়াসেই রেকর্ড করা যাবে। অনেকগুলো অ্যাকুমুলেটারে (Accumulator) ইলেকট্রিসিটি পুরো চার্জ করে আনা হয়েছে। মোমের তৈরি রেকর্ডও আছে প্রচুর। রেকর্ড অনেক আনতে হয়েছে, নষ্ট হবে অনেকগুলো। পাখি কখন গাইবে ঠিক নেই, রেকর্ড কিন্তু ঘুরিয়ে যেতে হবে ক্রমাগত। বসন্ত-বউরির গানটাই আগে তুলতে হবে। দোয়েলের তুললেই ভাল হত, কিন্তু দোয়েল আজকাল ডাকছে না বেশি। বসন্ত-বউরির ডাকটাই শোনা যাচ্ছে বেশি। কোকিলও অবশ্য আছে। যে রেডস্টার্টগুলো ধরে রেখেছেন, তাদের গান তুললে কেমন হয়? ও জায়গাটা কিন্তু বড় অসমতল। কক সাহেব বলেছেন, সাউন্ড-ভ্যানটাকে সমতল জায়গায় দাঁড় করাতে হবে। শহরের বাইরের মাঠটাতেই ঠিক হবে। বসন্ত-বউরি পাওয়াও যাবে সেখানে প্রচুর।

...মাঠ। ইউক্যালিপ্টাস গাছের উঁচু ডালে অনেক বসন্ত-বউরি এসে জোটে ভোরবেলায়। গাড়িটাকে একটু দূরে সমতল জায়গায় দাঁড় করিয়ে মাইক্রোফোনটাকে ফিট করে রাখা হয়েছে। আগে থাকতেই ঠিক করে রাখা হয়েছে। পাখিটা যাতে হঠাৎ মাইক্রোফোন দেখে ভড়কে না যায়। না, যায়নি। রোজ যেমন ডাকে, ঠিক ডাকছে।

...ভোরবেলা। রেকর্ড চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কই বসন্ত-বউরি আজ এল না তো গাছটায়! অথচ রোজ আসে। আজ কাক ডাকছে কতকগুলো। ওটা কিসের শব্দ? পাখির হতে পারে না। কুকুরের। ছি, ছি!

...কক সাহেব হেসে বলছেন, ব্যস্ত হলে চলবে না। আমরা একটা ব্ল্যাক বার্ডের গান রেকর্ড করবার জন্যে চেষ্টা করেছি দিনের পর দিন, রোজ রাত দুটো থেকে উঠে। অপেক্ষা করতে হবে।

...ওই এসেছে। ওটা কি হল? শর্ট সার্কিট (Short Circuit) হয়ে গেল। মাটি ভিজে যে।

...আবার ঠিকঠাক করে বসা হল। রেকর্ডের পর রেকর্ড ঘুরে চলেছে।

...মোটর চলে গেল একটা দূরের রাস্তা দিয়ে। বাতাস উঠল জোরে। ডাল-পালায় হুড়মুড় শব্দে পাখির গান চাপা পড়ে যাচ্ছে।

...এইবার হয়েছে। বাঃ ঠিক হয়ে গেছে—

"শুনছ, ওগো, ওঠ ওঠ।"

চোখ খুলে বৈজ্ঞানিক দেখলেন রত্নপ্রভা সামনে দাঁড়িয়ে, কক সাহেব নয়।

"স্বপ্ন দেখছিলে নাকি?"

বৈজ্ঞানিকের বুকের উপর একখানা বই। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

মুচকি হেসে বললেন, "হ্যাঁ স্বপ্নই। অদ্ভুত ধরনের স্বপ্ন একটা।"

"রূপচাঁদবাবু এসেছেন বাইরে।"

"ও।"

উঠে পড়লেন বৈজ্ঞানিক।

"চা খেয়ে বেরুবে, না, বাইরেই পাঠিয়ে দেব দুজনের একসঙ্গে?"

"তাই দাও।"

রত্নপ্রভা চলে গেলেন। বৈজ্ঞানিক বইটার দিকে চেয়ে দেখলেন আর একবার। Songs of

Wild Birds। ওদের দেশে পাখির গান সত্যিই রেকর্ড করেছে ওরা। আমাদের দেশে এসব এখন সুদূরপরাহত। স্বপ্নই। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে ভ্রুকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। এ দেশের অধিকাংশ লোক দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না।

...বেরিয়ে গেলেন।

বৈঠকখানায় যাওয়ামাত্রই রূপচাঁদ বললেন, "দু-একটা বাড়তি ফার্নিচার আছে তোমার চেয়ার, বেঞ্চি, ছোট টেবিল, এক-আধটা আলনা?"

"কেন, কি হবে?"

"ওই মেয়েটির দরকার, আমাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছে, কপর্দকহীন—দরকার তো সব জিনিসই।"

"গুদোমে আছে বোধ হয়। রত্না জানে ঠিক।"

"এখানেই যদি পেয়ে যাই তা হলে বেশি ঘুরতে হয় না আর।"

"আছে আমার।"

"বাচা গেল তা হলে।"

"রূপচাঁদের চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কল্পনায় ডানার কৃতজ্ঞতাস্নিগ্ধ মুখচ্ছবিটা ফুটে উঠল একবার।

"আনন্দবাবুর খবর কি?"

"সেখান থেকেই তো আসছি। সে দেখলাম একটা প্রকান্ড সবুজ বই নিয়ে তন্ময় হয়ে ছবি দেখছে। তুমিই দিয়েছ বোধহয় বইটা।"

"ওয়াইল্ড্ কোরাস (Wild Chorus) খানা দেখছেন বোধ হয়। আপনি দেখলেন বইটা?"

"একটু উঁকি মেরে দেখেছি। হাঁসের ছবি।"

"হ্যাঁ। অদ্ভুত বই।"

চা এসে পড়াতে বইয়ের কথা চাপা পড়ে গেল।

কবি তন্ময় হয়ে নিজের তেতলার ঘরটায় চৌকির উপর চিত হয়ে শুয়ে Wild Chorus বইখানা দেখছিলেন। শুধু বইখানাই দেখছিলেন না, তিনি কল্পনা-নেত্রে দেখছিলেন হংসরসিক পিটার স্কটকে, আর চেষ্টা করছিলেন তাঁর মানসলোকে ঢুকে তাঁর বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার আনন্দ-স্পন্দনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেতে। ভদ্রলোক শুধু বৈজ্ঞানিক নন—কবিও। অদ্ভুত চিত্রকর। কি চমৎকার ছবিই না এঁকেছেন। থাকেন সমুদ্রের ধারে। হাঁসের সঙ্গলোভেই শহর ছেড়ে গেছেন সেখানে। নদী যেখানে এসে মিশেছে সমুদ্রে, সেই মোহনার কাছেই এক প্রকাণ্ড 'লাইট হাউসে' (Light House) আস্তানা ওর। শীতকালে অজস্র হাঁস আসে সেখানে। অনেক বুনো হাঁস ধরে পুষেওছেন নিজে। বাড়ির তিন দিকে নোনা বালির চড়া, তারপর খানিকটা জল, খানিকটা কাদা, তারপর সমুদ্র-সৈকত। জোয়ারের সময় সবটা সমুদ্রের জলে ভরে যায়, বাড়িটা শুধু জেগে থাকে। চোখ বুজে কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন কবি। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল সাগরের ঢেউ। আরপর আকাশ। আকাশের রঙ বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। কখনও নীল, কখনও ধূসর, কখনও কালো। আবীর ছড়িয়ে পড়ছে কখনও, কখনও স্বর্ণরেণু। কখনও অরুণ, কখনও গৈরিক। কত অজস্র রঙের লীলা চলেছে। আর তার মাঝ দিয়ে মন্থর গতিতে খামখেয়ালী

মেঘের দল ভেসে ভেসে আসছে আর চলে যাচ্ছে। উড়ে উড়ে আসছে হাঁসের দল তুষারের দেশ থেকে। হাঁস দেখবার জন্যে কতরকম আয়োজন করেছেন ভদ্রলোক। কত দেশে ঘুরেছেন। অস্ট্রিয়া-হাংগেরি-রুমানিয়ায়, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে, দানিয়ুব নদীর তীরে, ক্যাস্পিয়ন সাগরের সৈকতে।...কবিতা জাগল মনে। তাড়াতাড়ি কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে গেলেন। লিখে না ফেললে থাকে না। চলে যায়, পালিয়ে যায়।

পাখা মেলে উড়ে চলে হাঁসেদের সারি
আর তার পিছু পিছু মানুষের মন।
রোদ-ঝড়-আলো-ছায়া-চন্দ্র-তপন
শূন্যবিহারী
অন্ধকারের বুকে তারা অগণন
সারি সারি সারি;
মায়া বিস্তারি'
ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসে রঙিন স্বপন
সন্ধ্যা-উষার মেঘে আলোকের অলঙ্করণ;
দিগন্তে ধরার নেত্রে কজ্জলিত স্বপ্ন মনোহারী ঃ
অকস্মাৎ তার মাঝে উড়ে আসে কল-কণ্ঠ হাঁসেদের সারি
সচকিয়া সমুদ্র-গিরি-মরু-বন
সাদা-মাথা, লাল-বুক, গোলাপী-চরণ,
আর তার পিছু পিছু মানুষের মন।

লিখে বসে রইলেন খানিকক্ষণ চুপ করে। বইখানা আবার ওলটাতে লাগলেন। হঠাৎ মনে হল, এ ভদ্রলোক হাঁস দেখতে বেরোননি, হাঁস ধরতে বেরিয়েছেন। হাতে আছে জাল---Clap net। হাঁস ধরে তার পাখা ছেঁটে বা বেঁধে তাকে বন্দী করে রাখবেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় পুষ্ট মন যে। উপভোগের অন্তরালে তাই উঁকি মারছে ভবিষ্যতের ভাবনা, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। প্রকৃতির আনন্দলীলা যে অফুরন্ত, অজস্র ঐশ্বর্য যে অবারিত রয়েছে সহস্র দিকে—এ বোধ বোধহয় জাগেনি এখনও ভদ্রলোকের। সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছেন তাই প্রাণপণে। ভাবছেন, ফুরিয়ে যাবে। ফুরিয়ে যাবে তুমি, ওরা থাকবে।

মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন এসে। হাতে একখানি পোস্টকার্ড।

"ওগো, শুনছ বিনয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। চিঠি পেলাম এখুনি, এই দেখ।"

বিনয় মন্দাকিনীর ছোট ভাই। কবি বইটা মুড়ে রেখে সোজা হয়ে বসলেন।

তাঁর কাব্যলোক অন্তর্হিত হল এবং পরমুহূর্তেই তাঁকে পানসে কালি দিয়ে লেখা বানান-ভুলে-পরিপূর্ণ অর্ধমলিন পোস্টকার্ডটিতে মনোনিবেশ করতে হল। "শ্রীচরণেষু'তে 'শ' এই প্রথম দেখলেন।

মন্দাকিনী বলে চলেছিলেন, "শেষ পর্যন্ত ওইখানেই হল, দেখলে তো! কত ফরকটই তুলেছিল। যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে—। হলই বা আই. সি. এস.। তার হাঁড়িতে চাল দিয়ে থাকলে তার সঙ্গেই বিয়ে হত। কিন্তু ও মেয়ে দিয়েছে আমার ভাইয়ের হাঁড়িতে চাল, হবে কি করে অন্য জায়গায় বিয়ে? তারিখের কথা লেখেনি। অথচ বাজে কথা লিখেছে একটি গাদা।

হরেন সিঙ্গির বিধবা বোনের কালাজ্বর হয়েছে, মানিক চাকরি পায়নি, বিপিনবাবুদের গাই বিইয়েছে। কাজের কথা শেষ করে জায়গা থাকলে লিখতিস এসব। তা নয় রাজ্যের বাজে কথা লিখে ভরে দিয়েছে পোস্টকার্ডটা।"

"বিয়ের তারিখ এখনও ঠিক হয়নি হয়তো।"—সন্তর্পণে কবি বললেন।

"দেনা-পাওনাও কি ঠিক হয়নি এখনও? সেইটেই তো আসল। বিনয়ের পছন্দ হয়েছে মেয়েকে খুব তা মানি, কিন্তু তা বলে একেবারে ফাঁকি দেবে নাকি? আমাদের নমস্কারী টমস্কারীগুলো তো নিশ্চয়ই দেবে। আই. সি. এস. না হতে পারে, কিন্তু বিনয়ও আমাদের ফেলনা ছেলে নয়। কি রূপ, কি গুণ! ওভারসিয়ারি করে মাসে চার-পাঁচশো টাকা রোজগার করে। অসময়ে বাবা মারা গেলেন তাই, তা না হলে ও ছেলেও আই. সি. এস. হত।"

বকবক করে ক্রমাগত বলে যেতে লাগলেন মন্দাকিনী। কবি পোস্টকার্ডের দিকে চেয়ে শুনে যেতে লাগলেন। বিনয়ের কথা থেকে এল মাসীমার কথা, তারপর যোগেনের বিয়ের কথা, তারপর বরযাত্রীর কথা, তারপর আজকালকার অগ্নি-মূল্য জিনিসপত্রের কথা, মাছ-তরকারির কথা, ধোপার কথা, সুন্দরী গরুর কথা....

কবি পোস্টকার্ডের দিকে চেয়ে সব শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, এও একরকম হাঁস। নারী-বেশিনী হাঁস। মন্দাকিনীর অজস্র কথার মাঝখানে তিনি যে শুনতে পেলেন,

আংগাংক্, আংগাংক্, আংগাংক্.....সেই চিরন্তন ডাক চিরপথিক হংসযাত্রীর—যে।

স্থির-লক্ষ্য চলিয়াছে বেগবান নিজ পক্ষ-রথে
ঝড়ে জলে অন্ধকারে অরণ্যে পর্বতে।

।। দশ ।।

ডানা চুপ করে বসেছিল বারান্দায়। কিছুক্ষণ আগেই চেয়ার টেবিল আলনা আলমারি পৌঁছে দিয়ে গেছেন রূপচাঁদবাবু। অনেক আশ্বাসও দিয়ে গেছেন। কিন্তু ঠিক যে ধরনের আশ্বাসকে মানুষ নির্ভরযোগ্য মনে করে, সে আশ্বাস পায়নি এখনও ডানা। বাইরের কোনও লোক সে আশ্বাস দিতে পারে না। অন্তরের অন্তস্থল থেকে তা উৎসারিত হয়। তার মনে হচ্ছিল যে, তার চারিদিকে পুঞ্জিভূত হয়েছে যে কুয়াশা, তা খানিকক্ষণ পরে অপসারিত হবে হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—তবু কিন্তু অনিশ্চয়তা থাকবে। কোনও বাইরের লোকের বাচনিক আশ্বাসে তা ঘোচবার নয়। নিজের চোখে যাচাই করে নির্ভয় হতে হবে। কুয়াশার ভিতর যেটাকে দৈত্য মনে হচ্ছে, সেটা আসলে যে মানুষ তা নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছিল না সে; নিজের সঙ্গে নিজেই তর্ক করছিল। তার মনের মধ্যে আর একটা সত্তা যেন গোপনে গোপনে কামনাও করছিল—আহা, ওটা সতিাই যদি দৈত্য হয়। হলে যে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা ভেবে শিহরন জাগছিল তার সর্বাঙ্গে। কৌতূহলে উন্মুখ এবং ভয়ে কণ্টকিত হয়ে বসে ছিল সে চুপ করে। অতীতের দিনগুলোও কেমন যেন ঝাপসা অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। নিজের মায়ের কথা মনে নেই তার। বিমাতার সঙ্গে কলহ হয়নি, ভাবও হয়নি। তার সঙ্গে মৌখিক ভদ্রতা রক্ষা করে এসেছে সে এতকাল। হঠাৎ সব শেষ হয়ে যাওয়াতে

যেন আরামই বোধ করছে। পায়ের টাইট জুতোটা খুলে গেল যেন চিরদিনের মতো, আর পরতে হবে না। বিমাতার সঙ্গে ভাব না থাকলেও ছোট বৈমাত্র ভাইটিকে ভালবাসত খুব। টুলটুলে মুখখানি। সর্বদাই যেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে থাকত। যখন হাসত, তখনও। ওইটেই ছিল যেন তার দৃষ্টিভঙ্গী। পৃথিবীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে যেন সে বলত, যা দেখছি তা সত্যিই ভাল না কি! চলে গেল কোথায় চিরদিনের মতো। বাবার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার। মনে পড়ে—এইটে ভাবতেই অবাক লাগে। বাবা যে থাকবেন না, তাঁকে যে মাঝে মাঝে মনে পড়বে, এই বিস্ময়কর সত্যটার বিস্ময় কিছুতেই যেন আর কাটছে না। ট্রেনের সহযাত্রীর মতো বাবাও এক জায়গায় নেবে গেলেন হঠাৎ নাম-না-জানা একটা স্টেশনে। দেখা হবে না আর কখনও। সে অথচ চলেছে। প্রতি-মুহূর্তে অতিক্রম করছে নিত্য নতুন পথ। অপ্রত্যাশিতভাবে পারিপার্শ্বিক বদলাচ্ছে। নতুন দৃশ্য আসছে আর চলে যাচ্ছে। ট্রেনটা থেমেছে মনে হচ্ছে একটা নতুন স্টেশনে। অনেকক্ষণ থেমে আছে। নতুন যাত্রীরা উঠছে তার কামরায়। জিনিসপত্র নাবাচ্ছে, ওঠাচ্ছে। কুয়াশা চারদিকে, স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। মানুষ ওরা? এতকাল যে ধরনের মানুষ সে দেখে এসেছে, তাদেরই মতো, না, নতুন রকম কিছু? বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কৌতূহল-ভয়, লোভ-আত্মসম্মান, পরস্পরবিরোধী আলোছায়ার অদ্ভুত সম্মিলন ঘটেছে একটা। দূরে কোথায় যেন কাঁসরঘণ্টা বাজছে, তার অতীতে জীবনটাই যেন উৎসব শুরু করেছে আর কোথাও। সে কেবল সরে এসেছে সেখান থেকে। ওরা কেউ কোথাও যায়নি, সে-ই কেবল সরে এসেছে। কথাটা মনে হতেই অদ্ভুত ধরনের ঠেকল। সে-ই কি একলা কেবল আসতে পারে? একটা জটিল জিজ্ঞাসা চিহ্ন যেন মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল মনের ভিতর। এ নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করবার অবসর কিন্তু সে আর পেলে না। ঘাড় ফিরিয়েই দেখলে, বৈজ্ঞানিক আর কবি নদীর ধার থেকে এগিয়ে আসছেন তার দিকেই।

একটু এসেই বৈজ্ঞানিক বসে পড়লেন ভাঙা সিঁড়িটার উপর তার দিকে পিছন ফিরে, তারপর দূরবীন দিয়ে কি যেন দেখলেন। তারপর কবির দিকে চেয়ে বললেন, "পাখিটাকে আগে দেখে নিন ভাল করে।"

কবি দেখতে লাগলেন।

"দেখতে পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। ওই পাখিটাই ডাকছিল অমন করে? উক্ কুক্ উক্ কুক্ উক্ কুক্—এই ধরনের ডাকটা, নয়?"

"ক-য়ের স্থানে প-ও দিতে পারেন : হুপো, হুপোপো—এ বললেও অন্যায় হয় না। ইংরেজী নাম ওর হুপো, হিন্দীতে বলে হুদ্‌হুদ্। Upupa Epops হল কেতাবী নাম।"

"ওর বাংলা নাম মোহনচূড়া দেওয়া যাক—মাথায় অমন চূড়া আছে যখন। হঠাৎ মনে হয়, আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান যেন পাখির বেশ ধরেছে। নয়? ফর্‌র্ করে মাথার চূড়াটা আবার খুলে যাচ্ছে জাপানী পাখার মতো। চমৎকার তো!"

ডানা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ইচ্ছে হল একটু আলাপ করে গিয়ে, কিন্তু সঙ্কোচ হতে লাগল। তার মনের কথা টের পেয়েই কবি যেন ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন তার দিকে।

"নমস্কার। আসুন। পাখি দেখতে বেরিয়েছি আমরা। কি চমৎকার একটা পাখি দেখুন!"

"কি নাম ওর?"

"ইংরেজী নাম হুপো, আমি নামকরণ করলাম মোহনচূড়া। বাংলা নাম আছে হয়তো কোনও, জানি না।"

"তিনটে রয়েছে দেখছি।"—ডানা বললে।

"আরও বেশি থাকে"—বৈজ্ঞানিক বলে উঠলেন—"ওরা একটু নির্জন জায়গায় চরতে ভালবাসে, অনেকটা ঘুঘুর মতন স্বভাব। ঠোঁটটা দেখুন ভাল করে, মাটি খুঁড়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, তাই অনেকটা পিক-অ্যাক্সের (Pickaxe) মতো। ওদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওদের বাসা। গাছের গুঁড়িতে বা পুরনো বাড়ির দেওয়ালের গর্তে ওরা ডিম পাড়ে সাধারণত। ডিম পাড়বার পর স্ত্রী-পাখিটা গর্ত থেকে কদাচিৎ বেরোয়। পুরুষ-পাখি তখন খাওয়ায় স্ত্রীকে। এ বিষয়ে ধনেশ পাখির সঙ্গে মিল আছে খানিকটা। ধনেশের ঠোঁটের সঙ্গেও এর ঠোঁটের মিল আছে একটু। স্ত্রী-পাখিটা বাসা ছেড়ে বেরোয় না বলে বাসার ভেতরে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। সাদা ডিমগুলো পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে যায়। অদ্ভুত স্বভাব, নয়? এই পাখিদেরই মধ্যে আবার কোকিল দেখুন ডিম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। অপরের বাসায় ডিম পেড়ে চলে আসছে।"

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হল, ডানা তাঁর কথা শুনছে না।

"চমৎকার দেখতে, নয়?"—বৈজ্ঞানিক একটু ইতস্তত করে আবার শুরু করলেন—"ওর বুকে যে রঙটা রয়েছে, সেটা ঠিক বাদামী নয়, ফন (fawn)। অনেকটা হরিণশিশুর গায়ের রঙের মতো। আবার পিঠের ডোরা ডোরা দেখলে মনে হয় জেব্রার গায়ের রঙ।"

তারপর কবির দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি কিছু বলছেন না যে?"

"আমিও মিল খুঁজছি"—হেসে উত্তর দিলেন কবি।

তারপর বললেন, "আমার বক্তব্য এখনই বলা যাবে না। লিখতে হবে।"

"পাখিগুলো উড়ে গেল"—ডানা বললে।

"চলুন, আপনার ওখানেই যাওয়া যাক। লিখে ফেলি কবিতাটা।"

সকলে পড়ো বাড়িটার দিকে অগ্রসর হলেন।

কবি গিয়েই চেয়ারটা টেনে বসে পড়লেন টেবিলের পাশে। পকেট থেকে বেরুল ফাউন্টেন পেন আর খাতা। শুরু করে দিলেন লিখতে।

বৈজ্ঞানিকও একটা চেয়ার টেনে বসেছিলেন, কিন্তু 'কির্‌র্ কির্‌র্' গোছের একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে উঠে পড়লেন টপ করে এবং ছুটে নেবে গেলেন মাঠে, তারপর ঊর্ধ্ব মুখ হয়ে চোখে লাগালেন দূরবীন।

ডানা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। দুই বিপরীতমুখী স্রোতের কোনোটাতে গা ভাসিয়ে দিতে পারছিল না সে। ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পারছিল না। তার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকছিল। কোথায় কোন্ একটা অদৃশ্য নোঙর যেন আটকে রাখছিল তাকে।

"শুনুন।"

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলেন হঠাৎ।

ডানা নেবে গেল।

"নতুন ধরনের একটা পাখি দেখুন। ওই যে।"

ডানা দেখলে, পায়রার মতো একটা পাখিকে কয়েকটা কাক তাড়া করেছে।

"বাজ ওটা একটা। লাল-মাথা বাজ—Redheaded Merlin। এদের স্ত্রী-পাখিটাকে তুরমতী বলে অনেক জায়গায়। পাখি ধরার জন্যে পোষে অনেকে। কুনকী হাতীরা যেমন বুনো হাতী ধরে, এরা তেমনই নীলকণ্ঠ, হুপো, তিতির প্রভৃতি পাখি ধরে। ধরাটা যদিও একজাতীয় না। কুনকী ভুলিয়ে আনে, এরা ছোঁ মেরে ধরে। চেহারাটা সুন্দর। মাথা লাল, পিঠটা নীলচে, বুকে-পিঠে সাদার ওপর ছিটছিট। দেখুন।"

দূরবীনটা ডানার হাতে দিলেন।

"ওই স্ক্রুটা ঘুরিয়ে ঠিক করে নিন নিজের চোখের সঙ্গে।"

ডানা দেখতে লাগল।

সহসা বৈজ্ঞানিকের মনে হল, মেয়েটিকে বাজপাখির সম্বন্ধে সামান্য কিছু জ্ঞানদান করা উচিত বোধ হয়।

"বাজের ঠোঁট আর পায়ের নখ লক্ষ্য করবার জিনিস। ওদের চেনবার আর একটা উপায় হচ্ছে ল্যাজের পালকের তলায় বেশ চওড়া ডোরা—Barred—দেখতে পেয়েছেন?"

ঘাড় নেড়ে ডানা জানালে, পেয়েছে।

"ঠিক এই রকম সাইজের আর এক রকম বাজ আছে। তাকে কেস্ট্রেল (Kestrel) বলে। তার মাথাটা কিন্তু নীলচে, পিঠটা লাল। এর ঠিক উল্টো।"

ডানা দূরবীনটা বৈজ্ঞানিকের হাতে দিয়ে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে বসল একটা, "একটু চা খাবেন?"

"বেশ তো"—বলেই বৈজ্ঞানিকের মনে হল, পক্ষীতত্ত্ব সম্বন্ধে মেয়েটির কৌতূহল ঠিক উদ্রিক্ত করতে পারলেন না তিনি। ভ্রূকুঞ্চিত করে অপস্রিয়মান ডানার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। গোড়ালির উপর শাড়ির পাড়টা চোখে পড়ল। মনে হল, ঠিক যেন শিকরা পাখির ল্যাজের তলার মতো। ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে অনুসরণ করলেন।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "কই, কি লিখলেন, পড়ুন।"

ডানার দিকে কবি চাইলেন। চোখের দৃষ্টি সপ্রশ্ন উৎসুক।

"পড়ব? আশ্রমপীড়া হবে না তো?"

"না না। কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। আপনি পড়ুন। কি নিয়ে লিখলেন?"

"যে পাখিটা দেখলাম এখুনি—মোহনচূড়া।"

"ও, পড়ুন।"

কবি পড়তে লাগলেন।

কি করিয়া মিল হল ঘুঘু আর ধনেশে
জেব্রা ও হরিণে
সে কথা ভাবিয়া আমি মরি নে।
আমি শুধু বার বার ডেকে বলি নিজেকে
কেবা কালো কেবা সাদা কেবা উঁচু নীচে কে
সত্য কে মিছে কে
তাহার হিসাব নিক যাহারা বৈজ্ঞানিক
তুই শুধু অঞ্জলি ভরি নে।

তুই শুধু দেখ্ রে পেখম মেলেছে মন
ও মোহন চূড়াতে
গরীব সখীর হিয়া জুড়াতে, না পুড়াতে!
চঞ্চল ও চলন শুধু চলাটুকু কি
উকু কুক্ উকু কুক্ শুধু উক্ কুকু কি
ওর সুখ দুখু কি
পেয়েছে কোথাও বাণী? কোন্‌খানে? কতখানি?
ছন্দেতে পারিস কি কুড়োতে?

"সুন্দর"—অস্ফুট কণ্ঠে বললে ডানা।

"বাঃ"—সোল্লাসে বলে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

।। এগারো ।।

শীত শেষ হল। বসন্ত এসেছে। ঝরে পড়ছে অনেকে গাছের পাতা। ঝরতে না ঝরতেই দেখা দিচ্ছে নব মুকুলের আভাস, পাওয়া যাচ্ছে কিশলয়দের সাড়া। বাতাসে শীতের আমেজটুকু আছে, তীক্ষ্ণতা নেই। ভোরের দিকের কুয়াশায় নিবিড়তা নেই, স্বচ্ছতা এসেছে। মসলিনের টুকরোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে দূরে দূরে। তিসির ফুল, যবের শীষ, গমের শীষ, মটর ফুল, অড়র ফুল ছেয়ে ফেলেছে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। ঘেঁটু ফুল ফুটেছে চারিদিকে। শিমুলের কুঁড়ি ধরেছে। সজনে ফুলের শ্বেতগুচ্ছ দেখা যাচ্ছে দু-এক জায়গায়। শিয়ালকাঁটার বনেও ফুল ফোটবার সাড়া পড়েছে, সোনালি ফানুস দুলছে গাছে গাছে। বটগাছে ফল ধরেছে অজস্র। আখ কাটা হচ্ছে। পেয়ারা পেকেছে। টুনটুনি পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে দলে দলে। পুরুষ টুনটুনি পরেছে চকচকে কালো রেশমের বর-বেশ। উচ্চ রোল তুলে নীলকণ্ঠ প্রণয় নিবেদন করছে প্রেয়সীকে। বাঁশপাতিরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসেছে মাটিতে। কাঠঠোকর'র ক্রেংকারধ্বনি শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বেনেবউ ডাকছে নানা সুরে। টিউ—কৃষ্ণ গোকুলে—ও বউ হলুদ তোল—নানা রকম কথা বলছে সে। বুলবুলিরাও টুরু টুরু শুরু করছে ঝোপে ঝাড়ে। বসন্ত-বউরির আনন্দ-সঙ্গীত উৎসের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। টংক্ টং ক্ টংক্—ডেকে চলেছে ভগীরথ। চন্দুল আর ভরতের গানে লেগেছে নতুন সুর। খঞ্জনের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে মাঠে গরুদের কাছে কাছে। শকুনি, বাজ, মুনিয়াদের বাচ্চা হয়েছে, তাই নিয়ে ব্যস্ত তারা।

...অমরবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিরাট একটা পার্সেল নিয়ে। মালয় থেকে তাঁর একজন বন্ধু স্টাফ্‌ড্ (stuffed) পাখি পাঠিয়েছিলেন কয়েক রকম তাঁর জন্মদিনের উপহার-স্বরূপ যুদ্ধের আগে। অনেক ঘাটের জল খেয়ে পার্সেলটা পৌঁছেছে এতদিন পরে। সর্প-ঈগলটা (Serpent Eagle) অতি অদ্ভুত রকম সুন্দর। ভীষণ অথচ সুন্দর, মাথায় পালক-গোঁজা সম্রাট যেন। কি দৃপ্ত ভঙ্গী, এর সঙ্গে এদেশী সর্প-ঈগলের মিল-অমিল কোন্‌খানে কতটুকু আছে তা তিনি বুঝিয়ে চলেছেন রত্নপ্রভাকে। রত্নপ্রভা গম্ভীর মুখে শুনে যাচ্ছেন। অনেক কিছুই বুঝছেন না, কিন্তু তাতে রস-ভঙ্গ হচ্ছে না। তাঁর উৎসুক দৃষ্টি এবং নীরব গাম্ভীর্য জমিয়ে রেখেছে

প্রসঙ্গটাকে। সাদা-কলার-ওলা চমৎকার মাছরাঙাটাও মন দিয়ে শুনছে যেন অমরবাবুর বক্তৃতা। ওটা যে মরাপাখি তা মনেই হচ্ছে না। বহুবর্ণ-বিশিষ্ট পিট্টা (Pitta) পড়ে আছে কাত হয়ে এক ধারে। পিঠে-চুল হলদে-বুক বুলবুলিটার চোখে বিস্মিত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। লাল-ঘাড় নীল-পিঠ টিয়া বসে আছে গ্রীবাভঙ্গী করে। মৃত্যুও তার গর্ব অপহরণ করতে পারেনি যেন। ক্রমাগত বকে চলেছেন অমরবাবু। যে পক্ষীনিবাস তিনি তৈরি করতে চান, তার কল্পনায় মেতে উঠেছে তাঁর মন। রত্নপ্রভারও।

.....চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন মন্দাকিনী। চৈত্র মাস এসে গেল, অথচ চাল কেনা হল না এখনও। চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে রোজ রোজ। মাঘের মধ্যেই সারা বছরের মতন চাল কিনে ফেলেন তিনি। এবারও ফেলতেন, কিন্তু রূপচাঁদবাবু দাঁও মাফিক কিনে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে অপেক্ষা করছেন। রূপচাঁদবাবুর কিন্তু পাত্তা নেই। একটি বিষয়ে মন খুশি আছে তাঁর। মনের মতো করে দুটি লেপ করাতে পেরেছেন এবার। চমৎকার ছিটটি। ধনুকর ডাকিয়ে সামনে বসে বার বার করে ধুনিয়ে, চক্রাকার সেলাই দিয়ে মনোমত করে করেছেন লেপ দুটি। রূপচাঁদবাবুর দৌলতেই হয়েছে। তাই আশা করছেন যে, চালের ব্যবস্থাটাও করে দেবেন উনি।

....উদ্‌গ্রীব আগ্রহে বকুলবালা দিন গুনছেন, কবে পাখি-ওলা হলদে পাখি বেনেবউ এনে দেবে তাঁকে। পাখি-ওলাটা রোজই বলে, এখনও পায়নি। অথচ সামনের আমগাছে প্রায়ই তো দেখা যায়। কি সুন্দর রঙ, সোনা ঠিকরে পড়ছে যেন গা থেকে। ওই রঙের শাড়ি আছে একখানা তাঁর। পাখিটা যখন আসবে, তখন তিনি যে কি করবেন, তারই কল্পনায় তন্ময় হয়ে আছেন তিনি। বেনেবউ এলে মদনলাল, সোহাগী হিংসেয় ফেটে পড়বে নিশ্চয়। তা পড়ুক, ওরা হিংসুটে বলে নতুন পাখি পুষবেন না তিনি বুঝি! আচ্ছা আবদার তো!

হলদে পাখির স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে বকুলবালার শিশুমন।

...সবজিবাগের পড়ো বাড়িটার কাছে যে নদীটা আছে, বর্ষার সময় তার কূল ছাপিয়ে যায়, আশেপাশের ডোবাগুলোতে জল ঢোকে এসে। মাছও ঢোকে। এইরকম একটা ডোবার ধারে ছিপ ফেলে বসে আছেন রূপচাঁদ। বকও বসে আছে কয়েকটি। মাথার উপর দিয়ে টিয়া উড়ে গেল এক ঝাঁক। টেলিগ্রাফ-পোস্টের উপর বসে একটা ফিঙে পাখি ঝনৎকার দিয়ে ধমকাচ্ছে যেন কাকে। তীরের একটা গাছের পাতায় আত্মগোপন করে হাঁড়ি-চাঁচা মাঝে মাঝে 'কক্‌রিং কক্‌রিং' শব্দ করে প্রিয়াকে ডাকছে। রূপচাঁদের কিন্তু লক্ষ্য নেই এসব দিকে। ফাতনায় নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসে আছেন তিনি।

...ডানা বসে আছে চুপ করে বারান্দার উপর। আসন্ন বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে তার মনেও, কিন্তু সজ্ঞানে সে অনুভব করছে না কিছুই। উতলা হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। অতীতের তীরভূমির দিকে চেয়ে আছে সে, দূরে সরে যাচ্ছে সেটা ক্রমশ। বর্তমানের নানা চিত্র ঘিরে ধরেছে তাকে। তাদের স্বীকার করতে বাধছে, অস্বীকার করতেও পারছে না। অদৃশ্য ভবিষ্যতের জয়গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে কোন্ অদৃশ্য কবি। অস্পষ্ট সুরটা শোনা যাচ্ছে কেবল, তাও নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়। তার সঙ্গে মিশছে এসে কোকিলের কুহু, পাপিয়ার 'পিউকাঁহা', বায়সের চিৎকার, বসন্তের সুরোচ্ছ্বাস। অনিবার্য বর্তমানের অকুণ্ঠিত অসংখ্য দাবি।

...নিজের তেতলার ঘরটিতে বসে কবি কবিতা লিখছিলেন।

আজ বিকেলে হঠাৎ যেন
দেখতে পেলাম পাঞ্চালীকে
ইচ্ছামতীর উচ্চ পাড়ে
খুঁজছে বাসা গাংশালিকে।

কঠিন গাছে কোমল গুটি
রঙিন হয়ে উঠছে ফুটি
ব্যাসের মুখে ফুটছে ভাষা
কোথায় তুমি অম্বালিকে।

জাগছে জীবন ভুবন-ভরা
সকল দ্বিধা শঙ্কা ঘোচে
শবের বোঝা সরিয়ে নে' যায়
মৃত্যু যেন সসঙ্কোচে।

জীবন-যাগের আগুন ফুঁড়ে
কৃষ্ণা জাগে বিশ্ব জুড়ে
স্বয়ম্বরের বিরাট সভায়
গান ধরেছে বৈতালিকে।

কৃষ্ণা আজও পার্থে মাগে
বহ্নি জ্বলে তন্বী-চোখে
শিক্‌রে বাজের পুলক জাগে
সমুদ্যত চঞ্চু-নখে!

সবুজ-লালে স্বর্ণ-পীতে
আগুন-মাখা বর্ণ-গীতে
কোন শবরী অর্ঘ্য সাজায়
বসন্তের এ বৈকালিকে।

ঝনাৎ করে কপাট ঠেলে প্রবেশ করলেন মন্দাকিনী। কবিতার খাতাটা তাড়াতাড়ি মুড়ে ফেললেন কবি।

মন্দাকিনী খাতাটার দিকে এক নজর চেয়ে অসঙ্কোচে বললেন, "কি যে বাজে কাজে সময় নষ্ট করছ তুমি সারাদিন বসে বসে! চালের ব্যবস্থা কর। রূপচাঁদবাবুর তো পাত্তাই নেই।"

অপ্রতিভ মুখে চেয়ে রইলেন কবি। কিছু একটা বলতেন হয়তো, কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকে উঠলেন। অঘটন ঘটে গেল একটা যেন। সুরের অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ তুবড়ির মতো আকাশে উঠে

ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। বাতায়নপথে শুনতে পেলেন এ বছরের প্রথম পাপিয়ার ডাক—চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—। চোখের অপ্রতিভ দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর, মন উড়ে গেল আকাশে, গুনগুনিয়ে উঠল কবিতার দুটো লাইন—

চোখ গেলে কি গান ধরে কেউ
অমন ধারা তান তুলে?
চোখ যায় নি মন গিয়েছে
বল্ না সেটা প্রাণ খুলে।

মন্দাকিনী বিরক্ত মুখে চেয়ে ছিলেন স্বামীর দিকে। তাঁর বিরক্তির কারণ, তিনি নিজের আকাশে উড়তে পারছিলেন না। সবাই নিজের নিজের আকাশে ডানা মেলে উড়তে চায়।

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

ডানা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট · কলিকাতা – ৬

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৪

সাড়ে চার টাকা

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, বাণী-শ্রী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

১

নদীর ধারের প্রকাণ্ড শিমুলগাছটায় পাতা নেই। অসংখ্য লাল ফুলে ভ'রে উঠেছে সেটা, আর তাকে কেন্দ্র ক'রে সাড়া প'ড়ে গেছে পাখিদের মহলে। জোয়ারি, হাঁড়িচাঁচা, টুনটুনি, শালিক, গো-শালিক, টিয়া, ছাতারে, কাক, বুলবুল—একটা হাট বসে গেছে যেন। কাকলী-কলরবে নদীতীর পরিপূর্ণ, আকাশটাও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন কৌতূহলভরে। নদীর স্বচ্ছ শীর্ণ ধারাতেও লেগেছে আনন্দের ছোঁয়াচ, অসংখ্য ঊর্মির শিহরণ জেগেছে যেন তার স্রোতোধারায়। নদীর ওপারে শুভ্র সৈকত। তার ওপারে মাঠ, গম যব মটর ছোলার ক্ষেত। শ্যামকান্তি নেই আর তাতে। শিশু-প্রাণের সবুজ অবুঝ উচ্ছলতা আর দেখা যাচ্ছে না, যৌবনের স্বর্ণাভা ফুটে উঠেছে চারিদিকে, ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্‌দিগন্তে সফল সৌন্দর্যের সার্থক মহিমা। লুটিয়ে পড়েছে।

…মুগ্ধনেত্রে দেখছিলেন আগন্তুক পথিক। পদ্মাসনে ঋজু-মেরুদণ্ড হয়ে ব'সে ছিলেন তিনি সেই প'ড়ো ঘরটির সামনের চাতালে। দেখতে দেখতে প্রায় পনেরো দিন কেটে গেছে। আরও কাটবে বোধ হয় কিছু কাল। এঁরা যতদিন না আপত্তি করেন, থাকবেন তিনি এখানে। থাকবার যে বিশেষ একটা আগ্রহ আছে, তা নয়। আগ্রহের সঙ্গত কারণ যদিও আছে একটা, কিন্তু সেটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকবার প্রবৃত্তি নেই তাঁর। থাকবেন, কারণ

কোথাও তো থাকতে হবে! এ জায়গাটা ভাল লাগছে। নদীতীর বেশ নির্জন। যে মেয়েটি ওই বাড়িটাতে থাকে, আশঙ্কা ছিল, সে হয়তো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। সে কিন্তু বিশেষ কিছুই করে না, ও-বাড়িতে কোন লোক আছে ব'লেই মনে হয় না। সামনের বারান্দায় ক্যাম্পচেয়ারে ব'সে থাকে চুপ ক'রে সামনের দিকে চেয়ে। কখনও পড়ে। বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতেও দেখা যায়। মাঝে মাঝে তাঁর কাছেও আসে, খোঁজখবর নেয়। প্রশ্নও করে দু-একটা এমন বিষয়ে, যাতে মনে হয়, মেয়েটি অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে। আগন্তুক হাসেন মনে মনে। ভাবেন, সবাই হাতড়াচ্ছে, কেউ সেটা বোঝে, কেউ বোঝে না।···ভাল লাগে মেয়েটিকে। হয়তো পিপাসা জেগেছে। মনে প'ড়ে যায় পুণার মুসলমানী সন্ন্যাসিনী হজরৎ বাবাজানের কথা। মুখময় বলি-রেখা, মাথায় শুভ্র কেশভার। চোখের দৃষ্টিতে কিন্তু শিশুসুলভ কৌতূহল যেন পাখা মেলে উড়তে চাইছে অজানার উদ্দেশে। ডানাকে দেখে শঙ্কা হয়েছিল তাঁর প্রথম প্রথম। এখন আর ভয় নেই। যে অনর্থ আশঙ্কা ক'রে মহাজনরা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন, সে অনর্থের সম্ভাবনা ডানার মধ্যে লক্ষ্য করেন নি তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে। তার তূণে অসংখ্য মোহিনী বাণ আছে তা সত্য, কিন্তু তাঁর কাছে যখন আসে, তখন তূণটা ঢেকে রাখে। তখন তার চোখে মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে, তাতে কুহকিনীর ইন্দ্রজালের আভাসমাত্র দেখতে পান নি তিনি একদিনও। বরং পথহারার অনিশ্চিত ব্যাকুলতাই লক্ষ্য করেছেন মাঝে মাঝে।

পুষ্পিত শিমুলগাছটার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। অসংখ্য লাল ফুল, বিচিত্রবর্ণ অসংখ্য পাখি, অসংখ্য রকম কাকলী।···ডানাও আছে ওর মধ্যে, তিনি নিজেও। অনন্তমুখী অনন্ত লীলার স্রোতে ভেসে চলেছেন স্বয়ং ভগবান, দেহ এবং দেহাতীত একসঙ্গে।

এই চিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন।

২

রূপচাঁদ যখন ডানার কাছে এলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সূর্যাস্তের রক্তিমাভা যদিও লেগে রয়েছে পশ্চিম দিগন্তে, কিন্তু অন্ধকার আসন্ন। রূপচাঁদ আপিস-ফেরত প্রায়ই আসেন আজকাল ডানার কাছে। অজুহাতের অভাব হয় না। শুধু তাই নয়, অজুহাতটা যে দরকার তাও মনে হয় না সব সময়ে। নানা প্রয়োজনে প্রত্যহ আসেন। কোনদিন না এলেই বরং ডানা বিস্মিত হয়।

সেদিন এসেই রূপচাঁদ যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন তাও নূতন নয়, কয়েক দিন থেকেই কথাটা বলছেন তিনি। ডানা মনঃস্থির ক'রে উঠতে পারে নি এখনও। রূপচাঁদ এসে গলাব পাকানো চাদরটি খুলে রোজ যেমন রাখেন আজও তেমনই রাখতে যাচ্ছিলেন কপাটের উপর।

ডানা বললে, "আলনা থাকতে ওখানে রাখা কেন? দিন"

রূপচাঁদ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে এবং ঘাড়টা একটু নামিয়ে এমন ভাবে চেয়ে রইলেন তার দিকে, যার অর্থ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—তুমি নেবে? এই ঘামেভেজা চাদরটা তোমার হাতে দেওয়া ঠিক হবে কি? কিন্তু এর গভীরতর যে অর্থ রূপচাঁদের মনের অন্তরালে ছিল, তা ডানা টের পাচ্ছিল না। সেটা হচ্ছে—তাই নাকি? আমার চাদরের সম্বন্ধে মমত্ব-বোধ জেগেছে নাকি তোমার? এইটেই তো প্রত্যাশা করছি।

বিনা বাক্যব্যয়ে চাদরটা তার হাতে তুলে দিলেন। তারপর চেয়ারে ব'সে পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার ক'রে একটা সিগারেট নিয়ে সন্তর্পণে ঠুকতে লাগলেন সেটা সিগারেট-কেসের উপরে।

ডানাই আবার প্রশ্ন করলে, "দেশলাই আছে তো?"

"আছে"

পকেট থেকে দেশলাই বার করে সিগারেট ধরালেন, তারপর

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কি ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত ? আমি আজ ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস্‌ অব্‌ স্কুল্‌সের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তিনি বললেন—হয়ে যাবে। তুমি দরখাস্তটা ক'রে দাও"

স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের হেড-মিস্ট্রেসের পদটি খালি হয়েছে। রূপচাঁদের ইচ্ছা, ডানা সেটির জন্য দরখাস্ত করুক। ডানার কিন্তু ইচ্ছা নয় তেমন। অথচ আর্থিক পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠছে ক্রমশ যে, অর্থাগমের কোনও একটা ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে। সেটা যে কি ক'রে সম্ভব হবে তা তার জানা নেই—রূপচাঁদবাবুর এই প্রস্তাবে তার অবিলম্বে রাজী হয়ে যাওয়া উচিত; কিন্তু কিছুতেই সে মনঃস্থির ক'রে উঠতে পারছিল না। সে বিদ্যা অর্জন করেছিল মানসিক সংস্কৃতির জন্যে, চাকরি করবার জন্যে নয়। তাকে যে কোনও দিন চাকরি করতে হবে—এ সম্ভাবনা পর্যন্ত কল্পনা করে নি কখনও সে।

রূপচাঁদ অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন, "মুদীর দোকান থেকে চাল ডাল তেল ঘি দিয়ে গেছে সব ?"

"হ্যাঁ, গেছে"

"আনন্দ তোমাকে যে চাকরটা এনে দিয়েছে, সেটা কাজ করছে তো ভাল ক'রে ? না হ'লে বল, আমার হাতে একটা ভাল চাকর এসেছে, রাঁধতেও পারে"

"না, এ বেশ কাজ করছে"

"মাইনে কত ঠিক হয়েছে ?"

"আমি কিছু ঠিক করি নি। আনন্দবাবু কিছু বলেন নি আমাকে"

"আগে থাকতে ঠিক ক'রে নেওয়া ভাল। পরে গোলমাল না হয়। আনন্দ কি এসেছিল এর মধ্যে ?"

"কাল এসেছিলেন"

"ও"

চুপ ক'রে গেলেন রূপচাঁদ। ডানাও চুপ ক'রে রইল। একটা অদৃশ্য রহস্য যেন ঘনীভূত হয়ে উঠল দুজনকে ঘিরে। সিগারেটে টান

দিয়ে রূপচাঁদ হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "দু-চার দিনের মধ্যে জন মজুর এসে পড়বে। কালই আসত, আজকাল যা পায়া-ভারী ব্যাটাদের। কনস্টেব্‌ল্‌ পাঠিয়ে তবে ঠিক করতে হয়েছে। আসবে ঠিক"

"জনমজুর কেন ?"

"সামনেই বর্ষা। এই প্রকাণ্ড খোলার বাড়ি, না সারিয়ে দিলে থাকাই যাবে না"

"কিন্তু সারাতে গেলে অনেক খরচ প'ড়ে যাবে যে—"

"তা পড়বে বইকি। বাঁশ দড়ি খাপরা সবই অগ্নিমূল্য আজকাল। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। অমরেশের টাকার অভাব নেই"

রূপচাঁদের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"তার বাড়ি সেই সারাবে। আমি শুধু ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, মানে—ঝঞ্ঝাটটা পোয়াচ্ছি"

এই শেষ উক্তিটি ক'রে রূপচাঁদ ডানার দিকে এমন ভাবে চাইলেন, যার অর্থ—তোমার জন্যেই পোয়াচ্ছি।

ডানা লজ্জিত হয়ে পড়ল। শুধু লজ্জিত নয়, শঙ্কিতও হ'ল। তার মনে হতে লাগল, একটা বেড়াজাল ক্রমশ যেন এগিয়ে আসছে তার চারিদিক ঘিরে। একটি মাত্র ফাঁক আছে—স্কুলের চাকরি নেওয়া। পরের দাক্ষিণ্যের উপর কতদিন থাকবে সে এমন ক'রে ? দাক্ষিণ্যের কি প্রতিদান প্রত্যাশা করেছে এরা ?

"আচ্ছা, স্কুলের হেড-মিস্ট্রেসের কি কোয়ার্টার্স আছে ?"

"না। যতদিন কোয়ার্টার্স না হচ্ছে, ততদিন তারা মাসে পঁচিশ টাকা ক'রে ভাড়া দেবে। এই বাড়িটাই নিতে পার তুমি, সেইটে নেওয়াই সুবিধে, কারণ অমরেশকে যে ভাড়া আমি বলব তাতেই রাজী হয়ে যাবে সে। পঁচিশ টাকা দিয়ে শহরের মধ্যে এত বড় বাড়ি তুমি পাবে না। খালি বাড়িই নেই। তোমার জন্যে খুঁজতে কসুর করি নি তো"

এই কথায় ডানা আবার মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। সহসা

আর একটা কথাও মনে পড়ল তার। রূপচাঁদবাবু কেমন সহজে 'আপনি' থেকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছেন। যদিও এতে অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছু নেই, আমাদের দেশে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বয়ঃকনিষ্ঠকে তুমিই ব'লে থাকে সাধারণত; তবু কিন্তু প্রথম যেদিন শুনেছিল, সেদিন কেমন একটু খটকা লেগেছিল। অমরেশবাবু, আনন্দবাবু—এঁরাও তো আসেন, কিন্তু এঁরা কখনও 'তুমি' বলেন না তো!। অবান্তরভাবে হঠাৎ সে ঠিক করলে, ওঁদেরও আর সে 'আপনি' বলতে দেবে না। ওঁদেরও অনুরোধ করবে 'তুমি' বলবার জন্যে। রূপচাঁদবাবু একাই ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তার দাবি করবেন কেন? কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল, রূপচাঁদবাবু দাবি করতে পারেন বইকি। একা এই বিদেশে রূপচাঁদবাবু না থাকলে কি করত সে? রূপচাঁদবাবুই তো তাকে আশ্রয় খুঁজে দিয়েছেন এবং এখনও প্রতিদিন কিসে তার সুবিধা হয় তারই চেষ্টা করছেন। অথচ এখনও পর্যন্ত তাঁর ব্যবহারে এমন কিছুই সে লক্ষ্য করে নি, যা সন্দেহজনক।…সে অন্য দিকে চেয়ে ভাবছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, রূপচাঁদবাবু নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে আছেন এবং সে চাহনি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছে তা আতঙ্কজনক নয়, অথচ ঠিক আশ্বাসজনকও নয়।

খানিকক্ষণ নির্নিমেষে ডানার দিকে চেয়ে থেকে রূপচাঁদ বললেন, "তুমি দরখাস্তটা ক'রে দাও আজই। কারণ পরশু দরখাস্ত দেবার শেষ দিন"

"ভাবছি—"

রূপচাঁদ ভাবনাটা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন মনে মনে। কিন্তু ওই একটি কথা ব'লেই ডানা থেমে গেল। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলে, তার মনের নিগূঢ় কথাটা কি তা সে নিজেই জানেনা ভাল ক'রে।

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি, এই অচেনা জায়গায় নিজেকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলাটা কি ঠিক হবে?"

"অচেনা জায়গা চেনা হতে কদিন লাগে ?"

"আমার বেশ একটু দেরি লাগে "

"রেঙ্গুন ছাড়া আর কোনও চেনা জায়গা আছে কি তোমার ?"

"না, তাও নেই"

"তবে ?"

এই ধরনের 'তবে'র উত্তর দেওয়া শক্ত, সহসা কিছু বলা যায় না। ডানা চুপ ক'রে রইল। তারপব হঠাৎ সমস্ত চোখ মুখ জ্বালা ক'রে মুখটা লাল হয়ে উঠল তার, দুঃসহ একটা বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ সে ব'লে ফেললে, "তবে এটা ঠিক যে, এখান থেকে যাবার আগে সকলকার প্রাপ্য আমি চুকিয়ে দিয়ে তবে যাব। আমাব দু-একখানা গয়না আছে এখনও—"

একটা স্নিগ্ধ হাস্যে রূপচাঁদের মুখভাবের তীক্ষ্ণতাটা কোমল হয়ে এল। বিদেশিনী বিদুষী এই তরুণীর মধ্যে চিরন্তনী নারীকে দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন তিনি যেন। ধরবার ছোবার মত কিছু যেন পেলেন একটা। এতদিন অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছিলেন। কেতাদুরস্ত মৌখিক ভদ্র আলাপের মুখোশ বিভ্রান্ত ব্যাহত করছিল তাঁকে এতদিন। আজ তার কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর ধ্বনিত হওয়াতে আনন্দিত হলেন তিনি।

হেসে বললেন, "দেখ, সস্তা কবিত্ব করবার ভারি সুন্দর একটা সুযোগ দিয়েছ তুমি। এখনই তুমি যা বললে, তার উত্তরে অনায়াসেই বলতে পারতাম, গয়না-বিক্রি-করা টাকা দিয়ে সব রকম প্রাপ্য শোধ করা যায় না, এবং সেটা মিথ্যা কথাও হ'ত না। কিন্তু আমি ওসব বলব না। আমি বরং বলব—হ্যাঁ, নিশ্চয়, সকলের ন্যায্য প্রাপ্য শোধ করতে হবে বইকি। তা না করলে আত্মসম্মান বজায় থাকে না। আর তোমার মত মেয়ের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে—এর চেয়ে শোচনীয় ছবি আমি কল্পনাও করতে পারি না। গয়না বিক্রি না ক'রেও যাতে সেটা হয়, সেই চেষ্টাই করছি আমি তাই গোড়া থেকে। আর একটা

কথাও তোমার মত মেয়ের বোঝা উচিত যে, গয়না বিক্রি ক'রে ধার শোধ করাটাও এক হিসাবে আত্মসম্মানহানিকর। উপহারের মর্যাদাকে প্রয়োজনের তাগিদে বিসর্জন দেওয়াটা কি ভাল ?"

একটানা এতগুলো কথা ডানাকে তিনি বলেন নি ইতিপূর্বে। তাঁর নিজের কানেই কথাগুলোর অতি-নাটকীয়তার ঢঙটা বিশ্রী ঠেকল। মনে হ'ল, রাশটা বোধ হয় বেশি আলগা ক'রে ফেলেছেন। অপ্রতিভ হলেন নিজের অক্ষমতায় এবং পরমুহূর্তেই এমন ভাবে সংযত করলেন নিজেকে যে, মুখের চেহারা বদলে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সিগারেটে টান দিলেন আর একটা, এবং নাক মুখ দিয়ে যে ধূম উদ্‌গিরণ করলেন তা দেখে ডানার হঠাৎ মনে হ'ল, ও সিগারেটের ধোঁয়া নয়—আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ডানা বললে, "আত্মসম্মানের চুল-চেরা বিচারই যদি করতে হয়, তা হ'লে আর একটা কথাও ভাবা উচিত"

ডানার মুখের দিকে ক্ষণকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে রইলেন রূপচাঁদ। তারপর বললেন, "কি সেটা ?"

"ঠকানোটা কি আত্মসম্মানজনক ?"

"তার মানে ?"

"যা আমি জানি না, তা করবার ভান ক'রে বেতন নেওয়াটা কি ঠকানো নয় ? ইতিপূর্বে কখনও আমি মাস্টারি করি নি। আমার বিশ্বাস, ও-বিষয়ে আমার তেমন কোনও যোগ্যতাও নেই ; একটা ডিগ্রী থাকলেই যোগ্যতা হয় না—"

"সত্যি সত্যি তোমার যাতে যোগ্যতা আছে ব'লে আমি মনে করি, তদনুসারে চলতেও তোমার বিবেকে বাধবে"—ব'লেই রূপচাঁদ থেমে গেলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আবার বললেন, "সেটা কি, তা বলতেও আমার বাধবে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এমনই বিচিত্র এবং আমাদের প্রয়োজনের তাগিদ এতই প্রবল যে, যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবার সুযোগ আমরা প্রায়ই

পাই না। জীবনে সকলকেই আপোস ক'রে চলতে হয় সব দিক বাঁচিয়ে। আমি এক কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্র ছিলাম, কেমিস্ট্রিতে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং অদ্ভুত যোগ্যতা ছিল, কিন্তু সারা জীবন আমাকে কাটাতে হচ্ছে পুলিস-সায়েবের কেরানীগিরি ক'রে। কেরানী হবার যোগ্যতা আমার ছিল না—"...হঠাৎ আবার থেমে গেলেন রূপচাঁদ। মনে হ'ল, সস্তা হৃদয়াবেগের আবর্তে খেই হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তা ছাড়া আর একটা অদ্ভুত অনুভূতি আচম্বিতে এসে অবাক ক'রে দিলে তাঁকে। মনে হ'ল, এ বিষয়ে আর বেশি কিছু বলতে গেলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়বে তাঁর। নিগূঢ় বেদনার উৎসমুখে যে কঠিন পাথরটা চাপা দেওয়া ছিল, সেটা ন'ড়ে উঠল সহসা যেন। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতার শ্মশান-ভূমি থেকে একটা হিমশীতল হাওয়া হাহাকার ক'রে চ'লে গেল যেন তাঁর অন্তরতম সত্তার ভিতর দিয়ে। মনের এই অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত হলেন তিনি। রাগও হ'ল। এমনভাবে বিচলিত হওয়ার মানে কি? সিগারেটটার দিকে এক নজর চেয়ে টান দিলেন তাতে দু-একটা, তারপর ফেলে দিলেন সেটা।

ডানা হেসে জবাব দিলে, "আপনি যা বললেন, তা ঠিকই। কিন্তু অযোগ্য কেরানী দেশের তত অনিষ্ট করে না, যত করে অযোগ্য মাস্টার বা অযোগ্য ডাক্তার। এদের হাতে দেশের প্রাণশক্তির ভার আছে। অত বড় ভার নেবার সাহস আমার নেই"

"কি করবে তা হ'লে ঠিক করেছ?"

"আমি ভাবছি, চ'লে যাব এখান থেকে। কলকাতা কিংবা বম্বে—"

রূপচাঁদের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

"তাতে লাভটা কি হবে?"

"সেখানে নিজের যোগ্যতা অনুসারে কাজ জুটিয়ে নিতে পারব একটা। ধরুন, টেলিফোনে কাজ পেয়ে যেতে পারি, কেরানীগিরিও পেতে পারি কোথাও, শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং জানা আছে আমার।

তা ছাড়া গানবাজনা শিখেছিলাম ভাল ক'রে—তাও শেখাতে পারি। বড় বড় শহরে অনেক রকম কাজ পাওয়া যায়। এসব জায়গায় মাস্টারি ছাড়া অন্য গতি নেই”

“তা ঠিক”

যুক্তিযুক্ত কথার প্রতিবাদ করা রূপচাঁদের স্বভাব নয়। কিন্তু তাঁর সমস্ত মুখে আশঙ্কার ছায়ার সঙ্গে তিক্ত বিদ্রূপের এমন একটা সম্মিলিত রূপ প্রতিভাত হয়ে উঠল, যা প্রতিবাদের চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ। একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, “তুমি যদি আমার নিজের লোক হতে, তা হ'লে তোমাকে এর আর একটা দিক দেখাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে অধিকার আমার নেই”

শশব্যস্ত হয়ে ডানা ব'লে উঠল, “না না, ও কথা বলছেন কেন? পৃথিবীতে আপনারাই এখন আমার একমাত্র আত্মীয়। আপনাদের সাহায্য না পেলে আমার যে কি হ'ত, তা জানি না। আপনাদের মতের বিরুদ্ধে আমি কিছু করব না। আমি ভাবছিলাম, কলকাতায় গেলে অন্যভাবে উপার্জনের পথ একটা পেতাম হয়তো। মাস্টারি আমি করতে পারব না”

ঘাড়টা একটু নীচু ক'রে নির্নিমেষে তার দিকে চেয়েছিলেন রূপচাঁদ অর্ধনিমীলিত নেত্রে। মনে হচ্ছিল, ডানার কথাগুলো উপভোগ করবেন কি না প্রণিধান করছেন। শুনে নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, “সত্যিই যদি তুমি আমাকে নিজের আত্মীয় ব'লে মনে কর, তা হ'লে বলছি, শোন—তোমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে হবে না তোমাকে। তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক”

“এমন ভাবে থাকা যায় নাকি?”

“কেমন ভাবে থাকতে চাও বল, তারই ব্যবস্থা করছি”

“ব্যবস্থা তো করেছেন, কিন্তু আমার অস্বস্তি লাগছে”

হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটিয়ে ব'লে উঠলেন রূপচাঁদ, “তোমার এ অস্বস্তি কেন জান?”

"কেন বলুন ?"

"তুমি সত্যি আমাকে আত্মীয় ব'লে ভাবতে পারছ না। পারলে তোমার এ অস্বস্তি হ'ত না। তুমি মুখে আমাকে আত্মীয় বলছ, অথচ তোমার ব্যবহারে সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না। আমি তোমার জন্যে সামান্য যা করছি, তার বদলে তুমি কি করবে তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ মনে মনে, অথচ ভেবে পাচ্ছ না কি ক'রে সেটা করবে"

অত্যন্ত সপ্রতিভ হাসি হেসে ডানা জবাব দিলে, "ঠিকই ধরেছেন আপনি। আপনাদের আত্মীয় ব'লে ভাবতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ব্যবহারে সেটাকে ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না। কেমন যেন বাধো-বাধো লাগছে"

"কেন ?"

আবার একটু হেসে ডানা জবাব দিলে, "কি জানি !"

রূপচাঁদও হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, "জটিল মনস্তত্ত্বের অরণ্যে প্রবেশ করলে দিশাহারা হয়ে পড়বে। ঋণ-পরিশোধ যদি করতে চাও ক'রো। কিন্তু তার জন্যে এখনই ব্যস্ত হবার দরকার নেই। প্রতীক্ষা করবার মত ধৈর্য আমার আছে…"

ধৈর্যভরে কেউ ঋণ-শোধের জন্য প্রতীক্ষা করছে—এ চিত্রটা আরও অস্বস্তিকর ব'লে মনে হ'ল ডানার। কিন্তু সে চুপ ক'রে রইল।

"দরখাস্ত তা হ'লে করবে না, এই ঠিক হ'ল তো ?"

"হ্যাঁ। ওসব থাক্ এখন"

"আচ্ছা, তা হ'লে চাদরটা দাও, এবার উঠি"

"এখনই যাবেন ? চা করতে বলেছি"

"তা হ'লে চা-টা খেয়েই যাই"

চা খাওয়ার প্রস্তাবটার মধ্যে একটা নূতন আলোক যেন দেখতে পেলেন রূপচাঁদ। রোজই তিনি চা খেয়ে যান, কিন্তু আজ যেন এটাকে একটু অভিনব ব'লে মনে হ'ল। একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তারপর সহসা সোৎসাহে বললেন, "দেখ, একটা কথা তুমি জেনে রাখ, আমি

যখন তোমার ভার নিয়েছি, তোমার ভয় নেই। তুমি যদি চাকরি করতে, তা হ'লে আমার পক্ষে সেটা সহজ হ'ত। টাকাকড়ির দিক থেকে নয়, লোকচক্ষুর দিক থেকে। একজন অপরিচিতা বিদেশিনীর এখানে থাকার একটা সঙ্গত অর্থ করতে পারত তারা, অবশ্য তাতেও যে তাদের মুখ বন্ধ হ'ত তা নয়, তবে আমার দিক থেকে দেবার মত একটা জবাবদিহি থাকত"

অপ্রত্যাশিতভাবে ডানা ব'লে উঠল, "কে কি বলবে তা নিয়ে আমার ভাবনা নেই। আমার ভাবনা—"

ব'লেই থেমে গেল সে মুচকি হেসে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন রূপচাঁদ। তবু চুপ ক'রেই রইল ডানা। কিন্তু রূপচাঁদ ছাড়বার পাত্র নন।

"তোমার ভাবনাটা কি শুনিই না, যদি বলতে তোমার আপত্তি না থাকে"

"আমার ভাবনা নিজেকে নিয়ে। নিজের কাছে যদি আমার আচরণ নিখুঁত হয়, তা হ'লে অপরের মতামতের তোয়াক্কা তত করি না। আমার নিজের আচরণ নিখুঁত হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না"

"ও"

আর কিছু বলবার পূর্বেই চা নিয়ে চাকরটা প্রবেশ করল এবং টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম রেখে চা ছাঁকতে লাগল। রূপচাঁদ নীরবে নিবিষ্টচিত্তে চাকরটাকেই লক্ষ্য করতে লাগলেন। তার চেহারা, চলন, মুখভাব, পরিচ্ছদ, চা-ছাঁকবার ভঙ্গী—প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। এইটে তাঁর একটা স্বভাব। কোনও প্রশ্ন না ক'রে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করেন, এবং যখন সেটা করেন তখন কেউ বুঝতে পারে না যে, তিনি এত বড় একটা কঠিন কাজে লিপ্ত আছেন।

চা-পর্ব নীরবেই সমাধা হ'ল।

চা শেষ হতেই উঠে পড়লেন রূপচাঁদ।

"চাদরটা দাও, এবার যাই—"

ডানা চাদর আনতে পাশের ঘরে গেল। রূপচাঁদ পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন সেটার দিকে।

ডানা ফিরে আসতেই বললেন, "একটা কথা তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে পারছি না। খোলাখুলি সেটা জিজ্ঞেস করাই ভাল বোধ হয়"

"কি কথা ?"

"আমি যে এখানে আসি যাই, তোমাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করি, এতে আর যে যা বলে আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু তোমার মনে কোন রকম সন্দেহ হয় না তো আমার সম্বন্ধে ?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন ডানার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ঠিক সত্যি কথাটা সোজা ক'রে বলতে পারলে না ডানা।

একটু হেসে বললে, "সে রকম কোনও কারণ ঘটে নি তো এখনও"

ক্ষণকাল নীরব থেকে কথাটা প্রণিধান করলেন রূপচাঁদ। তারপর বললেন, "যতক্ষণ তা না ঘটছে, ততক্ষণ আমাকে হিতৈষী আত্মীয় ব'লে মেনে নিতে আপত্তি নেই তা হ'লে ?"

"এত ভূমিকা কিসের বলুন তো—"

"তা হ'লে এইটে অসঙ্কোচে দিতে পারতাম তোমাকে"

খামটা দেখালেন।

"কি ওটা ?"

"আমি চ'লে যাবার পর খুলে দেখো"

খামটার দিকে চেয়ে মনে মনে একটু ইতস্তত করতে লাগল ডানা। তারপর মনঃস্থির ক'রে ফেললে।

"আচ্ছা, দিন"

খামটা দিয়েই বেরিয়ে গেলেন রূপচাঁদ।

ডানা খুলে দেখলে, একশো টাকার নোট রয়েছে একখানা, আর তার সঙ্গে ছোট একখানা চিঠি। ইংরেজীতে টাইপ করা।

চিঠির মর্ম ঃ—অতিশয় সসঙ্কোচে টাকাটা তোমায় দিচ্ছি। বন্ধুর সাহায্য হিসেবে নিতে যদি তোমার বিবেকে বাধে, ঋণ-স্বরূপই নিও। যখন সুবিধে হবে, শোধ দিও। বলা বাহুল্য, আমারা দিক থেকে কখনও কোনও তাগাদা থাকবে না।—নীচে কোনও নাম নেই।

ডানা নোটখানা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ নীরবে। রূপচাঁদবাবুর উপর রাগ হ'ল না। সঙ্কোচও হ'ল না তেমন কিছু। তবে তার অজ্ঞাতসারেই তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল একটু। যে নিষ্ঠুর নিয়তি তার জীবনকে সুখের শিখর থেকে চ্যুত করেছে, তারই করাল ছায়া মুখের উপর পড়ল যেন ক্ষণকালের জন্য। মনে পড়ল একটা চিত্র। তারা যখন বর্মা থেকে পালায়, তখন পথে এক হিতৈষী প্রতিষ্ঠান তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। হাজার হাজার লোক পালিয়ে আসছিল, পালিয়ে আসছিল যথাসর্বস্ব ফেলে। তফাত ছিল না ধনী আর ভিক্ষুকে। ভীত পীড়িত ভগ্নহৃদয় বুভুক্ষু জনতার সেই মিছিলটা ভেসে উঠল তার চোখের উপর আবার। হিতৈষী প্রতিষ্ঠানটি সকলের খাওয়ার আয়োজন করেছিল একটি নদীর তীরে। জলের সুবিধার জন্যই সম্ভবত। আয়োজন বিশেষ কিছু নয়। মোটা ডাল-চালের খিচুড়ি আর শাক-সবজির একটা ঘণ্ট সারি সারি পাতা পেতে দিচ্ছিল সবাইকে। জাতিধর্মনির্বিশেষে দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা তাই খাচ্ছিল সাগ্রহে বার বার চেয়ে চেয়ে। পথে উপর্যুপরি তিন দিন কোনও খাবার পাওয়া যায় নি। হঠাৎ দেখা গেল, একটি লোক খাচ্ছে না। খিচুড়ির দিকে চেয়ে পাতার সামনে ব'সে আছে চুপ ক'রে। লোভ মূর্ত হয়ে উঠেছে তার চোখের দৃষ্টিতে, কিন্তু খাচ্ছে না। হাত গুটিয়ে ব'সে আছে চুপ ক'রে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। গায়ে সিল্কের ময়লা পাঞ্জাবি, হাতে বেমানান-রকম উজ্জ্বল হীরের আংটি একটা। কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি খাচ্ছেন না কেন ?" লোকটি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে। তারপর

নিজের পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হতেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল একটু, বললে, "হ্যাঁ, খাব। তবে আমার একটা অনুরোধ যদি রাখেন।"৲ কর্মকর্তা বললেন, "কি বলুন ?" একটু ইতস্তত ক'রে লোকটি বললে, "আমার পাতাটা যদি সরিয়ে একটা আলাদা জায়গায় দেন !" কর্মকর্তা লোক ভাল ছিলেন, আলাদা জায়গাতেই খেতে দিলেন তাকে। ডানা পাশেই ছিল, সবিস্ময়ে শুনছিল সব। লোকটি পংক্তি থেকে আলাদা জায়গায় ব'সে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বোকার মত হাসতে হাসতে কর্মকর্তার দিকে চেয়ে বললে, "আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এই কয়েকদিন আগেই আমি কোটিপতি ছিলাম। আমার বাড়িতেই প্রত্যহ আড়াই শো কাঙালী ভোজন করাতাম। এখন আমি সর্বস্বান্ত, তবু ওদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ব'সে খেতে পারছি না।"—আবার ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর গপগপ ক'রে খেতে লাগল। ডানার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক সমস্ত ছেড়ে এসেছেন বর্মায়, একটি জিনিস কিন্তু ছেড়ে আসতে পারেন নি। অহঙ্কার। অনেক দিন পরে আজ আবার মনে পড়ল ছবিটা। মনে হ'ল, রূপচাঁদবাবুর টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে অশোভন আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করবে না সে।

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ল। সকালবেলা আনন্দবাবু এসেছিলেন। নদীর ওপারের আকাশটা মনোহর হয়ে উঠেছিল তখন। সাদা মেঘের বিরাট একটা জাল টাঙিয়ে দিয়েছিল কে যেন নীল আকাশপটে। আনন্দবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কথাগুলো এখনও ডানার কানে বাজছে।

"আপনি আর আমি কিন্তু ঠিক এক রকম দেখছি না। পৃথিবীতে কোনও ছুটি লোক ঠিক এক রকম দেখে না, যদিও একই জিনিস দেখে"

তারপর অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তিনি চেয়েছিলেন আকাশের দিকে। মনে হ'ল, দৃষ্টি তাঁর হারিয়ে গেল যেন ওই নীল অসীমের মাঝখানে।

হঠাৎ বললেন, "কাগজ আছে ?"

"চিঠি লেখার প্যাড আছে একখানা"
"দেবেন ? একটা কবিতা লিখতাম তা হ'লে"
তার প্যাডে একটা কবিতা লিখে রেখে গেছেন তিনি।
ডানা টেবিলের কাছে স'রে গিয়ে কবিতাটা পড়ল আবার।

আকাশ কেবল বাহিরেই নাই, সখি,
মনেরও ভিতরে আকাশ রেখেছ ঢাকি
সে আকাশ ভরি' যে তারার ঝকমকি
গভীর নিশীথে দেখেছ কখনও তা কি ?

তোমার আকাশে জাগিছে তোমারই ভাষা
হয়তো নয় তা সাবেক তপন তারা
আমার আকাশে কাঁপিছে আমার আশা
আপনার সুরে আপনি আত্মহারা
তোমার আকাশে যে রাগিণী শোন তুমি
আমার হয়তো শুনিতে আছে তা বাকি।

তোমার আকাশে যে ইন্দ্রধনু ছটা
তাহার মহিমা একাই দেখেছ তুমি
আমার আকাশে বরষার ঘনঘটা
আকুল করিয়া তোলে মোর মনোভূমি
তব অভিসার ছায়া পথে পথে যবে
ধ্রুবতারা পানে চেয়ে থাকে মোর আঁখি।

বাহির-আকাশে জাগে অনন্ত নীল
মনের আকাশে বহু বর্ণের খেলা
এ দুয়ের মাঝে আছে কি না কোনও মিল
তারই সন্ধানে বসেছে কবির মেলা
যুগ-যুগান্ত জাগিছে তন্দ্রাহীন
ছন্দে ছন্দে তাহারই হিসাব রাখি।

তুই অম্বরে বাজে গম্ভীর বাণী
জানি না কি সুরে কে যে সঙ্গীত গাহে
কান পেতে আছে কবি গুণী সন্ধানী
শিল্পী তাহারে চিত্রে আঁকিতে চাহে
বৃথা সন্ধানে হয়তো জীবন কাটে
ভুল রঙ দিয়ে সত্যের ছবি আঁকি'।

ডানার সহসা মনে হ'ল, আনন্দবাবুর কবিতা আর রূপচাঁদবাবুর একশো টাকার নোট একই জিনিষের দুই রূপ, রসায়নশাস্ত্রে যাকে বলে অ্যালোট্রপিক মডিফিকেশন। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। মনের অন্ধকারে মনে হ'ল, প্রেতের মতন কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

৩

অতিশয় উত্তেজিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজের বাড়ির পিছন দিকে। দোয়েলটা খুব ডাকছে নিমগাছের উঁচু ডালটায় ব'সে। এটা তাঁরই দোয়েল, অর্থাৎ গত বছর যে পাঁচটা দোয়েলের পায়ে তিনি রিং পরিয়ে দিয়েছিলেন, এটা তারই একটা, বাকি চারটেকে এখনও দেখতে পান নি তিনি। এটাকেও এতদিন খুঁজে পান নি। হঠাৎ আজ নজরে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক তাঁর নোট-বুক বার ক'রে তাড়াতাড়ি তারিখটা লিখে নিলেন, দোয়েলটাকে কোথায় প্রথম দেখা গেল, তাও লিখলেন। হঠাৎ আবার সেই সন্দেহটা মনে জাগল। সমস্ত শীতকাল এদের এত কম দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এরা বোধ হয় এদেশে থাকেই না। শীত একটু কমলে তবে আসে। সিন্ধু, করাচী প্রভৃতি স্থান থেকে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে দোয়েলরা যে চ'লে আসে—এ কথা লাহা

মশায় লিখেছেন। হয়তো শীতের সময় ওরা ওই অঞ্চলেই চ'লে যায়, কে জানে! শীতকালে ও-দেশের টেম্পারেচার কত থাকে একটু খোঁজ করতে হবে।···দোয়েলটা উড়ে গিয়ে বসল টেলিগ্রাফের তারের উপর। গানের ধরনটাও গেল বদলে। ধমকের সুর ফুটে উঠল। বৈজ্ঞানিক আশেপাশে চেয়ে দেখলেন, কারণটা কি, নিশ্চয় আর কেউ এসেছে। দেখতে পেলেন না কিছু। পাখিটা লেজ খাড়া ক'রে তেড়ে যেতেই চোখে পড়ল আর একটা দোয়েল। এইটেই প্রত্যাশা করছিলেন। দ্বিতীয় দোয়েলটা তাড়া খেয়ে অপরাধীর মত পালিয়ে গেল কিছুটা দূর, কিন্তু কিছু দূর গিয়েই রুখে দাঁড়াল। তাৎপর্যটা বুঝতে বৈজ্ঞানিকের দেরি হ'ল না। এ কথা বইয়ে পড়েছেন এর আগে। প্রত্যেক পাখিরই নিজের নিজের এলাকা থাকে। নিজের এলাকায় কেউ কাউকে ঢুকতে দেয় না। দুটো এলাকার মাঝখানে থাকে খানিকটা 'এজমালি' এলাকা, সেখানে সব এলাকার পাখিই যেতে পারে। দ্বিতীয় দোয়েলটি প্রথম দোয়েলের এলাকায় ঢুকে যে বে-আইনী কাজ করেছে তা বেশ জানে, তাই অপরাধীর মত স'রে পড়ল তাড়া খেয়েই। কিন্তু এজমালি এলাকায় গিয়ে, যেখানে তারও অধিকার আছে, সে আর বকুনি সহ্য করতে রাজী নয়। পালক ফুলিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। প্রথম পাখিটা তেড়ে গেল তার দিকে, দ্বিতীয়টা তুড়ুক ক'রে স'রে বসল আর একটা ছোট ডালে আর তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। অমরবাবুর মনে হ'ল, এটা গান তো নয়ই, হাহাকারও নয়, অনেকটা হুমকি-গোছের। ঘাড়ের রোঁয়াগুলো ফুলে উঠেছে, লেজটা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে বারংবার, মনে হচ্ছে—যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি বলছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু পিছু হটার ভাবও আছে। শেষ পর্যন্ত পালাতেই হ'ল বেচারীকে। প্রথম পাখিটা এমন ছোঁ মেরে তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল যে, টিকে থাকা অসম্ভব হ'ল তার পক্ষে। চোঁ-চা দৌড় দিলে বকুলগাছের পাশ দিয়ে। প্রথম পাখিটা আর পশ্চাদ্ধাবন করলে না,

ফিরে এসে বসল নিমগাছের সেই উঁচু ডালটাতে। এটা তার নিজের নিমগাছ, এর ত্রিসীমানায় দ্বিতীয় কোনও দোয়েলকে আসতে দেবে না সে আর। বৈজ্ঞানিক নিজের নোট-বুকে এই দোয়েলটির এলাকার ম্যাপ এঁকে নিলেন একটি। বকুলগাছ আর আমগাছের মাঝামাঝি জায়গাটা বোধ হয় এজমালি এলাকা। পূর্বদিকে নিমগাছ, পশ্চিমে মল্লিকের বাগানের দেওয়াল, উত্তরে মালিদের ওই ঘরটা আর দক্ষিণে আস্তাবল। প্রায় বিঘে দশেক জায়গা হবে। এইটুকুই মনে হচ্ছে এই দোয়েলটির স্বরাজ্য।...এক ঝাঁক টিয়া এসে বসল বকুলগাছটাতে, আমগাছের যে ডালটা সবচেয়ে উঁচু, তার উপর এসে বসল একটা পুরুষ টুনটুনি। কুচকুচে কালো রঙের উপর নীলের আভা বেরুচ্ছে। ডানার পাশে ছোট্ট একটু লাল জ্বলছে আগুনের মত। চি হুইট্, চি হুইট্, চি হুইট্...মুখ উঁচু ক'রে ডাকতে লাগল পাখিটা। সারি দিয়ে বাঁশপাতি পাখি উড়ছে একদল। চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—দূর থেকে ভেসে আসছে পাপিয়ার অবিশ্রান্ত ডাক।

...ক্ষণিকের জন্য আত্মহারা হয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর মনে হ'ল, তিনি যেন কোনও অবাস্তব স্বপ্নলোকে এসে হাজির হয়েছেন, যেখানে সুর আর রঙ ছাড়া প্রকাশের আর কোনও ভাষা নেই। সহসা যেন তিনি ভুলে গেলেন যে, দোয়েল পাখির জীবনের অনেক খুঁটিনাটি সংগ্রহ করতে হবে তাঁকে, অন্যমনস্ক হ'লে চলবে না। কিন্তু মনকে কি এমন ক'রে একমুখী ক'রে রাখা সম্ভব? একই মন সহস্র দিকে সহস্র ডানা মেলে উড়তে চাইছে যে অহরহ। দোয়েলের ডাকেই ঘোর ভাঙল বৈজ্ঞানিকের। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, নিমগাছের উঁচু ডালে ব'সে প্রাণ খুলে গান গাইছে। এক ঝাঁক গিটকিরি যেন অদৃশ্য পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে বাঁশীর তানে ভর ক'রে। একটু আগেই যে এই পাখিই মারমুখী হয়ে উঠেছিল, তা কে বলবে! একটু দূরে টুনটুনি ডাকছে, টিয়ার ঝাঁক বসেছে

পাশের বকুলগাছে, বাঁশপাতি পাখির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে স্বচ্ছন্দে আশেপাশে, দোয়েলের তাতে আপত্তি নেই। দ্বিতীয় আর একটি দোয়েল এলে কিন্তু ও আর কিছুতে সহ্য করবে না তাকে। আত্মীয়-প্রীতি মোটে নেই। কারই বা আছে? হঠাৎ মনে হ'ল বৈজ্ঞানিকের। আত্মীয়দের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক হয় না, কারণ তাদের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্কটা এত উগ্ররকম মুখ্য যে, প্রীতির সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যায়। তোমার সুখ-সুবিধায় ভাগ বসাতে উৎসুক তারা সর্বদা। তোমার ঐশ্বর্যে যদি ভাগ বসাতে দাও তাদের, তবু তারা সুখী হবে না, হিংসায় জ্ব'লে মরবে। জটিল মনস্তত্ত্ব। এই জন্যেই পৃথিবীর বড় বড় কাব্যের বিষয় বোধ হয় আত্মীয়-বিরোধ। বড় বড় গণিতজ্ঞ যেমন শক্ত শক্ত অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসেন, বড় বড় কবিরা তেমনই জটিল মনস্তত্ত্বের রহস্য নিয়ে আত্মহারা হতে চান—থিয়োরিটা খাড়া ক'রে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবলেন একটু। আশ্চর্য! অনাত্মীয়ের সঙ্গেই প্রেম হয়। যার সঙ্গে কোনদিন চেনাশোনা ছিল না, সেই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ। আগে সভ্যসমাজে লোকে বোনকেই বিয়ে করত, সে যখন আরও সভ্য হ'ল তখন এ প্রথা উঠে গেল। বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, পরের মেয়েকে গৃহিণী করার প্রথা শুধু যে প্রজনন-বিজ্ঞানের উপযোগিতার জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। প্রজনন-বিজ্ঞান অনেক পরের ব্যাপার। রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের সঙ্গে প্রেম জমে না—এই সত্যটাই মানুষ বোধ হয় অনেক আগে আবিষ্কার করেছিল। আবার বৈজ্ঞানিক সচেতন হয়ে উঠলেন।···চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। দোয়েলটার দিকে আবার মন দিতে চেষ্টা করলেন। ওই যে সঙ্গিনীটিও এসে নীচের ডালে বসেছেন। ভাবটা, যেন কিছুই জানেন না। ওকে কেন্দ্র ক'রেই যে এখনই অত বড় যুদ্ধ একটা হয়ে গেল, ওরই উদ্দেশে উপরের শাখায় যে অমন সঙ্গীতচর্চা চলছে, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন যেন। ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গিয়ে আর একটা ডালে বসল। যদিও গায়ের রঙ

পুরুষ পাখিটার মতই, কিন্তু অত চকমকে কালো নয়, একটু পাঁশুটের আভাস আছে। কিন্তু ওই পাঁশুটে কালোর মধ্যেই বেশ সুন্দর শ্রী আছে একটি। পুরুষটার চেয়ে একটু বেশি মার্জিতও যেন। পুরুষ পাখিটা উড়ে গিয়ে আর এক জায়গায় বসল, আবার শুরু করল গান।

...পদশব্দ শুনে বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, রত্নপ্রভা আসছেন। পিছনে একজন চাকর। তার মাথায় প্রকাণ্ড একটা আয়না।

রত্নপ্রভা বললেন, "কোথায় রাখব ?"

বৈজ্ঞানিক হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ছেলেমানুষের মত।

"ওই নিমগাছটার তলায় রাখলে কেমন হয়! গাছপালা দিয়ে একটু ঘিরে দিতে হবে কিন্তু। আর আমরা কোন্‌খানটায় বসব বল দিকি ? কাছাকাছি আমাদেরও বসবার একটা জায়গা করতে হবে, ফোটো তুলব কিনা !"

"আমাদের ছোট তাঁবুটা এখানে টাঙিয়ে দিলেই তো হয়"

"বেশ তো, তা হ'লে চমৎকার হবে"

"ওই উঁচু জায়গাটায় দিই ?"

"তা হ'লে তো গ্র্যাণ্ড হবে। গাছপালা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে কিন্তু। মানে তাঁবু-টাবু দেখে পাখিটা—"

"বুঝেছি। আগে তুমি খেয়ে নাও। চা ভিজিয়ে এসেছি"

"ও, চল"

বৈজ্ঞানিক ফিরেই দেখলেন, কবিও আসছেন।

"ও, আপনি এসে গেছেন! ভালই হয়েছে। আজ একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করব ভাবছি"

"কি ?"

"দেখতেই পাবেন, আগে চা খেয়ে নেওয়া যাক্‌, চলুন।"

গাছপালা দিয়ে ঢাকা ছোট তাঁবুটির মধ্যে অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি

ক'রে কবি আর বৈজ্ঞানিক ব'সে ছিলেন। নিমগাছের তলায় প্রকাণ্ড আয়নাটাও গাছপালা দিয়ে এমনভাবে রত্নপ্রভা রেখে দিয়েছিলেন যে, সেটাও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমালুম খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

রুদ্ধশ্বাসে ব'সে ছিলেন বৈজ্ঞানিক দোয়েলের আগমন-অপেক্ষায়। কবি নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করছিলেন এক জোড়া শালিককে। সামনের চালাটার উপর ব'সে ঘাড় নেড়ে কত কথাই বলছে যে! ওর রূপ রঙ গলার স্বর কিছুই খারাপ নয়, কিন্তু প্রত্যহ দেখে দেখে এমন হয়ে গেছে যে, মনে আর কোনও চমক লাগায় না। কেমন যেন একটা অতিপরিচিত ঘরোয়া ভাব। শালিকদের মধ্যেও পুরুষ আছে নিশ্চয়, কিন্তু ওদের পুরুষ ব'লে মনেই হয় না। উৎক্রোশ বা শিকৃরে-জাতীয় পাখিদের তো কথাই নেই, পুরুষ-দোয়েল বা নীলকণ্ঠেরও একটা পৌরুষ আছে যেন। শালিক পাখি কিন্তু অন্য রকম, অতিপরিচিতা প্রতিবেশিনী যেন। বৈজ্ঞানিক প্রায় নির্নিমেষে আয়নাটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন উপুড় হয়ে এবং কবির দিকে চেয়ে চুপিচুপি বললেন, "আপনিও এমনই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। কতক্ষণ যে থাকতে হবে ঠিক নেই।"

বৈজ্ঞানিক আর কোনও কথা বললেন না। গিরগিটির মত মাথা তুলে নিমগাছের পাতার আড়ালে ছোট্ট কি একটা পাখি চিকচিক ক'রে বেড়াচ্ছিল, সেইটেকে দূরবীন দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কবি অতি দুরূহ প্রক্রিয়ায় লিপ্ত না হয়ে শালিকটাকেই লক্ষ্য করতে লাগলেন একাগ্রচিত্তে। মাথা নেড়ে নেড়ে ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে ফুলিয়ে কত কথাই বলছে! হঠাৎ মনে জেগে উঠল কবিতা—

শালিকের সাথে মালিকের মিল যদিও আছে
কর্তার মতো হাবভাব তার মোটে নয়

আলিসার 'পরে গোয়ালের ধারে কিংবা গাছে
এ যাবৎ তার মিলিয়াছে যত পরিচয়
সে যেন কেবল গিন্নী।
ঘাড় নেড়ে নেড়ে ঝগড়া করে
খড়কুটো তুলে বাসা বানায়
পাড়াপড়শীর সঙ্গেতে ব'সে
সুখ-দুঃখের কথা জানায়।

সুবিধা মতন পোকা মাকড়টা যা পায় খোঁটে,
সইতে পারে না আদিখ্যেতা বা ঠ্যাকার মোটে,
বেরাল নেউল সাপ দেখলেই চেঁচিয়ে ওঠে,
হয়তো বা মানে সিন্নি।
সে যেন কেবল গিন্নী।

"এসেছে এইবার"

ফিসফিস ক'রে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। পিং শব্দ ক'রে শালিকটাও উড়ে গেল। তুড়ুক ক'রে কোথা থেকে নেমে এল একটা পুরুষ-দোয়েল। নেমেই ছোট্ট একটা ফড়িং ধ'রে এক ঝটকায় সেটাকে মেরে গলাধঃকরণ ক'রে ফেললে। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল একটু। একটা ভাঙা ঘুঁটে প'ড়ে ছিল, সেইটেকেই ঠোকরাতে লাগল। তারপর হঠাৎ নিজের প্রতিচ্ছবিটাকে দেখতে পেলে আয়নায়। পাওয়ামাত্রই ল্যাজটা খাড়া হয়ে উঠল সোজা। চিকচিক ক'রে গলা থেকে শব্দের স্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল যেন ছুটো। তারপর ঘাড় ফুলিয়ে তুড়ুক তুড়ুক ক'রে নাচের ভঙ্গীতে এগিয়ে যেতে লাগল আয়নার দিকে। ল্যাজটা ঠিক খাড়া আছে। ক্লিক ক'রে শব্দ হ'ল। বৈজ্ঞানিক ফোটো নিলেন। দোয়েলটা তারপর তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু আয়নায় প্রতিহত হয়ে উড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। উড়ে গিয়ে বসল পাশের পেয়ারাগাছের ডালে আর

সেখানে পুচ্ছ আস্ফালন ক'রে সুরের শায়ক বর্ষণ করতে লাগল সবেগে। তারপর হঠাৎ উড়ে গেল।

বৈজ্ঞানিকের চোখ থেকে আনন্দ যেন উপছে পড়ছিল।

"দেখলেন ?"

"হ্যাঁ, দেখলাম বইকি"

"পাখিটার চোখ দুটো লক্ষ্য করেছিলেন কি ?"

"লক্ষ্য করবার ছিল নাকি কিছু ?"

"বাঃ, ছিল বইকি! চোখের দৃষ্টিতে একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছিল। ওইটেই তো আসল। যখন ওরা প্রণয় নিবেদন করে, তখনও ওরা অমনই তুড়ুক তুড়ুক ক'রে নাচে, গানও গায়"

"মানে, রাগ আর অনুরাগের চেহারা প্রায় একই রকম ?"—হেসে বললেন কবি।

"না, তফাত আছে একটু। চোখের ভাবটা তখন বদলে যায়। অন্যরকম হয়"

"অন্যরকম মানে ?"

"মোলায়েম। অনেকটা এইরকম গোছের"

বৈজ্ঞানিক নিজের চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু ক'রে মোলায়েম দৃষ্টি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কবি হেসে ফেলতেই কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়লেন একটু।

তারপর বললেন, "দোয়েলদের স্ত্রী পুরুষ আলাদা আলাদা দেখতে। কিন্তু যেসব পাখির স্ত্রী পুরুষ এক রকম এবং তারা যখন হাজার হাজার মাইল অতিক্রম ক'রে অন্য দেশে চ'লে যায়, তখন পুরুষ-পাখিরা স্ত্রী-পাখিদের চেনে কি ক'রে? ওই ভাবভঙ্গী দেখে। ইংরেজীতে ওকে বলে 'পশ্চারিং' (Posturing)। ওদের তাড়া ক'রে যাওয়া আর প্রণয় নিবেদন করার ধরনটা প্রায় একই রকমের। স্বজাতের যে কোনও পাখি দেখলেই পুরুষ-পাখিটা ওই রকম 'পশ্চার' করতে থাকে। অচেনা পাখিটা

যদি চুপ ক'রে থাকে কিংবা গুটিস্মুটি মেরে ব'সে পড়ে, তা হ'লে বোঝা যায় যে, সেটা স্ত্রী-পাখি। কিন্তু সে যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় কিংবা তেড়ে আসে, তা হ'লে বোঝা যায়, সেটা পুরুষ-পাখি। দোয়েলের বেলায় কিন্তু ঠিক এ কথা খাটে না। কারণ স্ত্রী-দোয়েল দেখতে আলাদা। আমি দেখতে চাইছি, স্ত্রী-দোয়েলকে দেখে ওরা যেমন গান গায়, যেমন ভঙ্গী করে, পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখলেও ঠিক সে রকম করে কি না! একটু আগেই যা দেখলাম—দেখুন দেখুন, দেখলেন? একটা ঘুঘু একটা হাঁড়িচাচার পিছনে পিছনে ছুটছে। দেখেছেন? ওই দিক দিয়ে গেল”

“দেখেছি। ঘুঘুর এমন মিলিটারি ভাব কেন?”

“হাঁড়িচাঁচা ঘুঘুর ডিম খেয়ে ফেলে যে”

“বলেন কি! পাখি পাখির ডিম খায়?”

“খায় বইকি। কোনও পাখিই নিরামিষাশী নয়। হাঁড়িচাঁচাগুলো কাকের নিকট-আত্মীয় কিনা, সেজন্যে আরও বেশি আমিষভক্ত”

“কি বললেন নাম?”

“হাঁড়িচাঁচা, টাকাচোরও বলে কেউ কেউ। ইংরেজী নাম ট্রি পাই (Tree Pie), আর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ওর—”

“বৈজ্ঞানিক নামে দরকার নেই। খুব শ্রুতিকটু হবে নিশ্চয়। হাঁড়িচাঁচা নামটাও শ্রুতিকটু। টাকাচোরও সুবিধের নয়। পাখিটা দেখতে কিন্তু বেশ। হিন্দি নাম নেই?”

“আছে। কোট্রি, মহোখা”

“সেদিন যে মহোখা ব'লে একটা পাখি দেখালেন, যার বাংলা নাম ‘কুকো’?”

“হ্যাঁ, সেটাকেও মহোখা বলে—Centropus Sinensis—”

“কুকো নামটাও ভাল নয়। আমি ওর নাম দিয়েছি বাদামী-কালো। হাঁড়িচাঁচাকেও নূতন নাম দিতে হবে একটা”

“চুপ চুপ, আর একটা দোয়েল এসেছে। ওই যে—”

দোয়েলটা গাছের একটা উঁচু ডালে ব'সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধ'রে দিলে। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত চোখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কবিও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ নীরবে ব'সে রইলেন দুজনে। পাখিটা গেয়েই চলেছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "চমৎকার! নয়?"

কবি উত্তর দিলেন কবিতায়—

"সুরের আবেগে সুরের মেঘেতে সুরলোকে নাবে সুরের শ্রাবণ
সুরের ঝর্ণা, সুরের বন্যা, সুরের ফোয়ারা, সুরের প্লাবন।"

রত্নপ্রভা এসে হাজির হলেন অপ্রত্যাশিতভাবে।

ধরা-গলায় বললেন, "সবজিবাগের বাড়িতে ডানা ব'লে যে মেয়েটি থাকেন, তিনি এসেছেন"

"তাই নাকি?"

শশব্যস্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক উঠে পড়লেন।

কবি কেবল বললেন, "ও!"

তাঁর চোখের দৃষ্টি অবর্ণনীয় হয়ে উঠল।

ডানা যদিও খুব সপ্রতিভভাবে ব'সে ছিল বাইরের ঘরটাতে, মনে মনে কিন্তু তার কুণ্ঠার অন্ত ছিল না। কুণ্ঠার কারণ, অন্তরে সে ভিক্ষাপাত্র হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্তরের ভিখারিণী-ভাবটাকে সে কিছুতেই অবলুপ্ত করতে পারছিল না। আত্মসম্মান বজায় রাখবার প্রেরণাতেই এসেছিল সে, কিন্তু কামনা করছিল, আহা, যদি অন্য রকম হয়ে যায়! গম্ভীরপ্রকৃতির রত্নপ্রভা তার সামনে খাবারের থালা এবং চায়ের পেয়ালা ধ'রে দিয়ে অতিশয় সম্ভ্রমসহকারেই অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁর মনে হচ্ছিল, এই বিপন্না বিদুষী বিদেশিনীকে যতটা আপ্যায়িত করা উচিত, ততটা তিনি ঠিক পারছেন না। কথা তিনি বেশি বলতে পারেন না। যার-তার সামনে মোটা ধরা-গলায় কথা বলতে তাঁর লজ্জাও করে। কালো-কালো মুখখানিতে তাই একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছিল

তাঁর। অক্ষমতাজনিত লজ্জা, অভিজাতসুলভ ভদ্রতা এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য মিশে এমন একটা জটিল ভাব হয়েছিল, স্বল্প পরিচয়ে যার মর্মোদ্ভেদ করা শক্ত। কখনও তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করছিলেন, হাসবার চেষ্টা করছিলেন কখনও, ইতস্তত ক'রে দু-চারটি কথা ব'লে সহসা আবার এত বেশি গম্ভীর হয়ে পড়ছিলেন যে, ডানা ঠিক বুঝতে পারছিল না ব্যক্তিটি কি রকম। রত্নপ্রভাকে দেখে ডানার প্রথম বাঙালী ব'লেই মনে হয় নি। ভেবেছিল, মাদ্রাজী কিংবা সাঁওতাল আয়া বোধ হয়, বাঙালীর পোষাক প'রে আছে। পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। এ রকম বলিষ্ঠগঠন বাঙালী মেয়ে দেখা যায় না বড়। ইনিই অমরেশবাবুর স্ত্রী? রত্নপ্রভাও তন্বী ডানার মার্জিত মুখশ্রীতে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে, সপ্রতিভ স্বল্পভাষণে এমন একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না এবং যা তিনি ইতিপূর্বে আর দেখেন নি। ভারি ভাল লেগে গেল মেয়েটিকে। কিন্তু এই ভাল-লাগাটাকে কিছুতেই তিনি ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছিলেন না। এই বিদুষীর সঙ্গে ঠিক কি ভাবে আলাপ করলে যে শোভন হবে, সে রকম আলাপ করবার যোগ্যতাও যে তাঁর নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব ততটা করা উচিত—এই জাতীয় জটিল মনস্তত্ত্বের জালে জড়িয়ে প'ড়ে তাঁর আচরণ সহজ হচ্ছিল না কিছুতেই, এবং সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ছিল তাঁর চোখে মুখে। আলাপ জমছিল না কিছুতে।

ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। বৈজ্ঞানিক ও কবির পদশব্দ বারান্দায় শোনা গেল। বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরও। কবির সঙ্গে কথা কইতে কইতে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

"পাখিদের গান নিয়ে আপনারা কবিতা লিখছেন লিখুন, কিন্তু ও নিয়ে বেশ ভাল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লেখা যায়। বিদেশী লেখকরা লিখেওছেন। টার্নবুলের Bird Music বইখানা দেখেছেন আপনি? তাতে দেখবেন, পাখির সুরের বিশ্লেষণ করেছেন উনি। পাখিরা

কেন গান গায়, সেই গানের মূল উপকরণ, মানে Component Elements কি কি—"

তারপর হঠাৎ ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "ও, আপনি এসেছেন! নমস্কার নমস্কার! ভারি আনন্দিত হলাম, বসুন বসুন। আমরা দুজনে দোয়েল দেখছিলাম—"

কবিও সহাস্য দৃষ্টি মেলে চাইলেন ডানার দিকে। তাঁর মনে হ'ল, যদিও প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু যদি যেত বেশ হ'ত যে, দোয়েলের গান আর ওই ডানার রূপ আসলে এক জিনিষ। একটা কান দিয়ে মর্মে পৌঁছোয়, আর একটা চোখ দিয়ে। অমরবাবুকে বললে তিনি বোধ হয় হেসেই উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু আসলে কোনও তফাত নেই সত্যি।

ডানা বললে, "আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছিলাম"

"কি বলুন তো?"

"আমি ঠিক করেছি, কলকাতা যাব।" ডানা ক্ষণকাল থেমে রইল কি যেন একটু প্রত্যাশা ক'রে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ও, তাই নাকি? বেশ তো"

ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে সর্বস্বান্ত হ'লে মনের যে রকম অবস্থা হয়, কবির মনের অবস্থা সেই রকম হ'ল অনেকটা। খবরটা শুনে বিবর্ণমুখে নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি।

ডানা বললে, "কলকাতায় আমার তেমন চেনাশোনা কেউ নেই তো। আপনার যদি কেউ চেনাশোনা থাকে আর তাদের নামে আপনি যদি দু-একটা চিঠি দিয়ে দেন, তা হ'লে আমার একটু সুবিধে হয়"

"বেশ তো, দিয়ে দেব। কলকাতায় আপনি গিয়ে আমার বাড়িতেও উঠতে পারেন। বাড়িটা তো খালি আছে, নয়?"

"না। সেটা কালীবাবুরা নিয়েছেন"—গম্ভীরভাবে বললেন রত্নপ্রভা। তাঁর চোখে হাসির আভা ফুটে উঠল।

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে ছিল না। আচ্ছা, আমি চিঠি দিয়ে দেব"

ডানা বললে, "আর একটা কথা। আমি প্রায় দু মাস হ'ল আপনার বাড়িতে আছি। তার ভাড়াটা কত ?—চুকিয়ে দিয়ে যেতে চাই"

"বাড়ি তো আমরা ভাড়া দিই নি"—ধরা-গলায় রত্নপ্রভাই আবার বললেন, "আপনাকে থাকতে দিয়েছিলাম"

ডানা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তারপর সামলে নিয়ে বললে, "আবার অত খরচ ক'রে—"

"আপনি না থাকলেও সারাতে হ'ত। বাড়ি থাকলেই সারাতে হয়"

কথা কটি ব'লে রত্নপ্রভা স্বামীর দিকে চাইতে গিয়ে দেখলেন, তিনি ওধারে স'রে গিয়ে হেঁট হয়ে শেল্‌ফে বই খুঁজছেন। রত্নপ্রভার বড় বড় চোখ দুটি মধুর রসিকতার রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যেন কানায় কানায়। কিন্তু একটি কথা বললেন না তিনি। হাস্যদীপ্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন শুধু স্বামীর দিকে।

ডানা বললে, "আমার আর কিছু বলবার নেই তা হ'লে। আপনাদের এই অকৃত্রিম ভদ্রতার মূল্য দিতে যাওয়া বর্বরতা, কিন্তু কি ক'রে যে এর প্রতিদান দেব বুঝতে পারছি না"

হঠাৎ ডানা থেমে গেল। তার নীচের ঠোঁট দুটো ঈষৎ কেঁপে উঠল যেন। কিন্তু তা এত ঈষৎ যে, কারও চোখে পড়ল না।

কবি এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। জীবনটা যে স্বপ্ন, যা দেখছি সবই মায়া—এ ধরনের কোনও বৈদান্তিক চিন্তাকে আঁকড়ে ধ'রে তিনি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলেন না। মর্মান্তিক দুঃখটাকেই তিনি উপভোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল—

মলয় হাওয়া চলিয়া গেল
আসিল ছুটে আঁধি
তবু যে লাগে ভালো,

তোমারি তরে বিজন ঘরে
বসিয়া একা কাঁদি
জ্বালি আশার আলো।
কাননে পথে মেতেছে ঝড় কি গরজন তুলি
শিহরি ভাবি বুকেতে যারে ধরিয়াছিল ধূলি
মুছিয়া গেল বুঝি রে সেই চরণরেখাগুলি
ঘনাল ঘন কালো,
তবুও লাগে ভালো।

ডানা থেমে যেতেই তাঁর ঘোরটা কেটে গেল যেন সহসা। ডানার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "আপনি স্কুলে যে চাকরি নেবেন কথা হচ্ছিল, তার কি হ'ল ?"

"সেটা না নেওয়াই ঠিক করলাম। মাস্টারি তো কখনও করি নি, ও আমি পারব না"

বিবর্ণমুখে কবি উত্তর দিলেন, "ও। যা বলছেন তা এক হিসেবে অবশ্য ঠিক, কিন্তু আবার আরম্ভ করলে দেখতেন হয়তো অন্যরকম"

"ও আমার ভালও লাগে না"

"চলুন, আমরা ভিতরে যাই"—রত্নপ্রভা ডানার দিকে চেয়ে বললেন। তারপর কবির দিকে ফিরে বললেন, "আপনাদের আরও চা চাই নিশ্চয় ?"

বৈজ্ঞানিক বই খুঁজতে খুঁজতে বললেন, "চা নয়, কফি"

"আচ্ছা"

ডানাকে সঙ্গে নিয়ে রত্নপ্রভা ভিতরে চ'লে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক একটা পাতলা গোছের বই শেল্‌ফ্ থেকে বার ক'রে সেটার ধূলো ঝাড়লেন।

"টার্নবুলের বইখানা পেয়েছি। পাখির গান আর ভাষা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন ভদ্রলোক। পাখিরা কেন গান গায়,

তার কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টাও করেছেন। তাঁর মতে বসন্তঋতুই পাখিদের গান গাইবার একটা প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় দিয়েছেন প্রণয়লীলা—মানে, Nuptial Display"

তাড়াতাড়ি বইটার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

"এই যে, তৃতীয় কারণ দিচ্ছেন Rivalry—মানে, প্রতিযোগিতা; Defiance, অর্থাৎ যুদ্ধং দেহি ভাব এবং Assertion of Rights—মানে, নিজের অধিকার জাহির করা। আর চতুর্থ কারণ হচ্ছে, Joy and high spirits—মানে, আনন্দ স্ফূর্তি। আমরা এখনই যে দোয়েলটাকে লক্ষ্য করলাম, এর সবগুলোই তার মধ্যে পাওয়া গেল, কি বলেন? কিন্তু দাঁড়ান—"

আবার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

"এই যে—"

"কি?"

"পাখির ডাককে ইনি বারো দফায় ভাগ করেছেন। দেখা যাক, দোয়েলের মধ্যে সবগুলো পাওয়া যাচ্ছে কি না। Song Proper—মানে, রীতিমত গান, শুনেছি; Little Song—মানে, ছোটখাট গান, শুনেছি; Phrases—মানে, এমনই ডাক, শুনেছি; Chirrups, নিজেদের মধ্যে আলাপ, শুনি নি; Call Notes—আহ্বান, শুনি নি; Flight Notes—মানে ওড়বার ডাক, শুনি নি; Alarm Notes—ভয়ের ডাক, শুনি নি; Love Notes—প্রণয়-সম্ভাষণ, শুনেছি; Imprecations—অভিশাপ, শুনেছি; Cradle Notes—বাচ্চাদের সঙ্গে ওরা যে সব কথা বলে, শুনি নি; Grief Notes—ব্যথা পেলে যে ভাবে ডাকে, বোধ হয় শুনি নি। Drumming of woodpecker—এ অবশ্য আলাদা জিনিষ—"

কবি যদিও মনমরা হয়ে পড়েছিলেন একটু, তবু জিজ্ঞেস করলেন, "এত রকম ডাক আছে? একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন তো। প্রথমটা কি হ'ল?"

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

"প্রথমটা হ'ল Song Proper—মানে, পুরোদস্তুর পাবলিক গান। দোয়েল যে গানটা কোনও উঁচু ডালে ব'সে একটানা গেয়ে যায়, তার ইচ্ছেটা, যেন সবাই এ গান শুনুক। Little Song হচ্ছে ওরই ছোট সংস্করণ। আর Chirrups হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, চড়ুই বা ছাতারে যা ক্রমাগত করছে। দোয়েলের মধ্যে সেটা লক্ষ্য করি নি কখনও। দোয়েল গম্ভীর পাখি, বাজে বকবক করতে শুনি নি। Phrases—মানে, এমনই একটানা ডাক, কাক যেমন কা-কা করে বা ঘুঘু যেমন একটানা ডেকে যায়, দোয়েলের শিসটা এই ধরনের বলতে পারেন। Call Notes হচ্ছে যখন একটা পাখি আর একটা পাখিকে ডাকে কিংবা একদল পাখি যখন আর একদল পাখিকে ডাকে, তখন সেই ডাককে Call Note বলে। একদল বক বা হাঁস যখন উড়ে যায়, দেখবেন, একটা বা দুটো ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে। দোয়েলের শিসটাকে Call Noteও বলা যেতে পারে। শিস দিয়ে অনেক সময় সঙ্গিনীকে ডাকে ওরা, আলাদা কোনও Call Note শুনেছি ব'লে তো মনে হয় না। Flight Notes হচ্ছে ঠিক ওড়বার সময় অনেক পাখি একটা ডাক দিয়ে তবে ওড়ে। শালিক পিং ক'রে একটা শব্দ করে, কোকিল খুব তাড়াতাড়ি কু-কু-কু-কু ক'রে উড়ে যায়। দোয়েল নিঃশব্দে ওড়ে, ওর Flight Note শুনি নি, Alarm Noteও শুনি নি। ভয় পেলে কিংবা উত্তেজিত হ'লে Alarm Note শোনা যায়। সাপ বা বেড়াল দেখলে শালিকরা যে ভাবে ডাকে, তাই হচ্ছে Alarm Note। Love Notes মানে ভালবাসার ডাক; দোয়েলের Love Notes ভারি মিষ্টি। শোনাব একদিন আপনাকে। Imprecation হচ্ছে গালাগালি, ফিঙেদের মুখে প্রায় শুনবেন। দোয়েলরা একটা মৃদু কের্‌র্‌র্ গোছের শব্দ করে। Cradle Notes, শালিক-চড়ুইয়ের শোনা যায়, যখন তারা বাচ্চাদের খাওয়ায়। দোয়েলের শুনি নি, এবার শুনতে হবে,

বুঝলেন। আমার গোয়াল আর আস্তাবলের কার্নিসে ওরা বোধ হয় বাসা করবে, তখন শোনা যাবে। Grief Notes দোয়েলের কখনও শুনি নি, তবে শীতের সময় ওরা যে করুণ ডাক ডাকে, তাকে Grief Notes বলা যায়। সাধারণত কষ্ট পেলেই—"

মুন্সিকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

"হুজুর, পাখিগুলো বড্ড বেশি ডাকছে আজ সকাল থেকে"

"তাই না কি! খেতে দিয়েছিলি তো?"

"হাঁ, হুজুর। খাবার তো আজকাল কষ্ট নেই। মল্লিকবাবু আজকাল রোজ অনেক ফড়িং পাঠিয়ে দেন"

কবি জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ পাখিগুলো?"

"সেই রেডস্টার্টগুলো, যাদের নাম দিয়েছেন আপনি ফুলকি। এই সময় ওরা ফিরে যায় কিনা, তাই ছটফট করছে বোধ হয়। চলুন দেখি গিয়ে"

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কফির সরঞ্জাম নিয়ে একজন চাকর এসে হাজির হ'ল।

"কফিটা খেয়েই যাওয়া যাক তা হ'লে, কি বলেন? মুন্সি, তুই এগো, আমরা আসছি"

কবির কিছুই ভাল লাগছিল না। যন্ত্রচালিতবৎ তিনি কফির একটা পেয়ালা তুলে নিলেন।

বৈজ্ঞানিক কফি খেতে খেতে আড়চোখে কবির দিকে একবার চেয়ে দুষ্টু ছেলের মত একটু হেসে বললেন, "আজ কিন্তু আবার এমন একটা কাজ করতে হবে, যা হয়তো আপনার মনঃপূত হবে না ঠিক"

"কি?"

"আরও কয়েকটা রেডস্টার্ট ডিসেক্‌ট্ করতে হবে। দেখতে হবে, ওদের ওভারি (ovary) আর টেস্‌টিস্ (testes) গুলোর অবস্থা কি এখন"

কবি কফিতে চুমুক লাগিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হ'ল না, রত্নপ্রভা এসে পড়লেন। রত্নপ্রভা এসে এমন একটা কথা বললেন, যা অপ্রত্যাশিত, যা শোনামাত্র কবির অসাড় মন সজাগ হয়ে উঠল নিমেষে।

রত্নপ্রভা বললেন, "আচ্ছা, তুমি তো একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছ, তোমার ডিক্‌টেশন নেবার জন্যে, তোমার প্রবন্ধ টাইপ করবার জন্যে। এঁকেই সেই কাজটা দাও না। উনি বি. এ. পাশ, শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং জানেন। উনি মাস্টারি করতে চান না, এই ধরনের কাজ খুঁজতেই উনি কলকাতা যাচ্ছেন"

"বেশ তো! উনি যদি থাকতে রাজী হন, আমার কিছু আপত্তি নেই"

"উনি রাজী আছেন। তবে উনি আলাদা থাকতে চাইছেন, এক বাড়িতে থাকতে একটু ইতস্তত করছেন"

রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে একটা হাসির আভা ফুটে উঠল।

"যেখানে আছেন, সেখানেই থাকতে পারেন। আমার কাজের সময় পেলেই হ'ল"

অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে কবি ব'লে উঠলেন, "সে তো চমৎকার হবে!"

"চলুন, রেডস্টার্টগুলো দেখি গিয়ে, ডাকছে কেন!"

বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। কবি সোৎসাহে বললেন, "দেখুন, যদিও প্রথম প্রথম আপনার ওই ডিসেক্‌শন ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লাগত, এখন কিন্তু ভেবে দেখছি, ও রকম খারাপ লাগার কোনও মানে নেই। যা কর্তব্য তা করতে হবে"

"খারাপ-লাগা ভাল-লাগাটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রথম আমারও খারাপ লাগত, এখন কিন্তু বেশ লাগে"

"ঠিক"

দুজনে হন হন ক'রে অগ্রসর হতে লাগলেন।

৪

মন্দাকিনী খুব ভোরেই উঠেছেন সেদিন। উঠেই প্রথমে তিনি গেলেন ঘুঁটেগুলো দেখতে। কাল রাত্রে এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘুঁটেগুলো ভিজে গোবর হয়ে গেল বোধ হয়! গিয়ে দেখেন, ঘুঁটে-গুলো ভিজে তো গেছেই, একপাল গোশালিক এসে তছনছ করছে সেগুলোকে। ঠুকরে মাড়িয়ে চীৎকার চেঁচামেচি ক'রে কি কাণ্ডই যে বাধিয়েছে মুখপোড়ারা! নিরুপায় ক্ষোভে তাঁর চোখে জল এসে গেল যেন। একে আজকাল কয়লা কাঠ কিছুই পাওয়া যায় না, চাকর-বাকর নেই, ঠিকে ঝি এবেলা ওবেলা কোন রকমে বাসনটা মেজে দিয়েই পালায়, নিজের হাতেই কাল ঘুঁটে দিয়েছিলেন। সমস্ত ভিজে গেছে। গোশালিকগুলো নিমগাছটার উপর ব'সে কলরব করছিল, সেদিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে গেলেন তিনি সুন্দরীর গোয়ালে। গোয়ালেও যা দেখলেন, তা আনন্দজনক নয়। গোয়ালের চাল ছাওয়ানো নেই ভাল ক'রে, সুন্দরী সমস্ত রাত ভিজেছে বৃষ্টিতে। বাছুরটার সারা গায়ে গোবর। সুন্দরীর পিছনের পা দুটোও গোবরে মাখা। সব পরিষ্কার করতে হবে নিজেকে। হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা শক্তি সঞ্চারিত হ'ল তাঁর; উৎসাহের উৎসমুখ অবারিত হ'ল সহসা; নিজের অজ্ঞাতসারেই জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। খাদ্য পেলে পুলকিত হয় যেমন ক্ষুধার্ত, কাজ পেলে তেমনই আনন্দিত হন মন্দাকিনী। দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে তিনি বাছুরটাকে সরিয়ে বাঁধলেন, সুন্দরীকে বাইরে বার ক'রে দিলেন। আমগাছটার দিকে একবার চাইলেন, খুব মুকুল এসেছিল, বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল সব। ক্ষণকাল ধৌত-পরাগ মুকুলগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, পাপে ভ'রে রয়েছে পৃথিবী, তাই এই সব অনাসৃষ্টি হচ্ছে। গরুর দুধ নেই, খেজুরগুড়ে গন্ধ নেই, অসময়ে বৃষ্টি। সুন্দরীকে বেঁধে গেলেন তিনি বাড়ির মধ্যে। রান্নাঘরের একটা

উনুন পরিষ্কার ক'রে নিকিয়ে কাঠের জ্বালে চা করতে হবে। নিজের জন্যে নয়—ওঁর জন্যে। তারপর রান্নাঘর ধুয়ে, উনুনে ডালের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে চান করতে যাবেন তিনি। ততক্ষণ ঠিকে ঝিটা এসে যাবে, বাজার ক'রে আনবে, তারপর বাসন মাজবে, জল তুলবে, ঘরদ্বার পরিষ্কার করবে। ততক্ষণ মন্দাকিনীর স্নান সারা হয়ে যাবে, পূজোও সারা হয়ে যাবে। তারপর পাথরের গ্লাসে ক'রে একটি পুরো গ্লাস চা খাবেন তিনি। চা খেয়ে তারপর বাকি রান্নাটা করবেন। ঝি চ'লে যাবে। আনন্দবাবু তো চা খাবার পরই রোজ বেরিয়ে যান বাইনাকুলার হাতে ক'রে পাখি দেখতে। বারোটার আগে কোনও দিন ফেরেন না। এই সময়টুকুর মধ্যে মন্দাকিনী টুকিটাকি নানা কাজ করেন। সুন্দরীর তদারক করেন, খাবার করেন, বিকেলের জন্য পরোটা তরকারি করতে হয়, মাঝে মাঝে দু-একটা শৌখিন খাবারও করেন জিনিসপত্র পেলে। কাল গোয়ালার কাছ থেকে দুধ কিনে ক্ষীর ক'রে রেখেছেন রাত্রে, আজ মালপোয়া করার ইচ্ছে আছে। সোৎসাহে তিনি উনুন পরিষ্কার করতে লাগলেন। পরিষ্কার ক'রে কাঠের ঘরে গেলেন কাঠ আনতে। কাঠের ঘরের চালাটাও শত-ছিদ্র, জল প'ড়ে সব কাঠ ভিজে গেছে। ওরই মধ্যে থেকে বেছে বেছে কিছু কাঠ নিয়ে এলেন তিনি, পুরোনো খবরের কাগজ আর সামান্য কেরোসিন তেল দিয়ে ধরালেন সেগুলো। একটু ধ'রেই নিবে গেল আবার। বেশি কেরোসিন দিলে ধ'রে যেত। কিন্তু উনুন ধরাবার জন্যে বেশি কেরোসিন আজকাল খরচ করা চলে না। পয়সা ফেললে বাজারে মিলবে না। রাত্রে পড়াশোনা করবার জন্যে ওঁর তেল চাই। শুয়ে শুয়ে না পড়লে ঘুমই হয় না। যত সব বদ অভ্যাস! ঘরে আলো জ্বললে তাঁর তো ঘুমই আসে না। এই দুঃখে ওঁর কাছে শোওয়া ছেড়েই দিয়েছেন তিনি আজকাল। পাশের ঘরে শোন। উনি একা ঘরে পড়েন শুয়ে শুয়ে। কখনও বা উঠে লিখতে ব'সে যান।

অদ্ভুত মানুষ! না, কেরোসিন আর খরচ করা চলবে না। হেঁট হয়ে উনুনে ফুঁ দিতে লাগলেন আর গজগজ ক'রে গাল পাড়তে লাগলেন। আনন্দমোহনকে নয়, নিজের অদৃষ্টকেও নয়, বিধাতাকে। মন্দাকিনীর ধারণা, ওই মুখপোড়াই দুষ্টুমি ক'রে মাঝে মাঝে গোলমাল করে দেয় সব। খোকনের প্রতি তাঁর যে মনোভাব, বিধাতার প্রতিও তেমনই। এও তাঁর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস, শত দুষ্টুমি সত্ত্বেও খোকনকে যেমন শেষকালে হার মানতে হয় তাঁর কাছে, বিধাতাকেও তেমনই হবে। সেই ছেলেবেলায় পুণ্যি-পুকুর থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত তিনি যে পথে নিষ্ঠাভরে চ'লে এসেছেন, সেই পথেই তিনি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। বিধাতার সাধ্য নেই, তাঁকে আটকায়। মাঝে মাঝে তিনি দুষ্টুমি করে পথের মাঝখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন—মনের জোর আছে কি না পরীক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু ওসবে দমবার লোক মন্দাকিনী নন। কিন্তু দুষ্টুমি করার তো একটা সীমা থাকা উচিত, অসময়ে বৃষ্টি ক'রে শুকনো কাঠগুলো ভিজিয়ে দেশসুদ্ধ লোকের চোখকে ধোঁয়ায় জ্বলিয়ে দেওয়ার মানে হয় কোনও? মন্দাকিনী হেঁট হয়ে হয়ে ক্রমাগত ফুঁ দিতে লাগলেন।

কবি সকালে উঠে মুখ ধুয়েই গিয়েছিলেন ছাতে। মনটা খুব প্রসন্ন ছিল। অকারণ পুলকে ঝলমল করছিল সমস্ত অন্তঃকরণ। মোটা মোটা ঠোঁট দুটোকে কুঁচকে শিস দেবার চেষ্টা করলেন একটু। রাত্রের বৃষ্টিতে সব মলিনতা ধুয়ে গেছে যেন। গাছপালার শ্যামশোভা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দোয়েল পাখিটা ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছের ডালে ব'সে ডেকে চলেছে অবিরাম। ফিঙে একটা ব'সে আছে টেলিগ্রাফের তারে। নীলকণ্ঠ উড়ে এসে বসল একটা। কালো কালো দুর্গাটুনটুনিরা ডাকছে ক্রমাগত। হঠাৎ চোখে পড়ল, উত্তর দিকে ক্ষান্ত-বর্ষণ একটা মেঘ লম্বিত রয়েছে, তাতে রোদের আভা লেগেছে, মনে হচ্ছে একটা অপরূপ পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে কেউ যেন। মনে পড়ল কুমারসম্ভবের শ্লোক—

যত্রাংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাং যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্
দরীগৃহদ্বার বিলম্বিবিম্বাস্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তী।

কল্পনায় জেগে উঠল হিমালয়ের গুহাভ্যন্তরে নগ্না কিন্নরীকুলের লজ্জা-নিবারণের জন্য মেঘ যবনিকার মত ঢেকে দিয়েছে গুহামুখ। অদ্ভুত কল্পনা কালিদাসের। স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ সেদিকে। গিটকিরিভরা এক ঝাঁক সুর আছড়ে পড়ল সহসা তাঁর চেতনায়। উজ্জয়িনী থেকে ফিরে আসতে হ'ল, নেমে পড়তে হ'ল হিমালয় থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন সজনে গাছের উপর একঝাঁক পাখি ডাকছে। তাড়াতাড়ি নেবে গেলেন নিজের তেতলার ঘরটিতে। দূরবীনটা নিয়ে দেখতে লাগলেন ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে। জানলার ভিতর দিয়ে গাছটা স্পষ্ট দেখা যায় আরও। বিস্মিত হয়ে গেলেন দেখে। গোশালিকের ঝাঁক। গোশালিকের এত রূপ! এত সুর তার কণ্ঠে! যে গোশালিকের দল একটু আগে মন্দাকিনীর ক্রোধের কারণ হয়েছিল, তারাই জাগাল কবির মনে কবিতা—

রূপ যে তোমার নতুন ক'রে
দেখতে পেলাম আজকে মিতা
ও গোশালিক, দেখতে পেলাম
তুচ্ছ তো নও, রূপান্বিতা!
দেখতে পেলাম ভোরের আলোয়
মানিয়েছে বেশ সাদায় কালোয়
ঠোঁটে তোমার রঙ মেহেদি
চোখ মেলে তো দেখিই নি তা।

দোয়েল শ্যামা বুলবুলিরা
সুর-গরবে অহঙ্কারী
শুনুক তারা কণ্ঠে তোমার
উঠছে সুরের কি ঝঙ্কারই

অতি-চেনার বোরখা প'রে
দাঁড়িয়েছিলে ঘরের দোরে
বেরিয়ে এলে বোরখা খুলে
অর্থটা তার বলবে কি তা ?
রূপ যে তোমার নতুন ক'রে
দেখতে পেলাম আজকে মিতা।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন। ক'রেই বললেন, "তোমার কি ভীমরতি ধরেছে নাকি! রাঁধুনী বামুন রাখতে চাইছ, টাকা কোথায় অত ?"

"রাঁধুনী বামুন !"

স্বপ্নলোক থেকে নেবে এলেন কবি এবং নেবে এসেই সচেতন হলেন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে।

"একটা মৈথিল বামুন এসেছে। বলছে, তুমি নাকি রূপচাঁদবাবুকে বলেছিলে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। এই খরচই কুলোতে পারছি না, আবার বামুন কেন ?"

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন কবি।

বললেন, "হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে রূপচাঁদকে। এসেছে বামুন ? রাখ না। খেটে খেটে মরবার যোগাড় হয়েছ যে !"

মন্দাকিনী মনে মনে প্রীত হলেন একটু। মুখে কিন্তু বললেন, "খাটলে আবার মানুষে মরে নাকি ? কাজকর্ম না থাকলে সমস্ত দিন করবই বা কি ?"

"কাজের ভাবনা কি ? এস না, দুজনে মিলে পাখি দেখি। কি অদ্ভুত যে—"

"হয়েছে"—হেসে ফেললেন মন্দাকিনী। "নাও, চা-টা খেয়ে নাও, পেয়ালাটা নিয়েই যাই"

কবি ডিশে ঢেলে ঢেলে চা খেতে লাগলেন। চলকে খানিকটা চা প'ড়ে গেল কাপড়ে।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন মন্দাকিনী, "আবার কাপড়ে চা ফেললে তো! সমস্ত কাপড়গুলোতে দাগ হয়ে গেছে! চায়ের দাগ সহজে কি উঠতে চায়?"

কবি হেসে বললেন, "ওঠাবার দরকার কি, থাক্ না"

"ওসব নোংরামি আমি দেখতে পারি না"

দুজনেই চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। গোশালিকের কলরব আবার উদ্দাম হয়ে উঠল নিমগাছে। কবির চোখ আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সমস্ত চা-টা ডিশে ঢেলে এক নিমিষেই পান ক'রে ফেললেন সবটা।

"বামুনটাকে রাখ, বুঝলে? পাখি যদি একবার দেখতে আরম্ভ কর, তা হ'লে বুঝবে, কি চমৎকার জিনিস ও। এই গোশালিকই এতদিন অচেনা ছিল আমার কাছে"

কবি হঠাৎ একটা প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি তুলে চাইলেন তাঁর স্ত্রীর দিকে। মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগল, গোশালিকের মধ্যে তিনি যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে নূতন রূপ আবিষ্কার করেছেন, তাঁর প্রৌঢ়া গৃহিণীর মধ্যেও হয়তো তিনি আজ তেমনই আবিষ্কার ক'রে ফেলবেন সঙ্গিনীকে, যে শুধু তাঁর সন্তানের জননী নয়, সংসারের কর্ত্রী নয়, যে তাঁর কবি-মানসের বিবিধ বিচিত্র খেয়ালের সহচরী। মন্দাকিনীর উত্তর শুনে কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ হতে হ'ল তাঁকে।

"ঝ্যাঁটা মারি আমি গোশালিকের মুখে। সমস্ত ঘুঁটেগুলোকে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে, নখ দিয়ে খুঁড়ে তছনছ করেছে একেবারে"

"ও বেচারাদের চ'রে খেতে হবে তো! ওদের তো আর পেনশন নেই আমার মত"

এর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই অনুভব করলেন না মন্দাকিনী। ঘরের কোণে যে ফুল-ঝাড়ুটা রাখা ছিল, সেটা নিয়ে তিনি কবির বই-রাখা শেল্‌ফগুলো ঝাড়তে লাগলেন। প্রচুর ধুলো জমেছিল। কবি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। কৃতজ্ঞতায় সমস্ত মন ভ'রে

উঠল সহসা। বারো বছর বয়সের যে কিশোরীটিকে বিয়ে ক'রে এনেছিলেন তিনি বহুকাল পূর্বে, তাকে যেন তিনি দেখতে পেলেন হঠাৎ। সেই থেকে ক্রমাগত সেবা ক'রে চলেছে। কিছুতেই থামবে না। মন্দাকিনীর মত স্ত্রী না পেলে কি তাঁর মত মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভব হ'ত? সংসারের কোন আঁচটি তাঁর গায়ে লাগতে দেয়নি। তখনই কিন্তু মনে হ'ল, তা দেয় নি বটে, কিন্তু মন্দাকিনী তাঁর জীবনে ঠিক সেই প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছে কি, যার জন্যে তাঁর কবি-চিত্ত সতত উন্মুখ হয়ে আছে? এমন একটি মহিমময় মহূর্ত মন্দাকিনী তাঁর জীবনে মূর্ত ক'রে তুলতে পেরেছে কি, যার জন্যে সমস্ত সুখ-সুবিধা তুচ্ছ ক'রে অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়তেও লোকে ইতস্তত করে না? তিনি কবি, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ তিনি, তাঁর সমিধ-সম্ভারে একটি স্ফুলিঙ্গও দিতে পেরেছে মন্দাকিনী কোনও দিন? সে আগুনের জন্যে বারে বারে তাঁকে অপরের দ্বারস্থ হতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। ডানার মুখখানা মনে পড়ল। এমন অদ্ভুত একটা বহ্নি আছে মেয়েটির মধ্যে, যার সান্নিধ্যে এলেই সমস্ত মন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। না, ঠিক যৌন-লালসা নয় এটা— বৈজ্ঞানিকেরা যা-ই বলুন, আকর্ষণ মাত্রেই যৌন-আকর্ষণ নয়। লোহার সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্কটা কি যৌন? একএকটা বিশেষ লোককে দেখলেই মনে হয়, এই তো সে, যাকে খুঁজছিলাম এতদিন, তা সে নারী পুরুষ যে-ই হোক। তার কাছে গেলেই মনে ছবি জাগতে থাকে উদার আকাশের, দিগন্তবিস্তৃত মাঠের, দুরারোহ পর্বতের, সীমাহীন সমুদ্রের। অপূর্ব পুলকে সমস্ত চিত্ত ভ'রে ওঠে, অদ্ভুত উৎসাহ সঞ্চারিত হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, কোনও কিছু অসম্ভব ব'লে মনে হয় না, মনে হয়, সব পারব, মন ডানা মেলে উড়তে চায়। মন্দাকিনী ঠিক এ জাতের নয়। মন্দাকিনী বিচক্ষণ সচিব, অভিজ্ঞ গৃহিণী। কিন্তু প্রিয়সখী নয়, ললিতকলাবিধির কোনও ধার ধারেনা ও।

আশ্চর্য, ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মন্দাকিনীও ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন। নিজের চরিত্রে বা আচরণে যদিও কোন দোষ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না, কবির কবি-প্রতিভা সম্বন্ধেও হঠাৎ তিনি যে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তাও নয়, তবু কেমন যেন আবছাভাবে তাঁর মনে হচ্ছিল, এ লোকটির ঠিক সঙ্গিনী তিনি হতে পারেন নি। মনে হওয়ামাত্রই রাগ হ'ল তাঁর, নিজের উপর নয়—কবির উপর। বুড়ো বয়সে ওই সব ছেলেমানুষি মানায় নাকি! সঙ্গে ক'রে তীর্থে নিয়ে যেতে চাও রাজী আছি, পাখি দেখে বেড়াবার বয়স আছে কি আর এখন? ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন একবার। কবি জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে। আশ্চর্য মানুষ! হেঁট হয়ে শেল্‌ফের তলার ধূলোগুলো পরিষ্কার ক'রে নিলেন। একটা কাগজে সেগুলো নিপুণভাবে তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। আবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। তখনও দাঁড়িয়ে আছেন কবি নিস্পন্দ হয়ে, চোখে দূরবীন।

"কি দেখছ অত তুমি?"

কবি চমকিত হলেন। তারপর হেসে বললেন, "একটা ফিঙে। ফিঙে দেখেছ ভাল ক'রে কখনও? ওয়াণ্ডারফুল!"

"টেলিগ্রাফ পোস্টের ওপর কি চমৎকার ব'সে আছে তখন থেকে! কুচকুচে কালো, গা থেকে রোদ পিছলে পড়ছে যেন! সূর্য যেন শত ধারায় সোনা ঢালছে ওর গায়ে আর ও যেন ঘাড় বেঁকিয়ে বলছে, চাই না তোমার সোনা, নিয়ে যাও, নিছক কালোই ভাল আমার, অলঙ্কার দরকার নেই, থ্যাঙ্ক্‌স!"

হেসে ফেললেন মন্দাকিনী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তরও স্নেহে বিগলিত হয়ে পড়ল যেন। চুলে পাক ধরলে কি হবে, লোক নিতান্ত ছেলেমানুষ এখনও। ছি ছি, এ রকম লোককে নিয়ে কি সংসার করা চলে?

"দেখবে?"

"ওসব ছেলেমানুষি করবার সময় নেই আমার এখন"

মুখে যদিও এ কথা বললেন, কিন্তু মনে মনে দেখবার লোভ যে একটু ছিল না তা নয়।

"একটুখানি দেখ না—"

খুব অনিচ্ছাসহকারে যেন কবিকে বাধিত করবার জন্যেই এগিয়ে এলেন মন্দাকিনী। দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখলেন ফিঙেটাকে। বাঃ, বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে তো! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে ছুটলেন দ্বারের দিকে—"ওই যাঃ, ডালটা পুড়ল বোধ হয়, গন্ধ ছাড়ছে, কি যে ছেলেমানুষি কর তুমি!" পর-মুহূর্তেই বেরিয়ে গেলেন। কবি দেখতে লাগলেন ফিঙেটাকে আবার। একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। কাল ভোরে অদ্ভুত রকম মিষ্টি সুরে একটা পাখি ডাকছিল। উঠে টর্চ ফেলে দেখেছিলেন, অভিনব কোন পাখি নয়, ফিঙে। পাশে সঙ্গিনীটিও ব'সে আছে বলে মনে হ'ল। কি রে মেকি কি মেকি কি মেকি কি—ক্রমাগত ডেকে চলছে। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে পূর্বাকাশে। কি রে মেকি কি মেকি কি মেকি কি। কবির হঠাৎ মনে হ'ল, যা কিছু মেকি তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে ও যেন। সূর্যের সোনা ও চায় না, ফরসা হবার কোনও লোভ নেই ওর। আফ্রিকার জুলুর মত, ভারতবর্ষের কালা-আদমির মত কৃষ্ণবর্ণের গৌরবেই ও গৌরবান্বিত, আর সেটাকে প্রচারও করতে চায় স্পষ্টভাবে। শ্বেতাঙ্গদের বহু শতাব্দীর অত্যাচারের আগুন ওর বুকের ভিতর জ্বলছে। ভোরবেলায় প্রিয়াকে সম্বোধন করবার বেলাতেও তাই বোধ হয় ওর মনে হয়, এও মেকি নয় তো? সুরে সুরে বার বার প্রশ্ন করছে তাই—কি রে, মেকি কি, মেকি কি, মেকি কি?

ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—
চেনে নি তোমায় আজও যাহারা

কোন দেশে বাস করে তাহারা
উদ্যত ওগো কালো পতাকা
সদা-জাগ্রত কড়া পাহারা
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

কখনও বসিয়া আছ সু-উচ্চ টেলিগ্রাফ পোস্টে
গরু ছাগলের পিঠে কখনও বা ভ্রমিতেছ গোষ্ঠে
ফিং দিয়ে ছুটে যাও কখনও বা পতঙ্গ লক্ষ্যি'
ওগো ফিঙে পক্ষী,
খাইয়া তোমার তাড়া
কাক চিল পাড়াছাড়া
নিমেষে
ঠোকর খাইয়া মরে যদি হয় এতটুকু ঢিমে সে।
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

বুকে যে আগুন জ্বলে সারা গায়ে তারই কালো ঝুল কি ?
জ্বলজ্বলে লাল চোখে দেখা যায় বুঝি তারই ফুলকি,
তাই বুঝি চোখে মুখে ফুটে আছে 'আয় দেখি' ভঙ্গী
ওগো ফিঙে জঙ্গী,
পুচ্ছেতে এক জোড়া
বাঁকা বাঁকা কালো ছোরা
শাণিত
জবাব তখুনি দেবে যদি কেউ করে অপমানিত।
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

আঁধার রজনী-শেষে আলোর আভাস যবে ঝলকে
প্রেয়সীর দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের সুর তোলে বল কে
মেকি কি মেকি কি তুমি বল বল জীবনের সঙ্গী—
ওগো ফিঙে রঙ্গী

তখন যে গাও গান
ওঠে রসিকের প্রাণ
মাতিয়া
রাগে আর অনুরাগে প্রেয়সীও ওঠে বুঝি তাতিয়া
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

কবিতাটা লিখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। জানলা দিয়ে চেয়ে রইলেন দূরে। হঠাৎ মনে হ'ল, বসন্তের আগমনে সমস্ত প্রকৃতি উৎসবে মেতেছে, কর্ণিকার ফুলের কি অদ্ভুত স্বর্ণকান্তি, অশোক-গুচ্ছের কি রূপ!

কু-কুক্-কুক্-কুক্—

কলকণ্ঠে সাড়া দিয়ে উড়ে গেল একটা স্ত্রী-কোকিল। সূর্যের সোনালী আলোয় ঝলমল ক'রে উঠল তার জংলা শাড়িখানা।

মন্দাকিনী এক কাপ দুধ হাতে ক'রে প্রবেশ করলেন।

"বুঝলে, সুন্দরীর দুধ আজকাল এত ঘন হয়েছে যে, চড়িয়ে উনুন-গোড়া থেকে নড়বার জো নেই, সঙ্গে সঙ্গে তলা ধ'রে যাবে"

"ডালটা পুড়ে গেল?"

"না। খুব বেঁচে গেছে"

মন্দাকিনীর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

কবি দুধের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "বামুনটা রাখ, কত আর খাটবে?"

"তুমি বোঝ না, রাখব কি ক'রে, মাইনে দিতে হবে তো একটি কাঁড়ি?"

"কিছু টাকার যোগাড় হয়েছে"

"কোথা থেকে?"

"আমি রঘুবংশ আর কুমারসম্ভবের যে নোট লিখেছিলাম গেল বছর, সে দুটো একজন ছাপাতে চায়, মাসে আমাকে আশি টাকা ক'রে দেবে বলছে"

খুব খুশি হলেন মন্দাকিনী এ সংবাদে।

"তবে রাখ। মাইনে ঠিক করেছ কিছু ?"

"না। তুমিই যা হয় কর না গিয়ে"

সানন্দে মন্দাকিনী নীচে নেমে গেলেন।

কবিও বাইনাকুলার নিয়ে বেরুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে অমরবাবুর চাকর মুন্সি এসে গোটা দুই বই দিলে তাঁর হাতে। অমরবাবু একটা ছোট চিঠিও লিখেছেন,—এই বই দুটো উলটে পালটে দেখবেন। সাধারণ পাখিদের অনেক খবর আছে এতে। আমাদের বাড়ির সামনে 'চোখ গেল' খুব ডাকছে। পাখিটাকে দেখতে পাই নি এখনও। একটু খুঁজলেই দেখতে পাওয়া যাবে। দেখতে চান তো আসুন।

কবি বই দুটো টেবিলে রেখে বেরিয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে।

৫

রূপচাঁদ মৌলিক আপিসে বেরিয়ে গেছেন। বকুলবালা নিজের ঘরে তন্ময় হয়ে ব'সে আছেন তাঁর নূতন খেলনাটি নিয়ে। কাল রূপচাঁদ হলদে পাখিটি এনে দিয়েছেন তাঁকে। আনন্দবাবু যে কবিতাটা লিখে দিয়েছেন সেটা বড় বড় ক'রে লিখে দিয়ে গেছেন রূপচাঁদ একটা কাগজে। কিন্তু কবিতাটা বড়—অত বড় কাগজ খাঁচায় ঠিক সাঁটা যাচ্ছে না। বকুলবালা শেষে ঠিক করলেন কাগজটা দেওয়ালে ছবির মত ক'রে টাঙিয়ে দেবেন। টাঙিয়ে তার পাশে খাঁচাটা টাঙিয়ে দেবেন। অনেক খুঁজে খুঁজে পেরেক বার করলেন চারটে। তারপর রান্নাঘর থেকে নোড়া নিয়ে এলেন। নোড়া দিয়ে পেরেক ঠুকতে গিয়ে আঙুলে লাগল দু-একবার। কিন্তু বকুলবালার তাতে গ্রাহ্য নেই। অনেক কষ্টে হেঁট হয়ে হয়ে চারটে পেরেকই ঠুকে ফেললেন তিনি। কিন্তু ঘরের দেওয়াল পাকা

ভাল ক'রে ঠোকা গেল না, ঠোকবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পেরেক প'ড়ে গেল, কবিতার কাগজটা বেঁকে গেল। রোখ চ'ড়ে উঠল বকুলবালার। খানিকটা ময়দা বার ক'রে গুললেন প্রকাণ্ড এক অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে, তারপর ঘুঁটে জ্বেলে উনুনটা ধরিয়ে ফেললেন। ধোঁয়ায় চোখ লাল হয়ে জল পড়তে লাগল। কিন্তু এসবে নিরস্ত হবার পাত্রী বকুলবালা নন। একবার যখন ঝোঁক উঠেছে কাগজটাকে সাঁটতে হবে, তখন না সেঁটে কিছুতেই ছাড়বেন না তিনি। আঠা হয়ে গেল। কিন্তু ভয়ানক গরম। বাটিটাকে সাঁড়াশি দিয়ে এক চৌবাচ্চা জলের উপর ধ'রে রইলেন। সমস্ত চৌবাচ্চার জলটা যে কালো ভুসোতে ভ'রে গেল সেদিকে খেয়াল নেই। একটু ঠাণ্ডা হতেই তুলে নিয়ে এলেন সেটাকে, হাত দিয়ে দেখলেন, বাটিটা ঠাণ্ডা হয়েছে বটে, কিন্তু আঠা এখনও বেশ গরম। কতক্ষণ চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে রাখবেন তিনি? উঠে গিয়ে মশারির চাল থেকে পাখাটা নিয়ে এলেন—পাখার বাঁট দিয়ে দিয়ে আঠা মাখাতে লাগলেন কাগজটায়। খুব বেশি ক'রে ক'রে লাগিয়ে দেওয়ালে সেঁটে দিলেন কাগজটা। তারপর একটু দূরে স'রে গিয়ে দেখলেন। বাঃ চমৎকার হয়েছে, আনন্দে হাততালি দিয়ে আপনার মনেই নেচে উঠলেন একবার। কিন্তু ওখানে খাঁচাটাকে টাঙাবেন কি ক'রে? ওখানে তো খাঁচা টাঙানো যাবে না। কি করা যায়? ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর এক ছুটে ঘরের মধ্যে চ'লে গেলেন। ঘরের ভিতর রূপচাঁদের রিভল্‌ভিং বুক-শেল্‌ফ্ ছিল একটা। বেশ উঁচু। সমস্ত বইগুলো বার ক'রে স্তূপীকৃত করলেন মেঝের উপর। তারপর হিড়হিড় ক'রে বুক-শেল্‌ফটাকে টেনে নিয়ে গেলেন বাইরে, দেওয়ালে যেখানটায় কবিতা লেখা কাগজটা সাঁটা ছিল সেইখানে। উঃ, ভারী কি কম! জগদ্দল পাথর যেন একটা। হাঁপাতে লাগলেন। বিরক্তি ফুটে উঠল সারা মুখে। কিন্তু খাঁচাটা তার উপর রাখতেই আনন্দে হেসে উঠল আবার চোখ দুটি। কি চমৎকারই না

দেখাচ্ছে! বাঃ! রিভল্‌ভিং শেল্‌ফটা ঘোরালে কিন্তু ভয় পাচ্ছে পাখিটা।

"ভয় লাগছে বুঝি? আচ্ছা, আর ঘোরাব না"

খাঁচার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মুচকি হেসে সান্ত্বনা দিলেন তাকে বকুলবালা।

"কই, কথা বল একটা, শুনি!"

পাখির কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

"কথা বলবে না?"

তবু কোন উচ্চবাচ্য করে না বেনে-বউ।

"ও বাবা, রাঙা মূলো নাকি তুমি?"

পাখি নীরব।

"ভাব করবে না আমার সঙ্গে?"

বেনে-বউ ভাব করবার কোনও লক্ষণই প্রকাশ করলে না।

"এমনই গোমড়া মুখ ক'রে ব'সে থাকবে নাকি রাতদিন? তবেই তো হয়েছে! আমার মদনলাল খুব লক্ষ্মী—মদনলাল, তোমার কথা শুনিয়ে দাও তো ওকে"

বারান্দার কোণে লোহার খাঁচায় মদনলাল ব'সে ছিল লোম ফুলিয়ে চোখ বুজে। প্রবীণ একটি চন্দনা। ডাক শুনে চোখ খুললে।

"কথা শুনিয়ে দাও ওকে। বল—"

মদনলাল চোখ মিটমিট করতে লাগল, তারপর ব'লে উঠল হঠাৎ, "শিউজি, গোটি পী যাও, গোটি পী যাও, শিউজি, গোটি পী যাও—"

পশ্চিমের একজন কন্‌স্টেব্‌ল চন্দনাটিকে এই বুলি শিখিয়েছিল।

"শুনলে তো? তুমিও কথা বল একটি, শুনি"

বেনে-বউ গম্ভীর হয়ে রইল, একটি কথা বললে না।

"খিদে পেয়েছে নাকি? খাবে? দিচ্ছি, দাঁড়াও, ভাল পেঁপে আছে। পেঁপে খেয়ে কথা বলতে হবে কিন্তু"

একটা পেঁপে বার ক'রে কাটতে ব'সে গেলেন বকুলবালা।

পেঁপে কাটতে দেখে তাঁর সব পাখিগুলোই চঞ্চল হয়ে উঠল। দাঁড়ের উপর দুলতে লাগল টিয়াটা। ময়নাটা ব'লে উঠল, 'ওগো, শুনছ!' বুলবুলির কণ্ঠে ফুটে উঠল কুটুর কুটুর আওয়াজ। শ্যামা শিস দিয়ে উঠল। 'শিউজি, গোটি পী যাও'—মদনলাল নিজের কৃতিত্ব জাহির করলে আবার। তাদের দিকে একটা রোষদৃষ্টি হেনে বকুলবালা বললেন, "এখুনি তো খেয়েছ সব, আগে ওকে দিই, তারপর তোমাদের দিচ্ছি"

পেঁপে খেয়ে বেনে-বউ কিন্তু উল্লসিত হ'ল না তেমন। একবার ঠুকরে দেখলে, তারপর ব'সে রইল চুপ ক'রে। বকুলবালা তাঁর প্রত্যেক পাখিকে এক টুকরো ক'রে দিয়ে আবার এসে দাঁড়ালেন বেনে-বউয়ের খাঁচার সামনে।

"কই, খাচ্ছ না যে তুমি? পেঁপে ভাল লাগে না বুঝি? আমার মতন অবস্থা বুঝি তোমার? আমারও ভাল লাগে না পেঁপে। লজেঞ্চ খাবে? চকোলেট?"

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে লজেঞ্চ আর চকোলেট নিয়ে এলেন।

"এই নাও"

একটা লজেঞ্চ আর একটা চকোলেট খাঁচার মধ্যে ফেলে দিলেন। বেনে-বউ নির্বিকার।

"এও খাবে না? ও বাবা! বুঝেছি, আসলে তোমার দুষ্টুমি। কিছু শুনছি না আর। কথা বল এবার। বল না একটা কথা। বল, লক্ষ্মীটি"

বহুবার অনুরোধ ক'রেও বেনে-বউয়ের কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পেলেন না বকুলবালা। হঠাৎ রাগ হ'ল।

"তবে রে মুখপোড়া, আমাকে চিনিস না?"

পাখাটা তুলে ঘা কতক বসিয়ে দিলেন খাঁচারই উপর।

পাখিটা ত্রস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু একটি শব্দ করলে না। পাখাটা ফেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পাখিটার দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ বকুলবালা। তারপর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল হঠাৎ আবার। অমন সুন্দর পাখিটাকে কি বেশি নির্যাতন করা যায়? কিন্তু কি মুশকিল, কথা যদি না বলে, তা হ'লে ও পাখি নিয়ে কি হবে? পাখিটা বোবা নয় তো? মানুষের মধ্যে যেমন বোবা আছে, পাখিদের মধ্যেও হয়তো থাকে। হয়তো পাখিওলা ঠকিয়ে একটা বোবা পাখি বিক্রি ক'রে গেছে। আর একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন পাখিটার দিকে। কি চমৎকার গায়ের রঙ! হঠাৎ হিংসে হ'ল। বলে উঠলেন, "আমারও হলদে রঙের শাড়ি আছে, দামী রেশমী শাড়ি, তোর মত আমিও সাজতে পারি, দেখবি?" তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন বকুলবালা এবং হলদে শাড়িখানা বার ক'রে সত্যি সত্যি সাজতে ব'সে গেলেন। শাড়ি প'রে মাথার চুল আঁচড়ে এমনভাবে ফিতে দিয়ে বাঁধলেন যে, খানিকটা চুল গলায় এবং পিঠের উপর পড়ল গিয়ে। বেনে-বউয়ের মাথা আর গলার কাছটা যেমন কালো, অনেকটা তেমনই দেখাতে লাগল। তারপর ঠোঁটে রঙ দিলেন বেশ ভাল ক'রে। টুকটুকে হ'ল ঠোঁট দুটি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে দেখলেন খানিকক্ষণ। তারপর রূপচাঁদের কালো মাফলারটা বার ক'রে সেটা কোমরে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন দু পাশ দিয়ে, তারপর বেরিয়ে গিয়ে বাইরে চৌকিটার উপর উপুড় হয়ে পাখির মত ব'সে বেনে-বউকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "এই দেখ, তোমার চেয়ে কিছু কি খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে? এস, এইবার ভাব কর আমার সঙ্গে। কথা বল একটি".

বেনে-বউ তবু কথা বলে না।

এইবার কবিতাটার দিকে নজর পড়ল বকুলবালার। তাঁর মনে হ'ল, ওর সম্বন্ধে যে কবিতাটা লেখা হয়েছে, সেটা তো শোনানো

হয় নি ওকে। তাই অভিমান ক'রে ব'সে আছে নাকি? কিন্তু কবিতা কি ক'রে প'ড়ে শোনাবেন এখন? তিনি তো পড়তে জানেন না! হঠাৎ একটা গভীর বেদনায় টনটন ক'রে উঠল সমস্ত মনটা। কবিতাটা রূপচাঁদ প'ড়ে শুনিয়েছিলেন তাঁকে—মনে করবার চেষ্টা করলেন লাইনগুলো। 'কও না কথা হলদে পাখি'—এই লাইনটা মনে পড়ল শুধু। আর কিছু মনে পড়ল না। কেমন একটা অস্বস্তি লাগল, উঠে পড়লেন তিনি। মনের ভিতর কি যে হচ্ছে তা প্রকাশ করবার ভাষা নেই। উঠোনে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। নির্মল নীল আকাশ। রাস্তার ওধারে বটগাছটার পাতা ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে, শিশুগাছটা ভ'রে উঠেছে কচি কচি শ্যাম কিশলয়ে, উঠোনের আমগাছটায় অজস্র মুকুল ধরেছে, যেন পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে কারা—মুখ দেখা যাচ্ছে না, সোনালি চুলগুলো দেখা যাচ্ছে শুধু। মৌমাছির ঝাঁক উড়ছে, বোলতা উড়ছে, চিল উড়ছে উঁচুতে,…সবাই উড়ছে। বসন্তের হাওয়া বইছে। বকুলবালার সমস্ত অন্তঃকরণ ছটফট করতে লাগল একটা কারাগারের মধ্যে। কবিতাটা পড়তে না-পারার বেদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি, হয়তো ছুটে বেরিয়ে পড়তেন বাইরে। গাড়ি ডাকিয়ে চ'লে যেতেন রূপচাঁদের আপিসে তাঁকে ডেকে আনবার জন্যে। কিন্তু তার আর দরকার হ'ল না—চণ্ডী এসে পড়ল। স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছে চণ্ডী। পাখিওলার কাছ থেকে পরশু সে শুনেছে যে, হলদে পাখিটা রূপচাঁদবাবু কিনেছেন। পাখিওলা যখন রাস্তা দিয়ে যেত, প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে অনেকদিন দেখেছে সে এই হলদে পাখিটাকে।

"মাসীমা, আপনারা আর একটা পাখি কিনেছেন নাকি?"

"কে, চণ্ডী এসেছিস? ভালই হয়েছে।"

বকুলবালার বেশ দেখে চণ্ডী বললে, "আপনি কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি?"

"না। এমনই পরেছি। পোড়ারমুখো পাখিকে দেখাচ্ছিলাম যে, হলদে শাড়ি আমারও আছে"

"সুন্দর পাখিটা, নয়?"—চণ্ডী সাগ্রহে খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

"একটি কথা কইছে না কিন্তু। কবিতাটা পড়্‌তো"

"কোন্ কবিতা?"

"ওই যে দেওয়ালে সাঁটা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না? ওর বিষয়েই কবিতা, আনন্দবাবু লিখে দিয়েছেন"

"ও"

চণ্ডী সোৎসাহে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল কবিতাটা।

"চেঁচিয়ে পড়্‌না!"

চণ্ডী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল। তার সঙ্গে আবৃত্তি ক'রে যেতে লাগলেন বকুলবালা।

কও না কথা কও না কথা
কও না কথা হলদে পাখি
সোনার বরণ সুরের সাকী
চলবে না তো আর চালাকি
ধরা যখন প'ড়েই গেছ
নামটি তোমার বলবে না কি
কও না কথা হলদে পাখি।

যে কথাটি ঢাকছ কেবল
নানান ছলে নানান সুরে
সেই কথাটি শুনতে যে চাই
আজকে তোমায় খাঁচায় পুরে।

রঙটি গায়ে কলকে ফুলের
কুচকুচে রঙ মাথার চুলের
মনের কথাও রূপকথা কি ?
চুপটি ক'রে ছলবে নাকি
কও না কথা হলদে পাখি।

শর্ষে ফুলের স্বপ্ন ওগো
পদ্মফুলের বুকের রতন
সোনার কাঠির পরশ পেয়ে
রঙ হ'ল কি সোনার মতন।

তোমার তরেই চাঁদ সদাগর
পার হ'ল কি সাতটা সাগর
বিশ্ব উজল যে দীপ-শিখায়
তুমিই কি তার সলতে নাকি
কও না কথা হলদে পাখি।

দুজনে মিলে বার বার আবৃত্তি করতে লাগলেন কবিতাটা। আম্রমুকুলগন্ধমদির বসন্ত-দ্বিপ্রহর ছন্দভরে কাঁপতে লাগল যেন।

"টিউ—"

হঠাৎ মিষ্টি সুরে ডেকে উঠল বেনে-বউ।

হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন বকুলবালা।

ঘর্মাক্ত কলেবরে রূপচাঁদ যখন আপিস থেকে ফিরছিলেন, তখনও বেশ বেলা রয়েছে। তাঁর বাঁ হাতে একটি পুঁটলি। পুলিস সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার রহমান মিঞা একটি দুর্লভ জিনিস উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। কেপন—খাসি মুরগি। আপিসেরই চাপরাসীকে দিয়ে মুরগিটি জবাই করিয়ে কুটিয়ে মাংসের টুকরোগুলি নিপুণভাবে

কাগজে মুড়ে রুমালে বেঁধে নিয়ে আসছিলেন তিনি। ইচ্ছে ছিল, নিজেই রাঁধবেন। বাজার থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় মসলাও কিনে এনেছিলেন। বাড়িতে ঢুকতেই বকুলবালা ছুটে এলেন। তখনও তাঁর পরনে সেই হলদে কাপড়। ঠোঁটের লাল রঙ ঠোঁটেই নিবদ্ধ নেই, গালে এবং চিবুকেও লেগেছে। পরিবারের অসাধারণ প্রসাধন দেখে বিস্মিত হলেন রূপচাঁদ, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। বরং চোখমুখে এমন একটা ভাব প্রকাশ করলেন, যার অর্থ— কি অদ্ভুত রূপসী তুমি, কি চমৎকার মানিয়েছে তোমায়! বকুলবালা কিন্তু এসব সূক্ষ্ম ভাবের ধার দিয়েও গেলেন না। অন্য জগতেই ছিলেন যেন তখন। রূপচাঁদকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

"কি শয়তান তোমার ওই বেনে-বউ! উঃ, কম জ্বালানটা জ্বালিয়েছে আমায় সমস্ত দিন!"

"কেন, কি হ'ল?"

"প্রথমে তো মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে রইল। একটি কথা কইবে না, কত সাধ্যসাধনা—কিছুতে না"

রূপচাঁদ ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত বই মেঝের উপর স্তূপীকৃত।

"এ কি করেছ?"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন বকুলবালা, তারপর রূপচাঁদের হাত ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে টানতে টানতে বললেন, "বাইরে দেখবে চল না, কি করেছি! কম খোশামোদ করেছি তোমার পাখির?"

রূপচাঁদের সর্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠেছিল, কিন্তু হেসে বললেন, "এইটে রাখি দাঁড়াও আগে"

"কি ওতে?"

"মাংস"

পুঁটলিটা কোণে রেখে দিয়ে বকুলবালার সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এসে রূপচাঁদ দেখলেন, তাঁর বুকশেল্ফের উপর পাখির খাঁচা রাখা

হয়েছে। দেওয়ালে কবিতা সাঁটা রয়েছে, তাও দেখলেন। সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে ব'লে উঠলেন, "বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা করেছ তো! আমার মাথায় এত আসত না। সুন্দর হয়েছে!"

"তবু কি মন পেয়েছি তোমার পাখির! ওর মন ভোলাবার জন্যেই শেষে এই শাড়িটা পরলাম, তবু না। শেষকালে চণ্ডী এল, দুজনে মিলে ওই কবিতাটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লাম, তবে বাবুর মুখে কথা ফুটল, তাও একটি বার"

চণ্ডীর আগমনবার্তায় মনে মনে ঈষৎ অপ্রসন্ন হলেন পুলিস কর্মচারী রূপচাঁদ। বাইরের কোনও লোক বাড়িতে আসে, এ তিনি পছন্দ করেন না।

"চণ্ডী এসেছিল নাকি? বেশি আমল দিও না ওকে"

"কেন?"

"ছোঁড়াটা চোর শুনেছি"

অসঙ্কোচে মিথ্যা কথাটা বললেন রূপচাঁদ।

"তাই নাকি?"

বকুলবালা চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে রইলেন।

প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হবার জন্যে রূপচাঁদ বললেন, "তোলা-উনুনটাতে আঁচ দাও। আমিই মাংস রাঁধব আজ"

"তোলা-উনুনে কেন?"

"মুরগির মাংস যে"

"ও!"

বকুলবালা মুরগির মাংস খান, কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দেন না।

বকুলবালা তোলা-উনুনটা বার করলেন কোণ থেকে।

"উঃ, এর মধ্যেই কি রকম গরম প'ড়ে গেছে দেখেছ? পাখাটা এখানে প'ড়ে কেন?"

পাখাটা তুলে হাওয়া করতে যেতে ময়দার আঠা লেগে গেল হাতময়।

"এ কি, এতে লেগে আছে কি ?"

"ও ! আঠা লাগিয়েছিলাম ওটা দিয়ে। কবিতাটা দেওয়ালে লাগাবার জন্মে আঠা করেছিলাম যে। তোমার পাখির জন্মে কম ভোগান ভুগতে হয়েছে আজ !"

ক্রোধে কানের পাশ তুটো গরম হয়ে উঠল রূপচাঁদের। মুখে কিন্তু সুমিষ্ট হাসি ফুটিয়ে বললেন, "করতেও পার এত !"

উত্তরে বকুলবালাও হাসলেন। রূপচাঁদ ঘরে ঢুকে জামা জুতো ছেড়ে বেরিয়ে এলেন আবার। বকুলবালা তোলা-উনুনে ঘুঁটে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল তাঁর।

"কম তুষ্টু তোমার বেনে-বউ। কবিতা শোনবার পর 'টিউ' ক'রে ছোট্ট একটি শব্দ করেছিল খালি। তারপর অনেক সাধ্যসাধনা করলাম, না রাম না গঙ্গা, কিচ্ছু বললে না। এই একটু আগে, পরোটা বেলছি, হঠাৎ ব'লে উঠল, 'ওকি ওকি ও' ! কি তুষ্টু বল তো—তার মানে, পেঁপে খেয়েছি, ছাতু খেয়েছি, পরোটাও চাই একটু। পরোটা দিলাম, খেলে না, ওর মন পাওয়া ভার"

আনন্দে আত্মহারা হয়ে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

একটু মুচকি হেসে সংযতবাণী রূপচাঁদ বললেন, "আস্তে আস্তে ভাব হবে। তোমার মন পেতে আমাকেও কম বেগ পেতে হয় নি"

"আহা !"

কোঁপকটাক্ষে স্বামীর দিকে একবার চেয়ে ঘুঁটেয় কেরোসিন ঢালতে লাগলেন বকুলবালা। মাথায় জবাকুসুম মেখে চৌবাচ্চার দিকে অগ্রসর হলেন রূপচাঁদ। স্নান ক'রে চা জলখাবার খেয়ে মাংস রাঁধতে বসবেন।

"এ কি, চৌবাচ্চার জলে কালো কালো এসব ভাসছে কি ?"

"কই ? ও, অ্যালুমিনিয়ামের গরম বাটিটা ঠাণ্ডা করবার জন্মে চৌবাচ্চায় বসিয়েছিলাম। দাঁড়াও, ঠিক ক'রে দিই"

তাড়াতাড়ি এসে বকুলবালা হাত দিয়ে ভাসমান ভুসোগুলোকে

সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সমস্ত জলটাই ঘুলিয়ে উঠল তাতে। রূপচাঁদের মনের ক্রোধাগ্নি দাউদাউ ক'রে জ্বলছিল।

কিন্তু খুব শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, "থাক্, আমি জল তুলেই স্নান করছি"

কেবল ব্রহ্মচারীর নয়, চার্বাকপন্থীরও সংযম দরকার সিদ্ধিলাভের জন্য।

স্বহস্তে ইঁদারা থেকে জল তুলে স্নান সেরে যখন ফিরে এলেন, তখন ঘুঁটের ধোঁয়ায় চারিদিক ভ'রে গেছে, তার মধ্যে দগদগে হলদে কাপড়-পরা বকুলবালা ব'সে চা ছাঁকছেন। রূপচাঁদের মনে হঠাৎ একটা গানের একটা লাইন ভেসে এল, 'ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে'। যে স্বর্গলোকে সে ডানা মেলে উড়তে চায়, সেখানে পৌঁছতে হ'লে অনেক নালা নর্দমা আঁস্তাকুড় পার হতে হবে, দ'মে গেলে চলবে না।

"দেখ, মাংসটা আজ ভাল ক'রে রাঁধব। অমরেশকে দিয়ে আসব একটু। সে আমার হাতের রান্না খেতে চেয়েছে। ঘি আছে তো?"

"আছে। মসলা কি কি চাই?"

"বলছি"

টিফিন-কেরিয়ারটি হাতে ক'রে খাওয়া-দাওয়া সেরে রূপচাঁদ যখন বেরুলেন, তখন রাত্রি নটা বেজে গেছে। পূর্ববন্দোবস্তমত কন্‌স্টেব্‌ল্ রামখেলাওন মিশির এসে বারান্দায় শুয়েছে বকুলবালার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। রূপচাঁদ বকুলবালাকে বলেছেন যে, অমরেশ-বাবুর বাড়ি থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরে আসতে রাত হবে তাঁর।

অন্ধকার গলি জনবিরল হয়ে এসেছে। রূপচাঁদবাবুর পায়ে কেড্‌স্। নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি। মনের মধ্যে অদ্ভুত ভাব জাগছে একটা। দুঃসাহসী হিমালয়-আরোহীর মনে যে ধরনের ভাব জাগে, অনেকটা সেই রকম। হিমালয়-আরোহী জানে

যে, হয়তো তার অভিযান ব্যর্থ হবে, হয়তো সে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে উঠতে পারবে না, কিন্তু যদি পেরে যায়! ওই 'যদি'টা আলেয়ার মত প্রলুব্ধ ক'রে নিয়ে যায় তাকে দুর্গম পথে। তা ছাড়া, সাফল্য যদি না-ও হয়, অভিযান করার মধ্যেই কি আনন্দ নেই? ভয় জিনিসটার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে একটা। অনিশ্চয়তার মধ্যে অপ্রত্যাশিতের চমকপ্রদ যে সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে, তার আহ্বানে, ছুটে যেতে চায় মন। কোন কষ্টকেই কষ্ট ব'লে মনে হয় না তার, বরং বাধা যত দুরতিক্রম্য হয়, সে তত যেন আকুল হয়ে ওঠে, শক্তি তত যেন সংহত হয়, জেদ তত যেন চ'ড়ে ওঠে। অজানার আহ্বান নূতনের প্রলোভন সুরার মত সঞ্চরণ ক'রে বেড়ায় তার দেহে মনে স্বপ্নে কল্পনায়। বাইরের নানা বাধা অতিক্রম ক'রে কাম্যলোকে পৌঁছবার ঢের আগেই তার সমস্ত সত্তা কল্পনায় পৌঁছে যায় সেখানে, এবং পৌঁছে গিয়ে যে আনন্দ পায়, তারই আবেগে সে হাসিমুখে অতিক্রম করে সমস্ত বাধা। তার কৃচ্ছ সাধন ব্রহ্মলোলুপ তপস্বীর কৃচ্ছ সাধনের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। তার লক্ষ্য আলাদা, পথও তাই আলাদা। নিজের স্বর্গলোকে সেও মুক্তি পেতে চায়। তার মনও ডানা মেলেছে—বহুবর্ণবিচিত্র রূপ-রস-রঙের লীলাতীর্থে, মৃন্ময়ী ধরণীর মহিমালোকে—সূক্ষ্ম অবাস্তবে নয়, স্থূল বাস্তবে: পরোক্ষে নয়, প্রত্যক্ষে। পথ পিচ্ছিল, পর্বত দুরারোহ, সমুদ্র দুস্তর, কণ্টক কঙ্কর কর্দম—বাধার অন্ত নেই। কামনারও অন্ত নেই।

অন্ধকারে হঠাৎ খুব জোরে একটা হোঁচট খেলেন রূপচাঁদ। পায়ের বুড়ো-আঙুলটায় খুব জোরে লাগল জুতো থাকা সত্ত্বেও। সামলে নিয়ে আবার চলতে লাগলেন। বলা বাহুল্য অমরেশের কাছে যাচ্ছিলেন না তিনি, যাচ্ছিলেন ডানার কাছে।

৬

অন্ধকার চতুর্দিকে। নদীতীরের বন-জঙ্গল থেকে অবিরাম ঝিল্লীধ্বনি হিল্লোলিত ক'রে তুলছে অন্ধকারকে। অন্ধকার সমুদ্রে অসংখ্য সুরের উর্মি ছন্দিত হয়ে উঠছে যেন, স্পন্দিত করছে নক্ষত্র-কুলকেও। সন্ন্যাসী স্থির হয়ে ব'সে ছিলেন এতক্ষণ আনন্দময় স্তব্ধতার মধ্যে। চরাচরব্যাপী সঙ্গীতের স্পর্শ তাঁকেও আত্মহারা ক'রে তুলল ক্রমশ। হঠাৎ তিনিও গান গেয়ে উঠলেন। মীরার একটা ভজন রূপায়িত হয়ে উঠল তাঁর মনে।

চিতনন্দন আগে নাচুংগী
নাচ নাচ পিয়তম হিঁ রিঝাউঁ
প্রেমী জনকো জাচুংগী ॥
প্রেম প্রীতকা বাঁধ ঘুংঘরা
সুরতকী কছনী কাছুংগী।
লোক লাজ কুলকী মরজাদা
য়া মৈঁ এক ন রাখুংগী
পিয়াকে পলংগা জা পৌঢ়ুংগী
মীরা হরিরংগ রাচুংগী ॥

তাঁর উদাত্ত অনুপম কণ্ঠে ভ'রে উঠল চারিদিক। পাগলিনী মীরাই যেন অন্ধকারে খুঁজে বেড়াতে লাগল তার চিতনন্দন প্রিয়তমকে। অন্ধকারের স্তরে স্তরে, গঙ্গার কূলে কূলে, বনস্পতির শাখায় শাখায়, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে সেই সন্ধানের সূক্ষ্ম তীব্র আকুতি সঞ্চারিত হ'ল যেন। ঘুরে বেড়াতে লাগল নামহীন সমুদ্রের সৈকতে সৈকতে। সন্ন্যাসীর গান থেমে গেল কিছুক্ষণ পরে, কিন্তু আকুতি থামল না। তার অবাঙ্‌ময় আবেদন সূক্ষ্মতর হয়ে অনুপ্রবিষ্ট হ'ল বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ঘনিষ্ঠতর হয়ে গেল নিবিড়তায়, তীব্রতর হয়ে উঠল অনুভূতিলোকে। চোখ বুজে ব'সে রইলেন তিনি। অনেকক্ষণ

ব'সে রইলেন। যখন চোখ খুললেন, তখন দেখতে পেলেন, ভাঙা সিঁড়িটার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

"কে ?"

"আমি। আপনার গান শুনছিলাম"

ডানা এগিয়ে এসে প্রণাম করলে সন্ন্যাসীকে। তার হঠাৎ কেমন যেন মনে হ'ল, এ ব্যক্তিটি প্রণম্য।

"থাক্ থাক্"—সঙ্কুচিতভাবে সরে গেলেন সন্ন্যাসী। উঠে দাঁড়ালেন। বিব্রত বোধ করলেন একটু।

"যে গানটা গাইছিলেন, সেটা ভজন, নয় ?"

"হ্যাঁ, মীরার ভজন"

"গানের কথাগুলো খুব মিষ্টি, কিন্তু মানে বুঝতে পারলাম না ভাল"

সন্ন্যাসী নীরব হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "এই যে ঝিল্লীর সঙ্গীত, এর কি মানে বুঝতে পার ?"

"আমি বুঝতে না পারলেও ঝিল্লীরা বুঝতে পারে নিশ্চয়"

"কিন্তু তুমি তো ঝিল্লী নও, তুমি মানুষ। তোমার বোঝায় আর ঝিল্লীর বোঝায় তফাত থাকবে না ? ঝিল্লী ওর এক রকম মানেই জানে, কিন্তু তুমি ওর হাজার রকম মানে বার করতে পার, সে শক্তি সে স্বাধীনতা দিয়েছেন তোমাকে ভগবান"

হঠাৎ একটা নূতন জগতে প্রবেশ ক'রে ডানা যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। সন্ন্যাসীও চুপ করে রইলেন। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে আসছিল, এমন সময়ে ডানার চাকরটা এসে বললে যে সে গোয়ালা-বাড়ি থেকে দুধ আনতে যাচ্ছে। ঘর খোলা রইল। চাকরের আবির্ভাবে বিব্রত ভাবটা কেটে গেল উভয়েরই।

ডানা সপ্রতিভভাবে বললে, "আপনি আসবেন আমার ওখানে? চলুন না, একদিনও তো যান নি"

"আমি ? আচ্ছা, চল"

ডানার পিছু পিছু সন্ন্যাসী চলতে লাগলেন। সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ডানার মনে গোড়া থেকেই কেমন একটা কৌতূহল জেগেছে—কেমন যেন অস্পষ্ট শ্রদ্ধা একটা। এতদিন নানা ছলে ওই ভাঙা ঘরটার আনাচে কানাচে ঘুরেছে সে, কিন্তু সোজাসুজি মুখ ফুটে নিমন্ত্রণ করতে পারে নি। আজ করতে পেরে যেন আনন্দিত হ'ল।

ঘরে ঢুকে ডানা বললে, "বসুন"

সন্ন্যাসী নির্বিকারভাবে মাটিতেই ব'সে পড়লেন।

"চেয়ারে আপনি বসেন না বুঝি?"

"না, আজকাল আর বসি না।" তারপর একটু হেসে বললেন, একটা ব্রত চলছে আমার—তুমি ব'স চেয়ারে"

"কম্বল পেতে দেব আপনাকে?"

"কম্বলে আপত্তি নেই। কিন্তু থাক্ না, কি দরকার?"

"আপনি মাটিতে ব'সে থাকবেন, আমি কি ক'রে চেয়ারে বসি?"

ডানা একটা কম্বল পেতে দিলে। সন্ন্যাসী তার উপর উঠে বসলেন। ছোট একটা আসন পেতে ডানা বসল এক ধারে।

তারপর বললে, "আপনি এখনই স্বাধীনতা সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন—"

"বলছিলাম, তুমি মানুষ, ওই ঝিল্লীর গানের যে-কোনও অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা আছে তোমার। ঝিল্লীর তা নেই। একমাত্র মানুষকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন ভগবান, সে যা ইচ্ছে করতে পারে, যা খুশি হতে পারে। তার সামনে অসংখ্য পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। সে ভাল হতে পারে, মন্দ হতে পারে, যে কোনও জিনিসকে যেমন খুশি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে পারে। এ স্বাধীনতা আর কারও নেই"

"কেন, পশুরাও তো কম স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় না?"

"পশুরা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। রাত্রি হ'লে তাকে ঘুমুতেই হবে, ইচ্ছে করলেও সে জেগে থাকতে পারে না। ক্ষুধার উদ্রেক হ'লেই

তবে সে খায়, অক্ষুধার সময় কিছুতেই তাকে খাওয়াতে পারবে না। মানুষ কিন্তু যখন ইচ্ছে ঘুমুতে পারে, যতক্ষণ খুশি জাগতে পারে। ক্ষুধা অক্ষুধা—কোন সময়েই তার খাওয়ার বাধা নেই, সামনে খাবার থাকতে স্বেচ্ছায় সে উপবাসও করতে পারে। অন্য কোন প্রাণী তা পারে না—"

হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন তিনি, কেমন যে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। তারপর আপন মনেই বললেন, "সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে অপেক্ষা করছেন তিনি। জোর করেন না কখনও। অপেক্ষা করেন"

"কিসের অপেক্ষা ?"

"তুমি তাঁকেই নির্বাচন ক'রে নাও কি না, তারই অপেক্ষা। তোমার চোখের সামনে খুলে দিয়েছেন সীমাহীন ঐশ্বর্যভাণ্ডার, তোমার অন্তরে দিয়েছেন কামনা, মস্তিষ্কে দিয়েছেন বুদ্ধি। অনন্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পথের মোহনায়, যে-কোনও পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। অপেক্ষা করছেন, তুমি তাঁকেই বেছে নাও কি না।"

"এ রকম ধাঁধায় ফেলার মানে কি ?"

"জোর ক'রে দখল করায় কোনও আনন্দ নেই। তিনি আনন্দময়, আনন্দ ছাড়া অন্য কিছু কাম্য নেই তাঁর। তুমি যদি স্বেচ্ছায় তাঁকে বরণ ক'রে আনন্দ পাও, তা হ'লেই তাঁর আনন্দ। সত্যিকার আনন্দে ভণ্ডামির স্থান নেই, স্থান নেই জবরদস্তির। জবরদস্তির স্থান নেই ব'লেই বোধ হয় তিনি অন্য পথগুলোও মনোহর করেছেন, তাতেও দিয়েছেন কিছু কিছু আনন্দের খোরাক"

আবার চুপ করলেন তিনি। আবার ঘনিয়ে এল নীরবতা। স্পষ্ট হয়ে উঠল নদী-তীরের ঝিল্লীধ্বনি।

"আচ্ছা, একটা কথা মনে হচ্ছে, তিনিও কি লোলুপ ?"

ডানা এমন স্বরে কথাগুলো বললে যে, সন্ন্যাসীর মনে হ'ল,

সত্যিই তার প্রাণে জিজ্ঞাসা জেগেছে। মেয়েটির তীক্ষ্ণধীর পরিচয় পেয়ে মনে মনে আনন্দিতও হলেন তিনি। কিন্তু চুপ ক'রে রইলেন। যেন মনের গহনে তিনি উত্তর সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছেন—ডানার মনে হ'ল। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তিনিও লোলুপ। প্রেমের কাঙাল তিনি"।

"তবে শুনেছি যে, তিনি নিখুঁত নির্বিকার ?"

"তাও সত্য"

"ঠিক বুঝতে পারছি না"

"তীরের কাছে সমুদ্রের জল এক হাঁটু, আর একটু দূরে গেলে সেই সমুদ্রই অতলস্পর্শী—দুটোই সত্য। সমুদ্র নীল এও যেমন সত্য, সমুদ্র নীল নয় তাও তেমনই সত্য। একটা ঘটিতে তুলে দেখ সমুদ্রের জল সাধারণ জলের মত। সামান্য সমুদ্রের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী সত্য যদি নিহিত হয়ে থাকতে পারে, তা হ'লে কোটি কোটি পর্বত-সমুদ্রের যিনি আকর, তাঁর মধ্যে সত্যের অনন্ত রূপের সন্ধান পাওয়া কি অসম্ভব ? তা ছাড়া নিজের অনন্ত রূপ তিনি দেখাচ্ছেন ব'লেই তুমি দেখতে পাচ্ছ"

"এ রকম পরস্পরবিরোধী সত্য দেখাবারই বা মানে কি ?"

"দেখাচ্ছেন বললে ঠিক বলা হয় না। তিনি নিজেই নিজের অনন্ত রূপ দেখছেন তোমার চোখ দিয়ে। উপভোগ করছেন সেটা। কবি যেমন নিজের কাব্যকে নব নব রূপে উপভোগ করেন বিভিন্ন রসিকের সমালোচনায়, তেমনই। তোমার ভিতর দিয়ে নিজেকেই আবিষ্কার করছেন তিনি বারংবার, কে জানে, হয়তো সংশোধনও করছেন নিজেকে। পুরাতন ছবিকে অবলুপ্ত ক'রে আঁকছেন নূতন ছবি, তাঁর রবারের সামান্য ঘষায় অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পুরাতন সমুদ্র পর্বত, ঐতিহাসিক পড়ছে গিয়ে প্রাগৈতিহাসিকের পর্যায়ে, তুলির নূতন টানে ফুটে উঠছে আবার নব নব চিত্র, সৃষ্ট হচ্ছে নব নব লোকালয়, নব নব লোকপাল"

হঠাৎ আবার গান গেয়ে উঠলেন তিনি।

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্
অস্মিন ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা।

গান শেষ হ'লে চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

ডানাও চুপ ক'রে রইল। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল সে। স্বল্পপরিচিত এই উদাসীন ব্যক্তিটির মধ্যে যে এত ঐশ্বর্য আছে, তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। লোকটির ঔদাসীন্য প্রথমে কৌতূহলী করেছিল তাকে, তাঁর শুচিতা শ্রদ্ধান্বিতও করেছিল তারপর; কিন্তু এতটা সে প্রত্যাশা করতে পারে নি। নূতন আবেষ্টনীর আকাঙ্ক্ষা-অনিশ্চয়তার মধ্যে সে ততটা বিভ্রান্ত হয় নি। ভেবেছিল, নিরাপদ আশ্রয় কোথাও জুটে যাবেই একটা না একটা। বিপদে পড়েছিল সে নিজের মনকে নিয়ে। মনের পুরাতন আশ্রয় ছিন্ন হয়েছে, নূতন আশ্রয় পাওয়া যায় নি এখনও। কোথায় পাওয়া যাবে, কবে পাওয়া যাবে, কি রকম হবে সে আশ্রয়, কোন কিছুরই নিশ্চয়তা ছিল না। কল্পনা আকাশ-কুসুম সৃষ্টি করছিল নানা রকম। আদর্শও ঠিক হয় নি। আদর্শ ঠিক না হ'লেও অস্পষ্টভাবে যে আভাসটা তার চেতনায় আঁকা ছিল, তা সাধারণ বাঙালী নারীর গতানুগতিক জীবনেরই ছবি একটা। বিয়ে করবে, ঘরসংসার পাতবে, যুদ্ধ থেমে গেলে পৈতৃক সম্পত্তিও হয়তো ফিরে পাবে কিছুটা—এই ধরনেরই অনির্দিষ্ট চিত্র। নিখিল বিশ্বের বিধাতা যে তার চোখ দিয়ে নিজেকে দেখছেন, তার সমালোচনা শোনবার আশায় প্রতীক্ষা করছেন, তার রসবোধের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচিয়ে নিতে চাইছেন—এ খবরটা শুধু যে অদ্ভুত রকম নূতন মনে হ'ল তার কাছে তা নয়, এর সত্যটা সহসা যেন মর্মে গিয়ে বিঁধল তার। সে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। মনে

হ'ল, সে নিজেকে অত ছোট ক'রে ভাবছে কেন? মনে প'ড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা—

আমি নারী আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নারাতে নিদ্রাবিহীন শশী
আমি নইলে মিথ্যে হ'ত আকাশে চাঁদ ওঠা
মিথ্যে হ'ত কাননে ফুল ফোটা

মাটির ধূলিকণা থেকে আরম্ভ ক'রে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত সবাই প্রত্যাশাভরে তাঁরই জন্যে সেজে ব'সে আছে, এ কথা বিশ্বাস করলে নিজের দৈন্যবোধ আর থাকে না। সমস্ত মন আনন্দে ভ'রে ওঠে। এই আনন্দেই বোধ হয় ভ'রে উঠেছিল মীরার মন।

"মীরার যে ভজনটা আপনি গাইছিলেন এখনই, তারও বক্তব্য কি এই?"

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, "এ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও বক্তব্য নেই। কেবল বলবার ধরনটা প্রত্যেকের আলাদা, কারণ প্রত্যেকে তাঁকে নিজের মত ক'রে দেখতে চাইছে, আসলে তিনি নিজেই নিজেকে নানাভাবে দেখছেন। মীরা যখন বলছেন, হে প্রিয়তম, হে চিতনন্দন, আমি পায়ে প্রেমের নূপুর প'রে, গায়ে অনুরাগের বসন জড়িয়ে, লোক-লজ্জা কুলমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে তোমার সামনে নৃত্য করব, তোমার প্রেমকীর্তন করব, তোমার শয্যা আশ্রয় করব,—তখন বুঝতে হবে ভগবানেরই লীলা সেটা, মীরার মুখ দিয়ে নিজের একটা অভিব্যক্তি তিনি ব্যক্ত করছেন। তার প্রমাণ চোখ মেলে দেখলেই দেখতে পাবে। ওই দেখ, সুনীল আকাশ-প্রাঙ্গণে নৃত্যপরা হয়ে উঠেছে কোন্ পূজারিণী, বেজে চলেছে তার নূপুর, লুটিয়ে পড়েছে তার প্রেমাঞ্চল, কীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠছে দশদিক, তোমার মুখের দিকে আকুলনয়নে চেয়ে আছেন তিনি। ওই একই কথা বলেছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথও আর এক ধরনে—"

হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেন আবার সন্ন্যাসী—

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে
তোমার সূর্য চন্দ্র তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে
কত কালের সকাল সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে—

গানটা কিন্তু সমাপ্ত হ'ল না। হতে পারল না। হঠাৎ দ্বার ঠেলে রূপচাঁদ প্রবেশ করলেন মাংসপূর্ণ টিফিন-কেরিয়ার হাতে নিয়ে। সন্ন্যাসীর দিকে এক নজর চেয়ে টিফিন-কেরিয়ারটা নামিয়ে রাখলেন তিনি ঘরের কোণে। তারপর ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "টিঞ্চার আইয়োডিন আছে তোমার কাছে ?"

"না, কেন বলুন তো ?"

"হোঁচট খেয়ে আঙুলটায় লেগেছে বঁড্ড"

সন্ন্যাসী হঠাৎ উঠে পড়লেন। নমস্কার ক'রে বললেন, "আচ্ছা, আমি এখন চলি তবে।"

উঠে বেরিয়ে গেলেন। অকারণে ডানার কান দুটো গরম হয়ে উঠল। তবু সে আত্মসম্বরণ ক'রে লণ্ঠনটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

"খুব বেশি লেগেছে নাকি ? ইস, জুতোটা রক্তে ভিজে গেছে দেখছি যে! খুলে ফেলুন। এত রাত্রে আসবার কি দরকার ছিল অন্ধকারে ?"

"তোমার জন্যে মাংস রেঁধে এনেছি একটু। কেপনের মাংস।"

"মাংস? মাংস তো আমি খাই না।"

"তাই নাকি।"

নির্নিমেষে ডানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন রূপচাঁদ।

৭

অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যা সমাধান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডানা কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত হয় নি। মনের নেপথ্যলোকে গোপন অস্বস্তির একটা কীট কোথায় যেন সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। তার ঠিক স্বরূপ সে দেখতে পাচ্ছিল না; কিন্তু অনুভব করছিল, সে ঠিক যা চাইছে তা পায় নি। অথচ সেটা যে ঠিক কি, তা-ও সে জানে না। খাওয়া পরা থাকা ছাড়া মাসিক দেড় শত টাকা বেতন মোটেই তুচ্ছ করার মত নয় এ বাজারে। এমন একটা ভদ্র পরিবারের আশ্রয়ও অবাঞ্ছিত নয়। তবু কি যেন একটা কি খচখচ করছে মনের ভিতরে। আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু—দুজনেই ভদ্র শিক্ষিত লোক, দুজনেই তাকে সাহায্য করবার জন্য উন্মুখ, অথচ—। সন্ন্যাসীর মুখটা মনে পড়ল। আশ্চর্য সন্ন্যাসী। কোনও ভড়ং নেই, গেরুয়া জটা কমণ্ডলু কিছু নেই, কথাও বলতে চান না বেশি। সব সময়ে থাকেনও না। নদী পার হয়ে মাঝে মাঝে চলে যান কোথায় যেন চরের উপর দিয়ে। দু-তিন দিন পরে হঠাৎ আবার ফিরে আসেন। নিজের হাতে ভাতে-ভাত রান্না করেন ইঁটের তৈরি উনুনে ছোট মাটির মালসায়। ডানার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ভিক্ষা করতে বার হন উনি বোধ হয়। ভিখারীকে ঘৃণা করতে শিখেছে সে ছেলেবেলা থেকে। এই সন্ন্যাসীটিকে ভিখারী ভাবতে ইচ্ছা করে না কিন্তু তার। ভিক্ষুকের মত কোনও দীনতা তো লক্ষ্য করে নি একদিনও সে। বরং উলটো কথাটাই মনে হয় তাঁর চেহারা দেখে। প্রকৃত ঐশ্বর্যশালীর আভিজাত্য যেন ফুটে বেরোয় তাঁর চোখে মুখে। তাঁর গাম্ভীর্য, তাঁর নির্বিকার ভাব-ভঙ্গী সমস্ত দীনতার অতীত ক'রে রেখেছে তাঁকে।···

···সশব্দে পাশের দুয়ারটা খুলে গেল। শশব্যস্ত বৈজ্ঞানিক এসে প্রবেশ করলেন। কুণ্ঠিত হাসিমুখে নমস্কার ক'রে বললেন, "আমার দেরি হয়ে গেছে বোধ হয়, না? আপনি প্রস্তুত নিশ্চয়"

"হ্যাঁ"

"আচ্ছা, তা হ'লে শুরু করা যাক এবার"

হাতে হাত ঘ'ষে বৈজ্ঞানিক একটা চেয়ারে বসলেন। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর হেসে বললেন, "আনন্দবাবুরও আসবার কথা ছিল, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব কিনা ভাবছি"

ডানা কি-যে বলবে ভেবে পেলে না ঠিক। তার মনে হ'ল, এঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা এতদিন বেশ সহজ ছিল, কিন্তু সহসা ইনি মনিব হয়ে যাওয়াতে ব্যাপারটা একটু যেন গ্রন্থিল হয়ে পড়ল। এঁর আচরণে ঘুণাক্ষরে যদিও কোন রকম মনিবত্ব প্রকাশ পায় নি, কিন্তু ডানার মনে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ জেগে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। অমরবাবু যথেষ্ট ভদ্রতাই করেছেন। ডিক্‌টেশন নেবার জন্যে ডানাকে তিনি অনায়াসে নিজের বাড়িতে যেতে বলতে পারতেন। তা কিন্তু বলেন নি তিনি। তিনি নিজেই এখানে আসবেন বলেছেন যখন দরকার হবে। চাকরি করার যেটা প্রধান গ্লানি—ঠিক সময়ে আপিসে রোজ হাজির দেওয়া—তার থেকে মুক্তি দিয়েছেন তাকে।

সঙ্কুচিত কণ্ঠে, যেন একটা অনুগ্রহ চাইছেন এমনই ভাবে, অমরবাবু বললেন, "ইয়ে, একটা কাজ যদি করতে পারেন, বেঁচে যাই আমি—"

"কি বলুন ?"

"ইংরেজীতে একটানা ডিক্‌টেশন দেওয়া তো আমার অভ্যাস নেই কোন দিন। আমি ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে একটানা ব'লে যেতে পারি। হয়তো অনেক সময় এলোমেলোও হবে, আপনি সেটা শুনে যদি ইংরেজীতে লিখে যান, পারবেন কি, তারপর আমি সেটা দেখে দেব না হয়। পারবেন ?"

"তা পারব বোধ হয়। চেষ্টা ক'রে দেখি একবার"

"পারেন তো বেশ হয়। জিনিসটা আপনি যদি বুঝতে পারেন,

তা হ'লে ইংরেজী করা আর শক্ত কি! বৈজ্ঞানিক নাম-টাম অবশ্য আপনাকে দিয়ে দেব আমি। নোট করে এনেছি সব"

তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢুকিয়ে কতকগুলো টুকরো কাগজ বার করলেন তিনি।

"আজকের বিষয়টা হচ্ছে 'পাখির ডিমের রঙ'। পাখিদের বার্ষিক গতিবিধি জিনিসটা যেমন বিস্ময়কর, তা নিয়ে যেমন গবেষণার অন্ত নেই, পাখিদের ডিমের রঙও তেমনই অদ্ভুত, তা নিয়েও বৈজ্ঞানিকরা নানাভাবে মাথা ঘামিয়েছেন। এই সব সম্বন্ধেই আলোচনা করব আজকের প্রবন্ধটাতে"

"আমি তা হ'লে খাতা পেন্সিল নিয়ে আসি"

ডানা ঘরের ভিতরে ঢুকে খাতা আর পেন্সিল নিয়ে এল। খাতা পেন্সিল আনিয়েই রেখেছিল সে এজন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কবিও হাজির হলেন এসে।

"আপনার এত দেরি হয়ে গেল যে?"

"আমি একটু আটকে পড়েছিলাম রাস্তায়। অদ্ভুত একটা শোভা হয়েছে আজকাল, লক্ষ্য করেছেন সেটা?"

"কিসের শোভা?"—প্রশ্ন করলেন বৈজ্ঞানিক।

"প্রকৃতির। বসন্তকাল যে, খেয়াল আছে সেটা? ফুলই ফুটেছে কত রকম। আমের মুকুল তো ধরেইছে, তা ছাড়া আরও যে কত রকম ফুল, তার ইয়ত্তা নেই! লালে লাল হয়ে উঠেছে ওই বুড়ো শিমুলগাছটা। দেখেছেন? ন্যাড়া আমড়াগাছটা লক্ষ্য করেছেন? সবুজের শিখা ফুটে বেরুচ্ছে যেন তার সর্বাঙ্গ থেকে। একদল সোনার প্রজাপতি যেন পাখা মেলে ব'সে আছে শিয়ালকাঁটার বনে। ঘেঁটু-ফুলও ফুটেছে অজস্র, আর কি তাদের রূপ! ঘাসের ফুল দেখেছেন? সাদা সাদা ছোট ছোট ফুলগুলো কি যে চমৎকার! বটের গাছেও লাল লাল ফলের ভিড়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, কত জিনিসই যে আমরা দেখি না—"

হ্যাঁ, তা তো বটেই। ভাল ক'রে দেখার নামই তো দর্শন এবং দর্শনেরই একটা অংশ তো বিজ্ঞান। আমিও একটু পরেই বেরুব। এঁকে একটা প্রবন্ধের মালমসলা দিয়ে দিই। আপনি বসবেন, না, ঘুরে বেড়াবেন নদীর ধারে?"

"আমি বসছি একটু। বই-খাতা সঙ্গে এনেছি, ও-ধারটায় ব'সে আমিও লেখাপড়া করি একটু। আপনি ততক্ষণ কাজ সেরে নিন আপনার। একসঙ্গেই বেরুনো যাবে তারপরে। আপনার প্রবন্ধের বিষয় কি?"

"ডিমের রঙ"

"বেশ শোনাই যাক একটু"

"বেশ বেশ"—কৃতার্থ হয়ে গেলেন যেন বৈজ্ঞানিক। কবি একটা চেয়ার টেনে ধারে বসলেন।

বৈজ্ঞানিক শুরু করলেন, "দেখুন, এ বিষয়ে একটা প্রথমেই বলা দরকার—ডিমের এত বর্ণ-বৈচিত্র্য কেন, তা বিজ্ঞান ঠিক করতে পারে নি এখনও। এ যাঁরা বলেন যে, শত্রুদের কাছ থেকে ডিম গোপন করবার জন্যেই ডিমে এত রঙ, ইংরাজীতে যাকে camouflage বলে, তাঁরা সব ক্ষেত্রে তাঁদের মত সমর্থন করবার মত প্রমাণ খুঁজে পান নি। এই ধরুন না, কাকের ডিম greenish blue, শালিকের ডিম নীল রঙের। কিন্তু তারা কি সব সময়ে পারিপার্শ্বিক সবুজের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ডিম পাড়ে? শালিক পাখি অনেক সময় বাড়ির কার্নিসে বাসা বানায়, তা তো আমরা সবাই জানি। কাকের এলোমেলো বাসার মধ্যে যেখানে ডিমটা থাকে, সেখানে তো সবুজের কোনও চিহ্ন নেই। তা ছাড়া তাই যদি হ'ত, তা হ'লে যে সব পাখি গাছে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে, সকলেরই ডিম সবুজ বা নীল হ'ত। তা কিন্তু হয় না তো। আর একদল বৈজ্ঞানিক বলেন যে, আলোর সঙ্গে রঙের সম্বন্ধ আছে। ট্রপিকাল দেশের মানুষের গায়ে যে কারণে pigment অর্থাৎ রঙ হয়, ঠিক সেই কারণে, তাঁদের মতে যে সব

ডিম যত সূর্যের আলো পায়, তারা তত বর্ণবহুল হয়। এরও অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। যে সব পাখি গর্তের মধ্যে অন্ধকারে ডিম পাড়ে, তাদের অনেকের ডিম অবশ্য সাদা, কিন্তু অনেকের আবার রঙিনও হয়, যেমন গাংশালিক। গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে না অথচ রঙ সাদা—এমন ডিমেরও অভাব নেই, যেমন ঘুঘু পায়রা হাঁস মুরগী। সুতরাং ঠিক নির্দিষ্ট ক'রে বলা যায় না কিছু। Bayne সাহেব বলেছেন একটা অদ্ভুত কথা। বলেছেন, স্ত্রী-পাখিদের এটা বোধ হয় artistic impulse অর্থাৎ শিল্প-প্রেরণা। স্ত্রী-পাখিদের গায়ে সাধারণত রঙ কম হয়, তাই তারা সে শখটা মেটায় ডিমের গায়ে নিজের নিজের পছন্দমত রঙ ফলিয়ে। এটা অবশ্য কবিত্ব"

বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

কবি উত্তর দিলেন, "সেইজন্যেই বোধ হয় সত্য। কবিরাই সত্যকে দেখতে পায়। আপনারা কেবল আঁকুপাঁকু ক'রে মরেন, তাতেও অবশ্য আনন্দ কম নেই।"

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "এই camouflage ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গাংচিল, বাটান প্রভৃতি পাখি বালির চড়ায় ডিম পাড়ে, কোনও বাসা বানায় না, কিন্তু ওদের ডিমের রঙ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এমন মিশে যায় যে চট ক'রে ধরা যায় না। লোকে অনেক সময় মাড়িয়ে ফেলে, তবু দেখতে পায় না। যাদেরই ডিম খাকী রঙের বা মাটির রঙের বা স্টোন কলার্ড (stone coloured) তাদের সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে, যেমন ধরুন Bustard, Curlew, Indian Courser, আরও অনেক আছে। ডিমের রঙের সম্বন্ধে আর একটা কথাও মনে হয়, ওদের Endocrine glands, বিশেষ ক'রে Adrenal নিশ্চয় এ সবের জন্যে দায়ী। জীবদেহের সমস্ত রকম pigment-এর সঙ্গে Endocrine gland-এর যোগ আছে। যাঁরা পাখিদের ডিম নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরা সাতটা রঙই পেয়েছেন। আপনি ওখানটা একটু

ফাঁক রেখে দেবেন, রঙের কটমট বৈজ্ঞানিক নামগুলো আমি পরে বসিয়ে দেব। রঙগুলো স্পেক্‌ট্রাম অ্যানালিসিস্‌ ক'রে বার করেছেন Sorby ; এস ও আর বি ওয়াই ; এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে হয়—"

"আমি নদীর ধারে একটু ঘুরে আসি, বুঝলেন"—কবি উঠে পড়লেন।

"আচ্ছা, বেশ"—অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়ালেন বৈজ্ঞানিকও।

"আমি এটা শেষ ক'রে ফেলব এখুনি। আপনি ততক্ষণ বাটানগুলোর খবর নিন না!"

কবি চ'লে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁ, কি বলছিলাম যে?"

ডানা বললে, "রঙগুলো স্পেক্‌ট্রাম অ্যানালিসিস্‌ ক'রে বার করেছেন Sorby ; এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে হয়—"

"ও, হ্যাঁ। সব রঙেরই মূল হচ্ছে সূর্যালোক। আমরা যখন কোনও জিনিসকে সবুজ দেখি, তখন আসলে কি হয়? সূর্যালোকের যে সাতটা রঙ আছে, তার ছটা রঙই সেই জিনিসটা আত্মসাৎ ক'রে নেয়, সবুজটাকে করে না, আমরা সেটা দেখতে পাই। সুতরাং বকের ডিমকে আমরা যখন সবুজ দেখছি, তখন বুঝতে হবে ভিবজিওরের জি-টা ছাড়া বাকি সবগুলো ওই ডিম শুষে নিচ্ছে। হয়তো বকের ভ্রূণের পক্ষে ওই ছটা রঙের তরঙ্গাঘাত প্রয়োজন, সবুজটা অনিষ্টকারী। এদিক দিয়েও ডিমের রঙের বিষয় চিন্তা করা যেতে পারে। তা ছাড়া পাখির খাদ্যের সঙ্গেও নিশ্চয় সম্পর্ক আছে এর। কারণ জীবজগতের যত কিছু রঙ, তা তো খাদ্য থেকেই তৈরী হয় শেষ পর্যন্ত। পাখির ডিমের রঙের সঙ্গে হিমোগ্লোবিন আর বাইল পিগ্‌মেণ্টের যে সম্বন্ধ আছে, তা তো আবিষ্কারই করেছেন Sorby—"

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ কাংস্য স্বর বাতাসকে চিরে দিয়ে চ'লে গেল।

বৈজ্ঞানিক থেমে গেলেন এবং উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "শুনলেন ?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই শুনতে পাই। কি পাখি বলুন তো ?"

"কাঠঠোকরা। শব্দটা অদ্ভুত, নয় ? আচ্ছা, সংস্কৃতে ক্রেঙ্কারধ্বনি ব'লে একটা কথা আছে, তা কি এই রকম শব্দ ? আপনি তো সংস্কৃত জানেন"

"যে কোন কর্কশ শব্দকে ক্রেঙ্কারধ্বনি বলা যায়, কিন্তু হাঁসের ডাকের শব্দকেই ক্রেঙ্কারধ্বনি বলেছেন সংস্কৃত কবিরা"

"ও। কিন্তু এ সব শব্দকে কি কর্কশ বলা উচিত ?"

"সেটা নির্ভর করে শ্রোতার উপর"—মৃদু হেসে ডানা বললে।

"তা ঠিক। কাঠঠোকরা দেখেছেন ? দেখেন নি ? ভারি চমৎকার দেখতে। আজই চিনিয়ে দেব আপনাকে। এইটে হয়ে যাক, তারপর বেরুনো যাবে, কি বলেন ? আমি কয়েকটা ফর্দ ক'রে এনেছি ডিমের রঙের। পাখিগুলোর বাংলা নামই দিয়েছি। আচ্ছা, প্রবন্ধগুলো প্রথমে বাংলা কোনও কাগজে দিলে কেমন হয়, কি বলেন আপনি ? বাংলাতেই প্রথমে লিখে ফেলুন, পারবেন ?"

"পারব না কেন ? বাংলা ইংরেজী দু রকমই লিখে দেব"

"বাঃ, গ্র্যাণ্ড হবে তা হ'লে !"

কাগজের কয়েকটা টুকরো বার করলেন তিনি পকেট থেকে। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, লিখুন এইবার। আমি রঙ অনুসারে ভাগ করেছি। কুচকুচে কালো ডিম চেনাশোনা কোনও পাখিরই নেই। ভায়োলেট রঙের ডিমও বড় দেখতে পাওয়া যায় না এদেশী পাখির। ইন্‌ডিগো রঙের ডিমও দেখি নি। নীল রঙ অবশ্য অনেক আছে। আর একটা কথা, নিছক একরঙা ডিম খুব কম আছে। অধিকাংশ ডিমেই এক বা একাধিক বর্ণের সংমিশ্রণ দেখা যায়। তা ছাড়া অনেক ডিমের গায়েই কালো বা বাদামী বা লাল রঙের ছিটছিট থাকে"

ডানা দ্রুতবেগে লিখে যাচ্ছিল। অমরবাবু চুপ ক'রে গেলেন ডানার চলমান পেন্সিলের দিকে চেয়ে।

"হ'ল ?"

"হয়েছে। আপনি ব'লে যান না"

"নীল রঙের ডিম—ছাতারে, শালিক, গাংশালিক, গোশালিক। গাংশালিক গর্তের ভিতর ডিম পাড়ে, তবু কিন্তু ওর ডিম নীল। এইবার লিখুন ফিকে নীল—গ্রে হেডেড (Grey headed) ময়না, যাদের দেশী নাম—পাওয়াই, ব্রাহ্মণী ময়না, সবুজ মুনিয়া। সাদাটে নীল—দর্জিপাখি, শিকরা, দর্জিপাখির ডিম লালচেও হয়। অনেক পাখিরই ডিমের রঙ এক রকম হয় না। দর্জিপাখি আর শিকরার ডিমে ছিটছিট থাকে। সবুজাভ নীল—খয়রা, কোঁচ-বক—"

ডানা লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করলে, "খয়রা কি পাখি ?"

"ইংরেজী নাম স্নেক বার্ড (snake bird), অনেকটা হাঁসের মত। গলাটা কেবল সাপের মত লম্বা, অদ্ভুত লম্বা। ঝিলে প্রায় দেখা যায় এগুলোকে। যখন মাছ ধরে, মনে হয়, সাপে ছোবল দিচ্ছে। মাথা আর গলা এদের খয়েরী রঙের। সেইজন্যেই খয়রা ব'লে বোধ হয়। জানি না ঠিক। খয়রা মাছও আছে এক রকম, কিন্তু তাদের রঙ তো রূপোর পাতের মত। বলতে পারি না খয়রা নাম কেন,—সুনীতিবাবু হয়তো পারবেন। এ পাখিগুলো ডুব-সাঁতার দিতে খুব ওস্তাদ, ডুব-সাঁতার দিয়ে মাছ ধরে এরা।"

ডানা দেখলে খয়রা-প্রসঙ্গে বাধা না দিলে ক্রমাগত ব'লে যাবেন ইনি।

"ও। সবুজাভ নীল আর কোনও পাখির আছে কি ?"

"আর কারও নেই। নীলচে সবুজ আছে, কিন্তু সে সবুজের কোঠায় হবে এখন। এইবার লিখুন—নীলাভ সাদা। এগুলো সাদাই, একটু নীলের আভা আছে কেবল। গাই-বক (Cattle Egret), এদের ডিমের রঙ অনেকটা মাখন-তোলা দুধের রঙের মত।

ফ্লেমিংগোর (Flamingo) ডিমও নীলাভ সাদা। এরা অবশ্য স্পেন ইরাক প্রভৃতি দেশে ডিম পাড়ে। এ দেশে কচ্ছ প্রদেশে পাড়ে শুনেছি।"

"ফ্লেমিংগো? বাংলা নাম আছে কোনও?"

"রাজহংস বলে অনেকে। কিন্তু রাজহংস নামে অনেক পাখিই চলছে। বার-হেডেড গুজকে (Bar-headed Goose) অনেকে রাজহংস বলে, আবার মিউট সোয়ানও (Mute Swan) রাজহংস-রূপে চিত্রিত দেখেছি সরস্বতীর ছবিতে। পেলিকানও (Pelican) রাজহংস নামে চ'লে গেছে কোথাও। আপনি ফ্লেমিংগোই লিখুন। কিংবা বাংলা নামকরণ করতে পারেন যদি—

"পাখিটা দেখতে কি রকম?"

"দেখতে? রঙ সাদা, ডানার ধারে ধারে গোলাপী, পা দুটো খুব লম্বা, ঠোঁটও একটু বিশেষ ধরনে বাঁকানো।"

"পা দুটো লম্বা? খুব লম্বা?"

"খুব"

"তা হ'লে লম্বগ্রীব, লম্বকর্ণের মত লম্বচরণ বা লম্বপদ বলা যায় অনায়াসে"।

"বাঃ, চমৎকার হবে। তাই লিখুন। ব্র্যাকেটে ইংরেজী নামটা দিন।"

ডানা লিখতে লাগল। অমরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে। মেয়েটি নিতান্ত তুচ্ছ করবার মত নয় তো। বাঃ! তার ঘাড়ের কুঞ্চিত কতকগুলো চুলের দিকে চেয়ে তাঁরও ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। পাখির পালকে ঠিক এই রকম দেখা যায়। সেদিন দোয়েলের যে পালকটি পেয়েছেন—।

হঠাৎ ডানা মুখ তুলে বললে, "তারপর বলুন। নীলাভ সাদা আর কোনও পাখির আছে?"

"আছে। শর্ট-টোড ঈগল (Short-toed Eagle), দেশী নাম

সাপমার। এদের ডিম ধবধবে সাদাও হয়। এদের আর একটা বিশেষত্ব—এরা মাত্র একটি ডিম পাড়ে। হোয়াইট ইবিস—সংস্কৃত নাম মুণ্ডক, এদের ডিমও নীলাভ সাদা, সবুজাভ সাদাও হয়। যাদের ডিম দু রকম বা তিন রকম রঙের হয়, তাদের নামটা আর একটা পাতায় টুকে যান তো। আগে পেয়েছেন দর্জিপাখি। যে সব ডিমে ছিটছিট থাকে—অর্থাৎ যাদের ডিম Blotched—তাদের আলাদা একটা লিস্ট করেছি আমি। আচ্ছা, এইবার সবুজে আসা যাক। ঠিক সবুজ ডিম হয় না কারও। গ্রে হেরনের (Gre Heron) ডিম সী-গ্রীন"

"গ্রে হেরনের বাংলা কি ?"

"কাঁক-পাখি, সাদা কাঁক, সংস্কৃত—কঙ্ক। সী-গ্রীনের বাংলা কি লিখছেন ? সাধারণত সমুদ্রকে আমরা নীল বলি, কিন্তু ওর সবুজ রঙও হয়—দেখেছেন কখনও ?"

"দেখেছি। সী-গ্রীন সাগর-সবুজ লিখলে ক্ষতি কি ?"

"কিছু ক্ষতি নেই। তাই লিখুন। এদেরই আর এক আত্মীয় পার্পল হেরন (Purple Heron) নীল-বক নামে পরিচিত। নীল বক, কানা-বক, ওয়াক-বক এবং তাদের জ্ঞাতি-গুষ্টিদের···আপনি এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা লিখে দিন···অনেকেরই ডিম ফিকে সবুজ রঙের। আরও দু রকম বকের কথা আগেই বলেছি, কোঁচ-বক গাই-বক, এদের ডিমে অবশ্য নীলেরই প্রাধান্য। সারস, ব্ল্যাক ইবিস্ (Black Ibis) দেশী নাম কাড়া কোল, এদের ডিমও ফিকে সবুজ, কিন্তু ছিটছিট। রীফ হেরন (Reef Heron) এ দেশে বড় দেখা যায় না, তাদেরও ফিকে সবুজ ডিম। এই সারস বকেদের দলে ঢুকে পড়েছে কিন্তু দুটি ছোট ছোট পাখি কালী-শ্যামা আর দুর্গা টুনটুনি। এদের ডিমও ফিকে সবুজ আর ছিটছিট। এই পাখি দুটি নিজেরা যেমন অস্থির, এদের ডিমের রঙেরও তেমনই কোন স্থিরতা নাই। কালী-শ্যামার সাদা, পীতাভ, ফিকে সবুজ—তিন রকম

ডিম হয়। দুর্গা-টুনটুনি ছাই রঙয়ের ডিমও পাড়ে। আশ্চর্য নয়? একটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি, পরে বলব। সবুজ, ফিকে সবুজ হয়ে গেল, এইবার আসুন নীলচে সবুজ—Bluish Green। আগে হয়েছে Greenish Blue—সবুজাভ নীল। গোলমাল ক'রে ফেলবেন না। কাক, দাঁড়কাক, জলকাক—যার চলতি নাম পানকৌড়ি, ইংরেজী নাম Cormorant—এদের ডিম নীলচে সবুজ। কাক দাঁড়কাকের ডিমে ছিটছিট আছে, আর পানকৌড়ির ডিমের উপর সাদা বা নীলচে সাদা খড়ির মত এক রকম গুঁড়ো-গুঁড়ো জিনিস মাখানো থাকে। বকেদের সঙ্গে যেমন জুটেছিল কালী-শ্যামা আর দুর্গা-টুনটুনি, কাকেদের সঙ্গে তেমনই জুটেছে দোয়েল আর শ্যামা। দোয়েলের ডিমে ছিটছিট আছে। লিখেছেন?"

"একটু বাকি আছে"

তাড়াতাড়ি লেখা শেষ ক'রে ডানা বললে, "হয়েছে, বলুন।"

কিন্তু বাধা প'ড়ে গেল।

একজন কনস্টেব্‌ল সমভিব্যাহারে দুটো কুলি এসে হাজির হ'ল। দুটো কুলির মাথায় দুটো বাক্স। কনস্টেব্‌ল ডানাকে সেলাম ক'রে চিঠি দিলে একটা। রূপচাঁদের চিঠি। রূপচাঁদ লিখছেন—

ডানা, কাল রাত্রে আবিষ্কার করলাম যে, গানের তুমি খুব ভক্ত একজন। আমাদের পরিচিত এক বন্ধু দারোগার একটি গ্রামোফোন ও অনেকগুলি ভাল ভাল গানের রেকর্ড ছিল। তিনি অল্প কিছু দিনের জন্য বদলি হয়ে বাইরে যাচ্ছেন। আমার কাছে এগুলো রেখে যাচ্ছিলেন, আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আশা করি, গান শোনবার জন্যে বাইরের লোক ডাকবার আর প্রয়োজন হবে না তোমার। ইতি—আর, সি,

বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার?"

"রূপচাঁদবাবু একটা গ্রামোফোন আর কিছু রেকর্ড পাঠিয়ে দিয়েছেন"

"ও, বেশ তো! আমার কাছে পাখির গানের কিছু রেকর্ড আছে পাঠিয়ে দেব এখন।"

ডানা কনস্টেব্‌লের দিকে চেয়ে বললে, "ভিতরে রাখিয়ে দাও"

কনস্টেব্‌ল কর্তব্য সমাপন ক'রে চ'লে গেল।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "নিন, তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলতে হবে এটা। আনন্দবাবু হয়তো অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে নদীর ধারে"

আবার শুরু করলেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "এইবার আসুন অলিভ গ্রীনের কোঠায়। এর বাংলা কি হবে? জলপাই সবুজ? আমাদের দেশী পাখিদের মধ্যে একমাত্র গৈয়রই অলিভ গ্রীন ডিম পাড়ে"

"গৈয়র পাখির নাম শুনি নি তো?"

"ইংরেজী নাম স্টোন্ কারলিউ (Stone Curlew), অনেকটা বাটান পাখির মত—গায়ে বাদামী ডোরা, চোখে চশমার মত কালো দাগ আছে। পাথুরে জায়গায় থাকতে ভালবাসে। খাকী রঙের ডিমও হয় এদের কখনও কখনও। ডিমের গায়ে ছিটেফোঁটাও থাকে যে সব পাখি বালিতে, পাথরে কিংবা খোলা মাটিতে ডিম পাড়ে তাদের ডিমে সবুজের সঙ্গে নানা আমেজের খাকী, হলুদ আর ছাই রঙ দেখা যায়। গাংচিল (Tern) আর বাটানের (Plover) ডিম Greenish Grey—সবুজ-ধূসর, অন্য ধরনেরও হয়। ডিমে ছিটছিটে থাকে। সবুজের ফর্দ শেষ হ'ল এইখানে, এইবারে হলুদে আসা যাক একেবারে ঠিক হলুদ রঙের কোনও ডিম নেই। জলমুরগির ডিম ফিকে হলুদ, খাকীও হয়।"

লিখতে লিখতে ডানা বললে, "জলমুরগি আছে নাকি আবার?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। এগুলোর ইংরেজী নাম হচ্ছে Indian Moor Hen, ওয়াটার হেনও বলে কেউ, তবে আসল ওয়াটার হেন হচ্ছে ডাহুক। Indian Moor Henকে পানপায়রা, কোড়াও বলে। সংস্কৃত নাম কোযষ্টি। বিলে-ঝিলে খুব থাকে। এদের ডাক

হচ্ছে কিররিক-ক্রেক্-রেক্-রেক্। আর ডাহুকের ডাক কু-ওয়াক্, কু-ওয়াক্, কু-ওয়াক্, কুক্ কুক্ কুঁক্। এদের দুজনেরই ডাক বর্ষাকালেই শোনা যায় বেশি। বিদ্যাপতি, না, কার ভাল একটি কবিতা আছে ডাহুক নিয়ে। আনন্দবাবু থাকলে বলতে পারতেন।”

ডানা বললে, “আমি একটা জানি। মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া”—ব’লেই লজ্জিত হয়ে পড়ল সে, কিন্তু পর-মুহূর্তেই সামলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল আবার।

“হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটেই। বোধ হয় বর্ষার গান। এই সব পাখিদের মেটিং সিজন (Mating Season) বর্ষার সময় কি না, আর সেই সময় খুব ডাকে ওরা।”

“ফিকে হলুদ রঙের ডিম আর কোন্ কোন্ পাখির আছে বলুন?”

“আর কারও নেই। তারপর লিখুন ক্রীম। কালীশ্যামা, তিলে-বাজ, দুধরাজ, গ্রে তিতির আর ডাহুক। কালীশ্যামার ডিম ফিকে সবুজ হয়, একথা আগেই বলেছি। ডাহুকের ডিমও লালচে সাদা হয় অনেক সময়। কালীশ্যামা, দুধরাজ আর তিলেবাজের ডিম ছিটছিটও। মানে, Blotched; এইবার লিখুন ফিকে ক্রীম—ময়ূর, নাক্‌টা হাঁস। ময়ূরের ডিমে ছিটছিট থাকে, নাক্‌টার ডিম আইভরির অর্থাৎ হাতীর দাঁতের তৈরি ব’লে মনে হয়। লিখেছেন?”

“হ্যাঁ”

“তারপর, লিখুন, পিংকিশ ক্রীম—কুলোপাখি আর বাজ। বাজের ডিম অবশ্য পেল স্টোনও (Pale stone) হয়। দেখুন এসব রঙের বাংলা নাম কি হবে—কপিশ-টপিশ হবে বোধ হয়, সেগুলো আপনি ঠিক ক’রে নেবেন তো?”

“চেষ্টা করব। তারপর বলুন।”

“নানা ধরনের স্টোন রঙ আছে। কাদাখোঁচার ডিম Yellowish Stone, Coot-এর ডিম Buffy stone, গাংচিল আর বাটানের ডিমও Buffy stone”.

"কুট কি পাখি ?"

"যার সংস্কৃত নাম কারণ্ডব"

"ও"

"পাশে লিখে রাখুন, গাংচিল আর বাটানের ডিমে ছিটছিট থাকে। এইবার আসুন খাকী রঙে। খাকী রঙের ডিম হয় Quail-দের। যাদের বটের বলে। তবে খাকীতে নানা রঙের আমেজ থাকে। Quail আছেও তো অনেক রকম। তাই খাকীর সঙ্গে কখনও লালচে, কখনও পীতাভ, কখনও ক্রীম মিশে থাকে। হুক্‌নার ডিমও এই ধরনের'

"হুক্‌না ? সে আবার কি রকম পাখি ?"

"ইংরেজী নাম Indian Courser। শুকনো জায়গায় বালির চড়ায় থাকে সাধারণত। গায়ের রঙও Sandy Brown। চোখের উপর সাদা সাদা দাগ। আগেই বলেছি, যে সব পাখি বালিতে কিংবা খোলা মাটিতে ডিম পাড়ে, তাদের ডিম হয় খাকী, Greenish খাকী বা ওই ধরনের। এই দলে ফেলতে পারেন Lapwing মানে টিট্টিভদের, Pipit মানে বাগেরিদেরও। এদের ডিম ছিটছিটও। এই বাগেরিদের সগোত্র হচ্ছে আবার ভরতপাখির দল—Finch Lark, Sky Lark, Crested Lark প্রভৃতি। এরাও মাটিতে ডিম পাড়ে। এদের ডিমও ওই ধরনের Greyish, Greyish Yellow বা Yellowish White। নানা রকম শেড আছে। এইবার আসুন লালের কোঠায়। ঠিক লাল ডিম কারও নেই। তবে বাদামী, Brick red, লালচে, ফিকে গোলাপী, Salmon এই সব আছে। লিখুন, বাদামী রঙের ডিম হচ্ছে কালো তিতিরের। এদের ডিম চকোলেট রঙেরও হয়। Painted তিতির, হিন্দীতে যাকে পতীলু বলে, এদের ডিমও বাদামী। চমৎকার Bronze Brown হচ্ছে জলপিপির ডিম। ছিটছিট আছে। হুক্‌নার ডিমও Brown হয় অনেক সময়। আর Florican, যাকে হিন্দীতে লীখ বলে, তাদের ডিমও বাদামী"

"লীখ ?"

"হ্যাঁ"

ডানা দ্রুতবেগে ঢুকছিল। বৈজ্ঞানিক তার দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "হ'ল ?"

টোকা শেষ ক'রে ডানা বললে, "বলুন"

কিন্তু একটা দমকা হাওয়া এসে গোলমাল ক'রে দিলে সব।

কবি টেবিলের উপর কয়েকখানা কাগজ রেখে গিয়েছিলেন, সেইগুলো উড়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

"ধরুন, ধরুন—"

বৈজ্ঞানিক ও ডানা দুজনেই উঠে ছুটোছুটি ক'রে কুড়োলেন কাগজগুলো।

দেখা গেল, একটা কবিতা লেখা রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "পড়ুন তো কবিতাটা, নিশ্চয় কোনও পাখির বিষয়েই লিখেছেন। এই নীরস আলোচনার পর—আপনার নিশ্চয় নীরস লাগছে খুব ?"

"না। আমার তো বেশ লাগছে"

শিশুসুলভ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন অমরেশবাবু।

"সত্যি, এগুলো নীরস নয় মোটেই, এতে একবার যদি রস পান তা হ'লে আর—আচ্ছা, কবিতাটা পড়ুন।"

ডানা পড়তে লাগল।

একলা ঘরে দুপুরবেলায়
লিখছি চিঠি তোমায় প্রিয়,
চিড়িক চিড়িক ডাকছে চড়াই
চুমুক চুমুক ডাকছে কি ও।
স্বর্ণলতায় ফুটছে যা রং
শঙ্খচিলের কণ্ঠে সারং
এর ছবি কি আঁকতে পারি
নয়কো এ যে অঙ্কনীয়।

একলা ডালে বসন্ত-বউ
ডাকছে কারে আকুল ডাকে
দূরের বনে নিবিড় ছায়ায়
বউ-কথা-কও সাধছে কাকে
তপ্ত বায়ে কাঁদছে কি সুর
রোদের বীণায় কাঁপছে দুপুর
বাজায় পায়ে বহ্নি-নূপুর
কোন্ মোহিনী নর্তকী ও।

ফটিক জলের ব্যাকুল ডাকে
আকুল বিরাট ঔষধি যে
তীক্ষ্ণ সুরের শায়ক হেনে
চাইছে ও কোন্ দ্রৌপদীকে
পথ চেয়ে কার আকুল পাখি
'চোখ গেল' যে বলছে ডাকি
ধাপে ধাপে চড়ছে যে সুর
নয়কো তাহা বর্ণনীয়।

বর্ণনীয় নয়কো জানি
বলতে তবু চাইছি সবি
অসম্ভবের স্বপ্ন দেখি
ছন্দ-পাগল অন্ধ কবি
লুকিয়ে যাহা মর্মে বাজে
ভাষায় তাহা ফুটছে না যে
এ রূপকথার অরূপ বাণী
আন্দাজে তা বুঝেই নিও।

"অনেকগুলো পাখি লক্ষ্য করেছেন দেখছি ভদ্রলোক। চড়াই, শঙ্খচিল, বসন্ত-বউরি, বউ-কথা-কও, চোখ-গেল, ফটিকজল। চমৎকার হয়েছে কবিতাটা, নয় ?"

"হ্যাঁ"—ডানার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠেছিল। কোনক্রমে 'হ্যাঁ' কথাটা উচ্চারণ ক'রে সে কাগজ ছুখানা সরিয়ে রেখে দিলে। রূপচাঁদ যে গ্রামোফোন ও রেকর্ডগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেটার দিকেও আড়চোখে চেয়ে দেখলে একবার। তার মনে হ'ল, ছটো বিরাট গর্ত যেন মুখ ব্যাদান ক'রে আছে তার সঙ্কীর্ণ পথের ছু পাশে। একটু অন্যমনস্ক হ'লেই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

"ক্ষমতা আছে ভদ্রলোকের। চমৎকার ছন্দটি—"

"ব্রাউন তো হয়ে গেল। এর পর—"

"হ্যাঁ, এর পর লিখুন ফিকে লাল—উইদিন ব্র্যাকেট Pale Pink। নাইটজারের ডিম ফিকে লাল। নাইটজারের বাংলা নাম জানি না, হিন্দী নাম ডাভাক। সাদা শকুনের ডিম Pale Brick Red। সাদা শকুন দেখেছেন ? অতি কুৎসিত পাখি, ডিমগুলি কিন্তু চমৎকার। Pale Brick Red-এর উপর কালোর ছিটেফোঁটা। হ'ল ? এইবার লিখুন সাদার লিস্ট। চোর পাখি, ফিঙে, বাবুই, মুনিয়া, Tickel's Flower Pecker—ইনি পাখিদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম, কাঠঠোকরা, ভগীরথ, বসন্ত-বউরি, কুকো, টিয়া, চন্দনার দল, নীলকণ্ঠ, বাঁশপাতি, মাছরাঙা, ধনেশ, তাল-চোঁচ, প্যাঁচা সবরকম—কেবল কালোপ্যাঁচার ডিমে একটু ক্রীমের আভাস থাকে, শকুনি—এক সাদা শকুনি ছাড়া, কিন্তু সাদা শকুনির ডিমও সাদা হয় অনেক সময়। তারপর লিখুন গরুড়, সাপমার। এদের ডিম নীলচে হয় আগেই বলেছি। কোড়ল, হরিয়াল, পায়রা, ঘুঘু, হাড়গিলে, সিল্‌হি, দীঘোচ, বুশ কোয়েল (Bush Quail), মানিকজোড়, সোনাজঙ্ঘা, ডোকহর, কালীশ্যামা। কালীশ্যামার ডিম অন্য রঙেরও হয় আগেই বলেছি। তারপর লিখুন পিট্টা। পাশে নোট ক'রে নিন যে, চোরপাখি, ফিঙে, গরুড়

এদের ডিমে সাদার উপর ছিটছিটও থাকে। আর ধনেশ, বামুন শকুনি, সিল্‌হি, এদের ডিম প্রথমে সাদা থাকে, কিন্তু তা দিতে দিতে ঠিক সাদা আর থাকে না, আর সোনাজজ্বা আর ডোকহরের ডিম একটু ময়লাটে সাদা হয়। তারপর লিখুন—হ'ল আপনার ?"

ডানা লিখতে লিখতে শুধু যে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তা নয়, কবিতাটা পড়ার পর থেকে একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এসব লক্ষ্য করলেন না। করলে হয়তো ক্ষান্ত দিতেন।

"এইবার লিখুন, সাদার সঙ্গে অন্য যে সব রঙের আভা আছে। শ্যামাভ সাদা—ক্যারকাটা, সাতসয়ালি মানে মিনিভেট, চড়াই, সব ছিটছিট। Buzzard Eagle, যাকে দেশী ভাষায় বলে তিস্‌সা, আর খয়রার ডিম যে নীলাভও হয় তা আগেই বলেছি। তারপর আসুন। Pinky White—ফটিকজল, বুলবুল, সাধারণ চিল। ফটিকজলের সঙ্গে চিলের কি আকাশ-পাতাল তফাত! কিন্তু ডিমের রঙের ক্ষেত্রে মিলেছে এসে দুজনে। ভারি অদ্ভুত, না? সারসের ডিমও Pinky White হয়, Pale greenও হয়। এদের প্রত্যেকের ডিমে ছিটছিট। এর পর লিখুন Reddish white—লালমাথা বাজ, দর্জিপাখি এদের ডিম নীলাভও হয়। ডাহুক, ডাহুকের ডিম ক্রীম রঙের হয় আগেই বলেছি। সকলের ডিমই ছিটছিট। তারপর লিখুন, পীতাভ সাদা—বগেরি, ভরত, তিলেবাজ, মাঠ-চিল সব blotched। গ্রেইশ হোয়াইট—শঙ্খচিল, যার স্বরে আনন্দবাবু সারং সুর শুনেছেন, আর Bustard Quail। তারপর লিখুন, কফি-সাদা—ময়ূর, এদের ডিম Pale creamও হয়। মোটামুটি এই হ'ল ফর্দ। এর থেকে কি বোঝা যায়? একটু গবেষণা করা যাক আসুন।"

বৈজ্ঞানিক হেসে ডানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ডানা টোকা শেষ ক'রে বললে, "একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, অধিকাংশ ডিমই ছিটছিট।"

"হ্যাঁ, অনেক ডিমই। এ বিষয়ে একটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি। যত গাইয়ে পাখি আছে, সকলের ডিম ছিটছিট। ফটিকজল, বুলবুল, শ্যামা, কালীশ্যামা, দোয়েল, বেনেবউ, কাজলগৌরি, পাহাড়ী-ময়না, ভরত, দুর্গা-টুনটুনি—"

"আচ্ছা, কোকিলের কথা বললেন না?"

"ওহো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো! কোকিলেরা তো একটা class by themselves—ওরা আলাদা একটা শ্রেণীই—parasitic—বাংলায় কি যেন ভাল একটা নাম আছে—"

"পরভৃতিক?"

"হ্যাঁ, পরভৃতিক। এরা পরের বাসায় ডিম পাড়ে। আমাদের দেশেই কোকিল সতেরো রকমের আছে। আচ্ছা, এদের কথা বলছি, একটু বিশ্রাম ক'রে নিন আপনি"

"চা ক'রে আনি?"

"আনুন"

বৈজ্ঞানিক একটা কাগজে তাড়াতাড়ি নোট লিখতে লাগলেন। ডানা উঠে চা করতে গেল।

এইবার শুরু করা যাক আসুন। কোকিলদের রঙের বৈজ্ঞানিক নাম Cuculidoe—এটা আবার দু-রকম sub-familyতে বিভক্ত—থাক্, অততে দরকার নেই—আমরা যে চার রকম কোকিল এ দেশে সাধারণত দেখতে পাই, তার কথাই লিখুন। প্রথম, যাকে আমরা কোকিল বলি, তার ইংরেজী নাম হচ্ছে কোয়েল, পাশে একটু ফাঁক রেখে দিন, বৈজ্ঞানিক নামটা আমি পরে বসিয়ে দেব। এরা কাক কিংবা দাঁড়কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। ডিমের রঙও ওদের ডিমের রঙের মতই হয়—ফিকে নীলচে সবুজ গোছের। একটু ছোট। ছিটছিট থাকে।"

আর একবার ডেকে উঠল কাঠঠোকরাটা। উৎকর্ণ হয়ে থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক।

“নিন নিন, শিগ্‌গির লিখুন। ওটাকে দেখতে হবে এক্ষুণি। কোকিল জাতের দ্বিতীয় নম্বর পাখি ‘চোখ গেল’ ইংরেজী নাম Brain-Fever Bird বা Hawk Cuckoo, কারণ হঠাৎ এদের দেখলে বাজ ব’লে ভ্রম হয়। এরা সাধারণত ছাতারে জাতীয় পাখিদের বাসায় ডিম পাড়ে। ছাতারেদের ডিমের মতই এদেরও ডিম নীল—ছিটছিট নয়, কিন্তু চমৎকার নীল। তৃতীয় যে কোকিল এ দেশে দেখা যায়, তাকে আমরা বলি ‘বউ কথা কও’, এর ইংরেজী নাম Indian Cuckoo। এরা সাধারণতঃ হিমালয় অঞ্চলে বাচ্চা পাড়ে, এ দেশেও হয়তো পাড়ে, ঠিক জানা নেই। যতদূর জানা গেছে, এরা হিমালয় অঞ্চলের পাখি Blue Chat অথবা Laughing Thrush এর বাসায় ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ নীল, কখনও ছিটছিট থাকে, কখনও থাকে না। তারপর চতুর্থ কোকিল যা আমরা দেখতে পাই, তা হচ্ছে চাতক—Pied Crested Cuckoo—এদের সাধারণত বর্ষাকালেই বাংলা বিহার অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও এরা থাকে—বিশেষ ক’রে মাদ্রাজ অঞ্চলে। সিংহলেও প্রচুর আছে। আফ্রিকাতেও এ পাখি খুব দেখা যায়। অনেকের ধারণা, এরা শীতকালটা কাটায় আফ্রিকায়, বর্ষার সময় এ দেশে আসে। এ দেশেই ডিম পাড়ে। এরাও ডিম পাড়ে ছাতারেদের বাসায় কিংবা Laughing Thrush-এর বাসায়। ডিমের রঙ নীল, কিন্তু ছিটছিট নয়।

আমি যে থিয়োরিটা খাড়া করেছি যে, গায়ক পাখিদের ডিমের গায়ে ছিটছিট থাকে, এরা তার ব্যতিক্রম বলতে পারেন। কিন্তু এদের ডিমে ছিটছিট না থাকার কারণও আছে। এরা পরের বাসায় চুরি ক’রে ডিম পাড়ে, সেইজন্য তাদের ডিমের মত ডিম পাড়তে হয় এদের। এদের কথা যদি বাদ দেন, তা

হ'লে কিন্তু এটা বেশ দেখা যায়, যেসব পাখি গায়ক অথবা শিল্পী অথবা চতুর অথচ মানুষ-ঘেঁষা তাদেরই ডিমের গায়ে ছিটছিট থাকে। গায়ক পাখিদের নাম আগেই বলেছি। এইবার শিল্পীদের কথা লিখুন। বাসা তৈরি করবার সময় যারা নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, তাদেরই শিল্পী বলছি। চোরপাখি, ফটিকজল, বুলবুলি, শ্যামা, দোয়েল, বেনেবউ, কাজলগৌরী, ফিঙে, বাবুই, মুনিয়া, দুর্গাটুনটুনি, দর্জিপাখি—এরা অনেকে ভাল গায়কই শুধু নয়, ভাল শিল্পীও। এদের বাসা চমৎকার। তারপর যেসব পাখি খুব চতুর ব'লে বিখ্যাত, অথচ যারা মানুষ-ঘেঁষা —যেমন ধরুন কাক, দাঁড়কাক, চড়াই, হাঁড়িচাঁচা, চিল—এদের ডিমও ছিটছিট। এ সবের ব্যতিক্রম অনেক আছে, যেমন ধরুন ময়ূর, বটের, জলপিপি, কাদাখোঁচারা খুব যে মানুষ-ঘেঁষা তা নয়, কিন্তু ওদের ডিমেও চমৎকার বর্ণ-বৈচিত্র্য। তবু কিন্তু একটা কথা মনে হয়—"

বৈজ্ঞানিক চুপ ক'রে গেলেন।

"কি কথা ?"

"মনে হয়, এরা শিল্পী মানুষকে মুগ্ধ ক'রে শত্রুর হাত থেকে নিজেদের ডিমকে বাঁচাতে চাইছে। এরা মানুষের শিল্প-বোধকে কোন না কোন উপায়ে তুষ্ট করে। হয় গান গেয়ে, না হয় সুন্দর বাসা বানিয়ে, না হয় ডিমের রঙ দিয়ে এরা আমাদের মুগ্ধ ক'রে যেন নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে। ওদের গুণ দেখে আমরা যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারে ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি মনে মনে। যাদের বাসা খুব সাধারণ কিংবা যাদের গানের গলা তেমন নেই, যাদের ডিম সাদা, যারা গর্তে বাসা বানায়, অথচ যারা মানুষের সান্নিধ্যে থেকে মানুষের প্রতাপের সহায়তা কামনা করে (কামনা করে কিনা জানি না, এটা আমার থিয়োরি), তাদের দেখবেন প্রায়ই রূপ আছে। দেখতে চমৎকার। কাঠঠোকরা, ভগীরথ, বসন্তবৌরি, হুপো, কুকো, টিয়া, চন্দনার দল,

বাঁশপাতি, মাছরাঙা, হরিয়াল, পায়রা, ঘুঘু, পিট্টা, নানারকম হাঁস। ময়ূর, বটের, জলপিপি, কাদাখোঁচাদেরও এই দলে ফেলতে পারেন। যারা চমৎকার নয়, তারা আবার অদ্ভুত—যেমন প্যাঁচা, শকুনি, হাড়গিলা, মানিকজোড়, সোনাজঙ্ঘা প্রভৃতি। এরা অদ্ভুত রস দিয়েই বোধ হয় মানুষের রসবোধকে তৃপ্ত করে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে এরা বিপদেও পড়েছে হয়তো একটু, কারণ মানুষও এদের উপর কম অত্যাচার করে না, কিন্তু তা সত্বেও মানুষই বোধ হয় একমাত্র জীব যারা জ্ঞাতসারে এদের রক্ষণাবেক্ষণও করে নিজেদের রসবোধের তাগিদে। এরা বোধ হয় সেটা বুঝেছে, তাই মানুষের কাছাকাছি এসে নানা ভাবে তাকে আনন্দ দিচ্ছে আর তার বদলে আদায় করছে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ। অনেকটা সিম-বায়োসিস ধরনের। পাখিদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপ। বেশির ভাগ সরীসৃপদের ডিম সাদাই হয়, তাই বোধ হয় অনেক পাখির ডিমও সাদা, আর যাদের ডিম সাদা তারা প্রায়ই ডিম পাড়ে গর্তে—লুকিয়ে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, যাদের ডিম সাদা, তাদের ডিমেও মাঝে মাঝে রঙের ছিটেফোঁটা লাগছে। ডিমের রঙ বদলাচ্ছে এমন পাখি অনেক আছে—কালীশ্যামা, হাঁড়িচাঁচা এর অতি সাধারণ উদাহরণ। নানারকম রঙের ডিম হয় এদের। দর্জিপাখি, ভরত, বাগেরি, টুনটুনি, নাইটজার, বাজ, তিলেবাজ, ময়ূর, রেন কোয়েল, জলমুরগি, কায়েম, সারস, ছকনা, গাঙচিল, কালো তিতির প্রভৃতি অনেক পাখি আছে যারা একাধিক বর্ণের ডিম পাড়ে। মনে হয়, ডিমের রঙ নিয়ে এরা যেন পরখ করছে, কোন্‌টা মানুষের পছন্দ হবে। অর্থাৎ পাখিরা যত আধুনিক হচ্ছে, তত যেন তারা মানুষের মনোহরণ ক'রে মানুষের বন্ধুত্ব কামনা করছে। মানুষদের মধ্যেও যেমন বিশ্ব-মৈত্রীর ভাব জাগছে ক্রমশ, মানুষ ক্রমশ যেমন হিংসার পথ ত্যাগ ক'রে প্রেমের পথ আনন্দের পথ বেছে নিচ্ছে, আনন্দ দিচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে, পাখিদের মধ্যেও

সেইরকম কিছু একটা হচ্ছে হয়তো। তা না হ'লে এত বর্ণ-বৈচিত্র্যের কোনও মানে হয় না যেন। এসব কিন্তু আমার কল্পনা। যুক্তির নিক্তিতে ওজন ক'রে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এটাকে দাঁড় করানো শক্ত। প্রথমত, পাখিদের ডিমে পাখিরা সজ্ঞানে রঙ ফলায় না, যদিও অবশ্য ডিমের গায়ের রঙ ডিমটা ডিম্বকোষ থেকে বেরোবার পর ডিমটা যখন ডিম্বনালীতে আসে তখন লাগানো হয়, দ্বিতীয়ত—"

কাঠঠোকরাটা ডেকে উঠল আবার।

"চলুন, ওঠা যাক। বিজ্ঞানের অংশটুকু লেখা হয়ে গেছে। কল্পনার তো শেষ নেই। উঠুন। কাঠঠোকরাটাকে দেখা যাক। চলুন, আর দেরি করবেন না। আসুন—"

তড়াক ক'রে নেবে পড়লেন বৈজ্ঞানিক বারান্দা থেকে। ডানাও নাবল। পিছু ফিরে ডানার দিকে চেয়ে বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমরা যেটার ডাক শুনলাম, সেটা হচ্ছে Golden-backed Woodpecker। এ অঞ্চলে আর একরকম আছে, সেটাকে বলে মারহাট্টা Wood-pecker। হিমালয় অঞ্চলে আরও দেখা যায় কয়েকরকম। এসব দেশেও আরও দু-একটা ছোট জাতের কাঠঠোকরা আছে। এই Golden-backed Wood-peckerই তিন রকম আছে—"

আবার ডেকে উঠল কাঠঠোকরা।

সিঁড়িটা দিয়ে তড়বড় ক'রে নেবে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তাড়াতাড়ি নাবতে গিয়ে ডানার শাড়িটা গেল জুতোর সঙ্গে আটকে। ঘাড় ফিরিয়ে তা দেখতে পেয়েই বৈজ্ঞানিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর উঠে এলেন তাড়াতাড়ি এবং হাঁটু গেড়ে ব'সে ছাড়াতে লাগলেন সেটা।

"থাক্ থাক্, আমি নিচ্ছি ঠিক ক'রে"—ডানা প্রতিবাদ ক'রে উঠল।

"তাতে কি হয়েছে। ছটফট করবেন না। বকলশের কাঁটার সঙ্গে আটকে গেছে পাড়টা। বকলশওয়ালা জুতোগুলো শাড়ির সঙ্গে খাপ খায়না ঠিক। এই হয়েছে—"

বৈজ্ঞানিক উঠে দাঁড়ালেন। ডানার মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে বললেন, "চলুন—"

ডানার গালের পাশটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। ডানার পরনে ছিল সবুজ রঙের শাড়ি একখানা। বৈজ্ঞানিকের হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, জাভায় একরকম সবুজ রঙের বনমুরগি আছে, তারা blush করে। মনে কোনও রকম আনন্দ বা উত্তেজনার সঞ্চার হ'লে সমস্ত মুখটা লাল হয়ে ওঠে তাদের। টার্কিদেরও হয়,··· ডানার কথা ভুলে এই কথাই ভাবতে লাগলেন তিনি অন্যমনস্ক হয়ে।

ডানার মনের ভিতর অদ্ভুত একটা আলোড়ন চলছিল। হঠাৎ তার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল এই শিশুপ্রকৃতির মানুষটিকে। দুরন্ত নদের মত দুর্দম বেগে ব'য়ে চলেছে যেন। কি গভীর আর কি পবিত্র। কোন অহমিকা নেই, কোন সঙ্কোচ নেই, কোন গ্লানি নেই। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সে। সেই কল্পিত গহ্বরটা ভেসে উঠল মানসপটে। রত্নপ্রভার মুখটাও।

···কবি আসছেন দেখা গেল। বৈজ্ঞানিক এগিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

"বাটান একটাও নেই। কাদাখোঁচাদেরও দেখতে পেলাম না। বকের সারি ব'সে আছে কেবল। দু-একটা সাদা-মাথা খঞ্জনও দেখলুম। ভারি আনন্দ পেলাম আজ"

"নতুন কিছু দেখলেন ?"

"নতুন কিছু নয়, সবই পুরনো, কিন্তু চমৎকার। দোয়েল ডাকছে, চোখগেল ডাকছে, কোকিল ডাকছে, দুর্গাটুনটুনি ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছে। মাঠে গম কাটা হচ্ছে, সরষে কাটা হচ্ছে। আমের

মুকুলের গন্ধে আমোদিত চারিদিক। অশ্বত্থগাছগুলো ভ'রে উঠেছে সবুজ কচি পাতায়। সজনে গাছে সজনে ঝুলছে। গাছটা যেন সহস্র আঙুল বাড়িয়ে মাটিকে ছুঁতে চাইছে আবার। অপরূপ হয়ে উঠেছে নিমগাছটা। আমড়াগাছের ডালে ডালে সবুজ শিখায় লেগেছে সোনালী রঙ, মরকতমণির মত ছোট ছোট ফল ধরেছে। আতাগাছে পরশু পর্যন্ত কিছু ছিল না, আজ ভিড় ক'রে এসেছে কিশলয়ের দল তার গাঁটে গাঁটে। ঘেঁটুফুল ধরেছে, মনে হচ্ছে, সবুজ ছোট একটি মুখ উঁকি দিচ্ছে যেন লাল ঘোমটার ভিতর থেকে। তেলাকুচো ফলগুলো পেকে টুকটুকে লাল হয়েছে…"

কবি সোৎসাহে ব'লে চলেছিলেন, আরও হয়তো বলতেন, কিন্তু বাধা দিলেন বৈজ্ঞানিক।

"কবিতা লিখেছেন নিশ্চয় ?"

"লিখেছি। একটা পাখির বিষয়ে"

"কি পাখি ? আসুন, বসা যাক এইখানটায়। এইখান থেকে চারিদিক দেখা যাবে বেশ, কাঠঠোকরাটাকে দেখবার সুবিধে হবে। কোন্ পাখির বিষয়ে কবিতা লিখলেন ? বক ছাড়া তো বিশেষ কিছু দেখেন নি বলছেন"

"না, আর একটা পাখিও লক্ষ্য করেছি। আপনি সেদিন যে একটা বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে এর ছবি দেখেছিলাম। আমাদের দেশে পাখিটার নাম কানাকুয়া। বইয়ে লিখেছে—কুকো।"

"ও, দেখেছেন ? ক্রো-ফেজান্ট (Crow Pheasant), চমৎকার পাখি, নয় ? বেশ একটু বিশেষত্ব আছে"

"অদ্ভুত ধরনের"—ব'লে উঠলেন কবি, "বেশ একটু রহস্যময়। আমাদের আশেপাশেই থাকে, কিন্তু ওরই মধ্যে বেশ একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে চলে। কাক বা শালিকের মত খেলো হয়ে যায় নি। ও দিকটায় ব'সে ছিলাম, হঠাৎ দেখি, ঝোপের আড়াল থেকে বেরুল,

বেশ গম্ভীরভাবে ভারিক্কি চালে ঘুরে বেড়াতে লাগল শ্যাওড়াগাছের ওপাশে যে নির্জন জায়গাটুকু আছে সেইখানে। কালো রঙের সঙ্গে ডানার বাদামী রঙটা মানিয়েছে চমৎকার। কুকো নামটা ভাল নয়, কানাকুয়ো নামটাও না। আমি ওর নাম দিয়েছি বাদামী-কালো। ভাল হয় নি ?"

"বেশ হয়েছে! ওরা কিন্তু জাতে কোকিল, তা জানেন ?"

"হ্যাঁ, আপনার বইটাতে পড়লাম তাই। দেখলে মনে হয়, রিটায়ার্ড ডেপুটি বা মুন্সেফ গোছের, ফাজিল ফক্কোড় নয়, নিজের মতে নিজের পথে চলবার মত মনের জোর আছে ব'লে মনে হয়। নিজেই বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে, যদিও কোকিল। ডাকে প্যাঁচার মত, কিন্তু নিশাচর নয়—"

"গুপ্‌ গুপ্‌ গুপ্‌ গুপ্‌"—হঠাৎ ডেকে উঠল বাদামী-কালো।

"আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছে। হ্যাঁ, এক রকম প্যাঁচার ডাকও অনেকটা ওই রকম, আপনি পড়াশোনা করেছেন দেখছি"

"ওর বিষয়েই কবিতাও লিখে ফেলেছি একটা। শুনবেন ?"

"নিশ্চয় শুনব। পড়ুন।"

কবি ডানার দিকে ফিরে দেখলেন, ডানা ঘাড় ফিরিয়ে নির্নিমেষে চেয়ে আছে পরপারের দিকে। গালের পাশটা লাল হয়ে রয়েছে তখনও।

একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে কবি পড়তে লাগলেন—

বাদামী-কালোকে দেখেছ কখনও ভাল ক'রে ?
দেখেছ হয়তো, চেন না কিন্তু তাকে।
বিদ্রোহী পিক, কোকিল অথচ কোকিল নয়,
সমাজ-বিধিকে অমান্য ক'রে থাকে।

কোকিলের মত ডাকবে না কুহু-কুহু
কিছুতেই নয়—উঁহু—

দিনের আলোয় প্যাঁচার মতন ডাকবে
কোকিলের মত কালো কালো ছুটো ডানা
পছন্দ নয়—না—না—
বাদামী রঙের শাল দিয়ে তাকে ঢাকবে,
আপনার মনে বেড়িয়ে বেড়াবে আস্তে সে
বন-বাদাড়ের ফাঁকে
বাদামী-কালোকে দেখেছ কখনও ভাল ক'রে ?
দেখেছ হয়তো, চেন না কিন্তু তাকে।

পরের বাসায় ডিম সে কখনও পাড়বে না
আপনার ডিমে তা দিতে কখনও ছাড়বে না
বলুক যা খুশি লোকে,
কবি বিরহীর হৃদয় কখনও কাড়বে না।
অজানা বেদনা মনে যদি জমে এসে
হঠাৎ ফেলবে কেশে,
মনে হবে বুঝি ফেটে গেল কারো পাঁজর,
নিঝুম দুপুর চমকাবে বারে বারে
সে কাশির ঝঙ্কারে
মনে হবে বুঝি বাজল কোথাও ঝাঁঝর !
লুকিয়ে তখন চুপ ক'রে ব'সে থাকবে সে
ঘন-পল্লব-শাখে
বাদামী-কালোকে দেখেছ কখনও ভাল ক'রে ?
দেখেছ হয়তো, চেন না কিন্তু তাকে।

কবি থামতেই বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন, "বাঃ পাখিটার মোটামুটি জীবন-চরিতই লিখে ফেলেছেন দেখছি। ওর যে 'ঝন্‌ন্' ক'রে আর একটা ডাক আছে, সেটাও লক্ষ্য করেছেন উনি—।...এ কি হ'ল !" ডানার দিকে চেয়েই তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক।

কবিও দাঁড়ালেন। ডানা শুয়ে পড়েছে, চোখ বোজা, হাত দুটো মুঠো করা।

"ফিট হয়েছে"—বৈজ্ঞানিক বললেন।

"তাই তো দেখছি। কি করা যায়?"—কেঁপে উঠল কবির কণ্ঠস্বর।

দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। ডানার মুষ্টিবদ্ধ হাতটা সাপের মত সঞ্চালিত হতে লাগল ধীরে ধীরে।

"একটু জল দরকার"—বৈজ্ঞানিক বললেন, "চাকরটাকে খবর দেবেন? কিংবা চলুন, আমরা দুজনে ধরাধরি ক'রে ওঁকে বাসায় নিয়ে যাই। আমি পায়ের দিকটা ধরছি, আপনি মাথার দিকটা ধরুন"

চিত্রটা কবির কল্পনায় এমন বিসদৃশ ঠেকল যে, তিনি ব'লে উঠলেন, "না না, সে কি! চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে যাবেন কি! জল আমি এনে দিচ্ছি এখুনি"

ছুটে গিয়ে নিজের চাদরটা তিনি নদীর জলে চুবিয়ে নিয়ে এলেন।

চোখে মুখে জলের ছিটে লাগাতেই উঠে বসেছিল ডানা। সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিল সে নিজেই। এমন ব্যাপার আর কখনও তো ঘটে নি তার জীবনে। হঠাৎ বুকের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে উঠল, তারপর সব অন্ধকার। শুয়ে পড়েছিল সে? আশ্চর্য।

"এখন কেমন লাগছে?"—কবি জিজ্ঞাসা করলেন।

"ভালই"

"একটু জল এনে দেব কি আপনাকে? তেষ্টা-টেষ্টা পায় নি তো? রোদের তাত বেড়েছে তো আজকাল"

"না, জলের দরকার নেই"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ডানা তারপর সলজ্জকণ্ঠে যা বললে, তা অপ্রত্যাশিত। বললে, "আপনি আমাকে আর 'আপনি' বলবেন না। ভারি লজ্জা করে আমার"

এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না কবি। তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর গলার কাছটা কেমন যেন ব্যথা করতে লাগল। একটু সামলে নিয়ে সহজকণ্ঠেই তিনি উত্তর দিলেন, "ও, আচ্ছা, তা বেশ!"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ডানা বললে, "চলুন, যাই"

"অমরবাবু স্ট্রেচার আনতে গেছেন। একটু ব'স"

"স্ট্রেচারের দরকার কি? আমি হেঁটেই যেতে পারব"

উঠে পড়ল ডানা এবং হাঁটতে শুরু করল। কবিও অনুগমন করলেন।

"আমার কাঁধের উপর হাতটা রাখ না হয়। দুর্বল মনে হচ্ছে না তো?"

ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে ডানা বললে, "না। এমনিই যেতে পারব"

"খুব আস্তে আস্তে চল তা হ'লে"

কবির কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম উদ্বেগ ফুটে উঠল। তিনি হয়তো ডানাকে স্ট্রেচারের জন্য অপেক্ষা করতে আর একবার অনুরোধ করতেন, কিন্তু কোথা থেকে ঝঙ্কার দিয়ে ডেকে উঠল একটা পাখি। সুরের তুবড়ি ফুটল যেন শূন্যে। কুর কুর কুর কুর কুর কুর, চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল···। ধাপে ধাপে চড়তে লাগল সুর।

"কি পাখি ওটা?"

"পাপিয়া"

"পাপিয়াই বুঝি 'চোখ গেল' পাখি?"

"হ্যাঁ"

ডানা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। কবিও চুপ ক'রে রইলেন। অন্য কোন কারণে নয়, তাঁর মনের ভিতর যা হচ্ছিল তা এত বিচিত্র এত গভীর এত কোমল যে, তাতেই তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন তিনি, কথা বলবার প্রয়োজনই অনুভব করছিলেন না। বাসাটার কাছাকাছি এসে তাঁর চমক ভাঙল বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরে। দেখা

গেল, তিনি স্ট্রেচার এবং লোকজন নিয়ে আসছেন। রত্নপ্রভাও সঙ্গে আছেন।

"ওঁকে হাঁটিয়ে আনছেন?"—বিস্মিত বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন শঙ্কিত কণ্ঠে।

"আমার আর কোনও কষ্ট নেই। কেন জানি না, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল তখন, এখন আর কোনও কষ্ট নেই"

কথা কটি ব'লেই ডানা কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। রত্নপ্রভা গম্ভীরভাবে একবার চেয়ে দেখলেন তার মুখের দিকে। কোনও কথা বললেন না। মনে মনে ডানার সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন তিনি খুব, কিন্তু মুখ দেখে তা বোঝা যাচ্ছিল না। আর একবার চাইলেন ডানার দিকে। চোখোচোখি হতেই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর গম্ভীর মাংসল মুখটা। কোনও কথা বললেন না কিন্তু।

··বাসায় পৌঁছে বৈজ্ঞানিক স্ট্রেচার এবং স্ট্রেচার বাহকদের বিদায় ক'রে দিলেন। তারপর রত্নপ্রভার দিকে চেয়ে বললেন, "আমাদের চা খাওয়াও একটু তুমি। এখানে সব ব্যবস্থা আছে বোধ হয়, না?"

"আছে। আমিই ক'রে খাওয়াচ্ছি, উনি কষ্ট করবেন কেন?"

ডানা উঠে ভিতরে গেল। রত্নপ্রভার গম্ভীর চোখে হাসির আভাস ফুটে উঠল আবার একটা। ডানার পিছু পিছু তিনি ভিতরের দিকে চ'লে গেলেন। কবি এবং বৈজ্ঞানিক ব'সে রইলেন বারান্দায়। পাপিয়াটা সামনে ডেকে চলেছে। বৈজ্ঞানিক এই প্রসঙ্গে কিছু বলবেন ভাবছিলেন কবিকে, কিন্তু বাধা পড়ল। পিওন হাজির হ'ল একটা। বললে, সে আনন্দবাবুকে খুঁজছে, টেলিগ্রাম আছে একটা। কবি ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে পড়লেন টেলিগ্রামটা। বিনয়ের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। তাঁদের নেবার জন্যে লোক আসছে।

কবি চায়ের জন্য আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। বাড়ি চ'লে গেলেন।

৮

বিনয়ের বিয়েতে যাবার ইচ্ছে কবির ছিল না। প্রথমত, বিয়ে-বাড়ির গোলমাল ভালই লাগে না তাঁর; দ্বিতীয়ত, ভয় হচ্ছিল, ডানাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর মানস-সরোবরে যে অপরূপ পদ্মটি ফুটছে ধীরে ধীরে, তা ঝ'রে পড়বে এই সব টানা-হেঁচড়ায়। ডানার প্রেমে প'ড়ে তিনি যে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তা ঠিক নয়। হাবুডুবু খাওয়ার বয়স পার হয়েছিলেন তিনি। মানসিক গঠনটাও তাঁর অন্য রকম, তবু তিনি প্রেমেই পড়েছিলেন। চন্দ্রের টানে যেমন জোয়ার আসে, ডানার সংস্পর্শে তাঁর মনে তেমনই এমন একটা ভাবাবেগ উথলে উঠেছিল যা যে কোনও কবির পক্ষে পুলকপ্রদ, অন্য কোনও কারণে নয়, তা কাব্যসৃষ্টির অনুকূল ব'লে। যা সৃষ্টির প্রেরণায় মনকে উন্মুখ ক'রে তোলে, যার স্পর্শে নিমেষে মনের মেঘে ইন্দ্রধনু ফুটে ওঠে, কল্পনা-বীণায় লক্ষ সুরের সম্ভাবনা কাঁপতে থাকে, তাকে উপেক্ষা করা কবি-মনের পক্ষে অসম্ভব, সাধারণ জীবের পক্ষে যেমন অসম্ভব খাদ্যকে উপেক্ষা করা। কাব্যই কবির জীবন, কাব্যেই তার স্ফূর্তি, কাব্যলোকই তাঁর কাছে একমাত্র আনন্দলোক। কিন্তু কাব্যের আনন্দরূপ কবি-মনেও মূর্ত হয় না সব সময়ে, সরসী থাকলেই যেমন কমল ফোটে না। উনপঞ্চাশবায়ু-বাহিত অপরূপ উপলক্ষ্য এসে হাজির হয় অকস্মাৎ কোন অজানা আকাশ থেকে। শিহরণ জাগে, পাখি ডাকে, সাড়া প'ড়ে যায় কিশলয়দের নিদ মহলে, বাঁশী বেজে ওঠে বনে বনে, কাব্য-সুরধনী মর্ত্যে অবতরণ করেন স্বর্গলোক থেকে। আনন্দবাবুর কবি-মন অবসন্ন হয়েছিল যেন এতদিন। ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লিখতেন বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। ডানার অভ্যাগমে মরা-খাতে বান এসেছে হঠাৎ, মঞ্জুরিত হয়ে উঠেছে শুষ্ক তরু। তাঁর সমস্ত সত্তা যেন নূতন ক'রে বিকশিত হয়েছে এই নূতন বৃন্তটির উপর। ডানার প্রেমেই তিনি পড়েছিলেন,

কিন্তু সাধারণত প্রেমে পড়া বলতে যে ধরনের জৈবলীলা বোঝায় এ ঠিক তা নয়। এ তার চেয়ে ঢের বেশি তীব্র। হঠাৎ কোন বাঁশীতে কোনও বংশীবাদক যদি নিজের মনের সুরটি প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়ে যান, তা হ'লে সেই বাঁশীর প্রতি তাঁর যে ধরনের টান হয়, ডানার প্রতি কবির টানটাও সেই ধরনের। যে বস্তুকে অবলম্বন ক'রে মন অবাস্তব কল্পলোকে উড়ে যেতে পারে, ডানা যেন সেই অপরূপ বস্তু, সেই নিখুঁত দেহ-শিল্প, যার মধ্যে দেহাতীতের সন্ধান পাওয়া যায় অপ্রত্যাশিতভাবে। তাই ডানাকে ছেড়ে এখন কোথাও যাবার চিন্তা অসহ্য তাঁর কাছে। কিন্তু মন্দাকিনীকে কি যে বলবেন, তাও তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। সত্য কথা বলা অসম্ভব। অনর্থকও। মন্দাকিনী তার ঠিক মর্মটি বুঝবেন না। রীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েই কবি বাড়ি পৌঁছলেন টেলিগ্রামটি নিয়ে। খবরটা শোনামাত্র উল্লসিত হয়ে উঠলেন মন্দাকিনী।

"যাক, শেষ পর্যন্ত খবর একটা পাওয়া গেল তবু। আমার ভয় হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গেল বুঝি আবার সব। কালই লোক আসছে ? তা হ'লে তো রাজু ধোপার কাছে এখনই লোক পাঠাতে হয়, একটি গাদা কাপড় তার কাছে। ঠাকুরটাকেই পাঠাই না হয়—"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। মাত্র একটি দিন হাতে, অনেক কিছু ব্যবস্থা ক'রে যেতে হবে তাঁকে। গিয়েই তো ফিরে আসা যাবে না সঙ্গে সঙ্গে। অন্তত মাস দুই থাকতে হবে সেখানে। অনেকদিন বাপের বাড়ি যাওয়া হয় নি, ছাড়বে কি তারা সহজে ? তা ছাড়া, খোকনের গ্রীষ্মের ছুটি সামনে। মামাদের আমবাগান ছেড়ে সে কি আর আসতে চাইবে ? এখানকার ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব ক'রেই যেতে হবে। এই ব্যবস্থা করতে গিয়ে কিন্তু মন্দাকিনী এক গুরুতর সমস্যায় প'ড়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কবির সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল।

আনন্দমোহন মন্দাকিনীকে খবরটি শুনিয়ে নিজের তেতলার

ঘরটিতে গিয়ে ব'সে ছিলেন চুপ ক'রে। পালে হাওয়া লেগেছে, নৌকাটিকে স্রোতের মুখে ছেড়ে দিয়েছেন, এমন সময় এ কি সর্বনেশে মেঘ দেখা দিলে ঈশান কোণে! বিনয়ের বিয়েতে তাঁর যাবার ইচ্ছে নেই—এর আভাস মাত্র তো প্রকাশ করা যাবে না মন্দাকিনীর কাছে! অসুখের ভান করবেন?

মন্দাকিনী এসে প্রবেশ করলেন।

"ওগো, শুনছ, সুন্দরীকে নিয়ে কি করা যায় বল তো? পোয়াতি গাই, এমনভাবে ফেলে যাওয়া কি উচিত ঠাকুর-চাকরের হাতে? সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া যায় না? সেখানে আমাদের বেশ বড় গোয়া -ঘর আছে"

" গল নাকি! গাড়ি পাবে কোথায়? এখন কি আর সেদিন আছে, ানুষই গাড়িতে জায়গা পাচ্ছে না এখন, তা গরু—"

"তা হ'লে উপায়? ও কি, কোমরে হাত বুলোচ্ছ কেন?"

"কোমরটায় ব্যথা হয়েছে"

"তা হ'লে তুমি থেকে যাও না হয়। ওখানে গিয়ে অত্যাচারে আবার বেড়ে যায় যদি। অত্যাচার হবেই, ভিড়ের বাড়ি তো। সেই ভাল। ঠাকুর তো রইল, লোকটা রাঁধে ভাল, মসলার হাতটা কম। তুমি থাকলে সুন্দরীর সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারব। সেই ভাল"

কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে কবি বললেন, "ওঁরা আবার মনে করবেন না তো কিছু? বিনয় হয়তো ভাববে—"

"কি আবার ভাববে? কোমরে ব্যথা নিয়ে যেতে হবে তা ব'লে?"

কবি চুপ ক'রে রইলেন। মন্দাকিনী তাঁর দিকে এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, যার অর্থ—বুড়ো বয়সে এমন হুজুকে হওয়ার কোন মানে হয় না।

কবি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেন। আকাশে ধপধপে সাদা স্তূপ-মেঘ জ'মে রয়েছে খানিকটা, আর সেই পটভূমিকায়

বিরাট একটা পাখি ডানা মেলেছে। সাদার মাঝখানে কালো। চমৎকার দেখাচ্ছে। দূরবীনটা তুলে নিয়ে দেখলেন। দেখে কিন্তু হতাশ হয়ে গেলেন একটু। শকুনি। তখনই আবার মনে হ'ল, এতে দুঃখ করবার কি আছে? শকুনিও পাখি। সৃষ্টির মহাকাব্যে ওর স্থান দোয়েল-কোকিলের চেয়ে কিছু কম নয়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কথাও মনে হ'ল। যুক্তি দিয়ে আমরা যা মানি, কার্যকালে তা মানি কি? নিরপেক্ষতার পোষাকী মুখোশটা দার্শনিকতা আস্ফালন করবার সময়ই ব্যবহার করি আমরা। প্রতি মুহূর্তের কাজে কিন্তু উৎসাহ পাই নিজেদের অতি-সঙ্কীর্ণ ভাল-লাগার প্রেরণায়। পাপিয়া দোয়েলই আমাদের আনন্দ দেয়, শকুনি নয়। শকুনি অতি উপকারী পাখি জেনেও আমরা তাদের আমল দিতে চাই না ভাল-লাগার ক্ষেত্রে। অথচ উপকারী পাখির উপকারকে আমরা যে তুচ্ছ করি তাও নয়। এই চিন্তাটা অনেকক্ষণ আবিষ্ট ক'রে রাখল কবির মনকে। প্রাচীন গ্রীকদের কথা মনে পড়ল। তাঁরা তাঁদের সমাজব্যবস্থায় মোহিনী এবং কল্যাণী উভয়েরই গৌরব-ময় স্থান নির্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন। বিবাহ করতেন স্বাস্থ্যবতী নারী দেখে, যাঁরা সন্তানের জননী হয়ে গৃহলক্ষ্মীর বেদী অলঙ্কৃত করতেন, যাঁরা ছিলেন গার্হস্থ্যধর্মের প্রাণস্বরূপ, জাতির জন্য বীর সন্তান মানুষ হ'ত যাঁদের কোলে। মোহিনী হওয়ার দায়িত্ব তাঁদের ছিল না। মোহিনীদের ক্ষেত্র ছিল স্বতন্ত্র মাধুর্যে বিশিষ্ট। তাঁদের কাজ ছিল মুগ্ধ করা। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পী কবি রাজা সেনাপতি ছাত্র অধ্যাপক সকলকেই প্রেরণা যোগাত ওই মোহিনীর দল। তাদের মুঞ্জরিত যৌবনশ্রী স্পর্শমণির মত সকল স্বপ্নকেই সোনার স্বপ্ন ক'রে তুলতে পারত। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি। তারপর হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, ডানা আর মন্দাকিনীকে অবলম্বন ক'রে মন তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ করেছে। সেই স্বপ্নলোকে সুন্দর হয়ে উঠেছে দুজনেই। ছন্দাবিষ্ট মন বন্দনা করছে দুজনকেই।

স্নিগ্ধ শ্যামল ছোট গ্রামখানি
বাঁধিছে শতেক বন্ধনে
দূর দিগন্তে কার হাতছানি
ডাকিছে অচেনা নন্দনে
চেনা-অচেনার আলো-আঁধারিতে
দোলে অপরূপ হিন্দোলা
পুরাতন মন বলে বারে বারে
নব সুর নব ছন্দ নে।

কত নিঃসাড় হ'ল যে উতলা
অশান্ত হ'ল শান্ত যে
কত লৌহের শাস্তি অচলা
নাশিল অয়স্কান্ত যে
দোলে হিন্দোলা সীমা-অসীমায়
শুষ্ক তরুও মুঞ্জরে
পরিচিত পথে পথ ভুলে যায়
অতীব প্রাচীন পান্থ যে।

কবিত াটা লিখে শান্তি পেলেন তিনি। ডানার প্রতি তাঁর মন যে আকৃষ্ট হয়ে ছে—এর একটা সঙ্গত ওজুহাত আবিষ্কার ক'রে ফেললেন যেন। তাঁ র মনে হ'ল, জীবনের এবং জাগতিক ব্যাপারের কোনও কিছুর উপ রই তো হাত নেই তাঁর। বয়স দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে—এ যেমন তি তনি রোধ করতে পারেন না, ডানার প্রতি এই আকর্ষণও তেমনই অ নিবার্য। এও রোধ করার সাধ্য তাঁর নেই। সে চেষ্টা না ক'রে ব রং আত্মসমর্পণ করাই ভাল। শুধু তাই নয়, নিয়তিনির্দিষ্ট এই বিধানে ক মেনে নিয়ে সেটা উপভোগ করাই উচিত। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এক টা বিবেকের মোহে প'ড়ে আত্মনির্যাতন করার কোনও

অর্থ হয় না। নিঃসাড়কে যে শক্তি উতলা করে, চক্রবালরেখায় যে অজানার আহ্বান উন্মুখ ক'রে তুলছে সমস্ত চিত্তকে, জড় লৌহকে চঞ্চল ক'রে তুলছে যে অচেনা চুম্বকের মায়া, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ক্ষত বিক্ষত হওয়া ছাড়া আর কোনও লাভ নেই। কিন্তু আত্মসমর্পণ করলে আনন্দ আছে। জীবনে আনন্দই তো কাম্য। হঠাৎ পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। শিস দিতে দিতে উঠে দাঁড়ালেন।

...অকস্মাৎ একটা তীক্ষ্ণ সুরে ছন্দিত হয়ে উঠল চারিদিক। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, পুরুষ টুনটুনিটা কল্কে ফুলের ডালে ব'সে মুখ উঁচু ক'রে ডেকে চলেছে। কুচকুচে কালো পোষাক প'রে বরবেশে সেজেছে। কাঁঠালগাছে গিয়ে বসল আবার। দুরন্ত দামাল একটা কালো প্রজাপতি যেন। কিংবা এক টুকরো কালো মেঘ। অন্তর্নিহিত বিদ্যুতের দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে সর্বাঙ্গ থেকে। আবার ডাকল। মনে হ'ল, মূলতানের আলাপ যেন। হুইট টু হুইট টু হুইট—গুলতানি করতে করতে আবার ছুটে গেল আম-গাছের দিকে। ওই যে টুনটুনি-বউ ব'সে আছে আমের মুকুলের আড়ালে। উড়ে গেল অন্য গাছে। আবার নূতন একটা সুরের ফোয়ারা ছড়িয়ে পুরুষ পাখিটা ছুটল তার পিছু পিছু। দুপুরের রোদ তপ্ত হয়ে উঠেছে। এলোমেলো বাতাস বইছে একটু। মাঠে মাঠে গম যবের পক্ক স্বর্ণকান্তিতেও যেন যৌবনের আভাস ফুটেছে। হাওয়ায় দুলে দুলে তারা যেন উপভোগ করছে দামাল টুনটুনি-দম্পতীর প্রণয়লীলা। সমানে ডেকে চলেছে পুরুষ টুনটুনিটা। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎপ্রবাহ উতলা ক'রে তুলেছে প্রকৃতিকে। এক ঝাঁক প্রজাপতির মত উড়ে এল এক ঝাঁক উপমা কবির মনে আকাশে কোন অদৃশ্য স্বপ্নলোক থেকে। ছন্দের আবেগে কাঁপতে লাগল মন। টেবিলে গিয়ে বসলেন। টুনটুনির উদ্দেশে কবিতা লিখতে শুরু করলেন।

কুচকুচে রঙ ছোট্ট পাখি
গাইল কি সুর মূলতানই ?
বুকফাটা এ কান্না নাকি
কিংবা কেবল গুলতানই !
নাইক মুকুট নাই জড়োয়া
নাই তবু তার কুছ পরোয়া
তম্বি ক'রে বেড়ায় যেন
হাবশীদেশের সুলতানই।

আলোর বানে দিচ্ছে পাড়ি
আঁধার নায়ের মাল্লা নাকি
কাশিম মিঞার খুঁজছে বাড়ি
মরজিনার আবদাল্লা নাকি

টুনটুনি-বউ কোথায় ওগো
বসলে গিয়ে কার ডালে
রোদ-বাহারি গান শোন গো
তাল দাও না তার তালে।
কান্না ও কি লক্ষ হিয়ার
মেঘদূত কি যক্ষ-প্রিয়ার
চোখের তারা কোন্ তন্বীর
জীবন্ত তিল কার গালে ?

সূ[illegible] হাপর থেকে
ছিটকে এল কয়লা নাকি
কিংবা এল দ্বাপর থেকে
সেই কেষ্ট গয়লা নাকি !

৬

আলোক-ধোয়া কয়লা ও যে
আগুন জ্বলে ওর বুকে
রাজার ছেলে গয়লা ও যে
রাধার বাঁশী ওর মুখে
চিরন্তনের ওই নমুনা
গঙ্গাবুকে ওই যমুনা
বইছে সুখে তোয়াক্কা নেই
আজ কাল বা পরশুকে।

মহাকালের শুভ্র ভালে
মহাকালীর টিপটি যেন
সমুদ্রেরি উর্মিজালে
মাটির ছোট দ্বীপটি যেন

৭

সেদিন সহসা অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর থেকে ডানা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার সঙ্গত একটা কারণ খুঁজে বার করবার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে সে মনে মনে। হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে দুজন স্বল্পপরিচিত পুরুষের সামনে এমনভাবে নিজের শালীনতাকে ক্ষুণ্ন করলে কেন সে? কোনও উঁচু জায়গা থেকে হঠাৎ পদস্খলিত হয়ে প'ড়ে গেলে অনেক সময় লোক যেমন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তারও কি সেই ধরনের কিছু হয়েছিল? সেও কি নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও [illegible] সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছিল মনে মনে? কোথায়? ভাবাবেগের আতিশয্যে লোকে সংজ্ঞা হারায়

শোনা গেছে। তারও কি তাই হয়েছিল? সেও কি কোনও অন্তর্নিরুদ্ধ ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিল? কি ধরনের ভাবাবেগ? মনে তো পড়ে না কিছু। কিছুই নির্ণয় করতে পারছিল না সে। কিন্তু এ কথাও সে ভুলতে পারছিল না যে, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। এমন একটা কিছু যা উপেক্ষণীয় নয়, যা হয়তো ইঙ্গিতে এমন একটা সত্য প্রকাশ করতে চেয়েছে যার নিগূঢ় মর্ম তার মর্মবাণীরই আভ্যাস। বীজকে বিদীর্ণ করে যেমন অঙ্কুরের আগ্রহ, ঝড়ের প্রাবল্যে সূচিত হয় যেমন বায়ু-চাপের অসাম্য, তেমনই প্রবল অমোঘ কোনও শক্তি সেদিন ঘোষণা ক'রে গেছে তার অন্তর্নিহিত অস্তিত্ব, জানিয়ে গেছে তার জাগরণের বার্তা।...

নিজের ঘরের বারান্দায় চুপ ক'রে ব'সেছিল সে একটা ক্যাম্প-চেয়ারে। ফিট হওয়ার পর থেকে কেমন যেন দুর্বল বোধ করছে সে। মনে হচ্ছে, যেন কতকাল অনাহারে আছে। হঠাৎ নদীর ধারের শিমুলগাছটা চোখে পড়ল। বিশাল বলিষ্ঠ গাছটা লাল লাল ফুলে ভ'রে রয়েছে। ফুল নয়, ওর বলিষ্ঠতাটাই বিশেষ ক'রে চোখে পড়ল। চোখে পড়ল ওর দুর্দম পৌরুষটা। মনে হ'ল, কত শীতাতপ, কত বর্ষা, কত ঝঞ্ঝা, কত বজ্রপাত সহ্য ক'রে যুগযুগান্ত দাঁড়িয়ে আছে ও মাথা উঁচু ক'রে। কি একটা পাখি যেন বাসা বাঁধছে ওর ডালে। অমরবাবু বই দিয়েছিলেন একটা পড়বার জন্যে, কোলের উপর ছিল সেটা এতক্ষণ, উলটে পালটে দেখতে লাগল সেটা। মন কিন্তু বসল না। চোখ বার বার ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল ওই বলিষ্ঠ শিমুলগাছটাকে, আর মন উৎসুক হয়ে উঠল পাখির বাসাটা দেখবার জন্যে। বইটা রেখে উঠে পড়ল সে। নদীর ধারে শিমুলগাছটার দিকে এগিয়ে গেল। কাছেই সজনেগাছের উঁচু ডালে ব'সে ছিল একটা নীলকণ্ঠ পাখি। আস্তে আস্তে ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে ড্য ড্য ড্য ধরনের শব্দ করছিল কিছুক্ষণ থেমে থেমে। ডানাকে দেখে হঠাৎ সেটা উড়ল পাখা

মেলে উচ্ছ্বসিত কলরবে চতুর্দিক সচকিত ক'রে। ডানার মনে হ'ল, তাকে দেখে অট্টহাস্য ক'রে ব'লে উঠল যেন—এসেছে, এসেছে, ও-ও এসেছে এবার। ডানা শিমুলগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল, নূতন ক'রে বিস্মিত হ'ল সে আবার শিমুলগাছের শিকড়গুলো দেখে, কেবল বিস্মিত নয় রোমাঞ্চিত হ'ল। বলিষ্ঠ শিকড়গুলো কি প্রবল শক্তিতে আঁকড়ে আছে মাটিকে, কি দুর্বার আগ্রহে ঢুকে গেছে মাটির ভিতর! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে কিছুক্ষণ তারপর একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে সেগুলোকে। স্পর্শ ক'রে কেমন যেন আনন্দ হ'ল একটু। তারপর ব সল তা উপরে বর্ষাকালে নদীর স্রোতে মাটি ধুয়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে শিকড়গুলো নিশ্চল একটা অক্টোপাস যেন। নিশ্চল, কিন্তু সজাগ, সজাগ এবং সক্রিয়। প্রতি মুহূর্তে শোষণ করছে রস। প্রাণরস একটু দূরে একটা গোদা চিল এসে বসল মাঠের উপর। নখে ক'রে কি যেন এনেছে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ডানা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল মুগ্ধ বিস্ময়ে। ওই হিংস্র পাখিটার হিংস্রতার মধ্যে একটা বিরাট সত্যকে প্রত্যক্ষ করলে লাগল যেন সে। প্রত্যক্ষ করতে লাগল, কি বিচিত্র প্রেরণায় বিকশিত হচ্ছে জীবনের নব নব রূপ অভিব্যক্তিতে! চরাচরের সমস্ত কিছুই বাঁচতে চাইছে, উপভোগ করতে চাইছে নিজের অস্তিত্বকে নানাভাবে এবং তার জন্যে না করছে এমন জিনিস নেই। ভাল-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল, সভ্য-অসভ্য, হিংস্র-অহিংস্র সব কিছুই হচ্ছে সে জীবনকে সার্থক করবার প্রেরণায়। সে বাঁচতে চায়, অমৃত চায় এবং সেই জন্যেই চায় এমন একটা আশ্রয়, যাকে অবলম্বন ক'রে সে হাত বাড়াতে পারে আকাঙ্ক্ষিত অমৃতের দিকে। পায়ের তলায় মাটির আশ্রয় না থাকলে আকাশের দিকে তাকানো যায় না, সাগরের রহস্য জানতে হ'লে তরণী চাই। আনন্দসুধা পান করতে হ'লে চাই একটা পাত্র। ডানার মনে হ'ল, তার তো কিছু নেই। তার···হঠাৎ সে যেন

সেদিনের ফিটের কারণটা আবিষ্কার ক'রে ফেললে। মনে হ'ল, অন্তরের গহনলোকে তার গোপন সত্তা স্বপ্ন-প্রাসাদের শিখরে উঠে বোধ হয় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল অমৃতের পিপাসায়, হঠাৎ পদস্খলন হয়েছিল তার সেখান থেকে। অলীক স্বপ্ন-প্রাসাদ স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল, কিন্তু শূন্য-লোক থেকে তার আকস্মিক পতনটা মূর্ত হয়ে রইল তার মূর্ছায়। সমস্ত চেতনাই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল তার সে দিন। অন্ধকার হয়ে গেল যেন চতুর্দিক।

…অবলম্বন? শূন্য দৃষ্টিতে সে নদীর দিকে চেয়ে ব'সে রইল। চিলটা উড়ে গেল। দূরে দেখা গেল একটা মাছরাঙাকে, দেখতে দেখতে কাছে চ'লে এল। সাদা রঙে কালোর ডোরা কাটা। জলের দিকে একাগ্র দৃষ্টি রেখে উড়ে আসছিল। সহসা স্থির হয়ে গেল শূন্যে, পাখা দুটো নড়তে লাগল কেবল, তারপর হঠাৎ জলের উপর ছোঁ মেরে উড়ে চ'লে গেল আবার। পদশব্দ শুনে ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, অমরেশবাবু আসছেন হনহন ক'রে।

"আপনি এখানে? স্যাণ্ড পাইপার (Sand Piper) দুটোকে দেখছেন বুঝি? এই বোধ হয় লাস্ট ব্যাচ, এইবার ওরা এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে। স্যাণ্ড পাইপারগুলো অবশ্য সবচেয়ে শেষে যায়, এপ্রিল মে পর্যন্ত থাকে"

"কোন্‌গুলো স্যাণ্ড পাইপার? আমি দেখতে পাই নি তো!"

"ওই যে ওপারে জলের ধারে ধারে ঘুরছে। এইটে নিয়ে দেখুন"

গলায় ঝোলানো বাইনাকুলারটা খুলে ডানাকে দিলেন তিনি। ডানা দেখতে লাগল।

"দেখতে পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। কিন্তু ওগুলো স্নাইপ নয়?"

"না। স্নাইপের মত, কিন্তু স্নাইপ নয়। স্নাইপের লক্ষণগুলো সেদিন বলেছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়?"

বাইনাকুলারটা বৈজ্ঞানিককে দিয়ে ডানা হেসে উত্তর দিলে, "সব মনে নেই। ফ্যানটেল আর পিনটেল—এই দুটো কথা মনে আছে খালি"

বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টিও হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আচ্ছা, আর একদিন বলব এখন। আমাদেরই মনে থাকে না, আপনি তো মাত্র একদিন শুনলেন। এখন শুনুন যে জন্যে এসেছিলাম। দুটো রেডস্টার্ট ডিসেক্‌ট্‌ করেছিলাম, তাদের ওভারিগুলোর সেক্‌শন ক'রে স্টেন ক'রে মাউণ্ট ক'রে ফোটো তুলেছি, এগুলো আমার ওই মাইগ্রেশনের (Migration) প্রবন্ধের সঙ্গে রেখে দিতে হবে। প্রবন্ধটা তো আপনার কাছে আছে ?"

"হাঁ, টাইপ করা হয়ে গেছে"

"ওর সঙ্গেই গেঁথে রাখতে হবে ফোটোগুলো"

"আর কটা রেডস্টার্ট আছে ? সবগুলোকেই ডিসেক্‌ট্‌ করবেন নাকি ?"

"না, বাকিগুলোকে ছেড়ে দিলাম আজ। রিং পরিয়ে দিয়েছি প্রত্যেকটার পায়ে। অনর্থক কষ্ট পাচ্ছিল বেচারারা"

"বেশ করেছেন"

আনন্দিত হয়ে উঠল ডানা খবরটা শুনে। এতদিন সে অনুভব করছিল, রেডস্টার্টগুলোর অবস্থার সঙ্গে তার নিজের অবস্থার কোথায় যেন মিল আছে একটা।

"এবার আর একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করব"

"কি ?"

"এই তো ফেব্রুআরি মাস শেষ হচ্ছে, এইবার পাখিরা বাসা বানাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আমি নানা জায়গায় কয়েকটা বাসা বানিয়ে দেব ভাবছি, দেখা যাক, তার কোনটাতে কেউ আসে কি না। আপনার এখানেও দেব কয়েকটা, আপনিও লক্ষ্য রাখতে পারবেন"

"পাখির বাসা আপনি কি ক'রে বানাবেন ? যন্ত্র অ নাকি কোন রকম ?"

না না, পাখির বাসা বানাব না ঠিক। আমি কাঠ দিয়ে এমন কয়েকটা আশ্রয় ক'রে দেব যার ভিতর ওরা বাসা বাঁধতে প্রলুব্ধ হবে, অবশ্য হবে কি না সন্দেহ, কারণ ওরা ভারি চালাক। বিশেষত যারা গাছের ডালে কিংবা ঝোপে বাসা করে, তারা কেউ আসবে না। বুলবুলি, ওরিওল (আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছেন কনকসখি), রা কেউ আসবে না। তবে কতকগুলো মানুষ-ঘেঁষা পাখি আছে, শালিক, চড়াই—এরা আসতে পারে। গাইয়ে পাখিদের মধ্যে দোয়েল, সিপাহী বুলবুল অনেকটা মানুষ-ঘেঁষা, কিন্তু ওরা আসবে না। আর আসতে পারে যারা স্বভাবত গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে, যেমন ধরুন বসন্ত-বউ, ভগীরথ, কাঠঠোকরা, ময়নারা, নীলকণ্ঠ, হুপো (আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছেন মোহনচূড়া), প্যাঁচা—ওহো, একটা জিনিস ভুলে গেছি তো, এইখানে গেল বছর হুতোম প্যাঁচা দেখেছিলাম ওই দিকটায়। ওরা নদীর ধারেই সাধারণত থাকে। এই সময়েই ওরা ডিম পাড়ে, আসুন তো, এখনই খোঁজ করা যাক"

বৈজ্ঞানিক সহসা ঘুরে খানা-খন্দ বনবাদাড় ভেঙে নদীর তীরে তীরে অগ্রসর হতে লাগলেন। ডানাও অনুসরণ করতে লাগল। এবড়ো-খেবড়ো নদীর পাড়, মাঝে মাঝে গর্ত, কাঁকর আর পাথরের টুকরো ছড়ানো চারিদিকে। এসবের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না ক'রে বৈজ্ঞানিক এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ডানার যেতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল, তবু যাচ্ছিল সে। বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে একবারও ফিরে তাকান নি, কিন্তু একটা বড় গর্ত লাফ দিয়ে পার হবার পর সহসা তাঁর খেয়াল হ'ল যে, ডানা বোধ হয় এটা লাফিয়ে পার হতে পারবে না। পিছন ফিরে তাকালেন তিনি। দেখলেন, ডানা অনেক দূর পিছিয়ে পড়েছে। দাঁড়িয়ে রইলেন। গর্তটার ওপারে ডানা এসে হাজির হ'ল একটু পরে।

"ওটা লাফিয়ে পার হতে পারবেন ?"

"না"

"তা হ'লে এক কাজ করুন, আপনি গর্তটার ভিতর নে এদিকে চ'লে আসুন। আমি হাত ধ'রে আপনাকে তুলে নিচ্ছি এদিক থেকে"

তাই হ'ল। গর্তটার ভিতর ডানা কোন রকমে ছেঁচড়ে-মেচড়ে নেবে পড়ল, তারপর এগিয়ে গেল অমরবাবুর দিকে। অমরবাবু ঝুঁকে হাত বাড়ালেন। অমরবাবুর হাত ধরতে ক্ষণিকের জন্য দ্বিধ এল ডানার মনে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই। বৈজ্ঞানিকের বলিষ্ঠ আকর্ষণে পরমুহূর্তেই সে উপরে উঠে পড়ল।

"চলুন, আর বেশি দূর নেই। ওই উঁচু পাড়টার উপর যে গাছটা ঝুঁকে রয়েছে—"

দূরবীন দিয়ে দেখলেন একবার গাছটাকে।

"হ্যাঁ, গাছের গুঁড়িতে গর্তটা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভব বাসা আছে ওখানে, চলুন, যাওয়া যাক"

আবার অগ্রসর হতে লাগলেন বৈজ্ঞানিক। এদিকটার প আরও খারাপ। কেবল উঁচু-নীচু। বড় বড় পাথর প'ড়ে আে চারিদিকে। পুরোনো বাড়ির ভাঙা দেওয়াল একটা হুমড়ি খে প'ড়ে রয়েছে এক দিকে। কারও বাড়ি ছিল বোধ হয় এখানে কোন্ কালে। ডানার চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তবু যাচ্ছিল সে। বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তার সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—এই সত্যটাকে ফাঁপিয়ে ফেনিয়ে এই কষ্টটাকে ডানা তীব্রতর ক'রে তুলতে পারত, কিন্তু সে কথা তার মনেই হ'ল না। তার এসব কিছুই মনে হচ্ছিল না। অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হচ্ছিল তার একটা। অতীত জীবনে ফিরে গিয়েছিল সে হঠাৎ। খুব ছেলেবেলায় সে তার বাবার সঙ্গে একবার একটা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। রাত কাটাতে হয়েছিল সেই পাহাড়ে একটা ডাকবাংলায়। মাঝরাত্রে

ৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। সেই অচেনা জায়গায় নিশীথরাত্রে মনে যে অদ্ভুত অবর্ণনীয় ভাব জেগেছিল, সেইটে যেন ফিরে ল হঠাৎ আবার এই রৌদ্রালোকিত প্রখর মধ্যাহ্নে এতদিনের র। তা ভয় নয়, দুর্ভাবনাও নয়। সেই নিস্তব্ধ রজনীতে একা ছানায় শুয়ে তার সমস্ত চিত্ত যেন একাগ্র হয়ে উঠেছিল, কিসের ত্যাশায় তা সে জানে না। কিন্তু উৎসুক উৎকর্ণ হয়ে সে একটা কছু আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছিল। কিসের, তা সে তখনও জানত া, জানে না। কিন্তু প্রতীক্ষা করছিল। তার কেবলই হচ্ছিল, একটা অভূতপূর্ব কিছু ঘটবে বুঝি এখনই। গভীর াত্রির নৈঃশব্দ্যকে আরও নীরব বা সহসা সচকিত ক'রে দেখা দেবে স। হয়তো সে রূপকথার রাজপুত্র, কিংবা আরব্য-উপন্যাসের দৈত্য, ানস সরোবরের শ্বেতকমল বা কাব্যলোকের ওমার-খৈয়াম···ধীরে ীরে মর্মরধ্বনি উঠেছিল সূচীভেদ্য তমসার মর্ম ভেদ ক'রে, নিস্তব্ধতা ন্দ পাচ্ছিল ধীরে ধীরে, সে চুপ ক'রে শুয়েছিল বিনিদ্র নয়নে·

"একটা মুশকিল হ'ল কিন্তু। ওঠা যাবে কি ক'রে ?"

বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরে ডানা আত্মস্থ হ'ল। দেখলে, বৈজ্ঞানিক ধ্বর্মুখ হয়ে হেলানো গাছের গুঁড়িটার দিকে চেয়ে আছেন। উঁচু াড়ের উপর হেলে আছে বিরাট বটগাছটা।

"ওই গর্তটা দেখতে পাচ্ছেন—ওই যে চওড়া কালো দাগটা যখানে রয়েছে ? ওখানটা হুতোম প্যাঁচার পক্ষে আইডিয়াল বাসা ওয়া উচিত"

দূরবীন লাগিয়ে দেখতে লাগলেন। ডানা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে াইল। তার মনে হচ্ছিল, সে যেন একটা বিরাট বাঘের পাশে াড়িয়ে আছে নির্ভয়ে। বাঘটা এখন নির্নিমেষে চেয়ে আছে হুতোম প্যাঁচার বাসার দিকে, তার সমস্ত আগ্রহ এখন ওই দিকেই নিবদ্ধ য়ে আছে, কিন্তু হঠাৎ যদি সে তার দিকে ওই আগ্রহ নিয়ে দৃষ্টি ফেরায়—একটা শিহরণ ব'য়ে গেল তার সর্বাঙ্গে।

"ওটা প্যাঁচারই বাসা, বুঝলেন—ও, এই যে—"

হঠাৎ বৈজ্ঞানিক লাফিয়ে এগিয়ে গেলেন, মাটিতে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন কি যেন।

"এই যে পালক রয়েছে এখানে, মাছের আঁশও রয়েছে। ও কেটুপার পালকও রয়েছে দু-একটা। আর সন্দেহ নেই, ঠিক ওইটেই ওর বাসা। বাসার ভিতরটা একবার দেখা দরকার। কিন্তু মুশকিল, অত উঁচুতে ওঠা যায় কি ক'রে, বলুন তো? একটা মই আনতে হবে আর কি"

হঠাৎ তাঁর চোখের দৃষ্টি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"এক কাজ করবেন? এখনই তা হ'লে ডেফিনিটলি বোঝা যায়"

"কি বলুন?"

"আমার পিঠের উপর দাঁড়াতে পারবেন? আমি সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছি এই পাথরটায় ভর দিয়ে। আপনি ওই শিকড়টা ধ'রে ওই খাঁজটায় পা দিয়ে আমার পিঠের উপর চড়ে দেখুন তো ঠিক নাগাল পেয়ে যাবেন"

এই প্রস্তাবে ডানা এত বিস্মিত হয়ে গেল যে, তার নির্বাক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নির্বাক হতে পারলে না সে। বরং তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"ছি ছি, কি যে ছেলেমানুষি করেন আপনি! আপনার পিঠের উপর দাঁড়াব কি?"

"ও, আচ্ছা, থাক্ তা হ'লে"

অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তিনি একজন মহিলার কাছে অসঙ্গত প্রস্তাব ক'রে ফেলেছেন—এ বোধটা সহসা জাগ্রত হ'ল তাঁর মনে। কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দেখে ডানার মনে হ'ল, যেন কোনও ক্রীড়নক-লুব্ধ শিশুর হাত থেকে খেলনা কেড়ে নিয়েছে কেউ। মায়া হ'ল তার।

"আপনার পিঠের উপর দাঁড়ালে আপনার লাগবে না?"

সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টি।

"কিছুমাত্র না। আপনি আর কত ভারী হবেন!"

"খুব হালকাও নই, মাস ছয়েক আগে আট স্টোন ছিলাম"

"মোটে? ওতে কিছু হবে না আমার। রত্না পাক্কা দশ স্টোন। পরেশনাথ পাহাড়ে গিয়েছিলাম আমরা একবার। হেঁটে উঠেছিলাম। কিছুদূর গিয়ে রত্না হাঁপিয়ে পড়ল। তখন কিছুদূর তাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিছু কষ্ট হয়নি তো"

ডানা অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে। তার ভয় হচ্ছিল, চোখোচোখি হ'লে সে হেসে ফেলবে এবং তা হ'লে পরদাটা উড়ে হঠাৎ। কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল তার একটু।

বৈজ্ঞানিক বলতে লাগলেন, "আর কষ্ট হ'লেই বা কি! ওদেশের বৈজ্ঞানিকেরা পাখিদের বিষয় জানবার জন্যে কি কষ্টই যে করেছেন, তা যদি পড়েন, অবাক হয়ে যাবেন। হিউম সাহেব, রিপ্‌লে সাহেবের বইগুলো দেব আপনাকে, প'ড়ে দেখবেন। পড়লে অবাক হয়ে যাবেন। বনে জঙ্গলে, পর্বতে মরুভূমিতে, উত্তরমেরু দক্ষিণ-মেরুতে, কোথায় না গেছে ওরা পাখিদের খবর জানবার জন্যে! আর আপনি এইটুকু কষ্টের কথা ভাবছেন? তা ছাড়া কষ্ট হবে না আমার, বিলিভ মি, আসুন"

বৈজ্ঞানিক ঝুঁকে সামনের পাথরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। চতুষ্পদ জন্তুর মত দেখতে হ'ল অনেকটা।

"আসুন, উঠে পড়ুন। ওই খাঁজটায় পা দিয়ে ওই শিকড়টা ধরুন। তারপর পিঠে পা দিন আমার"

ডানার মনে হ'ল, খরস্রোতে প'ড়ে গেছে সে। স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই আর। তবু সে শেষ চেষ্টা করলে একবার এবং করতে গিয়ে ব্যাপারটাকে আরও জটিল ক'রে ফেললে।

"দেখুন, গুরুজনের গায়ে পা দেওয়াটা কি উচিত হবে?"

"গুরুজন! মানে? কে গুরুজন?"

"বিদ্যায় বুদ্ধিতে বয়সে সব বিষয়েই তো আপনি বড়"

"গড্!"

বৈজ্ঞানিক উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন।

"তার চেয়ে সোজা ভাষায় বলুন না, আমি উঠব না। রত্না থাকলে উঠত কিন্তু। রত্নার আসবারও কথা আছে এখনই। মিস্ত্রি আর কাঠের বাক্স-টাক্স নিয়ে আসতে বলেছি তাকে"—তারপর হাতঘড়িটা দেখে বললেন, "এসেও গেছে হয়তো এতক্ষণ। আপনি যদি না উঠতে চান, তা হ'লে অবশ্য জোর করতে চাই না। আপনি পিঠ পেতে দিলে আমি উঠতে রাজী আছি। কিন্তু না, আমি চোদ্দ স্টোন, আমার ভার সহ্য করতে পারবেন না আপনি। চলুন, যাওয়া যাক তা হ'লে। উঠে দেখলেই পারতেন কিন্তু। প্যাঁচাটা আছে কি না এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হ'ত আপাতত। রীতিমত আয়োজন ক'রে ডিমের খোঁজ পরে করতাম তা হ'লে"

"আপনি যখন ছাড়বেন না, উঠছি"

"হ্যাঁ, আসুন"

সোৎসাহে আবার পিঠ পেতে দাঁড়ালেন বৈজ্ঞানিক। খাঁজে পা দিয়ে এবং শিকড় ধ'রে তাঁর পিঠের উপর উঠে পড়ল ডানা।

"দেখতে পাচ্ছেন গর্তটা?"

"হ্যাঁ"

"হাত ঢোকাবেন না যেন, ঠুকরে দিতে পারে। এক কাজ করুন, ডাল-টাল ভেঙ্গে নিন একটা, আর সেইটে ভিতরে ঢুকিয়ে দেখুন।"

ডাল ভাঙবার দরকার হ'ল না আর। গর্তের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই 'হিস্‌স্‌' ক'রে তর্জন ক'রে উঠল কি যেন গর্তের ভিতর থেকে।

"গর্তের ভিতর হিসহিস করছে কি যেন। সাপ হতে পারে"

"হিসহিস করছে? তা হ'লে পেঁচা আছে ঠিক। দেখতে পাচ্ছেন কিছু?"

"না"

গর্ত থেকে মুখ সরিয়ে ঘাড় ফেরাতেই আর একটা জিনিস চোখে পড়ল ডানার। তারা যেখানে ছিল, সেখানে নদীর পাড়টা খুব উঁচু। আর কিছুদূর গিয়ে পাড়টা খাড়া নেবে গেছে। নীচে গভীর খাদ একটা। তাতে জল ঢুকেছে এসে। জলের এক ধারে চওড়া পাথর একটা এগিয়ে এসেছে ছোট বারান্দার মত। ডানা দেখতে পেলে, তার উপর ব'সে আছেন রূপচাঁদ আর সনাতন মল্লিক। সনাতন মল্লিক ফাতনায় নিবদ্ধদৃষ্টি। রূপচাঁদ দূরবীন দিয়ে তাদেরই দেখছেন বোধ হয়।

"নেবে পড়ুন তা হ'লে"

ডানা নেবে পড়ল। নেবে প্রণাম করলে বৈজ্ঞানিককে।

"আরে, ছি ছি, ও কি, এটা কি হ'ল ?"

ডানা কোনও উত্তর দিলে না। বৈজ্ঞানিক অপ্রস্তুত মুখে ক্ষণকাল থেকে সোৎসাহে যা বলতে লাগলেন, তা প্রণাম-বিষয়ক কিছু নয়।

"দেখলেন ? বললাম, পেঁচা ঠিক আছে। এগুলো খুব সম্ভবত হুতোম প্যাঁচা—কেটুপা জেলোনেন্‌সিস (Ketupa Zeylonensis), খুব বড় দেখতে। মুখটা বেরালের মুখের মত। দেখি যদি ধরতে পারি এটাকে। চলুন, যাওয়া যাক এবার। রত্না বোধ হয় ব'সে আছে এতক্ষণ আমাদের অপেক্ষায়।"

হঠাৎ ঘুরে চলতে শুরু ক'রে দিলেন তিনি। ডানাও অনুসরণ করতে লাগল। শিমুলগাছটার কাছাকাছি একটা বড় গাম্‌হার-গাছ ছিল। দেখা গেল, তার উঁচু ডালে কাক বাসা বাঁধছে। বৈজ্ঞানিকই দেখতে পেলেন আগে।

"ওই দেখুন, কাক বাসা বাঁধছে। ওটাতে লক্ষ্য রাখবেন। কোকিল এসে ঠিক ডিম পেড়ে যাবে ওতে"

"কি ক'রে বুঝব তা ?"

"কাক যখন ডিম পাড়বে, তখন দেখবেন, পুরুষ-কোকিলটা

কাকের বাসার কাছাকাছি এসে খুব ডাকাডাকি করছে। কোকিলের ডাক কাকেরা মোটেই সহ্য করতে পারে না। ডাক শুনলেই বাসা ছেড়ে তাড়া করে কোকিলটাকে। স্ত্রী-কোকিল লুকিয়ে থাকে আশেপাশে। সে তখন শূন্য বাসায় এসে ডিম পেড়ে চ'লে যায়। অনেক সময় কাকের ডিম ফেলে দিয়ে নিজের ডিমটি রেখে যায়”

“ভারি আশ্চর্য তো! কাকেরা নিজের ডিম চিনতে পারে না?”

“অনেক পাখিই পারে না। বেশি দূর যেতে হবে না, মুরগিরাই অপরের ডিমে বিনা আপত্তিতে তা দেয়। ডিউয়ারের (Dewar) 'বার্ডস্ অ্যাট দি নেস্ট্' (Birds at the nest) বইটা প'ড়ে দেখবেন। বইটা আছে আমার কাছে”

কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন দুজনে। ডানা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগল।

দূরবীনে নিবদ্ধদৃষ্টি রূপচাঁদের মুখটা মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে লাগল তার মনে।···

বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই দেখা গেল, রত্নপ্রভাও আসছেন, সঙ্গে জন চারেক লোক রয়েছে। একজনের কাঁধে একটা মই, দুজন দুটো কাঠের বাক্স ব'য়ে আনছে। যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছে একজন ছুতোরমিস্ত্রি। রত্নপ্রভাকে দেখে বৈজ্ঞানিক বালকের মত ছুটে চ'লে গেলেন তাঁর দিকে।

“জান, হুতোম প্যাঁচার সন্ধান পেয়েছি আজ আমরা। ও দিকের ওই বিরাট বটগাছটায় আছে, আমি বলি নি তোমাকে? ডিম পেড়েছে সম্ভবত। মইটা এনেছ, ভালই হয়েছে। যাবে এখনই?”

“এগুলো আগে টাঙানো হোক”—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন রত্নপ্রভা।

“ও হ্যাঁ। বাঃ, কাঠের গুঁড়িটা কেটে এটা বেশ চমৎকার হয়েছে তো!”

"তোমার বইয়ে যেমন ছবি আছে, ঠিক তেমনই করিয়েছি। কোথায় টাঙাবে ব'লে দাও"

খেলনা পেলে শিশু যেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে বাক্স ছুটো পেয়ে বৈজ্ঞানিক তেমনি হয়ে উঠলেন। ডানার দিকে ফিরে বললেন, "দেখছেন? এই গুঁড়ির টুকরোটা মাঝামাঝি লম্বালম্বি, মানে—Longitudinally চিরে তার ভিতর থেকে কিছু কাঠ কুরে বার ক'রে নেওয়া হয়েছে। তারপর টুকরো কাঠ ছুটো স্ক্রু দিয়ে জুড়ে বাইরে থেকে উপরের দিকে এই গর্তটা ক'রে দেওয়া হয়েছে পাখি ঢোকবার জন্যে। গাছের গুঁড়িতে গর্ত আর সুড়ঙ্গ ক'রে যে সব পাখি বাসা বানায়, যেমন—কাঠঠোকরা, বসন্ত-বউ, ভগীরথ, তারা হয়তো এতে এসে বাসা বানাতে পারে। এই বাক্সটাও ওই প্ল্যানেই তৈরি, তবে এটা তক্তা দিয়ে তৈরি। এইটে ওই তেঁতুলগাছটায় টাঙিয়ে দেওয়া যাক, আর এইটে, মানে—গুঁড়ি দিয়ে তৈরি যেটা, সেটা ওই আমগাছটায় দাও। এই শোন, এদিকে এস"

শিশুর মত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। রত্নপ্রভার চোখের দৃষ্টিতে স্নেহস্নিগ্ধ কৌতুক-হাস্য চিকমিক করতে লাগল। ডানার দিকে এক নজর চেয়ে ঈষৎ মুখ টিপে হাসলেন তিনি।

১০

ডানার কাছ থেকে তেমন কোনও সাড়া না পেয়ে রূপচাঁদ হতাশ হন নি, বিস্মিতও হন নি, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, এ ধরনের মেয়েরা যে ধরনের সাড়া দেয়, তা প্রায়ই এত মৃদু, এত প্রচ্ছন্ন হয় যে, অনেক সময় বোঝাই যায় না। তা বোঝবার জন্যে শুধু সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকলেই যথেষ্ট হয় না, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যও প্রয়োজন। ওর কাছে অমরবাবু আর আনন্দমোহন যে জাতীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তা ভেদ ক'রে

কিংবা অবলুপ্ত ক'রে নূতন রকম একটা কিছু করার মানসিক ক্ষমতা রূপচাঁদের যে নেই তা নয়। কল্পনা তাঁর প্রচুর আছে, কিন্তু সে কল্পনাকে রূপ দেওয়ার মত অর্থ নেই। ওকে নিয়ে এখন কলকাতা-বম্বে-দিল্লী-দার্জিলিং-পুরী-ওয়ালটেয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারলে অনেকটা কাজ হ'ত। ওরই হিতার্থে এই ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে, সে ভানটা করতে হ'ত অবশ্য—রূপচাঁদ সে ভান করতেও পারতেন—কিন্তু টাকা কই ? তা ছাড়া চাকরি, এবং তৃতীয় বাধা বকুলবালা। এখানেই কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কি সেটা ? আপিসে কাজ করতে করতে, পথ চল্'ত চলতে, রাত্রে বকুলবালার পাশে শুয়ে শুয়ে প্রায়ই কথাটা ভাবেন রূপচাঁদ।

···চমৎকার জরির পাড় দেওয়া একখানা নীলাম্বরী শাড়ি নিয়ে সকালে সেদিন হাজির হলেন রূপচাঁদ ডানার কাছে। ডানা পড়ছিল।

"এই নাও"

"কি ওটা ?"

"তোমার জন্মদিসের উপহার"

"আজ পঁচিশে ফাল্গুন নাকি ?"

"হ্যাঁ"

"আমার জন্ম-তারিখ আপনি জানলেন কি ক'রে ?"—একটু বিব্রত-ভাবে উঠে দাঁড়াল ডানা।

"তুমি আমাকে যে 'বলাকা'টা পড়তে দিয়েছিলে, তাতেই লেখা ছিল। তোমার জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন কে একজন সতুদা"

"ও বইটা আপনার কাছে আছে বুঝি ? আমি খুঁজছিলাম কাল"

"কাল দিয়ে যাব। শাড়িটা দেখ দিকি, পছন্দ হয় কি না ?"

"কেন কিনতে গেলেন মিছিমিছি ? ওসব শাড়ি-টাড়ি ভাল লাগে না আমার"

রূপচাঁদ স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "তুমি এ কথা বলবে তা জানতাম। তবু না কিনে পারলাম না। ময়ূরের পেখম না হ'লে চলে না যে!"

"কিন্তু পেখম ধরে তো পুরুষ-ময়ূর, সেদিন পড়লাম"

"ঠিকই পড়েছ"

আবার চুপ ক'রে গেলেন রূপচাঁদ, কিন্তু ভাষাময় হয়ে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন বলতে লাগল—হ্যাঁ, আমারই পেখম ওটা। দেখ, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, আনন্দিত হও।

পেখমের নিগূঢ় অর্থটা উপলব্ধি করবামাত্র ডানা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল হঠাৎ। রূপচাঁদ ব'সে রইলেন চুপ ক'রে। মৎস্যশিকারী তিনি, ধৈর্যের তাঁর অভাব নেই। মিনিট দুই পরেই কিন্তু ফিরে এল ডানা। মনে হ'ল, যেন একটা মুখোশ প'রে ফিরেছে। ভাবলেশহীন মুখ। ডানার মুখের দিকে এক নজর চেয়ে একটু আশ্বস্তই হলেন যেন রূপচাঁদ। আপাত-ঔদাসীন্যের যবনিকা মানেই যবনিকার ওপারে এমন একটা-কিছু ঘটছে যা অনাবৃত রাখতে লজ্জা করে। এইটেই তো চান রূপচাঁদ। কিন্তু সেই একটা-কিছুর স্বরূপটা কি?

"বড্ড গম্ভীর হয়ে গেলে যে হঠাৎ?"

হাসবার চেষ্টা করলে ডানা। কিন্তু কোনও কথা বেরুল না তার মুখ দিয়ে।

রূপচাঁদ খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "দেখ, জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারাটাই আনন্দ। ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকেই আমাদের অমরাবতী প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। যারা রসিক, তারা সেটা খুঁজে বার করতে পারে। যারা বেরসিক, তাদের সে সামর্থ্যই নেই মোটে। কিন্তু রসিকরা যখন নীতি বা ধর্মের প্যাঁচে প'ড়ে কৃচ্ছ্রসাধনের কসরৎ করে, তখন ব্যাপারটা শুধু হাস্যকরই হয় না, করুণও হয়ে পড়ে। তোমার মত মেয়ের

কাছে যে রসের দাবি নিয়ে আসি, সে দাবি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, তা বিশ্বপ্রকৃতির দাবি—এটুকু অন্তত মনে রেখো"

স্থূল কথাটার মর্মটুকু ডানার কাছে এক নিশ্বাসে ব'লে ফেলে রূপচাঁদ যেন ঈষৎ হালকা বোধ করতে লাগলেন। প্রকাণ্ড একটা বোঝা নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে দিয়ে কুলী যেমন আরাম বোধ করে, তেমনই যেন আরাম বোধ করলেন তিনি একটা। তিনি আশা করেছিলেন, ডানা এরও কোন উত্তর দেবে না। কিন্তু ডানা ঈষৎ হেসে সংযতকণ্ঠে যা বললে, তাতে বিস্মিত হলেন তিনি। ডানার হাসিটা অতি মধুর লাগল তাঁর।

"তা কি আর জানি না!"—ডানা বললে,—"কিন্তু আপনি জিনিসটার একটা দিকই দেখছেন কেন? দুই আর দুই যোগ ক'রে চার হয় এটা যেমন সত্যি, এক আর তিন যোগ ক'রে চার হয় সেটাও তেমনই সত্যি। পাঁচ থেকে এক বাদ দিলেও চার হয়। চার সংখ্যায় অসংখ্য রকম উপায়ে পৌঁছনো যায়।"

"ঠিক বলেছ। বাঃ!"—হঠাৎ উল্লসিত হবার ভান করলেন রূপচাঁদ।

"আপনি এখন বসবেন কি? চা ক'রে আনব?"

"তুমি এখন কি করবে?"

"আমাকে অমরবাবুর একটা লেখা টাইপ করতে হবে। বিকেলেই চেয়েছেন"

"ও, তা হ'লে আমি উঠি। আচ্ছা, অমরবাবুর কাজটা ভাল লাগছে তোমার তো?"

"খুব ভাল লাগছে"

"ভাল লাগলেই ভাল। আচ্ছা, উঠি তবে এখন। কাল 'বলাকা'টা দিয়ে যাব"

রূপচাঁদ উঠে পড়লেন।

পরদিন ডানার বাড়ি থেকে ফেরবার পথে সনাতন মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। সনাতন মল্লিকের সাঙ্গোপাঙ্গদের দেখে বিস্মিত হলেন রূপচাঁদ। এদের নিয়ে কোথায় চলেছেন ভদ্রলোক? জনকয়েক সাঁওতাল, প্রত্যেকের হাতে তীর-ধনুক। বন্দুকধারীও আছে জন দুই।

"কোথা চলেছেন মল্লিক মশাই এই দুপুরে? শিকারে নাকি?"

"কাক মারতে"

"হঠাৎ এ খেয়াল?"

"খেয়াল নয়, চাকরি। শ-খানেক কাক মেরে আনতে হবে—হুকুম হয়েছে"

"কি হবে?"

"রিসার্চ, রিসার্চ—"

"কাক নিয়ে?"

"কাক বক শালিক চিল শকুন কেউ বাদ যাবে না। আপনি যান নি নাকি এদানিং?

"না, একটু ব্যস্ত ছিলাম"

"গিয়ে দেখে আসুন! বার-বাড়িটা কশাইখানা ক'রে তুলেছে একেবারে। মরা পাখিদের ডানা ঠোঁট পালক মাপা হচ্ছে। পেট চিরে চিরে চামড়া ছাড়িয়ে দিনরাত রিসার্চ চলছে পরশু থেকে। আর বউটাও কি জুটেছে তেমনই মশাই! পাগল স্বামীকে তুই কোথায় সামলে-সুমলে রাখবি, না, তুইও সামনে উবু হয়ে ব'সে ব'সে পাখির পালক মাপছিস ওর সঙ্গে!"

"তাই নাকি?"

"যাচ্ছেতাই কাণ্ড। দেখে আসুন না গিয়ে।"

মুচকি হেসে রূপচাঁদ বললেন, "রিসার্চ করবার মত দামী একটা চিড়িয়া তো পেয়েছেন। কাক বক নিয়ে সময় নষ্ট করছেন কেন ভদ্রলোক?"

চোখ মটকে সনাতন মল্লিক বললেন, "সে রিসার্চও চলছে, সেদিন তো দেখলেনই স্বচক্ষে। তা চলুক না, তুই বড়লোকের ছেলে, বদখেয়ালে দু-দশ হাজার ওড়া না, পাখির পেছনে এমন ক'রে লেগেছিস কেন ?"

দুম ক'রে আওয়াজ হ'ল একটা। কলরব ক'রে এক দল কাক উড়ল একটা গাছ থেকে। যে লোকটি বন্দুক ছুঁড়েছিল, সে অপ্রস্তুত মুখে বললে, "লাগল না"

"আরে, কাক মারা কি সহজ কথা!"—মল্লিক মশাই ব'লে উঠলেন, "ওপারে যাওয়া যাক চল। এপারে আর পাওয়া যাবে না, সব ভড়কে গেছে, একটু থিতুক। ও অঞ্চলটা ঘুরে আসি ততক্ষণ আচ্ছা, আমরা চলি তা হ'লে। উঃ, রোদের তাত দেখেছেন এরই মধ্যে ?"

সদলবলে চ'লে গেলেন মল্লিক মশাই। রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ডানাকে 'বলাকা'টা ফিরিয়ে দিতে এসেছিলেন তিনি। ডানার সঙ্গে দেখা হয় নি। কপাট বন্ধ ছিল। বন্ধ দ্বারে অনেকক্ষণ করাঘাত করাতে চাকরটা বেরিয়ে এসে খবর দিলে যে, মাইজীর শরীর খারাপ, তিনি এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।

বৈজ্ঞানিকের পৃষ্ঠারূঢ়া ডানার ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল হঠাৎ। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়ালেন আবার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটি সিগারেট বার ক'রে ধরালেন সেটি নিপুণভাবে। তারপর আবার চলতে লাগলেন।

১১

নিজের তেতলার ঘরটিতে ব'সে কবি কবিতা লিখছিলেন। মন্দাকিনী চ'লে গেছেন। মন্দাকিনীর চ'লে যাওয়াটাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর মনে কত কি যে হচ্ছে, তার ঠিক নেই। মন্দাকিনীই যেন বার বার নানাভাবে ঘুরে ফিরে আসা যাওয়া করছে মনে। মন্দাকিনী না থাকলে যে ডানাকে নিয়ে তাঁর সমস্ত কল্পনা মেতে উঠবে তিনি মনে করেছিলেন, সে ডানার কাছে যেতেই ইচ্ছে করছে না যেন তাঁর। স্টেশনে ট্রেনের জানলায় মন্দাকিনীর মুখটা বার বার মনে পড়ছে। তাঁর কথাগুলোও—'সাবধানে থেকো, আমি যত শিগ্‌গির পারি চ'লে আসব।' মন্দাকিনীর চিন্তার সঙ্গে ডানার কথাও মিশছিল এসে তাঁর অজ্ঞাতসারে। শব্দের ঝঙ্কারে আর ছন্দের মিলে যে অর্থটা কবিতায় পরিস্ফুট হচ্ছিল, তা হয়তো ঠিক তাঁর মনের কথা নয়, তবু তিনি তন্ময় হয়ে লিখে যাচ্ছিলেন।—

নানা সুরে তারা ব'লে যায়
    পুনরায় ফিরে আসব তো
ব'লে যায় তবু চ'লে যায়
    জীবনের লীলা শাশ্বত।

হাসি করে রোজ অশ্রু-স্নান
হয় হিমাংশু অংশুমান
সূর্য-হিমানী-প্রণয়-গান
    রঙিন মেঘের বাষ্প তো।

এসেছ কে তুমি নন্দিতে
    অপরাজিতার স্বপ্ন কি
আলো-আঁধারির সন্ধিতে
    গোধূলি-বেলার লগ্ন কি

জন্ম-মৃত্যু দুঃখ সুখ
কাঁপায় প্রাণ ভরায় বুক
নবীন ফুল সে উৎসুক
বলে আমি ভালবাসব তো।

১২

তিন-চার দিন থেকে ঝোড়ো হাওয়া বইছে একটা। ধুলো বালি ঝরা-পাতা উড়িয়ে একটা দুর্দান্ত পাগল যেন নেচে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। দুপুরে ঘরের কপাট জানলা বন্ধ ক'রে ডানা একা ব'সেছিল চুপ ক'রে। এ কদিন কেউ আসে নি। বৈজ্ঞানিক নানা রকম পাখির বাসা বানিয়ে গাছে গাছে টাঙিয়ে বেড়াচ্ছেন বোধ হয়। অনেকগুলো পাখি-ওলা লাগিয়েছেন নাকি পাখি ধরবার জন্যে, এখানে চিড়িয়াখানা বানাবেন নাকি একটা। কাক মারবার জন্যে শিকারী বেরিয়েছে নাকি। প্রবন্ধ তৈরি হচ্ছে বোধ হয় আর একটা। হুতো প্যাঁচাটাকে ধরবার কি হ'ল? হঠাৎ মনে হল, আনন্দবাবুও আসেন নি। এই বিশ্রী হাওয়ার জন্যেই বেরুতে পারছেন না বোধ হয় ভদ্রলোক। তাঁর সেই কবিতাটা এখনও ডানার কাছে প'ড়ে আছে। ডানা উঠে গিয়ে কবিতাটা বার ক'রে আর একবার পড়লে। কার উদ্দেশে কবিতাটা লিখেছেন ভদ্রলোক? রূপকথার অরূপ বাণীর অর্থ কাকে বোঝাতে চাইছেন উনি? উইম্‌পোল স্ট্রীটের ব্যারেটের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের মানসীর কথা। অন্যমনস্ক হয়ে রইল অনেকক্ষণ। বাইরের এলোমেলো হাওয়ার মত মনের ভিতরও এলোমেলো চিন্তার হাওয়া উঠল যেন একটা। একটা অতৃপ্ত ক্ষুধার অস্পষ্ট রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মনের প্রচ্ছন্ন লোকে। মনে হ'ল কে যেন কোথায় তার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে আছে। যেতে হবে। হঠাৎ সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তিনি কয়েকদিন আগে এই রব

একটা বলেছিলেন যেন। তিনি আছেন কি ? কয়েকদিন খোঁজ ওয়া হয় নি। হঠাৎ কপাট খুলে বেরিয়ে পড়ল সে দুপুররোদে। াগিয়ে গেল নদীর ধারের সেই ঘরটার দিকে। ঘরটার পাশে যে বীগাছ আছে একটা, তা নজরেই পড়ে নি এতদিন। গোছা া ফুল ধরেছে। এলোমেলো হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠেছে গাছটা। সেই অস্থিরতার মধ্যেও একটা ছন্দ আছে যেন। মনে হচ্ছে, কোনও শ্যামাঙ্গিনী তরুণী নৃত্য করছে, নৃত্য করতে করতে গুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে অঞ্জলি ভ'রে ডাইনে বামে উর্ধ্বে নিম্নে। রবীফুলগুলো ঠিক যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত। সে দিকে চেয়ে সেই পুর-রোদে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। এলোমেলো হাওয়াটা হু-হু ক'রে টে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল, উড়ে গেল মাথার কাপড়টা, চুলগুলো ড়তে লাগল। একটা অদৃশ্য ঘূর্ণাবর্ত যেন মেতে উঠল তাকে ঘিরে। সই ঘূর্ণাবর্তে কতকগুলো ছেঁড়া কাগজ আর শুকনো পাতা নাচতে াচতে চ'লে গেল পাশ দিয়ে। চু-কির-কির-কির-কির—তীক্ষ্ণ সুরের ফোয়ারা ছুটিয়ে উড়ে গেল বরবেশে সজ্জিত কালো টুনটুনিটা। সমস্ত কৃতি অদ্ভুত এক আনন্দে ভরপুর যেন। ডানারও দেহের অণু-রমাণুতে স্পন্দিত হয়ে উঠতে লাগল নাচের ছন্দ। হঠাৎ নজরে ড়ল, বালির চড়া ভেঙে সন্ন্যাসী আসছেন। পরিধানে মলিন গরিক, হাতে কমণ্ডলু। নগ্ন পদ, নগ্ন শির। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নই। মনে হয় না, প্রকৃতির এই রুদ্র তাণ্ডব তাঁর মনকে একটুও পর্শ করছে। নির্বিকার চিত্তে ঋজুদেহে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে াসছেন। সম্রাট যেন। ডানাও এগিয়ে গেল।

"আপনি এই রোদে কোথায় বেরিয়েছিলেন ?"—ডানাই প্রশ্ন রলে।

"ভিক্ষে করতে।"—মৃদু হেসে উত্তর দিলেন সন্ন্যাসী।—"তুমি ?"

চুপ ক'রে রইল ডানা। সন্ন্যাসী যে ভিখারী এই বোধটা আঘাত

করল সজোরে তাকে। ভিক্ষা করা যে অতিশয় হীন বৃত্তি! ভিক্ষুক ইনি? হোঁচট খেলে মনের অবস্থা যেমন হয়, তারও যেন তেমনই হ'ল। ইংরেজী পড়া সংস্কারের পাথরে খুব জোরেই হোঁচট খেল সে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে।

"এই রোদে কোথায়?"—হেসে জিজ্ঞাসা করলেন সন্ন্যাসী।

"আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম"

"আমার কাছে? কেন?"

"এমনিই"

সন্ন্যাসী ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ডানাও ঢুকল গিয়ে তাঁর পিছু পিছু। সন্ন্যাসীর ঘরে ডানা ইতিপূর্বে একদিনও ঢোকে নি। ঘরটা ভাঙা, সে শুনেছিল। কিন্তু কত ভাঙা, তার তা ধারণা ছিল না। ঢুকে অবাক হয়ে গেল। ঘরের ভিতরে ব'সেই আকাশ দেখা যায়। চালে খাপরা খুব কম আছে। যা আছে, তাও ঠিক স্থানে নেই। মেঝেটা এককালে পাকা ছিল, এখন কিন্তু সিমেণ্ট উঠে গেছে। মাঝখানে একটা চৌ-কোণা পাথর বসানো হয়েছিল কোন কালে, সেইটেই অক্ষত আছে এখনও। সেই মেঝেরই এক ধারে একটি কম্বল পাতা, তারই এক পাশে আর একটি কম্বল পাট-করা রয়েছে, আর রয়েছে একটি ঝোলা। সেইটেই বোধ হয় যুগপৎ বাক্স এবং বালিশের কাজ করে। ঘরের আর এক ধারে কয়েকটি ইট পেতে উনুন করা রয়েছে। আর এক ধারে মাটির ছোট কলসী একটি, তাতে খাবার জল থাকে বোধ হয়, পাশে একটি মাজা-ঘষা পিতলের ঘটি চকচক করছে।

সন্ন্যাসী ডানার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "এস, ব'স। ওই কম্বলটার উপরই ব'স। কোনও দরকার আছে নাকি?"

ডানা কম্বলটার এক পাশে গিয়ে বসল। সন্ন্যাসী কমণ্ডলু টাঙিয়ে রাখলেন দেওয়ালের একটা পেরেকে।

"তেমন কোনও দরকার নেই। কয়েকদিন আপনাকে দেখি নি,

তাই ভাবলাম, খোঁজটা নিয়ে আসি, একা ব'সে ব'সে ভাল লাগছিল না। আচ্ছা, আপনি ভিক্ষা করেন কেন ?"

সন্ন্যাসী কলসী থেকে জল গড়িয়ে হাত-মুখ ধুয়ে হাসি-ভরা চোখে চাইলেন ডানার দিকে। তারপর বললেন, "আমি যে পথের পথিক, সে পথে এই নিয়ম"

"আপনি যে বলেছিলেন, পোস্ট-অফিসে আপনার কিছু টাকা আছে ?"

"তা আছে। তার থেকে টাকা বার করি মাঝে মাঝে, কিন্তু ভিক্ষা করি ঠিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে নয়, নিয়ম ব'লে"

"নিয়ম ? বুঝতে পারলাম না ঠিক"

"মিলিটারিদের যেমন ড্রিল করা নিয়ম, ডাক্তারি পড়তে গেলে যেমন মড়া-কাটা নিয়ম—এও তেমনই"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ডানা বললে, "ভিক্ষা করলে কি আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় না ? মাপ করবেন, আমার যা শিক্ষা সেই অনুসারেই বলছি"

"তোমরা আত্মসম্মান জিনিসটাকে বড় খাটো ক'রে দেখ, তাই পদে পদে সেটা ক্ষুণ্ণ হয়"

"খাটো ক'রে দেখি মানে ? বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"আজ তোমার ডান হাত যদি প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে যে, বাঁ হাতের কাছে কিছু নিলেই তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবে, তা হ'লে যে রকম বিপদ উপস্থিত হয়, তোমাদেরও তাই হয়েছে। তোমার আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার প্রকাণ্ড একটা তফাত আছে, এ কথা মেনে নিলেই মুশকিল হবে। যদি মেনে নিতে পার যে, তুমি আমি একই জিনিসের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, তা হ'লে আর সঙ্কোচের কারণ থাকে না"

"সত্যিই কি সেটা মেনে নেওয়া যায় ?"

"প্রত্যক্ষ করলেই মেনে নেওয়া যায়। অণুবীক্ষণ দিয়ে

বৈজ্ঞানিকেরা যেদিন জীবাণু প্রত্যক্ষ করলেন, সেই দিনই তাদের মেনে নিলেন। যেদিন তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে, তুমি আর তোমার বাইরের বিশ্ব অভিন্ন, সেদিন তোমারও সংশয় থাকবে না”

“কিন্তু সত্যিই কি সেটা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ?”

“সম্ভব বইকি। অনেকে পেরেছেন এবং সবাইকে পারতে হবে এক দিন”

খোলা দ্বারটা দিয়ে সন্ন্যাসী বাইরের দিকে চাইলেন। ডানার মনে হ'ল, তাঁর দৃষ্টি দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে গিয়ে নিমেষে কি যেন দেখে এল একবার। তারপর নিজের কমণ্ডলু থেকে দুটি ছোট কলা বার ক'রে একটি ডানার হাতে দিয়ে বললেন, “নাও এটি তুমি খাও। তুমি আসবে ব'লেই বোধ হয় একটি কলা বেশি পেয়েছি আজ”

“আমি এখনই খেয়েছি। আপনিই দুটো খান”

“তুমি অতিথি, তোমাকে না দিয়ে কি আমি খেতে পারি ? ক্ষিধে না থাকে তো পরে খেও, নিয়ে যাও”

“আপনি আর কিছু খাবেন না ?”

“না”

“ওই একটিমাত্র কলা খেয়ে থাকতে পারবেন ?”

“তা পারব”

“আমি না এলে দুটো কলাই তো খেতেন ?”

সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিলেন, “তা খেতাম। তুমি খেলেও আমারই খাওয়া হ'ল”

কলসী থেকে জল গড়িয়ে সন্ন্যাসী আবার হাত পা মুখ ধুতে লাগলেন। ডানা চুপ ক'রে ব'সে রইল। সন্ন্যাসীর কথাগুলো কে যেন তার কানের কাছে চুপিচুপি ব'লে গেল আবার—'সম্ভব বইকি। অনেকে পেরেছেন এবং সবাইকে পারতে হবে একদিন।'

“আচ্ছা, আপনি কি পেরেছেন ?”—ডানা জিজ্ঞাসা করলে হঠাৎ।

"কি ?"

ঝুলি থেকে একটি গামছা বার ক'রে হাত-মুখ মুছতে মুছতে প্রশ্ন করলেন।

"আপনি আর বাইরের বিশ্ব যে অভিন্ন, এই সত্য কি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন ?"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, "নিজের কথা নিজের মুখে বলতে নেই। তা ছাড়া আমি কি পেরেছি বা পারি নি—এ প্রশ্ন অবান্তর। আমি হিমালয়-চূড়ায় উঠতে পারি নি, তা প্রত্যক্ষও করি নি, তবু তা যে আছে এ কথা তোমাকে মানতে হবে"

"কিন্তু যাঁরা হিমালয়-চূড়ায় উঠেছেন বা হিমালয়-চূড়া দেখেছেন এ রকম লোক আছেন, তাই সেটা নিঃসংশয়ে মানা যায়"

"সর্বভূতে সেই এক অদ্বিতীয়কে প্রত্যক্ষ করেছেন এ রকম লোকও কম নেই—এ কথাও যেদিন বুঝবে, সেদিন এ সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকবে না"

"সে রকম লোক কোথায় আছেন ?"

"খুঁজে বার করতে হবে। তোমার সত্যকার জিজ্ঞাসা যেদিন জাগবে, সেদিন খোঁজবার পথও পাবে"

ডানা চুপ ক'রে রইল। ডানার মুখের দিকে চেয়ে সন্ন্যাসী বললেন, "মনে হচ্ছে, কোনও একটা মতলবে তুমি এসেছিলে, কি বল তো সেটা ?"

ডানা আর একটু চুপ ক'রে থেকে ইতস্তত ক'রে বললে, "আমার সব কথা শোনেন নি বোধ হয় আপনি ?"

"না"

ডানা নিজের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে শেষে বললে, "এখন পৃথিবীতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে আশ্রয় পেয়েছি একটা। এঁরা খুবই ভদ্রতা

করছেন আমার সঙ্গে। অমরবাবু, আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু সবাই—"

রূপচাঁদবাবুর কথাটা ব'লে সে থেমে গেল নিমেষের জন্যে।

"অমরবাবু একটা চাকরিই দিয়েছেন আমাকে। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে আছি। তবু কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করছি সর্বদা। কোথায় একটা ক্ষুধা যেন অতৃপ্ত রয়েছে। মনে হচ্ছে, কি যেন একটা কর্তব্য আছে, যা করা হয় নি। সেই ক্ষুধাটা যে কিসের, কর্তব্যটা যে কোথায়, তা ঠিক করতে পারছি না। তাই মনে করলাম, আপনার কাছে আসি। কেন যে আপনার কথা মনে হ'ল, তা বলতে পারি না, কিন্তু মনে হ'ল যে আপনি হয়তো কিছু উপদেশ দিতে পারবেন।"

সন্ন্যাসী গম্ভীর হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "দেখ উপদেশ দেওয়ার মত অভিজ্ঞতা আমার নেই। এইটুকু শুধু জানি যে, সবাইকে একদিন না একদিন সচেতন হতে হবে। তুমি, আমি, এই নিখিল বিশ্ব যাঁর অনন্ত লীলার প্রকাশ, তাঁকে জানবার আগ্রহ অভিনব ক্ষুধারূপে অনুভব করতে হবে সবাইকে একদিন। অনিত্য মোহের কষ্টিতে ঘ'ষে ঘ'ষে নিত্যকে চেনবার আকুলতাই নিয়ত ব্যক্ত হচ্ছে রূপে রূপে জীবনে মরণে জন্মজন্মান্তরে। তুমিও হয়তো সেই ক্ষুধাই অনুভব করছ, কে জানে?"

"ভগবানকে জানবার ক্ষুধা বলছেন?"—ডানা প্রশ্ন করলে।

"সেটা তুমিই ঠিক করবে, কিসের ক্ষুধা তোমাকে আকুল করছে। তোমার ক্ষুধাই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে"

"আপনার কথা বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার ক্ষুধা আমাকে বিপথেও তো নিয়ে যেতে পারে?"

"কোনও পথই বিপথ নয়। একমাত্র যে পথ, যে পথ সবাইকে ধরতে হবে একদিন, তার বহু গলি, গলির গলি আছে। ক্ষুধাকে অনুসরণ ক'রে চলতে থাক, ঠিক পথে পৌঁছে যাবেই একদিন না

একদিন। ক্ষুধাটা যদি সত্য হয়, তা হ'লে তার আগুনে অখাদ্যও হজম হয়ে যাবে”

“কোন কিছুই পাপ নয় তা হ'লে আপনি বলছেন ?”

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে একটু হেসে বললেন, “আমি কিছুই বলছি না। কোনও একটা কাজ পাপ কি না তা নির্ভর করে তোমার নিজের পাপ-পুণ্যবোধের উপর। মা-কালীর কাছে পাঁঠাকে বলিদান দেওয়া কারও কাছে পুণ্য, কারও কাছে পাপ। যাঁরা দিব্যদৃষ্টি লাভ ক'রে যোগী হয়েছেন, তাঁদের কাছে আবার পাপ-পুণ্যের প্রশ্নই অবান্তর। তাঁরা অনাসক্ত। পদ্মপত্রে যেমন জল লেগে থাকতে পারে না, তাদের মনেও তেমনই পাপ-পুণ্য লাভ-ক্ষতি এসব স্থান পায় না।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

—গীতার এই শ্লোকটিতে মনের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোনও ক্ষুধা নেই। কিন্তু এই সর্বসংকল্প সন্ন্যাস লাভ করবার আগে ক্ষুধার নির্দেশেই অনেক দুর্গম পথ চলতে হবে। সেই পথে যেটা তোমার বিবেকের কাছে পাপ ব'লে মনে হবে, সেইটেই ত্যাগ করবে তুমি।”

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার হেসে বললেন, “পুরাতন বিবেকের কাছে পুণ্য ব'লে যা মনে হয়েছে সেটাও কিছুদিন পরে হয়তো আবার ত্যাগ করতে হবে নূতন বিবেকের নির্দেশে। পুরাতন ক্ষুধা নূতন খাবার দাবি করবে। পুরাতন খাবারে তৃপ্তি হবে না তার তখন”

“ক্ষুধাটা যে কিসের, তাইতো বুঝতে পারছি না ?”—একটু অধীর কণ্ঠেই বললে ডানা।

“পারবে। চিন্তা কর, বুঝতে পারবে বইকি। বুঝতে হবেই। নিজেকেই বুঝতে হবে, আর কেউ বুঝিয়ে দিতে পারবে না। তোমার

মধ্যে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শিষ্য, তিনিই গুরু। তিনি নিজেকেই নিজে নূতন ক'রে উপলব্ধি করবেন তোমার মধ্যে আবার। তুমিই কর্তা, তুমিই কর্ম, তুমিই কার্য, তুমিই কারণ।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥

কিন্তু এ উপলব্ধি হবার আগে ভোগের পথে মোহের পথে হয়তো ঘুরতে হবে কিছুদিন। ঘোরাটা প্রয়োজনও হয়তো। তামসিক জীবনের পর রাজসিক জীবনই স্বাভাবিক পরিণতি। তারপর আসবে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং মোহটা তুচ্ছ নয়। কিছুই তুচ্ছ নয়।"

সন্ন্যাসীর চোখের দৃষ্টি কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে এল। ডানা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "মোহ সম্বন্ধে কি যেন বললেন, বুঝতে পারলাম না"

"মোহটা হচ্ছে তাঁকে চেনবার কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথর সোনা নয়, কিন্তু সোনার পরিচয় ওর থেকেই পাওয়া যায়। যে কোনও জিনিসেই আমরা মুগ্ধ হই না কেন, কিছুদিন পরেই তার নেশাটা কেটে যায়। কারণ মোহ নকল আলো, আসলে ওটা অন্ধকারই। ওই মোহই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, আমরা ভুল পথে গেছি। মন ব'লে ওঠে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনওখানে—"

"তা হ'লে মোহটাও দরকারী জিনিস ?"

"এক হিসেবে দরকারী বইকি। মুক্তির স্বাদ পেতে হ'লে খানিকটা বন্ধন-ভোগ দরকার। মোহ মানে আসক্তি, বন্ধন, যুক্তিহীন অনুরক্তি। যে কোন রকম আসক্তিই খারাপ। উপনিষদ বলছেন, যাঁরা অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসক, তাঁরা অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কিন্তু যাঁরা কেবল সম্ভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মে অনুরক্ত, তাঁরা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তোমার যদি অনুরক্তি হয়, তা হ'লেও অন্ধকার। অনুরক্তি জিনিসটাই খারাপ। সত্যদর্শন হওয়ামাত্র অনুরাগ বিরাগ সব লুপ্ত হয়ে যায়।

সত্যের সঙ্গে তখন একাকার হয়ে যায় দ্রষ্টা। হারিয়ে ফেলার ভয় থেকেই তো অনুরাগের জন্ম,—কিছুক্ষণ পরে হারিয়ে ফেলব, এই বোধ থেকেই দু হাত দিয়ে প্রিয়বস্তুকে আঁকড়ে ধরতে চায় সবাই। সত্যকে উপলব্ধি করলে সে ভয় আর থাকে না। কারণ তখন উপলব্ধি হয়, সবার মধ্যেই আমি এবং আমার মধ্যেই সব।”

বাইরের হাওয়াটা উদ্দামতর হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে একটা কোকিল ডেকে উঠল, কিক্, কিক্, কিক্। একরাশি ধূলোবালি হু-হু ক'রে উড়ে এল খোলা দ্বার দিয়ে, আর তার সঙ্গে বহুদূর থেকে ভেসে এল ঘুঘুর কণ্ঠস্বর। ঘুঘুঘু—ঘু, ঘুঘুঘু—ঘু, ঘুঘুঘু—ঘু। ভীষণা প্রকৃতির রুদ্র মূর্তিকে তুচ্ছ ক'রে প্রণয়ীর মোহ কোমল সুরে আবেদন জানিয়ে চলেছে প্রণয়ীকে। ডানা উন্মনা হয়ে আরও কিছুক্ষণ ব'সে রইল। ছন্নছাড়া পাগলের মত তার মনটা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল ঝড়ো হাওয়াটার সঙ্গে।

“আচ্ছা, আপনারও মোহ আছে?”—তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে সে।

“আছে বইকি। মায়াবিনী প্রকৃতির ছলাকলার কি অন্ত আছে? প্রতি পদক্ষেপেই যে তার একটা না একটা রঙিন ফাঁদ পাতা রয়েছে! তা কি এড়ানো সহজ?”

“আপনার তো কিছুই নেই, তবু কিসের মোহ আপনার?”

“আপাতত এই স্থানটার মোহ কাটাতে পারছি না দেখছি”—মলিন হেসে বললেন সন্ন্যাসী।

“এর আগে এখানে ছিলেন কখনও আপনি?”

“ছিলাম বইকি। সে অনেক কথা”—ব'লে একটু চুপ ক'রে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, “সেসব কথা না-ই বা শুনলে। থাক্। এটা মোহ, না কর্তব্য, তা-ও ঠিক করতে পারছি না।”

সন্ন্যাসী চুপ করলেন।

ডানাও চুপ ক'রে রইল। তার মনে হতে লাগল, কি যেন একটা

রহস্য আবৃত ক'রে রেখেছে এই লোকটিকে। হয়তো সে আবার প্রশ্ন করত, কিন্তু বাধা পড়ল। চাকরটা এসে উঁকি দিলে দ্বার-প্রান্তে।

"আনন্দবাবু এসেছেন, খুঁজছেন আপনাকে"

ডানার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল একটু। তারপর সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে বললে, "আপনি আসবেন আমার ওখানে? চলুন না"

"পরে আসব কোন সময়ে।"

একটু ইতস্তত ক'রে ডানা চ'লে গেল একাই। গিয়ে যা দেখলে, তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। কবির সর্বাঙ্গে রঙ, মুখে আবীর।

ডানাকে দেখে তিনি বললেন, "আজ বসন্তোৎসব। সমস্ত প্রকৃতি রঙে রসে রূপে মেতে উঠেছে! এস, তোমাকেও একটু রঙ মাখিয়ে দিই। আপত্তি আছে কি?"

কি যে বলবে ডানা ভেবে পেল না। মাথা হেঁট ক'রে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। তার কানে গালে ফুটে উঠল লজ্জারুণ ভাতি। তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল শুধু যে ভয়ে তা নয়, আনন্দেও। চিরন্তনী নারী পুলকিত হয়ে উঠল চিরন্তন পুরুষের আহ্বানে।

"দিই একটু?"

"দিন, ছাড়বেন না যখন"

কবি ডানার মুখে চুলে আবীর মাখিয়ে দিয়ে পকেট থেকে বার করলেন রঙের শিশি। বালকের মত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মন্দাকিনী চ'লে যাওয়ার পর তাঁর মনে যে ঔদাসীন্য এসেছিল, তা হঠাৎ কেটে গেল যেন। সমস্ত দিন আজ রঙ খেলে বেড়িয়েছেন। ডানার কাপড়ে বেশ ক'রে রঙ দিয়ে একটু দূরে স'রে দাঁড়ালেন।

"বাঃ, চমৎকার দেখাচ্ছে!"

ডানা লজ্জায় ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। রঙে তার কাপড় জামা ভিজে গিয়েছিল একেবারে। কাপড়-জামা বদলে বাইরে এসে দেখে,

কবি চ'লে গেছেন। বারান্দার টেবিলের উপর রঙের শিশিটা রয়েছে আর তার তলায় চাপা রয়েছে একখানা কাগজ। কাগজটা খুলে দেখলে, একটা কবিতা রয়েছে।

গৈরিক হরিতে পীতে
পুষ্পে ফলে ছন্দে গীতে
বহু বর্ণ বহু শিখা জ্বালি
বসন্ত আরতি করে যার,

যার লাগি সাজিয়াছে
মাঠে মাঠে গাছে গাছে
কিশলয় মঞ্জরীর ডালি
রচিয়া বিচিত্র উপহার,

তারই মূর্তি রক্তরাগে
সন্ধ্যার মেঘেতে জাগে
আগুনের প্রদীপ্ত আলোকে
কোকিলের জ্বলন্ত নয়নে,

রঙ্গনে পলাশে ফোটে
টিয়া চন্দনার ঠোঁটে
সহেলীর পালকে পালকে
তন্ময় সে কি স্বপ্ন চয়নে,

সে যে সিন্দুরের শোভা
পদ্মরাগ মনোলোভা
শোণিতের বরণে চর্চিত
শিবানীর রক্তজবা সে যে,

সেই বর্ণে জগদ্ধাত্রী
বালার্ক-অরুণ-গাত্রী
যুগে যুগে হতেছে অর্চিত
মানবের মনোমন্দিরে যে,

তারি ছন্দে তারি সুরে
নিকট যেতেছে দূরে
সুদূর যে নিকটেতে আসে,
পুরাতন হয় যে নবীন,

অতীত ও বর্তমান
গাহে ভবিষ্যের গান,
বক্ষে ধরি তাহারি সুবাসে
শুষ্ক বীজ তপস্যায় লীন,

এস, সখি, সমারোহে
বসন্ত-উৎসবে দোঁহে
পূজা করি কুঙ্কুমে আবীরে
সে চির-যৌবন দেবতার,

ওগো, সখি, নীলাঞ্জনা
হও আজি অবন্ধনা
অশঙ্কিত কঙ্কণে মঞ্জীরে
ঝন্‌ঝনিয়া তোল ঝনৎকার,

জড়তা কাটিয়া যাক
অচঞ্চল শিহরাক,
ভাষা দাও স্থাবরে জঙ্গমে
অকুণ্ঠিত হও সুলোচনা,

হও সখি, আত্মহারা
বন্ধহীন রসধারা
উদ্বেলিত অধর-সঙ্গমে
নবতীর্থ করুক রচনা।

ডানা দু-তিনবার পড়লে কবিতাটা। এলোমেলো হাওয়াটা থেমে গেল হঠাৎ। মেকি কি, মেকি কি, মেকি কি—। ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, রিক্তপত্র একটা অশ্বত্থগাছের শাখায় ব'সে পুচ্ছ আস্ফালন ক'রে একটা ফিঙে ডাকছে। পাশে ব'সে আছে আর একটা ফিঙে। তারই সহচরী বোধ হয়।

১৩

রূপচাঁদ আপিসে গিয়েছেন। দুপুরের রোদ খাঁ-খাঁ করছে চতুর্দিকে। বকুলবালা উঠোনে গুলি খেলছেন চণ্ডীর সঙ্গে। চণ্ডী ছেলেটি স্কুল পালিয়ে প্রায়ই আসে তাঁর কাছে। তার জন্তে নানারকম খাবার তৈরি ক'রে রা[illegible]ন বকুলবালা। যেদিন চণ্ডী আসে না, সেদিন কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েন তিনি। চণ্ডী যে পরের ছেলে, তার যে নিজের বাপ-মা আছে—এ কথা বকুলবালা যে জানেন না তা নয়, কিন্তু মানেন না। চণ্ডীকে আসতেই হবে রোজ। নানাভাবে প্রলুব্ধ হয়ে চণ্ডী আসেও। শুধু খাবার নয়, অন্য প্রলোভনও আছে; বকুলবালা মাঝে মাঝে তাকে পয়সা দেন। সেই পয়সায় চণ্ডী তার সেই সব শখ মেটায় যা মা-বাপের পয়সায় মেটে না সহজে। ছুরি, ঘুড়ি, লাট্টু এসব তো কিনেইছে, মাঝে মাঝে সিগারেটও কেনে। একটা টিয়াপাখিও কিনে দিয়েছেন তাকে বকুলবালা খাঁচাসুদ্ধ।

"এই, বেইমানি করছিস ফের। ভাল ক'রে মাপ্ আবার। থাম্, আমি

নিজেই হেঁট হয়ে মাপতে লাগলেন বকুলবালা গাব্বু থেকে তাঁর গুলিটা কতদূরে আছে। গাছকোমর বাঁধা, মাথার চুলগুলোও চুড়ো ক'রে বেঁধেছেন তিনি, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে দুপুরের তপ্ত হাওয়ায়।

কৃষ্ট" প্রিয়।

দুজনেই সোৎসুকে মুখ তুলে চাইলেন আমগাছটার দিকে

"বুলবুলিটা এসেছে বোধ হয়"

"হ্যাঁ, ওই যে"

"কই ?"

"ওই যে সরু ডালটায় ব'সে আছে"

এইবার দেখতে পেলেন বকুলবালা।

"চমৎকার দেখতে তো! গালের কাছে কি টুকটুকে রঙ—ওমা, কি সুন্দর!"

"পাখি-ওয়ালাটা বলছিল, এর নাম নাকি সিপাহী বুলবুল"

"সিপাহীর মতই তো দেখতে। ঘোড়সোয়ার সিপাহীদের মাথায় টুপি তো ঠিক ওই রকমই। সেবার এসেছিল দেখিস নি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত ?"

চণ্ডী ঘাড় উঁচু ক'রে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল পাখিটার দিকে। পাখি কিন্তু বেশিক্ষণ সে সুযোগ দিলে না তাকে। উড়ে গেল। পাতার আড়াল থেকে আর একটা পাখিও উড়ল।

"ও মা, দুটো ছিল!"

"কিছুতেই বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে না ওরা। জাফরের কাছে এই পাখি যদি দেখি কোনদিন, আনতে বলব মাসীমা ?"

"বলিস। কিন্তু হলদে পাখিটা ম'রে গিয়ে থেকে আর পাখি কিনতে ইচ্ছে করে না। কিচ্ছু খেলে না একেবারে। আয়,—আচ্ছা, তুইই আগে টিপ কর্"

আবার সুরু হ'ল গুলিখেলা।

"বাচ্চাবেলা থেকে পুষতে হয়। ধাড়ি পাখি পোষ মানে না"—টিপ করতে করতে চণ্ডী বললে।

"হলদে পাখির বাচ্চা কোথায় পাব বল্ ?"

"গণশা বলছিল যে, গেল বছর হলদে পাখির বাসা দেখছিল সে এক জায়গায়"

একটু থেমে চণ্ডী বললে, "নদীর ধারে অমরবাবুদের যে আম-াগান আছে সেই বাগানে। সে গাছে ফিঙেরও বাসা ছিল নাকি"

"ফিঙে পাখির দরকার নেই। গণশাকে বলিস, হলদে পাখির বাচ্চা যদি পায় এনে দেয় যেন আমাকে"

চণ্ডীর টিপ ব্যর্থ হ'ল। বকুলবালা টিপ করতে লাগলেন।

"বলব। কিন্তু অন্য পাখি যদি পেয়ে যায় ? নীলকণ্ঠের বাচ্চা রেছিল একবার গণশা"

"না, অন্য পাখি চাই না"

টকাস্ ক'রে চণ্ডীর গুলিটা মেরে গর্বোৎফুল্ল মুখে চাইলেন বকুল-বালা চণ্ডীর দিকে।

"তুমি আর একবার হলদে পাখি কিনেছিলে, না মাসীমা ?"

"সেবারও বাঁচে নি। ঠাণ্ডা লাগল, না কি হ'ল, সকালে দেখি, ম'রে প'ড়ে আছে খাঁচায়"

"বার বার ম'রে যাচ্ছে, কি দরকার তা হ'লে ও পাখি পুষে ? তার চেয়ে নীলকণ্ঠ পোষ এবার একটা। চমৎকার দেখতে"

চোখ-মুখ কুঁচকে আবার টিপ করছিলেন বকুলবালা। চণ্ডীর কথায় আগুনের ঝলক ছুটে বেরুল তাঁর চোখ থেকে।

"না, আমি হলদে পাখি পুষব। নীলকণ্ঠ আবার মানুষে পোষে ! ক্যারকেরে গলার আওয়াজ, তেমনই ঝগড়ুট্রি"

চণ্ডী চুপ ক'রে রইল। বকুলবালার গুলি এবার লাগল না। ণ্ডী টিপ করতে লাগল। টিপ করতে করতে হঠাৎ থেমে সে জিজ্ঞেস রলে, "হলদে পাখি খুব ভাল গান গায়, না ?"

"নিশ্চয়। কি মিষ্টি গলার স্বর! শুনিস নি তুই?"

"শুনেছি, কিন্তু দোয়েলের গলা ওর চেয়েও মিষ্টি"

"দোয়েল ওর মতন 'খোকা হোক' বলতে পারে?"

"হলদে পাখি 'খোকা হোক' বলে বুঝি?"

"হ্যাঁ, কি মিষ্টি ক'রে যে বলে!"

হঠাৎ বকুলবালার লজ্জা হ'ল এবং সেই লজ্জাটা ঢাকবার জন্যে তিনি ধমকে উঠলেন।

"মার্ না, কি বাজে বকবক করছিস!"

চণ্ডী টিপ করতে লাগল। টিপ করতে করতে হঠাৎ আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল তার।

"অমরবাবু কি কাণ্ড করছেন জানেন মাসীমা? কাক বক শালিখ টিয়া মারছেন ক্রমাগত। অনে—ক মেরেছেন"

"কেন? ওসব পাখি তো খায় না শুনেছি"

"খাবেন না। ওদের পালক, পা, ঠোঁট মাপছেন। এখানে মিউজিয়ম হবে নাকি। জ্যান্ত পাখিও ধরেছেন অনেক। অনেক পাখিওলা এসেছে, তারা নানা রকম ফাঁস নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে বাগানে"

"তাই নাকি?"

উৎসাহে বকুলবালার চোখ দুটো জ্বলজ্বল ক'রে উঠল।

"যাবি একদিন? চ না"

"কোথায়?"

"অমরবাবুর বাড়ি। দুপুরবেলা উনি যখন আপিসে থাকবেন আমরা দুজনে লুকিয়ে লুকিয়ে চল্ না, গিয়ে দেখে আসি কি হচ্ছে।"

রূপচাঁদের শিক্ষা সত্ত্বেও বকুলবালার কৌতূহলী মন বেড়া ডিঙিয়ে বাইরে যাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল।

"যদি কেউ দেখে ফেলে?"

“কে আবার দেখবে ? পাশের গলিটা দিয়ে টুক ক'রে চ'লে গেলে কেউ দেখতে পাবে না। আর পেলেই বা কি, বড় জোর বকবে একটু”

ঠোঁট উলটে বুড়ো আঙুলটা তুলে ধরলেন বকুলবালা। চণ্ডী হেসে ফেললে। তার মুখের হাসি কিন্তু বেশিক্ষণ রইল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সদর-দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। রূপচাঁদের গলাও।

“মেসোমশাই এলেন নাকি। আমি পালাই”

খিড়কি-দরজাটা দিয়ে চণ্ডী এক ছুটে বেরিয়ে গেল। রূপচাঁদকে বড় ভয় করে তার।

বকুলবালা খিড়কি-দরজায় খিলটা দিয়ে সদর-দরজাটা খুললেন। রূপচাঁদই এসেছিলেন।

“এমন অসময়ে ফিরলে যে আজ ?”

“আপিসের কাগজ ফেলে গিয়েছিলাম, তাই নিতে এসেছি। ও কি, মুখ অত লাল কেন ? রোদে রোদে ঘুরছিলে নাকি ?”

“গুলি খেলছিলাম উঠোনে”

“একা একা ?”

“চণ্ডী এসেছিল, তোমার সাড়া পেয়েই পালাল। কি ভীতু ছেলে বাবা !”

রূপচাঁদ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ঘরে ঢুকলেন এবং একটা বড় খাম নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আপিসের কাগজ নিতে তিনি আসেন নি, এসেছিলেন ‘বলাকা’ বইখানা নিতে। বইখানা একটা বড় খামের মধ্যে রেখেছিলেন তিনি। আপিসে একটা কথা মনে হওয়াতে নিজেই বইটা নিতে এসেছেন এই দুপুরের রোদ মাথায় ক'রে। একটা কনস্টেবল পাঠাতে পারতেন, কিন্তু এসব ব্যাপারে চাকর-নাকরের উপর বিশ্বাস করা সমীচীন মনে করেন না তিনি। তা ছাড়া কনস্টেবল পাঠিয়ে লাভও হ'ত না। নিরক্ষরা বকুলবালা ‘বলাকা’ খুঁজে বার করতে পারত না।

যাবার সময় তিনি ব'লে গেলেন, "আমাকে হয়তো সায়েবের সঙ্গে টুরে বেরুতে হবে"

"কবে ?"

"তারিখ ঠিক হয় নি এখনও"

রূপচাঁদ চ'লে গেলেন। বকুলবালা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন হঠাৎ। তাঁর মনে হ'ল, অমরবাবুর বাড়িতে গিয়ে পাখি দেখবার পথটা সুগম হ'ল তা হ'লে

আপিসের শেষ ফাইলটি ক্লিয়ার ক'রে রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ দোয়াতদানিটার দিকে চেয়ে। তারপর ঘণ্টাটি টিপলেন। একজন কন্‌স্টেব্‌ল সেলাম ক'রে এসে দাঁড়াল

"সতুবাবুর দোকান থেকে এক কাপ চা আনাও দেখি মিশি"

"বহুৎ খুব"

একটু পরেই চা এসে পড়ল। চা পান শেষ ক'রে রূপচাঁদ মিশিরজীকে বললেন, "আমি একটা বই আর একখানা চিঠি দিচ্ছি তোমাকে, সবজিবাগে নদীর ধারে যে মাইজী থাকেন তাঁকে দিয়ে এস। তুমি বাইরে একটু অপেক্ষা কর, চিঠিটা লিখে ফেলি আমি"

"বহুৎ খুব"

কন্‌স্টেব্‌ল চ'লে গেল।

রূপচাঁদ চিঠি লিখতে লাগলেন।

ডানা,

সেদিন সকালে তোমার 'বলাকা'টা দিতে গিয়েছিলাম। তোমার দেখা পাই নি। তোমার চাকরের মুখে শুনলাম, তোমার শরীর ভাল নেই। ঠাণ্ডা লেগেছে সম্ভবত। আনন্দমোহন তোমাকে রঙে চুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিল শুনলাম। সকলকেই সেদিন রঙে চুবিয়েছে ও। জলে ভিজেই শরীরটা বেভাব হয়েছে বোধ হয় তোমার। জলের সঙ্গে রঙ মেশানো থাকলে আরও বেশি বেভাব

হওয়ার সম্ভাবনা। ঘাবড়ালে চলবে না। তোমাদের ওপর দিয়েই তো এখন নানা রঙের খেলা চলবে। বিশ্বনাট্যমঞ্চে তোমরাই যে রঙ্গিণী। সেদিন তোমার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে সহসা যে সুরটা বেজে উঠেছিল আমার কণ্ঠে, সেটা সত্যিই আমার মনের সুর, এবং একেবারে বিশুদ্ধ সুর। বিশুদ্ধ মানে স্বাভাবিক, পবিত্রও বলতে পার। কিন্তু সমাজ নামক এমন একটি আজব জিনিস তৈরি করেছি আমরা যে, প্রকাশ্যে বিশুদ্ধ সুর আলাপ করবার সাহস নেই অনেকেরই। বিশুদ্ধ সুরের কালোয়াতি করতে গিয়ে চার্বাক, স্পাইনোজা প্রভৃতি বড় বড় ঋষিকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে নিষ্পেষিত ক'রে নিশ্চিহ্ন করাটাই এখনও ভদ্রসমাজে সভ্যতা ব'লে গণ্য। কিন্তু অসাধারণ মানব-মানবী পৃথিবীতে ছিল, আছে এবং থাকবেও বরাবর। তোমাকে অসাধারণের দলে ফেলেছি ব'লেই তোমার কাছে এ-ধরনের কথা বলতে সাহস পাচ্ছি। আমাকে ভুল বুঝো না। সমর্থ পুরুষের নিতান্ত স্বাভাবিক প্রেরণার সত্য মূল্য তোমার মত নারীই দিতে পারে ব'লে বিশ্বাস করি। তবে এটাও বিশ্বাস করি যে, তোমার পছন্দ-অপছন্দর একটা মাপকাঠি আছে নিশ্চয়ই, (সেদিন তোমার চার-এর উপমাটা বেশ লেগেছিল) এবং তা দিয়ে তোমার অজ্ঞাতসারেই হয়তো তুমি মাপছ অনেককেই। আমি সেই সৌভাগ্যবানদের দলে পড়েছি কি না অর্থাৎ আমাকেও তুমি মেপেছ কি না জানি না, কিন্তু সেটা জানবার স্বাভাবিক কৌতূহল একটা আছে।

তোমার সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তা গদ্যে বলা যাবে না। আনন্দমোহনের মত বাংলা কবিতা লেখবার ক্ষমতা আমার নেই। কলেজ-জীবনে ইংরেজীতে কবিতা লেখার শখ ছিল। মাঝে মাঝে লিখেওছি। অনেক দিন পরে আজ আবার চেষ্টা করলাম। তোমার সম্বন্ধে যা আমার মনে হয়েছে, তা ইংরেজী কবিতায় লিখে পাঠাচ্ছি।

ভাল যদি না লাগে, ছিঁড়ে ফেলে দিও। আর একটি কথা মনে রাখতে অনুরোধ করি। আমি বিবাহিত লোক, সে কথাটা মনে রেখো। তুমি কি করবে বা করবে না, তা তুমিই ঠিক ক'রো। একটি অনুরোধ শুধু করছি অর্থাৎ একটি জিনিস করতে মানা করছি। হৈ-চৈ ক'রো না। তা যদি কর, তা হ'লে আমাকেও হয়তো আত্মরক্ষার জন্যে এমন সব অবাঞ্ছনীয় কাজ করতে হবে, যা আমি এখন করবার কল্পনাও করি না। কবিতাটি এই—

Evening speaks in golden clouds
    Morning speaks in light
Flowers speak in scented petals
    Lightening speaks in flight

The manner in which they express
    Is simple plain and sweet
But what we do, we human beings ?
    We know not how to do it.

When the heart is full and feelings melting
    We try to hide and alter
When the eyes speak the tongue denies
    Words fail or falter.

I know not how to word my feelings
    How to call my Muse
I wish I had the knack of Nature
    To sing in Light and Hues.

হয়তো এর ছন্দে গোলমাল আছে, কিন্তু বক্তব্যটা আশা করি সুস্পষ্ট হয়েছে। এর বেশি কিছু আর বলবার নেই। ইতি—আর. সি.

চিঠি লেখা শেষ ক'রে রূপচাঁদ চিঠিটি খামে পুরে খামটি বেশ ভাল ক'রে জুড়ে দিলেন। তারপর ডাকলেন কন্‌স্টেব্‌লকে।

"মিশিরজী, এই চিঠিটি এবং বইটি মাইজীকে দিয়ে এস। মাইজীর হাতে দেবে, আর কারও হাতে দিও না যেন। মাইজী যদি না থাকেন, ফিরিয়ে নিয়ে এস। সাইকেলটা নিয়েই যাও। আমি এইখানেই আছি"

কন্‌স্টেব্‌ল চ'লে গেল এবং খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে খবর দিলে যে, মাইজীর হাতেই সে চিঠি এবং বই দিয়ে এসেছে।

"সেখানে আর কেউ ছিল নাকি ?"

"জী, না"

রূপচাঁদ আরও কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইলেন। তারপর উঠে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। বাড়ির কাছে এসে দেখেন, বিস্রস্তবাসা বকুলবালা একটা লোম-ওঠা কুকুরের পিছনে ঢিল নিয়ে ছুটছেন। যে ঢিলটা তিনি ছুঁড়েছিলেন, আর একটু হ'লেই সেটা রূপচাঁদকেই লাগত।

"কি, ব্যাপার কি ?"

"মেরেই ফেলব মুখপোড়াকে আজ"—বকুলবালার মুখ লাল, চোখের দৃষ্টিতে ধক্‌ধক্‌ ক'রে আগুন জ্বলছে।

"হ'ল কি ?"

"তোমার জন্যে হালুয়াটি ক'রে পেয়ারাগাছে উঠেছিলাম কয়েকটা পেয়ারা পাড়বার জন্যে, মুখপোড়া কখন স্রুট ক'রে ঢুকে সমস্ত হালুয়াটি খেয়ে গেছে!"

ক্ষুধার্ত রূপচাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "যাক, চল, মুড়ি-টুড়ি আছে তো তাই খাওয়া যাবে"

"মুড়ি আবার কখন কিনলাম!"

রূপচাঁদের ইচ্ছে করতে লাগল, তার চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে বলেন কখন কিনেছ তা জানতে চাইছি না, আছে কি না জানতে চাইছি।১৫ শেষ"

কিন্তু সে ইচ্ছে দমন ক'রে হাসিমুখে বললেন, "চল, ঘরে যা আছে তাই খাওয়া যাবে"

"শুধু পরোটা কি খেতে পারবে ?"

"তরকারি নেই কোনও ?"

"তরকারি ওবেলা সব ফুরিয়ে গেছে। এবেলা আবার আনতে হবে। তরকারি নেই ব'লেই তো হালুয়া করতে গেলুম"

"দু-একটা আলু-পটলও নেই ?"

"কচু আছে আধখানা"

"বেশ, তাই পুড়িয়ে দাও"

এই শুনে শিশুর মত খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

"ধ্যেৎ, তার চেয়ে চল, গুড় দিয়ে খাবে"

"বেশ, চল"

১৪

রত্নপ্রভার কাণ্ড দেখে ডানা সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। অমরবাবুও হয়েছিলেন। তিনি আশা করেন নি যে, রত্নপ্রভা নিজে মরা কাকের ডানা, পা, লেজ, ঠোঁট মাপতে বসবেন। রত্নপ্রভা কিন্তু বেশ উৎসাহ সহকারেই মাপতে বসেছিলেন। যদিও এতে অমরবাবুর সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হচ্ছিল, কারণ রত্নপ্রভা সব সময়ে ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাপতে পারছিলেন না, ব'লে দেওয়া সত্ত্বেও গোলমাল ক'রে ফেলছিলেন মাঝে মাঝে, তবু অমরবাবুর বেশ লাগছিল। ডানা একধারে কাগজ পেন্সিল নিয়ে মাপের অঙ্কগুলো টুকে নেবার জন্যে বসেছিল। তার কেমন যেন গা ঘিনঘিন করছিল ; শুধু তাই নয়, তার মনে হচ্ছিল, এতগুলো প্রাণী হত্যা ক'রে কি লাভ হবে শেষ পর্য অমরবাবু সত্যিই

যদি এ অঞ্চলের কাকেদের (Corvus Spendens) আর একটা উপ-শ্রেণী (Sub-species) বার করতে পারেন, তাতেই বা কি? হয়তো বিজ্ঞানজগতে ওঁর একটু নাম হবে; কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল, না, ঠিক নামের জন্যে উনি এত করছেন না, উনি করছেন নিজের একটা কৌতূহল মেটাবার জন্যে। একটা অদম্য শিশুসুলভ কৌতূহল মাতিয়ে রেখেছে ভদ্রলোককে। ছোট ছেলের মত ছটফট করে বেড়াচ্ছেন সর্বদা। একটা কাকের পেটে কয়েকটা ডিম পাওয়া গেছে, আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন যেন উনি। ডিমসুদ্ধ গোটা কাকটাকেই উনি একটা কাচের জারে রেখে দিচ্ছেন একটা ওষুধে ডুবিয়ে। এমন বিশ্রী গন্ধ ওষুধটার! জারে লেবেল লাগিয়ে অমরবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একবার রত্নপ্রভার দিকে। শেষ কাকটির মাপ নিচ্ছিলেন তিনি।

"না না, ভুল হচ্ছে, ল্যাজের মাপটা ক্যালিপার্স দিয়ে নাও। ছড়িয়ে নাও বেশ ক'রে আগে। হ্যাঁ। তারপর ওই মাঝখানের পালক দুটোর মাঝখানে একটা পয়েণ্ট নাও, তারপর সবচেয়ে লম্বা পালকটার টিপ পর্যন্ত মাপ। হ্যাঁ, হয়েছে। ঠোঁটটা ঠিক ক'রে মেপেছ তো বেস অভ দি স্কাল (Base of the skull) থেকে সোজা লাইনে? দাঁড়াও, দেখে নিচ্ছি আমি।"

নিজের ভুলের জন্যে রত্নপ্রভা খুব বেশি অপ্রস্তুত হয়েছেন, তা মনে হ'ল না। তাঁর মুখে একটু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল শুধু। ক্যালিপার্স্ দিয়ে কাকের লেজটা মেপে পাশের কাগজে টুকে রাখলেন। অমরবাবু সেগুলো ঠিক হয়েছে কি না দেখে তবে ডানাকে টুকতে দেবেন।

হাত ধুয়ে এসে অমরবাবু নিজে হাতে আবার মাপতে লাগলেন।

"আর নেই তো?"—রত্নপ্রভা বললেন।

"না, এইটেই শেষ"

"তা হ'লে আমি চায়ের চেষ্টা দেখি একটু"

"এইখান থেকেই ব'লে দাওনা কাউকে। ভিখারী করুক না"

"ভিখারী পারবে না। এত খাটুনির পর ভাল করে চা খেতে হবে একটু। কড়া করে। কি বলেন ?"

ডানার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে চলে গেলেন রত্নপ্রভা। বৈজ্ঞানিক মাপজোপ শেষ করে ডানার দিকে ফিরে বললেন, "ঠিকই আছে। আপনি টুকে নিন এ ফিগারগুলো"

"পুরুষ-কাক—ডানা ২৬৬ মিলিমিটার ; ঠোঁট ৫০'৫ মিলিমিটার ; ল্যাজ ১৬৪ মিলিমিটার, নখ—মানে টারসাস্ ৪৮ মিলিমিটার। সবসুদ্ধ কটা হ'ল দেখুন তো"

ডানা গুণে বললে, "পুরুষ-কাক কড়িটা, স্ত্রী-কাক ষোলটা"

সনাতন মল্লিক উঁকি দিলেন দ্বারপ্রান্তে।

"আরও কাক কি মারতে হবে ?"

"না। কোনও পাখিই মারবার দরকার নাই আর। এটা যে ব্রীডিং সিজ্‌ন্ তা খেয়াল ছিল না আমার। আসছে বছর আবার দেখা যাবে। মরা কাকগুলো কি করলেন ?"

"পুঁতিয়ে দিয়েছি"

"যে পাখিওলাগুলো এসেছে, তারা কিছু ধরতে পেরেছে কি ?"

"ফেরে নি তারা এখনও। তবে সেদিন যে পেঁচাটা দেখে এসেছিলেন, সেটা ধরা পড়েছে ডিম সুদ্ধ"

"অ্যাঁ, তাই নাকি ! কোথায় সেটা ?"

"বার-বাড়িতে। আনতে বলব ?"

"নিশ্চয় !"

কিন্তু অমরবাবুর আর তর সইল না। নিজেই তিনি বেরিয়ে গেলেন হুড়মুড় ক'রে।

ডানা বসে রইল। তার আগেকার চিন্তার সূত্র ধ'রেই ভাবতে লাগল, বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পেও কি জীবহত্যার সমর্থন করা চলে ?

সে জানত না যে, এ নিয়ে বিদ্বৎসমাজে তুমুল তর্ক হয়ে গেছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছুই না জেনেও স্বাধীনভাবে ডানা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল যে, মনুষ্যত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে প্রত্যেক মানুষকে যথাসম্ভব অহিংস হতে হবে। হিংস্র হবার চরম ক্ষমতা আছে ব'লেই হতে হবে। সে শক্তিশালী ব'লেই সংযমী হতে হবে তাকে। যে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল প্রাণীহত্যার কারণ, সে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল সম্বরণ করাটাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হওয়া চাই অন্য কোনও কারণে নয়, আত্মরক্ষার জন্যই। সে কোথায় যেন পড়েছিল—কোন পাঠ্য পুস্তকেই সম্ভব—যে, জীবজগতের জন্মমৃত্যুর হার এমন একটা কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত যে, তার বেশি রকম ওলট-পালট করতে গেলে সমগ্র জীবজগতেরই সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। মানুষের জ্ঞান যতই বাড়ছে, ততই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে অদরকারী ব'লে কিছু নেই। সুতরাং অস্বাভাবিক উপায়ে কোনও কিছু ধ্বংস করা মানেই প্রকৃতির নিয়মে বাধা দেওয়া এবং তার পরিণাম শুভ নয়, অশুভ। যে 'ফাংগাস' (চলতি ভাষায় যাকে আমরা 'ছাতা' বলি) এতদিন নানা রকম ঘৃণ্য রোগের হেতু ব'লে গণ্য হচ্ছিল, দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে রোগ সারাবারও উপাদান আছে। মানুষ যদি ইতিপূর্বে কোনও উপায়ে এই 'ফাংগাস'দের নির্মূল ক'রে দিতে পারত, তা হ'লে 'পেনিসিলিন' বা ফাংগাস-জাত অন্যান্য মূল্যবান ওষুধগুলি মানবসমাজ পেত না। মানুষের নিজের প্রয়োজনের জন্যই হয়তো পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণীর বেঁচে থাকা দরকার। সব কথা আজ জানা যায় নি ব'লেই অনেক জীবকে আমরা অদরকারী বা অনিষ্টকারী মনে করি, পরে হয়তো জানা যাবে যে, তারা উপকারীও। এই জন্যেই, এই আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই তাই সভ্য মানুষ স্বভাবত অহিংস। প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম-মৃত্যুর একটা স্বাভাবিক হার প্রকৃতির প্রয়োজনবশতই ঠিক হয়ে আছে। অস্বাভাবিক উপায়ে সে হার নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে তথাকথিত সভ্য

মানুষ হয়তো নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। হঠাৎ রূপচাঁদের চিঠিটার কথা মনে পড়ল তার। চিঠিটা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামায় নি সে। এ ধরনের চিঠি ইতিপূর্বে পেয়েছে সে আরও দু-একবার, বর্মায় থাকতে। সে জানে, এর একমাত্র প্রতিষেধক ঔদাসীন্য। যেন কিছুই হয় নি, এ রকম তো হয়েই থাকে---এই গোছের একটা ভাব দেখানো। রূপচাঁদের সঙ্গে দেখা হ'লে খুব সহজভাবেই সে কথা কইবে ভেবে রেখেছে। রূপচাঁদ প্রশ্ন না করলে চিঠিটার উল্লেখও সে করবে না। প্রশ্ন যদি করেন, তখন যা হোক একটা উত্তর দিলেই হবে। চিঠিটা পেয়ে সে যে বিব্রত বা বিচলিত হয়েছে, এটা সে কিছুতে প্রকাশ করবে না। চিঠিটার কথা এখন মনে প'ড়ে গেল, কারণ রূপচাঁদবাবু চিঠিতে স্বাভাবিক কথাটার উপর খুব জোর দিয়েছেন। ব্যাপারটা যেন বেশ জট পাকিয়ে গেল ডানার মনে। জীবনে স্বাভাবিক হতে চাওয়াটাই যদি কাম্য হয়, তা হ'লে রূপচাঁদবাবুর প্রস্তাব অসঙ্গত নয়। আর অস্বাভাবিকতাই যদি সভ্যতা হয়, তা হ'লে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতাকে মেনে নিতে হবে। অমরবাবুর পক্ষী-নিধনে আপত্তি করা চলবে না। তার মন পরস্পরবিরোধী দুটো ধর্মকেই প্রত্যাখ্যান করতে চাইছে কেন—স্বাভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতা দুটোই বিস্বাদ লাগছে কেন? তৃতীয় একটা কিছু আছে না কি, যা স্বাভাবিকও নয় অস্বাভাবিকও নয়, যা শুধু মনুষ্যোচিত। কি সেটা?...সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে।...

সোরগোল করতে করতে বৈজ্ঞানিক ঢুকলেন দুজন লোককে নিয়ে। দুজনের মাথায় দুটো প্রকাণ্ড খাঁচা। মুরগি-ব্যবসায়ীরা বাঁশের তৈরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যে সব খাঁচায় মুরগি রাখে, সেই রকম দুটো খাঁচায় বেশ বড় দুটো পেঁচা রয়েছে।

"বুঝলেন, একটা নয়, দুটো পাওয়া গেছে। আর আমি যা আন্দাজ করেছিলাম, কেটুপাই ঠিক। লক্ষ্য ক'রে দেখুন—পা পালক

দিয়ে ঢাকা নয়। আর ওই ডিমটাও দেখুন—একটি মাত্রই ছিল, এরা একটার বেশি পাড়েও না সাধারণত, বড় জোর দুটি। ডিমের রঙ কেমন চমৎকার দেখেছেন? সাদার উপর একটু ক্রীমের আভাস। প্রায় দু ইঞ্চি হবে, নয়? একেই বলে ব্রড ওভাল (Broad Oval), এটাকে রেখে দিতে হবে ভাল ক'রে।"

কোণের আলমারি থেকে কার্ড-বোর্ডের বাক্স বার করলেন একটা। তার ভিতর তুলো দেওয়া ছিল। তুলোর উপর ডিমটি সন্তর্পণে রেখে আরও খানিকটা তুলো দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর ফিরে এসে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন পেঁচা দুটোকে। ডানাও দেখতে লাগল। এমন ঘনিষ্ঠভাবে পেঁচা সে দেখে নি কখনও।

"কেটুপারা হচ্ছে ফিশ আউল, বুঝলেন। কয়েক রকম কেটুপা আছে। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এদের চেহারা, রঙ আর পা। টারসাসগুলো উলঙ্গ, মানে পালকহীন। বাইরে থেকে কোন্‌টা স্ত্রী কোন্‌টা পুরুষ বোঝবার উপায় নেই। এদের বাসা থেকে বার করলে কি সেই চামড়ার দস্তানাটা প'রে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—সনাতন মল্লিক বললেন,—"ভাগ্যে দস্তানাগুলো দিয়েছিলেন, তা না হ'লে বার করাই যেত না"

"আমি জানি কিনা"

রত্নপ্রভা প্রবেশ করলেন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। অমরবাবু সনাতন মল্লিকের দিকে চেয়ে বললেন, "মল্লিক মশাই, আপনিও একটু চা খেয়ে যাবেন তো?"

"আজ্ঞে না, আমার এখনও আহ্নিক হয় নি"

"ও, তাই নাকি, তা হ'লে আপনি বাড়ি যান, বাড়ি যান। এতক্ষণ কষ্ট ক'রে আপনার থাকবার কোনও দরকার ছিলো না তো"

সত্যিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন অমরবাবু।

সনাতন একটু হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আজ্ঞে না, কষ্ট কি?"

"যান আপনি। আজ আনন্দবাবু আসেন নি দেখছি। তিনি বলেছিলেন, পেঁচাটা যদি ধরা পড়ে, তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। আপনি তো ওই দিকেই যাচ্ছেন—না, আপনার আবার দেরি হয়ে যাবে, একটা চাকর পাঠিয়ে দিন বরং"

"আমিই যাবার পথে খবর দিয়ে যাচ্ছি। আমার রাস্তাতেই তো পড়বে"

সনাতন মল্লিক চ'লে গেলেন।

রত্নপ্রভা চায়ের আসর পেতে ব'সে প্রথমেই এমটি সুখবর দিলেন।

"আমাদের আস্তাবলের আলসেতে একটা শালিক বাসা বাঁধছে বোধ হয়। খড় মুখে ক'রে ক'রে নিয়ে আসছে দেখলাম"

"তাই নাকি ?"

বৈজ্ঞানিক উৎসাহিত হয়ে উঠে পড়লেন।

কবি বাড়িতে ছিলেন না।

তিনি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন শহরের বাইরে একটা বাগানে। বসন্ত শেষ হচ্ছে, তারই শোভা দেখছিলেন তিনি। সবাই যেন এবার ফুল ফোটাতে ব্যস্ত। অনেক আমগাছ এখনও মুকুলে ভরা, আমও ধরেছে অনেক গাছে। সজনে গাছে কচি কচি ডাঁটা ঝুলছে, ফুলের স্তবকও রয়েছে এখনও। দূরে রাংচিত্তিরের বেড়া, তাতেও ফুল। ঘনশ্যাম সোজা ডাঁটাগুলোর গাঁটে গাঁটে ছোট ছোট আগুনের শিখা উঁকি দিচ্ছে যেন। কৃষ্ণচূড়া লালে লাল। কর্ণিকার গাছে পাতা দেখা যায় না, আপাদমস্তক সোনার ফুল। কত রকম পাখিই যে ডাকছে! দোয়েলের গিটকিরি-ভরা গান আকুল ক'রে তুলেছে রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতকে। যে রিক্তাভরণা বসন্তশ্রী চ'লে যাবার আগে ফুলে ফলে কিশলয়ে সালঙ্কারা হয়ে উঠেছে, সহসা দোয়েলের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত যেন মাদকতার সঞ্চার

করেছে তাতে। কোকিলও ডাকছে। ক্রমাগত ডাকছে, বিরাম নেই। তার অবিরাম আহ্বানকে ব্যঙ্গ ক'রে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়ে উঠছে তীক্ষ্ণকণ্ঠী কোকিলার ভর্ৎসনা—কিক্ কিক্ কিক্। পাপিয়ার সুরলহরী আকাশ স্পর্শ করছে যেন। মনে হচ্ছে, মর্তের আকুতি অমর্তলোকে গিয়ে পৌঁছল বুঝি। ট্রু, টুরু টুরু—কয়েকটা বুলবুলি উড়ে গেল। ছোট্ট একটু জলতরঙ্গ বেজে উঠল যেন একবার। একটু দূরের একটা গাছে ভারি চমৎকার একটা সুর শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন কবি। কাছে গিয়ে দেখেন, ফিঙে এবং ফিঙে-গিন্নী প্রেমালাপ করছেন। মিষ্টি সুরের মাঝে মাঝে কেররর-গোছের মিষ্টি ঝনৎকারও আছে একটু। দূর থেকে শুনলে মনে হয়, দু রকম পাখি ডাকছে বুঝি। ছাতারেগুলো কচবচ করছে একটা গাছের নীচে শুকনো পাতার ভিতর। লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে আর বকর-বকর করছে ক্রমাগত। শালিক-দম্পতী খড় কুটো মুখে তুলে বাসা বানাতে ব্যস্ত। দূরের একটা প'ড়ো বাড়ির কার্নিসে বার বার উড়ে উড়ে যাচ্ছে খড় মুখে নিয়ে। ছোট্ট ভগীরথও একটা গাছের ডালে ঠোঁট দিয়ে দিয়ে গর্ত করছে কুরে কুরে। বাসা তৈরি করছে। দূরের আমগাছটায় টিয়া বসল এসে এক ঝাঁক।

হঠাৎ কবির ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। একটা লোক গুঁড়ি মেরে একটা ঝোপের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে। মানুষ নয়, মার্জার যেন একটা। হঠাৎ জালটা ঘুরিয়ে ফেললে সে একটা ঝোপে। সমস্ত পাখি উড়ে গেল আশপাশের গাছগুলো থেকে।

"কে তুমি হে, কি করছ এখানে ?"

এগিয়ে গেলেন কবি। লোকটা জাল গুটিয়ে নিচ্ছিল, কোনও জবাব দিলে না প্রথমে।

"কি করছ, জাল ফেলছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, পাখি ধরব"

"কেন ?"

"অমরবাবুর চাই। পাখি পিছু এক টাকা ক'রে দেবেন বলেছেন"

"ও !"

পাখি-ওলা জাল কাঁধে ফেলে অন্য দিকে চ'লে গেল। কবি খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তার প্রস্থান-পথের দিকে। জাল দিয়ে পাখি ধরার কথা ইতিপূর্বে অনেকবার শুনেছেন তিনি, খাঁচার ভিতর বন্দী পাখিও দেখেছেন, তবু কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন তিনি। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ আবার কিক্ কিক্ ক'রে উঠল কোকিলা সুন্দরী। খিক খিক ক'রে হেসে উঠল যেন। টুররর ক'রে সাড়া দিলে বুলবুলি। এক ঝাঁক গো-শালিক কলরব ক'রে উঠল। কবির মনে হ'ল, ওই পাখি-ওলাকে উদ্দেশ্য ক'রে ওরা নিজেদের ভাষায় কিছু বলছে যেন প্রত্যেকেই। খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে ওদের বক্তব্যটা যেন নিগূঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন তিনি। একটা গাছের তলা একটু পরিষ্কার ছিল, সেইখানে বসলেন আবার। পকেট থেকে খাতা কলম বেরুল। পাখিদের বক্তব্যটা কবিতায় প্রকাশ করতে হবে। তাঁর মনে হ'ল, পাখিরা যেন বলছে—

১

তোমাকে চিনি···
আমাদের তুমি চিনিতে চাও কি ও পাখি-ওলা ?
দূর হ'তে তুমি কারও শোন গান,
কারও দেখ রঙ, কাহারও দোলা,
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি
মোদের সুনীল উদার আকাশটি ?
আকাশ খোলা ?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

রঙ বা সুরের তুফান তুলিয়া
কেউবা টিয়া,
বাহার দিয়া,
কেউ বা কোয়েল, কেউবা দোয়েল, কেউ পাপিয়া
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি ?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৩

সুরের নেশায় কেউবা হারায়ে ফেলেছি দিশা,
কাহারও ফটিক-জলের তৃষা,
কেহবা জাগিয়া কাটাই নিশা—
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি ?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৪

কাহারও পালকে ইন্দ্রধনুর বরণ-ঘটা
কাহারও রূপালী, কাহারও আবার
সোনার ছটা
সরল জটিল অনেক ধরন
বিবিধ বরণ চঞ্চু চরণ
লাল, নীল, শাদা, কালো বা কটা
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি ?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৫

হয়তো একদা প'ড়ে যাব ধরা ফাঁদেতে তোমার,
খাঁচাটি তোমার জানি না কেমন
হয়তো লোহার, হয়তো সোনার
হয়তো একদা ভুলাব তোমারে পেখম তুলি
হয়তো শিখিব তোমারি বুলি
খাইব তোমারি ছাতু বা ছোলা
তোমারি দাঁড়েতে দুলিব দোলা
দয়া ক'রে শুধু যেও না ভুলি
ছিল আমাদের আকাশ খোলা,
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

কবিতাটা লিখে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন কবি। ডানার কথা মনে পড়ল। সেদিন রঙ মাখিয়ে দিয়ে আসার পর থেকে আর তিনি ডানার কাছে যান নি। রঙ দিতে দিতে মনে হচ্ছিল, ডানা যেন নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে নিরুপায় হয়ে রঙ দেওয়াটা সহ্য করছে। উৎসবটা উপভোগ করে নি। তাঁরও উৎসব তাই জমে নি সেদিন। এটাও তিনি মনে মনে অনুভব করেছেন যে, জোর ক'রে উৎসব জমানো যায় না। আনন্দটা স্বতোৎসারিত না হ'লে তা নিরানন্দের চেয়েও পীড়াদায়ক। ডানা কেন অমন ক'রে আছে? পাখিগুলো পাখিওলাটাকে যে চক্ষে দেখছে, ডানাও হয়তো ঠিক সেই চক্ষেই দেখছে আমাকে। ভাবছে, আমি কবি নই, আমি একটা ফাঁদ। তার ভুল যেদিন ভাঙবে সেদিন সে উৎসবে যোগ দেবে হয়তো। প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে হবে। প্রতীক্ষাতেও আনন্দ আছে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি। তারপর হঠাৎ মনে হ'ল, সত্যিকার উৎসব কবে জমবে? কবে ডানা বুঝতে পারবে যে, অপরকে বঞ্চিত

করলে নিজেকেও বঞ্চিত হতে হয়? প্রকৃতির প্রাঙ্গণে নিত্য নব উৎসবের যে ইঙ্গিত ছড়িয়ে পড়ছে অহরহ, ঘরের দ্বার বন্ধ ক'রে রেখে কতকাল তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে সে? দ্বার একদিন খুলতেই হবে। কিন্তু কবে?...

"চিঠ্‌ঠি হুয়"

চমকে উঠলেন কবি। ফিরে দেখলেন, চন্দনচর্চিত তাঁর মৈথিল ঠাকুরটি একটি চিঠি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি যে এখানে থাকবেন, তা ঠাকুরটিকে ব'লে এসেছিলেন। চিঠিটি সনাতন মল্লিকের।—

নমস্কারান্তে নিবেদন,

আনন্দবাবু, আপনাকে এক জোড়া হুতোম পেঁচা দেখাইবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত অমরেশবাবু বাড়িতে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম। আপনার দেখা না পাইয়া এই চিঠিটি লিখিয়া যাইতেছি। নিবেদন ইতি।

ভবদীয়
শ্রীসনাতন মল্লিক

চিঠিটির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কবি উঠে পড়লেন। হয়তো সোজা অমরবাবুর বাড়িই যেতেন, কিন্তু ঠাকুরটি অদ্ভুত ভাষায় আর একটি খবর দিলে।

"রেন্না হোইয়ে গিয়েসে"

"কটা বেজেছে?"

"বারহ্‌ বজ্‌ গিয়া"

"তবে চল, বাড়িই যাই"

১৫

গত কয়েকদিন থেকে রূপচাঁদ মনে মনে একটি ব'ড়ে হাতে করে কোথায় সেটি বসাবেন ভাবছিলেন। সনাতন মল্লিকের আগমনে তাঁর সে সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেল। রূপচাঁদ যুক্তিপন্থী জড়বাদী লোক, দৈব-টৈবের ধার বিশেষ ধারেন না, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ক্ষণিকের জন্য তিনি বিচলিত হলেন একটু। ক্ষণিকের জন্য তাঁর মনে হ'ল এর মধ্যে দৈবের কোন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে নাকি! মনে হওয়াতে কিন্তু আনন্দিতই হলেন। সমস্ত যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর মন কোন এক অজানা দেবতার আনুকূল্য লাভের আশায় লোলুপ হয়ে উঠল। এ ভাবে লোলুপ হয়ে ওঠাটা যে অযৌক্তিক, তা তাঁর মনেই হ'ল না।

শ্রীযুক্ত সনাতন মল্লিক অবশ্য রূপচাঁদকে সাহায্য করতে আসেন নি, এসেছিলেন নিজের কাছে। তিনি যদিও অমরবাবুর একটা কাছারির ম্যানেজার ব'লেই বিখ্যাত, তবু তাঁর নিজেরও বিষয় সম্পত্তি আছে কিছু। যদিও যৎসামান্য, তবু সেটাকে কেন্দ্র ক'রেই একটা ফৌজদারী মামলায় প'ড়ে গেলেন তিনি। সিংহেশ্বর দারোগা যদি ঠিক ঠিক রিপোর্ট দেয়, তা হ'লে খুনের দায়ে পড়তে হবে তাঁকে। বিপদে পড়লে সনাতন মল্লিকের বুদ্ধি প্রখরতর হয়ে উঠে সিংহেশ্বর দারোগার কাছে না গিয়ে তিনি সোজা চ'লে গেলে রূপচাঁদবাবুর আপিসে। তাঁর মনে হ'ল, রূপচাঁদ যখন পুলিস অফিসের বড়বাবু, তখন তিনি দারোগারও দারোগা।

রূপচাঁদ হাসিমুখে মল্লিক মশায়ের কথা শুনলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। নিশ্চয় করবেন মল্লিকের মুখের দিকে হাসিমুখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর বললেন, "আপনি অমরকে দিয়েও যদি একটু চেষ্টা করেন তা হ'লেও তো হয়ে যায়। অমরকে খুবই খাতির করে সিংহেশ্বর দারোগা"

"তা জানি"—মৃদু হেসে বললেন মল্লিক মশাই—"কিন্তু পাখি নিয়ে উনি এমন উন্মত্ত যে, এ সব কথা ওঁর কাছে পাড়াই মুশকিল"

এইবার ব'ড়েটি চাললেন রূপচাঁদ।

মুচকি হেসে বললেন, "বিশেষ ক'রে পাখির ডানা নিয়ে বলুন। সেদিন স্বচক্ষেই তো দেখলেন"

এর উত্তরে মল্লিক কোন কথা বললেন না, তাঁর মুচকি হাসিটি আকর্ণবিস্তৃত হয়ে গেল শুধু।

"না না, হাসির কথা নয়"—রূপচাঁদের কণ্ঠস্বরে একটা ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেলে এবার—"বন্ধু হিসেবে এর প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত আমাদের"

"কি প্রতিকার করবেন? আপনি আমি কি প্রতিকার করতে পারি বলুন? যার হাতে অত টাকা—"

কথাটা শুনে রূপচাঁদ দ'মে গেলেন একটু মনে মনে। বস্তুতান্ত্রিক লোক তিনি, টাকার ক্ষমতার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে অনেক টাকা আছে—এ সংবাদটা মোটেই আনন্দজনক নয় তাঁর কাছে। তাঁর ধারণা, টাকা দিয়ে প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই কেনা যায়। কাকে কিনতে কত সময় এবং কি পরিমাণ অর্থ লাগে, সেইটে কেবল নির্ভর করে প্রতি স্ত্রীলোকের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধের উপর। আর কোন তফাত নেই। অমরেশ যে বড়লোক তা রূপচাঁদ জানতেন, কিন্তু তার ঠিক কত টাকা আছে এ খবরটা ঠিক তিনি জানতেন না। ঈষৎ কৌতূহল হ'ল।

"অনেক টাকা আছে নাকি ওঁর?"

"নেই? বাংলা বিহার উড়িষ্যা সব জায়গাতেই কিছু না কিছু জমিদারি আছে যে। নগদ টাকাও আছে বেশ। বাপের, শ্বশুরের, মামার—তিন জায়গারই বিষয় পেয়েছেন কিনা। ত্রিবেণী-সঙ্গম। অগাধ জলের মাছ উনি"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নীরব হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর

বললেন, "এ ক্ষেত্রে একটিমাত্র লোক অবশ্য রাশ টেনে ধরতে পারেন—ওঁর পরিবার"

মল্লিক মশাইও কথাটা স্বীকার করলেন।

"তা পারেন বইকি. একশো বার পারেন। কিন্তু করছেন না তো কিছু বরং ওঁর গোড়েই গোড় মিলিয়ে—"

"আমরা সেদিন যেটা দেখলাম, সে খবরটা উনি জানেন না বোধ হয়। আমাদের উচিত খবরটা ওঁর কানে তুলে দেওয়া। আমার দ্বারা অবশ্য অসম্ভব সেটা, কোন কৌশলে আপনি যদি পারেন"

"আমি ? ও বাবা ! কে পড়তে যাবে ওই বাঘিনীর পাল্লায় !"

"বাঘিনী নাকি ? মনে তো হয় না দেখে ?"

"আপনার মনে হবে কেন, হবার কথাও নয়, যার ঘাড়টি মটকায় সে-ই জানতে পারে"

"ঘাড় মটকায় নাকি ?"

"খুব মটকায়। এখানকার জমিদারি তো ওঁরই বাপের, উনিই সব দেখাশোনা করেন, পান থেকে চুনটি খসবার জো নেই কারও। লেখাপড়া তেমন জানেন না বটে, কিন্তু সমস্ত জমিদারির হিসাবপত্র একবারে নখাগ্রে"

"সেইজন্যেই তো আমার আরও আশা হচ্ছে যে, নিজের স্বামীর পান থেকে চুন খসার খবরটা পেলে উনি ছেড়ে কথা কইবেন না। খবরটা আপনি পৌঁছে দিন কোন রকমে, বুঝলেন ? আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন"

কথাটা ব'লে রূপচাঁদ এমনভাবে চাইলেন মল্লিক মশাইয়ের দিকে যে, মল্লিক পুলকিত না হয়ে পারলেন না।

"নবুর মাকে দিয়ে খবরটা বলাতে পারি অবশ্য। এমনভাবে বলবে, যেন গুজব শুনেছে একটা। সেটা কিছু অসম্ভব নয়"

"নবুর মা-টি কে ?"

"ওঁর ঝি"

ক্ষণকাল নীরব থেকে রূপচাঁদ বললেন, "উপকারটি করুন তা হ'লে। অমরেশ আমাদের বন্ধুলোক, কিন্তু এসব ব্যাপার সামনাসামনি তো বলা যায় না কিছু। অথচ—"

রূপচাঁদ এমন একটা ভাব করলেন যে, মল্লিক মশাই যদি নবুর মাকে দিয়ে রত্নপ্রভার কানে খবরটা তোলেন তা হ'লে তিনি, মানে রূপচাঁদই, যেন ব্যক্তিগতভাবে বাধিত হবেন। মল্লিক মশাই রূপচাঁদের কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে এসেছেন, রত্নপ্রভার উপর তাঁর নিজেরও একটা আক্রোশ আছে, তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

"বেশ, নবুর মাকে বলব আমি। দু-চার দিনের মধ্যে চ'লেও যাচ্ছেন ওঁরা"

"কারা ?"

"অমরবাবুরা"

"কোথায় ?"

"ওঁদের জমিদারি দেখতে। নানান জায়গায় সম্পত্তি আছে তো। একটা জরুরি তারও এসেছে নাকি কোথা থেকে"

"ডানাও সঙ্গে যাচ্ছে নাকি ?"

"প্রাইভেট সেক্রেটারি যখন, যাওয়া তো উচিত"

রূপচাঁদের মনটা ঝম্পনোন্মুখ বিড়ালের মত একাগ্র হয়ে উঠল সহসা।

"সিংহেশ্বর দারোগাকে আজই খবর পাঠাব আমি। আপনিও নবুর মাকে লাগান আজই, দেরি করবেন না। দেরি করবেন না, বুঝলেন ?"

"আচ্ছা"

"মল্লিক মশাইয়ের কেমন যেন অস্পষ্টভাবে মনে হ'ল যে, সিংহেশ্বর দারোগাকে সপক্ষে আনার মূল্য হিসাবেই যেন তাঁকে এ কাজটি করতে হবে"

"উঠি তবে"

"নবুর মায়ের কথাটা ভুলবেন না"

"না"

মল্লিক মশাই চ'লে গেলেন। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন রূপচাঁদ। একটা অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হতে লাগল তাঁর। ছেলেবেলায় আরব্য উপন্যাসে সিন্দবাদ নাবিকের গল্প পড়েছিলেন। তারই একটা ঘটনা, মনে প'ড়ে গেল। একটা সর্পসঙ্কুল গুহার মধ্যে ঢুকে প'ড়ে সিন্দবাদের মানসিক অবস্থা যে রকম হয়েছিল, তাঁরও যেন সেই রকম হ'ল। চতুর্দিকে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ। প্রত্যেকটা মনোহর, প্রত্যেকটা বিষধর। প্রত্যেকের ফণার দু পাশে জ্বলজ্বল করছে চোখ, না, মণি? রূপচাঁদের শরীরের শিরায় উপশিরায় অগ্নিস্রোত বইতে লাগল যেন। পর-মূহূর্তেই সামলে নিলেন নিজেকে। না, আত্মহারা হ'লে চলবে না। স্থির মস্তিষ্কে অগ্রসর হতে হবে। আপিসের কাজে মন দিলেন আবার।

১৬

দ্বিপ্রহরটা ভারি অদ্ভুত মনে হ'ল কবির কাছে। মনে হ'ল দ্বিপ্রহরের রূপটা চোখেই পড়ে নি এতদিন। দিবসের পূর্ণ যৌবন যেন অনাড়ম্বর সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোথাও কোনও সাজসজ্জা নেই, কোনও কলরব নেই। মানুষ, গাছ পশুপক্ষী সকলেই যেন সংযত হয়ে আছে, একটা আত্মসম্বরণের সুর যেন ফুটে উঠেছে চারিদিকে। আত্মসম্বরণ, না, আত্মবিস্মৃতি?—সহসা মনে হ'ল তাঁর পূর্ণ যৌবন তো আত্মবিস্মৃত। নিজের মহিমার সম্পূর্ণ খবর সে নিজেও জানে না, অপরকে জ্ঞাতসারে জানাবার চেষ্টাও করে না তাই সকালে অমরেশবাবুর বাড়ি গিয়ে প্যাঁচা দুটো দেখেও এই কথা মনে হচ্ছিল তাঁর। ওদের অটল গাম্ভীর্য, প্রচ্ছন্ন প্রতাপ, ওদের শ্বাপদসুলভ

স্থূলতার সঙ্গে পক্ষীসুলভ লঘুতার সমন্বয়—এ সমস্তর সম্বন্ধেই ওরা উদাসীন। আমাদের মনে যে ভাব ওরা উদ্রেক করেছে, তার খবর ওরা নিজেরাই জানে না। ডানার কথা মনে হ'ল। সকালে যখন গিয়েছিলেন, ডানা তখন ছিল না সেখানে। না থাকাতে একটু আরামই পেয়েছিলেন মনে মনে। সেদিন অমন জোর ক'রে রঙ দেওয়ার পর থেকে নিজেই যেন অপরাধী হয়ে আছেন নিজের কাছে। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, এই সঙ্কোচটাকে তিনি যদি প্রশ্রয় দেন, তা হ'লেই পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। তিনি তো অন্যায় কিছু করেন নি, তাঁর মনে কোন পাপ নেই, সেদিন নিছক আনন্দের প্রেরণায় রঙে রসে মেতে উঠেছিলেন তিনি, তার মধ্যে স্থূল কিছু ছিল না। উঠে পড়লেন তৎক্ষণাৎ। এ সঙ্কোচের বাধাকে সরাতে হবে, এখনই সরাতে হবে। ডানাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তিনি রূপরসিক কবি, মাংসলোলুপ পশু নন। তার দেহে, তার যৌবন-শ্রীতে যে সৌন্দর্য ক্ষণিকের লীলায় মূর্ত হয়ে উঠেছে, তারই তিনি উপাসক।

…হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলেন তিনি। সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের আর একটা চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করেছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল, তাঁর এই সৌন্দর্য-পূজার ফলে ডানার মনোজগতে যদি একটা বিপ্লব ঘ'টে যায়, তা হ'লে তার পরিণাম কি হবে? এ রকম বিপ্লব ঘটতে পারে কি? না পারার কোনও হেতু নেই। বয়সের পার্থক্য প্রেমের অন্তরায় নয়। বৃদ্ধের সঙ্গে যুবতীর প্রেমের অনেক কাহিনী শোনা গেছে। আর এ কথাও সুবিদিত যে, কোনও নারী যখন কোনও পুরুষকে ভালবেসে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন দেহ সম্বন্ধে শুধু যে কোনও সঙ্কোচ থেকে না তা নয়, সমস্ত দেহ-মন দয়িতের কাছে নিবেদন করতে না পারলে তার তৃপ্তি হয় না,—আত্মসমর্পণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং—। হঠাৎ চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলেন তিনি। ভাবলেন, আমার নিজের মনে যখন ও-ধরনের কোনও চিন্তা জাগে নি, তখন ডানার মনেও জাগবে না।

খুকু নেই, খুকু নেই, খুকু নেই—

গাছের উপর থেকে পাখি ডেকে উঠল একটা। চেয়ে দেখলেন, হাঁড়ি-চাঁচা পাখি। এই পাখি তো চ্যা-চ্যা-চ্যা ক'রে ডাকে, ওই ডাকের জন্যই ওর হাঁড়ি-চাঁচা নাম সম্ভবত। অমন মিষ্টি ক'রেও ও ডাকতে পারে নাকি ?

খুকু নেই, খুকু নেই—

কি চমৎকার দুলে দুলে ডাকছে। সত্যিই কি খুকু নেই বলছে ? কান পেতে শুনলেন। এবার মনে হ'ল, যেন 'কু অক্ রিং' 'কু অক্ রিং' বলছে। কবি আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন। পর-মুহূর্তেই পাখিটা কিন্তু উড়ে গেল। উড়তেই তার ঝোলা লেজের বাহার দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। একটা জাপানী পাখা যেন। কালোর চারিদিকে চওড়া সাদা পাড়। অতি সাধারণ পাখি, তবু একে ভাল ক'রে দেখেন নি কোনদিন। দেখেছেন, কিন্তু চেনেন নি। তখনই আবার মনে হ'ল, চেনা সহজ কি ? যার চ্যা-চ্যা ডাক 'খুকু নেই' হয়ে যায় এবং সেই 'খুকু নেই' 'কু অক্ রিং' শোনায় পর-মুহূর্তে, তার পরিচয় কি সহজে পাওয়া যাবে ? অমরবাবু যে বইটা দিয়েছেন, সেই বইটা উলটে দেখতে হবে একটু। এই প্রসঙ্গে মনে হ'ল, একটা পাখির ব্যাপারেই যখন এত হেঁয়ালি, মানুষের ব্যাপারে সে হেঁয়ালি না জানি আরও কত জটিল ! অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি ডানার বাসার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। যে অপ্রত্যাশিত রূপ তিনি এই সামান্য পাখিটার মধ্যে দেখলেন, ডানার মধ্যেও তেমনই একটা কিছু পাওয়া যাবে কি না এই ধরনের একটা ঔৎসুক্য তাঁর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল, একটা শব্দ শুনে তাঁর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। তিনি দেখলেন—একটি স্ত্রীলোক এবং একটি কিশোর বালক ডানার বাড়ির পিছন দিক থেকে ছুটে পালাচ্ছে, ঝোপ-জঙ্গল ভেদ ক'রে মাঠামাঠি দৌড়চ্ছে। কবি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। ভদ্রঘরের

বয়স্ক মেয়েকে এমনভাবে ছুটতে কখনও দেখেন নি তিনি। মাথার খোঁপা এলিয়ে পড়েছে পিঠে, পরনের শাড়ি গাছ-কোমর ক'রে বাঁধা। বকুলবালা আনন্দমোহনকে দেখেই ছুট দিয়েছিলেন, দূর থেকে আনন্দমোহন তাঁকে চিনতে পারলেন না। চণ্ডীর সঙ্গে বকুলবালা চুপিচুপি দুপুরবেলা বেরিয়েছিলেন, অমরবাবু পাখিদের জন্যে কাঠের যে সব বাসা বানিয়ে নানা গাছে টাঙিয়ে দিয়েছেন তাই দেখবার জন্যে। ডানার বাসার সামনের গাছেই টাঙানো ছিল কাঠের বাক্স একটা, চণ্ডী দূর থেকে সেইটে দেখাচ্ছিল বকুলবালাকে।

কবি গিয়ে দেখলেন, দূর থেকেই দেখতে পেলেন, ডানা নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়ছে। এক ফালি রোদ এসে পড়েছে তার বাঁ কাঁধের উপর। শাড়ির জরি-পাড়টা জ্বলছে রোদ লেগে, কমলা-রঙের শাড়িটা যেন আগুনের শিখা। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দেখলেন তিনি, তারপর এগিয়ে গেলেন।

"পড়া হচ্ছে নাকি ?"

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললে, "আসুন। অনেক দিন আসেন নি"

"কি পড়ছ ?"

"পাখির বই একটা"

"অমরবাবু দিয়েছেন বুঝি ?"

"হ্যাঁ"

কবির সঙ্কোচ কেটে গেল। সহজ স্বরেই আলাপ করতে লাগলেন তিনি।

১৭

জরুরি তার এসেছিল রত্নপ্রভার বাপের বাড়ি থেকে। পয়লা বৈশাখ সেখানে খুব উৎসব। সেই উপলক্ষ্যে যেতে হবে। যেতেই যখন হচ্ছে, তখন বিষয়-সম্পত্তির কাজকর্মগুলোও মিটিয়ে আসবেন ঠিক করেছেন অমরবাবু। কিছুদিন আগেই এটা ঠিক করেছিলেন তিনি। কিন্তু পাখির ব্যাপারে সম্প্রতি এত মেতে উঠেছিলেন যে, কথাটা মনে ছিল না। মনে পড়াতে এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এখানকার ব্যাপারগুলোর কি হবে ভেবে। এতগুলো পাখি ধরা হয়েছে, নানা গাছে পাখির বাসা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেকগুলো আস্ত পাখি বম্বে পাঠান হয়েছে ট্যাক্সিডার্মিস্টের কাছে, পাখির ঘর তৈরি করবার জন্যে নানা রকম খাঁচা করতে দিয়েছেন, ইট পোড়ান হচ্ছে, তিনি না থাকলে এসব দেখবে কে? মল্লিক পারবেন না। অথচ তাঁকে যেতেই হবে। এখানকার ব্যাপারের সমস্ত ভারটা ডানার উপরেই দিয়ে যেতে চান তিনি। কোন্ পাখিকে কি খেতে দিতে হবে, তার ফর্দ এবং বই ডানাকে তিনি দিয়েছেন। পাখির যেসব বাসা বানিয়ে দিয়েছেন, তাতে কোন্ কোন্ পাখি আসা সম্ভব তারই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এখন। হাতে বই ছিল একটা। হঠাৎ বললেন, "দেখুন, ডিউয়ারের (Dewar) এ বইখানা আমি নিয়ে যাব। আপনি বরং নোটই ক'রে নিন"

ডানা কাগজ-পেন্সিল বার ক'রে বসল।

"পাখিরা সাধারণত কোন্ কোন্ জায়গায় বাস করে, তারই একটা মোটামুটি ফর্দ আছে এতে। লিখুন, বড় হেডিং দিন—বাড়ি। তারপর সাব-হেডিং—দেওয়ালের গর্তে বা ফাটলে। লিখুন—চড়াই, হুপো (মানে মোহনচূড়া), শালিক, কুটুরে-প্যাঁচা অবশ্য পুরোনো বাড়িই আশ্রয় করে বেশি, নীলকণ্ঠ, দোয়েল, খঞ্জন (মানে Pied Wegtail)—যেগুলো এ দেশে থাকে। তারপর সাব-হেডিং—

পরলে বা কড়ি-বরগার ফাঁকে—কালিশ্যামা, পায়রা, ঘুঘুও অনেক সময়, শালিক। আবার সাব-হেডিং—উঁচু ছাদ (যেমন চার্চের ছাদ) —শকুনি, ইনি বলছেন ছাদের উপর টিট্টিভও নাকি কখনও কখনও বাসা বাঁধে, আমি কখনও দেখি নি। আমাদের নদীর ধারের বাড়িটায় লক্ষ্য রাখবেন একটু। তারপর সাব-হেডিং দিন—বাইরের দিকের দেওয়ালে, পরলের কাছে—তাল-চোঁচ, মানে Indian Swift, সোয়ালো, ক্র্যাগ মার্টিন—"

"সায়ালো কোন্‌গুলো বলুন তো, দেখেছি কি ? ক্র্যাগ মার্টিন কি এদেশী পাখি ?"

"সোয়ালো আপনাকে দেখিয়েছি। ল্যাজে সরু তারের মত—Wire-tailed নাম সেইজন্যে। জগদানন্দবাবু ওর বাংলা নাম দিয়েছেন 'নকুটি'। ক্র্যাগ মার্টিনের পুরো নাম হচ্ছে ডাস্কি ক্র্যাগ মার্টিন (Dusky Crag Martin), আমিও খুব বেশি দেখি নি এ অঞ্চলে। তারপর লিখুন—কড়ি বা বরগা থেকে, কিংবা কোন তার থেকে যেসব পাখি বাসা ঝুলিয়ে দেয়—টুনটুনি, বাবুই। বারান্দায় টবের গাছে যারা বাসা বাঁধে—দর্জিপাখি, বুলবুল। বাড়ি এবং বাড়ির আশপাশ হয়ে গেল। এইবার বাইরে যাওয়া যাক। নদীর তীরে যারা গর্ত ক'রে বাসা বাঁধে—গাংশালিক, বাঁশপাতি (গ্রীন ব্লুটেল্‌ড্‌ও), মাছরাঙা (কমন পায়েড, হোয়াইট-ব্রেস্টেড)। গাছে যারা গর্ত ক'রে বাসা বানায়—বসন্তবউ, ভগীরথ, কাঠঠোকরা (গোল্ডেন ব্যাক্‌ড্‌—সেদিন যেটা দেখলাম, আর পায়েড, মারহাট্টা)। এরা গাছের গুঁড়িতে বা ডালে নিজেরাই গর্ত বানায়। আর কতকগুলো পাখি থাকে, তারা গাছের গুঁড়িতে যেসব ফাটল বা গর্ত থাকে, তাতে বাসা বানায়—যেমন পাওয়াই (দু রকমই—গ্রে-হেডেড, ব্ল্যাক-হেডেড), এরা শালিক জাতীয়, সাধারণ শালিকও এসব জায়গায় বাসা বানায়, চড়াই, কালিশ্যামা, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, হুপো, প্যাঁচা, টিল, মানে ছোট ছোট হাঁস। হয়েছে ?"

ডানা তাড়াতাড়ি লিখে যাচ্ছিল, চোখ তুলে একটু হেসে বললে, "টিল বললেন ?"

"হ্যাঁ, টিল। কুম্‌ব্ ডাকও লিখুন। কুম্‌ব্ ডাক বুঝলেন তো ? নাকুটা যাকে বলে। এইবার সাব-হেডিং হবে—ঝোপে-ঝাড়ে, গাছের নীচের দিকে"

ডানা লেখা শেষ ক'রে বলল, "হয়েছে, এইবার বলুন"

বাধা পড়ল। রত্নপ্রভা এসে ঢুকলেন। চকিতে বৈজ্ঞানিকের এবং ডানার দিকে চেয়ে নীরবে একটা চেয়ার টেনে বসলেন তিনি। মিনিট কয়েক আগে নবুর মার মুখে তিনি পল্লবিত কাহিনীটি শুনেছেন, ডানা নাকি বৈজ্ঞানিকের পিঠে উঠে নদীর ধারে একটা গাছ থেকে ফুল পাড়ছিল। কাহিনীটি সালঙ্কারে বিবৃত করার ফলে নবুর মায়ের চাকরিটি গেছে। রত্নপ্রভা সঙ্গে সঙ্গে দূর ক'রে দিয়েছেন তাকে।

রত্নপ্রভা স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, "ডানাও চলুক না আমাদের সঙ্গে। তোমার লেখাপড়ার কাজে সাহায্য করতে পারবে"

"অসম্ভব। এখানে তা হ'লে দেখা-শোনা করবে কে? ওর উপরই সব ভার দিয়ে যাচ্ছি এখানকার। অতগুলো পাখির বাসা টাঙানো হয়েছে, কোন্ পাখি কোথায় বাসা বাঁধে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে তো ?"

"একা একা ওঁর ভাল লাগবে কি ?"

"তা লাগবে"—ডানা হেসে বললে।

"আনন্দবাবুও থাকবেন। তাঁর উপরও ভার দিয়ে যাব। নিন লিখুন। এইবার লিখুন—যেসব পাখি ঝোপে-ঝাড়ে কিংবা গাছের নীচের দিকে বাসা বানায়"

রত্নপ্রভা উঠে গেলেন। তিনি যা জানতে এসেছিলেন, তা জেনে গেলেন। নবুর মা ইঙ্গিতে যা প্রকাশ ক'রে গেল তা যদি সত্য হ'ত, তা হ'লে ডানাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে বৈজ্ঞানিক

উল্লসিত হয়ে উঠতেন। স্বামীর উপর ক্ষণিকের জন্যও সন্দেহ হয়েছিল ব'লে অনুতাপ হ'ল তাঁর। রাগও হ'ল। নবুর মাকে আবার ডাকতে পাঠালেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক আরম্ভ করলেন, "ঝোপে-ঝাড়ে বা গাছের নীচের দিকে—সাব-হেডিং দিয়েছেন ? এইবার লিখুন—ছাতারে, হোয়াইট আর সবজে মুনিয়া, বুলবুল, দর্জিপাখি, কুলোপাখি, বাবুই, টুনটুনি। হ'ল ? তারপর লিখুন—কুয়োপাখি, আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছেন বাদামী-কালো, ঘুঘু ; আরও কয়েকটা নাম আছে, থাক্ সেগুলো। এইবার সাব-হেডিং দিন—যে সব পাখি গাছের উপরে মগডালের কাছাকাছি বাসা বাঁধে—সবরকম চিল, কাক, হাঁড়িচাঁচা, ফটিকজল, ফিঙে, শকুনি, সব রকম বাজ, হরিয়াল, বক, সারস, মুণ্ডক, পানকৌড়ি, গগনভেড় ইত্যাদি। আরও অনেক নাম আছে, সেসব এখানে দেখতে পাবেন না। তারপর সাব-হেডিং দিন—যারা ফসলের ক্ষেতে কিংবা নলখাগড়ার বনে কিংবা বড় বড় ঘাসের ঝোপে বাসা বানায়—হলদে-চোখ ছাতারে, বুলবুল, দর্জিপাখি, রেনওয়ার্বলার (হিন্দীতে যার নাম ফুৎকি), টুনটুনি, নীল বগলা, যার ইংরেজী নাম Purple Heron এইবার লিখুন—উঁচু পাহাড়ের খাঁজে বা ফাটলে যারা বাসা বানায়—চিল, শকুনি, বাজ, নীল পায়রা। এইবার লিখুন, ও, হয় নি বুঝি এখনও ?"

"হয়েছে। বলুন"

"লিখুন—মাটিতে যারা বাসা বানায়—কালিশ্যামা (কদাচিৎ), বগেরি, ভরতপাখির দল, নাইট্‌জার, ময়ূর, বনমুরগি, বটের, তিতির, সারস, হুকনা, বাটান, কাদাখোঁচা, টিট্টিভ, গাংচিল (হুইস্কার্ডগুলো নয় কিন্তু)। এইবার সাব-হেডিং দিন—ঝিলে বিলে যারা বাসা বানায়—জলমুরগি, কূট অর্থাৎ কারণ্ডব (এ দেশে যাদের বাবাজী বলে), জলপিপি, পানডুবি, অর্থাৎ Dalchick, Whiskered Tern, গুঁপো গাংচিল বললে কি খুব খারাপ শোনাবে ?"

ডানা লেখা শেষ ক'রে হেসে বললে, "এর অনেক পাখি কিন্তু চিনি না"

"সালিম আলি আর হুইসলার বই ছুটো রেখে যাব। দেখে নেবেন। ছবি দেখলে চিনতে কষ্ট হবে না"

কবি এসে হাজির হলেন।

"আসুন, আসুন, আপনারই প্রতীক্ষা করছি। আমার অবর্তমানে আপনি আর ইনি আমার পাখিগুলোর তদারক করবেন। পাখিদের সম্বন্ধে যদি নতুন কিছু দেখেন, লিখে রাখবেন"

"আমি লিখব কবিতায়, তা আপনার কাজে লাগবে না তো"

"বেশ, আপনি কবিতাতেই লিখবেন। ইনি লিখবেন গদ্যে। ছুটো মিলিয়ে দেখা যাবে, আমার সঙ্গে কোন্‌টা বেশি মেলে"

ডানার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল।

কবি বললেন, "আমার সঙ্গে কিছু মিলবে না। আপনি সেদিন প্যাঁচার জাতি বংশ নখ পালক নিয়ে অত বক্তৃতা করলেন, কিন্তু আমার কবিতায় যা ফুটল সে একেবারে অন্য জিনিস"

"কবিতা লিখেছেন নাকি ?"

"এনেওছি সঙ্গে"

"পড়ুন"

কবি পকেট থেকে কবিতার খাতা বার ক'রে পড়তে লাগলেন—

দেখেছি তোমার মাঝে বিহঙ্গের অম্বর-বিলাস
মার্জারের শব্দহীন সুগোপন শিকারান্বেষণ
তীক্ষ্ণ তব নখ-চঞ্চু, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাধা-বিদারণ
চীৎকার-ছুরিকাঘাতে নিশীথের স্তব্ধতা-বিনাশ
কর যবে হে পেচক,
শান্তরে অশান্ত কর, কেঁপে ওঠে মৃত্তিকা আকাশ।

অতি স্বচ্ছ দিবালোকে শুনি গান অসংখ্য পক্ষীর
হিংস্র শ্বাপদেরা জানি অন্ধকারে করে সঞ্চরণ
উভয়ের প্রাণধর্ম করিয়াছ তুমি সংহরণ
অন্ধকার প্রাসাদের দ্বারপাল, হে গুরু-গম্ভীর,
শক্তিধর, হে পক্ষী-পাঠান,
হে অদ্ভুত, হে বলিষ্ঠ, হে বাহন জীবন-লক্ষ্মীর।

"চমৎকার হয়েছে তো!"—বৈজ্ঞানিক বললেন,—"প্যাঁচার চরিত্রটা বেশ ফুটেছে"

"বেশ ফুটেছে?"—ডানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন কবি।

ডানা হাসিমুখ চুপ ক'রে রইল ক্ষণকাল, তারপর বললে, "সত্যিই বেশ হয়েছে"

কবিতার কথা কিন্তু চাপা প'ড়ে গেল পর-মুহূর্তেই।

বৈজ্ঞানিক কবিকে বললেন, "কোন্ কোন্ পাখি কোন্ কোন্ জায়গায় বাসা বানায়, তার মোটামুটি ফর্দ দিয়ে গেলাম একটা এঁর কাছে। লক্ষ্য রাখবেন, আমাদের তৈরি বাসাগুলোতে কোনও পাখি আসে কি না"

"বেশ"

"পাখিদের খাবার যদি বাসার চারিধারে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ত, তা হ'লে খাবারের লোভে পাখিগুলো আসত অন্তত। তারপর বাসা পছন্দ হ'লে হয়তো থেকেও যেত। দাঁড়ান, পাখিদের খাবারেরও আইডিয়া একটা দিয়ে দিই আপনাদের"

বৈজ্ঞানিক উঠে পাশের ঘরে গিয়ে বই খুঁজতে লাগলেন।

কবি ডানাকে বললেন, "কি টুকছিলে এতক্ষণ? দেখি—"

ডানা খাতাখানা এগিয়ে দিলে। পড়তে পড়তে ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠল কবির।

এই সব রাবিশ লিখে যেতে হচ্ছে ওকে প্রত্যহ! ডানাকে

প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত করাতে তিনিই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন। এখন কষ্ট হতে লাগল। খাতাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ব'সে রইলেন তিনি। তাঁর মনে হতে লাগল, ছ্যাকড়া-গাড়িতে ঘোড়াই জোতা উচিত ছিল অমরবাবুর, ময়ূরকে এ কাজে লাগানোটা ঠিক হয় নি। আর কিছু নয়, অশোভন। ময়ূরের কথায় মনে পড়ল ময়ূরবাহন কুমার কার্তিকেয়কে। তারপরই মনে পড়ল কুমারসম্ভবের শ্লোক—

তস্যাত্মা শিতিকণ্ঠস্য সৈন্যাপত্যমুপেত্য বঃ
মোক্ষ্যতে সুরবন্দীনাং বেণীবীর্য্যবিভূতিভিঃ।

যিনি নিজের বীর্যপ্রভাবে বন্দিনী দেববালাদের বেণী বিমোচন করতে পারেন, তিনিই ময়ূরবাহন হওয়ার উপযুক্ত।

একগাদা বই নিয়ে এলেন বৈজ্ঞানিক।

"এই বইগুলো আপনাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। অনেক রকম খবর পাবেন এগুলোতে"

বইগুলো খুলে খুলে প্রত্যেকটির পরিচয় দিতে শুরু করলেন। দিতে দিতে সক্ষোভে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক, "সত্যি, আমরা কিছুই করছি না, এরা কত রকম ভাবে পাখির বিষয়ে লিখেছেন দেখুন। ইনি কেবল পাখির ওড়া নিয়েই বই লিখেছেন একটা। ইনি লিখেছেন গান নিয়ে। পাখির বাসা নিয়ে, ডিম নিয়ে, দেশভ্রমণ নিয়ে, খাদ্য নিয়ে এঁদের কৌতূহলের আর অন্ত নেই। রিপ্লে সাহেব হামিং বার্ড দেখবার জন্যে ডাচ নিউগিনি পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। আমরা কি করলাম জীবনে ?"

"আপনিও করুন না। বাধাটা কিসের ?"—হেসে বললেন কবি।

"অত টাকা কোথায় মশাই ? আমার যদি টাকা থাকত, আমিও নিউগিনি গিয়ে থেকে আসতাম কিছুদিন"

"আপনার টাকা নেই ? বলেন কি ?"

"যা আছে, তা যথেষ্ট নয়। প্যাসিফিকের দ্বীপগুলোতে ঘুরে বেড়াতে গেলে নিজের ছোটখাট একটা জাহাজ থাকা দরকার। আমি একা তো যেতে পারব না। রত্নাকে চাই। তা ছাড়া আরও লোকজন চাই। ভাল একজন ফোটোগ্রাফার চাই। দোভাষীও দরকার প্রতি পদে। খরচ অনেক"

"কিন্তু আপনার তো আয়ও অনেক শুনেছি"

"খরচ নেই? চারটে স্কুলের সমস্ত খরচ দিতে হয়। প্রত্যেক জায়গায় কাছারি কাছে, কর্মচারী আছে। আমার মায়ের নামে একটা হাসপাতাল করিয়ে দিতে হবে, তাতেই দশ-বারো লক্ষ টাকা বেরিয়ে যাবে। জগুচকের প্রজারা ধরেছে, তাদের জমিতে বাঁধ দিয়ে একটা লকগেট ক'রে দিতে, প্রতি বছর বানে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ক'রে দিতেই হবে। পাখির পিছনে খুব বেশি টাকা খরচ করব কোথা থেকে? এখানে যা ফেঁদেছি, তাতেই লাখখানেক বেরিয়ে যাবে। এইটেই অপব্যয় মনে হচ্ছে"

বৈজ্ঞানিকের মুখে অপ্রতিভ হাসি ফুটে উঠল একটা। তারপর সে ভাবটাকে চাপা দেবার জন্যে একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন তাড়াতাড়ি।

"এই বইটাও আপনি পড়বেন আনন্দবাবু,—Hunters and the Hunted, বিশেষত পাখির অধ্যায়টা। আপনার কল্পনারও অনেক খোরাক আছে ওতে"

"বেশ, রেখে যান"

১৮

চরের দৃশ্য জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ হয়ে উঠেছিল। রৌদ্রালোকে দিবা দ্বিপ্রহরে যা ছিল অসহ্য, জ্যোৎস্নালোকে রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাই হয়ে উঠেছে মনোরম। এও অসহ্য মনে হচ্ছিল সন্ন্যাসীর একটা বালুস্তূপের উপর ব'সে ব'সে তিনি ভাবছিলেন, অনুভূতির এ বিকার কবে অবলুপ্ত হবে? চক্রবালরেখালগ্ন বৃক্ষশ্রেণীর রূপ বদলে গেছে, সবুজের লেশমাত্র নেই, সব কালো। নদীতীরের হেলে-পড়া গাছটাকে মনে হচ্ছে, একটা বিরাট সরীসৃপ যেন মাথা তুলেছে নদী থেকে। বীভৎস নয়, অদ্ভুত। অদ্ভুত ব'লেই কিন্তু খারাপ লাগছে সন্ন্যাসীর। অন্য কোনও কারণে নয়, এ অনুভূতির মধ্যে নিজের অপূর্ণতার প্রমাণ আছে ব'লে। যা অপ্রত্যাশিত, তাই অদ্ভুত। এ ব্যাপারটাকে অপ্রত্যাশিত কেন মনে হচ্ছে তাঁর? নিত্যপরিবর্তনশীল বহির্লীলার অন্তরালে যিনি শাশ্বত অক্ষর, তিনি তো অপ্রত্যাশিত নন, তাঁকে চিনতে বার বা ভুল হচ্ছে কেন? চোখ বুজে ব'সে রইলেন সন্ন্যাসী। মনে মনে বলতে লাগলেন, হে নিগূঢ়, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষলোকে অসংখ্য তোমার রূপ—কখনও ভীষণ, কখনও সুন্দর; অসংখ্য তোমার ভাষা—কখনও সরব, কখনও নীরব; অসংখ্য তোমার নির্দেশ—কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট; অসংখ্য তোমার আশ্বাস—কখনও সহজ কখনও দুরূহ। তুমিই প্রলোভন, তুমিই সংযম। ভোগে তোমার আনন্দ, ত্যাগেও তোমার আনন্দ। রৌদ্রে জ্যোৎস্নায় সবুজে কালোতে, পাপে পুণ্যে তুমিই ওতপ্রোত। কল্পনায় যা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে তা প্রতিভাত হচ্ছে না কেন? চোখ বুজে ব'সে রইলেন অনেকক্ষণ, দৃষ্টি প্রেরণ অন্তরের অন্তস্তলে, কল্পনাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে দেখতে চেষ্টা করলেন।

···টিহি—টিট্টিহি—টিট্টিহি। টিট্টিভ পাখিটা ডাকতে ডাকতে উড়ে চ'লে গেল। দূর থেকে শোনা যেতে লাগল কেবল—টিটি, টিটি, টিটি। সন্ন্যাসীর ধ্যানলোকেও পৌঁছল সে ডাক ঈষৎ রূপান্তরিত হয়ে, এবং রূপান্তরিত হ'ল ব'লে ধ্যানের একাগ্রতাও নষ্ট হ'ল। তিনি শুনতে লাগলেন—চিঠি, চিঠি, চিঠি। ভিন্ন খাতে বইল চিন্তাধারা, মানসপটে মায়ের মুখখানা ফুটে উঠল। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন, তাঁর দিকে ফিরে বলছেন—বাক্সর তলায় চিঠিখানা আছে, প'ড়ে দেখিস বাবা। ওতেই লেখা আছে সব কথা। বাক্সর তলা থেকে চিঠিখানা বার ক'রে নিয়েছেন তিনি। পড়েওছেন। কিন্তু···। বাবার মুখখানা মনে পড়ল। চোখ দুটো নির্নিমেষে যেন চেয়ে আছে তাঁর দিকে। পাঞ্জাবে চাকরি করতে করতে হঠাৎ তিনি যোগ দিয়েছিলেন সেকালের স্বদেশী-আন্দোলনে। দীক্ষিত হয়েছিলেন অগ্নি-মন্ত্রে। সন্ন্যাসী যদিও রিভল্‌ভার হাতে তাঁকে দেখেন নি কোনদিন, তবু যখনই তাঁকে মনে পড়ে তখনই একটা বিশেষ ছবি ফুটে ওঠে। অন্ধকার রাত্রে তিনি যেন একা হেঁটে চলেছেন বিরাট এক প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে। বলিষ্ঠ দক্ষিণ মুষ্টিতে ধ'রে আছেন পিস্তল। নির্জন প্রান্তর—বন্ধুর, উপলাকীর্ণ। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চলেছেন তিনি।···মনে হয়, আজও চলেছেন যেন। আর তিনি ফিরে আসেন নি। অর্থাভাবে দেশের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি ক'রে ফেলেন মা। গঙ্গার ধারের ওই প'ড়ো ঘরটাই নাকি বিক্রি করেন নি কেবল। অমরেশবাবু কি জানেন এ কথা?—সহসা মনে হ'ল সন্ন্যাসীর। মা যাঁকে সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন, তিনি আবার সেটা বিক্রি করেছিলেন আর একজনকে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে অমরেশবাবুর শ্বশুর কিনেছিলেন। অমরেশবাবুর শ্বশুরও বেঁচে নেই। সুতরাং গঙ্গার ধারের ওই প'ড়ো বাড়িটার প্রকৃত মালিক কে—এ কথা অমরেশবাবু হয়তো জানেনই না। জানাবার প্রবৃত্তিও নেই সন্ন্যাসীর। বাবার মুখটা আবার

জেগে উঠল মনে। মনে হ'ল, অন্ধকারে চলতে চলতে হঠাৎ যেন তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। পিতার পথ চেয়ে কত দিন যে কেটেছে তাঁদের! শোকে দুঃখে মা মারা গেলেন অবশেষে। তারপর এলেন সাধু অলখবাবা। তিনি বলেছিলেন, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধেই তো সমস্ত মানবজাতির অভিযান। কিন্তু সর্বাগ্রে ঠিক করা চাই, কি অসত্য, কোন্‌টা অন্যায়? যা সৎ নয়, তাই অসৎ, তাই অসত্য। যা অসত্য, তাই অন্যায়, তাই অযৌক্তিক। যা সৎ তাই চিৎ, তাই আনন্দ, তাই আমি। এই আমিকেই আবিষ্কার করতে হবে আগে, এই আবিষ্কারের পরিপন্থী যা কিছু, তার বিরুদ্ধেই করতে হবে সংগ্রাম। এই আমির সন্ধানেই তো কাটল অনেক দিন। কত তীর্থে, কত মন্দিরে, কত আশ্রমে, কত আখড়ায়!

টিট্রিহি—টিট্রিহি—টিট্রিহি।

টিট্রিভের ডাক শোনা গেল আবার। আবার চিঠিখানার কথা মনে পড়ল। ওই চিঠিখানাই তাঁকে টেনে এনেছে এখানে। এখনও কিন্তু করা হয় নি কিছু। মাঝে মাঝে মনে হয়, কি হবে হাঙ্গামা ক'রে? যেমন আছে থাক্ না। তাঁর নিজের তো কোনও প্রয়োজন নেই। চিন্তাটা কিন্তু নিঃশেষে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না কিছুতে। অদৃশ্য কাঁটার মত কেবলই যেন খচখচ করছে। মনে হচ্ছে, তাঁর নিজের প্রয়োজন নেই সত্য, শুধু যে প্রয়োজন নেই তা নয়, ও একটা জঞ্জাল, বাধা; কিন্তু তাঁর এই মনোভাব তো নির্বিকার মনোভাব নয়। কোন কিছুকেই বাধা ব'লে মনে হবে কেন? তা ছাড়া এটাও তো ঠিক যে, তাঁর হয়তো কাজে লাগবে না, কিন্তু অপরের কাজে লাগতে পারে। এটাও ঠিক যে, অযোগ্য লোকের হাতে পড়লে অকাজেও লাগতে পারে। হঠাৎ কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলেন তিনি। মনে হ'ল, একটা জালে যেন আটকে গেছেন। না, এসব চিন্তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া

হবে না। আবার চোখ বুঝলেন। অন্তরের অন্তস্তলে প্রেরণ করলেন দৃষ্টি। দূরে দূরে বহুদূরে গোপন সত্তার গভীরে চ'লে গেল মন, অবলুপ্ত হয়ে গেল বাহ্য জগৎ, নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন তিনি।

সন্ন্যাসী যখন চোখ খুললেন, চন্দ্র তখন পশ্চিম-গগনে ঢ'লে পড়েছে, পূর্বাকাশে উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। প্রভাতের বেশি বিলম্ব নেই আর। উঠে পড়লেন তিনি। উঠতেই টিট্রিহি-টিট্রিহি শব্দ ক'রে কয়েকটা টিট্রিভ কলরব ক'রে উড়ল। কাছেই তারা একটা বালুস্তূপের আড়ালে ব'সে ছিল, সন্ন্যাসী দেখতে পান নি। সন্ন্যাসী বালির চড়া ভেঙে নদীর ধারে এলেন, তারপর বাঁশের সঙ্কীর্ণ সাঁকোর সাহায্যে নদী পার হয়ে নিজের আস্তানার দিকে এগিয়ে গেলেন। তখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে বহির্জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হন নি, অন্তরের যে জ্যোতির্ময় লোকে এতক্ষণ তিনি বিহার করছিলেন, তারই প্রভায় তখনও তাঁর মন আবিষ্ট হয়ে ছিল। তাই তিনি লক্ষ্য করলেন না যে, তাঁর ঘরের কপাটটা খোলা রয়েছে। কপাট অবশ্য খুবই জীর্ণ, তবু তাতে শিকল ছিল, যাবার সময় রোজই তিনি শিকলটা তুলে দিয়ে যান, আজও গিয়েছিলেন। কপাট খোলা কেন ?—এ প্রশ্ন তাঁর মনে যদিও জাগল না, কিন্তু ঘরে ঢুকে তিনি বিস্মিত হলেন। ঘরের এক কোণে অন্ধকারে কে যেন ব'সে রয়েছে!

"কে ?"

"আমি, ডানা"

"তুমি এ সময়ে এখানে কেন ?"—রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী।

"ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি"

"ভয় ? কিসের ভয় ?"

ভয়টা যে কিসের, তা ডানা সোজাসুজি বলতে পারলে না। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বললে, "বলছি, বসুন"

আসনটা পেতে সন্ন্যাসী বসলেন। ভগ্ন বাতায়নপথে এক ফালি জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুকেছিল, সেই জ্যোৎস্নালোকে ডানার আনত মুখখানি দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল, এই ধরনের একখানি মুখ কোন এক মন্দিরের গাত্রে তিনি যেন চিত্রিত দেখেছিলেন। ভীত সঙ্কুচিত, কিন্তু একাগ্র। দেবতার কাছে বক্তব্যটা নিবেদন করতে বাধছে কিন্তু তাই ব'লে নিবেদন করবার আগ্রহটা কম নয়—এই ভাবটা ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী।

কি বলবে, তা ডানাও সত্যি ভেবে পাচ্ছিল না। নিজের আচরণে নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিল সে। যে ঔদাসীন্যের বর্মে নিজেকে আবৃত ক'রে, রূপচাঁদের প্রণয়-অভিযানকে ব্যাহত করবে সে ভেবেছিল, কার্যকালে তা কোনও কাজেই লাগল না। রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসতে হ'ল। পালিয়ে আসার লজ্জাটাই সবচেয়ে পীড়া দিচ্ছিল তাকে। নিজের দুর্বলতার এত বড় অকাট্য প্রমাণ তার জীবনে আর কখনও এমন নিদারুণভাবে প্রকট হয়ে ওঠে নি।

সন্ন্যাসী নীরবে চেয়ে ছিলেন তার দিকে। নীরবতাটাই যেন প্রশ্ন করছিল, চুপ ক'রে আছ কেন, কি বলবে, ব'ল?

বলতেই হ'ল শেষকালে।

"রাতদুপুরে রূপচাঁদবাবু হঠাৎ এসেছিলেন আমার ঘরে"

"কেন?"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে ডানা বললে, "কি জানি!"

"জান নিশ্চয়, তা না হ'লে পালিয়ে এলে কেন?"

ডানা নতমস্তকে ব'সে রইল চুপ ক'রে।

সন্ন্যাসী বললেন, "অন্যায় করেছ। নিজেকে বুঝতে পার নি। তুমি অভয়, তুমি ভয় পাবে কেন ?"

কথাটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য ডানা বুঝতে পারলে না। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললে, "ভয় করল যে"

"তার মানেই—নিজেকে বুঝতে পার নি। দাঁড়াও, আলোটা জ্বালি"

ঘরের কোণে ছোট একটা ডিপে ছিল, সেইটে জ্বেলে ফেললেন তিনি। জ্বেলেই দেখতে পেলেন, ডানার পাশে কাগজের ঠোঙায় লাল লাল আপেল রয়েছে কয়েকটা।

"ওগুলো এনেছ কেন ?"

"আমার জন্যে রূপচাঁদবাবু এনেছিলেন এগুলো। আমি আপনাকে দেবার ছুতো ক'রে পালিয়ে এসেছি তাঁর কাছ থেকে"

সন্ন্যাসী আবার গিয়ে বসলেন। হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "ভয় পেয়ে পালিয়ে আসার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব নেই কিন্তু"

"পাপকেও ভয় করব না ?"

"ভয় করবে কেন ? জয় করবে। পালিয়ে এলে তো তার কাছেই নতি-স্বীকার করা হ'ল"

"আপনি নিজেও কি পলাতক নন ? সংসার থেকে আপনিও তো পালিয়ে এসেছেন"

কথাগুলো ব'লেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল ডানা। সন্ন্যাসীকে কটু কথা বলতে সে আসে নি। আহত আত্মসম্মানের জ্বালায় কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে। সন্ন্যাসীর উত্তর শুনে কিন্তু আরও অপ্রতিভ হ'ল সে।

"আমি যে খুব একটা মহৎ ব্যক্তি—একথা তো তোমাকে বলি নি কোনদিন। আমিও তোমারই মত দুর্বল। ঠিকই ধরেছ তুমি, আমিও পলাতক। কিন্তু অনেকদিন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি কিনা,

তাই কথাটা ভাল ক'রে বুঝেছি যে, পালিয়ে কোনও লাভ হয় না। কারণ, ভয়ের হেতু বাইরে কোথাও নেই, আছে আমাদেরই ভিতরে, আমাদেরই বোঝবার ভুলে। পাপ বা পুণ্য, ভীষণ বা সুন্দর, ভাল বা মন্দ আমাদের নিজেদেরই অজ্ঞতার সৃষ্টি। সংস্কারবশে আমরা নিজেরাই নানা রঙে রঙিন ক'রে দেখি সব জিনিসকে। আলকাতরা মাখিয়ে কাউকে করি কালো, আবার কুঙ্কুম মাখিয়ে কাউকে করি লাল। আবার নিজের সৃষ্টি কালোকে দেখে নিজেরাই শিউরে উঠি, লালকে দেখে নিজেরাই মুগ্ধ হই। আসলে কেউ লালও নয়, কেউ কালোও নয়—"

ডানা হেসে বললে, "আসলে কে যে কি, তা জানি না। কিন্তু রূপচাঁদবাবুর উদ্দেশ্যটা এত স্পষ্ট মনে হ'ল যে—"

সন্ন্যাসী হেসে প্রশ্ন করলেন, "মনে হ'ল, তার কারণ, রূপচাঁদের উদ্দেশ্য তোমার মনকে প্রভাবিত করেছে। শুধু প্রভাবিত করে নি, আতঙ্কিতও করেছে। আতঙ্ক আকাঙ্ক্ষারই আর একটা রূপ। যে লালসা রূপচাঁদবাবুর মনে জেগেছে, তা তোমার মনেও সাড়া তুলেছে। কিন্তু যেহেতু তোমার সংস্কারের সঙ্গে এই সাড়ার বিরোধ আছে, তাই তুমি ভয় পেয়েছ, মিল থাকলে খুশি হতে। ভয় না পেয়ে খুশি হ'লেও খুব যে বেশি একটা অপরাধ হ'ত, তা মনে করি না। ভয়, খুশি—দুইই মনের বিকার। ভয় পেয়ে তুমি বরং রূপচাঁদবাবুকে আরও বেশি প্রশ্রয় দিয়েছ"

কথাগুলো শুনে ডানা বিস্মিত হ'ল।

"আমার তা হ'লে রূপচাঁদবাবুর কাছে থাকাই উচিত ছিল বলছেন?"

"যা বললাম তত্ত্ব হিসাবে সেটা সত্যিই যদি উপলব্ধি করতে, তা হ'লে নিজেই বুঝতে পারতে সেটা, কারও উপদেশের দরকার হ'ত না। এই আপেলগুলোতে দাঁত বসিয়ে যখন রসাস্বাদন কর কিংবা কোনও তৃষিতকে জলদান ক'রে যখন তৃপ্তি লাভ কর, তখন যেমন

দ্বিধা বা সঙ্কোচ হয় না, এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তেমনই সহজভাবে নিতে পারতে। নির্বিকার নও ব'লেই গোল বেধেছে। সংস্কারের তুলো দিয়ে কান বন্ধ করেছ ব'লেই মহাসঙ্গীতের ঐক্যতান শুনতে পাচ্ছ না। অসম্পূর্ণ শোনার ফলে বেসুরো লাগছে, কোনটা খারাপ কোনটা ভাল মনে হচ্ছে—"

"কাম ক্রোধ কি খারাপ নয় তা হ'লে?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে ডানা।

"আগেই তো বললাম, নির্বিকার চিত্তে খারাপ ভাল কিছু নেই। আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত। সকলেই আনন্দ চায়, নানা ভাবে সবাই সেটা পেতে চাইছে। সাধারণ লোকের বাইরের জীবনটাকে যদি বাঁশী বলি, তা হ'লে কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতিকে সেই বাঁশীর ছিদ্র বলা যেতে পারে। অধিকাংশ লোকই আনন্দ পাবার আশাতেই নানা সুর আলাপ করছে ওতে। সাধারণ বাঁশীতে গোটা কয়েক মাত্র ছিদ্র থাকে, মহাজীবনের বাঁশীতে কিন্তু অসংখ্য ছিদ্র, অসংখ্য রাগরাগিণীর আলাপ চলে তাতে। চলছেও। ওর কোনটাকে ভাল, কোনটাকে মন্দ বলার অর্থ হয় না। নিজেদের রুচিভেদে সাধনভেদে আমরা ভাল খারাপ ভাগ ক'রে নিয়েছি কেবল। আসলে ভাল খারাপ কিছু নেই"

"শাস্ত্রে কিন্তু কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে রিপু বলেছে। নিশ্চয়ই এর কারণ আছে একটা"

ডানার বিস্ময় কেটে গিয়েছিল ব'লেই হোক কিংবা বিস্ময়ের সংঘাতে হোক, তর্ক করবার প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সহসা।

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "শাস্ত্রও সংস্কার-মুগ্ধ মানুষেরই তৈরি। সংস্কারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রও বদলেছে যুগে যুগে। তা ছাড়া ওদের রিপু বলবার কারণ একটা আছে বইকি। তুমি গান-বাজনা করেছ কখনও?"

"কিছু কিছু করেছি। সেতার বাজিয়েছিলাম কিছুদিন"

"গানের উপমা দিয়েই বলি তা হ'লে। ওড়ব জাতীয় বৃন্দাবনী সারঙ্গে গান্ধার এবং ধৈবত লাগে না। গান্ধার এবং ধৈবত বৃন্দাবনী সারঙ্গের পক্ষে রিপু। তেমনই আধ্যাত্মিক সাধনার পথে কাম-ক্রোধেরাও রিপু"

ডানা হেসে বললে, "আধ্যাত্মিক উন্নতিই তো মানব-জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত"

"তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার পথও অনেক এবং অনেক সময় পরস্পর-বিরোধীও। শুনেছি, সহজিয়া মতে পঞ্চকাম উপভোগই সাধনার পথ। কাম উপভোগ ক'রে ক'রেই তাঁরা নিষ্কাম হতে চান"

"কি রকম ?"

"তাঁরা বলেন যে, আসক্তি আমাদের বদ্ধ করে, তা-ই আমাদের আবার মুক্তিও দেয়। তাঁদের কথা, 'রাগেণ বধ্যতে লোকে রাগেণৈব বিমুচ্যতে'। রবীন্দ্রনাথও তো বলেছেন, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'। বন্ধন মানেই—বাসনার বন্ধন। সুতরাং বাসনা-কামনা খুব অবহেলার জিনিস নয়। সবই নির্ভর করছে তোমার মনের উপর, তোমার চাওয়ার আন্তরিকতার উপর"

সন্ন্যাসী চুপ করলেন। গভীর নীরবতা ঘনিয়ে এল একটা। ডানা নতমুখে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইল। ধীরে ধীরে তারপর তার মনে যে প্রশ্নটা জাগল তা এতই অদ্ভুত যে, কথায় সেটা প্রকাশ করা উচিত কি না তা ঠিক করতেই আরও খানিকক্ষণ গেল। প্রকাশ করাই ঠিক করলে সে শেষ পর্যন্ত। তার কৌতূহলী নারীপ্রকৃতি এই সন্ন্যাসীটিকে যাচিয়ে নেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে মৃদু হেসে বললে, "মনে করুন, আন্তরিকভাবে আপনাকেই যদি চাই, পাব ?"

সন্ন্যাসী শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এত ছোট জিনিস চাইবে তুমি ?"

"আমার কাছে তো আপনি ছোট নন"

সন্ন্যাসী স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

"বলুন, পাব ?"

"তা আমি কি ক'রে বলব ? তোমার আন্তরিকতার উপর নির্ভর করবে তা। পেলে কি না তাও নিজেই বুঝতে পারবে"

"আন্তরিকতার পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হই, তা হ'লে সম্পূর্ণরূপে পাব তো ?"

"পাবে ব'লেই তো মনে হয়"

"আপনার দেহটাকে যদি ভোগের সামগ্রী ক'রে তুলি, তা হ'লেও আপনি আপত্তি করবেন না ?"

"সম্পূর্ণরূপে আমাকে যদি পাও, তা হ'লে আমার এই ভঙ্গুর দেহটা তুচ্ছ হয়ে যাবে তোমার কাছে। আর এই তুচ্ছ জিনিসটা নিয়ে যদি তুমি উন্মত্ত হতে চাও ক্ষণিকের আনন্দে, তা হ'লেও আমি আপত্তি করব না, এখনই আমার ওই গায়ের কাপড়টা নিয়ে যদি গায়ে জড়াতে চাও তাতেও যেন আপত্তি করব না"

সন্ন্যাসী হাসতেই ডানাও হেসে উঠল। বেশ একটু জোরেই হেসে উঠল। মেঘটা কেটে গেল।

"তর্ক ক'রে আপনার সঙ্গে পারবার জো নেই দেখছি। বাজে কথা থাক্, আপনার মতটা কি, তাই বলুন ?"

"সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবে তো ?"

"নিশ্চয়"

"আমি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি নি। আমি সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি শুধু"

"কি সন্ধান করছেন ?"

"উপলব্ধিকে। আমি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি—আমি

কে, এই বাইরের জগৎটা স্বপ্ন কি না, এই স্বপ্ন-জগতের ভালমন্দ পাপপুণ্য স্বপ্নেরই মত অলীক কি না?"

"সত্যিই যদি সে উপলব্ধি হয় আপনার, তাতে লাভটা কি হবে?"

"পরমানন্দ। যেসব সুখ দুঃখ প্রতি মুহূর্তে কম্পিত করছে মনকে, হঠাৎ যদি উপলব্ধি করি সেসব অলীক, তা হ'লেই তো দুঃস্বপ্নটা ভেঙে যাবে, মুক্তি পাব"

সন্ন্যাসী চুপ করলেন। ডানাও চুপ ক'রে রইল। শেষরাত্রির আলো-আঁধারিতে আবার একটা নিবিড় নীরবতা ঘনিয়ে এল কিছু-ক্ষণের জন্য। ডানাই কথা বললে একটু পরে।

"আপনি যে পথের পথিক, সে পথের নিয়ম কি? সে পথে কামিনী কাঞ্চন ত্যাজ্য, না, পূজ্য?"

"বিষবৎ ত্যাজ্য। একাগ্র ধ্যানই হচ্ছে আমার পথ। সংযমের পথ থেকে একচুল বিচলিত হ'লেই আমার পতন। তাই সংসার থেকে আমি পলাতক। দুর্বল ব'লেই পলাতক। রাজর্ষি জনকের মত মনের জোর আমার নেই"

একটা ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর চোখে মুখে। ডানা মুচকি হেসে বললে, "তা হ'লে কোন্ ভরসায় এখনই বলছিলেন যে, আমি যদি চাই আপনি ধরা দেবেন?"

"তোমার অজ্ঞতার ভরসায়। আন্তরিকভাবে চাওয়া যে কাকে বলে, তা তোমার জানা নেই ব'লেই অত সহজে কথাগুলো বলতে পেরেছিলে। কায়মনোবাক্যে চাওয়াটা নিতান্ত সহজ নয়"

ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, "আমি এখন কোন্ পথে যাব, তাই ব'লে দিন"

"সেটা তোমাকে নিজেই খুঁজে বার করতে হবে। আমার বিশ্বাস, কেউ তা কাউকে ব'লে দিতে পারে না। অন্তত আমি পারব না"

"আধ্যাত্মিক পথের কথা বলছি না, রূপচাঁদবাবুর হাত থেকে কি ক'রে পরিত্রাণ পাই, বলুন ?"

"তার উপায়ও তোমাকেই বার করতে হবে। একটি কথা শুধু বলতে পারি—পালিয়ে যাওয়া তার উপায় নয়। রূপচাঁদ জাতীয় লোকদের অভাব নেই পৃথিবীতে। এক রূপচাঁদের কবল থেকে পালিয়ে গেলেও আর এক রূপচাঁদের কবলে পড়তে হবে। নিজের চরিত্রকে নিজের মনকে বর্মাবৃত করা ছাড়া উপায় নেই, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছি"

"আমার চরিত্রে বা মনে কোনও দুর্বলতা নেই। কিন্তু ধরুন, তিনি যদি জোর ক'রে আমার গায়ে হাত দেন, কিংবা—"

"তাতেও কিছু এসে যায় না, তোমার মন যদি ঠিক থাকে"

"খুব এসে যায়, আপনি পুরুষমানুষ তাই বুঝতে পারছেন না। পরপুরুষের অবাঞ্ছিত স্পর্শের চেয়ে গ্লানিকর আর কিছু নেই আমাদের জীবনে"

"তা জানি। কিন্তু এও জানি, ওর প্রতিকার তোমারই হাতে"

"আমার যদি প্রচুর অর্থ থাকত, তা হ'লে আমি প্রতিকার করতে পারতাম। এমন একদিন ছিল, যখন বন্দুকধারী দরোয়ান আমাদের গেটে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিত। কিন্তু সে সামর্থ্য আমার নেই আপাতত"

"তোমার চাকরটা নেই ?"

"ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। ওই জীর্ণ শীর্ণ ছোঁড়াটা থাকলেও যে কিছু করতে পারত, তা মনে হয় না"

"টাকা পেলেই তোমার সমস্যার সমাধান হবে মনে কর ?"

"তা তো হবেই। কিন্তু অত টাকাই বা পাই কোথায় বলুন ? আমি বলছিলাম, আপনি যে কদিন এখানে আছেন, আমার বাড়ির একটা ঘরে গিয়ে যদি থাকেন—"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, "না, তা হয় না।

আমি একা থাকতে চাই। কারও সান্নিধ্য আমার সাধনার পক্ষে অনুকূল নয়”

হঠাৎ একযোগে কলরব ক'রে উঠল পক্ষীকুল। সন্ন্যাসী দ্বারের দিকে ফিরে দেখলেন, পূর্বাকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

“সকাল হয়ে গেল নাকি ?”—ডানা সবিস্ময়ে বললে।

“হ্যাঁ, এইবার যাও তুমি”

“আপনিও একটু চলুন আমার সঙ্গে”

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে খানিকক্ষণ।

তারপর বললেন, “বেশ, চল”

বাসায় পৌঁছে ডানা ভিতরে ঢুকে গেল, সন্ন্যাসী বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডানা ভিতরে গিয়ে দেখলে, কেউ নেই। বেরিয়ে এসে বললে, “চ'লে গেছেন”

“আমিও যাই তা হ'লে”

সন্ন্যাসী চ'লে গেলেন।

ডানা আবার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই রূপচাঁদের ছোট চিঠিটা দেখতে পেলে এবার। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে পড়তে লাগল।

কল্যাণীয়াসু,

ভীতি উৎপাদন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ভয় পেলে দেখে কিন্তু খুশি হয়েছি। নির্ভয় হওয়ার আগে ভয়ই তো থাকে। চললাম—

আর. সি.

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রেই চেয়ে রইল খানিকক্ষণ কাগজের টুকরোটার দিকে। তারপর কুঁচিকুঁচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলে সেটা।

১৯

রূপচাঁদও ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন মনে মনে। নিজের ব্যর্থতার লজ্জায় তিনি ম'রে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু সে লজ্জাটা স্বীকার করতে চাইছিলেন না নিজের কাছেও। নিজের অক্ষমতা নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধছিল তাঁর। তিনি ভাবছিলেন, ও কিছু নয়, ও রকম হয়েই থাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে। নূতন রকম কৌশল করতে হবে আর একটা। যে পাশ্চাত্য শিক্ষার কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন তিনি, যার মূল লক্ষ্য ঐহিক সুখ, সেই সুখলাভের বিবিধ প্রচেষ্টা যে শিক্ষাকে বহুমুখী করেছে, তারই মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি ভাবছিলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা অহঙ্কৃত ধারণা থাকাতে অন্য রকম কিছু ভাবতে পারছিলেন না। যে স্থূল বাস্তব-বিজ্ঞান-মোহ মদদৃপ্ত করেছিল বিস্‌মার্ক-হিটলারকে, উদ্বুদ্ধ করেছিল নীট্‌শের দর্শন, তা রূপচাঁদকেও যুক্তি যোগাচ্ছিল। ডারবিনের ভক্ত রূপচাঁদও ভাবছিলেন, ছলে বলে কৌশলে জয়লাভ করাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এবং সে ছল বল কৌশল যথাসময় যথাস্থানে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। নিজের সঙ্গেই তর্ক করছিলেন তিনি। বার বার সেই পুরাতন কথাটাই আবৃত্তি করছিলেন—জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করবার চেষ্টা করাই জীবের একমাত্র ধর্ম। সঙ্কোচ, লজ্জা, দয়া, ক্ষমা, উদারতা, অহিংসা প্রভৃতির স্থান মানবজীবনে নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, ও-গুলো মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়। ও-গুলোও অস্ত্র। বহুরূপী গিরগিটি যেমন প্রয়োজন অনুসারে গায়ের রঙ বদলাতে পারে, অনন্তরূপী মানুষও তেমনই প্রয়োজন অনুসারে মহৎ, লাজুক, পরোপকারী, অহিংস সাজতে পারে। কখনও সে জ্ঞাতসারে সাজে, কখনও অজ্ঞাতসারে। কিন্তু লক্ষ্য ঠিক থাকা চাই। জয়লাভ করাই লক্ষ্য। আধ্যাত্মিকতার ধোঁয়ায় বা কবিত্বের কুয়াশায়

লক্ষ্যটাকেই হারিয়ে ফেলে যারা, তারা ওই সন্ন্যাসীর মত কৃচ্ছ্রসাধন বা আনন্দমোহনের মত কবিতা লিখেই মরে খালি। ওই রোগা সন্ন্যাসী বা পানসে আনন্দমোহনকে ভয় নেই রূপচাঁদের। ওই সন্ন্যাসী যদি বিবেকানন্দের মত পুরুষসিংহ হতেন কিংবা আনন্দমোহন যদি উদ্দাম বায়রন হতেন, তা হ'লে ভয়ের কারণ ছিল। ছন্দের আর ভাবের ফুলঝুরি কাটলে নারীর মন পাওয়া যায় না। রূপচাঁদের ধারণা, ওমরখৈয়াম আর হাফেজ সারাজীবন কেবল প্যানপ্যান ক'রেই মরেছে, সাকীকে পায় নি। নারী আত্মসমর্পণ করে পৌরুষের পদপ্রান্তে—তা তিনি শিবই হোন, বিবেকানন্দই হোন, বায়রনই হোন বা চেঙ্গিস খাঁই হোন। আমি কি? হঠাৎ মনে হ'ল রূপচাঁদের। এই জৈবিক জীবনদর্শনের নিকট তাঁর মূল্য কতটুকু? পৌরুষের কোন্ পরিচয় দিয়ে ডানাকে তিনি মুগ্ধ করবেন? ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। উত্তরটা ঠিক যোগাল না। মনে হতে লাগল, ডানার মনের প্রবণতা যে কোন্ দিকে, তা এখনও আবিষ্কার করতে পারেন নি তিনি ঠিক। অর্থের প্রতি সব নারীরই (নরেরও) স্বাভাবিক লোভ আছে একটা, ডানার কি নেই? হঠাৎ মনে হ'ল, টাকার কুমীর অমরেশটা চ'লে যাওয়াতে সুবিধাই হয়েছে। হয়েছে কি? ডানা ওর সঙ্গে গেল না কেন? টাকার প্রতি লোভ থাকলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। টাকার প্রতি লোভ নেই হয়তো। হয়তো ও ব্যতিক্রম। রূপ চায় হয়তো, হয়তো যশ, কিংবা প্রতিপত্তি, কিংবা—না, ঠিক বোঝা যায় নি এখনও, ঘনিষ্ঠতর পরিচয় না হ'লে বোঝাও যাবে না।···ডানার সুন্দর মুখখানা ধীরে ধীরে ফুটে উঠল মনে। যে রূপের স্বপ্নে তন্ময় হয়ে টিশিয়ান ভেনাসের ছবি এঁকেছিলেন, তাজমহলের কল্পনা করেছিলেন শাহজাহান, কবিতা লিখেছিলেন কালিদাস, যে অজানার আকর্ষণে সমুদ্রে তরী ভাসিয়েছিলেন কলম্বাস, হিমালয় অভিযান করেছিলেন ইয়ং-হাজ্ব্যাণ্ড (Younghusband),

যে রূপ অজস্র ভঙ্গীতে সহস্র লীলায় ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত হচ্ছে প্রকৃতির অরণ্যে-পর্বতে, সমুদ্রে-আকাশে, নদীতে-নির্ঝরে, মরুতে-মরীচিকায়, জীবনের বিচিত্র বিকাশে যে রূপ ছন্দিত স্পন্দিত আনন্দিত, সেই রূপের স্বপ্নে রূপচাঁদও তন্ময় হয়ে গেলেন চার্বাকীয় নিষ্ঠাসহকারে। তাঁর ক্ষুধিত মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুলোকেই সুধার সন্ধান করতে লাগল। অতীন্দ্রিয় লোকের কথা তিনি শুনেছেন বটে, কিন্তু আস্থা নেই তাঁর অরূপ কোনও কিছুর উপরই, এমন কি অরূপরতনের উপরও না। যা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, বোঝা যায় তিনি জানেন, তাই এখনও ধরা হয় নি, ছোঁয়া হয় নি, বোঝা যায় নি। সেইটেকেই আয়ত্তের মধ্যে আনবার তপস্যা করতে হবে আগে। তপস্যা মানে যোগ্যতা অর্জন। হবে কি তা? হতেই হবে। যখন হবে···। বাসনার আকাশে রূপচাঁদের মন পাখা মেলে উড়তে লাগল। পাশে বকুলবালা শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন। ছোট ছেলের মত নাকও ডাকছিল তাঁর। রূপচাঁদ পাশ ফিরতেই তাঁর ঘুমটা ঈষৎ ভেঙে গেল যদিও, কিন্তু রূপচাঁদকে জড়িয়ে ধ'রে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমন্ত পত্নীর বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে অদ্ভুত একটা আরাম অনুভব করলেন রূপচাঁদ। তবু কিন্তু ডানার স্বপ্নেই আবিষ্ট হয়ে রইল তাঁর মন। বস্তুর ক্ষুধাও অল্পে তুষ্ট হয় না, বস্তুজগতেও সে ভূমাকে ধরতে চায় আকাঙ্ক্ষার জাল পেতে।

২০

অমরেশবাবু সস্ত্রীক চ'লে গেছেন। কবি একা নিজের ঘরটিতে ব'সে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন। একটু আগেই তিনি একটা পাখির বই প'ড়ে শেষ করেছেন। অমরেশবাবুর সাহচর্যে এসে এবং তাঁর দেওয়া বই প'ড়ে প'ড়ে পক্ষীজগৎ সম্বন্ধে তাঁর একটা অকৃত্রিম কৌতূহল জাগছিল ক্রমশ। ডানাকে দেখে যে

কারণে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, এই পাখিদের দেখেও অনেকটা সেই কারণে তিনি মুগ্ধ হচ্ছিলেন। ভাষা ভঙ্গী গতির একটা নবতর সৌন্দর্য মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর কবি-সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করছিল। রিপ্লে (Repley) এবং সিট্ওয়েল (Sitwell) সাহেবের বই দুটো প'ড়ে কাল সারা রাত তিনি বার্ড অব প্যারাডাইসের স্বপ্ন দেখেছেন। ওদের নামকরণ করেছেন—পরম পাখি। ওদের বিচিত্র রূপ, ওদের অদ্ভুত গান, ওদের নৃত্যভঙ্গী, বিশেষ ক'রে ওদের বাসা, বাসার সামনে পরিচ্ছন্ন ছোট উঠোন এবং সেই উঠোনকে ফুল-ফল-পাথর দিয়ে সাজাবার প্রবৃত্তি ওদের যেন ভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ওরা যেন ঠিক পাখি নয়, পক্ষীরূপী কোনও শিল্পী-সম্প্রদায়। মনুষ্য-রূপী পশু থাকা যদি সম্ভব হতে পারে, এই বা অসম্ভব হবে কেন? বইটা মুড়ে রেখে স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি ব'সে ব'সে। নিউগিনিতে ঘন ঝোপে কষ্ট ক'রে তিনিও যেন পরম পক্ষী-দম্পতীর নাচ দেখছিলেন রিপ্লে সাহেবের সঙ্গে ব'সে ব'সে। পুরুষ পাখিটির সমস্ত গা কালো মখমলে মোড়া, মাথার উপর ছোট ত্রিভুজাকৃতি রৌপ্য-ধবল তিলক একটি। সেই তিলকের পিছন থেকে সরু সরু লম্বা তারের মত কয়েকটা চুল চ'লে গেছে পিঠের দিকে। প্রত্যেকটি চুলের আগায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পালকে তৈরি থুপনি ঝুলছে। বুকের উপর ছোট্ট একটি ঢাল বাঁধা আছে যেন। সূর্যালোকে তার থেকে কখনও সবুজ, কখনও তাম্রাভ রঙ ছিটকে পড়ছে। দুলে দুলে নাচছে,—ঠিক যেন মানুষ। তন্ময় হয়ে ব'সে রইলেন কবি। অনেক কাজ আছে তাঁর, তবু ব'সে রইলেন। অমরেশবাবুর পাখীগুলোর তদারক করতে হবে, ডানার কাছে যেতে হবে একবার, মন্দাকিনীর চিঠির জবাব দিতে হবে। বিয়ে-বাড়িতে কি আয়োজন হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে কি রকম যে নাকাল হতে হচ্ছে, তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে দীর্ঘ পত্র লিখেছেন মন্দাকিনী। আনন্দনাড়ুর জন্য নারকেলই পাওয়া যাচ্ছিল না, অনেক কষ্টে অগ্নিমূল্য দিয়ে নাকি যোগাড়

হয়েছে। কলকাতা থেকে যে সব নতুন কাপড় এসেছে তার পাড়গুলো মোটেই ভাল নয়, খোকনের জামার ছিট মোটেই পছন্দ হয় নি অথচ দাম নিয়েছে একটি গাদা, কন্যাপক্ষ নমস্কারী নিয়ে নানা বায়নাক্কা তুলেছে নাকি—এই রকম বহু খবর দিয়েছেন মন্দাকিনী। আনন্দবাবু এবং সুন্দরীর সম্বন্ধে যে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন, সে কথাও বার বার জানিয়েছেন। উভয়ের সম্বন্ধেই বিস্তৃত বিবরণও চেয়েছেন অবিলম্বে। সুন্দরীকে রোজ চরাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না, তার গোবরের যে পাতলা ভাবটা ছিল সেটা গেছে কি না, মৈথিল ঠাকুরটা রান্নাবান্না কেমন করছে, আনন্দবাবুর সর্দি-টর্দি আর হয়েছে কি না—এমনই নানা প্রশ্ন করেছেন মন্দাকিনী। মন্দাকিনীকে একটা উত্তর দিতে হবে, আজই দেওয়া উচিত, মনে হচ্ছিল কবির। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছিল না তাঁর। ঘন নীল আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেই ভাল লাগছিল। দূরে কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে, গাছে ফুলও ধরেছে। নীল আকাশের পটভূমিকায় খানিকটা সবুজ, খানিকটা হলদে, সকালের রোদ এসে পড়েছে তাদের উপর, এবং সমস্তটার উপর ফুটে উঠেছে পরম পাখির স্বপ্নটা। এমন একটা সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না কিছুতেই। এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল। বুলবুলির সাড়া পাওয়া গেল। বাগানে ঝোপের মধ্যে টুর টুর টুরু টুরু কুড়ুক কুড়ু শব্দ পেয়েই কবি বুঝলেন, বুলবুলি এসেছে। কদিন থেকেই আসছে ওরা ওই ঝোপটায়। ওদের নিয়ে কবিতা লেখবারও চেষ্টা করেছিলেন, কবিতা কিন্তু শেষ হয় নি। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে খাতাটা তুলে নিলেন।

ওরে, তোরা চুপ কর্
খোকা বুঝি হেসেছে
বাতাসেতে ফুট তুলে
কার সুর ভেসেছে

ও মা, না তো, আতাবনে
বুলবুলি এসেছে
টুরু টুরু টুরকি টুরু টুরু টুরকি
আতাবন রাতারাতি হ'ল মধুপুর কি!

পছন্দ হয় নি কেটে দিয়ে আর একটা শুরু করেছিলেন ভিন্ন ছন্দে।

ওই শোন্ ওই শোন্
টুরু টুরু টর
বুলবুলি এসেছে রে
ওরে চুপ কর্
ফোটে যেন খই
কই কই কই
ওই যে বসল উড়ে
বেড়াটার পর।
সারা মন ওঠে নেচে
শুনে গান তোর
ভুলে যাই দুষ্টু রে
তুই ধান-চোর
ওরে চঞ্চল
বল্ বল্ বল্
কোন্ ঝোপটির মাঝে
বেঁধেছিস ঘর!

এটাও পছন্দ হয় নি, এটাও কেটে দিয়েছেন। খাতাটা টেবিলে রেখে দিয়ে আবার তিনি চাইলেন বাইরের দিকে। ওই যে বেরিয়েছে বুলবুলি দুটো। আমের ডালে উড়ে বসল। বাঃ, চমৎকার

জায়গাটি বেছে নিয়েছে তো! উপরে-নীচে আশে-পাশে গোছা গোছা আমের মুকুল দুলছে, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কর্ণিকার পুষ্পের স্বর্ণকান্তি, রোদও এসে পড়েছে এক ফালি, চমৎকার লাগছে দেখতে। পরমুহূর্তেই কিন্তু উড়ে গেল বুলবুলিরা। বসল গিয়ে ভাঙা কার্নিসটার ধারে। শ্যাওলা-পড়া বিশ্রী জায়গাটা। কিন্তু ওখানেও ওদের উৎসাহ উপচে পড়ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। একজন আবার ফুড়ুৎ ক'রে আর একটু উপরে উঠে বসল ল্যাজটি ঘুরিয়ে। ল্যাজের তলার টুকটুকে লাল অংশটুকু দেখা গেল ক্ষণিকের জন্য, তৎক্ষণাৎ ঘুরে বসল আবার। উড়ে গেল। উড়তে উড়তেও যেন লাফাচ্ছে। হঠাৎ যেন নূতন দৃষ্টি খুলে গেল কবির। ওদের তুলনায় নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগল। তাঁর যে এই জানলার ধারটা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না, মনোমত পরিবেশকে আঁকড়ে থাকবার এই যে লুব্ধ প্রবৃত্তি, এটা—এই স্থাণুতাটা যেন মৃত্যুরই নামান্তর মনে হ'ল তাঁর। প্রাণের ধর্ম গতি। সে চলবে, থামবে না। মনে হওয়ামাত্রই উঠে পড়লেন তিনি। ডানার কাছে যেতে হবে। ডানার কাছ থেকে ফিরে এসেই চিঠি লিখতে হবে মন্দাকিনীকে। সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় ছাড়তে লাগলেন। কাপড়টা ছেড়েই হঠাৎ কিন্তু আবার টেবিলে এসে বসলেন। তাঁর মনে হ'ল, বুলবুলির কাছে ঋণ-স্বীকার না করলে অধর্ম হবে সেটা। চোখ বুঝে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লিখলেন—

আমার মনের ভুলগুলি
শুধরে দিলে বুলবুলি।
আটকে থাকা নয় কিছু
চললে পরেই হয় কিছু
হয় উঁচু বা নয় নীচু
কোথাও গিয়ে ঠেক্ না রে—

ছাড়তে হবে ঘুলঘুলি
শিখিয়ে দিলে বুলবুলি
পায়ের দড়ি পাকাস কে
পথের দিকে তাকাসে কে
চাইতে হবে আকাশকে
ডানা মেলেই দেখ্ না রে।

কবিতাটা লিখেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন আবার। কবিতাটা কোটের পকেটে পুরে নিলেন। তারপর আলোয়ানটা টেনে নিয়ে উধ্বর্শ্বাসে বেরিয়ে গেলেন, যেন ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন। পথে যেতে যেতে আর একটা অদ্ভুত কথাও মনে হ'ল। মনে হ'ল, যে সুষমা ডানার অঙ্গে নেমেছে, তাও হয়তো পাখির মতই একটা কিছু, একটু পরেই উড়ে যাবে। উড়ে গিয়ে বসবে হয়তো কোন কার্নিসের উপর, তারপরে উড়ে যাবে হয়তো আকাশে, নক্ষত্রের জ্যোতির্ময় লোকে গিয়ে বসবে হয়তো ক্ষণকালের জন্য, তারপর আবার···। কল্পনার আকাশে ডানা মেলে উড়তে লাগল তাঁর মন।

কিছুদূর গিয়ে দেখা হ'ল মল্লিক মশাইয়ের সঙ্গে। মল্লিকের চেহারাটা কেমন যেন মনে হ'ল। মুখ শুষ্ক, চুল এলোমেলো। চোখের দৃষ্টিও কেমন স্বাভাবিক নয়। কবিকে দেখতে পেয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, "ওঁদের কি কোনও চিঠিপত্র পেয়েছেন আপনি ?"

"না, পাই নি তো! অমরবাবু গিয়েই একটা চিঠি লিখবেন বলেছিলেন দোয়েল পাখির বিষয়ে। আপনি পেয়েছেন নাকি কিছু ?"

"আমি পেয়েছি। কাণ্ড দেখুন!"

মল্লিক মশাই পকেট থেকে একটি রেজিস্ট্রি-করা খাম বার ক'রে দিলেন। কবি খাম থেকে চিঠি বার ক'রে দেখলেন, রত্নপ্রভার চিঠি। গোটা গোটা গোল অক্ষরে রত্নপ্রভা লিখেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

আপনি আনন্দমোহনবাবুকে সমস্ত হিসাবপত্র বুঝাইয়া দিয়া আপিস-ঘরের চাবিটি দিয়া দিবেন। আমরা তাঁহাকেই হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার হইবার জন্য অনুরোধ করিব। আপনার ছয় মাসের বেতন অদ্য মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। টাকাটি পাইলে আনন্দমোহনবাবুকেই একটা রসিদ দিয়া দিবেন। নমস্কার। ইতি

শ্রীরত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন কবি খানিকক্ষণ। বেশ একটু বিব্রত বোধ করছিলেন তিনি। চিঠিটার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মাথা চুলকে বললেন, "আমি তো কিছু জানি না। ব্যাপারটা কি বলুন তো ?"

যদিও ব্যাপারটা কি এবং কেন তাঁকে তাড়ানো হ'ল মল্লিক মশাই সম্পূর্ণ ই বুঝেছিলেন, তবু তিনি বললেন, "কি জানি ! খেয়াল আর কি ! স্ত্রীবুদ্ধিও বলতে পারেন। যাক, ভালই হ'ল, আমি বাঁচলুম। এ বয়সে ওসব ঝামেলা আর পোষায়ও না। আপনি তা হ'লে কবে সব বুঝে নিচ্ছেন বলুন ?"

"আমি ! আমি কোনও চিঠি পাই নি। তা ছাড়া আমিই কি পারব ওসব ?"

"সে আপনি ওঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে। আমাকে খালাস ক'রে দিন। আমি কালই আপনাকে চাবি-টাবি দিয়ে দেব। এখন চলি"

কোনও উত্তরের অপেক্ষা না রেখে মল্লিক মশাই হনহন ক'রে চ'লে গেলেন এবং দেখতে দেখতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। নিজেকে অকস্মাৎ একটা নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে আবিষ্কার ক'রে কৌতুকও জাগল একটু মনে। তিনি হবেন হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার ! অদ্ভুত কাণ্ড !

কবি ডানার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে যখন পৌঁছলেন, ডানা তখন স্নান সেরে চুল শুখচ্ছিল রোদের দিকে পিঠ ক'রে। কবি দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হ'ল, আলোকের শিখর থেকে অন্ধকারের একটা প্রপাত নামছে যেন! ডানা তাঁর পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল, সম্বৃত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কবি এগিয়ে এসে হেসে বললেন, "বাঃ, চমৎকার!"

"কি চমৎকার?"

"তোমার চুলের শোভা। অনেক দিন এমন শোভা দেখি নি"

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে মাথার কাপড় একটু টেনে ঘরে ঢুকে গেল। একখানা চিঠি হাতে ক'রে বেরিয়ে এল একটু পরে।

"মিসেস সেনগুপ্ত একটা চিঠি লিখেছেন, পড়ে দেখুন"

কবি দেখলেন, এটিও রেজিস্ট্রি চিঠি। খুলে পড়লেন—

সুচরিতাসু,

বিশেষ প্রয়োজনে এই পত্র লিখিতেছি। স্থির করিয়াছি, মল্লিক মহাশয়কে হরিপুরার ম্যানেজারি-পদ হইতে অব্যাহতি দিব। আনন্দবাবু যদি এই কার্যের ভার লইতে সম্মত হন, আমরা নিশ্চিন্ত হই। তাঁহাকে বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না, কর্মচারীরাই সমস্ত করিবে। তিনি কেবল একটু নজর রাখিবেন। তাঁহার মত একজন সচ্চরিত্র অভিজ্ঞ বিদ্বান লোক যদি একটু লক্ষ্য রাখেন, তাহাতেই যথেষ্ট কাজ হইবে। তাঁহাকে বেতন হিসাবে কিছু দিবার স্পর্ধা আমাদের নাই, প্রণামীস্বরূপ যদি কিছু গ্রহণ করেন আমরা কৃতার্থ হইব। তুমি ভাই আমার হইয়া একটু অনুরোধ করিও। তিনি যদি বরাবর কাজ করিতে রাজী না-ও হন, তাহা হইলে আমরা যত দিন না ফিরি তত দিন অন্তত যেন কাজটা চালাইয়া দেন, কারণ আমরা মল্লিক মহাশয়কে জবাব দিয়াছি। তিনি অবিলম্বে যেন মল্লিক মহাশয়ের নিকট হইতে চাবি এবং হিসাবপত্র বুঝিয়া লন। আর বেশি কিছু লিখিবার নাই। উনি তোমাকে

যে সব কাজ দিয়া আসিয়াছেন, সেগুলি ভালভাবে করিও। টাকার প্রয়োজন হইলে সদর-নায়েব জগৎবাবুর কাছে চিঠি লিখিয়া পাঠাইবে। তাঁহাকে এই মর্মে লিখিত উপদেশ দিয়া আসিয়াছি। টাকা লইয়া তাঁহাকে একটা রসিদ দিয়া দিও। আশা করি, ভাল আছ। ভালবাসা লও। আনন্দবাবুকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইবে। ইতি

শ্রীরত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

চিঠিটা প'ড়ে কবি বললেন, "এ মহা মুশকিল হ'ল দেখছি"

"মুশকিল আর কি!"—মুচকি হেসে ডানা বললে—"একটু-আধটু দেখাশোনা করবেন"

"কিন্তু তাও কি পারব ? আমি কবি, বৈষয়িক তো নই—"

"খুব পারবেন"

"তুমি বলছ পারব ?"

"না পারবার কি আছে এতে ?"—ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে একটু যেন ধমকের সুরেই বললে ডানা।

"বেশ। তা হ'লে তাই হোক। চেষ্টা করা যাক। তোমার চাকরটা আছে কি ?"

"না। কেন ?"

"একটু চা খেতুম"

"আমিই ক'রে দিচ্ছি"

"একটা খাতা দিয়ে যাও। কবিতা লিখি ততক্ষণ একটা"

একটা খাতা দিয়ে ডানা ভিতরের দিকে চ'লে গেল। স্টোভে তেল ছিল না। উনুন ধরাতে হ'ল। খানিকক্ষণ পরে চায়ের পেয়ালা নিয়ে এসে ডানা দেখলে, কবি কবিতা লেখা শেষ করেছেন।

"নিন"

"কবিতাটা আগে শোন"

পড়ুন। চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে"

"যাক। তুমি পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ব'স ভাল ক'রে"

ডানা বসতেই কবি শুরু করলেন—

অয়ি, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী যেন কালিন্দী-তরঙ্গ-দলে তোলে শিহরণ,
আলোকের শুভ্র বৃন্তে ফুটিল কি তমস্কান্তি কৃষ্ণ শতদল,
প্রত্যক্ষ জীবন আর পরোক্ষ মরণ—
কাজল নয়ন মাঝে হাসি অশ্রু করে টলমল,
শিব-সুন্দরের বক্ষে নৃত্যপরা কালীর চরণ,
ময়ূর-মানস-পটে নবোদিত মেঘের বরণ,
অমিত অসিত কাব্য গুচ্ছ গুচ্ছ চিকুর উচ্ছল
কবিচিত্ত করিল হরণ।

অয়ি, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

আসন্ন-নগ্নতা ভীতা অসম্বৃতা কৃষ্ণা যেন কৌরব-অঙ্গনে,
শুক-কলরব-মুগ্ধা মধুমত্তা মাতঙ্গিনী বল্লকী-মোদিতা
সহসা চকিতা যেন দৈত্য-আগমনে;
অন্তলোকে ধ্যানলগ্না ওজস্বিনী আঁধার কবিতা
সংযম-প্রস্তর ভেদি, সমুচ্ছ্রিতা শত প্রস্রবণে
খুঁজিল প্রকাশ যেন শব্দহীন বিরাট গর্জনে,
বিমুগ্ধ বিমূঢ়া ক্ষুব্ধা অকুণ্ঠিতা মত্তা প্রলোভিতা
কে ছুটেছে আত্ম-বিসর্জনে।

অয়ি, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

"বুঝতে পারলাম না ভাল"—মুচকি হেসে ডানা বললে—"বড় কটমট হয়েছে। বিষয়টা কি ?"

কবি হেসে উত্তর দিলেন, "অমিত অসিত কাব্য গুচ্ছ গুচ্ছ চিকুর উচ্ছল! তুমি সংস্কৃতের ছাত্রী, তোমার কানেও কটমট লাগল ?"

লাল হয়ে উঠল ডানার কানের পাশটা। সে বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু ভান করছিল না-বুঝতে পারার।

"কি যে বাড়াবাড়ি করেন আপনি! লোকে শুনলে কি বলবে!"

এ ধরনের কথা ডানার মুখে কবি ইতিপূর্বে শোনেন নি। শুনে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, "বাড়াবাড়ি তোমার মনে হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে, কিছু হ'ল না। লোকের কথা ভেবে ভয় পাবার দরকার নেই। এখনই আমি যেলোকে গিয়েছিলাম, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। এমন কি তুমিও—মানে, তোমার স্থূল দেহটাও—ছিল না সেখানে"

ডানা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে টেবিলের বই-খাতাগুলো গুছিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগল। কবি চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপরে বললেন, "বেশ, তোমার যদি আপত্তি থাকে, তোমাকে কবিতা আর দেখাব না"

"না না, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এমনই বলছিলাম"—হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বললে ডানা।

"আপনি আমার বাবার বয়সী, আপনি যদি আমার সম্বন্ধে দু-একটা কবিতা লেখেনই, তাতে মনে করবার কি আছে। কিন্তু সখী বলেছেন কেন, বুঝলাম না"

কবি হেসে ফেললেন।

"তুমি যদি সত্যি সত্যি আমার মেয়ে হতে, তা হ'লেও তোমার

এলোচুল নিয়ে কবিতা লেখবার সময় তোমাকে সখী সম্বোধন করতুম। কাব্যলোকে বয়সের হিসাবটা সামাজিক মাপকাঠি দিয়ে হয় না। স্থূল বস্তুজগতের কোন মাপকাঠিরই দাম নেই সেখানে। কাব্য-বৃন্দাবনে সবাই সখী। অনেকদিন আগে একটা কবিতা লিখেছিলাম তার সবটা মনে নেই, প্রথম চার লাইন হচ্ছে—

সন্ধ্যার মেঘে যে স্বর্ণ লাগে
স্যাকরা তাহার বোঝে না মর্ম
কুসুমে কুসুমে যে বর্ণ জাগে
রঙ-রেজ তার জানে না ধর্ম।

একটু আগে বুলবুলিকে দেখে যে কারণে কবিতা লিখছিলাম, তোমার কালো চুলের রাশি দেখেও ঠিক সেই কারণেই কবিতা লিখেছি। বুলবুলিও নয়, কালো চুলের রাশিও নয়, ওদের অবলম্বন ক'রে মনের ভিতর কে যেন ছন্দ জাগিয়ে তোলে। ওগুলো বৃন্ত, সেই বৃন্তে ফুল হয়ে ফোটে কি একটা যেন। কবির লক্ষ্য বৃন্তও নয়, ফুলও নয়, সেই কি-যেন-কি-টা"

এ কথা শুনে ডানার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এতে তার আত্মসম্মান একটু আহত হ'ল যেন। সে যে কবির কবিতার বিষয় হতে পেরেছে, এতে একটু বিব্রত বোধ করলেও ভিতরে ভিতরে সে খুশি হয়েছিল বইকি। তাকে নয়, তাকে অবলম্বন ক'রে যা কবিমানসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে তাই কবিতার হেতু—এ কথা শুনে একটু মর্মাহতই হয়ে গেল সে। মৃদু হেসে বললে, "তাই নাকি ?"

"নিশ্চয়। আর একটা কথাও শুনে রাখ। যে কবিতা লেখে, সে আমার এই দেহটা নয়। সেও যেন কি-একটা-কি মাঝে মাঝে ভর করে এসে আমার উপর"

ডানার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল আবার। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, ডানার গ্রীবাভঙ্গীতে

যে অপরূপ শ্রী ফুটেছে তা শুধু রক্তমাংসের সমন্বয় নয়, তা যেন কোনও অজ্ঞাত শিল্পীর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, আর কোনও শিল্পীর নবতর সৃষ্টিতে মূর্ত হবার আশায় অপেক্ষা করছে।

২১

বসন্ত শেষ হচ্ছে।

নিজের বাপের বাড়িতে রত্নপ্রভা স্বামীর ঘরে ঢুকে একটা বই খুলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বহু রকম পাখির বহু রকম ঠোঁটের ছবি। চওড়া, সরু, লম্বা, ছোট, উপরের দিকে বাঁকানো, নীচের দিকে বাঁকানো, চামচের মত, ছাঁকনির মত···বইটা নূতন এসেছে। বেশ মোটা বই। পাতার পর পাতা উলটে যেতে লাগলেন রত্নপ্রভা। কত ছবি, কত লেখা···। খানিকক্ষণ পরে তাঁর মনে হ'ল, গহন অরণ্য। গ্রন্থটা নয়, তাঁর স্বামী। বিশাল বিরাট অরণ্য। প্রতি পদক্ষেপেই নূতন কিছু চোখে পড়ছে। মাঝে মাঝে একটা অজানা ভয়ে গা ছমছম করে। আবার পরিচিত শব্দ শুনে, প্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে ভয় কেটে যায়। কত রকমের গাছ-পালা পশু পাখি, কত ধরনের শব্দ গন্ধ রূপ রস, আর এই সমস্তটাকে ঘিরে একটা অজানা রহস্য, কখনও গাম্ভীর্যে অটল, কখনও শিশুর মত সজীব। অজানাটা যদিও জানা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিঃশেষ হতে চাইছে না; মনে হচ্ছে, যেন কত কি আছে আরও। সহসা রত্নপ্রভার সমস্ত চিত্ত পুলকিত হয়ে উঠল। অরণ্যটা যে তাঁর একার, আর কারও নয়—এই অনুভূতি আনন্দিত ক'রে তুলল তাঁর সমস্ত সত্তাকে। একটা নবীন উৎসাহ জাগল তাঁর মনে, হোক জটিল, হোক দুর্গম, তবু সমস্তটা আয়ত্ত করতে হবে তাঁকে। শক্তি সংগ্রহ করতে হবে তা করবার জন্যে।

পাশের ঘরে বৈজ্ঞানিক নানা বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দোয়েল পাখির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখছিলেন একটা। আনন্দবাবুকে ব'লে এসেছিলেন, কিন্তু লেখবার সময় ক'রে উঠতে পারেন নি এতদিন। দোয়েলরা নিশ্চয়ই ডাকতে শুরু করেছে খুব সেখানে। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবলেন একটু। তারপর নিজের ডায়েরি খুলে দেখলেন। দোয়েলের গান তো তিনি শুনেই এসেছেন—প্রথম গান শুনেছিলেন ১০ই ফাল্গুন, এতদিন ধুম লেগে গেছে নিশ্চয়। তন্ময় হয়ে লিখতে লাগলেন আবার। পাশে চা ঠাণ্ডা হচ্ছিল।

কবি কবিতা লিখছিলেন নিজের ঘরটিতে ব'সে। গঙ্গা এবং শান্তনুর পৌরাণিক গল্পটা উদ্দীপ্ত করছিল তাঁর কল্পনাকে। তাঁর মনে হচ্ছিল, গঙ্গাই বুঝি বসন্তের বেশে এসেছিল পৃথিবী-শান্তনুর কাছে। এইবার ছাড়াছাড়ি হচ্ছে।

ফুটিছে ঝরিছে ফুল অরণ্যে উদ্যানে;
গঙ্গা-বাসন্তিকা যেন আপন সন্তানে
ভাসাইছে কাল-স্রোতে লীলায় কৌতুকে।
পৃথিবী-শান্তনু চেয়ে ছিল শুষ্ক মুখে
নিষ্ঠুরা প্রেয়সী পানে।
"আর নয়—না—না"
সহসা ধ্বনিল যেন শান্তনুর মানা
আতঙ্কিত কম্পকণ্ঠে—ক্ষান্ত দাও প্রিয়া।"
"চলিলাম আমি তবে" সুমিষ্ট হাসিয়া
কহিলেন সুরধুনী।
মর্ত্য-পাশ হতে
চ'লে যায় বাসন্তিকা, জাগে নদী-স্রোতে
কল্লোল-ক্রন্দন মৃদু; থাকিয়া থাকিয়া
আর্তকণ্ঠে হাহাকার করিছে পাপিয়া।
শিশু ভীষ্ম প'ড়ে আছে মাতৃহারা হায়
শিশু গ্রীষ্ম জাগিতেছে দিগন্ত-সীমায়।

রূপচাঁদ নদীতীরে একা নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিলেন। মল্লিক মশাইয়ের চাকরি যাওয়াতে তিনি নিজে যেন ব্যক্তিগতভাবে আহত হয়েছিলেন। কিন্তু হতাশ হন নি। সীমাহীন সমুদ্রে পথ-হারা হয়ে কলম্বাস হাল ছাড়েন নি, রূপচাঁদও ছাড়েন নি। তিনিও আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চেয়ে ব'সে ছিলেন। পর্যবেক্ষণ করছিলেন বাতাসের গতি। যদিও আশ্বস্ত হবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস ছিল যে যাবেই। স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে ব'সে ছিলেন তিনি।

বকুলবালাও স্বপ্ন দেখছিলেন। চণ্ডীর বন্ধুটি হলদে পাখির বাচ্চা যোগাড় ক'রে দেবে বলেছে। মার্বেল খেলার জন্য ভাল একটা 'চ্যাম্পিয়ন' মার্বেলও এনে দেবে বলেছে চণ্ডী। চণ্ডীর বন্ধু সত্যিই যদি হলদে পাখির বাচ্চা এনে দেয়, কি মজাই যে হবে! এবার আর ছাতু খাওয়াবেন না তিনি। ফড়িং ধরবার ব্যবস্থা করাতে হবে। চণ্ডী ঠিকই বলেছে, বাচ্চা-বেলা থেকে না পুষলে পোষ মানে না পাখি। পাখিদের বাসা বানাবার জন্যে অমরবাবু গাছে গাছে যে সব বাক্স টাঙিয়ে দিয়েছেন, তার একটাতেও কোনও হলদে পাখি বাসা বাঁধতে পারে। কিছুই বলা যায় না।

মন্দাকিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ছোট ভাই বিনয়কে নিয়ে। বিনয় সেলুন থেকে চুল ছাঁটিয়ে এসেছিল। তার মাথার দিকে চেয়ে মন্দাকিনী হেসে লুটিয়ে পড়ছিলেন। নন্দরাণীকে ডেকে বলছিলেন, "ওলো নন্দ, বিনুর চুলের বাহার দেখে যা একবার। বিয়ের নামেই এই, বিয়ে হয়ে গেলে না জানি কি করবে ছেলে!"

স্নেহে গ'লে পড়েছিলেন তিনি যেন। যে বিনুকে তিনি এতটুকু

থেকে মানুষ করেছেন, তাকে ঘিরেই রঙিন হয়ে উঠছিল তাঁর স্বপ্ন। তাঁদের বাড়ির পাশের সজনেগাছটায় একটা দোয়েলও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না মন্দাকিনীর।

সন্ন্যাসী একা ব'সে ছিলেন নদীর পরপারে বালুস্তূপের উপর। তিনি সহসা যেন নিজেকে ফিরে পেয়ে ভারি তৃপ্তি বোধ করছিলেন। গত কয়েকদিন থেকে একটা কথা কাঁটার মত খচখচ করছিল তাঁর মনের মধ্যে। সেদিন শেষরাত্রে ডানার সঙ্গে তিনি যে সব আলোচনা করেছিলেন, তার প্রকৃত মর্ম ডানা যদি বুঝতে না পেরে থাকে, যদি তাঁর অতি-সরল অভিমতকে ঘোলা দৃষ্টি দিয়ে বিচার ক'রে থাকে, তা হ'লে হয়তো সে তাঁর সম্বন্ধে খারাপ ধারণাই পোষণ করছে। এই চিন্তাটা পীড়িত করছিল তাঁর মনকে। কিন্তু এখনই একটু আগে দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি যেন উপলব্ধি করলেন যে, কে তাঁর সম্বন্ধে কি মনে করছে—এ নিয়ে মাথা ঘামানোর অর্থ নিজেকে তিনি চেনেন নি এখনও। তিনি যে কি এবং কে, তার নির্ভুল প্রমাণ তো তাঁর নিজের চেতনার মধ্যেই রয়েছে। অপরের সমর্থন বা প্রতিবাদে তার মূল্য তো এতটুকু পরিবর্তিত হবে না। সুতরাং ডানা তাঁর সম্বন্ধে কি ভেবেছে বা ভাবে নি—এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। ওই শস্যক্ষেত্র কিছুদিন আগে সবুজ ছিল, এখন স্বর্ণকান্তি। কিছুদিন পরেই আবার রিক্তাভরণ হবে। কোনও অবস্থাতেই তো সে সঙ্কুচিত নয়, তার এই পরিবর্তন কার মনে কি ভাবোদ্রেক করছে তা জানবার জন্যে কিছুমাত্র আগ্রহও নেই ওর। নিজের অনন্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ সচেতন যেন, কারও স্তুতিনিন্দায় বিচলিত হবার ওর প্রয়োজনই নেই। খানিকক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থেকে তারপর শস্যক্ষেত্রকে প্রণাম করলেন তিনি। যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে ভারি তৃপ্তি হ'ল তাঁর।

ডানাও খুঁজছিল।

সে যথারীতি কর্তব্যকর্ম ক'রে যাচ্ছিল সব। পাখিগুলির তদারক করছিল, দেখে বেড়াচ্ছিল কোনও পাখি কোথাও বাসা বাঁধবার আয়োজন করেছে কি না, অমরবাবু যে সব বই রেখে গিয়েছিলেন সেগুলি প'ড়ে 'পাখিদের পালক' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধও লেখবার আয়োজন করছিল, কবির কবিতা শুনছিল, রূপচাঁদবাবুকে এড়িয়ে চলছিল, সন্ন্যাসীর গতিবিধি সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছিল দূর থেকে। কিন্তু আসলে সে খুঁজছিল নিজেকে। খুঁজছিল নিজের সেই বিশেষ আকাশটিকে, যেখানে পক্ষ বিস্তার ক'রে সত্যিই আনন্দ পাবে সে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

ডানা

ডানা

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

ডি.এম.লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৬২

মূল্য চার টাকা

ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

ডানা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। কবির মনে হচ্ছিল যেন মধ্য-রাত্রি, রহস্যময় মধ্য-রাত্রি। নিশীথ-গগনের অসংখ্য নক্ষত্রমালাই সহসা যেন কোনও মন্ত্রবলে একত্রিত হয়ে সূর্যের রূপ ধারণ করেছে। তাঁর জানলা দিয়ে যে রৌদ্রোজ্জ্বল দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, সেটা যেন বাস্তবের নয়, রূপকথালোকের। যদিও বাল্যকাল থেকে বহুবার তিনি এ দৃশ্য দেখেছেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তাঁর পূর্ব-জীবনের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ আছে। ওই কর্ণিকার, পলাশের, কৃষ্ণচূড়ার উদ্দাম অথচ নীরব বর্ণসমারোহকে ঘিরে ফটিকজলের যে তীক্ষ্ণ করুণ সুর মাঝে মাঝে ধ্বনিত হচ্ছে তা যে পার্থিব—এ কথাও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কবি। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সহসা আজ পরম মুহূর্তে আবিষ্কার করেছেন পরম সত্য—সে সত্য শুধু অপরূপ নয়, অবর্ণনীয়। ভাষায় তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন তিনি। তাঁর অন্তরলোকে একটা অস্ফুটভাব রূপায়িত হচ্ছিল কেবল অসম্বদ্ধ লীলায়, মনে হচ্ছিল ছন্দবন্ধনে বাঁধলেই ওর অপরূপ অসীমতা খণ্ডিত হবে। মনের মধ্যে, তবু ছন্দ জাগছিল, গুঞ্জন করছিল কবিতার মিল। ফটিকজল পাখীর 'ফটি—ক জল' সূক্ষ্ম সুন্দর তীক্ষ্ণ সুরে যেন তাঁকে বলছিল, তুমি চুপ ক'রে আছ কেন, তুমিও তোমার গান গাও না। তোমার মনে যদি সুর থাকে, কণ্ঠে তার ফুটবেই কিছুটা। সবটা নাইবা ফুটল। তা ছাড়া, সবটা তুমি ফোটাতে পারবে, এত অহঙ্কারই বা কেন তোমার? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই কি সবটা ফোটাতে পেরেছেন একসঙ্গে?

পাখীর সুরে তিরস্কৃত হয়ে লজ্জিত হলেন কবি। কবিতার খাতাটা বার ক'রে নীরবে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লিখলেন—

রোদ নয়, রোদ নয়, সোনার স্বচ্ছ মেঘ
নামিয়াছে ধরণীর 'পরে
তারি টানে তারি পানে ছুটেছে সুরের বেগ
পুলকিত বিহগের স্বরে,
সে সোনার মেঘ হতে নামিছে স্ফটিক-জল-ধারা
বৃক্ষলতা করে স্নান, পুষ্পে বর্ণ হ'ল মাতোয়ারা
চঞ্চল পতঙ্গদল, মুখরিত পাখী আত্মহারা
মানুষ ঘুমায় শুধু ঘরে।
ওরে কবি, দ্বার খোল্—বাহিরে বারেক দাঁড়া এসে
সোনার স্বচ্ছ মেঘ নামিয়াছে তোরই দ্বারদেশে
রুদ্রের অন্তর হতে বাহিরিল যে মোহন বেশে
দেখ্ তারে দু'নয়ন ভরে
রোদ নয়, রোদ নয়, সোনার স্বচ্ছ মেঘ
নামিয়াছে ধরণীর 'পরে।

কবিতাটা লিখে কবির সত্যিই মনে হতে লাগল যে, বাইরে যে কড়া রোদ দিগ্‌দিগন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে তা রোদ নয়, তা সোনার স্বচ্ছ মেঘ, যে মেঘ থেকে স্ফটিকজল নামে। কপাট খুলে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল, এই অনবদ্য অপরূপ প্রকাশকে অভ্যর্থনা করবার দায়িত্ব তো তাঁরই, তিনি যে কবি। সাধারণ মানুষ কপাটে খিল লাগিয়ে বৈশাখের এই পরম প্রকাশকে উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু তিনি কি পারেন? বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে প্রথমেই মনে হ'ল, কোথাও কেউ নেই, চতুর্দিক খাঁ-খাঁ করছে যেন। তিনি

যেন অকস্মাৎ কোনও রূপকথালোকের নিদমহলে ঢুকে পড়েছেন। প্রখর রৌদ্রালোকিত নিদমহল। আপাদমস্তক স্বর্ণালঙ্কারে ঢাকা—ওটা কি কর্ণিকার বৃক্ষ? অপ্সরীই বা নয় কেন? ওই যে দূরে রক্তশিখার মত দেখাচ্ছে, ওটা পলাশ, না, শিমুল, না, ধরণীর মর্মভেদী কামনা? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। একটা তপ্ত হাওয়া ছুটে এল কোথা থেকে, এসে তাঁকে ঘিরে নৃত্য করতে লাগল।

'ফটি—ক জল'—'ফটি—ক জল'—

কবির চমক ভাঙল। কোথা থেকে ডাকছে পাখীটা? দূরের ওই বড় গাছটা থেকে নিশ্চয়। ঘন পত্রপল্লবের মাঝখানে উঁচুতে ছোট্ট একটি ডালে ব'সে আছে বোধ হয়। কয়েক দিন আগে দেখেছিলেন তিনি পাখীটিকে। অনেক কষ্টে, অনেক মেহনতের পর দেখেছিলেন। ছোট্ট পাখী, সুন্দর দেখতে। কালো সাদা আর সবুজাভ হলুদের অপরূপ সমন্বয় পুরুষটির গায়ে, সঙ্গিনীটির গায়ে কিন্তু কালোর ছোঁয়াচ নেই। পুরুষ-পাখীটিকে দেখে মনে হয়েছিল, অমানিশীথিনীর কালোর সঙ্গে যেন স্বর্ণকান্তি সূর্যালোকের দ্বন্দ্ব চলেছে ওর সারা অঙ্গ জুড়ে; মনে হয়েছিল, পুরুষ-পাখীটি তামসিকতার কালোকে জয় করতে পারে নি, সঙ্গিনীটি কিন্তু পেরেছে, তার সারা গায়ে কেবল সবুজ আর হলুদের দ্যুতি, কালোর আভাসমাত্র নেই।

'ফটি—ক জল'—'ফটি—ক জল'—

কবি আবার ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। দিন কয়েক আগে ফটিকজলকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছিলেন একটা। তাঁর হঠাৎ মনে হ'ল, কবিতাটা এখন একবার পড়া দরকার। ঘরে ঢুকে কিন্তু সে কথা ভুলে গেলেন আবার। অসংলগ্নভাবে মনে পড়ল অমরেশ-বাবুর জমিদারিতে কোথায় যেন খুন হয়ে গেছে একটা। জমিদারের ম্যানেজার হিসাবে তাঁকে হয়তো থানায় যেতে হবে। একজন গোমস্তাকে তিনি যেতে বলেছেন; কিন্তু সে যদি এসে বলে যে, আপনাকেও যেতে হবে, তা হ'লে—। বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন

তিনি। অমরেশবাবুর স্ত্রী এ কি বিপদে ফেলে গেলেন তাঁকে! সঙ্গে সঙ্গে ডানার কথাও মনে হ'ল তাঁর। শুধু তাঁকে নয়—ডানাকেও বিপদে ফেলে গেছেন ওঁরা। দুজনকে দু রকম 'টাস্‌ক্‌' দিয়ে গেছেন যেন। এই বিপন্ন ভাব সত্ত্বেও কিন্তু মনে মনে ঈষৎ আনন্দিত হলেন তিনি। ডানার সঙ্গে একই কারাগারে বন্দী হয়ে আছি কেবল অর্থাভাবে—এই ধারণাটা মনে স্পষ্ট হওয়া মাত্র ডানার সম্বন্ধে একটা নূতন ধরনের আত্মীয়তা-বোধ মনে জাগল। কিন্তু এতে আনন্দিত হওয়াটা অনুচিত—এ কথাও মনে হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। একটু লজ্জিত হলেন।

'ফটি—ক জল'—

কবিতার খাতাটা খুলে পাতা ওল্‌টাতে লাগলেন একটু অপ্রস্তুত ভাবে, কর্তব্যে অবহেলা ক'রে ধরা প'ড়ে গেছেন যেন। কবিতাটায় অনেক কাটাকুটি ছিল, তবু পড়তে কষ্ট হ'ল না তাঁর।—

বৈশাখী দুপুরের নিদারুণ আলোতে
সবুজাভ হলুদে সাদাতে ও কালোতে
সাজিয়া আসিল কে অজানারে চাহিয়া
ফটিকজলের গান বারে বারে গাহিয়া
          সাথে ল'য়ে সঙ্গিনী তন্বী শ্যামলীকে
আলোকের রূপ ওর সারা মন ভরিয়া
পালকের কালো তবু যায় না যে সরিয়া
হয়তো বা আশা আছে ওরই গাঢ় কালিমা
প্রেয়সীর অন্তরে জাগাইবে লালিমা
          শস্যের সুষমায় সাজাইবে পলিকে।

বেরিয়ে পড়লেন আবার। দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় ব'সে আছে একদল গরু, অর্ধনিমীলিত নয়নে রোমন্থন করছে, একটা

ছোট বাছুর কেবল লেজ তুলে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। তাঁর সুন্দরীও কি আছে ওদের মধ্যে? কর্তব্যবোধেই যন্ত্রচালিতবৎ সেই দিকে এগিয়ে গেলেন খানিকটা। কিন্তু গরুগুলির কাছাকাছি গিয়ে যা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা গরু নয়—গাছের ওপর এক ঝাঁক হাঁড়িচাঁচা পাখী। ছুটো পাখী দুলে দুলে কি মিষ্টি ক'রেই না ডাকছে। 'খুকু নেই' বলছে কি? না, 'কু অক্ রিং', না, 'ববো লিং'? সহসা কবির মনে হ'ল, ওরা যেন পরস্পরকে বলছে—ধর দিকিন, ধর দিকিন, ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি খেলার সময় যেমন বলে। দুষ্ট কিশোরী মেয়ের মতই দেখতে তো। সারাটা দুপুর এ-গাছ ও-গাছ ক'রে বেড়াচ্ছে, কখনও মগডালে মগডালে, কখনও ঘন পাতার আড়ালে আড়ালে। ফল চুরি করছে, অন্য পাখীর ডিম চুরি করছে, পোকামাকড় যা পাচ্ছে খেয়ে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে উঁচু ডালে ব'সে দুলে দুলে বলছে—ধর দিকিন, ধর দিকিন। স্নেহরসে কবির মন সিক্ত হয়ে উঠল। বিভূতি বাঁড়ুজ্জের 'পথের পাঁচালী'র দুর্গা যেন। পর-মুহূর্তেই কোকিল ডেকে উঠল একটা। তারপর, শোনা গেল—'ফটি—ক জল'। দূরে স্বর্ণাভরণভূষিতা কর্ণিকার বীথিতে নীরব সমারোহে যে বর্ণ-বাণী প্রস্ফুটিত হয়েছে, তারই প্রভাব যেন উন্মত্ত ক'রে তুলেছে কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পগুচ্ছকে। ওরা যেন রঙের ভাষায় ডাকাডাকি করছে পরস্পরকে। কবির আবার মনে হ'ল, তিনি রূপকথা-লোকে প্রবেশ করছেন। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আশ্বস্ত আনন্দিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হ'ল, তিনি দূর প্রবাস থেকে সহসা নিজের দেশে ফিরে এসেছেন যেন। এই পাখীর ডাক, ফুলের ভাষা, রৌদ্রমণ্ডিত নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বৃক্ষে লতায় তৃণে গুল্মে সহস্র ইঙ্গিতভরা অসংখ্য আবেদন—এই তো তাঁর নিজস্ব পরিবেশ। এরই ক্রোড়ে, এই বৈচিত্র্যের দোলায়, এই সহজ সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতেই তো মানুষ হয়েছেন তিনি। কত জন্ম, কত জন্মান্তর,

কত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার কত সংঘাত আন্দোলিত করেছে তাঁকে এই প্রকৃতির কোলেই। মায়াবিনী সভ্যতার পিছু পিছু কোথায় গিয়েছিলেন তিনি এতদিন ঘর ছেড়ে? জটিল অস্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন এতকাল কিসের মোহে? নিজের বুদ্ধিকে অনুসরণ ক'রে কোথায় চলেছে মানুষ! কোথায় এর পরিণতি! হঠাৎ এক ঝলক তপ্ত হাওয়া তাঁকে ঘিরে ছোট্ট একটু নাচ নেচে দূরে ছুটে চ'লে গেল কতকগুলো শুষ্ক পাতাকে নাচিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, বৃদ্ধ বটের পত্রপল্লবে সাড়া জাগিয়ে। মুগ্ধ কবি দাঁড়িয়ে রইলেন। ছেলেবেলার সাথী একজন যেন পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে ছুটে পালাল। ও তো এখনও তেমনি দুষ্ট, তেমনি চঞ্চল, তেমনি উত্তপ্ত, তেমনি উদ্দাম আছে। তিনিই কি বুড়ো হয়ে গেলেন না কি? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তর প্রতিবাদ ক'রে উঠল। ,দেহটা হয়তো অপটু হয়েছে, মন তো একটুও বুড়ো হয় নি! তাঁর ইচ্ছে করতে লাগল ওই দমকা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে। একটু ছুটলে ক্ষতি আর কি হবে! বড় জোর হাঁপিয়ে পড়বেন একটু। কেউ দেখতে পেলে হয়তো হাসবে, পাগল ভাববে। তাতেই বা ক্ষতি কি! ঊর্ধ্বপুচ্ছ কচি বাছুরটা তাঁর দিকে একছুটে চ'লে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তাঁর সামনে। যেন বলতে লাগল—ছুটবে? বেশ তো, এস না। কবি সত্যিই ছুটতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পারলেন না। রাস্তার বাঁকে পিওনকে দেখতে পেয়ে তাঁর গতিবেগ আড়ষ্ট হয়ে গেল, টান পড়ল ভব্যতার নিগড়ে। সহজ মন্দ গতিতেই এগিয়ে গেলেন তিনি পিওনের দিকে। পিওনও তাঁর দিকেই আসছিল, তাঁর চিঠি ছিল একখানা। বেশ মোটা একখানা খাম তাঁর হাতে দিয়ে পিওন নিজ গন্তব্যপথে চ'লে গেল। কবি চিঠিখানার ঠিকানা দেখেই বুঝলেন, অমরেশবাবুর চিঠি। হাতের লেখাতেই ভদ্রলোকের চরিত্র পরিস্ফুট। গোটা গোটা বড় বড় বলিষ্ঠ অক্ষর। বেশ মোটা চিঠি।

খামটা ছিঁড়েই কবির মনে হ'ল, এ চিঠি এখানে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। বেশ লম্বা চিঠি। প্রথমেই চোখে পড়ল—"একটা দোয়েল পাখী আমাদের কুঠিঘরের দেওয়ালের ফোকরে বাসা করেছে শুনে খুব আনন্দিত হলাম। শ্রীমতী ডানাকে আমি আরও খান কয়েক বই পাঠালাম। তাতে দোয়েলের কথা কিছু কিছু পাবেন তিনি। দোয়েলের বিষয়ে আমার যতটুকু মনে পড়ছে, আপনাকেও জানাচ্ছি। দোয়েলের গান খুব শুনছেন নিশ্চয়। এখানেও দোয়েলরা খুব মেতে উঠেছে—" এইটুকু প'ড়েই কবির মনে হ'ল, চিঠিখানা নিয়ে ডানার কাছে যাওয়াই উচিত। যা এতক্ষণ মনের প্রত্যন্তদেশে গোপন ইচ্ছা ছিল, তা এইবার কর্তব্যরূপ পরিগ্রহ ক'রে দ্বিধামুক্ত হ'ল। চিঠিখানা হাতে ক'রে, দুপুর রোদে মাঠ ভেঙে তিনি ডানার বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন। কবি বাইরে যদিও একটা সপ্রতিভতা বজায় রাখবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মনে মনে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। রূপকথালোকের যে অবাস্তব চিত্রটা সহসা তাঁর মনে বাস্তব হয়ে উঠেছিল তার প্রভাব তখনও কাটে নি। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন চিরন্তন রাজপুত্র, চিরন্তনী রাজকন্যার উদ্দেশ্যে তেপান্তর মাঠ ভেঙে চলেছেন। যে মেঘ স্ফটিকজল বর্ষণ করে, সে তার স্বচ্ছ স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত করেছে চতুর্দিক, তাঁর বয়স যেন অনেক ক'মে গেছে, তাঁর কবিতা যেন মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁকে।...

কল্পনার পক্ষীরাজে চ'ড়ে তিনি যখন সবজিবাগের প'ড়ো বাড়িটাতে এসে হাজির হলেন, তখনও তাঁর ঘোর কাটে নি। শিকল-তোলা দরজাটার দিকে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। চমকে উঠলেন চাকরটার সাড়া পেয়ে।

"মাইজী বেরিয়ে গেছেন।"

ঘোর কেটে গেল। মুখ দিয়ে কিন্তু কথা বেরুল না তবু।

"আপনি কি বসবেন?"—চাকরটাই প্রশ্ন করল আবার।

"হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল। কোথায় গেছেন মাইজী?"

জোর ক'রে কথা কটা বলতে পেরে যেন আত্মস্থ হলেন তিনি। মনের একটা অজানা গুরুভার যেন নেবে গেল।

"তা ঠিক জানি না বাবু। মাইজী আমাকে ডাকঘরে পাঠিয়ে ছিলেন খাম-পোস্টকার্ড আনতে। এসে দেখছি, বেরিয়ে গেছেন তিনি। কাছাকাছিই গেছেন কোথাও। আপনি বসেন তো একটু বসুন। আসবেন এখুনি।"

কপাটটা খুলে দিলে সে। কবি ভিতরে গিয়ে বসলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল, টেবিলের উপর তিনখানা মোটা মোটা পক্ষীবিষয়ক বই রয়েছে। অমরেশবাবু পাঠিয়েছেন নিশ্চয়। কবির একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল। অমরেশবাবু শুধু পাখীদেরই খাঁচায় পোরেন নি। তাঁকে এবং ডানাকেও পুরেছেন। অদৃশ্য যন্ত্র দিয়ে তাঁদেরও ঠোঁট নখ পালক মাপছেন কি না কে জানে?

অমরেশবাবুর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি। তাঁর মনে হ'ল, লোকটির প্রতি সুবিচার করেন নি তিনি। তাঁকে কখনও অবজ্ঞাভরে, কখনও অনুকম্পা সহকারে তিনি যেন দয়া ক'রে সহ্য ক'রে এসেছেন, তাঁর প্রকৃত মহত্ত্বের আলোকে কখনও তাঁকে বিচার করবার চেষ্টা করেন নি। তাঁর মনে হ'ল, চেষ্টা করলে তিনি অভিভূত হয়ে যেতেন। অসুরের মত বলিষ্ঠ, শিশুর মত কৌতূহলী, ঋষির মত জ্ঞানবৃদ্ধ, রাজার মত ধনী, অগ্নির মত পবিত্র এই লোকটির অনন্যতায় তাঁর অন্তত মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল। তিনি কবি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হওয়াতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন একটু। মুগ্ধই হয়েছেন তিনি মনে মনে, কিন্তু বাইরে ভান করছেন ঠিক উল্‌টোটা। কি দরকার এ চাতুরির? আত্মসম্মানের মুখোশটা বজায় রাখার জন্য? চিঠিখানার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। পকেট থেকে বার ক'রে পড়তে লাগলেন—

প্রিয় আনন্দমোহনবাবু,

একটা দোয়েলপাখী আমাদের কুঠিঘরের দেওয়ালের ফোকরে বাসা করেছে শুনে খুব আনন্দিত হলাম। শ্রীমতী ডানাকে আরও খানকয়েক বই পাঠাচ্ছি। তাতে দোয়েলের কথা কিছু কিছু পাবেন তিনি। দোয়েলের বিষয় এখন আমার যতটুকু মনে পড়ছে, আপনাকেও জানাচ্ছি। দোয়েলের গান খুব শুনছেন নিশ্চয়? এখানেও দোয়েলরা খুব মেতে উঠেছে। আমাদের রেডিওর এরিয়েলটা এখানকার একটি দোয়েল-গায়কের প্রধান রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছে। ওর ওপর ব'সে কত গানই শোনায় ও। সম্ভবত প্রেয়সীকেই শোনায়, কিন্তু মাঝ থেকে আমরাও লাভবান হই। কি বলেন? একজন ইংরেজ লেখক—ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর একটা প্রবন্ধে লিখেছেন যে, পাখীরা নাকি তাদের প্রেয়সীদের ভোলাবার জন্যে গান গায় না। ময়ূর নাকি ময়ূরীকে মুগ্ধ করবার জন্যে পেখম মেলে নৃত্য করে না। ওরা যা করে, সবই নাকি অকারণ পুলকে করে। কার্যকারণের যোগাযোগ মানতে চান না ভদ্রলোক। অকারণ পুলকে যে পাখীরা গান করে না তা নয়, লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, অনেক সময় এই দোয়েলই অহেতুক আনন্দে গান গেয়ে চলেছে। কিন্তু ওর অধিকাংশ গানের লক্ষ্য যে ওর প্রিয়া—এ কথা অস্বীকার করা শক্ত। লরেন্স বলেছেন, সৌন্দর্য ব্যাপারটা রহস্য-জনক। ওর কোনও হেতু নেই। বিজ্ঞান জোর ক'রে একটা হেতু বার করবার চেষ্টা করেছে, কারণ বিজ্ঞানীদের একটা হেতু-বাতিক আছে। আছে তা মানছি। কিন্তু ওই লরেন্সই ওই প্রবন্ধেই বলছেন যে, জীবন্ত যৌবনই সৌন্দর্য। অর্থাৎ তিনিও রূপের প্রকাশকে যৌন অভিব্যক্তির সঙ্গে না জড়িয়ে পারেন নি। বিজ্ঞানকে গাল দিতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি তাদের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। যাক ও-কথা, এখন দোয়েলের কথা শুনুন।

পাঞ্জাবের কিছু অংশ, রাজপুতানা, সিন্ধু, কচ্ছ প্রদেশ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র দোয়েল স্থায়ী বাসিন্দা। পার্বত্য প্রদেশেও আছে; চার হাজার ফুট, কখনও কখনও পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে পর্যন্ত তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হিমালয়েও এক হাজার ফুট পর্যন্ত এদের বাসা এবং ডিম পাওয়া গেছে। এদের চালচলন লক্ষ্য করেছেন কি কিছু? নিশ্চয়ই করেছেন। দোয়েল পাখীর সম্বন্ধে অমন সুন্দর কবিতা যখন লিখেছেন, তখন দেখেছেন নিশ্চয় ওদের ভাল ক'রে। কিংবা কি জানি, না দেখেও হয়তো ভাল কাব্য রচনা করতে পারেন আপনারা, এর অজস্র প্রমাণ তো বিশ্ব-সাহিত্যে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উর্বশী অথবা শেক্‌স্‌পীয়ার মিডসামার নাইটস্ ড্রীম দেখেন নি নিশ্চয়। যাক, আবার বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট করছি আপনার। দোয়েলের কথা হচ্ছিল, তাই হোক। দোয়েল হচ্ছেন—ইংরেজী গ্রন্থকারের ভাষায়—A bird of groves and delight to move about on the ground in the mixed chequer of sunshine and shade"—এর সংক্ষেপে বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, আমাদের দোয়েল হচ্ছেন কুঞ্জবিহারী, (নিকুঞ্জবিহারী বললেও ক্ষতি নেই) কাননের আলো-ছায়ার ঝিলিমিলিতে বিহার করতে ভালবাসেন। একজন বিদেশী গ্রন্থকার লিখেছেন যে, দোয়েল ঘন ঝোপের ভিতর ঘোরাফেরা করতে ভালবাসে না (thick undergrowth it dislikes); কিন্তু আমি দু-তিনবার একে ঘন ঝোপে দেখেছি। অবশ্য শীতের সময়। সে সময় বেচারারা একটু মন-মরা হয়েই থাকে। গলা দিয়ে সুর পর্যন্ত বেরোয় না ভাল ক'রে। তবে ছোটখাটো পরিচ্ছন্ন জায়গাই বেশী পছন্দ করে এরা। আমাদের বাড়ির সেই ছোট্ট জায়গাটুকু ভারি ভাল লাগে ওদের—সেই যেখানে আয়না বসিয়েছিলাম, মনে আছে নিশ্চয় আপনার। এখানকার বাগানেও দোয়েল আছে একটা—সে তো আমার গিন্নীর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব ক'রে ফেলেছে। গাছের তলায়

তলায় তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোরাফেরা করে আহারের খোঁজে, তারপর উড়ে হয়তো একটা ডালে বা বাগানের দেয়ালের ওপর বসল, ঘাড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল। কোনও গাছের তলায় কোনও পোকামাকড় নড়ছে কি না দেখতে পাওয়া মাত্রই বোঁ ক'রে নেবে সেটি সংগ্রহ ক'রে গলাধঃকরণ করা হ'ল, তারপর আবার উড়ে গিয়ে বসা হ'ল সেই ডালে বা দেওয়ালের ওপর। ফুল তুলতে তুলতে আমার গিন্নী হয়তো খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন, দোয়েলের ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং তার চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যা ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—ও, আপনি! খাবার সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছি আমি। আপনার ওই ফুলগাছগুলোকে যে সব পোকামাকড় নষ্ট করছে তাদেরই সাবাড় করছি! এই ধরনের বেশ একটা সপ্রতিভ ভাব। তারপর হঠাৎ উড়ে গিয়ে এরিয়েলের ডগায় ব'সে গান ধ'রে দিলে একখানা, মনে হ'ল আমাদের বাগানে আমরা যে ওকে থাকতে দিয়েছি তারই কৃতজ্ঞতায় ও যেন উচ্ছ্বসিত এবং সেইটেই যেন ওর গানের মুখ্য প্রেরণা। দোয়েলের গানের যে কত মূর্ছনা, কত উত্থান-পতন, কত লালিত্য, কত বৈচিত্র্য তা তো আপনি রোজই শুনছেন। দিন কয়েক চেষ্টা ক'রে আমাদের এখানকার দোয়েলের গানের ধরনটা আমাদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিছুই হয় নি অবশ্য, কারণ গানের সুরটাই আসল, তা লিপিবদ্ধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এর থেকে ধরনটা হয়তো একটু বোঝা যাবে। কিছুটা ঠুকে পাঠাচ্ছি।—

ও পি পি পি পি পি—চিঃ—··· (দু মিনিট)

ও জা—গো শিগ্‌গির শিগ্‌গির শিগ্‌গির—(সঙ্গে সঙ্গে উড়ল)

পিঁ—কেরেঃ পিঁ—কেরেঃ পিঁ কেরেঃ··· (৫ মিনিট)

পি পি পি—কই তুমি—কই তুমি—কই তুমি—কি কি কি

(তিন মিনিট)

প্রি—প্রি—প্রি—প্রি—প্রি—য়া—প্রি—য়া··· (দু মিনিট)

পি ই ই ইঃ পি ই ই ইঃ (মিনিট খানেক)

পি—ঞ্চি—ঞ্চি—ঞ্চি—ঞ্চি—ঞ্চি—চি—চি—চি

(ডাকতে ডাকতে উড়ল)

কি যে—কি যে—কি যে কি যে—কি এ কি এ কি এ—ঞ্চিকিক্ ঞ্চিকিক্··· (মিনিট খানেক)

পি পি পি—কি করছ যে—কি করছ যে—দুত্তোর—দুত্তোর—

(দু মিনিট প্রায়)

এ—কি রেঃ এ কি রেঃ—এ কি রেঃ—চোখ গেল—চোখ গেল···

(তিন মিনিট)

এ ছাড়া আরও কত রকম যে ডাক আছে তা আমাদের অক্ষর দিয়ে লেখাও শক্ত। আমার ইচ্ছে আছে, দোয়েল পাখীর জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে একটি ছোট বই লিখব। ডেভিড ল্যাকের (David Lack) 'দি লাইফ অব দি রবিন' বইখানা দেখেছেন কি? ওখানে আমার শেল্‌ফে আছে, ইচ্ছে করেন তো দেখতে পারেন। ওই ধরনের বই একটা লেখবার ইচ্ছে আছে। হয়ে উঠবে কি না জানি না। এ দেশে নানা বাধা। একটা বাধা হচ্ছে জনসমাগম। বহু বেকার লোকের বাস এ দেশে, তাদের কোনও কাজ নেই। লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে আড্ডা দিয়ে বেড়ানোই একমাত্র কাজ। যখন-তখন হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ছে, দূর ক'রে দেওয়া যায় না, প্রাণ খুলে আপ্যায়িত করাও যায় না। অসময়ের বৃষ্টি বা ঝড়ের মত। মহা বিরক্তিকর। তবু একটু একটু ক'রে লিখছি। ওই ডেভিড ল্যাকের বইয়ে আর একটা কথাও দেখবেন এবং সম্ভব হ'লে মিলিয়ে দেখবেন—যা তিনি রবিন রেডব্রেস্টের সম্বন্ধে লিখেছেন, তা দোয়েলের সম্বন্ধে খাটে কি না। আমার মনে হচ্ছে খাটে। কথাটা হচ্ছে এই যে, পাখীরা সব সময়ে প্রিয়ার মনোরঞ্জন করবার জন্যেই যে গান গায় তা নয়। ডেভিড ল্যাক লক্ষ্য করেছেন যে,

কোনও পুরুষ রবিন রেডব্রেস্টের নিজস্ব এলাকায় যদি অন্য কোনও পুরুষ রবিন রেডব্রেস্ট এসে পড়ে, তা হ'লে আগন্তুক পাখীকে লক্ষ্য ক'রে এলাকার মালিক গানের তুফান তোলে। অর্থাৎ ঝঙ্কারের মাধ্যমেই তাকে হুঙ্কার দেয়। মানুষের সঙ্গে ওইখানেই ওদের তফাত। এলাকার স্বত্বে কেউ যদি অবাঞ্ছিত দাবি করে—আমরা গালাগালিই দিই, মোকদ্দমা করি; কিন্তু পাখীরা গান গেয়ে ওঠে। এবং সেই গানের মর্যাদাও রক্ষা করে ট্রেস্‌পাসার পাখীটি। ও, এটা যে আপনার এলাকা বুঝতে পারে নি ঠিক, সো সরি—মুখের এই রকম একটা কাঁচুমাচু ভাব ক'রে স'রে পড়ে সে। সব পাখী অবশ্য এতটা বিনীত নয়, দু-একজনকে মারধোর ক'রেও তাড়াতে হয়। আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, এদের নিজস্ব এলাকার মালিকানা কে ঠিক ক'রে দেয়? এরা নিজেরাই ঠিক করে। কোনও অনধিকৃত এলাকা যে আগে দখল করতে পারে সে এলাকা তারই হয়—পক্ষী-জগতে এই নিয়ম মেনে নিয়েছে সবাই। একাধিক দোয়েলের পায়ে বিভিন্ন রঙের 'রিং' পরিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি আপনারাও লক্ষ্য করতে পারেন, ডেভিড ল্যাক যেমন করেছেন। দোয়েলের বিষয় আরও কয়েকটা কথা জানিয়ে দিয়ে পত্র শেষ করি। দোয়েলের প্রধান খাদ্য হচ্ছে পোকা-মাকড়। ওদের যদি খাঁচায় পুষতে চান তা হ'লে ছোলা ছাতু বা ফল খাওয়ালে চলবে না,—ওরা টিয়া-চন্দনার মত বৈষ্ণব-প্রকৃতির নয়, রীতিমত শাক্ত। সেই জন্যেই বোধ হয় রাধাকৃষ্ণ বুলি ওদের শেখানো যায় না। এদের প্রকৃতিতে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবার আছে। এরা ছাতারের মত দল বেঁধে থাকতে পারে না। এমন কি নিজের প্রিয়ার সঙ্গেও এদের খুব যে একটা মাখামাখি আছে তা নয়। যখন প্রয়োজন হয় তখন প্রিয়াকে লক্ষ্য ক'রে এরা গানের ঝরনা বইয়ে দিতে পারে, কিন্তু দিনরাত প্রিয়ার সঙ্গে লেপটে থাকতে রাজী নয় এরা। মেজাজটাও

এদের একটু ঝাঁঝালো রকমের, ইংরেজীতে যাকে বলে pugnacious। অর্থাৎ এদের ধরন-ধারণ চাল-চলন সবই প্রকৃত আর্টিস্টের মত। এরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী, কারও সঙ্গেই গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাকতে চায় না। ফিন্‌ সাহেব লিখেছেন যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রস আইলাণ্ডে নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে দোয়েল পাখী দেখা যায় এবং তারা মানুষ দেখলে নাকি পালায় না। বড় দোয়েলকে ধ'রে খাঁচায় পোষা বেশ শক্ত, সহজে পোষ মানে না, ম'রে যায়। এর একটা কারণ বোধ হয়, যে-পোকামাকড় ওদের খাদ্য তা প্রত্যহ জোটানো শক্ত। একজন সাহেব কিন্তু খাঁচায় দোয়েল-দম্পতিকে পুষেছিলেন, খাঁচায় তারা নাকি ডিম পেড়ে বাচ্চাও লালন করেছিল—ফিন্‌ সাহেব লিখেছেন। ওদের লেখা বই যখনই পড়ি, একটা কথা বার বার মনে হয়। প্রকৃতির প্রত্যেকটি আচরণের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ওদের কি অদম্য কৌতূহল। অগাধ বিদ্যা আর শিশুসুলভ কৌতূহলের মণিকাঞ্চন-যোগ হয়েছে ওদের প্রতিভায়। আমাদের দেশে কত ফুল, কত পাখী, কত রকমের গাছ; কিন্তু সে সম্বন্ধে কারও কোনও কৌতূহলই নেই। দু-চারটে পাখী বা গাছের নাম অনেকে অবশ্য জানেন। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে যা কিছু তা সব 'জংলি' বা 'কি জানি'র পর্যায়ে। আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা আরও অজ্ঞ। একটু চেষ্টা করলেই তাঁরা নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারেন, কিন্তু সে চেষ্টাই কারও নেই। সবাই চাকরি কিংবা ব্যবসা ছাড়া আর যা কিছু করেন তা অতিশয় নিম্নস্তরের পরচর্চা। ভাবলে দুঃখ হয়। কি আশ্চর্য দেখুন, কথায় কথায় আমিও বেশ পরচর্চায় মেতে উঠেছি। এটা বোধ হয় আমাদের মজ্জাগত দোষ। চিঠি অনেক লম্বা হয়ে গেল। আর আপনার সময় নষ্ট করব না। পাখীর বিষয়ে নূতন কি কবিতা লিখলেন? পাঠাবেন? পাখী আকর্ষণ করবার জন্যে আপনারা যে সব ব্যবস্থা করেছেন তাতে

কোনও পাখী আকৃষ্ট হয়েছে কি না জানাতে বলবেন শ্রীমতী ডানাকে। আমার ছোট চিড়িয়াখানার চিড়িয়ারা আশা করি সুস্থ আছে। যদি কাউকে অসুস্থ দেখেন ছেড়ে দেবেন। প্যাঁচাটা কেমন আছে? ও খুব মাংসাশী লোক। মালিটাকে ব'লে এসেছি ইঁদুর ধ'রে দিতে। ইঁদুর যদি রোজ না পাওয়া যায় বাজার থেকে মাংসের কিমা কিনে দেবেন। এখানকার ব্যাপার মিটিয়ে ফিরে যেতে আমার বেশ দেরি হবে মনে হচ্ছে। জমিদারি সংক্রান্ত ব্যাপারে কাজকর্ম চালাবার জন্যে আপনাকে একটা 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' পাঠালাম এই সঙ্গে। রত্নপ্রভা এই সঙ্গে আপনাকে হাজার টাকার ক্রস্‌ড্ চেকও পাঠাচ্ছে। সে বলছে, এটা পারিশ্রমিক নয়—প্রণামী। শ্রীমতী ডানার চেকটা কাল বা পরশু পাঠাবে সে।

আপনারা আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানবেন। সব খবর দিয়ে উত্তর দেবেন। ইতি—

আপনাদের
অমরেশ

কবি চেকটার দিকে চেয়ে রইলেন। সহসা একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল তাঁর। মুখে মৃদু হাসি ফুটল। ডানার টেবিলে চিঠি-লেখার যে প্যাডখানা ছিল, সেইটে টেনে নিয়ে তিনি লিখলেন—

কবির তপস্যা-লোকে এসেছে অপ্সরী
যুগে যুগে নানা রূপ ধরি'।
কখনও সে মদিরাক্ষী টলমল-পান-পাত্র হাতে
যৌবন-হিল্লোলে দুলি' আসিয়াছে জ্যোৎস্না-নীল রাতে;
কভু চুপে চুপে
এসেছে ভক্তের রূপে;

প্রশংসার বাণী-রূপে কভু এসেছে সে
উচ্ছ্বসিত রসিকের বেশে ;
জনতার রূপ ধরি করিয়াছে কভু অভিষেক,
আদেশ করেছে কভু, কখনও সে 'চেক'।
বারম্বার তার কাছে পরাভব করেছি স্বীকার
তবু আমি কবি নির্বিকার
গুটি-কারাগার-মাঝে কিছুদিন থাকি শূন্য-গতি
তারপর একদিন উড়ে যাই মুক্ত প্রজাপতি।

কবিতাটির দিকে খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে থেকে কবি চেকটি মনি-ব্যাগে পুরে ফেললেন।

ঠিক পর-মুহূর্তেই ডানা এসে ঘরে ঢুকল।

"ও, আপনি এসেছেন। ভালই হয়েছে। আমি আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম। তালগাছে যে বাক্সটা আমরা টাঙিয়েছি, তাতে এক জোড়া শালিক বাসা বাঁধছে। ও কি, কবিতা লিখলেন বুঝি ?"

কবি কবিতাটা প'ড়ে শোনালেন।

"হঠাৎ এ ভাব মনে এল যে আপনার ?"

"এল।"

"চলুন, শালিকের বাসাটা দেখবেন।"

"চল। ফিরে এসে চা খাব কিন্তু।"

"বেশ।"

দুজনে বেরিয়ে গেলেন।

কবি অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরে-ফিরে বাসাটা দেখলেন। সত্যিই এক শালিকদম্পতি খড়কুটো মুখে নিয়ে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে।

"দেখেছেন ? ভারি মজা লাগছে আমার।"

"আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।"

"কেন ?"

"মানাচ্ছে না একটুও। মনে হচ্ছে যেন এক সাঁওতাল-দম্পতিকে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে কলকাতা শহরের দোতলা ফ্ল্যাটে। মনে হচ্ছে—ওটা যেন ফাঁদ, বাসা নয়।"

"কি যে আপনার আজগুবি কল্পনা! চলুন, চা ক'রে দিই আপনাকে।"

ডানা হেসে কথাটা বললে বটে, কিন্তু কথাগুলো হঠাৎ কেমন যেন তার মনে গেঁথে গেল।

"তাই চল।"

দুজনে আবার বাসার দিকে ফিরলেন।

ডানা অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

পরের দিন সকালে উঠেই ডানার সর্বপ্রথম মনে পড়ল শালিকের বাসার কথাটা। তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তালগাছটার উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই যা চোখে পড়ল, তাতে চমকে উঠল সে। বাসা থেকে একটা সাপের খোলস ঝুলছে। পাখী দুটো কোথায়? এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, দেখতেই পেল না। মহা মুশকিল হ'ল তো! ওদের বাসায় সাপ ঢুকেছে না কি! তাড়াতাড়ি গিয়ে চাকরটাকে ডেকে নিয়ে এল। চাকরটা খানিকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বললে, "ঢিল ছুঁড়ে দেখব ?"

"ঢিল ছুঁড়বি ? যদি ওরা ভেতরে ডিম পেড়ে থাকে! তুই গাছে উঠতে পারবি না ?"

"না"

"তা হ'লে উপায় ?"

চাকরটা তালগাছটার তলায় গিয়ে গাছটাকে নাড়া দিতে চেষ্টা করল। গাছ নড়ল না একটুও।

"মই জোগাড় করতে পারিস কোথাও থেকে?"

"মই নিয়ে কি হবে?"

"মই লাগিয়ে তুই উঠতে পারিস?"

"সে আমার দ্বারা হবে না। ওখানে উঠে জান দেব না কি? সত্যিই যদি সাপ থাকে আর সে যদি তাড়া ক'রে আসে—ওরে বাবা, সে আমি পারব না মাইজি—"

ডানার মনে হ'ল, সাপের খোলসটা দুলছে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হতে লাগল তার। দিনের আলোয় তার চোখের সামনে এত বড় একটা সর্বনাশ হতে থাকবে আর সে কিছুই করতে পারবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে খালি। না, তা কিছুতেই হতে পারে না। কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

"তুই একটা মই যোগাড় ক'রে আন্ তো। তুই উঠতে না চাস আমি উঠব।"

"মই আমি কোথায় পাব?"

"আমি আনন্দবাবুকে একটা চিঠি দিচ্ছি। চিঠিটা নিয়ে তুই ছুটে চ'লে যা। তিনি নিশ্চয়ই একটা মই যোগাড় ক'রে দিতে পারবেন। চট ক'রে যাবি আর আসবি।"

ডানা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে কবিকে একটা চিঠি লিখল—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মহা মুশকিলে পড়েছি। তালগাছে শালিক পাখীর বাসায় সাপ ঢুকেছে। একটা মই চাই। একটা লোকও যদি পাঠাতে পারেন ভাল হয়। আপনাকে কষ্ট ক'রে আসতে হবে না, একটা মই পেলে আমিই সব ঠিক ক'রে নেব। আপনি আসবেন না কিন্তু। এলে খুব রাগ করব। বিপদে পড়লে পুরুষদের সাহায্য

ছাড়াও যে আমরা সামলে নিতে পারি, দোহাই আপনার, সেটা যাচাই করবার সুযোগ দিন। ইতি

ডানা

আগের দিন ছিমছাম কৃত্রিম মানুষের তৈরী বাসায় শালিক-দম্পতিকে দেখে কবির মনে যে বেসুর বেজেছিল, সেইটেই তাঁকে পরদিন প্রভাতে একটি কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করল। উপলক্ষ্য হ'ল একটি দাঁড়কাক। দাঁড়কাকটি তাঁর বাড়ির সামনের একটি ডালে ব'সে তারস্বরে চীৎকার করছিল। মন্দাকিনী থাকলে তার ওই শ্রুতিকঠোর খা-খা-খা শব্দ কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না, কাকটাকে তাড়িয়ে ছাড়তেন। কবি কিন্তু উদ্বুদ্ধ হলেন এবং ছন্দে গেঁথে দাঁড়কাককে খামখা উপদেশ দিতে ব'সে গেলেন। প্রথম দু লাইন লিখেই তাঁর মনে হ'ল, ভাবটি যেই জ'মে আসবে অমনি ঠিক খুনের মামলার নথিপত্র নিয়ে কুঁজো গণেশ গোমস্তা হাজির হবে এসে। সম্ভাবনাটা মনে জাগতেই ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। রাগও হ'ল, মনে হ'ল এলেই দূর ক'রে দেব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুভব করলেন যে, মনের সুরটাও কেটে যাবে তা হ'লে। গণেশের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও বিদায় নেবে। কিন্তু উপায়ই বা কি। গণেশকে কি ক'রে ঠেকাবেন তিনি, সত্যিই যদি এসে পড়ে সে। হঠাৎ মনে পড়ল, একটা উপায় আছে। ঠাকুরকে ডাকলেন। চন্দনচর্চিত মৈথিলী ঠাকুরটি দ্বারপ্রান্তে এসে নিজস্ব বাংলায় সসম্ভ্রমে বললে, "আমাকে ডাকিয়েসেন বাবু?"

"দেখ, কেউ যদি এখন আসে ব'লো যে, বাবুর শরীরটা ভাল নেই, এখন দেখা করবেন না কারও সঙ্গে।"

"বেশ। ভাত তো রেন্না করিয়েসি, দু-চারঠো রোটি কি বানাব? শরীর যেখন খারাব—"

"না, ভাতই খাব।"

ঠাকুর চ'লে গেল। জানলা দিয়ে কবি চাইলেন বাইরের

দিকে। দাঁড়কাকটা তখনও ডাকছিল। কবি তাকে উদ্দেশ ক'রে লিখলেন—

বলিষ্ঠ দাঁড়কাক
যা আছিস তাই থাক্
বুলবুলি হবি কোন্ দুঃখে
শুনে লেগে যায় তাক
তোর ওই হাঁকডাক
রূপ দেয় রুষ্টে ও রুক্ষে।

মনে আছে কবি এক দিয়েছিল তোরে গাল
ময়ূরের পেখমেতে হয়েছিলি নাজেহাল।

দেখিস খবরদার
করিস না যেন ধার
অভাব কিসের তোর বচ্ছ
কুচকুচে কালো গায়
আলো যে পিছলে যায়
কুচকুচে চোখ তোর স্বচ্ছ।

শৌখিন পাখীদের মিহি সুর ছাপিয়ে
গলা ছেড়ে হাঁক দে রে চারিদিক কাঁপিয়ে

ন্যাকামিকে তাড়িয়ে
সা রে গা মা ছাড়িয়ে
ছোটা তোর বেসুরের অশ্ব

রে হাবসি-সম্রাট,
তোর ঠাট তোর বাট
একেবারে তোর যে নিজস্ব।

ওরে ওরে দাঁড়কাক
যা আছিস তাই থাক্
কালো-কোলো বোম্বেটে পক্ষী
বুলবুলি দোয়েলের
টুনটুনি কোয়েলের
হ'স না নকল যেন লক্ষ্মী।

ডানার চাকর আনন্দবাবুর বৈঠকখানায় এসে কড়া নাড়তেই ঠাকুর গিয়ে হাজির হ'ল। সে যেন ওৎ পেতে ব'সে ছিল।

"বাবুর তবিয়ত খারাপ। মুলাকাত হোবে না।"

"মাইজি আমাকে একটা মই নিয়ে যেতে বলেছেন।"

"মই? মানে সিঁড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"সিঁড়ি তো হামাদের নাই।"

"কাদের আছে?

"রূপচন্দবাবুর বাসায় খুব লম্বা সিঁড়ি দিখিয়েছি একটা। সিথায় গেলে মিলতে পারে।"

"ও, আচ্ছা—"

রূপচাঁদবাবু আপিসে চ'লে গিয়েছিলেন।

যথারীতি চণ্ডী এসেছিল বকুলবালার কাছে। সে একটি দুঃসংবাদ বহন ক'রে এনেছিল। অনেক চেষ্টা ক'রেও গণশা এবার নাকি হলদে পাখীর বাসা আবিষ্কার করতে পারে নি। অথচ এই

হলদে পাখীর বাসা আবিষ্কারের উপর চণ্ডীর ভবিষ্যৎই নির্ভর করছিল। বকুলবালা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি সে হলদে পাখীর বাচ্চা এনে দিতে পারে তা হ'লে তাকে 'এয়ার-গান' কিনে দেবেন একটা। চণ্ডীকে অবশ্য তিন-সত্যি করতে হয়েছিল যে, সে এয়ার-গান দিয়ে কাক ছাড়া আর কোনও পাখী মারতে পারবে না। বেরাল, নেউল, শেয়াল, ক্ষ্যাপা কুকুর এসব মারতে পারে, কিন্তু কাঠবেড়ালী, ছাগলছানা বা গরু-বাছুরকে কিছু বলতে পাবে না। চণ্ডী এসব শর্তে রাজী ছিল, কিন্তু গণশা যা বললে তাতে তো এ বছর এয়ার-গান পাবার আশা দুরাশা।

বকুলবালা একটা ধনুকে ছিলে পরাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য দুর্বৃত্ত কাককুলকে শাসন করা। বকুলবালা একটু আরাম ক'রে বারান্দায় তোলা-উনুনটি নিয়ে রাঁধতে চান, (গরমে ওই ঘুপসি রান্নাঘরে টেকা যায় নাকি।) কিন্তু কাকের দৌরাত্ম্যে তা হয়ে উঠছে না। একটু নড়বার জো নেই—কখনও মাছভাজাটা নিয়ে পালাচ্ছে, কখনও দুধে মুখ দিচ্ছে। জ্বালাতন হয়ে উঠেছেন তিনি। তাই আজ ঠিক করেছেন, তীর-ধনুক দিয়ে কাক তাড়িয়ে তবে রাঁধতে বসবেন। তীর-ধনুকটা পাশেই থাকবে, তা হ'লে মুখপোড়ারা ভয়ে আর আসবে না।

চণ্ডীর মুখ থেকে দুঃসংবাদটি শুনে তিনি শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন একটু। ভাবটা—তুমি যে একটি অপদার্থ তা আমি বরাবরই জা[illegible]

মুখে বললেন, "ছিলেটা পরা তো, আমি বাঁকারিটা ভাল ক[illegible] বাঁকিয়ে ধরছি। খুব কস্‌-কসিয়ে বাঁধবি।"

চণ্ডী যথাসাধ্য শক্ত ক'রে দড়িটা বেঁধে ফেললে।

"এইবার একটা তীর ছোঁড়্‌ দিকি। ওই কাকটাকে মার্‌। মুখপোড়া সকাল থেকে জ্বালাচ্ছে আমাকে।"

"তীর কোথায়?"

"ওই যে। সকাল থেকে তো তীরই বানাচ্ছিলাম। একা হাতে বাঁশ চিরে তৈরি করেছি। তুমি তো এই এতক্ষণে এলে—"

চণ্ডী ধনুকে তীর যোজনা ক'রে লক্ষ্য করতেই কাকটা স'রে পড়ল। আশেপাশে আরও যা দু-একটা ছিল, তারাও উড়ে গেল।

"এই হচ্ছে ওদের ওষুধ।"

বকুলবালার চোখ দুটো আনন্দে ঝলমল ক'রে উঠল।

"দেখি, দেখি, আমাকে দে তো—"

একটা কাক অনেক দূরে মিত্তিরদের চিলেকোটার ছাদে এসে ব'সে ছিল আবার। বকুলবালা তীর-ধনুক আঁচল দিয়ে ঢেকে গুঁড়ি মেরে মেরে অগ্রসর হতে লাগলেন সে দিকে।

"এইবার মারুন।"—ফিসফিস ক'রে চণ্ডী বললে।

বেশ বাগিয়ে তীর ছুঁড়লেন বকুলবালা। আর একটু হ'লেই লাগত, একবারে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কাকটা কা-কা ক'রে পাড়া মাতিয়ে তুলল।

"তীরটা খুঁজে নিয়ে আয়।"

একছুটে বেরিয়ে গেল চণ্ডী এবং একটু পরেই তীরটা নিয়ে এল। এ সব ব্যাপারে সে ওস্তাদ একজন।

"রেখে দে ঠিক জায়গায়। গুছিয়ে রাখ্।"

চণ্ডী বিনা প্রতিবাদে আদেশ পালন করল।

বকুলবালা এবার হলদে পাখীর প্রসঙ্গে এলেন।

"গণশা এবার হলদে পাখীর বাসা দেখতেই পায় নি?"

"অমরবাবুর আম-বাগানে গণশা গেল-বছর হলদে পাখীর বাসা দেখেছিল। এ বছর সে বাগানে হলদে পাখীই নাকি দেখা যাচ্ছে না। গণশা বলছিল, অমরবাবুর লোকেরা নানা রকম ফাঁদ পেতে, জাল ফেলে, বন্দুক আওয়াজ ক'রে সব পাখীদের ভড়কে দিয়েছে, এ বছর ওরা হয়তো এ অঞ্চলে বাসা বাঁধবে না।"

"দূৎ, তা কি কখনও হতে পারে? এখানকার পাখী কি বাসা বাঁধবার জন্যে দিল্লী মক্কা চ'লে যাবে? গণশাটা বোকা, কিছু জানে না। তুই নিজে খুঁজিস একটু—"

"আমি যে হলদে পাখীর বাসা চিনিই না।"

"পাখীর বাসা চেনা আর শক্ত কি। পাখীর বাসা দেখিস নি কখনও?"

"আমাদের ঘরের আলসেতে একবার শালিক বাসা বেঁধেছিল। কাকের বাসাও দেখেছি। বাবুই পাখীর বাসাও দেখেছি। কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রকম যে। হলদে পাখীর বাসা দেখি নি কক্‌খনও কিনা।"

"গণশা তো দেখেছে, তাকে জিজ্ঞেস করিস না।"

"আচ্ছা।"

এমন সময় বাইরের দুয়ারে ডাক শোনা গেল, "বাবু বাড়ি আছেন?"

"দেখ্ তো কে এল এমন অসময়ে?"

চণ্ডী বেরিয়ে গেল। ডানার চাকরকে সে চিনত। আনন্দবাবুকে লেখা ডানার চিঠিখানা নিয়ে ফিরে এল সে।

"অমরবাবুর বাগান-বাড়িতে যে মেয়েটি আছেন তিনি একটা সিঁড়ি চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন আনন্দবাবুকে। আনন্দবাবু এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"চিঠিটা পড়্ তো।"

ডানার সম্বন্ধে দু-একটা কথা রূপচাঁদের মুখে বকুলবালা শুনে-ছিলেন। মেয়েটি নাকি বেশ লেখাপড়া জানা, অমরবাবু দু শো টাকা মাইনেয় চাকরি দিয়েছেন নাকি ওকে। ডানার সম্বন্ধে বকুলবালার বেশ একটা কৌতূহল ছিল, চিঠিটা শুনে তা আরও বেড়ে উঠল। খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বেশ লিখেছে তো চিঠিখানা। নিশ্চয়, পুরুষদের সাহায্য নিতেই হবে তার কোনও মানে নেই। কল্পনানেত্রে তিনি যেন শালিক পাখীর বাসায় প্রবিষ্ট সাপটাকে দেখতে পেলেন। অনেক দিন আগে ছেলেবেলায় একবার এ ধরনের

ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তাঁদের পায়রার খোপে সাপ ঢুকেছিল। সহসা তাঁর সমস্ত শক্তি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

বললেন, "চণ্ডী, তুই তীর-ধনুকটা সঙ্গে নে। চাকরটাকে ডাক্, মইটা সঙ্গে নিয়ে চলুক, আমরাও যাই চল্।"

ডানাকে দেখে বকুলবালা সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন, মেম-সাহেব-গোছ হোমরা-চোমরা কিছু দেখবেন। খড়কে-ডুবে-পরা, ছিপছিপে-গড়ন ইনিই ডানা না কি! মুখখানি তো চমৎকার! নিতান্ত ছেলেমানুষও। খুব ভাল লেগে গেল।

"নমস্কার—"

সপ্রতিভভাবে নমস্কার ক'রে ডানা এগিয়ে গেল।

"আপনাকে তো চিনতে পারছি না।"

"আমি বকুলবালা। আমার স্বামীর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি।"

"কে আপনার স্বামী?"

বকুলবালা চণ্ডীর দিকে ফিরে বললেন, "বল্ না রে।"

"রূপচাঁদবাবু।"

"ও, রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী আপনি। আসুন, আসুন। আমি একটা মুশকিলে পড়েছি। ওই দেখুন—"

বকুলবালা দোদুল্যমান সাপের খোলসটার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার।

"সব শুনেছি আমি। আনন্দবাবুর কাছে মই ছিল না। লোকটা ঘুরে আমার বাড়ি গিয়েছিল। তার হাতে আপনি যে চিঠিটা দিয়েছিলেন, সেটা চণ্ডী আমাকে প'ড়ে শোনালে। আমি নিজে লিখতে পড়তে কিছু জানি না, 'ক' অক্ষর গোমাংস যাকে বলে তাই। কিন্তু আপনি চিঠিতে যা লিখেছেন তা শুনে এত ভাল লাগল যে, থাকতে পারলাম না, নিজেই চ'লে এলাম। সত্যিই

তো, তুচ্ছ সব ব্যাপারের জন্যে পুরুষমানুষের সাহায্য কেন নিতে যাব আমরা ? চলুন, দেখা যাক। ওরে, মইটা দে তো এইবার আমাকে—”

ডানাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে বকুলবালা মইটা চাকরের হাত থেকে নিয়ে নিজেই সেটা অবলীলাক্রমে ব’য়ে নিয়ে গেলেন তালগাছটার কাছে। মইটা যখন তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর দুই বাহুর পেশীর দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল ডানা। অনেক দিন আগে সার্কাসে এই রকম মেয়ে দেখেছিল সে। মইটা তালগাছে লাগিয়ে ডানার দিকে ফিরে বকুলবালা বললেন, “আসুন আপনি।”

বকুলবালার গাছকোমর বাঁধাই ছিল, মাথার খোঁপাটা এলিয়ে বেণীটা লুটিয়ে প’ড়ে ছিল পিঠের উপর। কৌতূহল ঝলমল করছিল চোখের দৃষ্টিতে। অদ্ভুত দৃশ্য। ডানা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে ছিল তাঁর দিকে।

বকুলবালা হঠাৎ ডানার দিকে ফিরে অনেকটা যেন জবাবদিহির সুরে আবার বললেন, “আপনি হয়তো ভাবছেন, চাকরকে দিয়ে মই বইয়ে আনা কেন তবে, ও কি পুরুষমানুষ নয় ? এর উত্তরে আমি বলব, ওদের মাইনে দিয়ে যখন রেখেছি তখন খাটিয়ে নেব বইকি। ওরা যখন থাকবে না, তখন নিজেরাই সব করব। কি বলেন ? আসুন, সিঁড়ির নীচের দিকটা চেপে ধরুন, আমি উঠি—”

ডানা এগিয়ে গেল। বকুলবালার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে যদিও প্রথমটা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু তাঁর সরল সপ্রতিভ আলাপে বিব্রত ভাবটা কেটে গেল। রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী এমন চমৎকার মানুষ, অথচ আলাপ হয় নি এতদিন।

“বেশ জোরে চেপে ধ’রে থাকুন।”

“আপনি উঠছেন তো, কিন্তু সত্যিই যদি সাপ থাকে।”

“থাকলেই বা, কি করবে আমার। চণ্ডে, ওই বাঁকারিটা প’ড়ে

আছে, আমায় দে তো। কিছু দূরে উঠে খোঁচা দিয়ে দেখব প্রথমে। সাপ থাকলে হয় ফোঁস করবে, না হয় বেরিয়ে পড়বে।"

চণ্ডী বাঁকারিটা এনে দিতে বকুলবালা তলোয়ার গোঁজার মত ক'রে কোমরে সেটা গুঁজে নিলেন। তারপর উঠতে লাগলেন। ডানা মইটা ধ'রে রইল শক্ত ক'রে। আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে লাগল শালিক পাখীরা। দু-একটা পাখী উড়ে এসে ঠোকরাবারও চেষ্টা করতে লাগল বকুলবালাকে। বকুলবালা কোমর থেকে বাঁকারিটা খুলে তলোয়ার-চালানোর ভঙ্গীতে আস্ফালন করতে করতে উপরে উঠতে লাগলেন।

"আর বেশি উঠবেন না। এবার খোঁচা দিয়ে দেখুন, ভিতরে কিছু আছে কি না।"

বকুলবালা তর্ তর্ ক'রে বেশ অনেকখানি উঠে পড়েছিলেন। পাখীর বাসা তাঁর বাঁকারির নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। তিনি সাপের খোলসটায় প্রথমে খোঁচা দিলেন, খোঁচা দিতেই প'ড়ে গেল সেটা। বাসার ভিতর খোঁচা দিলেন, কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন সোজা তিনি উঠে গেলেন এবং বাসার ভিতর উঁকি মেরে দেখলেন। ডানা সোৎসুকে ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে ছিল, বকুলবালা কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি তার দিকে প্রেরণ ক'রে বললেন, "সাপ-টাপ কিছু নেই। চারটি নীল রঙের ডিম রয়েছে। পেড়ে আনব?"

"না না, পাড়বেন কেন! বাচ্চা হবে, তখন দেখা যাবে। আপনি নেবে আসুন।"

বকুলবালা অকম্পিত চরণে দ্রুতগতিতে নেবে এলেন।

"আচ্ছা, সাপের খোলসটা ওখানে গেল কি ক'রে তা হ'লে?"

ডানা সমস্যাটার সমাধান করতে পারছিল না কিছুতে। বকুলবালা সমাধান ক'রে দিলেন। বললেন, "ওই মুখপোড়ারাই নিয়ে গেছে হয়তো মুখে ক'রে। কে শত্রু, কে বন্ধু সে বোঝবার বুদ্ধি কি ওদের আছে! দেখুন না, আমাকেই তেড়ে তেড়ে ঠোকরাতে

আসছে, অথচ আমি ওদের বাসা থেকে সাপ তাড়াতে যাচ্ছি। ওদের ঘটে বুদ্ধি থাকলে ভাবনা ছিল কি।"

"চলুন, একটু চা খাওয়াই আপনাকে।"

"এ সময়ে কেউ আবার চা খায় না কি? চা খাব সেই পাঁচটায়, উনি আপিস থেকে ফিরে এলে।"

"তবু চলুন, বসবেন একটু।"

"তা বসছি একটু, চলুন—"

বকুলবালা ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল ডানার টেবিলের উপর মোটা মোটা বই দেখে।

"এই সব আপনি পড়েন?"

"পড়ি মাঝে মাঝে। অমরেশবাবু দিয়ে গেছেন, পাখীর বিষয়ে কিছু জানবার দরকার হ'লে উলটে-পালটে দেখি—"

"এতে সব পাখীর কথা আছে না কি? সব পাখীর বই?"

"হ্যাঁ। অনেক রকম পাখীর ছবিও আছে, দেখুন না।"

"হলদে পাখীর ছবি আছে?"

হলদে রঙের পাখী তো অনেক আছে, কোন্‌টার কথা আপনি বলছেন?"

"বেনেবউ।"

"ও, বুঝেছি। খুব ভাল ছবি আছে, দেখাচ্ছি আপনাকে।"

ডানা ছবি বার ক'রে দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বকুলবালা। চণ্ডীও সমান উৎসাহে বইটা আঁকড়ে ধরেছিল, কিন্তু বকুলবালার ধমক খেয়ে ছেড়ে দিতে হ'ল বেচারাকে।

"তুই ছাড়্‌ না, আমি আগে দেখে নিই, তারপর তোকে দেখাচ্ছি। অমন আত্মাখলাপনা করিস কেন? বাঃ, চমৎকার তো! ঠিক যেন জ্যান্ত পাখীটি ডালে ব'সে রয়েছে। এর একটা বাচ্চা পোষবার খুব শখ আমার, কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছি না।"

ডানা বললে, "আমারা লোক বাহাল করেছি সব রকম পাখীর

বাচ্চা সন্ধান করবার জন্তে। হলদে পাখীর বাচ্চা যদি পাই, দেব আপনাকে পাঠিয়ে।"

"দেবেন ? সত্যি বলছেন ? তিন সত্যি করুন।"

বকুলবালা উদ্ভাসিত চক্ষে ডানার হাত দুটি চেপে ধরলেন।

এতটা ছেলেমানুষি ডানা প্রত্যাশা করে নি। সেও ছেলেমানুষের মত হেসে ফেললে, হেসেই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভও হ'ল একটু।

"তিন সত্যি করবার দরকার কি ? পেলে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব।"

বকুলবালার জেদ চ'ড়ে গেল হঠাৎ।

"না, আপনি তিনবার বলুন—দেব দেব দেব। বলতেই হবে আপনাকে।"

বকুলবালার চোখের দিকে চেয়ে ডানা একটু অবাক হয়ে গেল। কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটে উঠেছে দৃষ্টিতে। শুধু তিন সত্যি ক'রেই নিস্তার পেলে না সে, গায়ে হাত দিয়ে দিব্যিও করতে হ'ল তাকে। আদেশ প্রতিপালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরল হাসিতে চোখ-মুখ ঝলমল করতে লাগল বকুলবালার।

"এবার যাই ভাই। ওঁর আসবার সময় হ'ল আপিস থেকে, খাবার-টাবার কিছু করা হয় নি এখনও। এই চণ্ডী, ওঠ্।"

চণ্ডী সবিস্ময়ে নানা রকম পাখীর ছবি দেখছিল। কি অদ্ভুত সব পাখী!

"এটা কি পাখী ?"

"ধনেশ।"

বকুলবালা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন।

"ধনেশ আবার পাখীর নাম হয় নাকি! ধনেশ বলতেই মনে পড়ে আমাদের গাঁয়ের ধনেশ ময়রাকে—মোটা কালো গোলগাল, দেখলেই মনে হ'ত একটা তরমুজ বুঝি হেঁটে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা হ'লেই বলত, খুকী, পানতোয়া খাবে? চল তা হ'লে দোকানে। আমি তাকে দেখলেই ছুটে পালাতাম। এ তো অদ্ভুত পাখী

দেখছি, ঠোঁটের ওপর একটা আবের মত রয়েছে।...চণ্ডী, তুই উঠবি কি না বল্, না উঠিস তো আমি একাই চললাম।”

বকুলবালা চণ্ডীর সঙ্গে চ'লে গেলেন। ডানা একা ব'সে ব'সে বকুলবালার কথাই ভাবছিল। খুব ভাল লেগেছিল তার মেয়েটিকে। অনিবার্যভাবে রূপচাঁদের কথাটাও তার মনে হচ্ছিল। ওই রকম প্যাঁচোয়া লোকের এত সরল স্ত্রী! এমন চমৎকার সহজ সরল স্বাস্থ্যবতী জীবনসঙ্গিনী পেয়েও ওঁর এমন কাঙালপনা কেন? মনে হ'ল, সহজ সরল ব'লেই হয়তো মনের মিল হয় নি। হাবভাবময়ী লীলাকুশলা হ'লে হয়তো পছন্দ হ'ত। হঠাৎ তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হ'ল। ছুটতে ছুটতে বকুলবালাই এসে হাজির হলেন আবার।

“একটা কথা আপনাকে মানা করা হয় নি। ওঁর কাছে যেন ভুলেও কক্ষনও বলবেন না যে, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম।”

“কেন?”

“ওরে বাবা! খেয়েই ফেলবেন তা হ'লে আমাকে। কোথাও যাওয়া উনি পছন্দ করেন না।”

“হলদে পাখীর বাচ্চা যদি পাই, তা হ'লে পাঠাব কি ক'রে আপনাকে?”

“চণ্ডে আসবে নিতে। মাঝে মাঝে ও এসে খবর নিয়ে যাবে। এই চণ্ডে, ভুলিস না যেন—”

“না।”

চণ্ডী সাগ্রহে মাথা নেড়ে জানাল যে, কিছুতেই তার ভুল হবে না।

“চললুম। ছুটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছি।”

বকুলবালার সমস্ত মুখ হাসিতে ভ'রে উঠল।

“চললুম ভাই, তা হ'লে।”

“আসুন। মাঝে মাঝে আসবেন লুকিয়ে। আমি রূপচাঁদবাবুকে কিছু বলব না।”

“আচ্ছা, আসব। চণ্ডে, চল্, আমরা ওই বাগানটার ভেতর

দিয়ে যাই। রাস্তা দিয়ে গেলে কেউ যদি দেখতে পেয়ে যায়! রোদ প'ড়ে গেছে তো, লোক চলাচল শুরু হয়েছে—"

"বেশ, তাই চলুন।"

চণ্ডীকে নিয়ে বকুলবালা চ'লে গেলেন। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে ডানার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন আর একবার। তারপর বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ডানা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য মেয়েটি! বয়স বেড়েছে, কিন্তু মন বাড়ে নি। দেহটা যেন মনের ছেলেমানুষির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না, হাঁপিয়ে পড়ছে। অথচ সেদিকে খেয়ালও নেই। একটু যেন ঈর্ষা হ'ল। মনে হ'ল, আধুনিকতার অতি-সভ্য জটিল মানসিকতা, সাহিত্য-বিজ্ঞানের কারু-কলায় যার নিত্য নূতন রূপ বিকশিত, এই সরলতার কাছে হার মেনেছে। গাছের ফুলের কাছে কাগজের ফুল দাঁড়াতে পারে কখনও? অকারণ ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মনটা। তারপর মনে হ'ল, পাখীর পালক বিষয়ে যে প্রবন্ধটা সে ফেঁদেছিল সেটা খানিকটা লেখা হয়ে প'ড়ে আছে। শালিক পাখীর বাসাটা নিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটল, বকুলবালাকে নিয়ে কাটল আরও খানিকক্ষণ। এইবার পাখীর পালক নিয়ে পড়া যাক। সময় কাটানোটাই যেন জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। ঘরে ফিরে পাখীর পালক বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের জন্য বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল। অমরবাবু একগাদা বই দিয়ে গিয়েছিলেন তাকে। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন অকূল পাথার। কিন্তু এ অকূল পাথারে কষ্ট হয় না, নব নব বিস্ময়ে ভ'রে ওঠে মন। সাপ যে-সরীসৃপশ্রেণীভুক্ত, সেই সরীসৃপই যে বিবর্তিত হয়ে পাখীতে পরিণত হয়েছে—এ কথা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না, অথচ বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলছেন। সরীসৃপের গায়ের আঁশই নাকি পালকের রূপ ধারণ করেছে। সরীসৃপ-পূর্বপুরুষদের আঁশ পাখীদের গায়ে এখনও বর্তমান, পাখীদের নখও নাকি আঁশ থেকে

হয়েছে, কোন কোনও পাখীর ঠোঁটও। এদের ঠোঁট নাকি খোলসও ছাড়ে বছরে বছরে সাপের মত। এ সব কথা কল্পনাতীত ছিল তার, অথচ সবই বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফলে সত্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে, অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে-সরীসৃপ বুক দিয়ে মাটিতে হাঁটত, সে-ই ক্রমশ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে হাঁটতে শিখল, তারপর লাফিয়ে গাছে চড়ল, তারপর উড়ল আকাশে। আকাশ পেরিয়ে আর কোথাও যাবে নাকি? কিংবা হয়তো গেছে, এখনও জানা যায় নি। আকাশচারী হয়ে এদের চঞ্চলতা তো বেড়েছে, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তিও বেড়ে গেছে বহুগুণ। ঘ্রাণশক্তি নাকি কমেছে। তাই এরা দুর্গন্ধ স্থানে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারে, দুর্গন্ধ পোকামাকড়ও গিলে খায় স্বচ্ছন্দে। ঘ্রাণশক্তি ক'মে গিয়ে একটা বাধাই যেন অপসারিত হয়েছে, জীবনকে আরও তীব্রভাবে উপভোগ করতে পারছে ওরা। বস্তুত পাখীর মত অমন স্বতস্ফূর্ত চঞ্চল প্রাণের প্রকাশ প্রকৃতির আর কোনও প্রাণীতে আছে কি? পাখীর আসল পরিচয় ওর প্রাণলীলায়। যতক্ষণ জেগে থাকে স্থির থাকে না এক মুহূর্ত। নেচে গেয়ে লাফিয়ে উড়ে রঙের বাহার ছড়িয়ে ও যেন সর্বদাই সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমি শুধু বেঁচে নেই, আমি জীবনটাকে উপভোগ করছি। পালক ওদের এই অতিক্রান্ত ছন্দ-মুখরিত বর্ণ-বিচিত্র জীবনযাত্রার প্রধান সহায়। এই পালক ওদের গায়ের লেপ (ওদের পালক চুরি ক'রে আমরাও লেপ তৈরি করি), এই পালক ওদের যানবাহনও, পালকের সাহায্যেই ওরা ওড়ে। এই পালকের সাহায্যে ওরা শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষাও করে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সঙ্গে পালকের রঙ বেমালুম ভাবে মিলিয়ে দিয়ে ওরা শত্রুর চোখে ধুলো দেয়। জীবন্ত পাখীটাকে দেখতেই পাওয়া যায় না। মনে হয়, বুঝি ঝোপের ভিতর ওটা আলোছায়ার কারিকুরি—বনমুরগী নয়, কিংবা গঙ্গার চরে ওগুলো

বালির ঢেউ—টিট্টিভ নয়। এ ছাড়া পালকের সাহায্যে ওরা প্রণয়লীলাও করে নানা রকম। পুরুষপাখী নানা বর্ণের পক্ষ বিস্তার ক'রে আহ্বান জানায় প্রণয়িনীকে। প্রণয়িনীও সাড়া দেয় পালকের ইশারায়। অনেক পাখী পালক দিয়ে বাসাও তৈরি করে ডিম পাড়বার সময়। মোট কথা, পাখীর জীবনে পালক অপরিহার্য, ওই ওদের ব্যক্তিত্ব। দু জাতের দু রকম পাখী পালকের জন্যই দু রকম, পালক ছাড়িয়ে ফেললে কোনও তফাত থাকে না আর বিশেষ। পালকের রঙের বিষয়েও একটা আশ্চর্য কথা চোখে পড়ল তার। সাধারণত প্রাণীদের শরীর থেকেই রঙ তৈরি হয়। পাখীরও হয়। কিন্তু অনেক পাখীর পালকের এমন গঠন-বৈচিত্র্য যে, সূর্যালোকই সেই পালকে প'ড়ে ভেঙে যায় এবং সূর্যালোক-ভাঙা রঙ তখন প্রতিফলিত হয় পালক থেকে। আকাশে যেমন আমরা রামধনুর রঙ দেখি, অনেকটা তেমনই। রঙটা আলোর, পালকের নয়। সব পাখীর পালকে অবশ্য এমন আলোর লীলা হয় না, কোন কোন পাখীর পালকের গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্যই এ রকম হয়। পাতা ওলটাতে ওলটাতে আর একটা কথা চোখে পড়ল। অদ্ভুত কথাটা। কোটি কোটি বৎসর ধ'রে পৃথিবীর জীবেরা নাকি বোবা ছিল, তাদের মুখে ভাষা ফুটেছে অনেক পরে।

মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মধ্যে এখনও অনেকেই মূক। তাদের কণ্ঠে ভাষা নেই। তাদের অনেকে শব্দ করে বটে, কিন্তু তা কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় না, হয় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে। পতঙ্গরা শরীরের এক অংশ অন্য অংশে ঘর্ষণ ক'রে শব্দ করে। মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট উভচরেরাই সর্বপ্রথমে কণ্ঠস্বরের অধিকারী হয়েছিল। মত্ত দাদুরীরাই গান গেয়েছিল প্রথম এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রণয়িনীকে আহ্বান করা।

কবি এসে ঢুকলেন হুড়মুড় ক'রে।

"মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি।"

"কি ?"

"সেই খুনের ব্যাপারটার তদ্বির করতে এখন ছুটতে হবে আমাকে সদর এস. ডি. ও.র কাছে। কি বিপদ বল দিকি। অমরেশবাবু এক ভীষণ ঘানিতে জুড়ে দিলেন আমাকে দেখছি। তোমাকেও। তোমার জন্যও একটা দুঃসংবাদ এনেছি। একটা হুতোম প্যাঁচা কিছু খাচ্ছে না। মালীর ভার্সন অবশ্য, তুমি গিয়ে একটু দেখে এস। মালীটা বেশ মুটিয়েছে দেখলুম। প্যাঁচার বরাদ্দ 'কিমা'টা ওই খাচ্ছে কি না কে জানে।"

ব'লেই কবি নির্নিমেষ হয়ে গেলেন ডানার মুখের দিকে চেয়ে—রোদের তাতে ডানার মুখটা রক্তিম হয়ে উঠেছিল।

"কি দেখছেন ?"

"তোমাকে। চমৎকার দেখাচ্ছে। এই নিদারুণ রোদে একটা অদ্ভুত রূপ ফুটেছে তোমার। দাঁড়াও।"

ব'সে পড়লেন টেবিলের ধারে এবং খানিকক্ষণ চোখ বুজে থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখলেন—

মরুভূমির তপ্ত বায়ে
গোলাপ ফোটে কাঁটার বনে
পথিক শুধু হারায় দিশা
অসম্ভবের আমন্ত্রণে
মরীচিকায় বয় নদী যে
স্বচ্ছধারা অলীক খাতে
কাঁটার বনে গোলাপ জাগে
পথিক-অলির প্রতীক্ষাতে।
লগ্ন জাগে কোন্ আকাশে
কোন্ বাঁশরীর কোন্ সুরে যে

বলতে পারে সেই কবি সে
কাছে থেকেও রয় দূরে যে।

কবিতাটা প'ড়ে ডানা বললে, "এটা কি হ'ল ?"

"হ'ল একটা যা হোক কিছু। গোলাপের সঙ্গে প্রলাপ মেলাতে ইচ্ছে হচ্ছিল, পারলাম না। হাতে সময় নেই এখন। চললুম। তুমি প্যাঁচাটার খবর নিও একটু।"

কবি চ'লে গেলেন। ডানা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কবিতাটা পড়লে আর একবার। আনন্দ হ'ল, ভয়ও হ'ল। অদ্ভুত প্রকৃতির ভদ্রলোক। বাপের বয়সী, অথচ ছেলেমানুষের মত মন। কোনও কুমতলব আছে ব'লে মনে হয় না, অথচ কেমন যেন···

হুতোম প্যাঁচাটার খবর নেওয়ার জন্যই ডানা বেরিয়ে পড়ল। এমন সময় বেরুতে হ'ল ব'লে খারাপ লাগতে লাগল খুব। একটা কথাই বার বার মনে হতে লাগল, অর্থাভাবে প'ড়েই এই সব করতে হচ্ছে। তার পর মনে হ'ল, কবিও ওই কথাই বলেছিলেন। অর্থাভাব সকলকেই যেন ঘানি টানাচ্ছে, ঘানির চেহারাও নানা রকম। অমরবাবুর কথা মনে হ'ল। অন্য দেশের বিজ্ঞানীরা পাখী সম্বন্ধে যে সব গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, অর্থাভাবে তা করতে পারছেন না ব'লে অমরবাবুর মত বড়লোকও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন একদিন মনে পড়ল। অদ্ভুত জিনিস এই টাকা। সকলেরই টাকার দরকার, সকলেরই টাকার প্রতি লোভ।

ককৃরিং—ককৃরিং—

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, বাদামী রঙের ল্যাজ-ঝোলা পাখীটা আমগাছের ডালে দুলে দুলে ডাকছে। তার পর নজরে পড়ল, সন্ন্যাসী আসছেন, তাঁর হাতে কি যেন একটা রয়েছে। কাছাকাছি হতে ডানা জিজ্ঞাসা করলে, "হাতে ওটা কি আপনার ?"

"শাবল।"

"শাবল নিয়ে কি করবেন? ও, আপনার ওদিকের সেই খুঁটিটা প'ড়ে গেছে বুঝি? তা, আপনি কেন কষ্ট করবেন, আমি কাল আমার চাকরটাকে পাঠিয়ে ঠিক ক'রে দেব। আমাকে একটু খবর পাঠালেই হ'ত, আমি আগেই করিয়ে দিতাম।"

সন্ন্যাসী কিছু না ব'লে মুচকি হাসলেন একটু। তার পর নিজের গন্তব্যপথে চ'লে গেলেন। ডানা তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মনে হ'ল, এ লোকটি একেবারে স্বতন্ত্র। পারতপক্ষে কারও সঙ্গে মেশেন না, কথা বলেন না, নিজেকে নিয়েই আপন মনে আছেন ওই ভাঙা ঘরটাতে, অথচ এঁকে অগ্রাহ্য করবারও উপায় নেই। ডানার সমস্ত মনটা তো এঁকে ঘিরেই স্বপ্ন রচনা করছে। রূপচাঁদের লোলুপতা, কবির কবিত্ব, অমরেশবাবুর পক্ষীতত্ত্ব মাঝে মাঝে তার ভাল যে লাগে নি তা নয়, ওঁদের নিয়ে কিন্তু তার মন স্বপ্নরচনা করতে পারে না। ডানা হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, কেন পারে না? সামাজিক বাধা আছে ব'লে? কিন্তু তা তো নয়। তা যদি হ'ত তা হ'লে সে বাধা তো এই সন্ন্যাসীর বেলাতে আরও প্রবল। তা ছাড়া সমাজের সঙ্গে মানুষের বাইরের আচরণেরই সম্পর্ক বেশী, মন তো স্বাধীন। তার ভাল-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে যে জগৎ সে সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে বাইরের সমাজের কোন সম্পর্ক নেই। না, কারণটা সামাজিক নয়, অন্য কিছু। খানিকক্ষণ পরে ডানার মনে হ'ল, সন্ন্যাসীর চরিত্র রহস্যময় ব'লেই কি তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে? কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল, কিই বা এমন রহস্যময়। অস্পষ্ট তো কিছু নেই। সোজাসুজি সন্ন্যাসী, ভাঙা কুঁড়েতে আপন খেয়ালে থাকেন, ভিক্ষে করেন, ভজন করেন, কাছে গেলে আলাপ করেন, কোন রকম বাজে ভড়ং নেই, আত্মগোপন করবার প্রয়াস নেই, তাক লাগিয়ে দেবার কসরৎ নেই। নিতান্তই সহজ সরল প্রাণ-খোলা লোক। ওঁর চেয়ে রূপচাঁদ ঢের

বেশী রহস্যময়। কিন্তু রূপচাঁদকে ঘিরে মন স্বপ্ন রচনা করতে চায় না তো। কেন··· ? এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই ডানা অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিল, মল্লিক মশাই যে কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তা সে লক্ষ্যই করে নি।

"নমস্কার। আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"নমস্কার। আমার কাছে ? কেন, কিছু দরকার ছিল ?"

"আনন্দবাবু শুনলাম আপনার বাসার দিকে এসেছেন, দরকারটা আমার তাঁর সঙ্গে। কোথায় তিনি ?"

"আমার কাছে একটু আগে এসেছিলেন, কিন্তু কোথায় যেন একটা খুন হয়েছে সেই সম্পর্কে তিনি এস. ডি. ও.র কাছে গেলেন।"

"এস. ডি. ও.র কাছে। সেখানে যাবার কিছু দরকারই ছিল না। রূপচাঁদবাবুকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলে তিনিই সব ব্যবস্থা করতেন। উনিই তো পুলিস সাহেবের দক্ষিণ হস্ত। এই কথাটাই ওঁকে বলবার জন্যে আসছিলাম। আমার অবশ্য মাথাব্যথা হবার কথা নয়, ম্যানেজার এখন আমি নই, ম্যানেজার আনন্দবাবুই, কিন্তু ঘাঁৎঘোঁৎ ঠিক রপ্তো হয় নি তো ওঁর, তাই ভাবলাম—কথাটা ওঁকে ব'লে আসি। অমরবাবুর নিমক তো অনেক দিন ধ'রে খেয়েছি, ভাবলাম—যাতে ওঁদের একটু সুবিধা হয় সেটা করা আমার কর্তব্য। কর্তব্য নয় ?"

কর্তব্য কি না তার উত্তর না দিয়ে ডানা বললে, "আচ্ছা, উনি এলে আমি বলব আপনার কথা।"

"বলবেন, নিশ্চয়ই বলবেন। রূপচাঁদবাবুকে আমিও বলব। তবে আমি ডিটেল্‌স্ সব জানি না তো—"

"আচ্ছা।"

ডানা পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছিল।

মল্লিক মশাই বললেন, "এই ভাঁ-ভাঁ রোদে চলেছেন কোথা ?"

"পাখীগুলোর তদারক করতে। শুনলাম, একটা প্যাঁচা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"একটি পাখীও বাঁচবে না। বনের পাখী কি অমন ভাবে রাখলে বাঁচে? আপনি বলবেন, চিড়িয়াখানায় বাঁচে কি ক'রে তা হ'লে? চিড়িয়াখানায় কত রকম ব্যবস্থা, কত রকম তদারক, গবর্মেণ্টের একটা আলাদা ডিপার্টমেণ্টই রয়েছে ওর জন্যে, তবু ম'রে যায়। আর আপনারা ভেবেছেন, মুন্সী আর গোটাকতক বদমাইস পাখীওলা আপনাদের চিড়িয়াখানা চালাবে। ছাগল দিয়ে বলদের কাজ হ'লে কি কেউ বলদ কিনত?"

"কিন্তু ওরা তো মোটামুটি ভালই চালাচ্ছে।"

"টিয়া ক'টা আছে গুনে দেখেছেন?"

"না, গুনি নি। গোটা দুই ম'রে গেছে।"

"মরে নি। মুন্সী বিক্রি করেছে। একটা কিনেছে আমার ছেলে আর একটা কিনেছে চণ্ডী—রূপচাঁদবাবুর বাড়িতে যাতায়াত করে যে ছোঁড়াটা।"

ডানা অবাক হয়ে গেল।

"সত্যি?"

"আরও শুনবেন? পাখীদের যে ছোলা, ফল, মাংস, মাছ আপনারা কিনে দেন, তা কি ওদের দেয় ওরা? কিচ্ছু দেয় না, বিক্রি করে।"

"তাই নাকি?"

ডানার কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। মনে হ'ল, অপরাধ তারই। অমরবাবু তার উপরেই বিশ্বাস ক'রে এতগুলি পাখী রেখে গেছেন, তারই উচিত সামনে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়ানো। মুন্সীটা এত চোর! এ কথা ভাবতেই পারে নি সে। যথেষ্ট মাইনে দেওয়া হয় তাকে।

"এই রোদে ছাতা না নিয়ে বেরিয়েছেন, মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে যে। আমার ছাতাটা নিয়ে যান না হয়।"

"না, থাক্। রোদে ঘোরা আমার অভ্যাস আছে।"

আর কোনও কথা না ব'লে ডানা হন হন ক'রে এগিয়ে গেল। মল্লিক মশাই তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তার পর মাথা নাড়লেন। মুখে একটা বিচিত্র হাসিও ফুটে উঠল তাঁর।

৩

এক লোলুপ ক্ষুধার্ত বাঘের খাঁচার সামনে রক্ত-চর্চিত মেদ-মণ্ডিত একটা মাংসের প্রকাণ্ড টুকরো ঝুলছে আর সেটা না পেয়ে বাঘটা নিষ্ফল আক্রোশে খাঁচার গরাদেতে মাথা কুটে মরছে—ঠিক এ উপমা রূপচাঁদের সম্বন্ধে খাটবে না। মনে মনে তিনি নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে মরছিলেন ঠিকই, ডানা এখনও তাঁর নাগালের বাইরে আছে—এ কথাও মিথ্যা নয়, তাঁর একাধিক চাল ব্যর্থ হয়েছে তাও তিনি মর্মে-মর্মে অনুভব করছেন। কিন্তু খাঁচার গরাদেতে মাথা কুটে মরবার লোক তিনি নন। খাঁচার অস্তিত্বই ছিল না তাঁর কল্পনায়। এ ধরনের আজগুবি রূপকে তিনি বিশ্বাসই করেন না। তিনি একটু নির্লিপ্ত হয়ে ক্রেতা রূপচাঁদের কৃপণতাটা উপভোগ করছিলেন। ঠিক কত দাম দিলে যে মালটা পাওয়া যাবে তা বেচারা নির্ণয় করতে পারছে না কিছুতে। বহুকাল আগে রূপচাঁদ একবার নিলামে জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন। একটা কাশ্মীরী শাল খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। পঞ্চাশ থেকে শুরু ক'রে ডাক দেড় শো পর্যন্ত উঠল। রূপচাঁদ ডাক দিলেন দু শো, প্রতিপক্ষ দু শো দশ হাঁকলেন। রূপচাঁদের জেদ চ'ড়ে উঠল, হেঁকে দিলেন তিন শো। প্রতিপক্ষ আবার দশ বাড়ালেন—তিন শো দশ টাকায় লোকটি আর একটু হ'লে নিয়ে নিয়েছিলেন শালটা। রূপচাঁদ

হাঁকলেন—পাঁচ শো। প্রতিপক্ষ আর দাম বাড়াতে সাহস করলেন না। রূপচাঁদ শালটা কিনে নিলেন। দমকা অত টাকা খরচ ক'রে তাঁকে অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল কিছুদিন; কিন্তু তার জন্যে তাঁর মনোকষ্ট হয় নি, ঈপ্সিত বস্তুটি লাভ ক'রে তিনি প্রীতই হয়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, ডানাও নিলামে চড়েছে। ঠিক কত দাম হাঁকলে যে তাকে পাওয়া যাবে, সেইটেই ঠিক করতে পারছিলেন না। প্রতিপক্ষ অমরেশ ও আনন্দমোহন যে কত দাম হেঁকেছে তাও ঠাহর করতে পারছিলেন না তিনি। সেটা জানতে পারলে সুবিধা হ'ত। তবে আর একটা কথাও অবশ্য ঠিক যে, রূপচাঁদ নিছক ক্রেতাও নন। তিনি আর্টিস্টও। অতসী কাচের ভিতর দিয়ে যে-কোনও মুহূর্তে রামধনু দেখতে পাওয়া যায় ব'লেই অতসী কাচের প্রতি তাঁর লোভ। লোভের সঙ্গে রামধনুর স্বপ্নটা জড়িয়ে থাকাতে লোভটা বেড়েছে সত্যি, কিন্তু একটু বিশেষত্ব লাভও করেছে। কারণ লোভটা কাচের প্রতি নয়, আকাশচারী রামধনুর প্রতি। নারীমাংস বাজারে অপ্রতুল নয়। প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় শ্রেণীর তৃতীয় শ্রেণীর ছাগমাংসও যেমন বাজারে বিক্রি হয়, নারী-মাংসও হয়। কিন্তু তার প্রতি লোভ নেই রূপচাঁদের। তারা সুলভ ব'লে নয়, তাদের সংস্পর্শে এসে স্বপ্ন জাগে না ব'লে। নিতান্তই খেলো কাচ তারা—কেউ রঙিন, কেউ সাদা, কেউ পাতলা, কেউ পুরু; কিন্তু অতসী কাচের বিশেষত্ব নেই তাদের। আলোকে তারা রামধনু করতে পারে না, ডানা পারে। ডানা কাচও নয় ঠিক, দামী হীরের টুকরো। যখনই ডানার সান্নিধ্যে এসেছেন তখনই এটা অনুভব করেছেন তিনি। ওর চোখে শুধু দৃষ্টি নেই—স্বপ্নরাও আছে, ওর রূপ, শুধু দেহেই নিবদ্ধ নয়—দেহাতীত রূপকথা-লোকে নিয়ে যাবার শক্তি আছে তার। ওর কাছে গেলেই মনে হয়, বয়স ক'মে গেছে, দায়িত্বের বোঝা নেমে গেছে মন থেকে, কোনও কিছুর জন্যেই কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না আর যেন।

মল্লিকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের একটা ভূমিকা রচনা করবার জন্যেই মল্লিককে পাঠিয়েছিলেন তিনি ডানার কাছে। তার কাছে যাবার একটা অজুহাত চাই তো। মল্লিককে সেই অজুহাতের পটভূমিকাটা তৈরি করবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন তিনি। মল্লিকও সানন্দে রাজী হয়েছিল। ডানাকে, আনন্দবাবুকে, অমরেশবাবুর চিড়িয়াখানাকে, জমিদারকে ছারখার না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি। ওই মাগীকে (অর্থাৎ অমরেশ-গৃহিণী রত্নপ্রভা দেবীকে) দেখিয়ে দিতে হবে যে, মল্লিক ছাড়া তাঁদের এখানকার জমিদারি অচল। রূপচাঁদ অধীরচিত্তে মল্লিকের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ একটা ঝোপ থেকে বাদামী-কালো পাখীটা ডেকে উঠল—গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্-গুপ্-গুপ্।

কয়েক সেকেণ্ড পরে আর একটু দূর থেকে তার সঙ্গিনী সাড়া দিলে—গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্।

অদ্ভুত লাগল রূপচাঁদের।

৪

সমস্ত দিন 'লু' চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তবু হাওয়ার তাপ কমে নি। ঘরের বাইরে মাঠের মাঝখানে একটা ছোট চেয়ার বার ক'রে ডানা ব'সে ছিল চুপ ক'রে। জাহাজে আসবার সময় ইঞ্জিনের কাছাকাছি বসলে যেমন মনে হয়, তেমনই মনে হচ্ছিল তার। জাহাজের কথা মনে হওয়াতে বর্মার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল মা-বাবা-ভাইটির কথা। মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরীর কথা। রিসার্চ-স্কলার ভাস্কর বসুর কথা। নিজের মনের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। যারা একদিন তার অত্যন্ত আপন ছিল, আজ তাদের কথা কচিৎ মনে পড়ে। যখন পড়ে তখনও ওদের খুব

আপন ব'লে মনে হয় না, মনে হয় ওরা যেন অন্য জগতের লোক, ওদের সঙ্গে আত্মীয়তাটা মানতে হয় যেন নীতিশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশত। মৃত্যু ছিন্ন ক'রে দিয়েছে অন্তরের যোগ। এখন তার কাছে ঢের বেশী আপন অমরেশবাবু, আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু (হ্যাঁ, রূপচাঁদের বর্বরোচিত লোলুপতাই যেন বেশী আপন করছে তাকে) আর ওই ভগ্নকুটিরবাসী সন্ন্যাসী। রত্নপ্রভাকেও খুব ভাল লেগেছে তার। শ্রদ্ধা হয়েছে তাঁর উপর, কিন্তু সত্যিকার ভাল লেগেছে বকুলবালাকে। মন্দাকিনীর কথা শুনেছে সে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপও হয় নি, তবু তিনি আনন্দমোহনবাবুর স্ত্রী—এই পরিচয়টুকুই যেন ওই অচেনা মানুষটিকে আপন করেছে। নিজের লোক পর হয়ে যায়, পর লোক আপন হয়ে ওঠে মনের কি রহস্যময় নিয়মে, কে জানে। যারা চোখের সামনে সদাসর্বদা ঘোরাঘুরি করে তারা যে সব সময় মনের মতন হয় তা নয়, কিন্তু আপন হয়। মনের মত লোকও দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলে আর আপন থাকে না। ইংরেজীতে প্রবচনই আছে—আউট অব সাইট আউট অব মাইণ্ড। ডানার মনে হ'ল, দৃষ্টিটা শুধু চোখের না ব'লে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বললে যেন আরও ভাল হয়। যা যতক্ষণ আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর তা ততক্ষণ আমার আপন, ভাল হোক মন্দ হোক তা ততক্ষণ আমার অধিকারভুক্ত, যেন আমার আপন সম্পত্তি, তাই তার সম্বন্ধে মমত্ববোধ প্রবল। ভাবতে ভাবতে কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল, খেই হারিয়ে গেল চিন্তার। মনে হ'ল ওই সন্ন্যাসী হয়তো ব্যাপারটা স্পষ্টতর করতে পারবেন। উঠে পড়ল সে চেয়ার ছেড়ে। সন্ন্যাসীর কাছে যাবার একটা অজুহাত পেয়ে সে যেন ব'র্তে গেল মনে মনে। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু বিনা কারণে বার বার ওখানে যাওয়াটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু মনে হয় নিজের কাছেই। কিছুদূর গিয়ে আবার থেমে গেল সে। মনে হ'ল

সন্ন্যাসী হয়তো ভাববেন যে, মিছিমিছি একটা অজুহাত সৃষ্টি ক'রে তাঁর কাছে গিয়েছে সে। একদিন স্পষ্টই যখন বলেছিলেন যে নারীর সান্নিধ্য তাঁর পক্ষে বিষবৎ ত্যাজ্য, তখন এমন ভাবে সেখানে যাওয়া কি উচিত? ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ তার কানে অদ্ভুত শব্দ এল একটা। টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররর…। টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররর…। ঠিক মনে হ'ল একটা মার্বেল যেন পাকা শানের মেঝেতে প'ড়ে কয়েকবার লাফিয়ে তারপর গড়িয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে গেল ডানার। মনে হ'ল কোথায় যেন পড়েছে এই রকম ধরনের কি একটা। ঘরে ফিরে এল, আলো জ্বেলে হুইস্‌লারের বইটা ওলটাতে লাগল। একটু পরেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল সে। নাইট্‌জার নামক নিশাচর পাখীর ডাক ঠিক ওই রকম। হুইস্‌লার লিখছেন—resembling the sound of a stone skimming over the surface of a frozen pond…নাইট্‌জারের কয়েকটা হিন্দী নামও অমরবাবু লিখে রেখেছেন ডানার চোখে পড়ল। চিপ্‌পাক, ডাবচুরী, ডাভাক্। একটা নামও পছন্দ হ'ল না তার। যে কখানা বই অমরবাবু দিয়ে গিয়েছিলেন, সবগুলো উলটে-পালটে দেখতে লাগল সে। পাখীটার বিশেষত্ব হচ্ছে—প্রকাণ্ড বড় মুখ, বড় বড় পোকা টপটপ ক'রে গিলে ফেলতে পারে। দাক্ষিণাত্যে এর যা নাম, তার বাংলা হচ্ছে 'ব্যাঙপাখী'। মন্দ না নামটা। পাখীটার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে ওতে। পঠিতব্য যা কিছু ছিল সব প'ড়ে ফেলে ডানা টর্চ আর অমরবাবুর দেওয়া বাইনকুলারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার। পাখীটাকে দেখতে হবে। শুকনো নদীর খালের কাছে কাছে যেদিকে ঝোপঝাপ আছে, সেই দিকেই এগুতে লাগল। কিছুদূর এগিয়ে গেল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। অনিশ্চিত ভাবে কতক্ষণ অগ্রসর হবে? কাছেই একটা উঁচু ঢিপির মতন ছিল। তারই উপরে উঠে বসল। ব্যাঙপাখী কাছাকাছি যদি থাকে কোথাও

সাড়া পাওয়া যাবে ঠিক। অন্ধকারের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে।

অনেকক্ষণ ব'সে থাকার পরও কিন্তু ব্যাঙপাখীর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ডানা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। দু-একটা নক্ষত্র মিটমিট ক'রে জ্বলছে বটে, কিন্তু সমস্ত আকাশটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে আছে। মেঘ নয়, ধুলো। প্যাঁচার চোখটা মনে পড়ল, অমন স্বচ্ছ চোখ কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল মরবার আগে। কিছুতেই বাঁচাতে পারা গেল না পাখীটাকে।

চ্যুইস্—

ঠিক মাথার উপর দিয়ে লম্বা-ডানা পাখী উড়ে গেল একটা। ব্যাঙপাখীই বোধ হয়। টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না। একটু পরেই আবার শুরু হ'ল একটু দূর থেকে—

টুক্-টুক্-টুক্, টুক্ টুক্ টুক্ টুক্, টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররররর···

মনে হ'ল যেন ব্যঙ্গ করছে। নাগালের বাইরে চ'লে গিয়ে খুক খুক ক'রে হাসছে যেন দুষ্ট ছেলের মত। ওদের স্বভাবটাই ওই ধরনের। সারাজীবন ধ'রে যেন লুকোচুরি খেলছে সকলের সঙ্গে। দিনের আলোয় পারতপক্ষে বেরোয় না। দিনের বেলা পারিপার্শ্বিকের রঙের সঙ্গে এমন বেমালুম মিলিয়ে দেয় নিজেকে যে, দেখাই যায় না। বাদামী পাঁশুটে, সাদা আর কালোর বিস্ময়কর সমন্বয়। একটু পরে আর একটা পাখী ডাকল, তার পর আর একটা, তার পর আর একটা। অনেক দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা ঐকতান শুরু হয়ে গেল। মৃদু কিন্তু স্পষ্ট। অজানা কোন এক জগৎ থেকে

ভেসে আসছে যেন আনন্দ-কলরবের প্রতিধ্বনি, একদল ছেলে মারবেল খেলছে, না হাসছে···?

হঠাৎ নজরে পড়ল, একজন কে যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। তারপর শুনতে পেল, গানও করছে গুনগুন ক'রে। টর্চ জ্বালতেই বুঝতে পারল, সন্ন্যাসীই আসছেন। উঠে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসী তার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত ক'রে চ'লে যাচ্ছিলেন পাশ কাটিয়ে।

"কোথা যাচ্ছেন অন্ধকারে?"—ডানা প্রশ্নটা না ক'রে পারল না।

"ওই বালির চরে যাচ্ছি।"

"ওখানে এত রাত্রে?"

"ওখানেই রাতটা কাটাব।"

"ওই চরে? একা?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন একটু।

তারপর বললেন, "প্রায়ই তো ওখানে রাত কাটাই।"

"একা ভয় করে না আপনার?"

"একা তো থাকি না। আরও অনেকে থাকে।"

"আর কারা থাকে?"

"এক ঝাঁক টিট্টিভ, কীটপতঙ্গ, একটা প্রকাণ্ড সাপকেও দেখি মাঝে মাঝে। তা ছাড়া আকাশভরা নক্ষত্র চাঁদ—একা থাকবার কি জো আছে!"

ডানার চোখ দুটো জ্বল-জ্বল ক'রে উঠল।

"আমারও যেতে ইচ্ছে করছে আপনার সঙ্গে।"

"তা বেশ, এসো একদিন। কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে আমি যা পাই তা পাবে না।"

"কেন?"

"কেউ কাছে থাকলে অনিবার্যভাবে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে

হয়। মনের খানিকটা তাকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, আর তা থাকলেই অনেক জিনিস সে দেখতে পায় না, অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতির মৃদু সাড়া শোনা যায় না। বেশ, এসো একদিন। আমি চলি এখন।"

সন্ন্যাসী পুনরায় চরের দিকে অগ্রসর হলেন।

"অন্ধকারে যাচ্ছেন, টর্চটা নেবেন ?"

"আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ। টর্চ দরকার হবে না।"

সন্ন্যাসী চ'লে গেলেন। ডানা দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে।

কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু হ'ল দূর থেকে—টুক্-টুক্-টুক্-টুক্,—টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্—টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররররর…

সমস্ত দিনের 'লু' যে ধুলোকে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করেছিল তা বোধ হয় নেমে আসছিল আবার মাটির দিকে। যে আকাশ একটু আগে ঘোলাটে হয়েছিল তা স্বচ্ছ হয়ে আসছে ক্রমশ। নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে দু-একটা। পূর্বদিগন্তেও আলোর আভাস ফুটে উঠেছে। দিন দুই আগেই পূর্ণিমা গেছে, একটু পরেই চাঁদ উঠবে তারই আয়োজন হচ্ছে। আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। আকাশের দিকে চেয়ে যে কথাটা তার প্রথমেই মনে হয়েছিল তারই একটা নূতন তাৎপর্য নূতন আলোকে যেন তার মনে পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল। প্রবল ঝঞ্ঝা যে ধুলোকে সবেগে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করেছিল, যার প্রাবল্যে আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, একটু আগে পর্যন্ত যা নক্ষত্রদেরও ঢেকে ফেলেছিল, সে ধুলো আবার মাটিতে নেবে আসছে। আকাশে থাকতে পারল না তারা। আকাশের চিরন্তন অধিবাসীদের কোন ক্ষতিও করতে পারল না। নক্ষত্ররা যেমন ছিল তেমনই আছে, ধুলোরাই নেবে আসছে। জোর ক'রে কিছু করা যায় না। কুকুরকে সিংহাসনে বসালেই সে রাজা হয় না। সহসা আর একটা কথাও মনে হ'ল তার সঙ্গে সঙ্গে। ধুলোরা আকাশে বেমানান, কিন্তু মাটিতে তাদের গৌরব। মাটির আসনেই তাদের মহত্ত্ব প্রকাশিত, প্রতিষ্ঠা

অবিসম্বাদিত। যথাস্থানে তাদের মহিমা আকাশের নক্ষত্রদের চেয়ে কিছু কম নয়। তারা আকাশে যেতেও চায় না, ঝড়ে তাদের ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ত ক'রে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ডানার মনে হ'ল, মানব-সমাজেও এই ঝড় মাঝে মাঝে এসে সমস্ত বিশৃঙ্খল ক'রে দেয়। তার নিজের জীবনের কথা মনে পড়ল। তার পর মনে হ'ল তার নিজের স্থান কোথায়? সে নামছে, না, উঠছে? প্রশ্নটার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, কারণ নামা-ওঠার মানদণ্ডটা ঠিক জানা নেই। সাধারণ বুদ্ধিতে যা উন্নতি ব'লে মনে হয়, সত্যি তা কি উন্নতি? কে বেশী উন্নত—ওই সন্ন্যাসী, না, অমরবাবু? কল্পনাবিলাসী কবি কথায় কথায় ছন্দ মিলিয়ে কবিতা রচনা করতে পারেন ব'লেই কি উন্নত বলতে হবে তাঁকে? সংসারের সাধারণ বিচারে রূপচাঁদবাবুও তো মন্দ লোক নন। জীবনটাকে তিনি নিজের পছন্দ অনুসারে উপভোগ করতে চান। কে না চায়? কিন্তু রূপচাঁদবাবুকে উন্নত মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা চলবে কি! সে নিজেই বা কি! বাল্যকাল থেকে নিষ্ঠাভরে নিজের পানের চুনটি আগলানো ছাড়া আর কিই বা সে করেছে! তার লেখা-পড়া, সংস্কৃতি, সভ্যতা, বিবিধ আচরণ একটি মাত্র যে জিনিসের উদ্দেশ্যে বিকশিত হয়েছে, সংক্ষেপে তার নাম আত্মবিনোদন। বিজ্ঞানী, কবি, রূপচাঁদ সকলেই আত্মবিনোদনের জন্য ব্যস্ত, প্রত্যেকের পথ শুধু আলাদা। ওই সন্ন্যাসী? তিনিও কি আত্মবিনোদন নিয়েই আছেন!

"টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররররর..."

আবার শুরু হয়ে গেল 'নাইটজার'দের ঐকতান। পূর্বদিগন্ত জ্যোৎস্নামণ্ডিত হয়ে উঠল ক্রমশ। চাঁদ উঠল। নদীর চরটা স্পষ্ট হয়ে এল। নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল ডানা। তার মনে হতে লাগল একটা সত্য যেন অস্পষ্টভাবে আভাসিত হচ্ছে তার মনের দিগন্তে। কিন্তু কি তার রূপ?

অনেকক্ষণ পরে ডানা যখন তার নিজের বাসায় ফিরে এল তখন সে এতই অন্যমনস্ক যে, বারান্দায় উপবিষ্ট রূপচাঁদকে দেখতেই পায় নি প্রথম। বারান্দায় চন্দ্রালোকে চেয়ারের উপর যে একজন লোক ব'সে আছে তাই নজরে পড়ে নি তার। খুব কাছাকাছি এসে তাই সে চমকে উঠল রূপচাঁদের কথা শুনে।

"অনেকক্ষণ থেকে তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছি। কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?"

ডানার মনে হ'ল, রূপচাঁদ সহসা অবির্ভূত হলেন যেন। তিনি এতক্ষণ যেন অদৃশ্যভাবে ওৎ পেতে ছিলেন, যাদুমন্ত্রবলে কায়া পরিগ্রহ করলেন সহসা। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক ব'লে মনে হ'ল যে, চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়ল সে কিছুক্ষণের জন্য।

"আপনি !"

"হ্যাঁ গো, আমিই। অনেকক্ষণ থেকে ব'সে মশার কামড় ভোগ করছি। এক প্যাকেট সিগারেট শেষ ক'রে ফেললুম প্রায়। কোথা ছিলে বল তো ?"

"গঙ্গার ধারে ব'সে ছিলাম।"

"একা ?"

"হ্যাঁ, একা ব'সে নাইট্‌জারের গান শুনছিলাম।"

"নাইট্‌জারটা কি ব্যাপার। মানুষ, না, আর কিছু ?"

"নিশাচর পাখী একরকম। আপনি এ সময়ে যে ?"

ডানার মানসিক স্বচ্ছন্দতা ফিরে এল আবার।

"নিশাচর পাখী সম্বন্ধে মোহ আছে নাকি। শুনে সুখী হলাম। আমিও নিশাচর কি না। আমি এসেছি একটা জরুরী দরকারে। অমরেশবাবুর জমিদারিতে যে খুনটা হয়ে গেছে সেটা সহজে মিটবে ব'লে মনে হচ্ছে না। পুলিস অমরেশের ম্যানেজারকে আসামী ব'লে সন্দেহ করছে। যে কোনও মুহূর্তে অ্যারেস্ট করতে পারে। আনন্দমোহনকে একটু সাবধান ক'রে দিতে এলাম। ওর এখন

একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল। ওর বাড়িতে ওকে পেলাম না, ঠাকুরটা অদ্ভুত বাংলায় বললে 'ডেনা মাইজির কাসে গিয়েসেন।' এখানে এসে দেখি, এখানেও কেউ নেই। আনন্দ কি এসেছিল বিকেলে?"

"এসেছিলেন। এসেই চ'লে গেলেন সদরে। বললেন, ওই খুনের মামলা সম্পর্কেই এস. ডি ও-র সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"সদরে গেছে না কি! সেরেছে! তা হ'লে তো এতক্ষণ পুলিসের খপ্পরে প'ড়ে গেছে সে। কি মুশকিল! এই কবিগুলোর যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে! উঠি—"

চিন্তিতমুখে উঠে পড়লেন রূপচাঁদ। তাঁর ভয় হচ্ছিল, অভিনয়টা তিনি ঠিকভাবে করতে পারছেন কি না! ডানাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। খবরটা শুনে সত্যই শঙ্কিত হয়ে পড়ল সে।

"পুলিস তাঁকে অ্যারেস্ট করেছে নাকি!"

"করাই সম্ভব। এস. পি. দারোগাকে যে রকম কড়া হুকুম দিয়েছে, তাতে তাই তো মনে হয়।"

"কে খুন হয়েছে?"

"একটি স্ত্রীলোক।"

"স্ত্রীলোক? তার সঙ্গে আনন্দবাবুর সম্পর্ক কি?"

"তা কি ক'রে বলব বল? কার সঙ্গে কোথা দিয়ে কার যে কি সম্পর্ক থাকে বলা শক্ত। পুলিস আর আদালতে সেটা নির্ণয় করবে। আনন্দমোহনের সই-করা একটা চিঠি নাকি পাওয়া গেছে মেয়েটির ঘরে।"

"কি চিঠি?"

"নোটিশ একটা। মেয়েটি বিধবা এবং যুবতী। তার কিছু জমি আছে এঁদের জমিদারিতে। খাজনা বাকী অনেক দিনের। তাই সম্ভবত ম্যানেজার হিসাবে আনন্দমোহন বাকী খাজনার জন্য নোটিশ দিয়েছিল। কিন্তু কবি কিনা, তাই নোটিশের পিছনে 'পুনশ্চ' দিয়ে

লিখেছে—'নোটিশের ভাষাটা স্বভাবতই রুক্ষ, কিছু মনে ক'রো না। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল, যদি চাও তো খাজনা কিছু মাপও ক'রে দিতে পারি।' এই চিঠি পাওয়ার দু দিন পরেই তার [illegible] [illegible] আন্দোলনে [illegible] পুলিস। তারপর তাঁর ঘর থেকে [illegible] [illegible]। [illegible] খবরটা পেলে তো।

রূপচাঁদ বাইক এনেছিলেন। মুচকি হেসে [illegible] চ'ড়ে চ'লে গেলেন।

অনেক রাত্রে বাইকের ঘণ্টার ঝঞ্ঝনায় ঘুম ভেঙে গেল ডানার। বিছানায় উঠে বসল। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে ব'সেই রইল। [illegible] আর জাগরণের মাঝামাঝি যে অবস্থাটা মানুষকে অসহায় ক'রে ফেলে, কয়েক মুহূর্ত সেই অবস্থায় অসহায় হয়ে ব'সে রইল ডানা। বাইকের ঘণ্টার শব্দটা থেমে গেল হঠাৎ। ঝিল্লীধ্বনিতে রূপান্তরিত হ'ল যেন। তারপর পদশব্দ পাওয়া গেল বারান্দায়।

"ডানা, ডানা—"

রূপচাঁদবাবুর গলা।

কাপড়-চোপড় সামলে উঠে দাঁড়াল ডানা। পিছনের ঘরে চাকরটা থাকে, তাকে উঠিয়ে দিলে।

"দেখ্ তো, বাইরে কে ডাকছে।"

চাকরকে দেখে রূপচাঁদ হতাশ হলেন একটু, কিন্তু সপ্রতিভভাবে বললেন, "মাইজি কোথা? তাঁকে ডাক্, জরুরী দরকার আছে।"

ডানা বেরিয়ে এল।

"আনন্দবাবুর খবর পেলেন কিছু?"

"পেয়েছি। তাকে অ্যারেস্ট করেছে, 'বেল' দেয় নি।"

"কোথায় তিনি এখন?"

"জেলে।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। রূপচাঁদ নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন তার দিকে, সেই দৃষ্টিটা যেন ধাক্কা মেরে সম্বিত ফিরিয়ে দিলে তার।

"কি উপায় করা যায় তা হ'লে এখন?"

"সেইটে ঠিক করবার জন্যেই তো এলাম এত রাত্রে। কাল আমার আপিসের নানান ঝামেলা, সময় পাব না। চল, বসা যাক কোথাও। চা খাওয়াতে পারবে কি একটু? ওরে, জগন্নাথের দোকান চিনিস? তাকে উঠিয়ে আমার জন্যে এক প্যাকেট কাঁইচি নিয়ে আয় তো। আমার নাম করলেই দেবে।"

পকেট থেকে পয়সা বার ক'রে চাকরটাকে দিলেন তিনি। চাকরটা চ'লে যাচ্ছিল। ডানা তাকে থামিয়ে বললে, "শোন্। আমাদের নায়েব মশাইকেও ডেকে নিয়ে আয়। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি—"

ঘরের কোণে যে কমানো লণ্ঠনটা ছিল সেটা উস্কে দিয়ে টেবিলের উপর রাখলে সে, তার পর চিঠির প্যাডটা টেনে লিখলে—

হরসুন্দরবাবু,

এইমাত্র রূপচাঁদবাবু খবর এনেছেন যে, আনন্দমোহনবাবুকে নাকি পুলিসে ধরেছে। রূপচাঁদবাবু এখানে ব'সে আছেন। আপনি অবিলম্বে চ'লে আসুন। ইতি

ডানা

চাকর চিঠি নিয়ে চ'লে গেল।

রূপচাঁদ বললেন, "অত ব্যস্ত হ'য়ো না। হরসুন্দরকে বৃথা ডেকে পাঠালে। হাত কচলানো ছাড়া আর কি করবে ও?"

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চ'লে গেল। সেখানে চায়ের টেবিলে দাঁড়িয়ে সে স্টোভটা জ্বালতে লাগল। স্পিরিটের স্বচ্ছ নীল শিখাটার দিকে চেয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে,

হঠাৎ চমকে দেখলে রূপচাঁদ তার কাঁধের উপর হাত রেখেছেন। কখন যে নিঃশব্দচরণে এসেছেন তিনি, তা ডানা বুঝতে পারে নি। তার সমস্ত মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। খুব ধীরভাবেই কিন্তু হাতটা সে সরিয়ে দিলে, খুব সংযতকণ্ঠেই বললে, "এ সব কি ?" ব'লেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা মাঠের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

রূপচাঁদ বেরিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ তিনি অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ক'রে ফেললেন একটা। হাত জোড় ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়লেন। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, "আত্মসম্বরণ করতে পারি নি। মাপ কর আমাকে।"

"ছি ছি, কি করছেন আপনি উঠুন।"

"বল, আমাকে মাপ করেছ ?"

"যার শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে সেই মাপ করতে পারে। আমার কাছে মাপ চেয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করছেন কেন ? আপনিই বরং মাপ করুন, আমি অসহায়—"

রূপচাঁদ উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তার পর বললেন, "আমার কথাটা তোমাকে বোঝাতে পারছি না ঠিক। একটু যদি ভেবে দেখ—একটু যদি অনুকম্পাসহকারে ভেবে দেখ—তা হ'লেই বুঝতে পারবে, সবচেয়ে অসহায় আমি। বাঘ বা সিংহের কবলে প'ড়ে লোকে যেমন ছটফট করে, আমিও তেমনই একটা হিংস্র আবেগের কবলে প'ড়ে ছটফট করছি। তুমি ছাড়া আমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারে না—"

ডানার নারীত্ব হঠাৎ উদ্বুদ্ধ হ'ল এ কথা শুনে। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হ'ল সে। সত্যিই তো, লোকটাকে সে মারতে কিংবা বাঁচাতে পারে, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নির্দেশে বাঁদরের মত নাচাতেও পারে। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল তার। ঠিক এই ঘটনাটা যদি কোন আধুনিক বিদেশী ঔপন্যাসিকের কল্পনায় মূর্ত হ'ত,

কি করতেন তিনি ! যা করতেন তা ডানার অবিদিত নেই, রূপচাঁদবাবুরও নেই সম্ভবত, তাই তিনি নাটকীয় ঢঙ ক'রে ব্যাপারটাকে সেই সম্ভাব্য পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। অর্থাৎ উনি ধ'রে নিয়েছেন (এবং আধুনিক বাস্তববাদী কবিরা এবং বিজ্ঞানীরা ওঁর এই ধারণাটাকে সমর্থনও করেছেন) যে, নারীকে পুরুষের বাহুপাশে ধরা দিতে হবেই—ওইটেই তার সহজাত প্রবণতা এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করলেই সমস্ত আর্ট, সমস্ত বিজ্ঞান, এক কথায় আধুনিক সমস্ত চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সতীত্ব বা সংযমের, শ্লীলতার বা শালীনতার কোন মূল্য নেই, থাকা উচিতও নয় যেন! যে যত বেপরোয়াভাবে উলঙ্গ হতে পারবে সে তত আধুনিক, সে তত আর্টিস্টিক। নারী মানেই পুরুষের লালসা-বহ্নির ইন্ধন, অন্য রকম কিছু হ'লেই যেন সে বেমানান। তাকে নানা রঙে রঞ্জিত হতে হবে, নানা ঢঙে সজ্জিত হতে হবে—ওই একই উদ্দেশ্যে। বিদ্যুদ্বেগে কথাগুলো মনে হ'ল তার, নিমেষে সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল। এক মুহূর্ত আগে যে উদ্বুদ্ধ নারীত্ব তাকে বরপ্রদা সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে বসিয়েছিল, এই নূতন আলোক সেই উদ্বুদ্ধ নারীত্ব কামাতুরা কুক্কুরীর রিরংসারই সমপর্যায়ভুক্ত ব'লে মনে হ'ল তার।

"আপনি এ ছাড়া যদি অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতে না পারেন, তা হ'লে আমাকে চ'লে যেতে হবে এখান থেকে।"

"অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করা কি সম্ভব এখন ?"

"চললুম তা হ'লে।"

রূপচাঁদবাবুর বাইকটা পাশেই ঠেসানো ছিল। ডানা হঠাৎ সেইটেতে চ'ড়েই বেরিয়ে গেল। বিস্মিত রূপচাঁদ তার প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। পর-মুহূর্তেই তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন—কোথায় গেল ও ? কোথায় যাওয়া সম্ভব ? মাথা হেঁট ক'রে ভাবলেন একটু। তার পর ধীরে ধীরে পদচারণ করতে লাগলেন। তার পর চেয়ারটায় গিয়ে

বসলেন। সিগারেট ধরালেন একটা। ঘড়ি দেখলেন। জ্রকুঞ্চিত করলেন। আবার উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে চেয়ারে এসে বসলেন আবার। পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে নাচাতে লাগলেন পায়ের পাতাটা। ঠিক করলেন, অপেক্ষাই করবেন। হঠাৎ মনে পড়ল, ডানা চা তৈরি করছিল। উঠে ঘরের ভিতর গেলেন। আবার স্টোভ জেলে চা তৈরি করলেন। দু কাপ করলেন। এক কাপ নিজে খেলেন, আর এক কাপ ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেন। ঘড়িটা দেখলেন আবার। আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। এখনও ফিরল না? ভ্রূযুগল আবার কুঞ্চিত হ'ল। বাইরের চেয়ারে গিয়ে বসলেন আবার। আবার পায়ের পাতাটা নাচাতে লাগলেন। উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তার পর আবার পায়চারি শুরু করলেন। খানিকক্ষণ পরে ঘড়ি দেখলেন, আরও মিনিট কুড়ি কেটে গেছে। কোথায় গেল ডানা? ' মনে হ'ল, আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। হেঁটেই বেরিয়ে পড়লেন অন্ধকারে। বেশী দূর যেতে হ'ল না। দেখলেন, তাঁর বাইকটা একটা গাছে ঠেসানো রয়েছে। স্তম্ভিত হয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন সেটার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর হরসুন্দরবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। দেখলেন, ডানাও তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছে। রূপচাঁদের দিকে চেয়ে খুব সপ্রতিভভাবে হেসে ডানা বললে, "খবরটা পেয়ে আমি নিজেই ছুটে গিয়েছিলাম হরসুন্দরবাবুর কাছে। ভাগ্যে গিয়েছিলাম। উনি বাড়ি ছিলেন না। চাকরটা এই খবর নিয়ে ফিরে আসছিল। আমি বাড়ির ভিতর গিয়ে ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে, উনি সিংহি মশায়ের বাড়ি দাবা খেলতে গেছেন, সেখান থেকে ধ'রে নিয়ে এলাম ওঁকে। আমি ওঁকে এখনই সদরে চ'লে যেতে বলছি—"

হরসুন্দরবাবু বিপন্নমুখে রূপচাঁদের দিকে চাইলেন।

বললেন, "এখন গিয়ে লাভ কি। কাল সকালের ট্রেনেই যাব না হয়। এখন গিয়ে কারু সঙ্গে দেখা হবে কি?"

ডানা উত্তেজিত হয়েছিল। বললে, "জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি—কটায় ট্রেন ?"

হরসুন্দর আরও বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন।

"কটায় ট্রেন বলুন না ?"

রূপচাঁদ এতক্ষণ স্মিতমুখে চুপ ক'রে চেয়ে ছিলেন।

বললেন, "আজকাল ম্যাজিস্ট্রেট একজন বাঙালী ভদ্রলোক। তুমি যদি যাও, সঙ্গে সঙ্গে 'বেল' দিয়ে দেবেন। তবে ট্রেনে গিয়ে সুবিধে হবে না, যদি বল রামেশ্বরবাবুর মোটরটা যোগাড় করি। অনুরোধ করলে এখনই পাঠিয়ে দেবেন। হরসুন্দরবাবুকে আর কষ্ট দেওয়া কেন ? আমিই চল না হয় যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। তবে ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই, আজ তো আর তাকে ছাড়বে না।"

ডানা বললে, "বেশ, কাল সকালেই যাব তা হ'লে। হরসুন্দর-বাবুর সঙ্গেই যাব। আপনার তো আপিস আছে।"

রূপচাঁদ বললেন, "তা আছে। তবে দরকার হ'লে ছুটিও নেওয়া যায়। কাল দিনের ট্রেনে যদি যাও, আমার অবশ্য যাওয়ার দরকারই হবে না। আমি বরং এস. পি.কে বলব একবার।"

"তা হ'লে তাই ঠিক রইল। চলুন হরসুন্দরবাবু, আপনার গিন্নী আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন ফুলুরি ভাজা খাওয়ার জন্যে। রাতের খাওয়াটা আপনার ওখানেই সারব আজ—"

"চলুন চলুন। বেশ তো, খুব আনন্দের কথা।"

হরসুন্দরের মুখের বিপন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠল। ডানাকে সঙ্গে নিয়ে রূপচাঁদকে নমস্কার ক'রে তিনি চ'লে গেলেন। রূপচাঁদ তাদের প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে নির্নিমেষে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৫

হরসুন্দরবাবুর বাড়ি থেকে ডানা যখন বেরুল, তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। চাঁদ উঠেছে। নিস্তব্ধ চতুর্দিক। হরসুন্দরবাবু একটা চাকর আর একটা টর্চ সঙ্গে দিয়েছিলেন। কিছুদূর এসে ডানা চাকরটাকে বললে, "তুমি শোও গে যাও। টর্চটা সঙ্গে থাকলেই আমি চ'লে যেতে পারব।" চাকর চ'লে গেল। ডানা টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে লাগল, অর্থাৎ চিন্তা করতে লাগল, এখন কোথায় যাওয়া যায়। হঠাৎ ঠিক করলে, নিজের বাসাতেই ফিরে যাবে। রূপচাঁদবাবুর ভয়ে গৃহত্যাগী হতে হবে নাকি। দেখাই যাক না ভদ্রলোকের দৌড় কতদূর। ফিরে এসে দেখলে, চাকরটা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আর কেউ কোথাও নেই। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যেন হতাশ হ'ল একটু। মনের নিভৃত প্রদেশে কে যেন আশা ক'রে বসেছিল যে, রূপচাঁদবাবু তার অপেক্ষায় এখনও অধীরভাবে পায়চারি করছেন মাঠে। তার পায়ের সাড়া পেয়ে চাকরটা উঠে বসল।

"রূপচাঁদবাবুর চাকর এই চিঠিটা দিয়ে গেছে। জবাবের জন্যে অনেকক্ষণ ব'সে ছিল, এই একটু আগেই চ'লে গেল।"

খামটা নিয়ে ডানা ঘরে ঢুকে পড়ল। লণ্ঠনটা উসকে চিঠিটা হাতে ক'রে ব'সে রইল খানিকক্ষণ। কি লিখেছেন ভদ্রলোক! যা লেখা সম্ভব তা তার অজানা নেই...হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। অনেকদিন আগে কথাটা সন্ন্যাসী বলেছিলেন। হাসিমুখেই বলেছিলেন—'ওই রূপচাঁদবাবুর লালসা তোমার মনকেও প্রভাবিত করেছে। শুধু প্রভাবিত করে নি, আতঙ্কিত করেছে। আতঙ্ক আকাঙ্ক্ষার আর একটা রূপ। যে লালসা ওঁর মনে জেগেছে তা তোমার মনেও সাড়া তুলেছে। কিন্তু যেহেতু তোমার সংস্কারের

'সঙ্গে এই পাড়ার বিরোধ আছে, তাই তুমি ভয় পেয়েছ, মিল থাকলে খুশী হতে··· ।'

খামটা ছিঁড়তেই কয়েকখানা নোট বেরিয়ে পড়ল, আর এক টুকরো কাগজ। রূপচাঁদবাবু লিখেছেন—

ডানা,

একটু আগে ঠিক করেছিলাম, তুমি না ডাকলে আর তোমার কাছে যাব না। সে সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হতে হ'ল। হঠাৎ মনে পড়ল, কাল সকালে তুমি সদরে যাবে আনন্দমোহনের 'বেল' নেবার জন্যে। তোমার হয়তো অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমি জানি পুলিস সংক্রান্ত ব্যাপারে টাকা জিনিসটা দরকারী, তালা খুলতে হ'লে চাবি যেমন দরকারী। তোমার হাতে টাকা আছে কি না আমার জানা নেই। তাই আমার কাছে যা ছিল পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে ফেরত দিও। আমি নিজে পুলিস-আপিসের বড়বাবু, আমার দ্বারা যতটা করা সম্ভব, বলা বাহুল্য, তা আমি করব নিশ্চয়ই; কিন্তু একটা কথা ভেবে মনে হচ্ছে, আমি ব্যর্থকাম হব। পুলিস যেখানে টাকার গন্ধ পায় সেখানে শুষ্ক খাতিরে কাজ করে না। অমরেশবাবু বড় জমিদার, তাঁর ম্যানেজারকে তারা ফাঁসিয়েছে, অতবড় রুইকে তারা শুধু হাতে ছেড়ে দেবে ব'লে মনে হয় না। তবে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, তুমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নিজে যদি যাও, বঁড়শিটা হয়তো খুলে যেতে পারে। ইতি

আরসি

ডানা গুনে দেখলে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইল নোটগুলোর দিকে। তারপর সেগুলো আর একটা খামে পুরে খামটা ভাল ক'রে জুড়ে দিলে। চাকরটাকে উঠিয়ে বললে, "জবাবটা রূপচাঁদবাবুকে দিয়ে আয়। চিঠিটা তাঁর হাতেই দিবি।"

চাকরটা ফিরে এল একটু পরে। দেখলে ঘরের কপাট বন্ধ। ভাবলে, মাইজী বোধ হয় শুয়ে পড়েছেন। সে যদি ভাল ক'রে দেখত তা হ'লে বুঝতে পারত যে, কপাটে খিল বন্ধ নেই, বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। ডানা বেরিয়ে গিয়েছিল চরের দিকে।

ডানা টর্চটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু টর্চের দরকার ছিল না। জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল চতুর্দিক। একা একা আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে চরে। সে যে ঠিক সন্ন্যাসীর সন্ধান করছিল তা নয়, রূপচাঁদের ভয়ে ভীত হয়ে সে যে পালিয়ে এসেছিল তাও ঠিক নয়, নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তর্ক করছিল নিজের সঙ্গে। অতীতে যে জীবনকে সে পিছনে ফেলে এসেছে সে জীবনেরই পুনরাবৃত্তি তার ভবিষ্যৎ-জীবনে কি ক'রে আবার হবে, আবার নূতন ক'রে ভদ্রভাবে কোথায় সংসার পাতবে—এই অতি স্বাভাবিক চিন্তাটাও তার মনে সজাগ হয়ে ছিল না, কখনও থাকতও না। খরস্রোতা জীবননদীর তীরে ছোট একটি গাছের মত বেড়ে উঠেছিল সে, হঠাৎ ধস্ ভেঙে প'ড়ে গেছে নদীর স্রোতে। যে শিকড় আগে স্থাণু মাটি থেকে প্রাণরস আহরণ করত তা এখন করছে বহমান স্রোতের জল থেকে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছিল, এখন আর হয় না। ভেসে চলাটাকেই এখন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ভেসে এসেছে নূতন জগতে। নূতন জগতের বিজ্ঞানী, কবি, রূপচাঁদ, সন্ন্যাসীকে ঘিরে ঘিরে স্রোতের আবর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মন, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, দাঁড়াতে পারছে না। অস্থির মনও স্বপ্ন রচনা করে। তার মনও করছিল। বিজ্ঞানীকে, কবিকে এবং রূপচাঁদকে কেন্দ্র ক'রে তিন রকম স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছিল তার কল্পনা, যদিও জ্ঞাতসারে তার মনে হচ্ছিল অন্যরকম। মনে হচ্ছিল সন্ন্যাসীই বুঝি তার স্বপ্নের খোরাক জোগাচ্ছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীকে

ঘিরে কোন বিশিষ্ট স্বপ্নলোক মূর্ত হয়ে ওঠে নি তার মনে। সে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করবার উপাদানই পায় নি। ঘুরে ঘুরে তার কাছে এসেছে কিন্তু কিছুই সহ্য করতে পারে নি। অমরেশবাবুকে ঘিরে যে স্বপ্নলোক সে সৃষ্টি করেছিল শ্রদ্ধাই তার প্রধান উপকরণ, কবিকে ঘিরে যে জগৎ সে সৃষ্টি করেছিল তাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে ছিল কিছু অনুকম্পা, রূপচাঁদের জগতে ছিল রিরংসা। কিন্তু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ছিল কেবল কৌতূহল। নিছক কৌতূহল নিয়ে স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করা যায় না, স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করবার জন্যও উপকরণ চাই, কৌতূহল সে উপকরণ সংগ্রহের প্রেরণা মাত্র দিতে পারে। সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ডানার মনে যে কৌতূহল জেগেছিল, সে কৌতূহলও সব সময়ে একাগ্র থাকতে পারছিল না। চরে এসে সে সন্ন্যাসীকে খুঁজছিল না। আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অথচ সন্ন্যাসী যে এখানে কোথাও আছেন এই ধারণাটা মনের প্রচ্ছন্নলোকে অস্পষ্ট-রূপে আভাসিত হচ্ছিল, একটা আবছা প্রত্যাশাও ছিল—হয়তো তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। জ্যোৎস্নালোকিত চরটাই কিন্তু পেয়ে বসেছিল তার মনকে। একটা অপরূপ আবির্ভাব যেন তার সমস্ত চৈতন্যকে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিল। জ্যোৎস্না সে আগে অনেকবার দেখেছে, চরও দেখেছে, কিন্তু গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতার সঙ্গে আকাশ-ভরা নির্মল জ্যোৎস্না আর দিগন্তবিস্তৃত শুভ্র চরের এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কখনও সে দেখে নি। আকাশ যেখানে চক্রবাল-রেখাকে স্পর্শ করেছে সেই দিকেই স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। সমস্ত জ্যোৎস্না যেন তারস্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠল। কলরব করতে করতে চরের উপর দিয়ে পাখী উড়তে লাগল, মনে হ'ল চরটাই বুঝি বহু পক্ষীর রূপ ধ'রে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের আগমনে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল। একটা বালুস্তূপের আড়ালে ব'সে ছিলেন তিনি, উঠে দাঁড়াতেই

দেখা গেল। পাখীদের এই হঠাৎ চাঞ্চল্য কেন জানবার জন্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ডানাকে তিনি দেখতে পেলেন, কিন্তু এগিয়ে এলেন না, কোনও সম্ভাষণও করলেন না। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। ডানাই এগিয়ে এল।

"ও, আপনি এখানে ব'সে আছেন বুঝি? আপনাকে দেখতেই পাই নি। পাখীগুলোকেও দেখতে পাই নি। ওগুলো টিট্টিভ মনে হচ্ছে—"

সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, টিট্টিভই। তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। আমি ওদের সঙ্গে ভাব ক'রে ফেলেছি।"

"ভাব ক'রে ফেলেছেন?"

"তোমার সঙ্গেও ভাব হয়ে যাবে যদি ওরা বোঝে যে, তুমি ওদের হিতৈষী।"

"সেটা কি ক'রে বোঝাব ওদের?"

"আপনিই বুঝবে। মন অন্তর্যামী।"

"তা হ'লে এখনই বোঝা উচিত ছিল। আমি তো ওদের কোনও অনিষ্ট চিন্তা করি নি।"

"কিন্তু তোমার মত চেহারাওলা অনেকে করেছে। এই সেদিনই ভোরবেলা নৌকো ক'রে শিকারীরা এসেছিল হাঁসের সন্ধানে। হাঁসেরা অনেক আগেই চ'লে গেছে, অনর্থক কতকগুলো টিট্টিভকে মারলে ওরা।"

"মানা করলেন না আপনি?"

"মানা করলে শোনে না কেউ। উপদেশও শোনে না। সবাই আপন প্রবৃত্তি অনুসারে চলে। আমাকে তুমি যদি বল," আপনি এমন ছন্নছাড়া জীবন যাপন করছেন কেন, বিয়ে ক'রে সংসারী হোন—তোমার এ উপদেশ আমি শুনব না।"

"সত্যিই এই ছন্নছাড়া জীবন ভাল লাগে আপনার?"

সন্ন্যাসী হাসলেন একটু।

তারপর বললেন, "ব'স। একটু আগে তুমি একটা অদ্ভুত রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছ। না জেনেই করেছ বোধ হয়। ব'স, সেই বিষয়েই আলোচনা করা যাক। আলোচনা করলে ব্যাপারটা আমার কাছেও বোধ হয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পরিবেশটাও মনোমত হয়েছে। ব'স।"

এই ব'লে চুপ ক'রে গেলেন তিনি। তলিয়ে গেলেন যেন কোথায়। তারপর বসলেন আস্তে আস্তে। ডানাও বসল। অনেকক্ষণ কোনও কথা হ'ল না। নীরবতা ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠল ডানার।

বললে, "পাখীগুলো এইবার থিতিয়ে বসেছে। খুব কাছেই বসেছে অনেকগুলো। ও-রকম ক'রে বসেছে কেন?"

"ডিম পেড়েছে ওরা। ডিমে তা দিচ্ছে। রাত্রেই ওরা ডিমে তা দেয়। দিনে বড় একটা বসতে দেখি না। দিনের বেলা নদীর ওপর উড়ে উড়ে মাছ ধরে খালি।"

"ওদের ডিম দেখেছেন আপনি?"

"হাত দিয়ে তুলে দেখি নি, দূর থেকে ব'সে ব'সে দেখেছি। দিনের বেলা আমিই তো ওদের ডিম পাহারা দি।"

নিজের বিদ্যে জাহির করবার জন্যে ডানা বললে, "ওরা বালির খাঁজে খাঁজে ডিম পাড়ে, নয়?"

"হ্যাঁ। কি ক'রে জানলে তুমি? এসেছিলে নাকি কোনদিন?"

"বইয়ে পড়েছি। ওরা দিনের বেলা ডিমে তা দেয় না কেন জানেন? রোদে বালি এত তেতে যায় যে তা দেবার দরকারই হয় না। ওদের ডিম পাহারা দেবারও দরকার নেই, বালির সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে বাইরে থেকে বোঝা যায় না।"

"ওদের দরকারের জন্যে পাহারা দিই না, পাহারা দিই নিজের প্রয়োজনে। আমি যে ওদের বন্ধু সেটা ওদের বোঝাবার জন্যে। ওরা সেটা বোঝে। সেদিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল।"

"কি ?"

"ওই যে উঁচু বালির ঢিপিটা দেখছ, তার ওপারে কয়েক জোড়া বেশ বড় ধরনের টিট্টিভ আছে। টিট্টিভই বোধ হয়, বেশ বড় ঠোঁট, পিঠ আর ডানার উপরটা কালচে বাদামী, জলের ঠিক ওপর দিয়ে দিয়ে উড়ে যায়—"

"বুঝেছি, বোধ হয় স্কিমার (Skimmer)।"

"তা হবে। ওদের বাচ্চা হয়েছে ওখানে। দুপুরে ব'সে আছি সেদিন, হঠাৎ দু-তিনটে পাখী উড়ে এল, এসে আমার মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে চীৎকার করতে লাগল। প্রথমটা আমি বুঝতে পারি নি। তারপর মনে হ'ল, পাখীগুলো আমাকে বোধ হয় বলতে চাইছে কিছু। উঠে দাঁড়ালাম। উঠে দাঁড়াতেই পাখীগুলো আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে ওই ঢিপিটার দিকে উড়তে লাগল। মনে হ'ল, আমাকে যেন ইঙ্গিত করছে অনুসরণ করতে। অনুসরণ করলাম। গিয়ে দেখি, একটা সাপ ওদের একটা বাচ্চাকে ধরেছে। তাড়া দিলাম, নড়ল না। তখন বাধ্য হয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে মারতে হ'ল সাপটাকে।"

"কি সাপ ?"

"কোনও চেনা সাপ নয়।"

"আহা, কেন মেরে ফেললেন বেচারীকে। ও তো কোনও দোষ করে নি, নিজের খাদ্য সংগ্রহ করতে এসেছিল—"

"আর্তকে রক্ষা করা কর্তব্য—শাস্ত্রের এই উপদেশ। ভৃগুপত্নী আর্ত দৈত্যদের রক্ষা করতে গিয়ে ইন্দ্রের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন—"

"ভৃগুপত্নী মানে ?"

"শুক্রের মা।"

"তাই বুঝি শুক্র দেবতাদের ওপর চটা ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমরা আসল প্রসঙ্গ থেকে ক্রমশ দূরে স'রে যাচ্ছি।"

"বলুন।"

"আমার মনে হচ্ছে, ব'লে কি-ই বা হবে। ভাবের সমুদ্রে কত বুদ্বুদই তো উঠছে, প্রত্যেকটাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়ও না, প্রকাশ করবার দরকারও নেই—"

"না না, বলুন তবু।"

সন্ন্যাসী চুপ ক'রে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রেই রইলেন।

নীরবতাটা আবার পীড়া দিতে লাগল ডানাকে।

"বলুন না, কি বলতে চাইছিলেন।"

"তুমি তখন বললে, মন অন্তর্যামী, কিন্তু সে এক নজরে বন্ধু বা শত্রুকে চিনতে পারে না কেন? কেন ভয় পায়, কেন সন্দেহের চক্ষে দেখে, কেন যাচিয়ে নিতে চায়? ওটা একটু অদ্ভুত রহস্য। ওর আসল উত্তর কি জান? অন্তর্যামীর শত্রু কেউ নেই, মিত্রও কেউ নাই, কারণ, এই নিখিল বিশ্বই অন্তর্যামী। সে-ই সব, তার আবার শত্রু-মিত্র কি? তোমার ডান হাতটা কি তোমার মিত্র, না, তোমার ডান পাটা তোমার শত্রু? ডান হাতও তোমার, ডান পাও তোমার, তুমিই সবটা। তেমনই বাইরে যা কিছু দেখছ, সবই অন্তর্যামী, তিনিই প্রকাশিত হয়েছেন নানা রূপে, তাঁর কাছে ভেদাভেদ নেই কিছু।"

"তা হ'লে আমাদের মধ্যে যে অন্তর্যামী আছেন, তিনি একজনকে শত্রু, একজনকে মিত্র মনে করেন কেন?"

"ওইটেই তাঁর খেলা। অনেকে বলেন—লীলা।"

"তার মানে?"

"তিনিই যুধিষ্ঠির, তিনিই দুর্যোধন, তিনিই বেদব্যাস, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্রই তিনি। এ না হ'লে মহাভারতের কাব্য জমত না। মহাকবি তিনি, অনন্ত তাঁর কাব্য, সে কাব্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে নিজেকেই মূর্ত করছেন তিনি নানা ভাবে, নানা রূপে, নানা ছন্দে—"

"বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"আমিও পারি নি। আভাসে যতটুকু বুঝেছি বললাম। হয়তো ভাল ক'রে গুছিয়ে বলতে পারলাম না। কারণ ঠিক বুঝি নি। বুঝতে পারলেই তো মুক্তি।"

"কি বুঝতে পারলে?"

"যে তুমিই সেই।"

আবার নীরব হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। ডানাও চুপ ক'রে রইল।

মনে হতে লাগল, একটা অসীম পাথার যেন থৈ-থৈ করছে চারিদিকে

৩৬

কবি হাজতে গিয়ে মন্দ ছিলেন না। তাঁর বিবেকে কোনও গলদ ছিল না, মনে তাই কোন অশান্তিজনক আশঙ্কা জাগে নি। তিনি যে অবিলম্বে ছাড়া পেয়ে যাবেন—এ বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল না। পুলিসের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখে এবং অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা অভিনব পারিপার্শ্বিকে নীত হয়ে বরং একটু মজাই লাগছিল তাঁর। কোনও অদৃশ্য বিধাতা তাঁকে যেন দৈনন্দিন একঘেয়েমির বন্দীশালা থেকে মুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিতলোকে এনে হাজির ক'রে দিলেন, রূপকথার হারুন-অল-রশিদ যেমন দিয়েছিলেন আবুহোসেনকে। আর একটা কথা ভেবেও পুলকিত হচ্ছিলেন তিনি। ডানা নিশ্চয়ই খবরটা পাবে, পেয়ে উতলাও হবে নিশ্চয়। উতলা হয়ে জানলার গরাদে ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবার মেয়ে সে নয়, কিছু একটা করবেই। কি করবে, কি করা সম্ভব? কল্পনা নানা রকম ছবি আঁকছিল। মশগুল হয়ে এক-একটা ছবির দিকে চেয়ে দেখছিলেন তিনি। ডানা কি [illegible] শরণাপন্ন হবে? অমরেশবাবুকে টেলিগ্রাম

করবে? হঠাৎ একটা সম্ভাবনা হওয়াতে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মন্দাকিনীকে খবর দিয়ে দেবে না তো? তা হ'লে কিন্তু হুলুস্থুল বেধে যাবে। মন্দাকিনীর ঠিকানা অবশ্য ডানার জানা নেই। রূপচাঁদ জানে। চিন্তিত হয়ে হাঁটু দোলালেন খানিকক্ষণ। চিন্তার অন্তরালেও কিন্তু একটা পুলকের স্রোত ফল্গুর মত বইছিল। ডানা যা-ই করুক, তাঁকে নিয়েই যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—উঠেছে নিশ্চয়ই—এই ধারণাটা পুলকিত ক'রে তুলেছিল তাঁকে।

যে ঘরটায় ছিলেন তিনি, সে ঘরে জানলা ছিল একটা। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল নীল আকাশ। নীল আকাশের পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছিল একটি গাছের কঙ্কাল। পাতা সব ঝ'রে গেছে। যে শাখা-প্রশাখাগুলি অসংখ্য সবুজ পত্রকে আঁকড়ে ধরেছিল তারা আজ রিক্ত। একটি পাতাও নেই। গাছের শীর্ষদেশে ব'সে আছে এক গোদাচিল। খানিকক্ষণ চিলটার দিকে চেয়ে থেকে তাঁর মনে ভাব জাগল। একটা ছোট খাতা আর পেন্সিল তাঁর পকেটে সর্বদা থাকত। বার ক'রে লিখতে লাগলেন। অনেক কাটাকুটির পর যা দাঁড়াল, তা এই—

যে নিগূঢ় মিল আছে ছবি আর পটভূমিকায়
ফুটিবে তা কোন্ বর্ণে কার তুলিকায়?
পিছনে আকাশ গাঢ় নীল,
এই পটভূমিকায় গাছের কঙ্কাল আঁকা
শিরে তার ব'সে আছে চিল।
তীক্ষ্ণ নখ-চঞ্চুবান ব'সে আছে অশঙ্কিত হিয়া
তাম্রবর্ণ পক্ষ দুটি সূর্যালোকে ওঠে ঝলসিয়া,
শক্তি-দৃপ্ত অকুণ্ঠিত মহিমার প্রতীক যেন সে,
দৃষ্টি তার প্রশ্ন করে এখনও কেন সে
পায় নি শিকার;

গাছের কঙ্কাল কিম্বা আকাশের নীল বর্ণ
চিত্তে তার তোলে নি বিকার
আমি কবি, আমি শুধু মুগ্ধ নেত্রে হেরি এই ছবি ;
মনে মনে খুঁজি সেই মিল
রিক্ত-বৃক্ষ, ক্ষুব্ধ-চিল, নির্বিকার আকাশের নীল
যে মিলে মিলিত হ'লে খুলে যাবে সমস্যার খিল।
স্বপ্নে দেখি যেন এক নূতন ধরণী,
নূতন নদীর স্রোতে ভেসে চলে নূতন তরণী ;
আরোহী ওরাই
আকাশের নীল আর গাছের কঙ্কাল আর ওই চিলটাই ;
সে তরীতে আমিই নাবিক
কোন ঘাটে ভিড়িব যে তাও যেন জানি আমি ঠিক।

কবিতাটা লেখা শেষ ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে ব'সে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ। নূতন ধরণীর নূতন নদীস্রোতে ভাসতে ভাসতে চ'লে গেলেন কোথায় যেন। হঠাৎ চমক ভাঙল, জানলার ঠিক নীচেই খুব চেনা পাখী ডেকে উঠল একটা। ছোট ছেলেরা 'টু' শব্দ ক'রে যেমন লুকোয়, অনেকটা তেমনি মনে হ'ল তাঁর। মনে হ'ল, তাঁকে ডেকে যেন বলছে—কি যা-তা ভাবছ তুমি। আমি এত কাছে রয়েছি দেখতে পাচ্ছ না। কবি চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, ঠিক নীচেই কুন্দফুলের ঝাড় রয়েছে একটা। আর কিছু দেখতে পেলেন না প্রথমে। একটু পরেই পেলেন। দরজিপাখী একটি, কুন্দ-ঝাড়ের নীচের ডালটিতে ব'সে আছে, ডালটি দুলছে, এককালি রোদ এসে পড়েছে তার ওপর। দরজিপাখীকে একাধিক বার দেখেছেন তিনি ইতিপূর্বে, তার নানা রকম ডাক শুনেছেন, তার পাতায় পাতায় সেলাই-করা বাসাও দেখেছেন—সংগ্রহ করা আছে একটি অমরেশবাবুর মিউজিয়মে ;

কিন্তু এত কাছে, এমন ঘনিষ্ঠভাবে দরজিপাখীকে দেখবার সুযোগ তিনি পান নি। বইয়ে যে বর্ণনা পড়েছিলেন তা মনে করবার চেষ্টা করলেন। বইয়ে লেখা আছে 'অলিভ গ্রীন' রঙ, লালচে পা, ছোট্ট মুখ, ছোট্ট ঠোঁট, গলায় কালো কণ্ঠী। সবই মিলে যাচ্ছে। হঠাৎ ল্যাজটা সোজা খাড়া হয়ে উঠল পিঠের ওপর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে 'টৌয়িট্' 'টৌয়িট্' 'টৌয়িট্' শব্দ ক'রে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গেল দরজিপাখী। বোঝা গেল, কবিকে দেখতে পেয়েছে এবং চটেছে। 'স্পাই'কে পাখীরাও ঘৃণা করে। কবির মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি, ছোট নাতির কাণ্ডকারখানা দেখে দাদামশায়ের মুখে যেমন ফোটে। খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর ঝুঁকে আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে, এঁকেবেঁকে না-না রকমে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পাখীটাকে আর দেখতে পেলেন না। একটু দূরে ডাক শোনা গেল—পীপ্ পীপ্ পীপ্। ঠিক এর পরই কবি বুঝতে পারলেন, বন্দীত্বের দুঃখটা কোথায়। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল, বেরিয়ে গিয়ে পাখীটার খোঁজ করেন; কিন্তু তার উপায় নেই এখন। অনেকক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ালেন ঘরের মধ্যেই। তারপর চেয়ারে এসে বসলেন। একটু পরে খাতা পেন্সিল বেরুল পকেট থেকে, ভাব ছন্দ আর মিলের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে পড়ল মন, ভেসে চলল কল্পনা-তরণী নূতন নদীর নূতন স্রোতে। অনেকক্ষণ লাগল কবিতাটা লিখতে, অনেক কাটাকুটি হ'ল, তবু মন খুঁতখুঁত করতে লাগল, মনে হ'ল বক্তব্যটা ঠিক যেন বলা হ'ল না।

দরজিপাখী শিল্পী মানুষ মরজি মতন চলেন
'পীপ্' 'পীপ্' 'পীপ্' দু-চার কথা খেয়াল মাফিক বলেন।
তোমার আমার দৃষ্টিটিকে পারতপক্ষে এড়ান,
পুচ্ছটিকে উচ্চে তুলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান।

চ'টে গেলেই ধমকে ওঠেন 'টোইট্' 'টোইট্' 'টোইট্'
যার অর্থ সরল ভাষায়—চটছি আমি, 'নো ইট'।
মনটা যখন তলিয়ে ছিল বিষণ্ণতার তলায়
হঠাৎ গানের উঠল গমক দরজিপাখীর গলায়।
চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে দেখি, সবুজ কুন্দ-শাখায়
দোল খাচ্ছেন দরজিপাখী রোদ পড়েছে পাখায়।
বুকটি সাদা পিঠটি রঙিন গলায় আভাস কালোর,
হচ্ছে মনে দুলছে যেন রঙিন সুরের ঝালর।
জলপাই রঙ সাধছে সারং শুনছে স্বয়ং তপন
বইছে হাওয়া মন্দ-মৃদু আকাশ দেখছে স্বপন।
দেখছে যেন বসুন্ধরাই দরজিপাখীর মতন
রূপের হট্টলোকের মাঝে খুঁজছে অরূপ রতন।
আকাশ-ভরা সূর্য তারা লক্ষ পাতা শাখীর
সব ছাড়িয়া সুর উঠেছে বসুন্ধরা-পাখীর।
পাতায় পাতায় সেলাই ক'রে সেও তো বাসা বানায়
কিন্তু সে যে নয়কো ছোট গান গেয়ে তা জানায়।

কবিতাটি বার দুই মনে মনে পড়লেন তিনি। তারপর জোরে জোরে পড়লেন একবার। 'ছোট্ট' কথাটাকে কেটে 'ছোট' করলেন। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন কবিতাটার দিকে ভাবতে লাগলেন, আরও গোটা দুই লাইন জুড়ে দেবেন কি না। এমন সময় জেলারবাবু এসে দাঁড়ালেন দ্বারপ্রান্তে।

"আপনার 'বেল' হয়ে গেছে। আসুন।"

কবি দাঁড়িয়ে উঠলেন হঠাৎ। খাতাটা প'ড়ে গেল তাঁর কোল থেকে। সেটাকে তুলে আবার পকেটে পুরলেন। খবরটা শুনে তিনি মনে মনে একটু হতাশই হয়ে গেলেন যেন। এত সহজে সব

শেষ হয়ে গেল ? তিনি আশা করেছিলেন, অনেক হৈ-চৈ হবে এ নিয়ে।

"'বেল' হয়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ। একজন ভদ্রমহিলা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে। উনিই সম্ভবত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর এস. পি.র সঙ্গে দেখা ক'রে 'বেলে'র ব্যবস্থা করেছেন। আসুন।"

কবি বেরিয়ে দেখলেন, ডানা দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। তারপর হঠাৎ গদগদ হয়ে বললেন, "চমৎকার। এইটেই আশা করেছিলাম।"

"চলুন, ট্রেনের বেশী দেরি নেই আর।"

"এ ঘোড়ার গাড়ি কি আমাদের জন্যে ?"

"হ্যাঁ। ওইটে ক'রেই তো ঘুরছি সকাল থেকে।"

"ও। খুব ঘুরতে হয়েছে বুঝি ?"

এ কথার উত্তর না দিয়ে ডানা কেবল বললে, "চলুন।"

গাড়িতে উঠে কিছুই কথা হ'ল না খানিকক্ষণ। ডানা বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। কবি উসখুস করতে লাগলেন। ডানাই কথা কইলে প্রথম।

"মনে হচ্ছে, এরা আমাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে।"

"ষড়যন্ত্র ? মানে ? কারা ষড়যন্ত্র করছে ?"

"মল্লিক মশাইরা।"

"আগে যে মল্লিক ম্যানেজার ছিল, সেই ?"

"হ্যাঁ।"

"লোকটা তো খারাপ নয়। তুমি জানলে কি ক'রে ?"

"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন। মল্লিক মশাই নাকি গোপনে

পুলিস সাহেবকে খবর দিয়েছিলেন যে, এ খুনের সঙ্গে আপনি জড়িত ?”

“কি রকম ?”

“ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সব কথা খুলে বললেন না। ইঙ্গিতে শুধু বললেন যে, আপনাদের নিজের লোকই তো পুলিসকে এ খবর দিয়েছে। নিজের লোকটি কে তা জিজ্ঞেস করাতে একটু ইতস্তত ক'রে তিনি মল্লিক মশাইয়ের নামটা বললেন। তাঁর ধারণা, মল্লিক মশাই এস্টেটেরই কর্মচারী একজন। আমি যখন তাঁকে বললাম যে, মল্লিক মশাই আগে এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন এবং অমরেশবাবুর স্ত্রী তাঁকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আপনাকে বসিয়েছেন, তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। মনে হ'ল, মল্লিকের এই অদ্ভুত আচরণের হেতুটা যেন তাঁর কাছে স্পষ্ট হ'ল। তারপর যখন শুনলেন আপনি প্রফেসার ছিলেন, তখন তাঁর ভুরু আরও কুঁচকে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ কলেজের প্রফেসার ছিলেন ? আমি জানতাম না, বলতে পারলাম না। তিনি বললেন, আমি এক আনন্দবাবুর ছাত্র ছিলাম, ইনি তিনি নন তো ? প্রশ্ন করলেন, কবিতা লেখেন কি খুব ? এ খবরটা জানা ছিল। বললাম, লেখেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, ইনি তা হ'লে সেই আনন্দবাবু। আমাকে একটা দরকারে এখুনি এক জায়গায় বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, তা না হ'লে আমি নিজেই যেতাম তাঁর কাছে। যাই হোক, তাঁর 'বেলে'র ব্যবস্থা আমি এখুনি ক'রে দিচ্ছি—”

কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

“নাম কি বল তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ?”

“তা তো ঠিক জানি না।”

“আমার এক ছাত্র—নিখিল বোধ হয় তার নাম—কোথায় যেন এস.ডি.ও. হয়েছিল শুনেছিলাম, এ হয়তো সেই—”

ডানা বললে, "উনি একদিন আসবেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

কবি হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর কল্পনা-তরণী তখন বিশাল সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল—অকূলে কূল খোঁজবার আশায় নয়, আনন্দের আবেগে।

ডানা বললে, "মিছিমিছি কি কাণ্ড দেখুন তো! খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয় আপনার?"

"কিছুমাত্র না। আমি কবিতা লিখছিলাম। শুনবে?"

"এখন থাক্। বাড়ি গিয়ে শুনব।"

"না, অত তর সইবে না আমার। এখনিই শোন।"

ছ্যাকড়া গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দের সঙ্গে কবির কণ্ঠস্বর পাল্লা দিতে লাগল।

ডানা ইণ্টার ক্লাস টিকিট করতে চেয়েছিল, কবি কিন্তু শুনলেন না।

ফার্স্ট ক্লাস টিকিট করতে হ'ল।

কবি বললেন, "তোমাকে ভিড়ের মধ্যে দেখলে ঠিকমত দেখা হয় না। মনের সঙ্গে চোখের ঝগড়া চলতে থাকে খালি।"

ডানা মৃদু হেসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রইল। হাওয়ার বেগে বিস্রস্ত হতে লাগল তার চুলগুলো।

কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন তার দিকে।

হঠাৎ বললেন, "তুমি যদি আমার মেয়ে হতে, বেশ হ'ত তা হ'লে—ভারি খুশী হতাম।"

"কেন?"

"অসঙ্কোচে আদর করতে পারতাম। আদর ক'রে যা বলতাম তা বেমানান হ'ত না। এখন কিছু বললেই তুমি চ'টে যাবে, লোকে শুনলেও ছি-ছি করবে।"

"কেন, কি বলতে চান?"
ডানা মুখ টেনে নিলে ভিতরে।
"বলতে চাই—।" ব'লেই কবি পকেট থেকে খাতা বার ক'রে পড়তে লাগলেন-

তুমি সুন্দরী, মন্দার মালা,
তুমি কর্পূরলতা,
দিবসের আলো, রাতের আঁধার
যাচে তব সখ্যতা।

জ্যোৎস্না-সাগরে তোমার তরণী
পাড়ি দেয় যবে রাতে
বেরসিক যারা ঘুমাইয়া থাকে
কবি জেগে থাকে ছাতে।

তাহারই কাব্য-তীর্থে, কণিকা,
ক্ষণতরে অবতরি,
মর্ত্য-মলিন কল্পনা তার
দাও যে সুধায় ভরি।

তুমি দেহ নও, তুমি কেহ নও,
অথচ তুমি যে সব,
তোমারে ঘিরিয়া হয় যে মূর্ত্ত
নিখিলের উৎসব।

তোমারই নয়নে, তোমারই অধরে,
তোমারই ডাহিনে বামে

সত্য-শিবের চির-সহচর
সুন্দর এসে নামে।

জানি না তাহারে, চিনি না তাহারে,
নাম নাই তার জানা,
তবু তারি লাগি কাব্যে ও গানে
সাজাই ছন্দ নানা।

ডানা স্মিতমুখে শুনছিল।

কবি থামতেই হেসে বললে, "আমি তা হ'লে, আপনার মতে, স্টেজ মাত্র।"

"স্টেজের মহত্ত্ব কম নাকি। স্বয়ং শেক্‌সপীয়র ব'লে গেছেন—সমস্ত পৃথিবীটাই স্টেজ।"

ডানা হাসিমুখে চুপ ক'রে চেয়ে রইল। তারপর জানলা দিয়ে আবার মুখ বাড়াল। কোন কথা কইল না। যে আমগুলো স্টেশন থেকে কেনা হয়েছিল, কবি তাই একটা তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন—হাত বেয়ে রস পাঞ্জাবিতে লাগল।

হঠাৎ ডানা মুখ ফিরিয়ে বললে, "ও কি করছেন? দিন, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। ক্ষিধে পেয়েছে আপনার? বলেন নি কেন?"

কবির হাত থেকে আমটা নিয়ে ডানা নিপুণভাবে কাটতে লাগল। কবি নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন।

"কি দেখছেন অমন একদৃষ্টে?"

"মেয়েকে, মাকে।"

ডানা চোখ তুলে চাইল। কবি দেখলেন, চোখে যে হাসি চিকমিক করছে তাতে আর শঙ্কার ছায়া নেই। তা প্রসন্ন, সুন্দর, স্নিগ্ধ।

৭

ফিরে এসেই ডানা আবার বেরিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর খোঁজে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। এই রোদে কেন যে সে বেরিয়ে পড়ল তা নিজেও সে বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার চেষ্টা করল না। আমাদের সব কাজের আসল কারণ কেউ আমরা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি না। অজুহাত অবশ্য সকলেরই একটা থাকে, ডানারও ছিল। যে আমগুলো কাল স্টেশনে কিনেছিল, তাই সে দিতে যাচ্ছিল সন্ন্যাসীকে। পরে দিলেও চলত, চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেও চলত। কিন্তু পিপাসার্ত পশু যেমন সহজ বুদ্ধিবলে টের পায়—জল কোথায় আছে এবং সে জলের সমীপবর্তী কি ক'রে হতে হয়, ডানাও ঠিক তেমনই অনুভব করছিল সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য তাকে এমন কিছু একটা দেবে যার জন্যে সে মনে মনে আকুল। কিন্তু সেটা যে কি, সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা ছিল না তার। ধারণা করবার প্রয়োজনও অনুভব করে নি সে। সন্ন্যাসীর কাছে গেলে ভাল লাগে, এই হেতুটুকুই যথেষ্ট ছিল তার কাছে।...বেরিয়েই চোখে পড়ল ছাই-রঙের একটা পাখী জিওলগাছের ডালে ব'সে আছে। অনেকটা বাজের মত। বুকের কাছটা বাদামী, তাতে ডোরাও দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। চোখ দুটো লালচে। ডানার মনে হ'ল, বাজ নয়, বাজ হ'লে ঠোঁটটা বাঁকা হ'ত। কি পাখী ওটা? এর আগে দেখে নি তো এ পাখী। পাখীটা যেই দেখলে ডানা তাকে লক্ষ্য করছে, সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল। উড়তেই ডানার নজরে পড়ল, পাখীটার ল্যাজের নীচে কালো রঙের ডোরা রয়েছে। পাখীটা উড়ে গিয়ে দূরে একটা আমগাছে বসল। ডানা চলতে শুরু করল আবার। চলতে চলতে ভাবতে লাগল, কি পাখী ওটা। মনে পড়ছে অথচ পড়ছে না। ঘুরতেই আবার পাখী। এক ঝাঁক ছাতারে একটা ঝোপের ধারে কচকচ করছে লাফিয়ে লাফিয়ে। দূরে টেলিগ্রাফ-

পোস্টের উপর ব'সে আছে ফিঙে। আর একটু দূরে মন্দিরের চূড়ার উপর নীলকণ্ঠ—ট্যক্ ট্যক্ শব্দ করছে আর ল্যাজ নাড়ছে। শালিকের বাসা চোখে পড়ল একটা। পক্ষীজগতের সঙ্গে আগে তার কোনও পরিচয় ছিল না, কোন ঔৎসুক্যও ছিল না। বাড়ির বাইরে বেরুলে পাখীদের সম্বন্ধে চোখ কান আগে সজাগ হয়ে উঠত না। এখন হয়। পাখীদের সামান্য সাড়াও মনে সাড়া জাগায়। অমরেশবাবু তাকে নূতন একটা রহস্যলোকের সন্ধান দিয়ে গেছেন। অমরেশবাবুর মুখটা মনে পড়ল। কত বড় বিদ্বান, অথচ কত সরল! এ দেশের এত রকম পাখী দেখেও তৃপ্তি হয় না ভদ্রলোকের। আরও টাকা থাকলে বিদেশে গিয়ে আরও পাখী দেখতেন। ছোট শিশু যেন। ডানার মনের নিভৃত কন্দর থেকে মাতৃস্নেহ উচ্ছলিত হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল, কত টাকা লাগে বিদেশে যেতে? আমার যদি থাকত আমি নিশ্চয় দিয়ে দিতাম। কবির কথাও মনে হ'ল, উনিও একটি শিশু. কিন্তু একটু অন্যরকম। ছিটগ্রস্ত। ভাবের ঘোরে কখন যে কি বলেন, কি করেন—কিছু ঠিক নেই। অনুকম্পা হ'ল। চিন্তাধারায় বাধা পড়ল হঠাৎ। রাস্তার ধারে একটা কাক কি যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল, তাকে দেখেই উড়ে গেল। ডানা দেখলে, মরা ইঁদুর একটা। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে, নীচের দাঁত দুটোও দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে মুখ ক'রে ব্যঙ্গ করছে যেন। কাকে? বিধাতাকে? মৃত্যুর সম্মুখীন হ'লে সকলেরই যেমন ক্ষণকালের জন্য জীবনের নশ্বরতার কথা মনে জাগে, ডানারও জাগল। বর্মা থেকে পালাবার সময় একবার মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছিল সে। মনে পড়ল সে কথা। অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বাবার মুখটা স্পষ্ট ফুটে উঠল মনে। মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? হারিয়ে যায় কি চিরকালের মত? নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যাওয়াই ভাল বোধ হয়। এই জীবনের সমস্ত সুখদুঃখবোধ সমস্ত স্মৃতিসম্ভার বহন করার

সার্থকতা কি থাকতে পারে, জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রই যদি চিরকালের মত ছিন্ন হয়ে যায়? যায় কি? তার এ চিন্তাস্রোতও ব্যাহত হ'ল। দূরে কোথায় যেন ডেকে উঠল আর একটা পাখী—বউ কথা কও। চমৎকার মিষ্টি ডাকটি। 'থা'টির উপর একটু সামান্য জোর দিয়ে, সামান্য একটু টান দিয়ে কি অপরূপ ক'রে বললে—বউ কথা কও। একবার ডেকেই কিন্তু চুপ ক'রে গেল। ডানা এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে লাগল, কোন্ গাছের ফাঁকে কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে। যে ছাই-রঙের পাখীটাকে একটু আগে দেখতে পেয়েছিল, সেটা বউ-কথা-কও নয়। যদিও সে চোখে দেখে নি এখনও, কিন্তু বইয়ে পড়েছে বউ-কথা-কও পাখীর রঙ কালো, ঠোঁটের দিকটা সাদা। ওর ইংরেজী নাম Indian Cuckoo ··ছাই-রঙের পাখীটা কি তা হ'লে? পর-মুহূর্তেই পাখীটা তারস্বরে আত্মপরিচয় ঘোষণা করল। সুরের উৎস পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে উৎসারিত হ'ল, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতপ্ত নির্মেঘ আকাশ সে উচ্ছ্বাসে বিব্রত হয়ে পড়ল। চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—দিগ্‌দিগন্তকে আকুল ক'রে তুলল যেন। ডানার তখন মনে পড়ল, অনেক কষ্টে এই চোখ-গেলকে একবার মাত্র দেখতে পেয়েছে সে। আরও মনে পড়ল, এর সঙ্গে বাজের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে ব'লে এর ইংরেজী নাম Hawk Cuckoo···ডানা চেয়ে দেখলে, কিছুদূরে একটা আমগাছের শাখা ফলভারে অবনত হয়ে পড়েছে। আরও কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়া শাখায় শাখায় আগুনের শিখা জ্বালিয়ে, তার পাশেই কর্ণিকার, মনে হচ্ছে অসংখ্য হলুদ-রঙের প্রজাপতি যেন কোনও মন্ত্রবলে অচঞ্চল হয়ে গেছে ওর পত্র-পল্লবে। সমুজ্জ্বল উত্তপ্ত রৌদ্র-কিরণেও উৎসবের আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে। সরবে-নীরবে, আভাসে-ইঙ্গিতে, স্পষ্টতা-অস্পষ্টতায় সে উৎসব আত্মপ্রকাশ করছে নানা সুরে নানা ছন্দে। বউ-কথা-কও আবার ডেকে উঠল অপ্রত্যাশিত ভাবে। ডানার

আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল একটু। সন্ন্যাসীর কাছে যাবে ব'লে বেরিয়েছিল, রাস্তার মাঝখানে ছেলেমানুষের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে পাখীর ডাক শুনে আর ফুলের গাছ দেখে। আবার চলতে শুরু করল। অনেক দিন আগে কবি একটা কবিতা লিখে শুনিয়েছিলেন তাকে। তার লাইনগুলো মনে পড়ল :—

নকল কাজেতে মত্ত থাকিয়া আসল কাজটি হয় নি করা,
মিলন-সভায় যাইতে পারি নি, সে যে হবে ওগো স্বয়ম্বরা।
সে বারতা লেখা তারায় তারায় ফুলে ফুলে তাহা উঠেছে ফুটি।
অকাজের পাকে রয়েছি জড়ায়ে কিছুতেই যেন পাই না ছুটি।

কবিতার লাইনগুলো গুঞ্জন করতে লাগল মনের ভিতর। এর যে অর্থ সে আগে বোঝে নি, সেই অর্থ টা ক্রমশ যেন প্রতিভাত হ'ল তার মনে। মনে হ'ল, আনন্দের একটা উৎসব অহরহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে চোখের সামনে, কিন্তু তাতে যোগ দেওয়ার সামর্থ্য নেই তার।

সন্ন্যাসীর বাসার কাছাকাছি গিয়ে ডানা যখন পৌঁছল, তখন আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাকে। দূর থেকে সে যা দেখতে পেলে তা অপ্রত্যাশিত। দেখলে, একটা শাবল নিয়ে সন্ন্যাসী একটা নারকেলের ছোবড়া ছাড়াবার চেষ্টা করছেন প্রখর রৌদ্রে ব'সে। ডানার মনে পড়ল কাকের ইঁদুর খাওয়ার দৃশ্যটা।

"কি করছেন আপনি ?"

সন্ন্যাসী একটু অপ্রতিভ হলেন।

"ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করছি। তুমি এই রোদে বেরিয়েছ যে ?"

"এই আমগুলো দিতে এসেছি আপনাকে।"

"দেখ, কি অদ্ভুত যোগাযোগ।"

শাবল ও নারকেল সরিয়ে রেখে হাসিমুখে সন্ন্যাসী চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ।

"যোগাযোগ মানে ?"

ডানা আমগুলি রেখে জিজ্ঞেস করল।

আর একটু হেসে সন্ন্যাসী বললেন, "যোগাযোগ বলছি এইজন্যে যে, ভগবানই আমার নিতান্ত দৈহিক ক্ষুধায় বিচলিত হয়ে প্রথমে নারকেল পাঠিয়ে দিলেন, তারপর যখন দেখলেন নারকেলটা আমি ছাড়াতে পারছি না তখন তোমাকে দিয়ে আম পাঠালেন—এ কথা ভাবতে পারছি না। যাঁকে নির্বিকার পরব্রহ্ম ব'লে ভাববার চেষ্টা করছি, তিনি এভাবে বিচলিত হচ্ছেন—এ কথা আমার পক্ষে ভাবা শক্ত। তাই যোগাযোগে বলছি।"

"নারকেলটা কে দিলে ?"

"কেউ দেয় নি। নদীর ধারে ব'সে ছিলাম, নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে আমার সামনে ঠেকল, ঠেকেই রইল অনেকক্ষণ, তাই তুলে নিয়ে এলাম। ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব।"

"আপনি তো রোজ ভিক্ষা করতেন। ভিক্ষেয় কিছু পান নি বুঝি ?"

"ভিক্ষা আজকাল আর করি না। আজকাল উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করেছি।"

"উঞ্ছবৃত্তিটা আবার কি ?"

"তুমি মহাভারত পড়েছ ?"

"না। কেন ?"

"মহাভারতে শান্তিপর্বে এক উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের কাহিনী আছে। পদ্মনাভ সে কাহিনী ধর্মারণ্য নামক এক ব্রাহ্মণকে বলছেন।"

"কি বলুন না শুনি।"

"এখানে বড্ড রোদ, ঘরে চল।"

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখা গেল, সেখানেও খুব ছায়া নেই। ভাঙা চালের ভিতর দিয়ে সেখানেও রোদ ঢুকেছে।

ডানা বললে, "এই ঘরে কি ক'রে যে আপনি আছেন! আনন্দবাবু আজকাল অমরেশবাবুর ম্যানেজার হয়েছেন, তাঁকে বলব আপনার ঘরটা সারিয়ে দিতে।"

"না, থাক্। কদিনই বা আর আছি।"

ভাঙা ঘরটার আসল মালিক যে তিনিই, অমরেশবাবু নন—এ কথা তিনি ডানাকে বললেন না। অমরেশবাবু নিজেও সে কথা জানতেন না বোধ হয়।

"চ'লে যাবেন না কি এখান থেকে?"

"সবাইকেই যেতে হবে, তোমাকেও। এক জায়গায় বেশীদিন থাকবার জো আছে কি! স্রোতের মুখে ভাসছি যে সব।"

"স্রোতের মুখে থেকেও তো মনে হয়, নড়ছি না।"

ডানা হেসে জবাব দিলে।

"বাইরের জগৎটা কার চোখে যে কেমন ঠেকে, কার মনে যে কি ভাবে প্রতিফলিত হয় তা বলা শক্ত। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই, সেইজন্য কারও মাপের সঙ্গে কারও মেলে না।"

"ওসব আধ্যাত্মিক কথা থাক্ এখন। আপনি আমগুলো খান আগে।"

"এনেছ যখন খাবই তো। তুমি ওই কোণের দিকটায় ব'স, যদি বসতে চাও অবশ্য। দাঁড়াও, আমগুলো নিয়ে আসি বাইরে থেকে।"

সন্ন্যাসী বেরিয়ে গেলেন আবার। ঘরের কোণে ছেঁড়া মাদুর গোটানো ছিল একটা। সেইটে পেতেই ডানা বসল। সন্ন্যাসী আমগুলি নিয়ে ফিরে এলেন। এসে বললেন, "তুমি ওই মাদুরটা পেতে বসলে! আচ্ছা থাক্, বসেছ যখন—"

"কেন, কি হয়েছে মাদুরে?"

"হবে আবার কি। নদীর চরে শ্মশানে প'ড়ে ছিল, কুড়িয়ে এনেছিলাম একদিন। ওতেই শুই রাত্তিরে। তোমার শুতে যদি বসতে আপত্তি থাকে আমার ওই আসনটায় ব'স। আমি আমগুলো কাটি ততক্ষণ।"

মাদুরের ইতিহাস শুনে ডানার উঠে পড়তেই ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সেটা অশোভন হবে ভেবে উঠল না। মনে হ'ল, সন্ন্যাসী এতে শুতে পারেন আর আমি ব'সে থাকতে পারব না ?

সন্ন্যাসী ঝুলি থেকে ছুরি বার ক'রে আমগুলি ধুয়ে কাটতে লাগলেন। ঝুলি থেকেই বার করলেন কয়েকটি শালপাতা। একটি আম কেটে শালপাতায় রেখে এগিয়ে দিলেন ডানার দিকে।

"তুমি খাও।"

"আমি এইমাত্র ভাত খেয়ে এসেছি।"

"তবু খাও। তুমি সামনে ব'সে থাকবে, আর আমি একা খাব—সেটা কি ভাল দেখায়।"

"তা হ'লে আমি উঠি। আপনি খান।"

"তুমি না খেলে আমি খাবই না। তা ছাড়া একটা আমই যথেষ্ট আমার পক্ষে। অতগুলো আম নিয়ে কি করব আমি ? তুমি একটা খাও, আমি একটা খাই। বাকিগুলো নিয়ে যাও তুমি।"

"রেখে দিন, কাল খাবেন।"

"আমি সঞ্চয় করি না। কালকের আহার কাল জুটেই যাবে কোথাও থেকে।"

ডানার মনে একটু খটকা লাগল। সন্দেহ হ'ল, লোকটা ভাব্ জাগিয়ে দেবার জন্য বাজে ভাঁওতা দিচ্ছে না তো। মুখে কিন্তু কিছু বললে না। শালপাতা থেকে আমের একটা চোকলা তুলে নিয়ে খেতে লাগল হাসিমুখে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সন্ন্যাসী নিজের এবং ডানার শালপাতাটা তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে এলেন, ডানাকে কিছুতেই ফেলতে দিলেন না। ডানা হাত মুখ ধুয়ে নিজের

আঁচলেই হাত মুখ মুছতে মুছতে বললে, "আপনি এত একগুঁয়ে কেন বলুন তো ?"

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

"কিছু বলছেন না যে ?"

"যা বলতে ইচ্ছে করছে তা বললে তুমি আমাকে হয়তো ভণ্ড মনে করবে। এ সব জিনিস বললেই খেলো শোনায়। চুপ ক'রে থাকাই ভাল।"

এবার ডানা একটু অবাক হয়ে গেল। সত্যিই তো, একটু আগে ওঁকে ভণ্ডই মনে হচ্ছিল। তার মনের কথা টের পেয়ে গেলেন নাকি! শক্তিশালী সন্ন্যাসীরা অন্তর্যামী। এ কথা সে শুনেছিল যেন কার কাছে। সরলভাবে সত্য কথাই বললে সে, "আমরা সাধারণ লোক অনেক সময় আপনাদের বুঝতে পারি না, তাই ভণ্ড ব'লে মনে হয়। ভণ্ড সাধুরও অভাব তো নেই দেশে।"

সন্ন্যাসী খুশী হলেন।

বললেন, "সত্যি কথা বললে বলতে হয়—আমিও ভণ্ড। আমার বাইরেটা দেখে বা আমার কথাবার্তা শুনে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা লোকের হওয়া স্বাভাবিক, আমি ঠিক তা নই। অথচ মুশকিল, আমি আমার বাইরের প্রকাশটা ঠিক আমার স্বরূপের অন্তরের অনুরূপ করতেও পারি না। তাই চেষ্টা করি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে—"

এই স্বীকারোক্তির পর কি বলা উচিত, ডানার মাথায় এল না। কিন্তু আনন্দে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলে, লোকটা ভণ্ড নয়।

"উঞ্ছবৃত্তির সম্বন্ধে আপনি কি একটা গল্প বলবেন বললেন। বলুন না শুনি।"

"এ সব আজগুবি গল্প কি ভাল লাগবে তোমার ? মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে গল্পটা। ধর্মারণ্য ব'লে একজন ব্রাহ্মণ, কোন্ ধর্ম

আচরণীয় তা ঠিক করতে পারছিলেন না। তাঁকে একজন পরামর্শ দিলেন—তুমি পদ্মনাভের কাছে যাও, তিনি তোমাকে নির্দেশ দেবেন। ধর্মারণ্য পদ্মনাভের বাড়ি গিয়ে শুনলেন, পদ্মনাভ সকালে উঠে সূর্যের রথচক্র বহন করতে গেছেন। রোজই যান। সূর্য অস্ত গেলে তিনি বাড়ি ফিরবেন। ধর্মারণ্য শুনে অবাক হয়ে গেলেন। নদীর ধারে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁর জন্য। নির্দিষ্ট সময়ে এলেন তিনি। ধর্মারণ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—সূর্যলোকে কি কি আশ্চর্য জিনিস দেখেছেন আপনি? পদ্মনাভ নানা রকম আশ্চর্য জিনিসের বর্ণনা ক'রে শেষে বললেন—কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম একটি জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে দেখে। তিনি সূর্যের মতই জ্যোতিষ্মান। তিনি যেন দ্বিতীয় সূর্য। দেখলাম, তিনি এসে সূর্যের মধ্যেই বিলীন হয়ে গেলেন। আমি সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলাম—ঠিক আপনার মত দীপ্তিশালী এই মহাপুরুষ কে? সূর্য বললেন—ইনি একজন উঞ্ছবৃত্তিধারী তপস্বী। এই গল্পটি শুনেই ধর্মারণ্য উঠে পড়লেন। পদ্মনাভ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছিলেন তা তো বললেন না? ধর্মারণ্য উত্তর দিলেন—আমি যা জানতে এসেছিলাম তা জেনেছি, আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে, তাই আমি চ'লে যাচ্ছি।"—এই ব'লে প্রণাম ক'রে তিনি চ'লে গেলেন।

গল্পটি ব'লে সন্ন্যাসী চুপ ক'রে রইলেন। ডানাও চুপ ক'রে রইল। তার কানে এল অনেক দূরে বউ-কথা-কও পাখীটা আর একবার ডেকে উঠল। মনে হ'ল, পাখীটাই যেন তাকে বললে—চুপ ক'রে আছ কেন? কথা কও, যা জানতে চাইছ জেনে নাও। একটু ইতস্তত ক'রে ডানা বললে, "উঞ্ছবৃত্তি কাকে বলে তা আমি জানি না। আমার মূর্খতায় আপনি হাসবেন হয়তো।"

"কুড়িয়ে খাওয়ার নাম উঞ্ছবৃত্তি। ফল ফুল শস্য কন্দ কত রকম খাদ্য ছড়িয়ে প'ড়ে থাকে চতুর্দিকে। কুড়িয়ে খেলে একজনের

অনায়াসে চ'লে যায়। বিষয়ী মানুষরাই কেবল খাদ্য সঞ্চয় ক'রে রাখে, পৃথিবীর বাকি সমস্ত প্রাণীই তো কুড়িয়ে খায়। পৃথিবীই অন্নপূর্ণা, তিনিই সকলের জন্য অন্নের ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে রাখছেন অহরহ। আমাদের ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি?"

ডানা হেসে বললে, "পশুত্বের স্তরে নেমে আসাই তা হ'লে সাধুত্বের লক্ষণ বলুন।"

"পশুরা অসহায়। উঞ্ছবৃত্তি না ক'রে ওদের উপায় নেই। মানুষ কিন্তু স্বাধীন, সে ইচ্ছে করলে রাজরাজেশ্বর হতে পারে আবার উঞ্ছবৃত্তিধারীও হতে পারে। সাধুরা রাজরাজেশ্বর হতে চান না, কারণ রাজরাজেশ্বর হ'লে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। সাধুরা চিরানন্দলোকে উত্তীর্ণ হতে চান—"

"সেই চিরানন্দলোক কোথায়? ঠিকানা পেলে যাবার চেষ্টা করতাম।"

"ঠিকানা কেউ ব'লে দিতে পারবে না। তোমাকেই খুঁজে বার করতে হবে।"

"আমি কোথায় খুঁজব?"

"ঠিকানা তোমার মনেই মধ্যেই আছে। যদি খোঁজ, পাবেই নিশ্চয়।"

"কই, কোনদিন আভাস মাত্র তো পাই নি।"

"চেষ্টা করলেই পাবে। শুধু আভাস কেন, তোমার তেমন আগ্রহ যদি থাকে সাক্ষাৎদর্শন পর্যন্ত পাবে।"

"কার সাক্ষাৎদর্শন পাব?"

"সত্যের।"

"কিন্তু আপনি চিরানন্দলোকের কথা বলছিলেন যে।"

"সত্যই চিরানন্দময়। সত্যই আনন্দ, সত্যই শিব, সত্যই সুন্দর। যে মুহূর্তে সত্যকে প্রত্যক্ষ করবে সেই মুহূর্তে এমন আনন্দ তোমার সত্তায় ওতপ্রোত হয়ে যাবে, যার শেষ নেই, যা অবর্ণনীয়।"

"কি রকম সে ব্যাপারটা—কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"সেটা কেউ কাউকে বোঝাতে পারে না। প্রভাতের সূর্যোদয় যে দেখে নি, তাকে বর্ণনা ক'রে তা বোঝানো অসম্ভব। তোমার রাত্রি শেষ হ'লে নিজেই তুমি প্রত্যক্ষ ক'রে তা বুঝতে পারবে একদিন। সে উপলব্ধি এ জন্মে হতে পারে, জন্মজন্মান্তর অপেক্ষা করতে হতে পারে তার জন্য। কারও বক্তৃতা শুনে তাড়াহুড়ো ক'রে তা হবে না। কাছে বা দূরে সে প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্য। তোমাকে যেতে হবে সেখানে।"

"কিন্তু আপনি এখনই তো বললেন, তা আমার মনের মধ্যেই আছে। তবে আবার দূরে আছে বলছেন কেন?"

"মনের মধ্যেই আছে। কিন্তু তোমার মন কি ছোট? সে যে বৃহৎ—অতি বৃহৎ। তারও সীমা নেই, শেষ নেই, তাও দূর থেকে দূরান্তে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে বিস্তৃত। তা তোমার ওই দেহটুকুর মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। তার স্বরূপ-আবিষ্কারই তো আত্ম-আবিষ্কার। সে আবিষ্কার সকলকেই করতে হবে একদিন, আর সেই আবিষ্কারের পথেই সত্য-দর্শনও হবে। তখনই বুঝতে পারবে, চিরানন্দলোক কোথায়।"

...ডানা আনত দৃষ্টিতে শুনছিল। শুনতে শুনতে তার মনে হ'ল, সে যেন খর-স্রোতে ভেসে চলেছে। ছোট একটা নৌকার উপর ব'সে আছে সে। কোথাও কূলকিনারা নেই। মনে হচ্ছে, স্রোতের ধারা দূরদিগন্তে আকাশে গিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। দিগন্ত-রেখা স'রে স'রে যাচ্ছে কেবল। সে যে কঠিন মাটির উপর সন্ন্যাসীর সামনে ব'সে আছে, তা ভুলে গেল সহসা। কয়েক মুহূর্তের জন্য অসীম যাত্রাপথের যাত্রী হয়ে পড়ল সে যেন, স্থান কাল অবলুপ্ত হয়ে গেল তার চেতনা থেকে। একটা সুনিশ্চিত অবলম্বনের আশায় আকুল হয়ে উঠল সে...ভয়-ভয় করতে লাগল...মনে হ'ল, নৌকাটা এই স্রোতের ধাক্কা কতক্ষণ সইতে পারবে—টুকরো টুকরো

হয়ে যাবে এখনই···আশ্রয় চাই, অবলম্বন চাই একটা। আশ্রয় মিলল। বাইরে একটা দোয়েল পাখী তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠে আশ্বাস দিলে। কি বললে, ভাষায় তা প্রকাশ করা যাবে না; কিন্তু মনে হ'ল, যেন আশ্রয় মিলল।

ডানা চেয়ে দেখলে, সন্ন্যাসী চোখ বুজে ব'সে আছেন।

৮

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ডানা যখন চ'লে এল, তখনও বাইরে রোদের তেজ একটুও কমে নি। তখনও 'লু' বইছে। বাইরের এই রুদ্র রূপ কিন্তু ডানার মনকে একটুও স্পর্শ করল না। সে সন্ন্যাসীর কথাই ভাবছিল কেবল। ভাবছিল, উনি নিশ্চয়ই এমন একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছেন, যার তুলনায় ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ওঁর কাছে। নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধনের ভেতর দিয়ে কি পেতে চাইছেন উনি? ভগবানকে? উঞ্ছবৃত্তিধারী না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যাবে না? প্রশ্ন করলে উত্তর দেন না, চুপ ক'রে থাকেন, মাঝে মাঝে একটু হাসেন। কখনও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন, কখনও আবার সোৎসাহে এমন সব কথা বলেন যার মানে বোঝা যায় না। অথচ ওঁকে পাগলও ঠিক বলা চলে কি। এই সব ভাবতে ভাবতে ডানা পথ চলছিল।

"মাসীমা, মাসীমা, শুনুন—"

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, চণ্ডী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। কয়েক দিন আগে রূপচাঁদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এই ছেলেটি এসেছিল—ডানার মনে পড়ল।

"কি?" ডানা দাঁড়িয়ে পড়ল।

চণ্ডী কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "চৌধুরীদের বাগানে একটা গাছে হলদে পাখীর বাসা দেখে এসেছে গণেশ।"

"ও, আচ্ছা। গণেশকে নিয়ে এস। একটা চাকরকে নিয়ে যাব আমি। বাসাটা দেখব।"

"আপনি নিজে যাবেন?"

"যাব।"

"কখন আসব?"

"তোমাদের যখন সুবিধে। এখনই যেতে পারি।"

"গণেশকে নিয়ে আসছি তা হ'লে।"—চণ্ডী একছুটে চ'লে গেল আবার।

সন্ন্যাসীর কথাটা ডানার মনের প্রত্যক্ষলোক থেকে স'রে গেল, কিন্তু একেবারে অবলুপ্ত হ'ল না। সে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এসে দেখলে, কবি ব'সে আছেন। ডানাকে দেখেই বললেন, "ছিলে কোথা? অমরেশবাবুর একখানা চিঠি এসেছে। আমি ভাবছিলাম, কাজে ইস্তফা দিয়ে দেব। কিন্তু ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখ। উনি সিমলায় গিয়ে পাখী দেখে বেড়াচ্ছেন। কাশ্মীর ঘোরবারও ইচ্ছে আছে অথচ চিঠিতে কোনও ঠিকানা নেই যে, চিঠি লিখি।"

ডানা চিঠিখানা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

"কোথা গিয়েছিলে তুমি এই দুপুর রোদে?"

"সন্ন্যাসীটিকে কয়েকটা আম দিতে গিয়েছিলাম।"

"ও! সেই সন্ন্যাসী এখনও আছেন নাকি?"

"আছেন।"

"চিঠিটা আর একবার পড় দেখি চেঁচিয়ে।"

ডানা পড়তে লাগল।—

প্রীতিভাজনেষু,

আনন্দবাবু, গতবার 'প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার'-এর (Paradise Flycatcher) যুগ্মমূর্তির একটা রঙিন ক্রিশমাস্ কার্ডে আপনি একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন আমাকে। নকল ক'রে রেখেছিলেন কি না জানি না। তাই প্রতিলিপি আপনাকে আবার পাঠালাম।

প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের দেশী নাম—দুধরাজ। কেউ কেউ শাহবুলবুল বলে। কিন্তু ওটা সম্ভবত ঠিক নয়। আপনার কবিতাটি এই—

১

সমাজ মানে আঁধার গলি
বাধার কাদা মানার পলি
পরদানসীন আনারকলি
ছদ্মবেশে তাই বুঝি।
চুলগুলো তাই বব্ করেছে
নাই বুঝি তাই বোখরাটা
পরদা-ভাঙা সুর ধরেছে—
জরদা-রঙের ওড়নাটা।

২

তেপান্তরি মাঠের শেষে
রূপান্তরি স্বপনদেশে
শঙ্খধবল পাখীর বেশে
রাজপুত্র ওই বুঝি
নূতন ধরন নূতন বরণ
নূতন রকম ছন্দ রে
সাদায় কালোয় মেলায় চরণ
কষ্টি এবং মর্মরে।

কবিতাটি টুকে রাখবেন। আমার খুব ভাল লেগেছে। মেয়ে-পাখীটির মধ্যে আপনি যে আনারকলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এতে আপনার কবি-কল্পনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা এখন শিমলায় আছি। কাশ্মীরের নানা জায়গায়

বেড়াবার ইচ্ছে আছে। আপনাকে কাশ্মীরের পাখী বিষয়ে একটি বই পাঠালাম। ছবি দেখে যদি কবিতার প্রেরণা পান খুশী হব। যদি কবিতা লেখেন আমাকে পাঠাবেন।

এখানে অনেক নূতন পাখী দেখলাম।

আমাদের শালিকের মত অনেকটা দেখতে একরকম পাখী আছে, গায়ে সাদা সাদা দাগ, নাম Striated Laughing Thrush (স্ট্রায়েটেড্ লাফিং থ্রাশ্)—এদের দেশী নাম কি জানি না। তবে থ্রাশ্ পাখীর কাস্তুরা, পাঙু, শামা এসব নাম শুনেছি, পড়েওছি। এদের হুইশলিং ডাকটা খুব অদ্ভুত—'ও সি হোয়াইটি—ও হোয়াইট্'। এ অঞ্চলে এ পাখী অনেক। হিমালয়ের বসন্ত-বউরি পাখীও দেখলাম। বেশ বড় পাখী। প্রায় পায়রার মত। সালিম আলির 'ইণ্ডিয়ান হিল বার্ডস্' বইটাতে ছবি আছে দেখবেন। পাখীটার সর্বাঙ্গে চমৎকার রঙ্—নানা রকম রঙ। তা ছাড়া গ্রেহেডেড ফ্লাইক্যাচার, ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারও (Verditer Flycatcher) অনেক দেখলাম এখানে। এই শেষোক্ত পাখীটি চমৎকার দেখতে। নীল রঙের ওপর সবুজের আভা। আপনি দেখলে নীল-পরী বা ওই ধরনের কিছু একটা নামকরণ ক'রে ফেলতেন। আসামের দিকে ফেয়ারি ব্লু বার্ড (Fairy Blue Bird) নামে নাকি এক রকম পাখী আছে, দেখি নি এখনও। এখানে হিমালয়ান হুইশলিং থ্রাশের একটানা শিস ঝরনার কলধ্বনি ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বেশ। কোকিলের কুহু কুহু ডাকেই অভ্যস্ত আমরা। এখানে কুলু উপত্যকায় কুকুর 'কুক্-উ' ডাক শুনলাম। কিন্তু সালিম আলির বইয়ে এ কথা লেখা নেই। আর একটি নতুন পাখী দেখে ভারি আনন্দ পেলাম। ব্রাউন ডিপার। ব্যাস নদীর স্রোতে খেলতে দেখলাম পাখীটিকে। এর কথা প'ড়ে দেখবেন। অদ্ভুত লাগবে। এরা খুব উঁচুতে তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলে থাকে। আর খেলা করে বরফ গলা নদী-স্রোতে। কথাটা যত সহজ শোনাল, আসলে ততটা

সহজ নয়। পাহাড়ের বরফ-গলা নদী জোড়ে নেবে আসে—ফেনার আবর্তে কলকলধ্বনিতে চতুর্দিক মাতিয়ে। এই দুর্দম দুরন্ত নদীর জলে ওই ছোট্ট বাদামী রঙের পাখীটি (আমাদের দোয়েলের চেয়ে বড় নয়) ঝাঁপাই ঝুঁড়তে ভালবাসে। জলের তলায় ডুব-সাঁতার কেটে খাদ্য অন্বেষণ করে। ব্যাপারটা কল্পনা করুন। একে যদি জল-পরী বলেন ঠিক মানাবে না। জলদস্যু বললে খানিকটা ঠিক হবে হয়তো। দু রকম ডিপার আছে, এক রকম পুরোপুরি বাদামী, আর এক রকমের বুকটা সাদা (এর ছবি সালেম আলিতে পাবেন)। ব্লু ম্যাগপাইও এ অঞ্চলে যথেষ্ট। আপনারা ওখানে যে ল্যাজঝোলা পাখী দেখেন (যার ইংরেজী নাম ট্রি পাই, বাংলায় কেউ কেউ হাঁড়িচাঁচাও বলে) তারই জ্ঞাতি এই ব্লু ম্যাগপাই। বেশ বড় পাখী। প্রায় বাইশ-তেইশ ইঞ্চি লম্বা হবে। ল্যাজটা খুবই লম্বা। নীল (প্রায় কালো) রঙের সঙ্গে সাদা ও ধূসরের অপূর্ব সমন্বয়। ঠোঁটটি লাল। হলদে ঠোঁটওলা আর একটা জাতও আছে, কিন্তু এখানে লাল-ঠোঁটই বেশী। কালিজ ফেজাণ্ট (Kaleej Pheasant), মোনাল ফেজাণ্টও (Monal Pheasant) দেখেছি। চমৎকার বর্ণসজ্জা। একটা 'স্কিন' জোগাড় করেছি। এখানে বার্কিং ডিয়ারও (Barking Deer) পাওয়া যায়। শিকার করতে দেখেছি।

আরও নানা রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সব চিঠিতে লেখা যাবে না। আপনারা আশা করি ভাল আছেন। আমি দিন সাতেক পরে এখান থেকে চ'লে যাব আরও উঁচুতে। সম্ভব হ'লে নূতন ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখব। শ্রীমতী ডানা আশা করি ভাল আছেন। আমার পাখীগুলি কেমন আছে?

আমরা ভাল আছি। আপনারা আমাদের ভালবাসা নিন। রত্না ডানাকে একটা চিঠি দেবে বলেছিল, কিন্তু আর ডাকের সময় নেই। ইতি

আপনাদের অমরেশ

চিঠি পড়া শেষ হতেই কবি বললেন, "কাণ্ড দেখ! এ এক আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। এই খুনের মোকদ্দমা এখন কতদিন চলবে তার ঠিক নেই। এখুনি আমার কাজে ইস্তফা দিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।"

ডানা একটু মৃদু হেসে বললে, "কিন্তু আমি যা শুনলাম তাতে কাজে ইস্তফা দিলেও আপনি মোকদ্দমার হাত থেকে উদ্ধার পাবেন না।"

"কেন?"

"যে মেয়েটি খুন হয়েছে, তার ঘর খানাতল্লাসি ক'রে পুলিস আপনার লেখা এক টুকরো চিঠি নাকি বার করেছে। বাকী খাজনার নোটিশের পিছনে 'পুনশ্চ' দিয়ে আপনি কিছু লিখেছিলেন নাকি?"

"লিখেছিলাম হয়তো। শুধু তার নয়, অনেকেরই নোটিশের পিছনে লিখেছি। দেখলাম, অনেক খাজনা বাকি প'ড়ে রয়েছে, যদি কিছু মাপ ক'রে দিলে আদায় হয় তাই সে কথা লিখে দিয়েছিলাম অনেক নোটিশের পেছনে। কেন, তাতে অন্যায়টা কি হয়েছে?"

"অন্যায় কিছু হয় নি। তবে পুলিস নাকি ওই সূত্র ধ'রেই আপনাকে জড়িয়েছে এতে?"

"কে বললে?"

"রূপচাঁদবাবু।"

"রূপচাঁদ কবে এসেছিল তোমার কাছে?"

"আপনি যেদিন সদর এস. ডি. ও.র কাছে যান, সেই দিনই। ও নিয়ে মিছিমিছি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আপনার কোনও ভয় নেই। আমাদের এস্টেটের ভাল উকিল আছেন, তিনি যা করবার করবেন। আমি ফিরে এসেই অমরবাবুর স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখেছি। কিন্তু তিনি সে চিঠি পাবেন না বোধ হয়।"

"কি লিখেছ?"

"এখানকার সব ঘটনা। আপনি অমরবাবুকে কিছু লেখেন নি? ওঁদের সব জানানোই তো ভাল।"

"আমি ভাবছিলাম, কাজে একেবারে ইস্তফা দিয়ে দেব। কিন্তু মন স্থির করতে পারি নি, তাই দেরি হচ্ছে। তোমার মতে তা হ'লে কাজ ছাড়া ঠিক নয়?"

ডানা হেসে বললে, "সেটা আপনি ঠিক করুন। আমি কি বলব।"

"না, তুমিই ঠিক কর। তুমি যা বলবে তাই করব। আমার নিজের ওপর আর আস্থা নেই।"

কবির কণ্ঠে যে অসহায় সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল তা শিশুর কণ্ঠেই মানায়।

ডানা হাসিমুখে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর বললে, "তাড়াতাড়ি এখন কাজ ছাড়বার দরকার কি। যেমন চলছে চলুক না। এ মোকদ্দমার কিছু হবে না।"

"বেশ।"

গণশাকে সঙ্গে ক'রে চণ্ডী এসে হাজির হ'ল। গণশা চণ্ডীরই সমবয়সী, কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। মাথার চুল দশ-আনা ছ-আনা, পরিধানে হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট, হাতে একটি গুলতি। ডানার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলে, "আপনি ডেকেছেন আমাকে?"

ডানা একবার চণ্ডীর দিকে একবার গণশার দিকে চেয়ে দেখলে।

"তুমি হলদে পাখীর বাসা কোথায় দেখেছ?"

"অমরবাবুর বাগানে।"

"আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবে?"

"পারব। অনেক উঁচুতে আছে। গাছে না উঠলে দেখা যাবে না কিন্তু।

"আমার দূরবীন আছে, আমি নীচে থেকেই দেখতে পাব।"

"বেশ, চলুন তা হ'লে।"

ডানা কবির দিকে ফিরে বললে, "আপনি বসুন। আমি হলদে পাখীর বাসাটা দেখে আসি চট ক'রে।"

কবি বললেন, "এরা কে?"

"চণ্ডী আর গণেশ। এদের হলদে পাখীর বাসার সন্ধান করতে বলেছিলাম। আপনি বসুন, আমার বেশী দেরি হবে না।"

"চল না, আমিও যাই।"

"না, এই রোদে আপনার কষ্ট হবে। আপনি বরং বসুন এখানে। এই বইগুলো ওলটান কিংবা লিখুন কিছু।"

"বেশ। বেশী দেরি ক'রো না কিন্তু।"

"না, দেরি হবে না।"

চণ্ডী ও গণশাকে নিয়ে ডানা বেরিয়ে পড়ল।

অমরবাবুর বাগানে ডানা ইতিপূর্বে আসে নি কখনও। দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে হ'ল, এ একটা আলাদা জগৎ যার পরিচয় সে জানত না। নানা রকম পাখী ডাকছে—কোকিল, বসন্ত-বউরি, চোখ-গেল, দোয়েল, ফিঙে, নীলকণ্ঠ। ভগীরথের অবিশ্রান্ত টুক্-টুক্-টুক্ও ধ্বনিত হচ্ছে কোথায় যেন। প্রজাপতি উড়ছে নানা রঙের। পতঙ্গের বিচিত্র ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। দূরে একটা তালগাছের ওপর শকুনি ব'সে আছে একটা। আর সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে আমগাছেরা—কেউ ফলভারনত, কেউ মুকুল-চুম্বিত, কেউ রিক্ত, কারও বা শাখায় কিশলয়ের শোভা। তারা নীরব ভাষায় যা বলছে তা অবর্ণনীয়। ডানা বাগানের মাঝখানে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার মনে হ'ল সন্ন্যাসীর কথা। মনে পড়ল, তিনি একদিন বলেছিলেন—পৃথিবীর এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে যিনি আছেন, তিনিই সত্য, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁকে জানলে মানুষের কোন ভয় থাকে না, তাই তিনি অভয়।

এমন ভাবে বলেছিলেন যেন তিনি চেনেন তাঁকে। অথচ স্বীকার করেন না সে কথা। বলেন—পাই নি এখনও, খুঁজছি। ডানা ভাবতে চেষ্টা করল, ওই মুকুল-ভরা আমগাছ, ওই দোয়েলের শিটকিরি, ওই পতঙ্গের কর্কশ চীৎকার আর ওই শকুনির বীভৎস চেহারা—এ সবই ব্রহ্মের প্রকাশ? এদের মধ্যে মিল কোথায়? কথাটা জিজ্ঞাসা করতে হবে একদিন।

চণ্ডী আর গণেশ এসেই চ'লে গিয়েছিল খুব বড় একটা আমগাছের তলায়। গণেশ গাছটায় উঠেছিল। ডানা দেখতে পেলে, গণেশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ডানা এগিয়ে গেল। গণেশ গাছের ওপর থেকেই ফিসফিস ক'রে বললে, "আমি যেদিকে আঙুল দেখাব, সেইদিকে দূরবীন দিয়ে দেখুন। ওই যে ডালটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে, তারই ডগায় দেখুন বাটির মত ঝুলছে, তার ওপর হলদে পাখীটা ব'সেও আছে। ওই দেখুন, উড়ে গেল।"

ডানা দূরবীন দিয়ে বাসাটা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু পাখীটাকে দেখতে পায় নি।

বললে, "দেখেছি। নেবে এস। রোজ এসে খবর নিতে হবে। ওটা হলদে পাখীরই বাসা।"

গণেশ তরতর ক'রে নেবে পড়ল।

"রোজ খবর নেওয়া তো মুশকিল। ইস্কুল পালিয়ে আসা যাবে না। মাসী জানতে পারলে খাওয়াই বন্ধ ক'রে দেবে।"

"ও। মাসীমা বুঝি খুব কড়া গার্জেন?"

"আর বলবেন না। সমস্ত সকালটি তাঁর সামনে ব'সে পড়া করতে হয়। দুপুরে ইস্কুল, সেখানে আছেন রামবাবু। আসলে তিনি রাবণবাবু। একটি ভুল হ'লে আর রক্ষে নেই। বিকেলে ফিরে জলখাবার খেয়ে মাসীমার সামনে ব'সে দুখানি বাংলা, দুখানি ইংরিজী হাতের লেখা লিখে তবে ছুটি। তখন অন্ধকার হয়ে যায়,

তখন এই বাগানে এসে কি পাখীর খবর নেওয়া যায়? রবিবারে কিংবা ছুটির দিনে নিতে পারি।"

ডানা জিজ্ঞেস করলে, "তোমার মা-বাবা কোথা?"

"তাঁরা অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। মাসীই আমাকে মানুষ করেছেন।"

"তোমার মেসোমশাই কি করেন?"

"তিনিও মারা গেছেন। অমরবাবুর এস্টেটে চাকরি করতেন আগে।"

"এখন তোমাদের চলে কি ক'রে তা হ'লে?"

"অমরবাবুর এস্টেট থেকেই মাসী মাসোহারা পান। কিছু জমিও দিয়েছেন অমরবাবু।"

"তোমার মাসীমার ছেলেপিলে কটি?"

"মাসীর কোনও ছেলে হয় নি।"

চলতে চলতে কথাবার্তা হচ্ছিল। চণ্ডী চুপ ক'রে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সে বললে, "গণশা প্রতিবার ফার্স্ট হয়।"

গণেশ ধমক দিয়ে উঠল, "চুপ কর্, ফাজিল কোথাকার।"

চণ্ডী যেন চুপসে গেল।

এই ছুটি কিশোরের সঙ্গ খুব ভাল লাগছিল ডানার। একটা গোপন মাধুর্য ধীরে ধীরে তার মনকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলছিল। তার এও মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর চারিদিকে—দূরে নিকটে এই যে এত মাধুর্য ছড়িয়ে রয়েছে তার সঙ্গে তার যেন ঘনিষ্ঠ কোন যোগ নেই। সকলের কাছেই সে যেন পর। কারোরই আপন লোক নয় সে। সবাই তাকে খাতির করে, অনেকেই তার সঙ্গে আত্মীয়ের মত কথাও কয়, খুব ঘনিষ্ঠভাবে পেতেও চায় দু-একজন (যেমন আনন্দবাবু, রূপচাঁদ); কিন্তু দূরত্বটা যেন ঘুচতে চায় না। মনে হয়, সে যেন এদের মাঝখানে আগন্তুক একজন। এসেছে, আবার

চ'লে যাবে। সন্ন্যাসীর কথা মনে হ'ল হঠাৎ। মনে হ'ল, আজই আবার দেখা করতে হবে তাঁর সঙ্গে।

চণ্ডী বললে, "আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব রোজ। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমি গাছে উঠতে পারি না ভাল।"

"তোমাদের কাউকে আসতে হবে না। আমিই আসব এখন বিকেলের দিকে।"

"আমিও থাকব আপনার সঙ্গে। আমাকে দূরবীন দিয়ে দেখিয়ে দেবেন তো?"

"দেব।"

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর চণ্ডী সসঙ্কোচে বললে, "রূপচাঁদবাবুর বাড়ি যাবেন? কাছেই খুব।"

"রূপচাঁদবাবু আপিস থেকে ফিরেছেন এখন। বকুলদি ব্যস্ত আছেন। পরে যাব কোনদিন দুপুরে।"

"কবে যাবেন?"

চণ্ডীর কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ফুটে উঠল। ডানা কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সে আবার বললে, "দুপুরে যাওয়াই ভাল। আপনি যেদিন বলবেন এসে নিয়ে যাব আপনাকে। কাল যাবেন?"

"ঠিক বলতে পারছি না।"

"কাল সকালে এসে তা হ'লে জেনে যাব। কেমন?"

"আচ্ছা।"

চণ্ডীর কেমন যেন মনে হচ্ছিল, ডানার সঙ্গে বকুলবালার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারলে তার এয়ার্-গান্ পাওয়া সহজ হয়ে যাবে।

গণেশ হঠাৎ বললে, "ফিঙে পাখীর বাসাও দেখেছি আমি একটা। অনেকটা হলদে পাখীর বাসার মত দেখতে। একবার দেখেছিলাম, একই গাছে প্রায় পাশাপাশি ফিঙে পাখী আর হলদে পাখীর বাসা ছিল—"

গণেশের কথাবার্তায় ডানা বুঝতে পেরেছিল যে, ছেলেটি সত্যিই বুদ্ধিমান। তার মনে হ'ল, অমরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে তিনি হয়তো ছেলেটিকে ভাল ক'রে মানুষ ক'রে তুলতে সাহায্য করবেন।

"পাখীর বাসা দেখবার খুব ঝোঁক বুঝি তোমার ?"

গণেশ বললে, "ঝোঁক আগে ছিল না। কিন্তু অমরেশবাবু বলেছেন যে, পাখী সম্বন্ধে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভাল প্রবন্ধ লিখবে তাকে তিনি এক শো টাকার প্রাইজ দেবেন। প্রাইজটা আমাকে নিতে হবে। অমরেশবাবু বলেছেন—বই পড়ে লিখলে চলবে না, নিজের চোখে পাখীদের লক্ষ্য ক'রে লিখতে হবে। তাই সময় পেলেই পাখী দেখে বেড়াই।"

"তুমি লক্ষ্য করেছ কিছু ?"

"কিছু কিছু করেছি।"

"খাতায় লিখে রেখেছ ?"

"রেখেছি।"

"দেখিও তো আমাকে একদিন।"

"আচ্ছা। আমি এবার যাই। আমার বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি। ওই যে আমার বাড়ি।"

গণেশ আঙুল দিয়ে ছোট একটি মাটির বাড়ি দেখিয়ে দিলে।

"ও, আচ্ছা। তোমার মাসীমার সঙ্গে এসে আলাপ করব একদিন।"

"আসবেন।"

গণেশ চ'লে গেল।

গণেশ সব দিক দিয়েই চণ্ডীর চেয়ে ভাল ছেলে। উঁচু ক্লাসে পড়ে, ফার্স্ট হয়, পাখীর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে—এ সবই সত্য; কিন্তু এ সত্য ডানার কাছে এমন ভাবে প্রকটিত হওয়াতে চণ্ডী একটু মন-মরা হয়ে পড়ল। সে স্কুল-পালানো খারাপ ছেলে।

এক বকুলবালা ছাড়া আর কেউ তাকে প্রশ্রয় দেয় না। তার আশা হয়েছিল, ডানাও হয়তো দেবে। কিন্তু গণেশের মত একটা জ্যোতিষ্ক এসে পড়াতে সে একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, "গণশা মাথায় মাথায় আমার মত দেখতে। কিন্তু ওর বয়স হয়েছে বেশ। ষোল পেরিয়ে গেছে—ওর মাসী বলছিল।"

ডানা অন্যমনস্ক হয়ে ছিল, কোনও উত্তর দিলে না। চণ্ডী আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলে ডানার দিকে, আর কিছু বলা সমীচীন মনে হ'ল না তার। নীরবেই বাকি পথটুকু হেঁটে ডানার বাসার কাছাকাছি যখন এল, তখন বললে, "মাসীমা, আমি তা হ'লে এবার যাই। কাল আসব সকালে।"

"এসো। কিছু খাবে নাকি?"

"না, আমার খিদে পায় নি।"

"তবু দুখানা বিস্কুট নিয়ে যাও।"

ডানা ঘরে ঢুকে চারখানা বিস্কুট এনে দিলে তাকে। মহানন্দে চ'লে গেল চণ্ডী। ডানা ঘরে ঢুকে দেখলে, কবি টেবিলের উপর কবিতা লিখে গেছেন একটা।

"অমরবাবুর নির্দেশ অনুসারে একটি পাখীর ছবি দেখে কবিতা লেখবার চেষ্টা করলাম। এই দাঁড়াল—

১

খাঁচার টিয়ার সাথে বুনোটার মিল নেই
এটা পড়ে, ওটা পড়ে না,
আসল পাখীর সাথে ছবিটার মিল নেই
এটা নড়ে, ওটা নড়ে না।
কার সাথে কার কত মিল বা অমিল আছে
খুঁজি খালি দিবা-রাত্তি রে

হিসাবের গোলমালে বেসামাল হয়ে পাছে
ছুঁচো ব'লে ফেলি হাতীরে
এই ভয়ে ক্রমাগত কষিতেছি অঙ্ক
ওদিকে কমল ফোটে ভেদ করি পঙ্ক।

জীবনের পথে যেতে দেখা হ'ল যার সাথে
সে যেন রাগিণী ললিতা
কিংবা পাহাড়ি-পথে ঝরনার ধারা যেন
উচ্ছলা কল-কলিতা।
তারে ল'য়ে কি করিব ভাবিতে ভাবিতে মোর
বেলা ব'য়ে গেল হায় রে
কি লেবেল গায়ে তার জানি না মানাবে ঠিক
বিবেক যে ধমকায় রে
"ঠিক ক'রে যুক্তির তুলোটাকে ধোন্ না
ওটা তোর মাসী, পিসী, প্রেয়সী না কন্যা।"

৩

কবি কর্ত্তৃ—ছত্তোর
দেব নাকো উত্তর।"

কবিতাটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ডানা। আবার পড়ল কবিতাটা। তার অজ্ঞাতসারেই সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল মুখে, অন্তর্লীন একটা গর্ব যেন অভিব্যক্ত হতে চাইল সে হাসির রেখায়। হঠাৎ কিন্তু ভয় হ'ল তার, মনে হ'ল সে যেন অতলস্পর্শ একটা গহ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। একটু বেসামাল হ'লেই প'ড়ে যাবে। আবার মন থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। মনে

হ'ল, ঘরের ভিতরেই বুঝি বিপদটা লুকিয়ে আছে। ঘর থেকে বেরিয়েই মুখে লাগল রোদের তাত, চোখে পড়ল কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় উদ্দাম বর্ণসমারোহ, কানে এল দোয়েলের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্ষণকালের জন্য। মনে হ'ল, সমস্ত প্রকৃতি যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে; যেন বলছে—পালাচ্ছ কোথায়, পালাচ্ছ কেন, চারিদিকেই যে ফাঁদ। কৃষ্ণচূড়ার ফুলে, দোয়েলের গানে, স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে যে নাটক জ'মে উঠছে তাতে যোগ না দিয়ে পালাবার প্রবৃত্তি কেন তোমার। এই স্পষ্ট অথচ অস্পষ্ট ইঙ্গিতে তার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ ব'য়ে গেল। আনন্দ হ'ল, ভয়ও হ'ল। মনে হতে লাগল, তার বুকের ভিতর কাঁটার মত কি যেন একটা বিঁধে আছে, যা আনন্দজনক অথচ কষ্টকর। আবার চলতে শুরু করল। সন্ন্যাসী কি আছেন এখন বাসায়? না থাকলেও খুঁজে বার করবে সে। একমাত্র ওই লোকটির কাছে গেলেই শান্তি পাওয়া যায়, মনে হয় অনেকক্ষণ রোদে হেঁটে যেন গাছের ছায়া পাওয়া গেল। বেশ দ্রুতপদে চলতে লাগল সে। চলতে চলতে হঠাৎ মনে হ'ল, কি বলবে তাঁকে গিয়ে। এই তো কিছুক্ষণ আগে আম দেওয়ার ছুতোয় গিয়েছিল তাঁর কাছে, এখন কোন্ ছুতোয় যাচ্ছে? যাওয়ার একটা সঙ্গত কারণ দিতে হবে তো। কি বলবে গিয়ে? নারীর সান্নিধ্য যিনি পছন্দ করেন না, তাঁর কাছে এমনভাবে যাওয়ার অর্থই বা কি। নিজের উপরই রাগ হ'ল, মনে মনে নিজেকেই সে বলতে লাগল—নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান ক'রে নাও না, পরের কাছে সাহায্য চাইতে যাচ্ছ কেন? উনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, ওঁকে বিব্রত করার মানে হয় না। তবু কিন্তু সে থামল না, চলতে লাগল। সন্ন্যাসীর বাসার কাছে এসেই চোখে পড়ল, উনি সেই শাবলটা একটা পাথরে ঘ'ষে ঘ'ষে শান দিচ্ছেন। তারার পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন, তারপর একটু মুচকি হেসে শাবলটা সরিয়ে রেখে দিলেন।

"আবার কি মনে ক'রে ?"

ডানার মুখ দিয়ে অদ্ভুত ধরনের উত্তর বেরিয়ে পড়ল একটা।

"একটা কথা জানতে এলাম। প্রকৃতি বলতে কি বোঝায় ? ইংরেজীতে যাকে নেচার বলে, তাই কি প্রকৃতি ?"

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর আবার হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

বললেন, "হঠাৎ এ আগ্রহ হ'ল কেন ?"

"আগ্রহ ঠিক নয়, কৌতূহল হয়েছে। নানা রকম পাখী গান করছে, সঙ্গিনীকে ডাকছে, ফুল ফুটছে, ভ্রমর আসছে, আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যেও অসংখ্য আলোর বুদ্বুদ। একা একা ব'সে প্রকৃতির কত লীলা দেখি রোজ। নিজের মধ্যেও প্রকৃতির নিগূঢ় ষড়যন্ত্র টের পাই। তাই মনে হ'ল, প্রকৃতির রহস্যটা কি জেনে আসি একটু আপনার কাছে।"

সন্ন্যাসী বললেন, "তুমি যা বর্ণনা করলে তা প্রকৃতির প্রকাশ। প্রকৃতি অব্যক্ত নিষ্ক্রিয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যভাব এই সাম্যভাব বিচলিত হ'লেই সক্রিয় হয়, তখনই সৃষ্টি-লীল আমাদের ইন্দ্রিয়লোকে ফুটে ওঠে। অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ও আমাদের নেই।"

"তা হ'লে তার অস্তিত্ব আছে তা বোঝেন কি ক'রে ?"

"অনুমান ক'রে, ধ্যান ক'রে।"

ডানা চুপ ক'রে রইল। সন্ন্যাসী একটু হেসে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ বেরুলেন না। ডানা ব'সেই রইল চুপ ক'রে। সন্ন্যাসীর কাছে এসে সে যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সাংখ্যের প্রকৃতির স্বরূপ জানতে সে সন্ন্যাসীর কাছে আসে নি সে এসেছিল তার মনের মধ্যে যে অস্বস্তি জাগছে, বৈশাখের উন্মত্ত প্রকৃতি যে অস্বস্তিকে নানাভাবে বাড়িয়ে তুলছে, সেই অস্বস্তির

প্রতিকার-কামনায়। সে ভেবেছিল, সন্ন্যাসী তার মনের কথা বুঝবেন, কিন্তু তিনি একেবারে দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করলেন। আনন্দবাবু কবিতার ইঙ্গিতে ক্রমাগত যা বলতে চাইছেন তা ভাল লাগছে, কিন্তু তার তাৎপর্য কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না। আনন্দবাবু নিজেও সেটা বলতে চাইছেন না। একটু আগে যে কবিতাটা লিখেছেন তাতে স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন—"কবি বলে ছুত্তোর, দেব নাকো উত্তর।" ওঁর মনের ভিতরেও সে কথাটা স্পষ্ট নেই কি ? কে জানে।

সন্ন্যাসী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হঠাৎ। হেসে বললেন, "দেখ, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অশান্তি আছে। ওতে ভয় পেয়ো না। ওটা জীবনের লক্ষণ। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকলেই হ'ল, বাকি সব তুচ্ছ। কিসের অভাবে তোমার জীবন অশান্তিময় হয়েছে, তা জানলে চেষ্টা করতাম সে অভাব পুরণ করবার। বেশ তো আছ, কিসের অভাব তোমার ?"

ডানা হেসে বললে, "আপনার কাছে বলতে লজ্জা করছে।"

"কিসের লজ্জা ?"

"আমার অভাব টাকার। যদি অনেক টাকা পেতাম তা হ'লে স্বাধীনভাবে যেখানে খুশী থাকতে পারতাম। টাকা নেই, তাই চাকরির গ্লানি বহন করতে হচ্ছে—আপনার মত লোকের কাছে এই তুচ্ছ কথাটা বলা লজ্জাকর বইকি।"

সন্ন্যাসী চুপ ক'রে রইলেন ক্ষণকাল। একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর হেসে বললেন, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ভাবনাই সিদ্ধির রূপ ধ'রে আসে। হয়তো তোমার কামনা নিষ্ফল হবে না। আমি এখন একটু বেরুচ্ছি। তুমি বসবে নাকি ?"

"না, চলুন, আমিও যাই। কোন্ দিকে যাবেন আপনি ?"

"চরের দিকে। স্নান করব।"

"আপনার সেই পাখীর দল আছে এখনও ?"

"আছে। তবে অনেক পাখী চ'লে গেছে।"

"আমারও যেতে ইচ্ছে করছে আপনার সঙ্গে। কিন্তু যাবার উপায় নেই। অমরবাবুর পাখীগুলোর খবর নিতে হবে।"

"অমরবাবুর পাখী পোষার শখ আছে নাকি ?"

"আছে। উনি পাখী পুষেছেন পক্ষীবিজ্ঞান চর্চা করবার জন্যে।"

"ও।"

সন্ন্যাসী চরের দিকে চ'লে গেলেন।

ডানা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তাঁর দিকে চেয়ে, তারপর চ'লে গেল নিজের বাড়ির দিকে। বাড়িতে ফিরে দেখলে, আনন্দবাবু ব'সে আছেন।

"কোথা গিয়েছিলে তুমি ?"

"একটু বেরিয়েছিলাম।"

সত্য কথাটা ডানা চেপে গেল। আনন্দবাবুও আর সে বিষয়ে প্রশ্ন করলেন না, যে সংবাদটি এনেছিলেন তারই উত্তেজনায় বিহ্বল হয়ে ছিলেন তিনি।

"জান, নিখিল এসেছিল একটু আগে ?"

"নিখিল কে ?"

"ম্যাজিস্ট্রেট এখানকার। সত্যিই সে আমার ছাত্র। চমৎকার ছেলে—"

"মোকদ্দমার কথা কি বললেন ?"

বললে, "ও মোকদ্দমা ডিসমিস হয়ে যাবে। কেসটা যে সাজানো তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ও। কিন্তু আমি আর এক মুশকিলে পড়েছি যে।"

"আবার কি ?"

"অমরবা আমাকে কলকাতা যাবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছেন।"

"তিনি কাশ্মীর যাবেন লিখেছিলেন যে ?"

"কি জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু আপনি এখন যাবেন কি ক'রে? আপনি জামিনে খালাস আছেন, মোকদ্দমার দিন আপনাকে তো হাজির থাকতে হবে।"

"দেখি, নিখিলের সঙ্গে দেখা করি। নিখিল চ'লে যাবার ঠিক পরেই টেলিগ্রামটা এল। নিখিলের সঙ্গে দেখা করি, কি বল?"

"তাই করুন। তা হ'লে তো এখনই বেরুতে হয় আপনাকে। আর এক ঘণ্টা পরেই ট্রেন।"

"তাই নাকি? আমি উঠি তা হ'লে।"

আনন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে চ'লে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলেন আবার।

"আমি তোমাকে আর একটা কথা বলতে এসেছিলাম, বলতে ভুলে গেলাম। আমি কবিতায় আবোল-তাবোল অনেক কিছু লিখে ফেলি—না লিখে পারি না, তাতে তুমি রাগ ক'রো না বা ভয় পেয়ো না। আমার কবি-সত্তা কল্পনালোকে তোমাকে নিয়ে যে উৎসব করে, আমার সামাজিক সত্তার সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। এ কথা আগেও তোমাকে বলেছি বোধ হয়। আবার বলছি, কারণ আমার মনে হচ্ছে, আমার কবিতা তোমার মনে ঠিক—মানে—"

ইতস্তত ক'রে কবি থেমে গেলেন।

ডানা স্মিতমুখে আনত-নয়নে দাঁড়িয়ে ছিল। কবি থামতেই চোখ তুলে বললে, "আপনার কবিতা খুব ভাল লাগে আমার। আর সেই জন্যেই বোধ হয় ভয় করে।"

"জ্যোৎস্না, সন্ধ্যার মেঘ, ফুল, পাখী—এদের দেখেও ভয় করে নাকি?"

"তার মানে?"

"কথাটা ভাব। পরে আলোচনা হবে। চললুম।"

কবি চ'লে গেলেন।

ডানা স্টোভ জেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। পাখীগুলোর

তদারক করতে এখনি তাকে বেরুতে হবে। জ্বলন্ত স্টোভের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে। আনন্দবাবু যা ব'লে গেলেন তার অর্থ কি। জ্যোৎস্না, ফুল, পাখী—এরাও তো এক-একটা সৃষ্টি, কবিতাও সৃষ্টি, আনন্দবাবুর কবিতা প'ড়ে কিন্তু ভয় হয়। যেমন ব্যাঘ্র নামক পশুটি সৃষ্টি হিসেবে চমৎকার হ'লেও তাকে দেখলে ভয় হয়। আনন্দবাবুর কবিতার সঙ্গে বাঘের উপমা দিয়ে নিজেই মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল সে। কিন্তু এ কথাও সে অস্বীকার করতে পারলে না যে, আনন্দবাবুর কবিতার মধ্যে এমন একটা কি যেন আছে যা ভীতিজনক, অস্বস্তিকর। ভাবতে ভাবতে নূতন কথা মনে হ'ল একটা। মনে হ'ল, তার এই চিন্তার মধ্যে অহঙ্কার কি প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই? সে নিজেকে এমন মোহিনী রূপসী ব'লে কেন ভাবছে? আনন্দবাবুর মত বিজ্ঞ লোক তাকে দেখে বেসামাল হয়ে পড়বেন—এই কুৎসিত চিন্তা তার মনে আসছেই বা কেন? আনন্দবাবু কবিতায় যা-ই লিখুন, তাঁর ব্যবহারে কোন অশোভনতা তো সে লক্ষ্য করে নি। কবিতায় কবিরা একটু বাড়াবাড়ি ক'রেই থাকেন। সে বাড়াবাড়িকে সত্য মনে করা হাস্যকর নয় কি? সে কি কর্পূরলতা, না, মন্দারমালা। উচ্ছলা কলকলিতা পাহাড়ী ঝরনার সঙ্গেই বা তার মিল কোথায়। এই অসম্ভব উদ্ভট ধারণা কেন তার মনে আসছে। কেন সে ওই কবিতাগুলোকে নিজের সঙ্গে জড়াচ্ছে। কেন? হঠাৎ রূপচাঁদবাবুর কথা মনে পড়ল। ওই লোকটির আচরণে কিন্তু প্রচ্ছন্ন কিছু নেই। ধূর্ত শিকারী। একটা কথা মনে হওয়াতে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। রূপচাঁদবাবুর অভদ্রতাকে সে যদিও প্রশ্রয় দেয় নি, কিন্তু তার বর্বরতাটা মনের নিভৃতে উপভোগ করেছে সে। আশ্চর্য।

চায়ের জলটা ফুটে উঠল।

৯

ট্রেন খুব ভোরে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল। তখনও সূর্য ওঠে নি। কবি প্রত্যাশা করেন নি যে, এত ভোরে অমরবাবু স্টেশনে আসবেন তাঁকে নিতে। তিনি গ্র্যাণ্ড হোটেলের যে ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেই ঠিকানায় গিয়ে তাঁকে ধরতে হবে—এই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন কবি। ধরতে যদি না পারেন, তা হ'লে কি অকূল পাথারে যে পড়বেন তা ভেবেও চিন্তিত ছিলেন একটু। যে লোক সিমলা থেকে হঠাৎ কলকাতা চ'লে আসতে পারে, তার পক্ষে কলকাতার হোটেল ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যাওয়া অসম্ভব নয়। অমরবাবুকে সশরীরে স্টেশনে দেখে আনন্দবাবু শুধু যে আনন্দিত হলেন তা নয়, একটু অবাকও হলেন।

"জিনিসপত্র খুব বেশী আছে নাকি সঙ্গে?"

"না, সুটকেস আর বিছানাটা।"

"কবিতার খাতাখানা এনেছেন তো?"

"এনেছি।"

"এইখানেই হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে তা হ'লে সোজা এখান থেকেই যাওয়া যাক।"

"কোথা যেতে হবে?"

"সল্ট লেক।"

কবির চোখে বিস্মিত দৃষ্টি দেখে হেসে ফেললেন অমরবাবু।

"আপনার খুব আশ্চর্য লাগছে, না?"

"সিমলা থেকে হঠাৎ এখানে এলেন, আমাকে ডেকে পাঠালেন, তার পর দুজনে মিলে সল্ট লেকে যাচ্ছি, একটু দুর্বোধ্য বইকি!"

অমরবাবু ব্যাপারটা যেন উপভোগ করলেন মনে মনে, ছোট ছেলেরা নিজেদের জানা হেঁয়ালী অপরকে সমাধান করতে ব'লে

যেমন মজা উপভোগ করে অনেকটা তেমনি। কবির দিকে আড়-চোখে চেয়ে বললেন, "হোরেস অ্যালেকজাণ্ডারের নাম শুনেছেন?"

"না। কে তিনি?"

"একজন বড় পক্ষীবিজ্ঞানী। খঞ্জন-স্পেশালিস্ট। তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলে। হঠাৎ সিমলায় চিঠি পেলাম, তিনি কলকাতায় আসছেন দু দিনের জন্যে। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াটা সৌভাগ্য। তাই কালবিলম্ব না ক'রে চ'লে এলাম। কাল আর পরশু—দু দিন তাঁর সঙ্গে সল্ট লেকে ঘুরেছি, নানারকম পাখী দেখলাম, অনেক পাখী এর আগে দেখিই নি। অ্যালেকজাণ্ডার কাল চ'লে গেছেন। আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম দুটো কারণে। প্রথম, আপনাকেও পাখীগুলো দেখাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। দ্বিতীয়, আপনার আর ডানার চিঠিতে খবর পেয়েছিলাম যে, আপনি কোন এক খুনের মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন। আমার ভয় ছিল, আপনি হয়তো আসতেই পারবেন না। আপনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার আর ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ঘামাবার মত যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা রত্না ঘামাবে। সে এতক্ষণ ডানার কাছে পৌঁছে গেছে সম্ভবত। এবার আশা করি আর কিছু দুর্বোধ্য ঠেকছে না? চলুন, সোজা বেরিয়ে পড়া যাক এখান থেকে। আগে কিছু খেয়ে নিন।"

কবি প্রশ্ন করিলেন, "সল্ট লেকটা কোথা?"

"বেঙ্গল কেমিক্যালের পিছনে। সল্ট লেকের বাংলা নাম হচ্ছে ভাওড়। প্রচুর পাখী আছে মশাই, স্বদেশী বিদেশী দুইই। আপনি গেছেন কখনও?"

"না। কখনও দরকার পড়ে নি তো।"

"চমৎকার জায়গা। জলের মধ্যে আল-বাঁধা জমি, তা ছাড়া জলা, ডোবা, ঝিল, হ্রদ সব একসঙ্গে পাবেন। আবার ওর ভিতর

বাবলা গাছও আছে, ছোট বড় ঝোপঝাড়ও আছে, নলবন, নানাজাতের শর, হোগলা, শ্যাওলা, দেশী পানা, কচুরি পানা—হরেক রকম জিনিস দেখবেন সেখানে। আজ বিশেষ ক'রে গ্রেট মার্শ ওয়ার্বলার (Great Marsh Warbler) দেখাতে চাই আপনাকে। দেখতে বোধ হয় পাবেন না, ডাক শুনেই ফিরে আসতে হবে। নলবনের ভিতরে ঢুকে থাকে ওরা। চলুন, যাওয়া যাক।"

স্টেশনের হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে সল্ট লেকের উদ্দেশে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। খাল পেরিয়ে তবে সল্ট লেকে পৌঁছতে হবে। পারাপার করবার জন্য খেয়া আছে। কবি আর বিজ্ঞানী খেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

"দেখুন, দেখুন—"

"কই, কি ?"

"উড়ে গেল। এক ঝাঁক শালিক।"

দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসলেন।

কবি বললেন, "শালিক অনেক দেখেছি।"

"কিন্তু এমন দল বেঁধে এত উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছেন ? সাধারণত সকালবেলায় ওরা এমন ক'রে উড়ে বেড়ায়। এক্সারসাইজ করে সম্ভবত। আগেও লক্ষ্য করেছি।"

কবি চুপ ক'রে রইলেন।

অমরবাবু বলতে লাগলেন, "পাখীদের নানাভাবে লক্ষ্য করলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। ধরুন, এই শালিকরাই সমস্ত দিন কখন কি ভাবে চলাফেরা করে তার একটা রেকর্ড যদি রাখা যায়, অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে। সেদিন আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল। একটা বাগানে রোজ বেতাম। খুবই ভোরে

গেছি তখনই দেখেছি, 'ফটিক জল' পাখীরা এ-গাছ থেকে ও-গাছে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। একদিন যেতে একটু বেলা হ'ল, দেখি, ফটিক-জল একটিও নেই, ঘুঘুর দল এসেছে। মনে হ'ল, প্রত্যেক পাখীর বোধ হয় খেলা করবার নির্দিষ্ট সময় আছে এক-একটা। কিছুদিন ধ'রে লক্ষ্য না করলে অবশ্য ঠিক বলা যায় না। আপনাকে আইডিয়াটা দিয়ে দিলুম, ফিরে গিয়ে লক্ষ্য করবেন তো যদি সময় পান। জমিদারির ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিব্রত হতে হচ্ছে না তো? ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবেন না। আমলা-গোমস্তারা যা পারে করুক, আপনি শুধু একটু নজর রাখবেন। বাস্‌। বেশী গোলমাল দেখেন তো রত্নাকে খবর দিয়ে দেবেন। ও এসব ব্যাপার আমাদের চেয়ে ভাল বোঝে। চলুন এবার।"

খেয়াটা এসে ভিড়ল। যাত্রীর দল নেবে গেল। ঝুড়ি-মাথায় স্ত্রী পুরুষ অনেকগুলি। গ্রাম থেকে তরি-তরকারি মাছ নিয়ে যাচ্ছে শহরের বাজারে। একজনের সঙ্গে একটি ছাগ-শিশুও ছিল। কবি আর বিজ্ঞানীর সঙ্গে একজন মৎস্য-শিকারীও উঠলেন। ওপারে পৌঁছে বেশ কিছুদূর হাঁটতে হ'ল আল ধ'রে।

"দেখুন, দেখুন, কি বলুন তো ওগুলো? বাইনকুলারটা নিয়ে ভাল ক'রে দেখুন।"

বাইনকুলারটা নিয়ে কবি দেখতে লাগলেন।

"বক মনে হচ্ছে।"

"গ্রে হেরন (Grey Heron)। ওরা খেয়ে ফিরছে সম্ভবত। ওরা খুব ভোরে একবার খায়, আর একবার খায় সন্ধ্যার দিকে। সমস্ত দিন কোনও গাছে নিঝ্‌ঝুম হয়ে ব'সে থাকে।"

কবি যতক্ষণ দেখা গেল হেরনগুলিকে দেখলেন।

তারপর বললেন, "এখানে কোথাও যদি বসবার জায়গা পাওয়া যেত একটু, বেশ হ'ত।"

"হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না কি? অনেক হাঁটতে হবে এখন।"

"হাঁটতে পারব, বসবার জায়গা খুঁজছি কবিতা লিখব ব'লে।"

"শুভ। আছে জায়গা,—ওই দেখুন।"

দূরে একটি কুটির ছিল। অমরবাবু সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন।

"ও তো বেশ ভাল জায়গা। চেনা-শোনা আছে না কি আপনার সঙ্গে?"

"না, তবে চেনা-শোনা ক'রে দিতে কতক্ষণ! এটা ভারতবর্ষ— সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন মশাই? তা ছাড়া কবি-গুরুর সেই কবিতাটাই বা ভুলছেন কেন—কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই? আসুন।"

অমরবাবু হনহন ক'রে, প্রায় ছুটে, চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে ঘুরে বললেন, "বাইনকুটা গলায় ঝুলিয়ে রাখুন।"

কবির মনে যে কবিতার ভাব জেগেছিল, সেইটেতে তা দিতে দিতে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলেন তিনি। আলের উপর দিয়ে বেশী জোরে চলা সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। কুটিরের কাছাকাছি এসে কবি দেখলেন, কুটিরের মালিক অমরবাবুর সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ গদগদ হয়ে পড়েছেন। মনে হ'ল, লোকটি দুগ্ধ-ব্যবসায়ী। তাঁর কাছে সের পাঁচেক দুধ ছিল, অমরবাবু সমস্তটা কিনে নিয়েছেন। কবি শুনলেন, অমরবাবু বলছেন—"দুধটা একটু গরম ক'রে দিতে হবে কিন্তু। আর গোটা দুই গেলাস, আর একটু জল চাই।"

ঝোলা-গোঁফ দুগ্ধ-ব্যবসায়ী সবিনয়ে বললেন, "সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে বাবু। আপনারা ততক্ষণ পাখী দেখুন, আমি পীতুকে ডেকে আনি। সে এসে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে আপনাদের। এক শিকারী বাবু বন্দুক নিয়ে এসেছেন, তার পিছু পিছু ঘুরছে শালা।"

"পীতু তোমার চাকর বুঝি ?"

"আমার ছেলে বাবু। চাকর রাখবার মত পয়সা আছে কি বাবু ? নিজেদের কাজ নিজেরাই ক'রে নিই। দুধ কেনা-বেচা ক'রে কায়ক্লেশে সংসার চালাই কোন রকমে। আপনারা এই চৌকিটাতে বসুন। আমি যাব আর আসব।"

"তোমার নামটা জিজ্ঞেস করা হয় নি।"

অমরবাবু হেসে প্রশ্ন করলেন।

"আমার নাম নীলাম্বর। 'নীলু' ব'লেই ডাকবেন আমাকে। আমার ছেলের নাম পীতাম্বর, ডাকনাম পীতু।"

"ও—"

"পীতুকে ডেকে নিয়ে আসছি এক্ষুনি। আপনারা বসুন।"

নীলাম্বর চ'লে যেতেই অমরবাবুর চোখে শিশুসুলভ দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটে উঠল।

"আপনি ওই চৌকিটাতে ব'সে ততক্ষণ যা মনে এসেছে লিখে ফেলুন। আমি একটু এগিয়ে দেখি, ওই যে ওই গাছের ডগায় ব'সে আছে ওটা কি ? ঠিক চিল ব'লে মনে হচ্ছে না। আর একটু এগিয়ে না গেলে ফোকাস করতে পারব না। আপনি কি বিষয়ে লিখবেন এখন ? খুব গ্র্যাণ্ড ভাব এসে গেছে নিশ্চয় ?"

"ওই বকগুলোর কথা শুনে দু-চার লাইন মনে এসেছে, তাই লিখে রাখব।"

"হেরনদের সম্বন্ধে লিখবেন ? তা হ'লে হেরনদের কোর্টশিপের ব্যাপারটা শুনে নিন। আর্মস্ট্রং সাহেবের লেখা একটা বইয়ে পড়েছিলাম। হেরন-যুবা প্রিয়ার সন্ধান করবার আগে ঠিক করে, কোথায় বাসা বাঁধবে। সেটা ঠিক হয়ে গেলে হেরন-যুবা সেই নির্বাচিত বৃক্ষের একটি শাখায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ ক'রে শব্দ করে 'হু' (hoo), তারপর মাথাটি নাবিয়ে পায়ের দিকে চেয়ে শব্দ করে 'উ উ উ উ'। যতক্ষণ না প্রিয়ার দেখা পায়, ততক্ষণ

ক্রমাগত এই রকম শব্দ ক'রে যায় সে।...আমি চললুম, এক্ষুনি আসছি।"

কবি প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, হেরনের বাংলা কি হবে? বক?"

"হেরন বড় বক। কঙ্ক বা বলাকা বলতে পারেন। আমি চললুম। দেখে আসি, ওটা কি। আপনি চটপট লিখে ফেলুন, অনেক ঘুরতে হবে।"

অমরবাবু বাইনকুলারটা গলায় ঝুলিয়ে হনহন ক'রে এগিয়ে গেলেন।

কবি চারিদিকে চেয়ে পরিস্থিতিটা প্রণিধান করলেন। কবিতা লেখবার উপযুক্ত স্থান সন্দেহ নেই। কিন্তু চৌকিতে ব'সে হাঁটুর উপর খাতা রেখে লেখা যাবে না। পাশেই একটা চট প'ড়ে ছিল। সেইটে মাটিতে পেতে বসলেন, আর চৌকিটাকে করলেন টেবিল। ব্যবস্থাটা বেশ মনোমত হ'ল। বাগিয়ে বসলেন। পকেট থেকে খাতা আর কলম বেরুল। মুখ ছুঁচলো ক'রে হাঁটু দুলিয়ে ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর লিখতে শুরু করলেন। অনেক কাটাকুটির পর যা দাঁড়াল, তা এই—

বিজ্ঞানী কষে শুধু তথ্যের অঙ্ক
কবি বলে—পাখী নয়, মহর্ষি কঙ্ক।
কবি খোঁজে কবিতা, বিজ্ঞানী তথ্য,
কঙ্কই জানে শুধু কোথা সার সত্য।
সকালেই খাওয়া সেরে চ'লে যায় বাসাতে
সন্ধ্যায় খাবে ব'লে ব'সে থাকে আশাতে।
চিত্তে তোলে না সুর কবিতার মাধুরী
তার ধ্যান চুনোপুঁটি মৎস্য বা দাঁড়ুরী।
'হু' 'উ' ডাকে উড়ে আসে প্রিয়া নভোচারিণী
সু-অণ্ড-প্রসবিনী অতি মনোহারিণী।

বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বেড়ে যায় বংশ
ছানা নয়, আহা, যেন কুল-অবতংস।
এই সত্যের নীড়ে বাস করে কঙ্ক
এই কাব্যের তালে বাজে তার ডঙ্ক।
বাজিতেছে চিরকাল যুগে ও যুগান্তে
হারাইয়া গেল কত ডারবিন্ দান্তে।

কবিতাটা লিখে কবি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর খাতার পাতা ওলটালেন। উলটেই আর একটা কবিতা চোখে পড়ল। নিজেরই ছেলের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হ'ল যেন। অদ্ভুত লাগল। ভাবটাও অদ্ভুত।

শালিক ছাতারে ঘুঘু ফিঙে বক মুরগী
চড়াই শকুনি আর কাকেরা
বিহঙ্গ-সমাজের এই নব-শাকেরা,
এবার তুলিবে নাকি বিদ্রোহ ঝাণ্ডা
অভিজাত পাখীদের ক'রে দেবে ঠাণ্ডা।
ময়ূর, ফটিক-জল, দোয়েল হলদে পাখী
আমেরিকা যাবে ব'লে খুঁজিতেছে 'ভিসা' নাকি।
হংসরাজ-দম্পতি
কম্পিত চিত্ত অতি,
নীলকণ্ঠের নীল হইতেছে গাঢ়তর
তিতির বটের হুপো ভয়ে কাঁপে থরথর,
খঞ্জন, টিট্টিভ
ভয়ে বুক ঢিপঢিপ।
থিরখিরা ছোটপাখী
কাঁপিতেছে থাকি থাকি।

কোকিলের কুহু কুহু
মনে হয় উহু উহু
বেদনা আকাশে ফেরে কাঁপিয়া,
চোখ গেল চোখ গেল—ফুকারিছে পাপিয়া।
টুনটুনি বুলবুল
ঘামিতেছে কুলকুল।
শুধু কাঠঠোক্‌রার শোনা যায় ঝঙ্কার—
বলে যেন—চোপ চোপ চোপ রও,
চুপি চুপি ডাকে—বউ কথা কও।
দরজি বাবুই আর মুনিয়া
মুচকি মুচকি হাসে শুনিয়া।

কবিতাটা নিজেরই ভাল লাগে নি ব'লে ডানাকে শোনানো হয় নি আর। আর একটা অদ্ভুত কবিতাও চোখে পড়ল। লাল কালিতে লেখা। পড়তে পড়তে মুচকি হাসি ফুটল—কেন লিখেছিলেন এসব। রাবিশ যত।

বল্ দেখি ভাই—ডাব,
বলত যদি সে,
অমনি হেসে জবাব দিতাম
তোমার সঙ্গে ভাব।
ছেলেবেলায় সহজ ছিল সব
এখন সবাই 'স্নব'।
শিকড়সুদ্ধ নারকেল গাছটাও এখন যদি আসে
ফিরবে হতাশ্বাসে,
জমবে না ঘটকালি
ঘটবে না তা 'ডাব' বললেই ঘটত যাহা খালি।

কাটাকুটির ভিতর আর একটা কবিতা চোখে প'ড়েও মজা লাগল খুব।

কবি। [উচ্চকণ্ঠে ভৃত্যের প্রতি] ওরে ভুতো—
পাখীগুলো তাড়া তাড়া, মার্ জুতো।
[চড়ুই পাখীর প্রতি, ভদ্রতা সহকারে]
চড়ুই পাখী, চড়ুই পাখী,
তোমার না হয় নাই শরম।
কিন্তু তোমার বোঝা উচিত
আমি একটা ভদ্রলোক
আমার দুটো আছেও চোখ
আমার সামনে না-ই করলে
এমনধারা কাণ্ড চরম।
[ঈষৎ ভাবিয়া এবং ইতস্তত করিয়া]
একটা কথা হচ্ছে মনে, বলছি সেটা,
আমার ঘরের আল্‌সে জুড়ে করছ যেটা
সেটাই হবে শিল্প-সৃষ্টি
সংস্কৃতি কিংবা কৃষ্টি
সভ্য ভাষা যদি একটা শিখতে পার
করছ যা তা গল্পে যদি লিখতে পার
করতে পার বাজার গরম
পটাং ক'রে পক্ষী-কবি হতেও পার
কেউ তোমাকে বলবে—নরেন্দ্র,
কেউ বা হয়তো বলবে—যম্।

কবি তন্ময় হয়ে পাতার পর পাতা উলটে চলেছিলেন। অমরবাবু যে 'এক্ষুনি আসছি' ব'লে অনেকক্ষণ দেরি করছেন—এ

খেয়ালই ছিল না তাঁর। তিনি পুরনো কবিতাগুলোই আবার কাটাকুটি করছিলেন। হঠাৎ অমরবাবু এসে হাজির হলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত, ঘর্মাক্ত কলেবর, সঙ্গে চার-পাঁচটা ছোঁড়া।

"লেখা হ'ল আপনার?"

"হয়েছে।"

"উঠুন তা হ'লে। অনেক জিনিস দেখাব আপনাকে আজ। গাছের ওপর ওটা কি ব'সে আছে জানেন? চিল নয়, কোড়াল—হোয়াইট টেল্‌ড্ ফিশিং ঈগল্ (White Tailed Fishing Eagle), সংস্কৃত ভাষায় বললে বলতে হয়—মৎস্য-গরুড়। ভাণ্ডড়ের জলচারী পাখীদের রাজা। প্রায় তেত্রিশ ইঞ্চি লম্বা। চলুন, আর দেরি করবেন না।"

কবি প্রশ্ন করলেন, "এ ছেলেগুলি কে?"

"এদের ডেকে নিয়ে এলাম ওদিকের গাঁ থেকে। দুধ খাওয়াব এদের। পাঁচ সের দুধ না হ'লে হবে কি? এদের সাহায্যও দরকার আমাদের। নলবনের ভেতর যে সব ওয়ার্বলার ঢুকে আছে তাদের তাড়া না দিলে বেরুবে না, তাড়া দিলেও বেরুবে কিনা সন্দেহ। এরা ঢিল মারবে। চলুন, বেরুনো যাক। চড়চড় ক'রে রোদ উঠছে।"

বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। পিছনে পিছনে ছোঁড়ার দল চলল। আলের ওপর দিয়ে কোনক্রমে হাঁটতে হাঁটতে অমরবাবু বললেন, "কি কি দেখাব আপনাকে তার মোটামুটি একটা ফর্দ ক'রে ফেলেছি—এই দেখুন। মানে, এই পাখীগুলো এখনও এখানে আছে। খঞ্জন কয়েক রকমই আছে। বিদেশ থেকে এ দেশে যারা শীতকালে এসেছিল, তাদের এবার নিজের দেশে ফেরবার সময় হয়েছে। সেখানে গিয়ে বাসা বেঁধে এবার ওরা ডিম পাড়বে। সেই জন্যে ওরা সবাই এবার ব্রিডিং প্লুমেজে (Breeding Plumage) অর্থাৎ বর-বেশে সেজেছে। এদের মধ্যে এক রকম হচ্ছে হলদে খঞ্জন।

এদের মধ্যে আবার তিনটি উপজাতি আছে। নীল মাথা, ফিকে ধূসর মাথা, গাঢ় ধূসর মাথা। এ ছাড়া আর এক রকম হলদে খঞ্জন আছে যাদের মাথাটাও হলদে। এরা ভিন্ন জাত। পঞ্চম হচ্ছে, গ্রে ওয়াগটেল (Grey Wagtail)—এও ভিন্ন জাত। সব দেখতে পাবেন আজ। খঞ্জন ছাড়া আর এক রকম নূতন পাখী দেখাব, যা আপনি দেখেন নি কখনও—ওয়ার্বলার (Warbler)। এদের বাংলা নাম দিয়েছি কলকলানি। ক্রমাগত কলকল করে। পাঁচ রকম আছে দেখলাম—স্ট্রায়েটেড মার্শ ওয়ার্বলার (Striated Marsh Warbler), গ্রেট্ রীড্ ওয়ার্বলার (Great Reed Warbler), জাংগ্‌ল্ রেন্ ওয়ার্বলার (Jungle Wren Warbler), ইণ্ডিয়ান রেন ওয়ার্বলার (Indian Wren Warbler), প্যাডি ফিল্‌ড্ ওয়ার্বলার (Paddy field Warbler)—"

অমরবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন।

"আমার নোট-বুকের কয়েকটা পাতা খুলে প'ড়ে গেছে দেখছি।"

"এই যে আমি কুড়িয়ে রেখেছি।"—একটি ছেলে খান কয়েক পাতা ছেঁড়া কামিজের পকেট থেকে বার করলে।

"বাঃ, লক্ষ্মী ছেলে। চল, খাওয়াব তোমাদের।"

অমরবাবু তার হাত থেকে পাতাগুলি নিয়ে আবার চলতে শুরু করলেন। চলতে চলতে বলতে লাগলেন, "এ সব ছাড়া আর যা আছে তা আপনি দেখেছেন সম্ভবত। টিট্টিভ, গাংচিল, বাজ, জলপিপি, ফেজাণ্ট টেল্‌ড্ জ্যাকানা আছে দেখলাম একটা, ওর দিশী নাম পিউয়া। পিউয়া এখন বর-বেশে সেজেছে, একটা ভূতীও দেখেছি। চলুন, অনেকক্ষণ ঘুরতে হবে।"

গতিরোধ করতে হ'ল আবার। দেখা গেল, নীলাম্বর পাতাকে নিয়ে ফিরছে। নীলাম্বর অবাক হয়ে গেল, একটু অপ্রস্তুতও হ'ল যেন।

"আপনারা সব চ'লে যাচ্ছেন যে ?"

"আসছি এখুনি, তুমি ততক্ষণ দুধটা গরম কর না।"

"কতক্ষণে ফিরবেন ? দুধ জুড়িয়ে যাবে যে।"

"আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। একটু পরে না হয় গরম ক'রো।"

অমরবাবু নিজের হাতঘড়িটা দেখলেন একবার।

"চলুন, যাওয়া যাক।"

আবার তিনি তাঁর নোট-বুক থেকে পড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে থমকে গেলেন। বাইনকুলারটা তুলে ফোকাস করলেন আকাশের দিকে, ক'রেই নাবালেন সেটা চোখ থেকে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল উত্তেজনায়।

"ওটা দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না ?"

কবি বাইনকুলার লাগালেন চোখে। তারপর বললেন, "চিলের মত মনে হচ্ছে—"

"চিলের মত, কিন্তু চিল নয়। ওর পেটের তলাটা দেখুন ভাল ক'রে, আর গলার পাশটা দেখুন। পেটের তলাটা দেখেছেন ?"

"দেখেছি, সাদা। গলার পাশে কালো মত একটা দাগ রয়েছে।"

"দ্যাট'স ইট। চিলের ও-রকম থাকে কি ? বরং হোয়াইট আইড বাজার্ড ঈগলের (White Eyed Buzzard Eagle) সঙ্গে কিছু মিল আছে। কিন্তু বাজার্ড অনেক ছোট ওর চেয়ে। অস্‌প্রে (Osprey) মশাই। উৎক্রোশ, কবি কালিদাস যাকে কুররী ব'লে বর্ণনা করেছেন। সেবার শীতকালে আপনাকে দেখিয়েছিলাম, মনে নেই ? এরা সব শীতের অতিথি। গ্রীষ্মকালে ওরা ইউরোপে চ'লে যায়। ইউরোপে গিয়ে এতদিন ওর বাসা বাঁধা উচিত ছিল। ভাওড়ের মাছের লোভ ছাড়তে পারছে না বোধ হয়।"

অমরবাবু আরও বোধ হয় কিছু বলতেন, কিন্তু নীলাম্বর-পুত্র পীতাম্বর ছুটে এসে বাধা দিলে।

"দুধটা আপনারা খেয়েই যান। বাবা বললেন, তা না হ'লে দুধ হয়তো খারাপ হয়ে যেতে পারে। রাত্রের বাসি দুধ তো।"

"চলুন, ঝামেলা মিটিয়েই ফেলা যাক।"

অমরবাবু আবার সদলবলে ফিরলেন কুটিরের দিকে। ঘুঁটে আর কাঠ জ্বালিয়ে দুধটা গরম ক'রে ফেললে নীলাম্বর। অমরবাবু প্রত্যেকটি ছেলেকে দু-তিন গ্লাস ক'রে দুধ খাওয়ালেন।

কবি বললেন, "আমার মশাই খিদে নেই এখন।"

"যা পারেন খেয়ে নিন। সমস্ত দিন ঘুরতে হবে তো। মিল্‌ক্ ইজ এ গুড ফুড। একটু খান।"

এক গ্লাস খেতে হ'ল কবিকে। অমরবাবু উবু হয়ে ব'সে ঢকঢক ক'রে প্রায় এক ঘটি দুধ খেলেন।

নীলাম্বর বললে, "আরও খানিকটা দুধ প'ড়ে রইল যে?"

রুমালে মুখ মুছে অমরবাবু হেসে বললেন, "ওটুকু তোমরা দুজনে শেষ ক'রে ফেল। চলুন এবার। আহার-সমস্যার সমাধান হ'ল, নিশ্চিন্ত চিত্তে এবার পাখী দেখা যাক।"

দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

পরিশ্রান্ত কবি একটা গাছের ছায়ায় এসে বসেছেন। অমরবাবু তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘন নলখাগড়া ঝোপের পাশে। ছেলেগুলো তখনও ঝোপের ভিতর ইট ফেলছে মাঝে মাঝে। একটিও কলকলানি পাখী দেখা যায় নি তখনও। নলখাগড়ার ভিতর থেকে কিন্তু অবিরাম শব্দ হচ্ছে, গোড়া থেকেই হচ্ছিল। চক্ চক্ চক্ চক্—কেরে কেরে ক্রেৎ ক্রেৎ—চক্ চক্—পৃৎ পৃৎ পৃতিক—ক্রেৎ ক্রেৎ ক্রেৎ। হঠাৎ মনে হয় ব্যাঙ ডাকছে। সারা দুপুর এই শব্দ শুনে কবি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে একটা কবিতার কয়েকটা ছত্র ঘুরে-ফিরে আসা-যাওয়া করছিল অনেকক্ষণ থেকে। পকেট থেকে খাতা কলম বার ক'রে হাঁটুর উপর খাতাটা

রেখে কবিতাটা লিখে রাখলেন। এখনি না লিখে ফেললে ভুলে যাবেন পরে—

জয় জয় জীবনের জয় জয়
নলখাগড়ার বন বাঙ্ময়।
বাঙ্ময় আকাশের শূন্য
ক্ষিতি অপ্ মরুৎ যে পূর্ণ
রোদে জ্ব'লে বাণী কার পুণ্য
　　নলখাগড়ার বন কিবা কয়।
জয় জয় জীবনের জয় জয়।

"দেখুন, দেখুন, দেখুন—একটা বেরিয়েছে—"

অমরবাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন হঠাৎ।

ফুড়ুৎ ক'রে একটা পাখী বেরিয়েই আবার ঝোপে ঢুকে পড়ল। অমরবাবু সাগ্রহে ছুটে এলেন।

"দেখেছেন পাখীটা? অলিভব্রাউন রঙ, ঠোঁটটা কালচে বাদামী?"

কবি দেখতে পান নি। কিন্তু বিজ্ঞানীকে সে কথা বললে তিনি বড়ই মর্মাহত হবেন, তাই বললেন, "দেখেছি, তবে ভাল ক'রে দেখি নি।"

"ওর চেয়ে ভাল ক'রে দেখা শক্ত। মার্শ ওয়ার্বলারটা দেখেছেন ভাল ক'রে আশা করি। অনেকটা ভরত পাখীর মত উড়ল, না? গানটিও সুন্দর, হুইট্—হুইট্—টু—টু—হুইট্—হুইট্—"

ছেলেগুলো নলখাগড়ার ঝোপে আবার ঢিল ছুঁড়ছিল। ঘুষ খাইয়ে অমরবাবু তাদের কেনা গোলাম ক'রে ফেলেছিলেন একেবারে। অমরবাবু বললেন, "ওই ঝোপটার ওপর আসুন আমরা বাইনকুলার ফোকাস ক'রে ব'সে থাকি। কখন কষ্ট ক'রে বেরুবে বলা যায় না তো।"

দুজনে চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ব'সে রইলেন। কবির হঠাৎ মনে হ'ল, গ্রীষ্মের এই দুপুরে কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে আমরা কি খুঁজছি? পাখী, না, আর কিছু?

৬০

ডানা আবার সন্ন্যাসীর কাছেই গিয়েছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না, কারণ আনন্দমোহনবাবুর চ'লে যাওয়ার ঠিক পরেই রূপচাঁদ এসে হাজির হয়েছিলেন আবার। রূপচাঁদের ব্যবহারে কোনরকম অশোভনতা ছিল না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে শাণিত ছুরিকার ঝলক চকমক ক'রে উঠছিল যেন মাঝে মাঝে। যাওয়ার আগে তিনি ব'লে গিয়েছিলেন, "এখন আমি চললুম। কিন্তু আবার আসব। একবার নয়, বার বার। ওই নীলকণ্ঠ পাখীটা তার সঙ্গিনীকে ঘিরে যে উৎসব করছে, একবার উড়ে চ'লে যাচ্ছে দূরে আবার ফিরে আসছে দ্বিগুণিত উৎসাহে কলকণ্ঠের উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত ক'রে, তা কি দেখতে পাও না তুমি? বাইনকুলার চোখে দিয়ে কি দেখ তা হ'লে? ওইটেই তো দেখবার মত একমাত্র সত্য। শুধু পক্ষী-জগতে নয়—সর্বত্র। আর একটা জিনিসও এতদিন তোমার হৃদয়ঙ্গম করা উচিত ছিল, চোখে পড়া উচিত ছিল অন্তত। পাখীদের মধ্যে এটা কি তুমি লক্ষ্য কর নি যে, যে পুরুষপাখীটা বেশী শক্তিমান, সে-ই অবশেষে প্রণয়-দ্বন্দ্বে জয়ী হয়? শক্তিরই জয় সর্বত্র। বিদেশের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক—সবাই এই কথাই বলছেন। ডারবিনের 'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট' আর নীট্‌শের 'সুপারম্যান' একই তথ্যের দুটো দিক। আমাকে তুমি কি অক্ষম মনে কর? শক্তির পরিচয় যেদিন চাইবে, যেমন ভাবে চাইবে, পাবে। এমনও হতে পারে যে, না

চাইলেও পাবে। এখন চললুম, কিন্তু আবার আসব। হয়তো অসময়ে অতর্কিতে আসব—"

ডানার দিকে চেয়ে একটু হেসে চ'লে গিয়েছিলেন তিনি। ডানা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ব'সে ছিল খানিকক্ষণ, তারপর সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিল।

সমস্ত শুনে সন্ন্যাসী হাসিমুখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "ইতিহাস পড়েছ তুমি?"

"পড়েছি কিছু কিছু।"

"তা হ'লে তোমার জানা উচিত, ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়াটা অসভ্যতার লক্ষণ। মানুষ যখন খুব অসভ্য ছিল, তখন তার পশু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করত কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। কিন্তু চারিদিকে যে অদৃশ্য শক্তির প্রতাপ সে অনুভব করত, যার প্রভাব সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারত না, যার প্রকাশ সে দেখত ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়, বজ্রে-বিদ্যুতে, দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে, হিংস্র জন্তুতে, তার রূপ ভয়ঙ্কর ছিল তার কাছে। সেই ভয়ঙ্কর কল্পনা যখন দেবতারূপে মূর্ত হ'ল তাদের সমাজ-জীবনে, তখন সে দেবতাও হ'ল ভয়ঙ্কর। তার রূপ হ'ল রক্তপায়ী পিশাচের রূপ। যে সব সভ্যতা অতি প্রাচীন, যেমন ধর—ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, উর, তাতে তুমি কোনও সুন্দর দেবতার সাক্ষাৎ পাবে না। সবই বীভৎস। পশু আর মানুষে মিলিয়ে, দু রকম পশুর সংমিশ্রণ ক'রে যে সব দেবতার মূর্তি তারা নির্মাণ করেছিল তা ছিল তাদের ভয়েরই প্রতীক। মানুষ আরও যখন সভ্য হ'ল, তখন ভয় কমতে লাগল। ও-দেশে বোধ হয় গ্রীসেই প্রথম মানুষের রূপে ভগবানকে কল্পনা করা হয়েছে। আমাদের দেশে বোধ হয় তারও আগে। আমাদের দেশে চিন্তাধারা আরও নানাভাবে এগিয়েছে। ভগবানকে আমরা নিজেদের মধ্যেই পেয়েছি, আমরাই বলেছি—সোহং, আমরাই জেনেছি—প্রেমই ভগবান, আমরাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি।

যদিও নানাভাবে নানা সাধক নানা পথে এগিয়েছেন, প্রত্যেকের পথ আলাদা আলাদা হয়েছে, হয়তো বিপরীতমুখী হয়েছে, কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেই একমত—ভয়কে কেউ আমল দেন নি, ভয়ের স্থান কোথাও নেই। আমাদের দেশে আত্মার অপর নামই অভয়। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? রূপচাঁদবাবু কি করবেন তোমার?"

"যদি অপমান করেন?"

"সম্মান মানেই আত্মসম্মান। তুমি ছাড়া তোমার সম্মান আর কেউ তো ক্ষুণ্ণ করতে পারে না—"

"যদি জোর ক'রে গায়ে হাত দেন?"

"দিলেনই বা। তোমার যদি খারাপ লাগে, বাধা দেবে। তোমার যতটুকু সামর্থ্য আছে তাই দিয়েই প্রতিবাদ করবে—"

"তা তো করবই। কিন্তু আমার শক্তি আর কতটুকু বলুন?"

"যতটুকু আছে প্রতিবাদ করবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তোমার প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ও-লোকটা যদি তোমাকে অভিভূত ক'রে ফেলে, তা হ'লে তোমার আত্মসম্মান নষ্ট হবে না। তা ছাড়া, তোমার যে আসল 'তুমি' তার গায়ে কেউ হাত দিতেই পারে না। তোমার দেহটা তুমি নও। তুমি ভয় ত্যাগ কর। তা ছাড়া, তোমার কাছে চাকর থাকে তো একজন?"

"তা থাকে। কিন্তু আমার সন্দেহ, চাকরটাও ওঁর দলে। উনিই যোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন লোকটাকে। সেদিন দেখলাম, একটা রঙিন জামা আর জুতো কিনে দিয়েছেন। ওকে আমার বিশ্বাস হয় না।"

সন্ন্যাসী আবার কিছুক্ষণ হাসিমুখে থেকে বললেন, "আত্মবিশ্বাস ছাড়া আর কোনও বিশ্বাসই টেকে না শেষ পর্যন্ত। নিজের শক্তিতে আস্থাবান হও, ভয় পেয়ো না। ভয়টা মিথ্যা, একমাত্র সত্যই

"আপনি আমার কাছে গিয়ে থাকবেন চলুন। আমি বাইরের ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে দিচ্ছি।"

"পরিষ্কার আমি নিজের হাতেই ক'রে নিতে পারি। কিন্তু তোমার ওখানে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। বাধা আছে।"

"কিসের বাধা ?"

"তা ঠিক তোমাকে ব'লে বোঝাতে পারব না।"

ডানার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। লজ্জায় নয়, রাগে। রাগটা হ'ল তার নিজেরই ওপর। ঠিক এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর একবার আলোচনা হয়েছিল, ঠিক এই একই অনুরোধ করেছিল সে সন্ন্যাসীকে—তখনও তিনি ঠিক এমনই ভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন আরও স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, নারীসঙ্গ বিষবৎ আমার পক্ষে। তবু সে কোন্ লজ্জায় ওই একই প্রসঙ্গ তুলেছে আবার। কিন্তু এ অবস্থায় সে করবেই বা কি ? হঠাৎ কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে।

"চিনতে পারছ ?"

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল। স্বয়ং রত্নপ্রভা দাঁড়িয়ে। গোলগাল কালো মুখটি হাসির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। হাতে একটি বেঁটে ছাতা, বগলে ফাইল। ডানা কি যে বলবে ভেবে পেল না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল শুধু। তারপর বললে, "আপনি আসবেন কোন খবর পাই নি তো ?"

"খবর দেওয়ার সময় ছিল না। একাই এসেছি। আনন্দবাবুর বিপদের খবর পেয়ে মনে হ'ল, নিজে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসি। আমি এসেছি সকালে। এসেই সদরে গিয়েছিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে।"

তারপর সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে তিনি নমস্কার করলেন। হাসিমুখে বললেন, "আপনি এখনও আছেন এখানে ?"

"এইবার যাব।"—সন্ন্যাসীও হাসিমুখে উত্তর দিলেন।

ডানা জিজ্ঞেস করলে, "এখানে এসেছেন কতক্ষণ আগে ?"

"এখুনি। সোজা স্টেশন থেকেই তো আসছি। তোমার বাসায় গিয়েছিলাম। চাকরটার কাছে শুনলাম—তুমি এখানে আছ, তাই এখানেই চ'লে এলাম।"

স্মিতমুখে ডানার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। অকারণে ডানার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। মনে হতে লাগল, সে যেন একটা দুষ্কার্য করছিল, হঠাৎ ধরা প'ড়ে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, "চলুন, আপনার নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করি তা হ'লে।"

"সে সব সেরে এসেছি আমি সদরে। চা খাব একটু।"

"চলুন।"

কিছুদূর এসে রত্নপ্রভা প্রশ্ন করলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে ভাব হ'ল কি সূত্রে ?"

"সূত্র কিছু নেই, এমনি আলাপ করেছিলাম একদিন নিজেই গিয়ে। অদ্ভুত চরিত্রের লোক, নিজেকে নিয়েই থাকেন ওই ভাঙা ঘরে। নদীর চরে একা একা ঘুরে বেড়ান। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে গল্প করি।"

"আমাদের পাখীগুলোর খবর কি ?"

"মাঝে মাঝে ম'রে যাচ্ছে দু-একটা।"

"তা তো যাবেই। চা খেয়ে যাব একবার দেখতে। তারপর হেসে বললেন, দেখবার মত বিদ্যে নেই অবশ্য আমার। আমার দৌড় লাহা মশায়ের 'পেট বার্ডস অব বেঙ্গল' (Pet Birds of Bengal) পর্যন্ত। ওঁর সঙ্গে এতদিন থেকেও বিদ্যে বিশেষ বাড়ে নি। তোমার কেমন লাগছে ?"

ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল। কি বলবে ভেবে পেল না, অর্থাৎ ঠিক কি বললে যে সত্য কথা বলা হবে তা মাথায় এল না। অমরবাবু তাকে যে নূতন জগতের সন্ধান দিয়ে গেছেন তা যে খারাপ

লাগছিল—এ কথা সত্য নয়; কিন্তু যে অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে থেকে তাকে সে জগতের পরিচয় নিতে হচ্ছিল, সেই পরিবেশটাই ক্রমশ এমন নিদারুণ হয়ে উঠছিল যে কিছুই তার ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, দাঁতের ব্যথা নিয়ে তাকে যেন বাধ্য হয়ে ব'সে কোনও ভাল ওস্তাদের গান শুনতে হচ্ছে। গানের কিছুটা সে বুঝতে পারছে, কিছুটা তাকে মুগ্ধও করছে, কিন্তু দাঁতের ব্যথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কিন্তু এত কথা সে রত্নপ্রভাকে বুঝিয়ে বলবে কি ক'রে? তাই চুপ ক'রেই রইল। রত্নপ্রভা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নন।

বললেন, "তোমার ভাল লাগছে না বোধ হয়। কিন্তু পাখীর পালক নিয়ে যে প্রবন্ধটা তুমি ওঁকে লিখে পাঠিয়েছিলে তা প'ড়ে মনে হয়েছিল যে, পাখীদের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি।"

"ও-প্রবন্ধে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই। পাঁচটা বই দেখে লিখেছিলাম। পাখীদের কথা আগে তো কিছুই জানতাম না, এখন যত দেখছি তত ভাল লাগছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে—"

"মুশকিল আবার কি?"

"চলুন, সব বলছি।"

ডানা অবশ্য অকপটে সব কথা রত্নপ্রভাকে বলতে পারে নি। বলা সম্ভবই ছিল না তার পক্ষে। কিন্তু যতটুকু সে বলেছিল, তাতেই রত্নপ্রভা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাঁর নিটোল ভারী মুখখানা যদিও গম্ভীর হয়েই ছিল, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো থেকে হাসি উপচে পড়ছিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি বললেন, "ওতে ভয় পেয়ো না। সুন্দরী মেয়ে দেখলে সব পুরুষেরই একটু-আধটু মতিভ্রম হয়। ও কিছু নয়। আমাকে তো রূপসী বলা চলে না, সাঁওতালনীর মত চেহারা আমার, আমাকেও ও ভোগ ভুগতে হয়েছে। ও কিছু নয়। দু দিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে সব।

আমাদের দেউড়ির সিপাহী সুখন পাঁড়েকে ব'লে যাব, সে তোমার কাছে না হয় থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা। আর এক কাজ করলেও তো হয়। এখানে থাকবার দরকার কি? আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটা কি দুটো ঘর নিয়ে থাকলেই তো পার।"

"নদীর ধারে এই জায়গাটা কিন্তু ভারি চমৎকার। গোড়া থেকেই এখানে আছি, মন ব'সে গেছে এখানে। তবে আপনি যদি বলেন—"

শেষের কথাগুলো উচ্চারণ ক'রেই সে থেমে গেল, নিজের কানেই অত্যন্ত বেসুরো ঠেকল। তার যে নিজের কোনও স্বাধীন ইচ্ছা নেই, সে যে একজন বেতনভোগিনী দাসী মাত্র, কর্ত্রীর আদেশ অনুসারেই তাকে চলতে হবে, গত্যন্তর নেই—এই ভাবটা যেন কদর্য মূর্তিতে প্রকাশ হয়ে পড়ল শেষের কটা কথায়।

রত্নপ্রভা কিন্তু বিচলিত হলেন না। তাঁর গাম্ভীর্য অটুট রইল। বললেন, "বেশ, এখানেই থাক তা হ'লে। সুখন থাকবে তোমার কাছে—তাকে ব'লে যাব।"

"না, তাকে কিছু বলবার দরকার নেই এখন। ও যেমন দেউড়িতে আছে থাকুক। যদি তেমন দরকার বুঝি আনিয়ে নেব ওকে।"

"বেশ। চল, এবার পাখীগুলো দেখে আসা যাক।"

"চলুন।"

আনন্দবাবুর ব্যাপারটা কি হ'ল তা রত্নপ্রভা কিছু বলেন নি এতক্ষণ। রাস্তায় যেতে যেতে বললেন, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন। আনন্দমোহনবাবুর ছাত্র উনি, আমার সঙ্গেও খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন।"

"আনন্দমোহনবাবুর মকদ্দমার আবার দিন পড়েছে?"

"পড়েছে বোধ হয়। কিন্তু আনন্দমোহনবাবুকে ওঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। আসল খুনী ধরা পড়েছে, দোষও স্বীকার করেছে।"

"ও! তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আনন্দমোহনবাবুকে এর জন্যে আর ঝামেলা পোয়াতে হবে না, তবে—। আচ্ছা, এখানকার এস. পি. মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোমার?"

"না, তেমন আলাপ হয় নি।"

"আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় উনি। আমার সঙ্গে দেখা হ'ল না। কোথায় বেরিয়েছেন শুনলাম। আজই ফেরার কথা। আমি চিঠি লিখে এসেছি একটা। হয়তো দেখা হয়েও যেতে পারে।"

কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটবার পর জাল-ঘেরা পক্ষী-নিবাসে এসে হাজির হলেন তাঁরা। একজন চাকর পাখীদের জন্যে নানারকম খাবার নিয়ে আগে থাকতেই ব'সে ছিল। রত্নপ্রভাই সদরে যাবার আগে এ ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন।

দানা আর ফল ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পাখীদের মধ্যে একটা সোরগোল প'ড়ে গেল যেন, বিশেষ ক'রে টিয়া শালিক আর ছাতারেদের মধ্যে। আলাদা আলাদা খাঁচায় শামা, হরবোলা, দামা, দোয়েল, পাহাড়ী ময়না, হলদে পাখী প্রভৃতি পৃথক পৃথক রাখা ছিল। তারা বিশেষ কোন উৎসাহ প্রকাশ করলে না কিন্তু। খাবারের দিকে চেয়েও দেখলে না।

"হুতোম প্যাঁচাটা ম'রে গেছে?"

"হ্যাঁ। ফিঙে দুটোও বাঁচল না। ওই পাহাড়ী ময়নাটাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে। গায়ে পোকা হয়েছে বোধ হয়। হলুদ-জলে একদিন স্নান করিয়েছিলাম। কিন্তু বিশেষ কোনও উপকার হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে না। কি করা যায় বলুন তো?"

"বেশী অসুস্থ হ'লে ছেড়ে দিও। হরবোলাটা কেমন আছে? ছেলেবেলায় আমি একটা হরবোলা পুষেছিলাম, কত রকম ডাকই যে ডাকত!"

হরবোলার খাঁচার কাছে গিয়ে রত্নপ্রভা অপ্রত্যাশিতভাবে শিস

দিলেন একটি। ডানা অবাক হয়ে গেল; হরবোলা পাখীটাও। খাঁচার ভিতরই সে তুড়ুক ক'রে এগিয়ে এল, ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে দেখলে একবার রত্নপ্রভার মুখের দিকে, তারপর সেও মিষ্টি সুরে শিস দিয়ে জবাব দিলে। মনে হ'ল, রত্নপ্রভাকে যেন বললে—তুমি যে আমার আত্মীয় তা তোমার শিস শুনেই বুঝেছি। তারপর খাঁচার দাঁড়ে পা ছুটো আটকে ডিগবাজি খেয়ে নিজের আর একটা কৃতিত্ব দেখিয়ে দিলে। কিন্তু ওর প্রতি আর বেশী মনোযোগ দেওয়ার অবসর পাওয়া গেল না, আর একজনের ডাক শোনা গেল। ফটি—ক জল, ফটি—ক জল।

"ফটিক-জলগুলো বেঁচে আছে না কি?"

"না, তিনটে ম'রে যাবার পর বাকিগুলোকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। বন্দী অবস্থায় কেমন যেন মন-মরা হয়ে থাকে।"

"বেশ করেছ। কিন্তু ডাকটা এল কোথা থেকে?"

"ওই বড় গাছটায় ওরা বাসা বাঁধছে বোধ হয়। প্রায়ই ডাক শুনি। বাইনকুলার দিয়ে দেখতেও পেয়েছি দু-একবার।"

"চমৎকার দেখতে, নয়?"

"সুন্দর।"

পক্ষী-প্রসঙ্গ কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পেল না। মোটরের হর্ন শোনা গেল একটা। চাকরটা এসে খবর দিলে—পুলিস সাহেব এসেছেন, মালকাইনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

পক্ষী-নিবাসের গেটেই দেখা হ'ল মিস্টার গুপ্তের সঙ্গে। রত্নপ্রভাকে দেখেই মিস্টার গুপ্ত স্টিয়ারিং ছেড়ে নেবে এলেন এবং পারধানে সাহেবী পোশাক থাকা সত্ত্বেও হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে।

"মাসীমা, আপনি যে এখানে আসতে পারেন তা কল্পনাই করি নি আমি। এখানে হঠাৎ কি সূত্রে এসেছেন?"

"এখানে আমার একটা বাড়ি আছে, কিছু সম্পত্তিও আছে। তাই মাঝে মাঝে আসি। তুমি কতদিন হ'ল এসেছ এখানে ?"

"বেশী দিন নয়। মাস ছয়েক।"

"এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি শ্রীমতী ডানা, আমাদের পক্ষী-নিবাসের কর্ত্রী। এখানেই থাকেন উনি। রিটায়ার্ড প্রোফেসার আনন্দমোহনবাবু আমাদের জমিদারির ম্যানেজার। তাঁর সঙ্গেও আলাপ ক'রো, চমৎকার লোক, চমৎকার কবিতা লেখেন। এখন এখানে নেই, কলকাতা গেছেন, দু-একদিনেই ফিরবেন।"

"আচ্ছা, ইনিই কি খুনের মোকদ্দমায় পড়েছিলেন না কি ?"

"হ্যাঁ। কোনও দুষ্ট লোক ফাঁসিয়ে দিয়েছিল বেচারীকে তোমাদের আইনের জালে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, ওঁকে রেহাই দিয়ে দিয়েছ তোমরা।"

মিস্টার গুপ্ত ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নিজের বাটার-ফ্লাই গোঁফে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করতে করতে রত্নপ্রভার কথা শুনছিলেন। রত্নপ্রভা থামতেই বললেন, "সে দুষ্টু লোকটিকে চিনি আমি। এ যে আপনাদের জমিদারি, আপনাদের ব্যাপার—কিছুই জানতাম না আমি। আই সি। আপনি যাবেন কখন ?"

"আজই রাত দশটার ট্রেনে আমি ফিরতে চাই। তোমার মা কোথায় আজকাল ?"

"ডেরাডুনেই আছেন। মেসোমশায়ের পাখী-বাতিক এখনও আছে ?"

"বেড়েছে। পক্ষী-নিবাস দেখে বুঝছ না ? তুমি সন্ধ্যেবেলা আজ খাও না আমার কাছে। সুনীরা এখানেই আছে ?"

"না, সে বাপের বাড়ি গেছে, তার বোনের বিয়ে। আসবে দিন সাতেক পরে। আচ্ছা, আমি আসব আজ সন্ধ্যের পর। সাড়ে সাতটা নাগাদ—"

"ডানা, তুমিও এস, আমার ওখানেই খাবে আজ।"

ডানা একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। খাকি-পোশাক-পরা গোঁফ-ছাঁটা ঘাড়-কামানো এই বলিষ্ঠ লোকটার সামনে ব'সে খেতে হবে। কিন্তু 'না' বলবার উপায় নেই। চুপ ক'রে রইল।

মিস্টার গুপ্ত বললেন, "আপনারা কোথা যাচ্ছেন, আসুন না, পৌঁছে দি।"

"আমরা বেশী দূর যাব না। এই কাছে-পিঠেই ঘোরা-ফেরা করব। তুমি যাও।"

"আচ্ছা, সাড়ে সাতটা নাগাদ আপনাদের কাছারিতে পৌঁছব, কাছারিটা চিনি। পাশেই দোতলা বাড়িটাই নিশ্চয় আপনার ?"

"হ্যাঁ।"

মিস্টার গুপ্ত চ'লে গেলেন।

রত্নপ্রভা পক্ষী-নিবাসটাই ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলেন নীরবে। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে জিজ্ঞেস করলেন, "এ পাখীটা কি—বেশ সুন্দর দেখতে তো। এটাকে আগে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না।"

"আপনারা চ'লে যাওয়ার পর একটা পাখীওলা দিয়ে গিয়েছিল।"

"নাম কি ?"

"বলেছিল, দামা। দামাই লিখে রেখেছি, ইংরেজী নাম খুঁজে পাই নি।"

"লাহা মশায়ের বইয়ে দেখেছি মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব অরেঞ্জ-হেডেড গ্রাউণ্ড থ্রাশ (Orange-headed Ground Thrush)।"

আরও কিছুক্ষণ নীরবে পাখী দেখে বেড়ালেন। তারপর ডানার দিকে ফিরে বললেন, "দেখ, আমাদের ছেলেমেয়ে হয় নি। এরাই আমাদের ছেলেমেয়ে। এদের একটু যত্ন ক'রো। তুমি যত্ন করছ নিশ্চয়ই, তবু বললাম কথাটা। এদের নিয়েই জীবন কাটাতে হবে। আচ্ছা, কটা পাখী ম'রে গেছে ? লিস্ট ক'রে রেখেছ কি ?"

"রেখেছি। বাসায় আছে।"

"মরতে দিও না কাউকে। যদি দেখ খাচ্ছে না বা বিমর্ষ হয়ে আছে, ছেড়ে দিও।"

"আচ্ছা।"

ডানার বাসার দিকেই ফিরছিলেন রত্নপ্রভা। হঠাৎ রত্নপ্রভার কানের কাছ দিয়ে সোঁ ক'রে একটা তীর বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

"এ কি ব্যাপার, তীর ছুঁড়ছে কে?"

পর-মুহূর্তেই তীরন্দাজদের দেখা গেল। বকুলবালা গাছ-কোমর বেঁধে হাঁটু গেড়ে ব'সে তৃতীয়বার শর-সন্ধান করছিলেন, পাশে এক গোছা শর নিয়ে চণ্ডী দাঁড়িয়ে ছিল, তারও আর এক হাতে ধনুক।

ডানা হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বললে, "বকুলদি, কখন এলেন আপনি?"

"এখুনি এসেছি। এসেই দেখি একটা বাজ না চিল তোমার ওই পাখীর বাসার উপর ব'সে আছে। আর একটু হ'লে বাচ্চাগুলোকে শেষ ক'রে ফেলত। ভাগ্যে আমি আর চণ্ডী এসে পড়েছিলাম—"

উৎসাহভরে তিনি আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রত্নপ্রভাকে দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। কোমর থেকে আঁচলটা খুলে গায়ে দিয়ে মাথায় আধঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন।

ডানা পরিচয় করিয়ে দিলে, "ইনি অমরেশবাবুর স্ত্রী। আসুন, আলাপ করুন।"

বকুলবালার কিন্তু আলাপ করবার উৎসাহ তেমন দেখা গেল না। ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ লজ্জিত হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, আর বার বার আঁচল দিয়ে নিজের স্থূল বপুটি ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। এগিয়ে এলেন তিনি।

ডানা বললে, "ইনি রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী। এঁরও পাখী পোষার খুব শখ। তালগাছে ওই যে বাক্সটা আমরা বেঁধে দিয়েছি, তাতে শালিক বাসা বেঁধেছে। বাচ্চাও হয়েছে তাদের। উনি কিছুদিন আগে এসে ডিমগুলো দেখে গিয়েছিলেন—"

"নমস্কার।"—হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন রত্নপ্রভা।

বকুলবালা আর একটু ঘাড় হেঁট ক'রে আঁচলটা গায়ে আর একটু টেনে দিলেন।

"আসুন। আপনার যখন পাখী পোষার এত শখ, তখন আপনি তো আমাদের ঘরের লোক। এতদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া উচিত ছিল। আসুন।"

একটু দূরে চণ্ডী দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। শুধু দেখছিল নয়, উপভোগ করছিল। তার চোখ-মুখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল, এই অপূর্ব মিলনের কৃতিত্বটা যেন তারই।

বকুলবালা নিম্নকণ্ঠে তাকে বললেন, "আমার ধনুকটা তুলে রাখ ভাল ক'রে। এখনি বাড়ি ফিরব আমরা। তুই পালাস নি যেন

"না।"

এই আদেশ দিয়ে গায়ের কাপড়-চোপড় আবার সামলে-সুমলে বকুলবালা রত্নপ্রভাকে অনুসরণ ক'রে বারান্দায় গিয়ে উঠলেন।

রত্নপ্রভা চণ্ডীকে দেখিয়ে বললেন, "ওটি কে? ছেলে বুঝি?"

"না। আমার ছেলে হয় নি।"

হঠাৎ একটা নীরবতা ঘনিয়ে এল। তিনটি নিঃসন্তান রমণীকে কেন্দ্র ক'রে একটা বিরাট শূন্যতা মূর্ত হয়ে উঠল যেন।

রত্নপ্রভাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

বললেন, "কি পাখী ভালবাসেন আপনি?"

"অনেক রকম ভাল পাখী পুষেছি আমি। টিয়া, চন্দনা, ময়না,

শুনিয়া। একটা হলদে পাখী পোষবার শখ, কিন্তু পাচ্ছি না যোগাড় করতে। একবার একটা পেয়েছিলাম, না খেয়ে ম'রে গেল। ইনি একটা যোগাড় ক'রে দেবেন বলেছিলেন, তাই এসেছিলাম খোঁজ করতে।"

"চেষ্টা করছি। বাচ্চা পেলেই আপনাকে খবর পাঠাব। আপনার চণ্ডী-গণশাও তো খোঁজে আছে।"—ডানা হেসে উত্তর দিলে।

গণশার নাম শোনামাত্র কিন্তু বকুলবালা ক্ষেপে গেলেন। রত্নপ্রভার খাতিরে যে ভব্যতাটুকু এতক্ষণ তিনি বজায় রেখেছিলেন তা আর টিকল না, চোখের দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুতে লাগল। ঘাড়ের ঝাঁকানিতে আঁচল স'রে গেল মাথা থেকে।

"গণশা মুখপোড়ার কাণ্ড শুনবেন? বলে কিনা—আমাকে একটা ভ শ ডিশ কনারি না কিনে দিলে হলদে পাখীর বাচ্চা পেলেও উড়িয়ে দেবে আমি। মুখপোড়া আমাকে আবার মাসীমা ব'লে সোহাগ জানা তে আসে। অমন বোনপোকে ঝাঁটা মারি আমি।"

রত্নপ্রদিদি গম্ভীর মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল আবার। এক নজরেই তিনি বকুলবালার স্বরূপ অনেকটা টের পেয়েছিলেন। গণশাকে ও নি চেনেন। গণশার মেশোমশাই এস্টেটের কর্মচারী ছিলে না।" দিন আগে মারা গেছেন, রত্নপ্রভাই পেনশন বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন তাঁর বিধবার জন্যে, জমিও দিয়েছেন কিছু। গণশা যে পড়াশোনায় ভাল তাও তিনি জানেন। বকুলবালার কাছে গণেশের নূতন পরিচয় পেয়ে খুব মজা লাগল তাঁর।

ছদ্ম বিস্ময়ে বললেন, "এই কথা বলেছে গণশা?"

"আমার কথা বিশ্বাস না হয়, চণ্ডীকে জিজ্ঞেস করুন। এই চণ্ডী দিকে আয়। গণশা তোকে কি বলেছিল বল্ তো এঁদের।"

কা থেমে থেমে ঢোক গিলে গিলে বকুলবালার কথা সমর্থন করতে না ক'রে উপায়ও ছিল না। কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর নাম এ

ভাবে কালিমালিপ্ত করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল সে। তার ভয়ও করছিল। কথাটা গণশার কানে গেলে সে যে কি করবে, তা কল্পনা ক'রে হৃৎকম্প হচ্ছিল তার। হয়তো আচমকা নাকে একটা ঘুষিই বসিয়ে দেবে কোন্‌দিন।

বকুলবালা বললেন, "এরা দুটোতে কম জ্বালায় আমাকে! ইনি জেদ ধ'রে ব'সে আছেন একটা এয়ার-গান্‌ কিনে দিতে হবে, উনি বলছেন ভাল ডিশ্‌কনারি চাই। আমি অত টাকা পাব কোথা? বাজারের পয়সা থেকে কিছু কিছু সরিয়ে কতই বা জমানো যায়! ডিশ্‌কনারি জিনিসটা কি? কুড়ুল-টুড়ুল না কি—সাতজন্মে ও-কথা শুনি নি কখনও।"

ডানা মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করবার চেষ্টা করল। রত্নপ্রভা কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইলেন। শুধু তাই নয়, বললেন, "আপ এমন ভাবে জ্বালাতন করা খুব অন্যায় হয়েছে ওদের ' আমি ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি, আপনি হলদে পাখী এবার।"

"ধাড়ি পাখী চাই না কিন্তু, বাচ্চা দিতে হবে।"

"বেশ, তাই পাবেন—"

বকুলবালার চোখের দৃষ্টি ঝলমল ক'রে উঠল আনন্দে

চণ্ডীর দিকে চেয়ে বললেন, "শুনলি তো! ' তোয়াক্কা করব না আমি।"

কথাবার্তা আরও হয়তো কিছুদূর অগ্রসর হ'ত, কি মল্লিকের আকস্মিক আবির্ভাবে তা চাপা প'ড়ে গেল। বকু তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে দ্রুতপদে স'রে পড়লেন চণ্ডীকে সনাতন মল্লিক যা করলেন, তা আরও নাটকীয়। তিনি রত্ন পদপ্রান্তে দড়াম্‌ ক'রে শুয়ে প'ড়ে হাউমাউ ক'রে কেঁদে উ শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন রত্নপ্রভা। উঠে স'রে [illegible]। কাপড়টা টেনে দিলেন একটু। মল্লিক সাশ্রুনেত্রে করজোড়ে

লাগলেন, "আপনি আমার মা, বাঁচান আমাকে, ছাপোষা মানুষ আমি, দয়া করুন আমার ওপর।"

"কি হয়েছে ?"

মল্লিক তখন জামার পকেট থেকে একটি ছোট চিঠি বার ক'রে রত্নপ্রভার হাতে দিলেন। পেন্সিলে লেখা ছোট চিঠি। এস. পি. লিখেছেন—

"মাসীমা, এই লোকটিই সেই দুষ্ট লোক, যার কথা আপনি আন্দাজ করেছিলেন একটু আগে। ইনিই আনন্দমোহনবাবুর নামে মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করেছিলেন পুলিসকে। এঁর লেখা একখানা চিঠি আছে আমাদের কাছে। আনন্দমোহনবাবুর মত নিরীহ ভদ্রলোককে বিব্রত করার জন্যে এঁর শাস্তি হওয়া উচিত। আপনারা যদি এঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন, আমরা সাহায্য করতে পারি। তবে যদি ক্ষমা করেন, সে কথা স্বতন্ত্র। সন্ধ্যার পর যাব। ইতি—অনিল"

রত্নপ্রভা চিঠিখানা প'ড়ে ডানাকে দিলেন সেটা। মল্লিক মশায়ের দিকে ফিরে বললেন, "আনন্দমোহনবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা না ক'রে কিছুই বলতে পারছি না আপনাকে এখন। তিনি যদি মামলা করতে চান মামলা হবে, যদি না করতে চান হবে না।"

"আপনি দয়া করলে—"

রত্নপ্রভা আর কোনও জবাব দিলেন না, ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। ডানা তাঁর পিছু পিছু গেল।

৬৭

কবি দিনের গাড়িতে ফিরছিলেন কলকাতা থেকে। অমরবাবু ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন পাখীদের

মাইগ্রেশন (Migration) সম্বন্ধে একটা নূতন বই। কবি অভিভূত হয়ে ব'সে ছিলেন। তাঁর অভিভূত ভাবটা একরঙা ছিল না। অনবরত রঙ বদলাচ্ছিল। প্রথমে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন অমরবাবুর ব্যবহারে। কিছুতেই ছাড়লেন না ভদ্রলোক, জোর ক'রে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে দিলেন। বললেন, "কিছু বলা যায় না, একটু আরামে গেলে হয়তো আরও দু-চারটে ভাল ভাল কবিতা পাব আমরা। তার দাম এই টাকা কটার চেয়ে অনেক বেশী। একটু শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, একটু নির্জনতা না থাকলে ভাল ভাব আসতে পারে না। ভাল ভাবও পাখীর মত, গোলমাল দেখলেই স'রে পড়ে।"

কবি সত্যিই খুব আরাম বোধ করছিলেন। গাড়িতে নির্জনতাও ছিল, কিন্তু কোনও কবিতার ভাব মনে আসছিল না। তিনি তন্ময় হয়ে জানলা দিয়ে দেখছিলেন কেবল—দৃশ্যের পর দৃশ্য আসছে আর চ'লে যাচ্ছে, থামছে না কেউ। এ সব দৃশ্য আগে অনেকবার দেখেছেন, নূতন কিছু নয়, সবই চেনা; তবু মনে হচ্ছে ঠিক যেন চেনা নয়, ওদের মধ্যেই অচেনার রহস্য যেন মাখানো রয়েছে। টেলিগ্রাফের তারে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ফিঙেকে, নীলকণ্ঠকে, বাঁশপাতিকে, কাজলা পাখীকে (যার ইংরেজী নাম শ্রাইক—Shrike), বুলবুলিও দু-একটা দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে—সবই চেনা; কিন্তু তবু মনে হচ্ছে একটু যেন অচেনার আমেজ আছে প্রত্যেকটির মধ্যে। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল তাঁর। মনে হ'ল, যা চেনা তা ফুরিয়ে যায়, তা ক্ষণভঙ্গুর, নিজের পরিচয়ের পসরা সে যখন উজাড় ক'রে দেয়, যখন নূতন-কিছু দেবার আর থাকে না, তখনই সে ম'রে যায়, অনেক সময় সে বুঝতেও পারে না যে তার মৃত্যু হয়েছে। অচেনার মধ্যে কিন্তু অসীম সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে, তা আমাদের প্রত্যাশার নব নব দাবি মিটিয়ে চলেছে চিরকাল, মেটাবার পরই আবার মৃত্যু হচ্ছে তারও, আসছে নূতন অচেনা নূতন সম্ভাবনা

নিয়ে, শুধু তাই নয়, আসছে ওই চেনাকে অবলম্বন ক'রেই। ভাবটা কবির মনে নানাভাবে প্রসারিত হতে লাগল মেঘের মত। তার পর ক্রমশ কবিতায় রূপান্তরিত হ'ল তা। খাতা কলম বার ক'রে অনেক ভেবে ভেবে তিনি লিখলেন—

হে অচেনা, কতবার চেনা তুমি হ'লে
কত রূপে এ জীবনে; কত প্রসাধনে
দেখা দিলে রঙ্গমঞ্চে—শূন্যে জলে স্থলে,
জীবে-জড়ে, অন্ধকার অরণ্য-গহনে,
জনাকীর্ণ সমাজের হাসি-অশ্রু-জলে,
নিত্য-নবান্বিত করি জীর্ণ পুরাতনে
চিরকাল এ কি লীলা তব পলে পলে!

অচেনার অনন্যতা অবলুপ্ত হয়
পরিচয়-ঘর্ষণেতে, অপূর্ব পরশে
তারই মাঝে সঞ্চারিয়া নবীন বিস্ময়
সঞ্জীবিত কর তারে নব প্রাণ-রসে,
মৃত্যুর মুখেতে শুনি জীবনের জয়
ভীত প্রাণ উল্লসিয়া ওঠে যে হরষে,
মৃত্যু যেন এসে বলে—আমি মৃত্যুঞ্জয়।

কবিতাটা বার দুই পড়লেন, কেমন যেন তৃপ্তি হ'ল না। মনে হ'ল, যে ভাবটি মনে এসেছিল ঠিক সেটি ফোটাতে পারেন নি তিনি। ভাষা আর ছন্দকে বাঁচাতে গিয়ে ভাব মারা পড়েছে। বচনের ভিড়ে হারিয়ে গেছে অনির্বচনীয়। নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় ক্ষুব্ধ হলেন। চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে। একটা পুলের উপর গাড়ি উঠেছিল, শুভ্র সৈকতের মাঝখান দিয়ে শীর্ণস্রোতা

নদীটি বইছে। এখন গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে শুকিয়ে গেছে বটে, কিন্তু ম'রে যায় নি। নিজের সমস্ত শক্তিকে সংহত ক'রে রেখেছে, দু কূল প্লাবিত ক'রে একদিন তা আত্মপ্রকাশ করবে। পুকুর হ'লে ম'রে যেত। এই চিন্তার সূত্র অনুসরণ ক'রে একটা দার্শনিক-লোকে গিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য। মনে হ'ল, নদীর উৎস উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে, তাই সে বেঁচে থাকে, গ্রীষ্মের প্রখর তাপও তার জীবনধারাকে সম্পূর্ণ শুষ্ক করতে পারে না। মানুষের জীবনও একটা অদৃশ্য স্রোতের মত, তারও কি কোনও উৎস আছে কোনও উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে? ভগবানের কথা মনে হ'ল, অনেক-দিন-আগে-পড়া উপনিষদের কথা মনে পড়ল, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কোল থেকে বার্ড মাইগ্রেশনের বইটা প'ড়ে গেল, মর্ত্যলোকে নেবে এলেন আবার। বইটারই পাতা ওলটাতে লাগলেন। তারপর পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে নূতন ভাবে অভিভূত হয়ে গেলেন আবার। গ্রন্থকার লিখছেন* যে, কেবল যে পাখীরাই এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায় তা নয়। অনেক প্রাণীও যায়। জলচর, স্থলচর, উভচর, মাছ, কীটপতঙ্গ, প্রজাপতি, এমন কি কাঁকড়ারা পর্যন্ত নিয়মিতভাবে স্থান পরিবর্তন করে। আদিম মানবজাতিদের মধ্যে যারা নিজেদের আদিম স্বভাব এখনও রক্ষা করতে পেরেছে তারাও স্থাণু নয়, পরিভ্রমণশীল। এক স্থানে বেশীদিন থাকে না তারা, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে খাদ্যের সন্ধানে, শিকারের সন্ধানে, পালিত পশুদের জন্য মাছের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় তারা। কালাহারি মরুভূমির বুশম্যানরা, সাইবেরিয়ার বল্গাহরিণ-শিকারীরা, মধ্য-এশিয়ার পশুপালকেরা নিয়মিতভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। আরব দেশে ভ্রাম্যমাণ রুওয়ালা (Ruwala) জাতির অস্তিত্ব এখনও আছে। সভ্য মানুষেরাও মাঝে মাঝে হাওয়া বদলাতে না পারলে হাঁপিয়ে ওঠে।...পড়তে

* *Bird Migrants* by ERIC SIMMS.

পড়তে কবির মনে হ'ল, 'মুক্তি' ব'লে যে অবস্থাটা আমরা কল্পনা করি, যার স্বপ্ন সাধুরা দেখেন, প্রতি জীবের মধ্যে এই স্থান-পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা কি সেই মুক্তি-আকাঙ্ক্ষারই আদিম রূপ না কি? যে কোনও পরিবেশেই আমরা বাস করি না কেন, কিছুদিন পরে সেই পরিবেশ যেন কারাগার মনে হয়। একঘেয়েমির কারাগার। তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাণ ছটফট করে। তাই উত্তরমেরুর পাখী চ'লে আসে ভারতবর্ষের নদী-তীরে, আফ্রিকার হাতী গভীর অরণ্য ত্যাগ ক'রে অগভীর বনে বেড়াতে আসে, উরাল পর্বত বা কামস্কাট্‌কা থেকে চ'লে আসে হলদে খঞ্জনের দল ভারতবর্ষের মাঠে। কলকাতার সণ্ট লেকে যে খঞ্জনগুলোকে দেখে এসেছেন, তাদের দোদুল্যমান পুচ্ছভঙ্গীর ছবিটা ফুটে উঠল চোখের সামনে, নূতন দেশে এসে তারা যেন আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে। এই আনন্দই কি মুক্তির আনন্দের আভাস? সত্যিই কি এমন কোন পরিবেশ আছে যা কিছুদিন পরে কারাগার হয়ে ওঠে না, যেখানে নিত্য-নূতনের আবির্ভাব মনকে একঘেয়েমি থেকে বাঁচাতে পারে? চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লম্বা হয়ে শুলেন। শুয়ে শুয়ে আবার পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে ঘুম এসে গেল। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন এল। অদ্ভুত স্বপ্ন। ছেলেবেলার একটা দুপুর হঠাৎ যেন ফিরে এল স্বপ্নে। অতীতের একটা টুকরো সহসা মূর্ত হ'ল চৈতন্যলোকে। স্কুলের সঙ্গী ভুতোকে দেখতে পেলেন। হরিবাবুর বাগানের বেড়ার ধারে সে যেন দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা পেয়ারা। আনন্দবাবু তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, ভুতো, তুই বেঁচে আছিস? আমি খবর পেয়েছিলাম তুই মারা গেছিস কলেরায়। ভুতো কোনও উত্তর দিলে না। মুচকি হেসে পেয়ারাটা দেখালে শুধু। বালক আনন্দমোহন যেন তাকে ধরতে গেলেন। সে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখিয়ে পেয়ারাটার

কামড় দিলে একটা। এই দেখে আনন্দমোহন হোঁচার বেগ বাড়িয়ে দিলেন এবং হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেলেন। ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন, ঘেমে গেছেন, বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। সত্যিই যেন ছুটছিলেন। উঠে ব'সে ভাবতে লাগলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে হঠাৎ ভুতোকে স্বপ্ন-দেখার মানে কি? ভুতোর কথা তিনি তো ভাবছিলেন না, তাকে ভুলেই গিয়েছিলেন। ছেলেবেলার কথাও ভাবছিলেন না, তা হ'লে এ রকম স্বপ্ন দেখলেন কেন? হঠাৎ মনে হ'ল, এও এক রকম ভ্রমণ না কি? আমাদের মনও বোধ হয় ভ্রমণ করে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে— কখনও স্বপ্নে, কখনও কল্পনায়। পাখীরা নূতন দেশে কিছুদিন থেকে যেমন পুরাতন জায়গায় ফিরে আসে, তাঁর মনও বোধ হয় বর্তমানের নূতন পরিবেশ থেকে ফিরে গিয়েছিল অতীতের পরিবেশে, হরিবাবুর বাগানের ধারে ভুতোর কাছে। বিজ্ঞান এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হয়তো অন্য রকম করবে, কিন্তু কবি নিজের ব্যাখ্যাতে নিজেই তুষ্ট হলেন। অন্যমনস্ক হয়ে ভুতোর কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। ভুতো সত্যিই ইহলোকে নেই, কিন্তু সে বেঁচে আছে। অতীত নিগূঢ়ভাবে বেঁচে থাকে। সহসা আর একটা কথাও তাঁর মনে হ'ল, বর্তমানটা প্রবাস, অতীতই যেন স্বদেশ। এ চিন্তা কিন্তু আর বেশী দূর প্রসারিত হ'ল না তাঁর মনে, ট্রেন এসে একটা বড় জংশনে ঢুকল। কলকাতার পর এইটেই প্রথম বড় জংশন, অর্থাৎ বর্ধমান। ভিড় চীৎকার কোলাহল কলরব। একটা নূতন জগতে এসে হাজির হলেন যেন, একটা এঞ্জিন খুব জোরে হুইস্‌ল্‌ দিয়ে উঠল, মনে হ'ল যেন স্পর্ধিত হুঙ্কার ছাড়ছে কোনও অদৃশ্য আততায়ীকে উদ্দেশ ক'রে। কবি কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। উঠে দাঁড়ালেন একবার, মনে হতে লাগল সহসা যেন কোন অপরিচিত বিদেশে এসে পড়েছেন অপ্রত্যাশিতভাবে। অপ্রত্যাশিত আর একটা ঘটনাও ঘটল একটু পরে। স্টেশনের হোটেলের এক

পোশাক-পরা চাপরাসী এসে জিজ্ঞাসা করলে, তিনিই আনন্দমোহন তরফদার কি না, কারণ হাওড়া থেকে তারে খবর এসেছে যে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী মিঃ তরফদারকে যেন খাবার দেওয়া হয়। অমরবাবু ব'লে এক ভদ্রলোক এ জন্য হাওড়ায় টাকা জমা ক'রে দিয়েছেন। কবি অবাক হলেন, তাঁর খাওয়ার দরকার ছিল না তত। কিন্তু দাম যখন দেওয়া হয়ে গেছে, তখন না খেলে লোকসান। কথাটা অমরবাবুর কানে গেলে হয়তো···

···সাড়ম্বরে খাচ্ছিলেন তিনি। মাংসের ঝোলটা বেশ ভালই লাগছিল। ট্রেনে চ'ড়ে ঝড়ের বেগে যে নূতন পরিবেশে হঠাৎ তিনি হাজির হয়েছিলেন, সে পরিবেশের সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিছু আর বিসদৃশ লাগছিল না, মাংসের ঝোলটা খুব ভাল লাগছিল। আপন মনে নিবিষ্টচিত্তে তিনি খেয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটা ঘটনা ঘটল।

"এ কি, তুমি এখানে?"

কবি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, মন্দাকিনী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে তাঁর মামাতো শালা যজ্ঞেশ্বর। কবি বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর সহসা তাঁর মনে পড়ল, এই বর্ধমানের কাছেই তো তাঁর শ্বশুরবাড়ি। এই স্টেশনে নেবে গরুর গাড়ি ক'রে যেতে হয়। মন্দাকিনী এবং তাঁর মামাতো ভাই উঠে প্রণাম করলেন কবিকে।

কবি বললেন, "একটু দরকারে কলকাতা যেতে হয়েছিল। ফিরছি।" তারপর একটু থেমে একবার ঢোঁক গিলে বললেন, "তুমি আসছ তা তো জানাও নি, জানালে আমি—"

"আমি যে আসব তা কি নিজেই জানতাম? রূপচাঁদবাবুর চিঠি পেয়ে আসতে হ'ল।"

মন্দাকিনীর চোখের দৃষ্টিতে একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। কবি ভয় পেয়ে গেলেন একটু।

"ব্যাপার কি? কি লিখেছে রূপচাঁদ?"

"বলছি।"

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা শোনা গেল। মন্দাকিনী তাঁর মামাতো ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "তোর তা হ'লে আর কষ্ট ক'রে যাওয়ার দরকার কি? টিকিট কিন্তু কাটা হয়ে গেছে, নয়?"

"টিকিট ফেরত নেবে।"

"তা হ'লে তোকে আর কষ্ট ক'রে যেতে হবে না। আমার টিকিট দিয়ে তুই না হয় ফিরে যা। আমার জিনিসপত্তরগুলো কোথা?"

"এনে দিচ্ছি—"

যজ্ঞেশ্বর তাড়াতাড়ি নেবে গেল এবং পুঁটলি, ঝোলা, ঝুড়ি, তোরঙ্গ, বিছানার বাণ্ডিল প্রভৃতি নিয়ে এল। গুছিয়ে রেখে দিলে সব নিপুণভাবে। জামাইবাবু যে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন, এতে যেন সে বিশেষ একটা গৌরব বোধ করছিল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল তা।

গার্ডের হুইস্‌ল্ শোনা গেল।

যজ্ঞেশ্বর একখানি ইণ্টার ক্লাস টিকিট সসম্ভ্রমে কবির হাতে দিয়ে বললে, "এই দিদির টিকিট। আমি 'ক্রু'কে ব'লে দিচ্ছি, চেঞ্জ ক'রে দেবে—"

হোটেলের খানসামা এসে প্লেট প্রভৃতি নিয়ে নেবে গেল। যজ্ঞেশ্বরও প্রণাম ক'রে নেবে গেল। ট্রেন ছেড়ে দিলে।

কবি ও মন্দাকিনী পরস্পরের দিকে চেয়ে ব'সে রইলেন।

বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে যা অহরহ ঘটছে কিন্তু যার সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই—ক্ষুদ্র পরিবেশে সেই ঘটনাটা কবির মনে

কৌতুক সঞ্চার করলে একটু। পৃথিবী যে সেকেণ্ডে আঠারো মাইল বেগে ছুটে চলেছে এবং যে কোনও মুহূর্তে যে সেটা চুরমার হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে এ সম্ভাবনা জেনেও আমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকরনা করছি—ঠিক এ কথাটা কবির মনে হ'ল না, কিন্তু দ্রুতবেগে ধাবমান ট্রেনের কামরায় সহসা জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়াতে এ কথাটা তাঁর মনে হ'ল যে, আমাদের প্রত্যাশাটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ব'লে অপ্রত্যাশিতকে আমরা ভাল ক'রে সম্বর্ধনা করি না, মনে মনে তার জন্যে প্রস্তুত থাকি না। সে যখন আসে আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পায়। মন্দাকিনী না এসে যদি একটা শ্যাওলা-ধরা কলসী জানলার ভিতর দিয়ে এসে হাজির হ'ত আর সেই কলসীর ভিতর থেকে দৈত্য না বেরিয়ে যদি মন্দাকিনী বেরিয়ে আসতেন এবং এসে বলতেন যে যাদুকর পি. সি. সরকারের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি আমার গাড়িভাড়াটা বাঁচিয়ে দিলেন—তা হ'লেও কি এর চেয়ে বেশী বিস্ময়কর হ'ত কিছু? কবি লক্ষ্য করলেন মন্দাকিনীর গালে কপালে কালো কালো দাগ হয়েছে কিসের। কিন্তু সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন মনে করলেন না। চুপ ক'রে চেয়েই রইলেন তাঁর মুখের দিকে। মন্দাকিনীও কোনও কথা বললেন না কয়েক মুহূর্ত। তিনি স্বামীর মুখের দিকে এক নজর চেয়েই সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। রূপচাঁদবাবু চিঠিতে যে সব ইঙ্গিত করেছিলেন তা যে মিথ্যা তা কবির মুখভাবের সূক্ষ্ম শুচিতা দেখেই বুঝেছিলেন তিনি। এই সূক্ষ্ম শুচিতার স্বরূপ আর কারও চোখে হয়তো ধরা পড়ত না, কিন্তু মন্দাকিনীর চোখে পড়ল, কারণ এই শুচিতাটুকুর ভিত্তির উপরই তাঁর সমগ্র দাম্পত্য জীবন গ'ড়ে উঠেছিল, সে ভিত্তির স্বরূপ তাঁর কাছে অবিদিত ছিল না, তাতে এতটুকু চিড় খেলে আর কেউ না জানুক তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানতে পারতেন তা কোনও প্রমাণ-প্রয়োগের অপেক্ষা না রেখেই। তবে একটা

কাণ্ড যে কিছু ঘটেছে তাতে সন্দেহ ছিল না, আর খুব সম্ভবত ঘটেছে কবিরই নির্বুদ্ধিতার জন্য বা কোনও কিছু নিয়ে বাহাদুরি করতে গিয়ে—এ রকম ধরনের কাণ্ড তো একবার নয়, অনেকবার উনি করেছেন। একবার তো চাকরিটাই যেত আর একটু হ'লে। ছেলেরা করেছে স্ট্রাইক, ওঁর সর্দারি ক'রে তাদের দলে ভিড়ে যাওয়ার দরকার ছিল না, কিন্তু উনি ভিড়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে থাকাটা ক্রমশ যেন একটা সেতুর মত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই সেতুর উপর দিয়ে মন্দাকিনী যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে, কবির মনে হ'ল।

মন্দাকিনী এর পর যা বললেন, তা কিন্তু কবি প্রত্যাশা করেন নি।

"বড্ড রোগা হয়ে গেছ তুমি। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হয়েছে নিশ্চয়। ঠাকুরটা রাঁধে কেমন ?"

কবি তবু চুপ ক'রে রইলেন। অভিভূত হয়ে কেমন যেন দুর্বল বোধ করতে লাগলেন।

"রূপচাঁদের চিঠি পেয়ে আসছ তুমি। কি লিখেছে রূপচাঁদ ? আমাকে কিছু না জানিয়ে তোমাকে চিঠি লেখবার মানে কি তা তো বুঝতে পারছি না।"

মন্দাকিনী যে প্রশ্ন করেছিলেন এটা ঠিক তার জবাব নয়। নিজেও তিনি বুঝতে পারছিলেন তা, কিন্তু যত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই হোক সব চেয়ে দরকারী কথাটা তিনি যে ব্যক্ত করেছেন, করতে পেরেছেন, এইতেই তিনি যেন আরাম পেলেন একটু, সাহসও পেলেন।

মন্দাকিনীর উত্তর কিন্তু একটুও অপ্রাসঙ্গিক হ'ল না।

তিনি বললেন, "তিনি তোমার বন্ধু ব'লেই লিখেছিলেন। এসব কথা তোমারই উচিত ছিল আমাকে জানানো। তুমি দিনরাত ব'সে

ব'সে কবিতা লিখতে পার, কিন্তু আমাকে দু লাইন চিঠি লিখতে পার না! শঙ্করীকে চিঠি লিখেছিলে? না, তাও লেখ নি?"

মন্দাকিনীর কথার ধাঁচে সেই সাবেক সুর বেজে ওঠাতে আনন্দমোহন আর একটু সাহস পেলেন। সাহস পাবার আর একটা কারণও ছিল। যে সব অস্ত্র চালনা ক'রে মন্দাকিনী তাঁকে কাবু করবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁর মনে হ'ল, সে সব অস্ত্রকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেবার মত একটা অস্ত্র অন্তত তাঁর তূণে আছে। ব্যবহার করলেন সেটি।

"অতবড় জমিদারির ম্যানেজারি করতে করতে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাই না, চিঠি লিখব কখন? তার ওপর খুনের মামলায় ফেঁসে গিয়েছিলাম একটা—"

এইবার মন্দাকিনী আকাশ থেকে পড়লেন এবং প'ড়েই নির্বাক হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। জমিদারির ম্যানেজারি? খুনের মামলা? এসব কি আবার! এসবের বিন্দুবিসর্গ তো তিনি জানেন না! রূপচাঁদবাবুও তো লেখেন নি কিছু! তিনি কেবল লিখেছেন—'আপনি চ'লে আসুন, আনন্দমোহন কাছা-খোলা লোক, আপনি না থাকাতে নানা ভাবে ও নানা রকম কেলেঙ্কারি ক'রে বেড়াচ্ছে, ওকে একদিন থানায় পর্যন্ত ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, অনেক তদ্বির ক'রে জেল থেকে উদ্ধার করেছি আমরা; একটা মেয়েমানুষের নামের সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে যা-তা রটাচ্ছে লোকে।' জমিদারির কথা তো লেখেন নি কিছু।

তাঁর বাক্‌শক্তি যখন ফিরে পেলেন তখন প্রশ্ন করলেন, "কার জমিদারির ম্যানেজারি করছ তুমি?"

"অমরেশবাবুর। মল্লিক মশাইয়ের চাকরি গেছে। আমিই এখন হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার।"

"কি রকম?"

মন্দাকিনীর মুখভাব দেখে কবি খুশী হলেন। এই সংবাদ-

বোমাটি যে মন্দাকিনীর সমস্ত বিরুদ্ধতাকে বিধ্বস্ত ক'রে দেবে এ তিনি জানতেন। কিছুদিন পূর্বে মল্লিক-গৃহিণী মন্দাকিনীকে তাচ্ছিল্যভরে কি একটা বলেছিলেন যার থেকে মন্দাকিনীর মনে ধারণা জন্মেছিল যে, উনি ম্যানেজারের বউ ব'লেই এ ধরনের কথা বলতে সাহস করেছেন। কিন্তু এ ধারণা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল যে, চাকা ঘুরে যেতে পারে এবং তিনিই একদিন ম্যানেজারের বউ হয়ে যেতে পারেন। এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে—এ কথা স্বকর্ণে শুনেও তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। কবিকে নানা রকম প্রশ্ন ক'রে নানা ভাবে কুরে কুরে সম্পূর্ণ খবরটি তিনি যখন জানলেন, বিশেষত যখন টের পেলেন যে এর জন্যে বেশ মোটা মাইনেও পাওয়া যাবে, ইতিমধ্যে হাজার টাকা পাওয়াও গেছে, তখন তিনি উথলে উঠলেন। তাঁর এই উথলে-ওঠা অবস্থা দেখেও কবি কিন্তু আর একটা কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন মনে মনে। শঙ্করীকে, মানে তাঁর মেয়েকে সত্যিই এখনও চিঠি লেখা হয় নি। সেই প্রসঙ্গটা যদি হঠাৎ উঠে পড়ে তা হ'লে কি জবাব দেবেন তিনি। মরীয়া হয়ে ঠিক করলেন, নিজেই প্রসঙ্গটা তুলবেন। বললেন, "ফিরে গিয়েই তোমাকে খবরটা দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু কাজের চাপে নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতা ছুটতে হয়েছিল। শঙ্করীকে পর্যন্ত চিঠি লিখতে পারি নি এখনও। ওই খুনের মকদ্দমাটায় এমন জড়িয়ে ফেলেছিল আমাকে—আমার বিশ্বাস মল্লিক আছে এর ভেতরে।"

দেখা গেল মন্দাকিনীর প্রত্যয় আরও দৃঢ়।

তিনি বললেন, "নিশ্চয় আছে।"

একটা বড় স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল।

মন্দাকিনী একটা ফেরিওলাকে দেখে বললেন, "আমার জন্যে কিছু ফল কেনো তো, আজ আমার ষষ্ঠীর উপোস।"

কবি তাড়াতাড়ি ফল কিনতে লাগলেন।

১২

কবি যথাসময় এসে পৌঁছেছিলেন ঠিক, কিন্তু ডানার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। কবি ব্যস্ত ছিলেন মন্দাকিনীকে নিয়ে—ব্যতিব্যস্ত ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ডানাকেও ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছিল। প্রথমত, চিড়িয়াখানার পাখীগুলোকে নিয়ে, আবার দু-চারটে পাখী ম'রে গিয়েছিল, সে জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল তার। দ্বিতীয়ত, রূপচাঁদবাবু আবার বিব্রত করছিলেন তাকে। আগ্নেয়গিরিশিখর থেকে আবার ধূমোদ্গিরণ শুরু হয়েছিল। কবি টেলিগ্রাম পেয়ে যেদিন কলকাতা চ'লে গেলেন, সেই দিন রাত্রেই রূপচাঁদবাবু এসেছিলেন। অনেক রাত্রে। ডানা তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। ঘুমোয় নি, বই পড়ছিল। রূপচাঁদবাবুর ডাকাডাকিতে উঠে আসতে হ'ল। তাকে দেখেই রূপচাঁদবাবু হাত দুটি জোড় ক'রে বললেন, "প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, তুমি না ডাকলে আর আসব না। কিন্তু আসতে হ'ল, তোমার জন্যেই আসতে হ'ল। একটু আগে তোমার চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে আসছিলাম—মনে হ'ল, তোমার চিড়িয়াখানায় সাপ ঢুকেছে। পাখীগুলো খুব চেঁচামেচি করছে। ফোঁস ফোঁস শব্দও পেলাম দু-একবার। মালীটার কি রাত্রে ওখানে শোবার কথা? ডাকাডাকি ক'রে সাড়া পেলাম না কারও, তাই ভাবলাম তোমাকে অন্তত খবরটা দিয়ে যাই।"

ডানা একটু বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সপ্রতিভভাবে বললে, "ও। কি করা যায় তা হ'লে বলুন তো? মুন্সীর ওখানে শোবার কথা। ঘর রয়েছে তার—"

"আমি তো ডেকে সাড়া পেলাম না কারও। তুমি যদি যেতে চাও, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি—ও, বেগ ইওর পার্ডন, তুমি যে আমার সঙ্গে যাবে না তা মনে ছিল না।"

"আমি গিয়েই বা কি করব? সাপ মারা তো আমার সাধ্যে কুলবে না। আচ্ছা, আমি দেউড়িতে খবর পাঠাচ্ছি, সুখন পাঁড়ে যা পারে করুক।"

"বেশ, আমি চললাম তা হ'লে।"

রূপচাঁদ চ'লে গেলেন কিছুদূর। তারপর ফিরে এলেন আবার। এসে যা বললেন, তা অপ্রত্যাশিত নয়, ওই রকমই একটা কিছু প্রত্যাশা করেছিল ডানা।

"সেদিন ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ যে কাজটা ক'রে ফেলেছি, তার জন্যে এখনও কি ক্ষমা কর নি আমাকে? ভগবানও শুনেছি পাপীকে ক্ষমা করেন, তুমি কি তাঁর চেয়েও নিষ্ঠুর?"

প্রত্যুত্তরে অনেক কিছু বলা চলত, কিন্তু ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। রূপচাঁদ দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড, তারপর তিনিও ভিতরে উঠে গেলেন।

বললেন, "ডানা, এমন অবুঝের মত ব্যবহার তোমার কাছে আশা করি নি। তুমি সত্যিই যদি আমার নিতান্ত স্বাভাবিক আচরণে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাক, স্পষ্ট ভাষায় সেটা জানিয়ে দিতে তোমার সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয়। তোমার এই সঙ্কোচ দেখে আমার আশা হচ্ছে যে, আমার সেদিনকার ব্যবহারে সত্যিই হয়তো তুমি তত রাগ কর নি।"

এর উত্তরে ডানা যে কথা যে সুরে বললে, তা তার নিজের কানেই অত্যন্ত নরম শোনাল। সে বলতে চাইছিল, 'এই মুহূর্তে আপনি বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে' বা ওই ধরনের একটা রূঢ় কিছু। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অনুনয়ের সুর—"কেন আপনি আমাকে এ ভাবে জ্বালাতন করছেন রূপচাঁদবাবু?"

"এটাকে জ্বালাতন মনে করছ কেন তুমি? অভিনন্দন এটা, পুরুষের অকৃত্রিম অভিনন্দন প্রকৃতির উদ্দেশে। আচ্ছা, সত্যিই তুমি বিরক্ত হয়েছ?"

"আমার সেদিনের আচরণ থেকে তা কি স্পষ্ট হয় নি?"

"না। সেদিন তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে, কিন্তু পালিয়ে যাওয়াটা অনেক সময় আমন্ত্রণেরই নামান্তর। পুরুষের শক্তি বা আগ্রহকে মাপবার মাপকাঠি ওটা অনেক সময়ে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তোমরা অনেক সময় ব্যবহার কর ওটা—বড় বড় প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলেন।"

"আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। মানুষের বিচার প্রাণীদের নিয়ম দিয়ে হয় না। প্রাণীরা প্রকৃতির কারাগারে বদ্ধ জীব। মানুষ সে কারাগার ভেঙেই মনুষ্যত্ব অর্জন করেছে। কামনার দাসত্ব করা প্রাণীদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে, মানুষের পক্ষে নয়। অন্তত আমার পক্ষে নয়।"

"আমাকে কি তা হ'লে তুমি অমানুষ ব'লে মনে কর?"

"আপনার স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা আমি কোনদিন করি নি। করবার ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই। এইটুকু শুধু বুঝেছি, আপনি যে পথে চলতে চান সে পথে আমি চলতে চাই না। সম্ভবত আপনার স্ত্রীও চান না।"

কথাটা ব'লেই ডানার মনে পড়ল, বকুলবালা মানা ক'রে দিয়েছিল রূপচাঁদবাবুকে তার কথা বলতে।

"আমার স্ত্রীর কথা জানলে কি ক'রে তুমি?

"শুনেছি।"

"কি শুনেছ?"

"শুনেছি তিনি সতী।"

"কে বললে তোমাকে?"

"ঠিক মনে নেই। আশা করি সংবাদটা মিথ্যে নয়।"

"কিন্তু তিনি আমার পথে চলতে চান না—এ খবরটা তো তাঁর কাছ থেকে ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এ খবরটা পেলে কোথা?"

"ওটা আমার অনুমান। আর খুব সম্ভবত সত্য অনুমান। তিনি সত্যিই যদি সতী হন, তা হ'লে আপনার পথে চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।"

রূপচাঁদ হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

"এ দেশের সতী স্ত্রীরা স্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্যে সব কিছু করতে পারে। সতী স্ত্রী পঙ্গু স্বামীর লালসা চরিতার্থ করবার জন্যে তাকে কাঁধে ক'রে বেশ্যা-বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে—এ গল্পও প্রচলিত আছে এ দেশে।"

"হয়তো আছে। কিন্তু ও-গল্পের মূলে আর একটা জিনিস আছে, সেটাকে উপেক্ষা করবেন না। ওতে স্বামীর অকপটতাও প্রকাশ পেয়েছে। স্বামী অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর লালসার কথা স্ত্রীর কাছে, শিশু যেমন মায়ের কাছে অকপটে ব্যক্ত করে তার সন্দেশলোলুপতা। লুব্ধ অসহায় পঙ্গু স্বামীর তুচ্ছ সাধ মেটাবার জন্যে হয়তো করুণাময়ী সতী স্ত্রী তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন বেশ্যালয়ে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার আচরণের মিল কোথায়? আপনি কি আপনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন আপনার স্ত্রীর কাছে? আমার বিশ্বাস, করেন নি। আপনি যা করেছেন, তা চোরের মত করছেন। আপনার লোলুপতায় শিশুর সারল্য নেই, আছে অতি জঘন্য ভণ্ডামি। যান, বাড়ি যান। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।"

রূপচাঁদ তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো শ্বাপদের চোখের মত জ্বলতে লাগল। নাসারন্ধ্রযুগল বিস্ফারিত হ'ল একটু। কিন্তু যে কথাগুলি তিনি বললেন, তাতে উষ্মার আভাস পাওয়া গেল না।

"তুমি আমার নিখুঁত ছবি এঁকেছ; তোমার অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করছি। কিন্তু একটু খটকা লাগছে। তুমি আমাকে এতটাই যদি

বুঝেছ তা হ'লে আমাকে এতদিন প্রশ্রয় দিয়েছ কেন, আর প্রশ্রয়ই যদি দিয়েছ তা হ'লে মাঝপথে থামছই বা কেন ?”

“আমি আপনার কথার উত্তর দেব না। আপনি বাড়ি যান।”

ঠিক এই সময়ে চাকরটা না এসে পড়লে কি হ'ত বলা শক্ত। চাকরটার আগমনে রূপচাঁদ বিব্রত হয়ে পড়লেন একটু, সে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

“মাইজী, মুন্সী এসেছে।”

“এতক্ষণে তা হ'লে ঘুম ভেঙেছে যাদুর। আচ্ছা, আমি চললাম। আবার আসব পরে—”

রূপচাঁদ বেরিয়ে গেলেন।

মুন্সী এগিয়ে এসে সেলাম ক'রে প্রশ্ন করলে, মাইজী কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

“আমি তো ডেকে পাঠাই নি।”

“রূপচাঁদবাবুই তো একটু আগে ডাকছিলেন আমাকে। আমি বেরিয়ে এসে দেখলাম তিনি এই দিকেই আসছেন, তাই মনে হ'ল আপনিই বোধ হয় ডেকে পাঠিয়েছিলেন।”

“না, আমি ডাকি নি। রূপচাঁদবাবু চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে আসতে আসতে শুনেছিলেন যে, পাখীগুলো চীৎকার করছে, সাপের ফোঁস ফোঁস আওয়াজও পেয়েছিলেন তিনি, তাই তোমাকে ডাকছিলেন। চিড়িয়াখানার সব ঠিক আছে তো ?”

“ঠিক আছে। অনেক পাখী তো রাত বারোটার সময় রোজই ডেকে ওঠে। সাপের আওয়াজ তো পাই নি। অমন ঘন জালের বেড়ার মধ্যে সাপ ঢুকবেই বা কি ক'রে ?”

“তুমি চিড়িয়াখানার চারিদিকে ফিনাইল ব্লিচিং পাউডার দাও তো ?”

“রোজ দু বেলা দি মাইজী।”

“নতুন যে প্যাঁচাটাকে আজ এনেছ, সেটা খেয়েছে কিছু ?”

"একটা ইঁদুর খেয়েছে।"

"আচ্ছা, যাও তুমি। আমি কাল সকালে যাব।"

মুন্সী চ'লে গেল, চাকরটাও শুতে গেল নিজের ঘরে।

ডানা বিছানায় শুয়ে আবার আগের মতন পড়তে শুরু করল।

ভাবতে চেষ্টা করল, যেন কিছু হয় নি। রত্নপ্রভার কথাগুলো মনে পড়ল—ও কিছু নয়, সুন্দরী মেয়ে দেখলে সব পুরুষেরই একটু-আধটু মতিভ্রম হয়, ওতে ভয় পেয়ো না। ডানা ভয় পায় নি। কিন্তু এটা সে ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করছিল যে, রূপচাঁদ-সমস্যার একটা ভদ্র সমাধান করতে না পারলে তাকে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ ক'রে যাবে কোথায়? কে তাকে আশ্রয় দেবে? খুঁজলে হয়তো আশ্রয় কোথাও মিলবে, কিন্তু তার জন্যে যে প্রাথমিক প্রয়াস প্রয়োজন তা করবার শক্তি তার আছে কি? খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অনেকগুলো দরখাস্ত সে করেছিল। সন্তোষজনক কোনও জবাব আসে নি। দু-এক জায়গা থেকে ইণ্টারভিউ করবার জন্যে ডেকেছিল, কিন্তু ডানা যায় নি। তার মনে হয়েছিল, চাকরিই যদি করতে হয় তা হ'লে এর চেয়ে ভাল চাকরি পাওয়া যাবে না আপাতত। অমরেশবাবু বা রত্নাপ্রভাকে মনিব ব'লে মনে হয় না কখনও, তাঁরা যেন আত্মীয়। হঠাৎ বিস্মিত হয়ে গেল ডানা একটু। নিজের ভবিষ্যতের কথা এমন ভাবে কেন ভাবছে সে? এ ভাবনার কোনও কূল-কিনারা তো নেই। সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তিনি একদিন বলেছিলেন—"কাজ কর, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ক'রো না। নির্বিকার হয়ে যদি কাজ করতে পার, তা হ'লে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাবে। আমি এটা করেছি, আমি ওটা করেছি, এ কাজটা ভাল, ও কাজটা মন্দ, কাজ করবার বদলে আমি এ চাই ও চাই—এই সব অহংচিন্তাকে যদি প্রশ্রয় দাও, তা হ'লে দুঃখের শেষ থাকবে না। এ কথা নূতন নয়, চির পুরাতন। কিন্তু পুরাতন ব'লেই পরিত্যাজ্য নয়, দুঃখ থেকে মুক্তি

পাবার ওটা একটা পরীক্ষিত পথ।"...ডানা ভাবতে লাগল, নির্বিকার হয়ে কাজ করা কি সম্ভব? আমি কাজ করব অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা করব না—এই বা কেমন ধারা কথা? ভাল কাজ, মন্দ কাজ—দুইই সমান ব'লে মনে করা যায় কি। তা হ'লে ওই কামুক রূপচাঁদের বাহুপাশে ধরা দেওয়া আর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করায় কোন তফাত নেই? ডানার মনে হ'ল, সন্ন্যাসীর যুক্তি হয়তো ঠিক অনুসরণ করতে পারে নি সে। কাল গিয়ে পুরাতন প্রসঙ্গটা আবার একবার তুলতে হবে। সন্ন্যাসীকে ধরাই কিন্তু শক্ত। প্রায়ই তো বাসায় থাকেন না। ডানা বইটাতে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করলে আবার। বিলেতের এক স্কুলের হেডমাস্টার মিস্টার প্যাট্রিজ (E. H. Patridge) লিখেছেন বইখানা। এ বইটাতে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, ভারতবাসীর পক্ষে তা খুব নূতন কথা নয়। বর্তমান যুগের যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব ও-দেশের মানুষকে প্রকৃতির কাছ থেকে যতটা বিচ্ছিন্ন করেছে, আমাদের দেশে এখনও ততটা করে নি, কারণ আমাদের দেশে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব এখনও তেমন প্রবল হয় নি, যদিও আমরা কামনা করছি—প্রবল হোক। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর। প্যাট্রিজ সাহেব বলছেন যে, যদিও বর্তমান যুগের টেকনিক্যাল শিক্ষাকে উপহাস করা বা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, তা করতে যাওয়া যুক্তিযুক্তও নয়; কিন্তু তবু এ কথা ভুললে চলবে না, টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে অতি-প্রবণতা আমাদের ক্রমশ অমানুষ ক'রে ফেলেছে—আমাদের সমাজ-বন্ধন শিথিল করছে, আমরা আদর্শ পিতা-মাতা হতে পারছি না, আদর্শ ভাই-বোন হতে পারছি না, আদর্শ বন্ধু-আত্মীয় হতে পারছি না, আদর্শ দেশসেবকও হতে পারছি না। ওসব হতে হ'লে বুদ্ধিবলের চেয়ে চরিত্রবল থাকা বেশী দরকার। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা আমাদের স্বার্থ-বুদ্ধিতেই শান দিচ্ছে

কেবল, স্বার্থপর ক'রে তুলছে আমাদের। আমরা এর ফলে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছি, জীবনটাকে ভাল ক'রে ভোগও করতে পারছি না। টাকা রোজগার করছি কিন্তু সুখী হচ্ছি না, জীবনটাই ক্রমশ যেন বিস্বাদ হয়ে আসছে। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনের পরিপূর্ণ রূপ-রস থেকে বঞ্চিত হয়েছি আমরা। এমন অবস্থা হয়েছে, যাঁরা বয়স্ক তাঁরা জীবনের পরিপূর্ণ রূপ দেখতে চান না, ভয় পান। যারা শিশু বা কিশোর-কিশোরী তারা এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। সুতরাং প্যাট্রিজ সাহেবের অভিমত, নানা ছুতোয় প্রকৃতির সংস্পর্শ লাভ কর। আমরা এই যে একপেশে জীবন যাপন করছি, এ জীবন অসম্পূর্ণ, তাই আমরা অসুখী। ডানার মনে হ'ল, প্যাট্রিজ সাহেবের প্রকৃতি সম্পূর্ণ জীবনের যে শিক্ষা আমাদের দেবে, তাও কি আমাদের কাম্য? প্রকৃতিলালিত বর্বর মানুষ এখনও আছে পৃথিবীতে, তারা প্রকৃতিকে চেনে, প্রকৃতির ভাষা বোঝে, তার প্রতিটি ইঙ্গিতের অর্থ তাদের নখদর্পণে, আমরা কি তাই হতে চাই? প্যাট্রিজ সাহেব তা চান না, কিন্তু তিনি প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে চান। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ডানা। ভারতবর্ষের দর্শনেও প্রকৃতির উল্লেখ আছে। সন্ন্যাসী সেদিন বলেছিলেন, প্রকৃতি অব্যক্ত, নিষ্ক্রিয়, সত্ত্ব রজ তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যভাব। ঠিক বুঝতে পারে নি কথাটা। আর একদিন গিয়ে বুঝে নিতে হবে। বইটা আবার পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু আর ভাল লাগল না। আলো নিবিয়ে পাশ ফিরে শুল। সন্ন্যাসীর কথাই মনে পড়তে লাগল কেবল। স্বপ্নেও দেখা দিলেন সন্ন্যাসী।

খুব ভোরেই কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল ডানার। তখনও অন্ধকার কাটে নি। উঠে বসল সে বিছানার উপর। ব'সেই মনে হ'ল, শরীরের ক্লান্তি একটুও দূর হয় নি। সমস্ত রাত সে কেবল চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে প'ড়ে ছিল, সত্যিকার ঘুম আসে নি। একটা

অস্বস্তি সারা মন জুড়ে রয়েছে। ঘরের ভিতর সাপ ঢুকেছে খবর পেলে যে ধরনের অস্বস্তি হয় অনেকটা তেমনি। রূপচাঁদই কি এর একমাত্র কারণ? না, অন্য কিছু? চিড়িয়াখানার বন্দী পাখীগুলো? তাদের অসহায় অবস্থা গোড়া থেকেই পীড়া দিচ্ছে তাকে। পাখীগুলোকে দেখে মাঝে মাঝে রাজবন্দীদের কথা মনে পড়ে, যাদের বিরুদ্ধে কোনও দোষ প্রমাণ করা যায় নি, এমন কি যাদের বিচারালয়ে বিচার পর্যন্ত হয় নি, তাদের চেয়েও নিরপরাধ এই পাখীগুলো। একটা বড়লোকের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য তাদের বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে আর তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তার পাহারাদার। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাকে এই নিষ্ঠুর কর্ম বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে ব'লেই কি এই অস্বস্তি? আবার তার মনে হ'ল, তার নিজের টাকা যদি থাকত কিছু, তা হ'লে সে বোধ হয় এমন অশান্তি ভোগ করত না। নির্ভরযোগ্য কোন নিজের লোকও যদি থাকত কেউ!...হঠাৎ একযোগে সমস্ত পাখীগুলো ডেকে উঠল। ফরসা হয়ে এল বোধ হয়। ঘোর গ্রীষ্মেও সে সাহস ক'রে জানলা খুলে শুতে পারত না। দু-একদিন চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। শুধু রূপচাঁদের ভয় নয়, সে ভয়ও অবশ্য ছিল খুব, কিন্তু অন্য ভয়ও ছিল—বিশেষ ক'রে সাপের ভয়। গঙ্গার ধারে প্রায়ই বড় বড় সাপ বের হয়। কপাট খুলে বেরিয়ে এল সে। চাকরটাকে উঠিয়ে দিলে চা করবার জন্য। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দেখলে যে, অত ভোরেও একটা দোয়েল এসে নদীর ধারে পোঁতা উঁচু বাঁশের ডগাটার উপর ব'সে পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে গান শুরু ক'রে দিয়েছে। পূর্বাকাশ উষারাগরঞ্জিত। মনে হ'ল, ও যেন পাখী নয়, বৈদিক যুগের কোনও ঋষি, উষাদেবীকে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছে স্বতঃ-উৎসারিত সঙ্গীতের মন্ত্র দিয়ে। বহু উষাকে অনুসরণ ক'রে যে নূতন উষা আজ এসেছে, অনন্তের যাত্রাপথে চলতে চলতে কিছুক্ষণের জন্য যে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর

পূর্বতোরণে, তার সম্বন্ধে আর সবাই উদাসীন, কিন্তু ওই দোয়েল নয়। অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। সমস্ত পৃথিবীর হয়ে ওই ক্ষুদ্র পাখীটি যে কর্তব্য পালন করছে, তার জন্য তার অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু একটু পরেই তাকে চমকে উঠতে হ'ল আর একটা পাখীর ডাকে, যেন সুরের ছোট্ট তুবড়ি ছুটিয়ে উড়ে চ'লে গেল একটা টুনটুনি পাখী। তার পরই পাশের পুটুস ফুলের ঝোপটাতে টিক-টিক-টিক শব্দ ক'রে খুব ছোট একটা পাখী তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। দরজি পাখী কি? বেশীক্ষণ ভাববার অবসর কিন্তু পেলে না, এক জোড়া ঘুঘু তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে। পাশাপাশি এসে বসল তারা অশ্বত্থগাছের কাঠের বাক্সটার উপর। এই বাক্সটা অমরেশবাবু টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যদি কোনও পাখী ওতে বাসা বাঁধে এই আশায়। কোনও পাখী এখনও পর্যন্ত বাঁধে নি। ঘুঘু পাখী দুটোকে বসতে দেখে ডানার একটু আশা হ'ল, বাসা বাঁধবে কি ওরা? পর-মুহূর্তেই কিন্তু উড়ে গেল পাখী দুটো। উড়ে অনেক দূর চ'লে গেল। অনেক গাছে অনেক বাক্স টাঙিয়ে দিয়ে গেছেন অমরেশবাবু—অনেক রকম আকারের বাক্স, কিন্তু এক ওই তালগাছে-টাঙানো বাক্সটায় ছাড়া অন্য কোনও বাক্সে কোনও পাখী বাসা বাঁধে নি। মানুষকে পাখীরা এখনও তত বিশ্বাস করে না। ওই বাক্সগুলোকে তারা ফাঁদ ভাবছে। বাক্সগুলোর অভিনবত্ব যখন লোপ পাবে, পুরনো হয়ে যাবে ওগুলো যখন, প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যাবে, তখন হয়তো ওগুলোতে বাসা বাঁধবে পাখীরা। অভিনবত্বকে ওরা ভয় করে, অভিজ্ঞতার ধোপে না টিকলে ওরা কোনও জিনিসকে গ্রহণ করে না। মানুষের মত দ্রুত আধুনিক হওয়ার দিকে ওদের প্রবণতা কম। অনেক বিদেশী বিজ্ঞানী পাখীদের আধুনিক ক'রে তোলবার চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য বৈঠকখানা বাসা প্রভৃতি বানিয়ে দিচ্ছেন, এক ভদ্রমহিলার

টাইপ-রাইটারের উপর ছোট্ট একটি পাখীর ছবিও সে একবার দেখেছিল অমরেশবাবুর একখানা বইয়ে; কিন্তু ওই বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করেছেন যে, পাখীদের বিশ্বাস উৎপাদন করানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ডানার এ চিন্তাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পেল না একদল শালিকের চীৎকারে। একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে দেখতে হ'ল, শালিকগুলো চেঁচাচ্ছে কেন! দেখল, একটা নেউল বেরিয়েছে। তাকে দেখেই নেউলটা ঢুকে পড়ল একটা ঝোপে। তার পরই চোখে পড়ল, সন্ন্যাসী চর থেকে ফিরছেন। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপরই মনটা অস্বস্তিতে ভ'রে উঠল আবার। যতক্ষণ পাখীদের নিয়ে মন নিযুক্ত ছিল ততক্ষণ নিজেকে সে ভুলে ছিল, সন্ন্যাসীকে দেখেই নিজের কথা মনে হ'ল। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল সন্ন্যাসীর উপর একটু অভিমান তার মনের প্রত্যন্তলোকে সঞ্চিত হয়েছে। আবিষ্কার ক'রে সে একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল নিজের কাছেই। সন্ন্যাসী তো তার সঙ্গে কোনদিন কোনও অভদ্র ব্যবহার করেন নি, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কই বা কতটুকু, কোনও দাবিই তো নেই, তবে অভিমান কেন? অভিমানকে প্রশ্রয় দেবার জন্য সামান্য একটু প্রেমের সম্পর্ক থাকা দরকার—তা সে সম্পর্ক যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেটুকু সম্পর্কও তো তার হয় নি। সন্ন্যাসী ইচ্ছা করলে হয়তো হতে পারত, কিন্তু সন্ন্যাসী সে ইচ্ছা করেন নি। বরং বিপরীত ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন তিনি, নারীসঙ্গ তিনি পরিহার করতে চান। ডানার মনে হ'ল, এই জন্যই অভিমান হয়েছে তার। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে মনে মনে সে কি যেন একটা প্রত্যাশা করেছিল, ঠিক যে কি সে সম্বন্ধে যদিও স্পষ্ট কোন ধারণা নেই তার, কিন্তু প্রত্যাশা একটা ছিল মনে মনে, এখনও আছে। সে যেন মনে মনে নির্ভর ক'রে আছে ওই অজ্ঞাতকুলশীল লোকটির উপর, তার নিভৃত অন্তরবাসী সত্তাটির দৃঢ় প্রত্যয়—ওই লোকটিই সত্য পথের সন্ধান পেয়েছেন, ইচ্ছে করলে

তারও সমস্যার সমাধান করতে পারেন, কিন্তু করছেন না। এই জন্যই অভিমান হয়েছে বোধ হয়। আর একটা কারণও সম্ভবত আছে, যদিও সেটা নিজের কাছে এতদিন স্বীকার করতে বেধেছে তার। কিন্তু প্রশান্ত প্রভাত-আলোকে সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার মনে। সে বুঝতে পারল যে, তার অহঙ্কার ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লেই রাগ হয়েছে; এও সে বুঝতে পারল সন্ন্যাসীর দুর্নমনীয় সংযমকেও তার নারী-প্রকৃতি সুচক্ষে দেখছে না, মনে হচ্ছে ওটা একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বা পরিখা যা তাকে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে। মনে পড়ল আর একটা ভোরের কথা। সে দিন সে রূপচাঁদের ভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সন্ন্যাসীর ওই ভাঙা ঘরটাতে। সন্ন্যাসী ঘরে ছিলেন না, একটু পরে ফিরে এসে যা যা বলেছিলেন, তা এখনও মনে আছে তার। একটা কথা বিশেষ ক'রে মনে আছে—"পালিয়ে আসার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব নেই। পালিয়ে এলে তো তার কাছেই নতি-স্বীকার করা হ'ল।" সে তো সবার কাছ থেকেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এমন কি ওই সন্ন্যাসীর কাছ থেকেও। কে কি বলবে, পাছে সন্ন্যাসী কিছু মনে করেন, এই সব ভেবে সে সন্ন্যাসীর সঙ্গ এড়িয়ে এসেছে, ইচ্ছে থাকলেও যায় নি তাঁর কাছে। ইচ্ছে করলে সে কি ঘনিষ্ঠ হতে পারত না? তার ঘনিষ্ঠতা কি উপেক্ষা করতে পারতেন উনি? তার যে আকর্ষণী শক্তি আছে এর অনেক প্রমাণ পেয়েছে সে জীবনে। অমরেশবাবু, আনন্দবাবুর মত লোকও আকৃষ্ট হয়েছেন তার প্রতি। রূপচাঁদ তো হয়েইছেন।···হঠাৎ অনেক দিন পরে আবার মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরী আর ভাস্কর বসুর কথা। এরা দুজনেও আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রতি। রিসার্চ-স্কলার ভাস্কর বসুকে তার নিজেরও ভাল লেগেছিল। জাপানীরা বোমা ফেলে যদি রেঙ্গুন বিধ্বস্ত ক'রে না দিত, তা হ'লে হয়তো ভাস্কর বসুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যেত। কথাবার্তা তো প্রায় ঠিকই হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেছে। সৌম্যদর্শন ভাস্কর বসুর মুখটা মনের উপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। কোথায় আছে এখন সে? বেঁচে আছে কি? তার মন কিন্তু ভাস্কর বসুকে নিয়ে, অতীতকে নিয়ে বেশীক্ষণ থাকতে চাইল না, সন্ন্যাসীই এসে মনটা জুড়ে বসলেন আবার। সন্ন্যাসী ক্রমশ এগিয়ে আসছিলেন তার দিকে, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ ছিল ভূমিতে। তাঁর ভূমিনিবদ্ধ দৃষ্টি ডানার অহঙ্কারকে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল যেন। ডানা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করছিল, উনি চোখ তুলে চাইবেন এবং তাকে দেখে মৃদু হেসে বলবেন কিছু। কিন্তু উনি সে সব কিছুই করলেন না, ওঁর বাইরে যে একটা জগৎ আছে সে জগতের সম্বন্ধে উনি যেন সচেতনই নন মনে হ'ল। নিজের ভাঙা ঘরের মধ্যে যখন তিনি ঢুকে পড়লেন, তখনও ডানা দাঁড়িয়ে রইল। তারও চোখে বাইরের পৃথিবী লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য, সমস্ত অন্তর সন্ন্যাসীময় হয়ে গিয়েছিল। চাকরটার ডাকে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল।

"চা ভিজিয়ে দিয়েছি মা, আপনি আসুন।"

"ভিজিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি ভেজাতে গেলে কেন? আমাকে ডাকলেই পারতে। ভেজাবার আগে টী-পট্‌টা গরম জলে ধুয়ে নিয়েছিলে তো?"

"নিয়েছিলাম। ভরতি ভরতি দু চামচ চা দিয়েছি।"

"দুধটা গরম করেছ?"

"করেছি।"

নিরর্থক জেনেও চাকরের সঙ্গে উপরোক্ত আলাপ সে করল নিজেকেই কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকবার বাসনায়। কিছুতেই সে যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না, কি করলে সে আর পাঁচজনের মত বেশ সহজ হতে পারবে। ত্রিশঙ্কুর মত

কতদিন আর সে কাটাবে এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে? চা খেতে খেতে সে ঠিক করলে, ওই সন্ন্যাসীর কাছেই সে পরামর্শ চাইবে আর একবার গিয়ে। তাঁকে গিয়ে বলবে, আপনি দয়া ক'রে আমাকে একটা সহজ পথ ব'লে দিন। আপনার আধ্যাত্মিক উপদেশ অত্যন্ত ধোঁয়াটে মনে হয়, ঠিক বুঝতে পারি না। যতটুকু পারি ততটুকুও অনুসরণ করতে পারি না। কখনও মনে হয় হাস্যকর, কখনও মনে হয় অসম্ভব। সেদিন উঞ্ছবৃত্তির কথা বলছিলেন, এ যুগে ব্যাপারটা কি বেমানান নয়? মনে মনে সন্ন্যাসীকে সামনে বসিয়ে মনে মনেই কথাগুলো বললে সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার মনে। কি ছুতোয় সে যাবে তাঁর কাছে? তাঁর দিক থেকে আমন্ত্রণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও তো সে পায় নি কোনদিন। এমন ভাবে যাওয়াটা কি শোভন? কথাটা আগেও মনে হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে না গিয়ে পারে নি। এর কারণ সন্ন্যাসীর কাছে গেলে ভাল লাগে, তাঁর সান্নিধ্যে এমন একটা কি জিনিস আছে যা অনির্বচনীয়, যার অপরূপত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। সন্ন্যাসীর কাছে নিজের সমস্যার কথা সে তো পেড়েছিল কয়েক দিন আগে, সন্ন্যাসী বিরক্ত হন নি। বলেছিলেন, যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। কিন্তু সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে ভাবনাকে একটা বিশেষ পথ অনুসরণ করতে হবে। সেই পথের কথাই জিজ্ঞাসা করবে এবার গিয়ে। একটা নির্দিষ্ট মীমাংসায় উপনীত হয়ে তার মন যেন একটু শান্ত হ'ল।

পর-মুহূর্তেই চাকরটা এসে বললে, "কাল দুপুরে যখন আপনি বাইরে গিয়েছিলেন, তখন পিয়ন এসে ওই পার্সেলটা দিয়ে গেছে। আপনি রসিদ সই ক'রে দিন, পিওন এসে আজ নিয়ে যাবে।"

খুব ছোট একটা পার্সেল রত্নপ্রভা পাঠিয়েছেন। ডানা খুলে দেখলে, তার মধ্যে একটা চাবি রয়েছে আর একটা চিঠি।—

ডানা,

আমাদের লাইব্রেরি-ঘরের চাবিটা তোমাকে পাঠালাম। মাঝে মাঝে গিয়ে বইয়ের শেল্‌ফ্‌গুলোর একটু তদারক ক'রো। অনেক সময় উই লাগে। কোনও বই যদি পড়তে ইচ্ছে কর, প'ড়ো। তুমি যদি আমাদের বাড়িতে এসে থাকাই স্থির কর, সুখন পাঁড়েকে বললেই সে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। তাকে ব'লে এসেছি। তুমি যে সব ভয় করছ তা অলীক। আমি যতটা করবার ক'রে এসেছি। কোনও ভয় নেই। পাখীগুলোর খবর দিও মাঝে মাঝে। কাল আমরা সিমলা যাচ্ছি। সেখানকার ঠিকানা গিয়ে পাঠাব। বকুলবালার জন্যে একটা এ-বছরের হলদে পাখী কিনেছি টেরেটি বাজার থেকে। কারও সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। আগে থাকতে তাকে ব'লো না যেন কিছু। পেঁ ছলে তারপর খবর দিও। আশা করি, ভাল আছ। ভালবাসা নিও। ইতি রত্নপ্রভা

মুক্তোর মত গোটা গোটা অক্ষরগুলোর দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর উঠে পড়ল। নূতন ধরনের একটা কাজ পেয়ে বেঁচে গেল যেন সে। ঠিক করলে, আগে লাইব্রেরিতে যাবে, তারপর চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানা যাবার পথে খোঁজ নিয়ে যাবে সন্ন্যাসীর। একটা সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ঠিক হয়ে যাওয়াতে তার মনের অস্বস্তি ভাবটা কেটে গেল।

লাইব্রেরিতে গিয়ে নূতন একটা জগৎ আবিষ্কার করলে সে। তাদের বাড়িতেও বেশ বড় লাইব্রেরি ছিল, কিন্তু তাতে ছিল প্রধানত আইনের বই। যখন কলেজে পড়ত, তখন কলেজ-লাইব্রেরির বই সে নিত মাঝে মাঝে। প্রায়ই কাজের বই নিত, পড়ার বই বা যে সব বই পড়লে পরীক্ষা পাস করবার সুবিধা হয় সেই সব বই। তার সঙ্গে আনন্দের বিশেষ কোনও যোগ ছিল না, কলেজ-লাইব্রেরিতে কি কি বই আছে তা নিয়ে কোনও দিন মাথা ঘামায় নি সে।

অমরেশবাবুর ছোট্ট লাইব্রেরিটি কিন্তু তাকে অনাস্বাদিতপূর্ব এক আনন্দের সন্ধান দিলে। তার অবলম্বনহীন ক্ষুধিত মন যেন একসঙ্গে অবলম্বন এবং খাবার পেয়ে গেল নানা রকম। কত রকম বই। পাখীর বই-ই যদিও বেশী ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, ইংরেজী বাংলা নানা রকম মাসিক পত্র, গ্রীক নাটকের একটা পুরো সেট, ইংরেজী নভেল, বাংলা নভেল, নক্ষত্রের বই, পাকপ্রণালী, ইতিহাসের বই দু-চারখানা, কয়েকটা অভিধান—নানা রকম বই রয়েছে। ডানা একটা চাকরকে দিয়ে ঘরের জানলাগুলো খুলিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে ফেললে। পরিষ্কার করাবার সময় একটা খাতা বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। সাধারণ একসারসাইজ বুক। উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা—'পক্ষীপর্যবেক্ষণ বাই গণেশ'। খাতা খুলে আরও অবাক হয়ে গেল ডানা। চণ্ডীর বন্ধু গণশার খাতা, গত বছরের ডায়েরির মত, সম্ভবত অমরেশবাবুর উৎসাহে পাখী দেখতে উৎসাহিত হয়েছিল গণেশ। যা যেমন দেখেছিল, লিখে রেখেছে।

১লা কার্তিক, ১৩৫৬ : বেনেবউ পাখীর ডাক শোনা গেল, সকাল প্রায় আটটা নটার সময়। প্রায়ই দেখতে পাচ্ছি পাখীগুলোকে। একটা আর একটার পিছনে তাড়া করছিল। একটা ফিঙে ডাকছিল, চমৎকার মিষ্টি ডাক, প্রায় নটা দশটার সময়।

২রা কার্তিক : আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনতে পেলাম কোকিলেরা ডেকে উঠল। তার একটু পরে—প্রায় ছটার সময়—একটা দোয়েলের শিস শুনতে পেলাম। বেরিয়েই কিন্তু দেখতে পেলাম কয়েকটা গোশালিককে। দোয়েলটাকে দেখা গেল না। আর একটা ছোট্ট পাখী দেখলাম—টোইট্ টোইট্ টোইট্ এইরকম ডাকছে। ওই কি দরজি পাখী। অনেক রকম পাখী দেখলাম আজ। টিয়া এক ঝাক, একটা বেনেবউ, কয়েকটা গেছো-ভরত—অমরেশবাবু এদের ইংরেজী নাম বলেছিলেন ট্রি-পিপিট,

হলদে খঞ্জন একটা, চিল, বুক-সাদা মাছরাঙা ; বসন্তবউরির ডাকও শুনলাম ; স্যাকরা পাখীও (ছোট বসন্তবউরি) ডাকছিল—টংক, টংক, টংক।

৩রা কার্তিক : একটা ঘুঘু ঠিক আমাদের চালের উপর ব'সে ডাকছিল আজ ভোরে।

৪ঠা কার্তিক : কোকিল, ঘুঘু।

৫ই কার্তিক : তেমন কিছু দেখি নি। ঘুঘুর ডাক শোনা গেছে।

৬ই কার্তিক : অমরেশবাবু যে নূতন পাখীটা চিনিয়ে দিয়েছেন, সেটাকে আবার আজ দেখলাম—রেডস্টার্ট। দেশী নাম থিরথিরা। আতাগাছে ব'সে ছিল।

পাতার পর পাতা লিখে গেছে গণেশ। খাতাটার শেষ পাতায় অমরেশবাবু লিখেছেন—"খুব খুশী হলাম ; ছেলেটির পড়ার ব্যবস্থা যাতে ভাল হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে ; রত্নাকে দেখাতে হবে খাতাখানা।" অমরেশবাবুর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। খাতাখানা রেখে দিয়ে আর একটা শেল্‌ফের দিকে এগিয়ে গেল ডানা। চোখে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী রয়েছে। একখানা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল, হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল 'কর্মযোগ'। তাতেই মগ্ন হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যতটা পড়া সম্ভব ততটা প'ড়ে শেষকালে একটা চেয়ার টেনে ব'সে পড়তে লাগল সে। মনে হ'ল, তার প্রশ্নের উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ দিয়ে গেছেন বহুকাল আগে। উৎসাহিত হয়ে উঠল। উৎসাহের আর একটা হেতুও ছিল। এই প্রবন্ধটা পড়বার পর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করাটা সহজ হবে মনে হ'ল। উনিও আলাপের সূত্র পাবেন কিছু। 'কর্মযোগ' পড়তে পড়তে সন্ন্যাসীর কথাটাই ঘুরে

ফিরে মনে হতে লাগল। উনি নিশ্চয় পড়েছেন এসব, ওঁর নাম কি, বাড়ি কোথা? বাধা পড়ল একটু পরে। আনন্দবাবুর চাকর একটি চিঠি নিয়ে হাজির হ'ল। চিঠির গোড়াতেই কবিতা একটা।—

'আমি আছি,' 'আমি নেই' এ দুটোই সত্য,
'ছিলাম,' 'ছিলাম না' তা-ও নয় মিথ্যে,
'থাকব না,' 'থাকব' দুইই খাঁটি তথ্য—
সব জানি তবু হায় সুখ নেই চিত্তে।
কোথায় যে আছে সুখ কিসে যে ভরিবে বুক
তারই লাগি অহরহ হয়ে আছি উন্মুখ,
চিরে তর্কের চুল গাছে কি ফুটেছে ফুল,
প্ল্যান ক'রে হয়েছে কি মহাসাগরের কূল,
মোদের জীবন তবে অপূর্ণ কেন রবে
দর্শন-মন্থনে সুখ কে পেয়েছে কবে!
যাহাতে ভরিবে বুক কোথায় সে চিরসুখ
যেখানেই থাক্ না সে নিত্যে অনিত্যে
তাহারই ঠিকানা চাই সুখ নেই চিত্তে।

উল্লিখিত কবিতাটি প'ড়ে তোমার যদি মনে হয়, আমি দর্শন-শাস্ত্রকে বিদ্রূপ করেছি, তা হ'লে মারাত্মক ভুল হবে তোমার। দর্শন নয়, অদর্শনই আমার ক্ষোভের কারণ। যিনি আমার আসল মনিব তিনি এসেছেন, সুতরাং আপিস কামাই করা সম্ভব হচ্ছে না। ভাবছি, ছুটির ক্ষেত্রটাকে কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলে কেমন হয়? অর্থাৎ গৃহিণীর সঙ্গে তোমার যদি আলাপ করিয়ে দিই, তা হ'লে সমস্যার সমাধান হবে কি? এ বিষয়ে তোমার যদি অমত না থাকে, তা হ'লে আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে যেয়ো। যদি অমত থাকে, জানিয়ে দিও সেটা। অমরেশবাবুর কাছারির অনেক পুরনো

দলিলের পঙ্কোদ্ধার করেছি। অর্থাৎ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র করছি একটা। তুমি যদি একটু সাহায্য কর, প্রয়োজনীয় কর্তব্যটা মনোরমও হয়ে উঠবে। সন্ধ্যার সময় আসবে কি না এক লাইন লিখে জানিও। ইতি

আনন্দমোহন

ডানা ভুরু কুঁচকে ভাবলে একটু স্মিতমুখে, তারপর এক টুকরো কাগজে লিখে দিলে—"যাব নিশ্চয়ই ; আমি নিরামিষ খাই সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছি।"

বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' পড়তে পড়তে ডানা নূতন জগতে নীত হ'ল। সন্ন্যাসী তাকে যে জগতের আভাস দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দও তাকে সেই জগতেই নিয়ে গেলেন। সে জগতে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে, কিন্তু উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। সকলেই সেখানে স্ব-স্ব মর্যাদায় সমান মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সে জগতে রাজায় মেথরে, সন্ন্যাসী গৃহস্থে সম্মানের কোন তারতম্য নেই। সকলেই সেখানে ভগবানের কাজ করছেন, নিজের নয়। কর্মই সে জগতের একমাত্র অবলম্বন—কর্মফল নয়, আকাঙ্ক্ষা নয়, অহঙ্কারও নয়। সে জগতে সামান্য পক্ষী-পরিবারও তাই অতিথিসেবার জন্য আত্মবিসর্জন করতে ইতস্তত করে না, সন্ন্যাসী হেলায় প্রত্যাখ্যান করতে পারে রাজ্যেশ্বরী রূপসী রাজকন্যাকে। সে জগতে কর্তব্যই সব চেয়ে বড়—আত্মসুখ নয়, পরার্থপরতাই সেখানকার মন্ত্র—স্বার্থপরতা নয়। এই নূতন জগতে নীত হয়ে ডানা খানিকক্ষণের জন্যে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার মনে হ'ল, সে কি আদর্শ গৃহস্থজীবন যাপন করতে পারবে? এমন পুরুষ কি এ দেশে আছে, পরের মঙ্গলের জন্য যে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেবে? সে রকম পুরুষ না পেলে তো আদর্শ গৃহস্থালী স্থাপনই করা যাবে না। সে নিজেও কি পারবে? বইটা বন্ধ ক'রে উঠে পড়ল সে। কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত করলে

নিজেকে। শেলূফ্ গোছাতে গোছাতেও কিন্তু ওই একই কথা ভাবতে লাগল—আদর্শ গার্হস্থ্যজীবন যাপন করবার উপায় আছে কি এ যুগে? সকলেই যে যুগে স্বার্থপর, যে যুগে পরার্থপরতার অর্থ বোকামি বা পাগলামি, সে যুগে এ সব কথা ভাবাও কি সঙ্গত? কোথায় আছে সে রকম পুরুষ, যে সংসার পাতবে নিজের জন্য নয়—পরের জন্য? যদি সে রকম পুরুষ দুর্লভ হয়—হবেই—তা হ'লেই বা তার কর্তব্য কি? সন্ন্যাসীর কাছে এ প্রসঙ্গ তুললে তিনি এর কি উত্তর দেবেন, শোনবার জন্য তার মন আগে থাকতেই উৎসুক হয়ে উঠল। একটু পুলকিতও হ'ল সে। কল্পনায় সে সন্ন্যাসীর বিব্রত ভাবটা উপভোগ করতে লাগল। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল তার। 'কর্মযোগ' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে সন্ন্যাসীর কথা বর্ণনা করেছেন, যিনি সুন্দরী রাজকন্যাকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান ক'রে বনের মধ্যে পালিয়ে গেলেন, এ সন্ন্যাসীরও কি তেমনি মনের জোর আছে? বেগতিক দেখলে ইনিও কি অমনি অন্তর্ধান করবেন? করতে পারবেন? হঠাৎ তার কল্পনা বিস্মিত হ'ল। চিড়িয়াখানার চাকর মুন্সী এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল।

"মাইজী, পাখীদের দানা ফুরিয়েছে। গোটা দশেক টাকা দিন, কিনে আনি। হরেওয়াদের জন্যে কিছু ঝাড়-জঙ্গলও আনাতে হবে। মিহিপুরার একটা বাগানে আছে খবর পেয়েছি। আমাকে যদি এক বেলা ছুটি দেন, আমিই গিয়ে কেটে আনতে পারি, তা না হ'লে একটা মজুর পাঠাতে হবে—তার আবার মজুরি লাগবে।"

ডানা সহসা যেন আর এক জগতে এসে হাজির হ'ল। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে নীরবে চেয়ে রইল সে মুন্সীর দিকে। তারপর তার মনে পড়ল, হরবোলা পাখীরা লোরেনথাস্ (Loranthus) ফুল খেতে ভালবাসে। এগুলো একরকম পরগাছার ফুল, সাধারণত আমগাছের উঁচু ডালে হয়। অমরবাবু একবার তাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন মনে পড়ল। তারপর তার মনে হ'ল, মুন্সী যে প্রস্তাবটি

এনেছে তার অন্তরালে মুন্সীর চতুর একটা মতলবও যেন লুকিয়ে আছে। যে টাকাটা সে দানা কেনবার জন্যে চাইছে তার সবটা হয়তো সে দানা কেনবার জন্যে খরচ করবে না। কিছু বাঁচাবে নিশ্চয়ই। আর যে মিহিপুরার বাগানে সে লোরেনথাস্ ফুল আনতে যাচ্ছে সেই মিহিপুরা গ্রামেই তার শ্বশুর বাড়ি, তার যুবতী বধূ সেখানে আছে। ডানা ইচ্ছে করলে একজন গোমস্তাকে দিয়ে পাখীর দানা আনিয়ে নিতে পারে, একবার হুকুম করলেই মিটে যাবে ব্যাপারটা। এ বাড়ির কোনও চাকরকে ফরমাশ করলে লোরেনথাস্ ফুলও অনায়াসে এসে যাবে। অমরেশবাবুর আস্তাবলে ঘোড়া নেই কিন্তু সহিস আছে, তাকে রত্নপ্রভা বরখাস্ত করেন নি, পেন্‌শন দিয়েছেন। সে ফাইফরমাশ খাটবার জন্যে উৎসুকও, তাকে বললেই সে সানন্দে লোরেনথাস্ ফুলগুলি এনে দেবে। ডানা আর একবার মুন্সীর মুখের দিকে চাইল, দেখল তার চোখ দুটো মিটমিট করছে। মায়া হ'ল। মনে হ'ল, বেচারার আশা ভঙ্গ ক'রে তার কোন লাভ হবে না, হয়তো তার অনুচ্চারিত অভিশাপ তার অনিশ্চিত জীবনকে আরও অনিশ্চিত ক'রে তুলবে। অদেখা বধূটির প্রত্যাশাভরা পথ চাওয়াটাও সে যেন দেখতে পেল কল্পনায়। তার নিজের মনের ভিতরই কে একজন যেন বধূটির হয়ে সুপারিশ করতে লাগল। ডানা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে দশ টাকার নোট বার করলে একটি।

"পাখীর দানা কিনে আন। ভাল জিনিস কিনো, আর ওজন ঠিক ঠিক দেখে নিও। দানা কিনে নিয়ে চল তুমি চিড়িয়াখানায়। সেখানে পাখীদের খাইয়ে তারপর মিহিপুরা যেয়ো। আমিও যাচ্ছি এখুনি।

মুন্সী সানন্দে চ'লে গেল।

চিড়িয়াখানায় অনেক রকম পাখী ছিল। একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরকে প্রথমে দেওয়াল দিয়ে এবং পরে তার দিয়ে ঘিরে

অমরেশবাবু নিজের যে পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন— এখনও যদিও তা সম্পূর্ণ হতে অনেক দেরি, কিন্তু যতটুকু হয়েছে ততটুকুই ডানাকে হিমসিম খাওয়াবার পক্ষে যথেষ্ট। বেশীর ভাগ পাখী পাখীওলারাই দিয়েছে। মুনিয়া, তিতির, বটের, দামা, দোয়েল, হরবোলা, বুলবুলি, চাতক, শামা, বেনেবউ, নীলকণ্ঠ, বুনোচড়াই, গাংশালিক, পাহাড়ী ময়না, রেডস্টার্ট (কবি যার নামকরণ করেছেন ফুলকি), ভিংরাজ, টিয়া, চন্দনা, ফিঙে প্রভৃতি পাখীকে বড় বড় খাঁচায় রাখা হয়েছে, একটা পুকুরে কিছু পানকৌড়ি এবং এক জোড়া ডাহুককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, হুতোমপ্যাঁচাও রাখা হয়েছে খাঁচার ভিতরে, কতকগুলো ভরদ্বাজ পাখীও ছাড়া আছে ঘাসের জঙ্গলে, দরজিপাখী, টুনটুনি, সাধারণ চড়াই, ছাতারে, এ সব তো আছেই। কিছুদিন আগে রেডস্টার্টগুলোকে ডানা ছেড়ে দিয়েছিল। একটা প্যাঁচা মারা গেছে, আর একটাও মরমর। এইটের জন্যেই ডানা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে, ভাবছে এটাকেও ছেড়ে দেবে কি না।

মুন্সী দানা নিয়ে আসতেই ডানা জিজ্ঞেস করলে, "প্যাঁচাটা কিছু খেয়েছে?"

"একটা গোটা মাছ খেয়েছে হুজুর।"

"ভালই আছে তা হ'লে।"

"চোখ খোলে নি কিন্তু হুজুর। পিছু ফিরে ব'সে মাছটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলে, তারপর থেকে চোখ বুজে ব'সে আছে।"

ডানা প্যাঁচাটার খাঁচার সামনে এগিয়ে গেল। সত্যিই রোগা হয়ে গেছে বেচারা।

"কত বড় মাছ দিয়েছিলি?"

"বেশ বড় পুঁটি একটা। তা আধপোয়াটাক হবে।"

ডানা কেটুপা প্যাঁচার প্রধান বৈশিষ্ট্যটা আবার ভাল ক'রে লক্ষ্য করছিল, পায়ে মোটে পালক নেই। হঠাৎ প্যাঁচাটা চোখ খুলে

একবার চাইলে, বড় বড় গোল গোল চোখ ছুটোর দৃষ্টি ডানার মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে রইল ক্ষণকাল, তারপর পিঠ ঘুরিয়ে বসল। ভাবটা যেন, তোমাদের মতো পাষণ্ডদের মুখদর্শন করাও পাপ। ডানা মুচকি হেসে এগিয়ে গেল মুন্সীর দিকে। মুন্সী শামা পাখীটার খাঁচায় কিছু মাংসের কিমা আর কিছু মরা ফড়িং দিচ্ছিল। ডানা কাছে আসতেই সে বললে, "এগুলো আরশোলা খুব ভালবাসে। পুরনো গুদোম ঘরটায় অনেক আছে, কিন্তু নায়েব মশাই সেখানে ঢুকতেই দেন না আমাকে। আপনি যদি একটু ব'লে দেন—"

"আচ্ছা, বলব। গুদোম ঘরে অনেক জিনিসপত্তর আছে কি না, তাই সে ঘরের চাবি কাউকে দিতে চান না তিনি। আমি কাল চাবি চেয়ে রাখব, তুমি আমার সামনে কিছু আরশোলা ধ'রে এনো—"

প্রস্তাবটা মুন্সীর খুব মনঃপুত হ'ল না। সে গম্ভীর মুখে নীলকণ্ঠ, ভিংরাজ, দোয়েল প্রভৃতি মাংসাশী পাখীদের কিমা আর ফড়িং দিতে লাগল। হঠাৎ শামা পাখীটা খুব জোরে শিস দিয়ে উঠল আর লাফালাফি করতে লাগল খাঁচার ভিতরে।

"ওর পেট ভরে নি বোধ হয়। ওকে আর একটু কিমা দাও মুন্সী।"

মুন্সী আদেশ পালন করলে, কিন্তু মন্তব্য করলে, "ওর পেট কি ভরাতে পারবেন আপনি মা, রাক্ষস একটা। দশটা ফড়িং ওকে দিয়েছি।"

নীলকণ্ঠটাও চীৎকার শুরু করল। ভিংরাজ দোয়েলেরও আর্তকণ্ঠ শোনা গেল। ডানার মনে হ'ল, কোন বড়লোকের বাড়িতে যেন কাঙালীবিদায় হচ্ছে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বটের পাখীটা ব'লে উঠল—ঠিক, ঠিক তো।

"আমি চললুম। তুই এদের খাইয়ে মিহিপুরায় চ'লে যাস। আজই ফিরবি তো?"

"নিশ্চয়। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসব।"

ডানা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। বন্দী পাখীগুলোর দুর্দশা অতিষ্ঠ ক'রে তুলল তাকে।

সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ডানা একটা অপ্রত্যাশিত জিনিস দেখলে। সন্ন্যাসী পান খাচ্ছেন। কাছেই খান দুই শালপাতা দেখে সন্দেহ হ'ল, হয়তো বাজার থেকে খাবার কিনেও খেয়েছেন। ডানাকে দেখে তিনি মৃদু হাসলেন একটু, কোন কথা বললেন না। কিন্তু ওই মৃদু হাসির মধ্যেই এমন একটি সূক্ষ্ম অভ্যর্থনা ছিল যা ডানার মর্ম স্পর্শ করল।

"রোজই ভাবি আপনার কাছে আসব, কিন্তু সাহস পাই না। আজ জোর ক'রে চ'লে এলাম। যদি এটাকে অন্যায় মনে করেন বকুন আমাকে, আমি তৈরি হয়েই এসেছি।"

"বকতে যাব কেন শুধু শুধু। তুমি এলে তো ভালই লাগে।"

"আপনি যে পথের পথিক সে পথে তো আমরা বাধা, নিজেই তো বলেছেন এ কথা।"

"কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু পথের বাধাকে অতিক্রম করবার শৌর্য যে আমার আছে তা যাচাই করব কি ক'রে যদি বাধা না থাকে? তাই বাধাটা অনাবশ্যক নয়, ওরও প্রয়োজন আছে তা ছাড়া যা অনিবার্য তাকে কি নিবারণ করা যায়। বাধা হিসাবে তুমি দুস্তরও নও, ভয়ঙ্করও নও।"

কথাগুলি ব'লে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিনি ডানার দিকে।

"পান পেলেন কোথা? উঞ্ছবৃত্তিধারীরা পানও কুড়িয়ে পায় না কি।"

"না। কিনেছি। শুধু পান নয়, কচুরি এবং রসগোল্লাও।"

"পয়সা পেলেন কোথা ?"

"আমি তো নিঃস্ব নই। পোস্টাফিসে আমার টাকা আছে কিছু।"

"এখানকার পোস্টাফিসে ?"

"হ্যাঁ।"

ডানা যুগপৎ বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে উকিলের মেয়ে, তার বাবা নামজাদা উকিল ছিলেন বর্মায়, জেরা করবার সহজ শক্তি তার অন্তরের মধ্যেই ছিল সম্ভবত। সে জেরা করতে লাগল।

"এখানে এসে পোস্টাফিসে টাকা জমা করেছিলেন ?"

"না। টাকা অনেক আগে থাকতেই ছিল।"

"আগে তা হ'লে আপনি আর একবার এসেছিলেন এখানে ?"

সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন হাসিমুখে। তারপর আর একটু হেসে বললেন, "আমার সম্বন্ধে এ কৌতূহল কেন তোমার ?"

"বাঃ, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আপনার পরিচয় জানতে চাইব না !"

"আমার পরিচয় তো জেনেছ, আমি সন্ন্যাসী। সংসারী লোকের কাছে এর বেশী পরিচয় দেওয়া নিরর্থক।"

"আমি কিন্তু ঠিক সংসারী লোক নই। আপনাকে তো সব কথা বলেছিলুম একদিন। আমার নিজের লোক বলতে কেউ নেই। ঘটনাচক্রে আমিও সংসার থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছি। তাই বোধ হয় আপনার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা অনুভব করি। আপনি আমার চেয়ে অনেক উঁচুদরের লোক, নারীর সান্নিধ্য আপনি পছন্দ করেন না। এসব জেনেও তবু আপনার কাছে আসি। আপনার পরিচয়ও জানতে তাই আগ্রহ হয়।"

সন্ন্যাসী হঠাৎ উঠে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। একটা মাটির সরা আর একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে ক'রে বেরিয়ে এলেন

আবার। ডানার সামনে সেগুলো নামিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও তা হ'লে—"

"কি ?"

"আমার পরিচয়। এককালে খুব খাইয়ে ছিলাম। কদিন থেকে রসগোল্লা, গরম কচুরি আর মিঠে পান খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। কিছুতেই একাগ্র হতে পারি না, ভগবৎচিন্তার ফাঁকে ফাঁকেও লোভটা এসে উঁকি মারে দুষ্টু ছেলের মত। আজ সর্বকর্ম পরিত্যাগ ক'রে তাই ওটাকে শান্ত করলুম আগে। কিছুদিন বিরক্ত করবে না আর।"

অকৃত্রিম সরল হাস্যে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সন্ন্যাসীর। ডানাকে বললেন, "নাও, তুমিও খাও।"

"এখন তো আমি গিয়ে ভাত খাব। এখন খেলে দুপুরের খাওয়াটা নষ্ট হবে।"

"সঙ্গে নিয়ে যাও তা হ'লে।"

"আপনিই রেখে দিন না, বিকেলে খাবেন।"

"আমি আর খাব না। লোভকে বেশী প্রশ্রয় দেওয়াও ভাল নয়। ওগুলো নিয়ে যাও তুমি।"

"আমি না এলে কি করতেন ?"

"কাককে কুকুরকে খাইয়ে দিতাম। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আমার নেই।"

"পোস্টাফিসে টাকা তো সঞ্চয় করেছেন।"

"আমি করি নি। আমার পূর্বপুরুষরা করেছেন।"

কথাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না সন্ন্যাসীর, কথার পিঠে বেরিয়ে পড়ল। জেরার মুখে আরও অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল।

"আপনার পূর্বপুরুষরা ? তাঁরা এখানকার পোস্টাফিসে টাকা জমালেন কি ক'রে ?"

"তারা এই অঞ্চলেই ছিলেন এককালে। আমারও ছেলেবেলাটা এখানেই কেটেছে।"

এইবার ডানা আকাশ থেকে পড়ল।

"অমরবাবু আনন্দবাবুর সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল আপনার?"

"এঁরা অনেক পরে এসেছেন। আমরা এখানে ত্রিশ বছরেরও আগে ছিলাম। আমি যখন এখান থেকে চ'লে যাই, তখন আমার বয়স পাঁচ বছরেরও কম।"

"আর আসেন নি?"

"এসেছিলাম একবার পোস্টাফিসের খাতাটা ঠিক করিয়ে নেবার জন্যে। চার-পাঁচ দিন ছিলাম মাত্র।"

"পোস্টাফিসের খাতা আপনার নামেই ছিল?"

"আমার নামেই ছিল। এখনও আছে।"

"এখানে আপনার পূর্বপরিচিত লোক আছেন নিশ্চয় তা হ'লে?"

"বেশী নেই। দু-একজন আছেন। না থাকলে টাকা বার করা যেত না। কারণ এখন যিনি পোস্টমাস্টার, তিনি আমাকে চেনেন না। তাঁদের একজনকে ডেকে আনলাম গিয়ে, তার পর টাকা পেলাম।"

ডানার ভারি মজা লাগল—রসগোল্লা, লুচি আর মিঠে পান খাওয়ার জন্য ভদ্রলোক এত কাণ্ড করেছেন! লোকটির চরিত্রের আর একটা দিক দেখতে পাওয়ার পর লোকটাই যেন বদলে গেল তার চোখে। এতদিন সে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল, এই অপ্রত্যাশিত নূতন আলোতে একটা পথের রেখা সে যেন দেখতে পেল। যদিও অস্পষ্ট আভাস মাত্র, তবু আশাপ্রদ।

অনুযোগভরা কণ্ঠে ডানা বললে, "এতক্ষণে বুঝতে পারছি, সত্যিই আপনি আমাকে পর মনে করেন। আমাকে একটু যদি খবর দিতেন তা হ'লে আপনাকে কচুরি আর রসগোল্লার জন্যে এত কাণ্ড করতে হ'ত না, আমি অনায়াসে সব ব্যবস্থা ক'রে দিতাম।"

"তা দিতে জানি। কিন্তু তোমার যুক্তিটা ঠিক হ'ল না। পরের কাছেই অসঙ্কোচে ভিক্ষা চাওয়া যায়, কিন্তু নিজের লোকের কাছে সঙ্কোচ হয়। তা ছাড়া তোমার কথা মনেও হয় নি। জীবন্ত কারো কাছে ভিক্ষা না ক'রে মৃতের দ্বারস্থ হচ্ছি এর অভিনবত্বেই মশগুল হয়ে ছিলাম আমি।"

"মৃতের মানে?"

"পূর্বপুরুষদের।"

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল ডানার মুখের দিকে সহাস্যদৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রেখে আবার বললেন, "পূর্বপুরুষদের কাছে যে আমরা সর্বদাই ঋণী সে কথা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। স্মৃতিশাস্ত্র পুত্রোৎপাদন ক'রে পিতৃঋণ পরিশোধ করতে বলেছেন। আমি স্মৃতিশাস্ত্রের এ বিধান মানি নি, কথাটা মনেও লাগে নি খুব। পিতৃঋণ অপরিশোধ্য এই আমার বিশ্বাস। পূর্বপুরুষদের দাক্ষিণ্যের দ্বারে হাত পেতে তাই ভারি আনন্দ পেয়েছি আজ।"

ডানা মুচকি হেসে বললে, "আমি আপনার মত পণ্ডিত নই। অত চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারব না। তবে রামায়ণে পড়েছিলাম যে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে কয়েকটি শহুরে মেয়ে সন্দেশের লোভ দেখিয়ে শহরে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। সন্দেশ দেখে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শেষকালে তিনি রাজা লোমপাদের জামাইও হয়ে গেলেন। আপনার কথা শুনে গল্পটা মনে প'ড়ে গেল।"

সন্ন্যাসী হেসে জবাব দিলেন, "অতটা বেকুবি আমি করব না। যাক, আমার কথা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, ওটা এখন বন্ধ থাক্। কোনও দরকারে এদিকে এসেছিলে, না, এমনি বেড়াতে এসেছ?"

"দরকার আমার একটা আছে। আগেও দু-একবার বলেছি আপনাকে, কিন্তু আপনি ব্যাপারটাকে আমল দেন নি। অথচ আমার ধারণা, আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন।"

সন্ন্যাসী একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখে একটা শঙ্কার ছায়াপাতও হ'ল। একটু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মনে করবার চেষ্টা করলেন, মেয়েটি কবে কোন্ প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর কাছে এসে বিফলমনোরথ হয়েছে। কিন্তু মনে পড়ল না। তখন বললেন, "তোমার কথাটা বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার দ্বারা তোমার যদি কোনও উপকার হয়, নিশ্চয় করব যথাসাধ্য। ব্যাপারটা কি ?"

"আপনাকে আগেই বলেছি, পৃথিবীতে এখন আমার আপন বলতে কেউ নেই। এখন যাঁর আশ্রয়ে আছি তিনি অতি সদাশয় লোক সন্দেহ নেই। আমার অনেক উপকার করেছেন, আরও হয়তো করবেন; কিন্তু যে কাজ তিনি আমাকে দিয়েছেন তা একেবারেই ভাল লাগছে না আমার। কতকগুলো নিরীহ পাখীকে তিনি বন্দী ক'রে রেখেছেন আর আমার ওপর ভার দিয়েছেন তাদের তদারক করবার। ওদের আর্ত-চীৎকার রোজ রোজ আর শুনতে পারি না। মাঝে মাঝে ম'রেও যাচ্ছে। ছেড়ে দিয়েছি কয়েকটাকে। ইচ্ছে করে, সবগুলোকেই ছেড়ে দিই। কিন্তু ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করাই যখন আমার চাকরি তখন সব ছেড়ে দিলে হয়তো আমার চাকরিই থাকবে না। নিজের স্বার্থের জন্য অতগুলো প্রাণীকে কষ্ট দিচ্ছি—এ কথা ভাবতেও খুব খারাপ লাগে। তার ওপর আছেন ওই রূপচাঁদবাবু, লোকটার ধরনধারণ মোটেই ভদ্র নয়। মোটের ওপর আমি বড় অস্বস্তিতে আছি। মনে হচ্ছে এ পরিবেশ থেকে স'রে না গেলে স্বস্তি পাব না। অথচ স'রে যাবই বা কি ক'রে, হাতে টাকাকড়ি কিছু নেই। এ অবস্থায় কি করি বলুন তো ? আমাকে একটা পরামর্শ দিন।"

সন্ন্যাসী বললেন, "সাংসারিক ব্যাপারে আমি তোমার চেয়েও আনাড়ী। অনেকদিন হ'ল সংসার থেকে চ'লে এসেছি। তোমাকে সাংসারিক পরামর্শ দেবার যোগ্যতা তো আমার নেই। শুধু

এইটুকু বলতে পারি, এ পরিবেশ তোমার যদি খারাপ লাগে এখান থেকে চ'লে যাওয়াই উচিত। স্বাধীনতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সত্যের সন্ধানে যে শক্তি আমাদের একমাত্র সম্বল, স্বাধীনতা না থাকলে সে শক্তিও আমাদের থাকে না। সংসারে অনেকেই নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না, আমি পারি নি, তাই আমাকে সংসার ত্যাগ করতে হয়েছে। সকলের পথ অবশ্য এক নয়, কোন্ পথে গেলে তুমি সুখী হবে, তা তোমাকে ঠিক করতে হবে।"

"কিন্তু আমি ঠিক করতে পারছি কই!"

"তোমাকেই ঠিক করতে হবে। কোন্ খাবারের স্বাদ কি রকম, তা ভাল লাগছে, না, মন্দ লাগছে—এ যেমন নিজেকেই ঠিক করতে হয়, আনন্দের পথও তেমনি নিজেকে বার করতে হয়, কেউ সংসারের ভিতরে থেকেই তা পারে, কাউকে সংসার ছাড়তে হয় আমাকে হয়েছে। তুমি কি করবে সেটা তুমিই ঠিক কর। অনিশ্চয়তার মধ্যেই ধ্রুবকে পাওয়া যায়। অনিশ্চয়তার পটভূমিকাতেই তো চেনা যায় তাকে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে এ পরিবেশ যদি ভাল না লাগে অন্য কোথাও চ'লে যাও।"

"আমার কিছু ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স থাকলে নিশ্চয়ই যেতাম। মুশকিল হয়েছে আমি নিঃস্ব।"

"কষ্ট ক'রে থেকে কিছু টাকা জমাও তা হ'লে মাইনে থেকে তারপর কোথাও একটা চাকরি যোগাড় ক'রে চ'লে যেয়ো। এই লক্ষ্যটা ঠিক রেখে চলা ছাড়া আর অন্য কি-ই বা উপায় আছে তা তো মাথায় আসছে না আমার। অলক্ষ্য থেকে হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যরকম হয়ে যাবে কিছু একটা, তখন আবার তদনুসারে চলতে হবে। এই তো জীবন।"

সন্ন্যাসী ডানার দিকে চেয়ে হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

ডানাও চুপ ক'রে রইল। মনে হতে লাগল, সে যা বলতে

এসেছিল তা বলেছে, কিন্তু তবু যেন বাকি আছে কিছু। অনেক কিছু।

১৩

ডানা কবির বাড়িতে যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্তে এসে সে পৌঁছেছিল—যদিও তাতে নূতনত্ব কিছু ছিল না, নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে বার করতে হবে—এ কথায় চমক-লাগানো অভিনবত্ব কিই বা থাকতে পারে, কিন্তু তবু এই আলোচনার ঘোরটা কিছুতেই যেন কাটতে চাইছিল না তার মন থেকে। ক্ষিধে পেলে খাবারটা পছন্দসই কি না তা ভাববার অবসর থাকে না অনেক সময়, যা পাওয়া যায় তাই খেতে হয়, ক্ষিধের মুখে অখাদ্যও ভাল লাগে, তাই সন্ন্যাসী বলছিলেন—যে পথ সামনে পেয়েছ সেই পথেই চল। চলতে চলতে নিজেই বুঝতে পারবে পথটা তোমার মনোমত কি না। পথই তোমাকে নূতন পথের সন্ধান দেবে, নূতন বিচারের প্রেরণা জাগাবে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কবির বাড়িতে এসে হাজির হ'ল সে। হাজির হয়েই অর্থাৎ কড়া-নাড়ার আগেই মন্দাকিনীর কথা মনে পড়ল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। মনের রঙটা বদলে গেল একেবারে, কল্পনা-বীণায় বেজে উঠল নূতন সুর। বকুলবালার মত মন্দাকিনীও অপ্রত্যাশিত কিছু হবেন নাকি! হঠাৎ মনে হ'ল, মন্দাকিনী লেখাপড়া জানেন কি? আনন্দবাবুর কবিতা পড়েন কি? সহসা লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। আনন্দবাবু তাকে লক্ষ্য ক'রে যে সব কবিতা লিখেছেন তা যদি ওঁর নজরে প'ড়ে থাকে...। কয়েক মুহূর্ত অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে সে কড়া নাড়ল। কপাট কিন্তু খুলল না। কবি দোতলার নিজের ঘরে তন্ময় হয়ে ব'সে ছিলেন, কড়া নাড়ার

শব্দ তাঁর কানে গেল না। মন্দাকিনী রান্নাঘরে মৈথিল ঠাকুরটার সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তিনিও কিছু শুনতে পেলেন না। চাকরটা ছিল না, তাকে মন্দাকিনী বাজারে পাঠিয়েছিলেন সা-জিরে আনবার জন্যে। ডানা নিরামিষ খায় শুনে তিনি . নানারকম নিরামিষ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে সোৎসাহে লেগে পড়েছিলেন এবং ঠিক এই কারণেই ডানার সম্বন্ধে একটু সশ্রদ্ধও হয়েছিলেন তিনি। লেখাপড়া-জানা বর্মী মেয়ে মাছ-মাংস খায় না—এটা যেন বাঘের গায়ে কালো-ডোরা-নেই জাতীয় আশ্চর্য খবর মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। তা ছাড়া আর একটা বড় কথা, আনন্দবাবুও প্রশংসা করেছেন মেয়েটির। উনি যার-তার প্রশংসা বড় করেন না। মোষের মত মোটা একটা মেয়ে কিছুদিন আগে ওঁর পিছু নিয়েছিল, যখন উনি প্রফেস্যারি করতেন। এক গাদা পদ্য নিয়ে এসে প'ড়ে প'ড়ে রোজ শোনাত ওঁকে। মুখখানা কাছিমের পিঠের মত, তার উপর বড় বড় হলদে হলদে ফাঁক ফাঁক দাঁত, মুখে সর্বদা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ। চুল ফাঁপিয়ে, হাত-কাটা জামা প'রে, কত ঢঙ ক'রেই যে আসত! আসতে যেতে পেল্লাম। কিন্তু তবু উনি আমোল দেন নি তাকে। এলে বিরক্তই হতেন। তাঁর দূরসম্পর্কের ছোট বোন জবাও ফষ্টি-নষ্টি করবার চেষ্টা করেছিল তাঁর সঙ্গে শালী হিসেবে, কিন্তু ওঁর গাম্ভীর্যও টলাতে পারে নি, প্রশংসাও কুড়োতে পারে নি। আড়ালে বলতেন, মেয়েটা ডেঁপো। জবা সুন্দরী ছিল, কিন্তু উনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। তাঁর মত লোক যখন বলেছেন যে—মেয়েটির রূপও আছে, গুণও আছে, তখন সে কথা মূল্যবানই মনে হয়েছিল মন্দাকিনীর। তিনি বাইরে স্বামীর যত রূঢ় সমালোচনাই করুন, মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন খুবই। এত বয়েস হয়েছে কিন্তু শিশুর মত সরল, নিজের কা[illegible]টা পর্যন্ত সামলাতে পারেন না, কখন কোথায় কোন্ কথা বললে মানাবে জানেন না, ফট ক'রে বেমানান হয়তো ব'লে বসলেন একটা

কিছু, এ সবের জন্যে অনেক বকাঝকা, অনেক অশান্তি সৃষ্টি তিনি করেছেন, কিন্তু ওই সরলতার জন্যেই ওঁকে শ্রদ্ধাও করেন। আসল কথা, মন্দাকিনীর মনটা এসে থেকেই খুব খুশী হয়ে আছে, সেই জন্যেই সব কিছু ভাল লাগছে তাঁর। তিনি এখন সামান্য মাস্টারের স্ত্রী নন, এত বড় জমিদারির সর্বেসর্বা ম্যানেজারের স্ত্রী, এই ব্যাপারটা তাঁকে খুশির সপ্তম স্বর্গে তুলে দিয়েছে। মল্লিক মশায়ের বউয়ের গুমরটা যে ভেঙেছে, এতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করেছেন। জগু মোক্তারের স্ত্রীও পরশু ঘটা ক'রে বেড়াতে এসেছিলেন—আগে কখনও আসতেন না, দেখা হ'লে কথাও কইতেন না। এখন মুখে কথার খই ফুটছে। রূপচাঁদবাবুও এসেছিলেন দুবার। আগে এত ঘন ঘন আসতেন না। স্বামীর আয় বাড়াতেই শুধু নয়, পদমর্যাদা বৃদ্ধি হওয়াতে মন্দাকিনীর যেন নবজন্ম হয়েছে। স্বামীকে তিনি পাখী দেখতেও উৎসাহ দিচ্ছেন আজকাল। জমিদারের যখন পাখী দেখার বাতিক আছে, তখন পাখীদের খবরাখবর রাখলে তিনি খুশী হবেন নিশ্চয়, আর তিনি খুশী হ'লে চাকরির বনিয়াদ ক্রমশ পাকা হবে—এই তাঁর যুক্তি। ডানা মেয়েটিও এই পাখী-তদারকের কাজে নিযুক্ত হয়েছে শুনে ডানার প্রতি একটা আত্মীয়সুলভ মনোভাব হয়েছিল তাঁর। মহা উৎসাহে তার জন্যে রান্না করছিলেন তিনি।

তৃতীয় বার একটু জোরে কড়া নাড়ার পর ফল হ'ল। মৈথিল ঠাকুরটি এসে কপাট খুলে দিয়ে আধা-বাংলা আধা-হিন্দীতে অভ্যর্থনা করলে, "আসেন মাইজী, ভিতরে আসেন—"

ব্যাপারটা কবিরও কর্ণগোচর হয়েছিল। তিনি নেবে এলেন। মন্দাকিনীও কড়াটা নাবিয়ে বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। লণ্ঠনটা তুলে ধ'রে ডানার মুখখানি ভাল ক'রে দেখে একমুখ হেসে বললেন, "ইনিই ডানা নাকি! একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি। এ যে আমার শঙ্করী গো—"

ডানার মধ্যে নিজের মেয়ে শঙ্করীকে দেখে মন্দাকিনী বিগলিত হয়ে পড়লেন একেবারে। কবি কোনও কথা বললেন না, স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু। মন্দাকিনীর আড়ময়লা কাপড়ে হলুদের দাগ লেগেছিল একটু, মাথায় টাক পড়েছিল সামনের দিকটা, কপালে গালে কালো কালো দাগ পড়েছিল, দেহ শীর্ণ, গায়ে সেমিজ পর্যন্ত নেই; কিন্তু তবু মন্দাকিনীকে খুব ভাল লাগল ডানার। তাঁর স্নেহমাখা মুখের দিকে চেয়ে নির্ভয় হ'ল যেন সে। ঝুঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে তাঁকে। প্রণাম করতে গেলে অনেকে যেমন মৌখিক লৌকিকতা ক'রে 'হাঁ-হাঁ' ক'রে ওঠেন, মন্দাকিনী সে সব কিছু করলেন না। তাঁর প্রাপ্য প্রণামটা নিয়ে তার চিবুকে হাত দিয়ে নিজের আঙুলগুলি ঠোঁটে ঠেকিয়ে আলগোছে চুম্বন করলেন। তারপর আশীর্বাদ করলেন, সতীলক্ষ্মী হয়ে দীর্ঘজীবী হও। ডানার মনে হ'ল, মস্ত বড় একটা সম্পদ পেয়ে গেল সে অপ্রত্যাশিতভাবে। তাকে এমন ক'রে আশীর্বাদ কেউ কখনও করে নি। তার দেহমন স্নিগ্ধ হয়ে গেল যেন।

"রান্নার এখনও একটু দেরি আছে। তোমরা ওপরে ব'সে ততক্ষণ লেখাপড়া কর। ঠাকুর, তুমি বেরিয়ে দেখ একটু, হরির মুখপোড়া ছু আনার সা-জিরে আনতে গিয়ে ঘুগ কাবার ক'রে দিলে। ঠিক মোড়ে বিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে মুখপোড়া।"

ডানাকে নিয়ে কবি উপরে উঠে গেলেন।

"আমার কাজ প্রায় হয়ে এসেছে। তুমি ততক্ষণ আমার কবিতার খাতাটা ওলটাও। শেষের দিকে দেখ, কয়েকটা নূতন কবিতা লিখেছি।"

ডানা খাতা ওলটাতে লাগল। কয়েকটি নূতন কবিতা চোখে পড়ল।

টিয়া

ওরে টিয়া তোকে যদি বলি কলাগাছ
ঠোঁটটি তা হ'লে তোর মোচা,
কিন্তু যে কবি তোকে কলাগাছ বলবে
সে কবি নিতান্তই ওঁছা।

তুই কি রে সবুজের জয়-গান
তাই কি কোরাস্ ধরে যত বন-ময়দান
যোগ দিয়ে পান্নার সঙ্গে
এসে কি মিশল তোর অঙ্গে।

সবুজ হতে না পেরে চুনীটা
হ'ল বাঁকা টুকটুকে ঠোঁট কি
চুনীতে তৈরি ওটা আবীরের মটকি।
সে আবীর কারো কারো কণ্ঠেও লেগেছে
কারো কারো ডানাতে
এ কথা রটেছে রূপখানাতে।

সেখানের রূপসীরা তাই নাকি ঠোঁটে গালে চরণে
আলতা মাখায় নানা ধরনে।
রসিকেরা হেসে হয় সারা
টিয়ার নকল করা—এ কেমন ধারা।

ছাতারে

দিন গেল, মাস গেল, কাটিল বছর
তবু তোর থামিল না কচর-বচর

ডানা

রে ছাতারে পাখী,
বল্‌ তোর ভাষণের আর কত বাকি।
কান প্রাণ গেল যে ছাপিয়ে
আর কত বকবি রে লাফিয়ে লাফিয়ে।

ফুৎকি

ওরে ওরে ফুৎকি, মাটিতে নামবি না?
একটু থামবি না?
ডালে ডালে চিরকাল ছটফট করবি
সারাদিন ক্রমাগত কত পোকা ধরবি?
একটু নাম্‌ না ভাই
একটু থাম্‌ না ভাই।
দূরবীনে দে না ধরা ক্ষণিকের জন্য,
চট্‌ ক'রে দেখে নি'
কবিতায় এঁকে নি'
কোন্‌ গুণে হয়েছিস এতটা অনন্য।

ফটিক জল

ফটিক জল পাখীটির দেখা পেলাম সকালে
দেখা দিয়েই ঠকালে,
ফুড়ুৎ ক'রে পালিয়ে গিয়ে লুকোল
অমনি আমার কাব্য-মুকুল শুকোল,
কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ উঠল ফুটে হর্ষিত
'ফটি—ক জল' গহন থেকে হ'ল যখন বর্ষিত।

ফিঙ্গক-শারিকা-কাব্য

আমড়াগাছের শুকনো ডালে একটি ফিঙে এবং একটি শালিক পাশাপাশি ব'সে ছিল। কেন জানি না, মনে হ'ল শালিকটি স্ত্রী-শালিক এবং ফিঙেটি পুরুষ-ফিঙে। এ অবস্থায় মানব-কবির মনে যে ভাব আসা স্বাভাবিক তাই এসেছিল। কিন্তু শেষে অপ্রস্তুত হতে হ'ল।

ওহে ফিঙে চৌধুরী
করেছ কার বউ চুরি ?

শালিক-প্রিয়া তোমার পাশে
আছেন ব'সে কিসের আসে।
মিল হবে কি শালিক-ফিঙে দুজনে ?
করছ নাকি কেলেঙ্কারি
বাঙালী আর তেলেঙ্গারি
গাঁথছ নাকি মিলন-মালা দুজনে।

খাসা কাব্য ফেঁদেছিলাম
ছন্দটি বেশ গেঁথেছিলাম
এমন সময় ফিঙা গেল উড়িয়া
শালিক পাখী নির্বিকার
দেখলে নাকো ফিরেও আর
রইল একা আমড়া-শাখা জুড়িয়া।

তার পরেতে একটু পরে
উড়ল সে-ও 'পিড়িং' ক'রে
দিব্যজ্ঞান হইল পরকীয়ার কি

ডানা

বসল শিরীষ গাছে গিয়ে
তার পরেতে ঘাড় ঝুলিয়ে
ঝাঁকিয়ে মাথা বললে, এ কি ইয়ার্কি !
মনে রেখো শালিক মোরা
এবং মোরা সেকেলে,
মানুষ নই, মানুষ নই
এবং নই একেলে।

শিকারী পাখী

অলঙ্কৃত কর তুমি আকাশের নীল
বহু নামে। কভু তিস্‌সা, কভু চিল,
কখনও কোড়ল ; ঈগলের রূপ ধরি
কভু দৃপ্ত পক্ষীরাজ। শিক্‌রে, কুররী
কভু ; কখনও আবার সাপমার হয়ে
ধ্বংস করি সর্পকুল বেড়াও নির্ভয়ে।
পানডোবা-মাঠচিল-রূপে পুন দেখি
ক্ষিপ্র বেগে শত্রুমাঝে ঝম্প দিয়া, এ কি
অসঙ্কোচে অনুসরি বেদুঈন-রীতি
সুতীক্ষ্ণ নখরপ্রান্তে ঝুলায়ে ঝটিতি
রক্তাক্ত শিকারটিরে, হও নিরুদ্দেশ।
কভু দেখি ধরিয়াছ অপরূপ বেশ
পাংশু মাথা লাল ডানা ; কভু লাল শির
ডানায় নীলাভ পাংশু ভঙ্গী তুরম্ভীর।
মাঝে মাঝে মনে হয় ঋষি দুর্বাসার
তুমিই কি পক্ষীরূপ ? অথবা দুর্বার
চেঙ্গিস নাদির কোন ধর পক্ষীসাজ।
পক্ষী-জগতের যম, হে বিহঙ্গ বাজ,

কহ, কহ, সমুন্নত-নখ-চঞ্চুবান,
রুদ্রবীণে তুমিই কি সারঙের তান ?

কাজল গৌরী

ও রূপসী বণিকবধূ
মাথা তোমার করছে ধূ-ধূ
হঠাৎ কেন করলে এমন ক্ষৌরী,
হলদে পাখী বললে হেসে
দিলাম দেখা নূতন বেশে
নামটি আমার এখন কাজল গৌরী।
বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম
কালার দেখা পেয়েছিলাম
মাথার কালো হারিয়ে গেল সেই কালোয়,
তাহার ধটির পীতবরণ
হলদে রঙও করবে হরণ
থাকব কি আর তখন আমি এই আলোয় ?
শুনি এই নিদারুণ বাণী
আদ্যোপান্ত পুনরায় পড়িলাম জীর্ণ গীতাখানি।

ডানা

পাখীর ডানা আছে, তুমিও ডানা
আকাশে উড়িবার নাই তো মানা
কিন্তু জানি তুমি উড়িবে না গো,
মনে মনে তারই দরশ মাগো
যাহার বাজারেতে অনেক দাম
স্বর্ণ-পিঞ্জর যাহার নাম

হারেম বলে কেউ, কেউ বা ঘর,
সবাই চেনা-শোনা নাইক পর,
তাহারই নিরাপদ কোমল কোলে
জানি গো জানি তব হৃদয় দোলে,
অজানা আকাশেতে দেবে না হানা
যদিও নাম তব শ্রীমতী ডানা।

কবিতাটি প'ড়ে ডানার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। কবির দিকে চেয়ে দেখলে একবার। কবি নিবিষ্ট চিত্তে কি লিখে যাচ্ছিলেন, ফিরে চাইলেন না। ডানা তবু চেয়েই রইল, তার মনে যে প্রতিবাদটা জেগে উঠেছিল, সে ভাবছিল, সত্যিই কি সেটা অন্তরের কথা তার? অজানা আকাশে নিজেকে বিলিয়ে দেবার সাহস তার আছে কি? সহসা মনে হ'ল, আছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে অজানা পথেই তো চলছে। শুধু সে কেন, সকলেই। মাতৃগর্ভ থেকে মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয়, অজানা জগতেই এসে অবতীর্ণ হয় সে। তার পর থেকে প্রতিমুহূর্তে তার অভিযান চলে অজানাকে জানবার, অনায়ত্তকে আয়ত্তে আনবার। এই চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে ডানা কোনও সমাধানে পৌঁছতে পারল না। পৌঁছবার আগেই কবি বাধা দিলেন।

"একটা খবর তোমাকে দিতে ভুলে গেছি। নিখিল বদলি হয়ে গেল এখান থেকে। তার জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন মিস্টার বোস। তিনি নাকি চেনেন তোমাকে। আসবেন তোমার কাছে একদিন।"

"মিস্টার বোস?"

"হ্যাঁ, ভাস্কর বসু।"

ডানা স্তম্ভিত হয়ে রইল।

৯৪

যে ভাস্কর বসুর সঙ্গে রেঙ্গুনে আলাপ ছিল, যার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, সে-ই এখানে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে। কথাটা বিশ্বাস করতে সাহস হ'ল না ডানার। কিন্তু আর কোনও ভাস্কর বসুর সঙ্গে তার তো আলাপ নেই। তা হ'লে···। আশা-আশঙ্কায় বুকটা দুলে উঠল তার। বিয়ে করেছে কি ভাস্কর? যদি ক'রে থাকে, যদি না ক'রে থাকে—উভয়বিধ সম্ভাবনার জন্যেই সে নিমেষে প্রস্তুত ক'রে নিলে নিজেকে। যেন পর-মুহূর্তেই ভাস্কর বসুর সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে। বাইরে কিন্তু কোনও বিচলিত ভাব দেখা গেল না তার। কবি ঝুঁকে কি একটা কাগজ দেখছিলেন, ডানা তাঁর দিকে শান্তমুখেই চেয়ে রইল। তারপর প্রশ্ন করল, "ভাস্কর বসুর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে নাকি?"

কবি কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, "না। শুনছি লোকটা ট্যাঁস-মার্কা। আলাপ হবেই একদিন। ব্যস্ত কি। যেচে আলাপ করতে যাব কেন?"

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে চেয়েই রইলেন খানিকক্ষণ কাগজটার দিকে। তারপর বললেন, "একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করেছি পুরনো কাগজপত্র থেকে। অমরবাবুও বোধ হয় জানেন না ব্যাপারটা।"

"কি?"

"তুমি যে বাড়িটাতে আছ আর ওই সন্ন্যাসী যে পোড়ো বাড়িটাতে আছেন—ওই বাড়ি দুটো আর ওর সংলগ্ন বিশ বিঘে জমি অমরবাবুর নয়। ওটা সহায়রাম ভট্টাচার্য নামে এক ভদ্রলোকের। সমস্ত জমিদারিটাই এককালে তাঁর ছিল। রত্না দেবীর বাবা তাঁর কাছ থেকে জমিদারিটা কেনেন। গঙ্গার ধারের ওই বাড়ি দুটো আর ওই বিশ বিঘে জমি তিনি বিক্রি করেন নি, আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল বোধ হয়, এসে বাস

করবেন। কিন্তু আর আসেন নি। ওটা ক্রমশ অমরবাবুর সম্পত্তি ব'লে গণ্য হয়ে গেছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো—"

ডানার মনে পড়ল, সন্ন্যাসী বলছিলেন যে ছেলেবেলায় তিনি এখানে ছিলেন। সহায়রাম চট্টাচার্যের তাঁর সম্পর্ক নেই তো! তাঁর বাবা এখানকার পোস্ট-অফিসে টাকা জমিয়ে গেছেন···চকিতের মধ্যে অনেক রকম সম্ভব অসম্ভব কথা বিদ্যুৎ-চমকের মত খেলে গেল তার মনে। কিন্তু কোন কথা বললে না সে। শান্তমুখে ব'সে রইল চুপ ক'রে। মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললে, পোস্ট-অফিসে যখন পাসবুক আছে তখন সন্ন্যাসীর সব খবর সে বার করতে পারবে। যদি পারে, তখন··· চিন্তা আর এগোল না। তখন কি করবে সে? বিশেষ কিছুই তো করবার নেই। বিশেষ কিছু করবার নেই, এই কথাটা মনে হওয়াতে বিমর্ষ হয়ে পড়ল সে। ওই উদাসীন লোকটা আজ এখানে আছে, কাল আবার অন্যত্র চ'লে যাবে, কোন ঘটনাই তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না কোথাও।

কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন।

"আমার সব রান্না হয়ে গেছে। এইবার রূপচাঁদবাবু এলেই তোমরা খেতে বসতে পার। আমি তোমার জন্যে নিরামিষ রান্না করেছি, রূপচাঁদবাবু নিজেই নিজের জন্যে মাংস রান্না ক'রে আনবেন। আমি আর আঁষের হাঙ্গামাই করি নি এ বেলা। উনি এখানে কাজ করছেন, চল তুমি ও-ঘরে, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি। এখানে বক বক করলে উনি রাগ করবেন এখুনি আবার। রাগটি তো কথায় কথায় কিনা। লেখাপড়ার সময় টুঁ শব্দটি করবার জো নেই।"

কবি কোন কথা না ব'লে গৃহিণীর দিকে স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু ক্ষণকাল। তারপর আবার কাগজপত্রে মন দিলেন। রূপচাঁদবাবু আসবেন শুনে ডানা মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

কিন্তু তার বাইরের শান্তভাব ব্যাহত হ'ল না তাতে। মন্দাকিনীর কথা শুনে হাসিমুখে সে উঠে দাঁড়াল।

কবি তার দিকে চেয়ে বললেন, "আমি একটা নতুন কবিতা লিখেছি আজ সকালে। সেটা ও-খাতায় নেই। অন্য আর একটা খাতায় আছে। পরে দেখাব। খাওয়াদাওয়ার পর।"

মন্দাকিনী ঠোঁট উলটে বললেন, "আমি মুখ্যু মানুষ। ও-সবের কিছু বুঝি না। তোমার ভাল লাগে বুঝি?"

ডানা হেসে বললে, "লাগে একটু একটু।"

"তুমি লেখাপড়া-জানা মেয়ে, কত পরীক্ষা পাস করেছ, তোমার তো লাগবেই। চল ও-ঘরে।"

পাশের ঘরে গিয়ে ডানা বললে, "পরীক্ষা পাস করলেই বা, আপনার সংসারের বিষয়ে যত জ্ঞান যত বুদ্ধি আছে তার সিকির সিকিও আমার নেই। আমি কতকগুলো বই মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা পাস করেছি মাত্র।"

মন্দাকিনী মনে মনে খুশী হলেন। তাই একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, "তাই বা ক'টা মেয়ে পারে। ক'টা ছেলেই বা পারে। আমার খোকন তো এবার প্রমোশনই পেল না। কেবল ঘুড়ি, ঘুড়ি আর ঘুড়ি—"

বিছানায় দুজনে পাশাপাশি বসলেন।

মন্দাকিনী বললেন, "তোমাকে দেখে আমার শঙ্করীকে মনে পড়ছে। তোমার চিবুকের দিকের গড়নটা ঠিক শঙ্করীরই মত। তার চোখ অবশ্য তোমার চোখের মত ভাসা ভাসা নয়, ধরণ-ধারন কিন্তু তোমারই মত। মুচকি মুচকি হাসে, বেশী কথা বলে না। অনেক দিন চিঠি পাই নি মেয়েটার। তার কোলের মেয়েটা কেমন আছে কে জানে।"

এইভাবে আলাপ শুরু ক'রে মন্দাকিনী নিজের জগতে নিয়ে গেলেন ডানাকে, যে জগতে মনোটিক বা নেহরুর চেয়ে সুন্দরী গাই

বড়, বেকার-সমস্যার চেয়ে বড়ি-সমস্যার প্রাধান্য বেশী। কথায় কথায় তাঁর ভাইয়ের বিয়ের কথাও উঠে পড়ল; বিয়েতে কতরকম বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, কত জিনিস নষ্ট হয়েছিল (আত্মীয়-স্বজনরা পর্যন্ত গামলা গামলা সন্দেশ রসগোল্লা চুরি করছিল—নীচু গলায় বললেন খবরটা), পাত্রীপক্ষ অলঙ্কারে, বরাভরণে কি রকম কৃপণতার পরিচয় দিয়েছিল, এমন খেলো চেলী দিয়েছিল যে রঙ উঠে যাচ্ছিল, আংটিটা পেতলানি, দানের বাসন কংকঙে, নগদ টাকা তো দেয়ই নি—যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে তারা। তবে মেয়েটি সুন্দরী। তা ছাড়া ঘরের কাজকর্মও ভাল জানে। চমৎকার মোরব্বা তৈরি করেছিল। আচারও নাকি চমৎকার করে শুনলাম। আচার-প্রসঙ্গ এসে পড়াতে মন্দাকিনীর ক্ষোভ উথলে উঠল। ঠিক সময় কুল কেনা হয় নি ব'লে এবার তিনি কুলের আচার করতে পারেন নি। উনি (আনন্দবাবু) যদি একটু হুঁশ ক'রে কিনে রাখতেন তা হ'লে হ'ত, কিন্তু ওঁকে বিধি যে কি দিয়ে নির্মাণ করেছেন তা তিনিই জানেন। এ অঞ্চলে কুল একটু দেরিতে পাকে, কুল পাকবার আগেই তাঁকে ভায়ের বিয়ের জন্যে চ'লে যেতে হ'ল, কুল কেনা হ'ল না। এবার আমের কাসুন্দি করবার ইচ্ছে আছে। হঠাৎ মন্দাকিনী ডানার ব্লাউসের হাতাটায় হাত বুলিয়ে বললেন, "ছুঁচের কাজ তুমি নিজে করেছ?"

ডানা লজ্জিত হয়ে বললে, "আমিই করেছি। কিন্তু ভাল হয় নি, আমি ভাল জানি না।"

"কেন, বেশ চমৎকার হয়েছে তো। আমি এসব কিছুই পারি না। কাঁথা সেলাই করতে দাও, পারব। পাড় জুড়ে জুড়ে পরদা বা বিছানার চাদর করতে দাও, পারব। কিন্তু ছুঁচ দিয়ে ফুল পাখী লতাপাতা আঁকা—এ আমার দ্বারা হয় না। কেউ তো শেখায় নি ছেলেবেলায়। শঙ্করীটা পারে। এক মাস্টারনী শিখিয়েছিল ওকে।"

ডানা চিত্রার্পিতবৎ ব'সে ব'সে শুনে যাচ্ছিল। "যে জগতে সে মানুষ হয়েছে সে জগতেও গৃহকর্ম-নিপুণা গৃহলক্ষ্মীরা ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন আলাদা জাতের। বিদেশী সংস্কৃতির ছোঁয়াচ লেগে তাঁদের স্বভাবটা একটু যেন দোআঁশলা-গোছের হয়ে গিয়েছিল। চাকরকে 'বোয়' ব'লে ডাকতেন, বাইরের কেউ এলে চট ক'রে তার সামনে বেরুতে পারতেন না। দু সেকেণ্ডের জন্যেও অন্তত আয়নার সামনে না দাঁড়িয়ে অচেনা লোকের সামনে বার হওয়া অসম্ভব ছিল তাঁদের পক্ষে। যখন বার হতেন তখন মুখে ঝুলত একটা মেকি হাসি। মন্দাকিনীর মত এ রকম বেশে বাইরের কারো সামনে ব'সে গল্প করার কল্পনাও করতে পারতেন না তাঁরা। তাঁদের গল্পও পোশাকী গল্প, খবরের কাগজের খবর, আবহাওয়া, বড় জোর মার্কেট-সংক্রান্ত দু-চারটে কথা। অন্তরের কথা নয়। তাঁরা যে খারাপ ছিলেন তা নয়, তাঁদেরও অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তাঁরা ছিলেন স্বতন্ত্র জাতের, মন্দাকিনীর মতো নয়। শুধু যে তাঁরা টেবিলে খেতেন বা ইংরেজী বকুনি দিয়ে কথা বলতেন ব'লেই স্বতন্ত্র জাতের তা নয়, তাঁদের মন এবং চরিত্রের গড়নই ছিল অন্য রকম। হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়াতে মজা লাগল একটু। মনে পড়ল, বিপদে পড়লে এই স্বতন্ত্র সংস্কারে গঠিত চরিত্র বা মন এক নিমেষে বদলে যেতেও সে দেখেছে। জাপানীরা যখন বর্মায় বোমা ফেলল তখন তাদের এক সাহেবী-মেজাজের প্রতিবেশী মিস্টার বিশওয়াস্ বদলে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন দলবদ্ধ হয়ে পালাচ্ছিলেন তখন তাঁদের সঙ্গে দাড়িওলা গলায়-রুদ্রাক্ষের-মালা এক বেঁটে কালো-গোছের লোক ছিলেন। তিনি বিশওয়াস্-পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন কয়েক দিনের মধ্যে। বহু লোক একসঙ্গে পালাচ্ছিল। কয়েক দিন মিস্টার বিশওয়াস্দের খবর পাওয়া যায় নি ভিড়ের মধ্যে। সবাই তখন নিজের নিজের সামলাতে ব্যস্ত। দিন দশেক পরে হঠাৎ তাঁদের দেখা গেল

একেবারে ভিঁমি চেহারায়। মিস্টার বিশওয়াস্ হঠাৎ ভোল বদলে একেবারে বিশ্বেস মশাই হয়ে গেছেন। মাথা কামিয়ে টিকি রেখেছেন, গায়ে নামাবলী। মিসেস বিশ্বাসের ঠোঁটে রুজ নেই, কপালে তিলক। তিনি নিষ্ঠাভরে নিজেকে বিপত্তারিণী-ব্রতে নিযুক্ত করেছেন।

মন্দাকিনী বক্ বক্ ক'রে ব'কেই চলেছিলেন। ডানা যে তাঁর কথার কোনও জবাব দিচ্ছে না, সে খেয়ালই তাঁর ছিল না। তিনি যেন তাঁর শঙ্করীকে পেয়ে তার কাছেই বহুদিনকার সঞ্চিত সংবাদ সব ব'লে যাচ্ছিলেন অসঙ্কোচে। পাশের ঘরে রূপচাঁদের গলা পেয়ে তাঁর একটু হুঁশ হ'ল, মাথার কাপড়টা টেনে উঠে দাঁড়ালেন।

"রূপচাঁদবাবু এসে গেছেন। এবার খাবার ঠিক করি তোমাদের। রূপচাঁদবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে তো ?"

"আছে।"

"তা হ'লে পাশের ঘরেই বসবে চল।"

বলা বাহুল্য, রূপচাঁদবাবুর সামনে ডানার যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তবু বেশ সপ্রতিভভাবেই পাশের ঘরে গেল।

ডানাকে দেখে রূপচাঁদবাবু একটু অবাক হয়ে গেলেন।

"এ কি, তুমি এখানে ? আমি তোমার বাড়ি হয়ে ঘুরে এলাম।"

"কেন, কোনও দরকার ছিল ?"

"একটা খবর দিতে গিয়েছিলাম। আমাকে হঠাৎ এখান থেকে বদলি ক'রে দিয়েছে। খবর পেলাম, মিসেস সেনগুপ্তের ইঙ্গিতেই এটা নাকি হয়েছে। পুলিস সায়েব তাঁর নাকি চেনা লোক। মল্লিককেও তিনি বিপন্ন করেছিলেন। আনন্দমোহনের কল্যাণে সে বেচারা ছাড়া পেয়েছে। মল্লিকের না হয় কিছু দোষ ছিল, কিন্তু আমাকে কি অপরাধে বদলি করা হয়েছে তা বুঝতে পারলাম না।

তাই তোমার কাছে জানতে গিয়েছিলাম, তুমি কিছু জান কি না। তুমি রত্নপ্রভা দেবীর পেয়ারের লোক—হয়তো জানতেও পার।"

"আমি কিছুই জানি না। আপনার বদলির খবর আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম।"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তার দিকে। ডানার মনে হ'ল, তার দু গালে কে যেন দুটো ছুঁচ বিঁধিয়ে রেখেছে। তার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। আনত চক্ষে ব'সে রইল সে।

"যাক, এ ব্যাপারটা শেষ হ'ল মোটামুটি এখন।"

কবি সশব্দে মোটা খাতাখানা বন্ধ ক'রে দিলেন।

"কি ব্যাপারে লিপ্ত ছিলে তুমি? কবিতা লিখছিলে, না, আর কিছু?"—রূপচাঁদ প্রশ্ন করলেন।

"কিছুক্ষণ আগে কবিতা লিখেছি একটা। কিন্তু এই খাতাটায় সমস্ত প্রজাদের একটা বর্ণানুক্রমিক সূচী ও তাদের পরিচয় লিখে ফেললাম। আচ্ছা, সহায়রাম ভট্টাচার্যকে চেন তুমি, নাম শুনেছ কখনও তাঁর?"

"না। কোথাকার লোক?"

"এককালে তিনিই এই জমিদারির মালিক ছিলেন। রত্নপ্রভা দেবীর বাবা, মানে—অমরবাবুর শ্বশুর তাঁর কাছ থেকেই জমিদারিটা কেনেন। কিন্তু নদীর ধারের বিশ বিঘে জমি আর দুখানা বাড়ি তিনি বিক্রি করেন নি। একটা বাড়িতে ডানা থাকে আর একটাতে ওই সন্ন্যাসী থাকেন।"

এ নিয়ে আরও আলোচনা চলত, কিন্তু মন্দাকিনী এসে বললেন, "লুচি ভাজছি, তোমরা বসবে চল।"

রূপচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাত নেই? মাংসে একটু বেশী ঝোল থেকে গেছে। চারটি গরম ভাত পেলে ভাল হ'ত।"

"ভাত আছে বইকি।"

"তবে চলুন।"

ডানা খেতে ব'সে অবাক হয়ে গেল। মন্দাকিনী এক হাতে দশ রকম নিরামিষ তরকারি, দু রকম ডাল, পায়েস, এমন কি পিঠে পর্যন্ত করেছেন। এত রকম এবং এমন সুস্বাদু নিরামিষ তরকারি সে জীবনে আর কখনও খায় নি। খেতে খেতে রূপচাঁদের বদলি নিয়েই আলোচনা হতে লাগল। পূর্ণিয়ায় বদলি করেছে তাঁকে। জায়গাটা বড় অস্বাস্থ্যকর, গেলেই নাকি ম্যালেরিয়া হয়। ডানা এ আলাপে যোগ দিল না। খাওয়া শেষ হবার পর রূপচাঁদ ডানার দিকে ফিরে বললেন, "তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে? যাও তো পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি।"

"আমি একটু পরে যাব। আপনি যান।"

রূপচাঁদ তার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর চ'লে গেলেন।

সকলের খাওয়ার পর মন্দাকিনী খেতে বসলেন। ডানা তাঁর কাছে বসল গিয়ে।

"এ কি, আপনি আর কিছু খাবেন না?"

মন্দাকিনী দুখানি রুটি, একটু তরকারি আর গুড় নিয়েছিলেন।

"রাত্রে বেশী খেলে হজম হয় না। ভাত লুচি কিছু না। দুখানি শুকনো রুটি খাই, তাও রাত্রে দুবার উঠে জল খেতে হয়।"

মন্দাকিনী রান্নাঘরের এক ধারেই খেতে ব'সে ছিলেন। তিনি অনুভব করছিলেন, ডানা ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্যেই একটা আসন নিয়ে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে ব'সে আছে। বসবার ধরন দেখেই তিনি বুঝতে পারছিলেন, বেশ স্বচ্ছন্দভাবে ব'সে নেই সে। অসুবিধা হচ্ছে।

"তুমি ওপরে ওঁর কাছে গিয়ে ব'স না। আমার কাছে আর বসতে হবে না। আমার খাওয়া হয়েও গেল।"

একটি ছোট ঘটি বাঁ হাতে তুলে আলগোছে জল খেয়ে আহার শেষ করলেন তিনি।

"তুমি ওপরে যাও। আমার সারতে-সুরতে এখনও ঢের দেরি।"

"আমি তবে চ'লেই যাই। আর একদিন আসব।"

ডানা কবির সঙ্গে যখন ওপরে দেখা করতে গেল, তখন তিনি লিখছিলেন। ডানাকে দেখে বললেন, "এ কবিতাটা নিয়ে যাও, বাড়ি গিয়ে প'ড়ো। এখানে পড়বার নয় ওটা।"—ব'লে তিনি মুচকি হাসলেন।

"এখনই লিখলেন নাকি?"

"না। আগেই লিখেছি। টুকে দিলাম এখন। অনেকদিন পরে এ ধরনের কবিতা লিখলাম। লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হচ্ছিল, শুনলে হয়তো তোমার ভালই লাগবে।"

"কি কথা?"

"এ ধরনের কবিতা আর লিখব না।"

"কেন?"

"লিখতে পারব না। যে জোয়ারটা এসেছিল সেটা নেবে যাচ্ছে।"

কবি স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন, "কিন্তু সেই জোয়ারের মুখে নৌকো ভাসিয়ে যে অমরাবতীতে আমি উত্তীর্ণ হয়েছিলাম, তার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার জীবনে। যদি হাতে কোনদিন পয়সা হয় কবিতাগুলো ছাপাব, আর তুমি যদি আপত্তি না কর তোমাকে উৎসর্গ করব সেগুলো।"

এর উত্তরে ডানা কিছু না ব'লে একটু মুচকি হেসে চ'লে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে একটা কথা তার মনে হ'ল। যে রকম যোগাযোগ ঘটছে, তাতে তার জীবনে নবপর্বের সূচনা হবে বোধ হয়। এখানে যে-লোকটি দুষ্টগ্রহের মত তার জীবনের আকাশে উদিত হয়েছিলেন, তিনি অস্ত যাচ্ছেন। রূপচাঁদের বদলির খবরটা

পেয়ে তার মনের একটা অংশ খুশীই হয়েছিল ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'লেও এ কথা সে না মেনে পারছিল না যে, ওই লোকটিই তার নারীসত্তাকে এমন একটি মূল্য দিয়েছিল যা আর কারও দেবার সাহস হয় নি, এবং যে মূল্য পেয়ে সে গর্বই অনুভব করেছিল মনে মনে। তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নি সে নানা কারণে, কিন্তু তার বলিষ্ঠ পুরুষোচিত আকুলতাকে সে সত্যি সত্যি ঘৃণা করে নি কখনও। ভয় পেয়েছে, ঘৃণা করে নি। রূপচাঁদবাবু আর তার জীবনে ছায়াপাত করবেন না—এই সম্ভাবনাতে তাই সে একটু বেদনাও বোধ করল যেন। বেদনাটা আরও বাড়ল কবির কথা ভেবে। তাকে দেখে তাঁর মনে যে জোয়ার এসেছিল তা নেবে যাচ্ছে, তাকে নিয়ে আর তিনি কবিতা লিখবেন না—এ সংবাদটাও স্বস্তিকর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হ'ল না। মনে হতে লাগল, তার জীবন থেকে কি যেন একটা হারিয়ে গেল চিরকালের মত। পর-মুহূর্তেই মনে হ'ল, ভাস্কর এসেছে। মনে পড়ল তার কথা—'তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব, আর কাউকে বিয়ে করব না।' অপেক্ষা ক'রে আছে কি ? হঠাৎ তার সমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হয়ে উঠল খবরটা জানবার জন্যে।

"মাসীমা—"

"কে ?"

"আমি চণ্ডী। কলকাতা থেকে একটা লোক চমৎকার একটা হলদে পাখী নিয়ে এসেছে। অমরবাবুর স্ত্রী পাঠিয়েছেন। বকুল-মাসীমাকে তিনি একটা পাখী পাঠাবেন ব'লে গিয়েছিলেন। হয়তো এইটে সেই পাখী। তাই আমি আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম—"

"ও। আচ্ছা, চল দেখি।"

সত্যিই রত্নপ্রভা বকুলবালার জন্যে চমৎকার একটা হলদে পাখী পাঠিয়েছিলেন। চিঠিও একটা লিখেছিলেন—

ডানা,

শ্রীমতী বকুলের জন্যে হলদে পাখী পাঠালাম একটা। এই বছরেরই বাচ্চা। তাঁকে পাখীটা পাঠিয়ে দিও। তোমার সমস্যার, আশা করি, সমাধান হয়ে গেছে। অনিলের (মিস্টার গুপ্ত) চিঠি পেয়েছি। আমরা এবার কাশ্মীর পাড়ি দিচ্ছি। সেখানে গিয়ে ঠিকানা জানাব। কালই আমাদের রওনা হওয়ার কথা। আশা করি, তোমরা সব কুশলে আছ। পাখীগুলোর সম্পূর্ণ ভার তোমার উপরেই রইল। ওদের সম্বন্ধে যা ভাল মনে কর ক'রো। যদি ইচ্ছে কর, ছেড়ে দিতেও পার। ওঁর এখন চিড়িয়াখানা করার দিকে তত ঝোঁক নেই। ঝোঁক হয়েছে বিদেশে গিয়ে (ইয়োরোপে, আমেরিকায়, ও-দেশের সমুদ্রের ধারে ধারে) বিদেশী পাখীদের পরিচয় লাভ করা। টাকার যোগাড় যদি হয় চ'লে যেতে পারি। সুতরাং তুমিই ওই পক্ষী-নিবাসের সর্বেশ্বরী হয়ে থাক। ওখানকার জমিদারির আয় থেকেই তোমাদের খরচ চ'লে যাবে। আমরা ওখান থেকে আপাতত কিছু নেব না ঠিক করেছি। আনন্দমোহনবাবুকে আমার প্রণাম জানিও। তুমি স্নেহ-আশীর্বাদ নিও। ইতি

রত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

ডানা যতক্ষণ চিঠিটা পড়ছিল চণ্ডী সোৎসুকে চেয়ে ছিল তার মুখের দিকে। পড়া শেষ হতেই জিজ্ঞেস করলে, "আমাদেরই পাখী, নয় ?"

"হ্যাঁ, নিয়ে যাও। আমার চাকরটাই গিয়ে দিয়ে আসুক। আমি চিঠিও লিখে দিচ্ছি একটা। দাঁড়াও একটু—"

চিঠিটা রূপচাঁদবাবুরও হাতে পড়বে এই সম্ভাবনাটা মনে হ'ল তার। তাই অতি সংযত ভাষায় ছোট চিঠি লিখলে একটা—

শ্রীমতী বকুলবালা,

আপনার জন্যে রত্নপ্রভা দেবী কলকাতা থেকে একটা হলদে পাখী উপহার পাঠিয়েছেন। পাঠালাম এই সঙ্গে। শুনলাম, আপনারা বদলি হয়ে গেছেন। যাব একদিন আপনাদের বাড়িতে। নমস্কার জানবেন। ইতি

ডানা

পাখী নিয়ে ওরা যখন চ'লে গেল, তখন চুপ ক'রে ব'সে রইল সে বারান্দায় একা। মনে হ'ল, সে যেন নিঃস্ব হয়ে গেছে। চোখে পড়ল কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ উঠেছে বটগাছের মাথার উপরে। একটা উপমা মনে এল, সংস্কৃত কাব্যের উপমা, বটগাছটা যেন ধূর্জটির জটাজাল, সেই জটাজালে সুশোভিত হয়েছে বঙ্কিম চন্দ্র। চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল—পাপিয়াটা ডেকে উঠল দূরের একটা গাছ থেকে। তার আকুল স্বরে ডানার মনের আকুলতাই ফুটে উঠল যেন। আরও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল সে। তারপর ঘরে ঢুকে শোবার আয়োজন করতে লাগল। ব্লাউসটা খুলতে গিয়েই কবিতাটা বেরিয়ে পড়ল। সে কবিতার কথা ভুলেই গিয়েছিল। আলোটা কমানো ছিল টেবিলের উপর। সেটা বাড়িয়ে দিয়ে একটু জুৎ ক'রে ব'সে কবিতাটা পড়তে লাগল—

ঝাঁ-ঝাঁ রোদে রুক্ষ মাঠের মাঝ দিয়ে
একা চলেছিলে তুমি।
কাছাকাছি আর কেউ ছিল না, আমিও না,
তুমি নিজেও ছিলে না নিজের কাছে।
আমি যে দূরের লোক থেকে দেখেছিলাম তোমাকে
হয়তো তারই উদ্দেশে অভিসারে বেরিয়েছিলে,
কিন্তু নিজেই তা জানতে না॥

মনে হচ্ছিল তৃষ্ণার্ত মাঠের আর্ত কামনা মূর্ত হয়েছে,
তোমার চলাটা মনে হচ্ছিল প্রবাহ ॥
স্বচ্ছতোয়া তন্বী তটিনীর উপর নেমেছে নব জলধর,
এক জোড়া খঞ্জন উড়ছে,
নীল শাড়িতে ফুটেছে আকাশের মহিমা,
চলার বেগে অকুণ্ঠিত ঔদাসীন্য ॥
রুক্ষ মাঠের তৃষ্ণার্ত কামনা যে ছবি সেদিন এঁকেছিল,
জানি তুমি তা নও,
কখনও হবে না তা-ও জানি।
কিন্তু সত্যি তুমি যা
তা নিয়ে স্বপ্নের ছবি আঁকা যায় না।
তোমার ভঙ্গুরতা তোমার ক্ষণিকের সত্যকে,
যে রূপে তুমি সকলের কাছে পরিচিত হয়েছ তাকে,
চুরমার ক'রে দেবে একদিন।
বেঁচে থাকবে শুধু এই স্বপ্নটুকু।
অলীক রঙে আঁকা এই ছবিটি, যা তুমি নও,
যা তুমি হবে না ॥

ভানা কবিতাটা ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বার দুই পড়ল। নিজের অজ্ঞাতসারেই তার অধরে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল একটি। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে ব'সে থেকে সে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখলে কবিকে নয়, ভাস্কর বন্ধুকে।

৩৫

পরদিনই ভাস্কর বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল ভানার। ভাস্কর বন্ধু নিজেই এসেছিলেন দেখা করতে। তিনি যখন আসছিলেন তখন

ডানা তাঁকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু চিনতে পারে নি। যে লোক সিগারেটটি পর্যন্ত খেত না, তার মুখে যে অত বড় পাইপ ঝুলবে তা প্রত্যাশা করতে পারে নি সে। পরনে খাকী রঙের হাফ-প্যান্ট, হাফ-শার্ট, হাতে ছোট একটা বেত, চোখে গাঢ় কালো রঙের গগল্‌স্‌। ডানা বারান্দায় ব'সে চিঠি লিখছিল, লিখতে লিখতে একবার চোখ তুলে দেখতে পেয়েছিল তাকে। দেখে বিরক্তই হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, কোনও বেকার ছোকরা বোধ হয় আসছে তাকে বিরক্ত করতে। অনেকে আজকাল আসে অমরবাবুর 'পক্ষী-নিবাস'টা দেখতে। অসংলগ্ন অবান্তর প্রশ্ন করে নানারকম। প্রশ্ন শুনলেই মনে হয় পাখীর সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই, কেবল খানিকটা সময় কাটাতে এসেছে।

"চিনতে পারছ আমাকে?"

গগল্‌স্‌ খুলে বারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালেন ভাস্কর বসু। বজ্র প'ড়ে ডানার স্বপ্নসৌধ যেন চুরমার হয়ে গেল। এই সেই ভাস্কর? এত পরিবর্তন হয়েছে! চোখের কোলে কালি, রঙও ময়লা হয়ে গেছে, কেবল চোখের দৃষ্টিটাই উজ্জ্বল আছে তেমনি। আরও উজ্জ্বল হয়েছে বোধ হয়। ডানা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে উঠল।

"ভাস্কর! এস, এস। তুমি এমন ভাবে আসবে তা প্রত্যাশা করি নি। কাল আনন্দবাবুর মুখে যখন শুনলাম যে, ভাস্কর বসু নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন এখানে, তখন—"

"আমি এসেই তোমার খবর পেলাম এস. পি. মিস্টার গুপ্তের কাছে। 'মিস্‌ ডানা' শুনেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর তিনি যখন বার্মা রেফিউজি বললেন, তখন আর সন্দেহ রইল না। শুনলাম, এখানে তুমি কোন পক্ষী-নিবাসের কর্ত্রী হয়েছ? ব্যাপারটা কি? পোল্‌ট্রি?"

"না। চাকরি। এখানকার জমিদার অমরেশবাবু একজন

পক্ষীতত্ত্ববিৎ। তিনি অনেক রকম পাখী ধ'রে রেখেছেন এখানে। তারই তত্ত্বাবধান করি আমি।"

"আই সি। কতদিন আছ?"

"ছ মাস হয়ে গেল। নভেম্বর মাসের শেষে এসেছিলাম।"

"একাই আছ? মিস্টার গুপ্ত তাই বললেন যেন।"

ভাস্কর বসু উঠে এসে আরাম-কেদারাটায় ব'সে পাইপে টান দিয়েই বুঝলেন, পাইপ নিবে গেছে। নিবিষ্ট মনে সেইটেই ধরাতে লাগলেন।

"একাই আছি।"

"আর সবাই কোথা?"

"মারা গেছে। আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। তুমি শোন নি?"

"বাই জোভ, বল কি! না, কিচ্ছু শুনি নি তো। আমি অনেক দিন এ দেশে ছিলাম না।"

ভাস্কর বসু সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারের উপর। ডানা চুপ ক'রে রইল।

তারপর সব বলতে লাগল। তার নূতন জীবনের মাঝখানে পুরাতন জীবনটা হঠাৎ এসে হাজির হ'ল যেন খানিকক্ষণের জন্য।

৭৬

দ্বিপ্রহরের প্রখর রোদে সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন চরের উপর। জ্যোৎস্নার মত রোদটাকেও তিনি উপভোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। দৈহিক কষ্টটাকে আমলই দিচ্ছিলেন না; যে বোধ-শক্তি আরাম বা কষ্টের কারণ সেই শক্তিটাকেই তিনি আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছিলেন, যাতে সে কষ্টটাকেও সুখ ব'লে গণ্য করে। তাঁর মনে হচ্ছিল, যে মুহূর্তে তিনি সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা

উপলব্ধি করতে পারবেন সেই মুহূর্তে সত্যকেও উপলব্ধি করবেন। সুদূর আকাশে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে একটা শকুনি উড়ছিল। তারই দিকে নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ হাত তুলে তাকে নমস্কার করলেন। মনে মনে বললেন, সুদূর আকাশে উঠেছ তুমি। অনেক জিনিসই তোমার চোখে পড়ছে। শুভ্রমেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত রয়েছে দিগ্বলয়ের কাছে। কিন্তু আমি জানি, তুমি ওসব কিছুই দেখছ না। তুমি ব্যাকুল হয়ে সন্ধান করছ, মড়া কোথায় আছে। ও ব্যাকুল একাগ্রতা যদি আমারও থাকত। কিছুতেই একাগ্র হতে পারছি না, কিছুতেই নিস্পৃহ হতে পারছি না। মায়া কেটেও যেন কাটছে না। এই স্থানটার মোহ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। আবার পদচারণ শুরু করলেন। গম যব ছোলা মটর সব কাটা হয়ে গেছে। চরের যে সব জায়গায় ফসল ফলেছিল সে সব জায়গা আবার প্রস্তুত হচ্ছে নূতন ফসলের জন্য। সন্ন্যাসী চেয়ে দেখলেন সন্ত-কর্ষিত জমিগুলোর দিকে। যে গম যব ছোলা মটর তাদের অলঙ্কৃত করেছিল একদিন, বুকে ক'রে ধ'রে রেখেছিল যাদের, তাদের সম্বন্ধে সামান্যতম শোক বা মোহের চিহ্ন তো নেই। তুমি নির্বিকার। তার কাছে ভাল গাছ খারাপ গাছ দুইই সমান; ফুল, শস্য, খাদ্য, বিষ সমস্তই সে উৎপাদন করে, কিন্তু কাউকে আঁকড়ে থাকতে চায় না। তারা দলে দলে আসে আর চ'লে যায়। সে নির্বিকার। নির্বিকার ব'লেই এত অসংখ্য সম্ভাবনার জননী সে সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে শুয়ে পড়লেন ভূমির উপর। উত্তপ্ত চরের নিদারুণ উষ্ণতা প্রবেশ করতে লাগল তাঁর দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর মনে হতে লাগল, বীর্যবতী জননীর আশ্বাসবাণী যেন সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর সর্বাঙ্গে। তিনি যেন বলছেন—ভয় নেই, ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে; থেমো না, এগিয়ে চল। সন্ন্যাসী আবার উঠে বসলেন। স্থির হয়ে ব'সে রইলেন চোখ বুজে। তাঁর খুব কাছে একটি বকও ধ্যানময় হয়ে ব'সে ছিল অনেক আগেই থেকেই

সন্ন্যাসীকে দেখে সে স'রে গেল না। সন্ন্যাসীকে চিনত সে। নিঃসংশয়ে জানত, এঁর দ্বারা কোনও অনিষ্ট হবার আশঙ্কা নেই তার। অনেক দিন এসেছেন, বসেছেন, বেড়িয়েছেন, স্নান করেছেন, কোনদিন তাকে মারতে বা ধরতে যান নি। অনড় হয়ে ব'সে রইল বক। সন্ন্যাসীও অনড় হয়ে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ—বেশ খানিকক্ষণ, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। গুন গুন ক'রে গান গাইতে গাইতে নদীর জলে নামলেন। স্নান করলেন অনেকক্ষণ ধ'রে। তারপর উঠে ভিজে কাপড় প'রেই নিজেই সেই ভাঙা ঘরটির উদ্দেশে চলতে লাগলেন। স্নান করবার পর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে আসছিলেন, খাওয়ার মত যদি কিছু জুটে যায় পথে। বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। আশা করতে লাগলেন, নদীর ধারে যে বেলগাছটা আছে তাতে একটা বেলও অন্তত পেয়ে যাবেন। ঘরে ফিরে অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, ডানার চাকর এক ঝুড়ি ফল নিয়ে ব'সে আছে। ঠিক এই রকম ব্যাপার আর একদিনও হয়েছিল।

চাকর বললে, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মাইজীকে অনেক ফল পাঠিয়ে দিয়েছেন, তিনি আপনাকে কিছু পাঠিয়ে দিলেন।"

সন্ন্যাসী একটি মাত্র ল্যাংড়া আম তুলে নিয়ে বললেন, "আর আমার লাগবে না। ওগুলো তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

"আরও কিছু রাখুন।"

"না। আর দরকার নেই।"

সন্ন্যাসী ঘরে ঢুকে গেলেন। চাকরটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর চ'লে গেল।

৯৭

প্রথম কয়েকদিন ডানার সঙ্গে ডাক্তার বন্ধুর যে পরিচয়টা হ'ল তা ঠিক পুরনো পরিচয় ঝালানো নয়, তা সম্পূর্ণ নূতন পরিচয়।

ভাস্কর বসু যে-ডানাকে দেখলেন, সে ডানা ঠিক তাঁর পূর্বপরিচিত তন্বী রূপসীটি মাত্র নয়। বর্মায় জাপানী বোমা না পড়লে যাকে তিনি বিয়ে ক'রে এক ড্রয়িং-রুমের পরিবেশ থেকে আর এক ড্রয়িং-রুমের পরিবেশে অনায়াসে স্থানান্তরিত করতে পারতেন, এ ডানা সে ডানা নয়। এর দেহ মন আরও পরিপুষ্ট হয়ে অনেক বদলে গেছে। এখন মুখের দিকে চাইলে এ আগেকার মত চোখ নীচু করে না, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে না, বেশ সপ্রতিভ ভাবে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করলে ঘাবড়ে যায় না, বেশ ভেবে চিন্তে উত্তর দেয়, অনেক সময় পাল্টা প্রশ্নও করে। অবশ্য সে জন্য আগের চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর, ঢের বেশী লোভনীয়ও হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তিত্ব ওকে আরও মোহিনী করেছে, মনে হ'ল, সেই ব্যক্তিত্বের বেড়াটা পেরিয়ে তার কাছে যাওয়া শক্ত, ঘনিষ্ঠ হওয়া আরও শক্ত।

ডানাও দেখলে, যে ভাস্কর বসুকে সে চিনত, যাকে নিয়ে তার মন স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল একদিন, এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটি ঠিক সে লোক নন। তরুণ তেজস্বী রিসার্চ-স্কলার ভাস্কর বসুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার দীপ্তি নিবে গেছে। তার সঙ্গে এ লোকটির কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সে ঔজ্জ্বল্য নেই। একটা বহুমূল্য আসবাব অযত্নে বাইরে প'ড়ে থাকলে যেমন হয়, অনেকটা যেন তেমনি। রঙ চ'টে গেছে, জৌলুস নেই। ডানা একে দেখে প্রথমে হতাশ হয়েছিল বটে, কিন্তু দু-চার দিন দেখবার পর সে ভাবটাও কেটে গেল। কৌতূহল হ'ল বরং। বাইরেটা বদলেছে। ভিতরটাও বদলেছে কি? দুজনেই পরস্পরের অন্তরের খবর নেবার চেষ্টা করছিল সোজাসুজি কোন প্রশ্ন না ক'রে। কথায় কথায় যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুই বেরুচ্ছিল না। দুজনেই সাবধানী। এই ভাবেই চলছিল।

...অসহ্য গরম ছিল সেদিন। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছিল

না। ডানা নিজের ঘরের জানলা কপাট বন্ধ ক'রে ক্যাম্প-চেয়ারটায় শুয়ে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে ভাস্কর বসুর কথাই ভাবছিল। রোজই প্রায় ওর সঙ্গে দেখা হচ্ছে, কিন্তু ও বিয়ে করেছে কি না তা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি। সে নিজেও বলে নি, ডানা লজ্জায় ও-প্রসঙ্গ তোলেই নি। কিন্তু কথাটা জানবার জন্যে তার মন ছটফট করছে। মনে হচ্ছে যদি··· কিন্তু না, কথাটা মনে করতেও লজ্জা হচ্ছে। সে নিজের মুখে কিছুতেই বলতে পারবে না। নিজের মনের এই হ্যাংলাপনাতেই সে মরমে ম'রে যাচ্ছে। কিন্তু একটা সত্য সে কিছুতেই এড়াতে পাচ্ছে না, বরং ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে সেটা। ভাস্করের সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয়ে যায়, তা হ'লে অচিরাৎ তার জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আপাতত। কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধটা করবে কে? যে সমাজে সে মানুষ হয়েছে, তা যদিও ঠিক গোঁড়া বাঙালী সমাজ নয়; কিন্তু সে সমাজেও পিতামাতারাই বিবাহ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী। তার তো কেউ নেই, তা হ'লে কি নিজেই তাকে নিজের ব্যবস্থা করতে হবে? ভাস্কর বসুকে ছলা-কলায় ভুলিয়ে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধতে হবে অবশেষে? মৎস্যশিকারীরা টোপের লোভ দেখিয়ে মাছ ধরে যেমন ক'রে? কথাটা ভাবতেও খারাপ লাগছিল তার। কিন্তু··· চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। বন্ধ দ্বারে টোকা পড়ল। মনে হ'ল, টোকা নয়, ঘুষি। কপাট খুলে দেখলে, বকুলবালা দাঁড়িয়ে আছেন। রোদের ঝাঁজে লাল হয়ে উঠেছে মুখটা। পিছনে চণ্ডীও রয়েছে।

"আসুন, আসুন—"

বকুলবালা বললেন, "একটু ঠাণ্ডা জল দিতে পারেন?"

ডানা কুঁজোতে হাত দিতেই বললেন, "খাব না, পা ধোব। পা দুটো ঝলসে গেছে আমার। রাস্তায় ধুলো যেন তপ্ত খোলার বালি।"

"তা হ'লে চানের ঘরে চলুন—"

চানের ঘরে ঢুকে উপর্যুপরি কয়েক ঘটি জল ঢেলে বকুলবালা পা ধুলেন। তারপর নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়েই মুছলেন পা দুটি। ডানা একটা তোয়ালে এগিয়ে দিচ্ছিল, তিনি নিলেন না।

বললেন, "কি হবে তোমার ফরসা তোয়ালেটা ময়লা ক'রে? আমাকে তো একটু পরে কাপড় ছাড়তেই হবে। তখন ভাল ক'রে ধুপে কেচে নেব। এখন যে জন্য এসেছি তা বলি। চমৎকার পাখীটি পাঠিয়েছ ভাই। আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু ফাঁকই পাই নি। উনি কদিন ছুটি নিয়েছিলেন, বাড়িতে ব'সেই আপিসের কাজকর্ম করছিলেন। আমরা এখান থেকে বদলি হয়ে গেছি, মাসখানেক পরেই বোধ হয় চ'লে যেতে হবে। আজ উনি আপিসে গেছেন, তাই চ'লে এসেছি আমি। পাখী নিয়ে কিন্তু অনেক কাণ্ড হয়েছে ভাই। উনি পাখী দেখে ভয়ানক চ'টে গেছেন। বলছেন, অমরবাবুর স্ত্রীই মিথ্যে ক'রে ওঁর নামে লাগিয়ে ওঁকে এখান থেকে বদলি করিয়েছেন, তাঁর উপহার ফেরত দাও। আমি কিছুতেই রাজী হই নি। বাড়িতে সে কি ধুম কাণ্ড ওই পাখী নিয়ে, চণ্ডীকে জিগ্যেস কর না। বল্ না রে—"

চণ্ডী কিছু বলল না, মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শুধু।

বকুলবালা বলতে লাগলেন, "আমি শেষে বলেছি, আমি নিজে কিছুতেই পাখী ফেরাতে পারব না। একজন ভদ্দরলোকের মেয়ে একটা উপহার পাঠিয়েছেন, তা আমি কোন্ মুখে ফিরিয়ে দিতে যাব? তোমার যদি চোখের চামড়া না থাকে তা হ'লে তুমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

এই ব'লে বকুলবালা এমন ভাবে ডানার দিকে চাইলেন যেন ডানাই রূপচাঁদবাবু। ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল, কি আর বলবে?

বকুলবালা তখন আসল প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

"উনি যে রকম জেদী লোক, ঠিক পাখীটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে আসবেন। তখন তুমি যেন ঘুণাক্ষরেও ব'লো না যে, আমি অমরবাবুর স্ত্রীর কাছে পাখী চেয়েছিলাম; তা হ'লে কিন্তু কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবেন বাড়ি গিয়ে। উনি পাখী যদি ফেরাতে আসেন, তা হ'লে তুমি টুঁ শব্দটি না ক'রে পাখীটি নিয়ে নিও। চণ্ডে তার পরদিন এসে পাখীটি তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে আমাকে দিয়ে আসবে, বলবে—ও আর একটা পাখী, ও এক পাখীওলার কাছ থেকে জোগাড় করেছে। কি রে চণ্ডী, যা বলছি তা করবি তো? নিজে যেন গাপ ক'রো না পাখীটি। তোমার এয়ার গান্ আমি দেব—যখন বলেছি ঠিক দেব। সেই পাখীওলাটার সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে ব'লে রাখিস, উনি যদি জিজ্ঞেস করেন তা হ'লে যেন বলে সে-ই পাখী দিয়েছে। কিছু পয়সা দেব বললেই রাজী হয়ে যাবে। ভাল বুদ্ধি করি নি ভাই, পাখীর গায়ে তো আর নাম লেখা নেই। চমৎকার পাখীটি। এর মধ্যেই এমন মায়া ব'সে গেছে। কি সুন্দর ক'রে আজ সকালে ডাকল—ইষ্টিকুটুম। না রে চণ্ডে?"

চণ্ডী বললে, "একবার 'খোকা হোক'ও বলেছিল। তুমি তখন চানের ঘরে ছিলে।"

"মিথ্যুক কোথাকার। চানের ঘরে থাকলে আমি শুনতে পাব না? কানের মাথা খেয়েছি না কি?"

"আমার কিন্তু মনে হ'ল—"

"ভুল শুনেছ তুমি। ইষ্টিকুটুম ছাড়া আর কিছু বলে নি। বলবে অবশ্য ক্রমশ। আর একটু পোষ মানুক।"

একটা গাড়ি হর্ন দিয়ে এসে থামল বাড়ির সামনে।

"কেউ এল বোধ হয় ভাই। আমি পালাই, লুকিয়ে এসেছি তো। উনি হয়তো আজ সকাল সকালই আপিস থেকে এসে

পড়বেন। যাবার আগে আর একদিন আসবার চেষ্টা করব ভাই। যা যা বললুম সব মনে থাকবে তো?"

ডানা মৃদু হেসে বললে, "থাকবে।"

"পালাই তা হ'লে। পিছনের দরজা আছে? তা হ'লে ওই দিক দিয়েই যাই।"

চণ্ডীকে নিয়ে বকুলবালা খিড়কি-দরজা দিয়ে চ'লে গেলেন।

পর-মুহূর্তেই ভাস্কর বসু এসে দাঁড়ালেন দ্বারপ্রান্তে।

"আমার গাড়িটা আজ কোলকাতা থেকে এল। বাইরে বেরুচ্ছি একটু। তোমার হাতে যদি তেমন বিশেষ কাজ না থাকে, চল না, ঘুরে আসবে আমার সঙ্গে।"

"কতদূর যাবে?"

"বেশী নয়, মাইল ষোল। ঘণ্টা দুই লাগবে।"

"এই গরমে বেরুবে?"

"মোটর চললে বেশী গরম লাগে না। হাওয়া লেগে আরামই লাগে বরং। আমাকে যেতেই হবে—একটা এন্‌কোয়্যারি আছে। তুমি যদি না যেতে চাও, থাক্ তা হ'লে।"

ডানা দোমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুহূর্তকাল। এই সফরের সম্ভাব্য ফলাফলের ভাল-মন্দ দুটো দিকই মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠল তার মনে। তারপর যেন মরীয়া হয়ে বললে, "বেশ, চল।"

বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

ভাস্কর নিজেই ড্রাইভ করছিল। পিছনে ব'সে ছিল চাপরাসী। পোস্ট-অফিসের কাছে এসেই ডানার একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। সন্ন্যাসীর কথা। তিনি বলেছিলেন, পোস্ট-অফিসে তাঁর নামে খাতা আছে। সেই খাতা থেকে ভদ্রলোকের আসল পরিচয়টা জেনে নেবে ভেবেছিল সে।

"পোস্ট-অফিসের কাছে একটু থামো তো। একটু দরকার আছে।"

ব্রেক ক'ষে ভাস্কর জিজ্ঞেস করলেন, "কি দরকার ?"

"নদীর ধারে এক প'ড়ো বাড়িতে একটি সন্ন্যাসী থাকেন। শুনেছি এই পোস্ট-অফিসে তাঁর সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট আছে। ভদ্রলোকের আসল নামটা সম্ভবত সেই খাতা থেকে পাওয়া যাবে। আমাকে বলবে কি ?"

"তোমাকে না বলতে পারে, আমাকে বলবে।"

ভাস্কর চাপরাসীকে আদেশ দিলেন পোস্টমাস্টারবাবুকে সেলাম দিতে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তিনি।

"এখানে নদীর ধারে অমরবাবুদের একটা প'ড়ো বাড়িতে এক সন্ন্যাসী আছেন শুনলাম। তাঁর এখানে নাকি একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট আছে। সেই অ্যাকাউণ্টে তাঁর কি নাম আছে একটু দেখে বলুন তো।"

পোস্টমাস্টার বললেন, "কয়েক দিন আগেই তিনি টাকা বার করেছেন। তাঁর নাম হচ্ছে—বিশ্বপতি ভট্টাচার্য। আমিও তাঁকে চিনতাম না, তাঁকে আইডেন্টিফাই করলেন আপনারই আপিসের একজন ক্লার্ক বিনয়বাবু। তিনি ওঁর খবর বলতে পারবেন।"

"কত টাকা আছে ওঁর অ্যাকাউণ্টে ?"

"সাত হাজার টাকা। অনেক দিন ধ'রে প'ড়ে আছে।"

"ও। আচ্ছা।"

আবার মোটর চলতে শুরু করল।

ভানার বিস্ময় সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কে যার সাত হাজার টাকা, সে উঞ্ছবৃত্তিধারী। কেন ?...অন্যমনস্ক হয়ে এই কথাই ভাবতে লাগল সে।

ভাস্কর বসু উঠলেন এসে একটা ডাক-বাংলোয়। নদীর ধারে বেশ মনোরম বাংলোটি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জন্য দারোগা-জাতীয় কয়েক জন লোক অপেক্ষা করছিলেন। ভাস্কর ভানাকে বললেন,

"আমি যত শিগগির পারি কাজটা সেরে নিচ্ছি। তুমি যদি গাড়িতে বসতে চাও—"

ডানা বললে, "তুমি কাজ সার। আমি নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়াই একটু। দু-চারটে পাখীর দেখা নিশ্চয়ই পাব।"

নদীর উপর গোটা দুই কালো-পেট গাংচিল উড়ছিল। তাদের সহজ সুন্দর স্বচ্ছন্দ ওড়ার দিকে চেয়ে ডানা দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর দেখতে পেলে, দুটো বাঁশপাতি উঁচু পাড়ের গর্ত থেকে মুখ বাড়াচ্ছে। আর একটু এগিয়ে দেখল দুটো নয়, অনেক। গর্তও অনেক। বাঁশপাতিরা পাড়া বসিয়ে ফেলেছে একটা। দুরবীনটা আনে নি ব'লে দুঃখ হতে লাগল। গাংশালিকও আছে মনে হ'ল।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সমস্ত দিনের অসহ্য গরমের পর ঝিরঝির ক'রে সুন্দর হাওয়া উঠেছিল। ঝিল্লীর ঝঙ্কারে স্পন্দিত হচ্ছিল অন্ধকার। ডানা চুপ ক'রে ব'সে ছিল একটা ক্যাম্প-চেয়ারে হেলান দিয়ে। ভাস্কর বসুও পাশেই ব'সে ছিলেন। কেউ কোনও কথা বলছিল না। না-বলা কথার ভারে পরিবেশটা যেন আরও নিবিড় আরও ঘন হয়ে উঠেছিল। ভাস্কর হঠাৎ দেশলাই জ্বেলে পাইপটা ধরালেন, নিবিড় ভাবটা কেটে গেল।

"চা দিতে তো বড্ড দেরি করছে। দুধ যোগাড় করতে পারে নি বোধ হয়। আমি টাটকা দুধ দিয়ে চা তৈরি করতে বলেছি। দেখি।"

ভাস্কর বসু উঠে ডাক-বাংলোর সামনের দিকে গেলেন।

ডানা চুপ ক'রে ব'সে রইল। নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে অনেক দূর চ'লে গিয়েছিল। কয়েকটা কাদাখোঁচা আকৃষ্ট করেছিল তাকে। গ্রীষ্মকাল প্রায় শেষ হতে চলল, এদের এতদিন

এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাওয়া উচিত ছিল। এরা বোধ হয় এখনও এ দেশের মায়া কাটাতে পারে নি। এরা কোন্ জাতের, গ্রীন স্যাণ্ডপাইপার (Green Sandpiper), না, কমন স্যাণ্ডপাইপার (Common Sandpiper) তা বোঝা যাচ্ছিল না। উড়লে গ্রীন স্যাণ্ডপাইপারের সাদা পিছন দিকটা থেকে বোঝা যায়—অমরবাবুর দেওয়া একটা বইয়ে পড়েছিল সে। তাই দেখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পাখীগুলো এমনভাবে উড়ছিল যে, পিছন দিকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই করতে করতে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিল সে নদীর ধার দিয়ে দিয়ে। নদীর তীরে এক জায়গায় ঝোপের মত ছিল একটু, তারই পাশে গিয়ে বসল সে অবশেষে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে তার সমস্ত ক্লান্তি চ'লে গেল। ছোট কবিতাও মনে পড়ল একটা। আনন্দবাবু তার খাতায় লিখে দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। কবিতাটা মনে গেঁথে গিয়েছিল তার।

(দূরের আকাশে অনেক সূর্য উঠেছে এবং অস্ত গেছে
কাছের আকাশে এখনও ওঠে নি কেউ
দূরের বাগানে অনেক ফুলেরা ফুটেছে ঝরেছে অতীত কালে
কাছের বাগানে এখনও ফোটে নি কেউ।)

কাছের আকাশে উঠবে সূর্য কাছের বাগানে ফুটবে ফুলেরা জানি
মনের ভিতরে তবুও কিন্তু কাহারা বসিয়া করে যেন কানাকানি
বিরাট সূর্য খুব কাছে এলে সহ্য করতে পারবে কি তাকে হায়
খুব কাছাকাছি ফুটলে ফুলেরা লাগবে কি তব রসবোধ চেতনায়
তাদের সূক্ষ্ম গন্ধ বর্ণ ঢেউ ?

কবি অজ্ঞাতসারেই তার মনের কথাটা লিখেছিলেন ওই

কবিতাটাতে। তাই মনে থেকে গেছে। হঠাৎ সেই কাদাখোঁচা পাখীর দল খুব কাছে এসে বসল এবং উড়ল তখনই। এবার সাদা পিছন দিকটা স্পষ্ট দেখা গেল। ডানা বুঝতে পারল ওরা গ্রীন স্যাণ্ডপাইপারই। ভারি আনন্দ হ'ল বুঝতে পেরে। তারপরই মনে হ'ল, কেন এই আনন্দ? সত্য নির্ণয় ক'রে? না, নিজের অহঙ্কার তৃপ্ত হ'ল ব'লে? আবার পাখীগুলো এসে বসল, আবার উড়ল। এবার উড়ে অনেক দূরে চ'লে গেল। আকাশের ভিতর মিলিয়ে গেল যেন। ডানার মনে পড়ল ওরা দূরের যাত্রী। তারপরই সে সচেতন হ'ল যে, তাকেও ফিরতে হবে। ভাস্করের কাজ হয়তো হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল। এসে দেখলে, ভাস্কর সত্যিই তার অপেক্ষায় ব'সে ছিল।

"ওদিকের ঘরটায় চা দিয়েছে, চল।"

"চল—"

ডাক-বাংলোয় খাওয়াদাওয়া করবার জন্য যে ঘরটা নির্দিষ্ট থাকে, তাতে বেশ কেতাদুরস্তভাবে চা-পানের আয়োজন করা হয়েছিল। পেট্রোম্যাক্স্ জ্বলছিল একটা ঘরের কোণে। চাপরাসী চা ঢেলে দিতে যাচ্ছিল, ডানা তাকে মানা করলে। নিজেই চা ঢালতে লাগল সে। চাপরাসী বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। ভাস্কর বসু নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ডানার আনত মুখের দিকে। আবার নীরবতা ঘনিয়ে এল। একটা সঙ্কটই যেন ঘনিয়ে এসেছে ডানার মনে হচ্ছিল। এমন সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল একটা। অনেক ফুল নিয়ে দ্বারপ্রান্তে একটি লোক এসে দাঁড়াল। ভাস্কর ঘাড় ফেরাতেই ঝুঁকে সেলাম করল লোকটি। তারপর ঘরে ঢুকে একটি চিঠি দিল। ভাস্কর ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চিঠিটার দিকে চেয়ে দেখল একবার। তারপর লোকটিকে বললে, "আচ্ছা, দিয়ে যাও ওগুলো।

বাবুজীকে আমার সেলাম দিও।" লোকটি ফুলগুলো চাপরাসীর হাতে দিয়ে চ'লে গেল।

ভাস্কর মৃদু হেসে চিঠিটা এগিয়ে দিলে ডানার দিকে। ডানা দেখলে লেখা রয়েছে—"মিসেস বসুর জন্যে কিছু ফুল পাঠালাম। আপনারা আমার নমস্কার জানবেন। ইতি কৃষ্ণলাল"

"বেচারা জানেই না যে, আমি বিয়ে করি নি।"

"ও। খবরটা আমিও তো জানতুম না।"

ডানার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

ভাস্কর বসু এ সুযোগ ছাড়লেন না।

বললেন, "তোমার জানা উচিত ছিল। সব ভুলে গেছ নাকি? তোমার স্মৃতিশক্তির ওপর আমার আস্থা ছিল, এখনও আছে।"

ডানা মনে মনে যা প্রত্যাশা করছিল, যা চাইছিল, তাই হ'ল। কিন্তু সে সহসা উত্তর দিতে পারল না কিছু। চোখ নীচু ক'রে চামচেটা চায়ের পেয়ালার ভিতর নাড়তে লাগল আস্তে আস্তে। কি বলবে মাথাতেই এল না।

"ভুলে গেছ সব?"

"না। কিছুই ভুলি নি, তবে—"

আবার থেমে গেল সে।

"তবে কি?"

"কিছুই নয় তেমন। চল, এবার ফেরা যাক।"

ডানা উঠে দাঁড়াল। ভাস্কর বসু কিন্তু ব'সেই রইলেন।

"কথাটা শেষ ক'রেই দাও না যাবার আগে।"

"শেষ করবার তো কিছুই নেই। ধীরে সুস্থে আলোচনা করা যাবে। এখন চল।"

"আলোচনা করবার মত কিছু আছে না কি?"

"আছে কি না সেইটেই আলোচ্য।"

"হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে।"

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। হঠাৎ নজরে পড়ল, ভাস্করের চোখের নীচেটা ফোলা ফোলা। আগে তো এমন ছিল না। এর আগে তার চোখেও পড়ে নি।

"কি দেখছ অমন ক'রে ?"

"কিছু নয়, চল। আমার কাজ আছে।"

দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

১৮

কল্পনার নূতন খোরাক পেয়ে কবি মেতে উঠেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল কাব্য-চর্চায়। বিশেষ ক'রে সংস্কৃত কাব্য তাঁকে পেয়ে বসেছিল যেন। তারপর যখন কলেজে তিনি চাকরি পেলেন, তখন মেতে উঠলেন ছাত্রদের নিয়ে। তাঁর সৃজনীপ্রতিভা লেগে পড়ল ছাত্র-ছাত্রীদের সুরুচি-সৃষ্টি করবার কাজে। কলেজের যা পাঠ্য তা তো তাঁদের পড়াতেনই নানা রকম ক'রে, যা পাঠ্য নয় তাও পড়াতেন। কালিদাস যাঁদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত, তাঁরা ভবভূতি ভারবী ও মাঘেরও আস্বাদ পেতেন কিছু কিছু। ছাত্রদের নিয়েই মেতে ছিলেন তিনি তাঁর চাকরি-জীবনে। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে যখন দেশে ফিরলেন, তখন একটু মুশকিলে পড়েছিলেন। বাল্যবন্ধু রূপচাঁদ ছিলেন অবশ্য, কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যা মাতিয়ে দিতে পারে। তাঁর চতুর [illegible] কোনও প্রেরণা পেতেন না তিনি। তবু তাঁকে নিয়েই দিন কাটছিল। তাঁর পাল্লায় প'ড়েই নীট্শের দু-একখানা বইও [illegible]। খুব ভাল লাগে নি তাঁর। মনে হয়েছিল, তখনকার হৈঁইও-মার্কা বীরপুরুষদের মন রাখবার জন্যই ভদ্রলোক বুদ্ধির কসরৎ করেছেন নানারকম। যারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শকে উপলব্ধি করেছে, তাদের কাছে নীট্শের 'সুপারম্যান' খুব ফিকে। এ দেশে চার্বাক কণুকে

পায় নি, নীটশেও পাবে না। এ নিয়ে রূপচাঁদের সঙ্গে তর্ক হ'ত মাঝে মাঝে। অর্থাৎ নীটশেকে নিয়েই মেতে থাকবার চেষ্টা করতেন তিনি। কিন্তু জমত না। এমন সময় অমরবাবু এলেন তাঁর অপরূপ মানসিক ঐশ্বর্য নিয়ে। যে জগৎ তিনি উদ্‌ঘাটিত করলেন তাঁর চোখের সামনে, তা শুধু পাখীর জগৎ নয়, তা এক অদ্ভুত রহস্যময় অমরাবতী। তার পর এল ডানা। অপরিচিতা, রূপসী, যুবতী। মানবী নয়, যেন স্বপ্ন। নূতন রঙে, নূতন রসে মেতে উঠল তাঁর কল্পনা। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়ে উঠল, যা পাষাণ মনে হচ্ছিল তা ফেটে গেল হঠাৎ, কুলকুল ক'রে বেরিয়ে পড়ল কাব্যনির্ঝরিণী। চলল কিছুদিন। এখন সে ভাবটাও কেটে গেছে। এখন নূতন সুর লেগেছে মনে। অমরবাবুর জমিদারির ম্যানেজার হওয়ার পর থেকে প্রজাদের দিকে তাঁর নজর পড়েছে। কি করলে তারা ভালভাবে থাকতে পারে—এই হয়েছে এখন তাঁর প্রধান চিন্তা। ওই নিয়েই মেতে উঠেছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন। ডানার কাছ থেকে মন স'রে গেছে অনেক দূরে। জোর ক'রে যে সরিয়ে দিয়েছেন তা নয়। নদীর মত আপনিই স'রে গেছে।

…দুপুরের রোদ অগ্রাহ্য ক'রে সেদিন বেরিয়েছিলেন তিনি ইছাপুর গ্রামের উদ্দেশে। হেঁটে নয়, গরুর গাড়ি ক'রে। ইছাপুরের প্রজারা জানিয়েছে যে, এবার তাদের ফসল ভাল হয় নি। তার উপর গ্রামে কলেরার মড়ক লেগেছে। পুকুরে জল নেই, কাদা উঠছে। যে কটি কূপ আছে তাও শুষ্ক হয়ে আসছে। আনন্দবাবু ডাক্তার পাঠিয়ে কলেরার প্রকোপটা আগেই কমিয়েছিলেন। নবাগত ম্যাজিস্ট্রেট ভাস্কর বসুর সহায়তায় কয়েকটা কূপের জীর্ণ-সংস্কারও হয়েছে। দু-একটা টিউবওয়েল করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। কবি যাচ্ছিলেন স্বচক্ষে সব দেখবার জন্যে। একটা

বাগানের কাছাকাছি এসে গাড়োয়ানটা বললে, "হুজুর, গরু দুটোকে একটু জল খাইয়ে আনি। বড্ড হাঁপাচ্ছে। কাছেই নদী, আমি যাব আর আসব। চান করিয়ে নিলে আরও ভাল হয়। যা রোদ।"

কবি বললেন, "বেশ, যাও। খুব বেশী দেরি ক'রো না। আমার বিছানাটা একটা গাছের তলায় বিছিয়ে দাও তা হ'লে। গাড়িতে ব'সে থাকার চেয়ে ওখানে ব'সে থাকা ভাল—"

ছায়াসুশীতল একটি বড় গাছের নীচে বিছানাটি পেতে দিয়ে গাড়োয়ান চ'লে গেল। কবি উপবেশন করলেন। উপবেশন ক'রেই অনুভব করলেন, এক অদ্ভুত স্বর্গরাজ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন। চতুর্দিক যখন রোদে পুড়ে যাচ্ছে, তখন এই শ্যামাঙ্গিনী কানন-লক্ষ্মী আশ্চর্য কৌশলে অদৃশ্য এক স্নেহ-অঞ্চলের আড়ালে এই স্থানটুকুকে রোদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে ফেলেছেন। অদ্ভুত পরিবেশ। তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। সমস্ত অন্তর দিয়ে উপভোগ করতে লাগলেন পরিবেশটা। তার পর গান শুরু করলে একটা দোয়েল পাখী। গ্রাম-সংস্কারের কথা মনে রইল না আর। কবিতার খাতা বেরুল পকেট থেকে। দেখলেন, পুরনো খাতাটা এনেছেন। মাত্র চার-পাঁচ পাতা সাদা আছে। মাঝে মাঝে যে সব পাখী নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাই পরিষ্কার ক'রে টোকা আছে এতে। বহুবার-পড়া কবিতাগুলোতেই চোখ আটকে গেল আবার। আবার পড়তে লাগলেন।

বক

গাই-বক, কোঁচ-বক, রাত-বক
কেউ সাদা, কারো গায়ে নানা ছক।
নদী-নালা-পুকুরেতে চুপচাপ
ব'সে ব'সে মাছ খায় মুপকাপ।

এক মনে ব'সে থাকে নড়ে না
চোখে তার আর কিছু পড়ে না।
আকাশেতে ওঠে রবি, তারা, চাঁদ,
বাগানে রূপের বান ভাঙে বাঁধ।
বাতাসেতে কত লীলা সুরভির
কত সাহানার কত পূরবীর।
বকদের প্রাণে নেই কোন শখ
গাই-বক, কোঁচ-বক, রাত-বক,
দেখে শুধু চুনো-পুঁটি মারে ঘাই
তার চোখে আর কিছু পড়ে নাই।
বক কয়, কবি, মোরা সত্যিই নাজেহাল
তোমাদের মত বল কোথা পাব বেড়াজাল

ময়ূর

নীল-সবুজের সাথে ইন্দ্রধনু করেছে মিতালি
ছন্দ সাথে মহানন্দে মিলিয়াছে মনের আবেগ
উচ্ছ্বসিত পেখমেতে জ্বলিতেছে বর্ণের দীপালি
প্রেয়সী এসেছে কাছে, আকাশেতে উঠিয়াছে মেঘ।

* * *

ভঙ্গী-ভরা দৃপ্ত গ্রীবা অপাঙ্গে কি বহ্নি-বিভা
প্রতি পর্ণে বর্ণময় সুর,
তালে তালে নাচিছে ময়ূর।
নাচিছে কবির চিত্ত বনভূমি হ'ল তীর্থ
স্থূল রূপ হ'ল সূক্ষ্ম, দুঃখ হ'ল দূর
তালে তালে নাচিছে ময়ূর।

নাচে পক্ষী-নটরাজ পরিয়া অপূর্ব সাজ
গ্রীষ্মও যে হ'ল স্বপ্নাতুর,
শাল তাল কর্ণিকার ভাষা নাহি বাণবার
সর্ব অঙ্গে তাহাদের রোমাঞ্চ মধুর
প্রিয়া-পাশে নাচিছে ময়ুর।

শকুনি

কলির জটায়ু তুমি জয়, জয়, জয়
ক্ষুধারূপী রাবণেরে করেছ দমন
জীবন্ত কোন সেনা নাহি করি ক্ষয়।
মরিয়া পড়িয়া থাকে ভাগাড়ে যারা
অভিনব তব রণে যোদ্ধা তারা
শবের বাহিনী ল'য়ে হে শিব-দোসর,
ক্ষুধাসুরে কর পরাজয়।

নহ তুমি মনোহর, বিলাসী নহ,
দুঃখের রুক্ষতা অঙ্গে বহ
মৃত্যুর সাথে তব কি দুঃসহ
ঘনিষ্ঠ ঘোর পরিচয়।
জয়, জয়, জয়।

বাবুই

চোখ দিয়ে যা দেখছ তুমি
আসল সেটা দেখাই নয়,
আসল দেখা হয় যে অনেক পুণ্যে।
বাবুইটাকে ভাবছ পাখী ?
কিন্তু ওরা পাখীই নয়

ব্যাবিলনের শিল্পী ওরা
শহর বানায় শূন্যে।

*　　*　　*

খড়ের বোতল বানিয়ে ওরা
ঝুলিয়ে দিল তালগাছে,
না, না ভায়া, তাড়ির নেশায় নয় গো!
ঘোজঘাজ আর কোটর ছেড়ে
নূতন কিছু করল ওরা
শিল্পী-মনের সেই তো পরিচয় গো!

*　　*　　*

নাইক তাঁত, নাইক হাত
নাইকো কোন যন্তর
তালগাছেতে বুনল শহর
এ কোন্ যাদু মন্তর!

*　　*　　*

আছে কেবল ছোট্ট মুখ
হলদে মাথা, হলদে বুক,
এবং আছে কল্পনা
নেহাত সেটা অল্প না!

*　　*　　*

তাই কি বুড়ো তালগাছটা সসম্ভ্রমে যেন
পাতার ছাতা ধরছে মাথায় ওদের?
কিন্তু ওরা মশগুল যে, তোয়াক্কা নেই রোদের।
শূন্যে শহর ঝুলছে
এই [illegible] রোদ বৃষ্টি ঝুলছে।

আরও অনেক পাখীর বিষয়ে অনেক কবিতা লেখা আছে। কিন্তু কোয়েল পাখীটার অশ্রান্ত গানের তাগিদে পড়া বন্ধ করতে

হ'ল তাঁকে। দোয়েল যেন ভর্ৎসনার সুরে তাঁকে বলতে লাগল—কি কাণ্ড তোমার! আমি এসেছি দেখছ না? এখন অন্য কিছু করা সম্ভব কি! মনে পড়ল, অমরবাবু অনেকদিন আগে একটা চিঠিতে একটা দোয়েলের গানকে আমাদের অক্ষরে লেখবার চেষ্টা করেছিলেন। কবিতায় সে চেষ্টা করলে কেমন হয়? কান পেতে শুনতে লাগলেন মন দিয়ে। তারপর ভেবে ভেবে লিখলেন—ওরই গানের যথাসম্ভব অনুকরণ ক'রে লিখলেন—

চিচাকি—চিচাকি—চিচিরর্‌র্‌
কিনি কিনি কিনি কিনি কুংকিনি কোনিয়া
টুক্‌চি কুট্‌র কিম কোনিয়া
কুরুরু কিচির চং
কুরুরু কিচির চং
জুচ্‌কি জুচ্‌কি কি রে কিচ্‌কিচ্‌ কোনিয়া।

মানুষের কাছে এর কোন অর্থ নেই। কিন্তু দোয়েলের কাছে আছে। দোয়েলটা উড়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এসে বসল একটা ল্যাজ-ঝোলা পাখী। এ পাখীটি তাঁর প্রিয় পাখী। লম্বাটে ধরনের বাদামী রঙের পাখী, ল্যাজটি লম্বা, মাথাটি কালো; কিন্তু ওর রূপের জন্য নয়, ওর সাবলীল বেপরোয়া ভাব-ভঙ্গীর জন্য ওকে কবির ভারি ভাল লাগে। বুলিও ছাড়ে নানারকম। চ্যা—চ্যা—চ্যা ডাকের জন্য বেরসিক লোকেরা ওর নাম দিয়েছে হাঁড়ি-চাঁচা। কিন্তু তারা বোধ হয় ওর ক-অক্লিং ডাকটা শোনে নি। ওই ডাকটাই মাঝে মাঝে মাঝে শোনায় 'খুকু নেই' 'খুকু নেই'। এ ছাড়াও কখনও কখনও গঁয়-গঁয়-গঁয়-গঁয় ধরনের শব্দ করে পাখীটা। অদ্ভুত শোনায়। মনে হয় কোনও ছোট ছেলে যেন

গন্‌গন্‌ ক'রে বায়না করছে। ল্যাজ-ঝোলা যেন কবির মনের কথা টের পেয়ে তার সেরা বুলিটা শুনিয়ে দিল।

"ক-অক্‌রিং—ক-অক্‌রিং—ক-অক্‌রিং।"

বেশ ছুলে ছুলে ডাকতে লাগল। যাকে উদ্দেশ ক'রে এই সুরেলা সম্ভাষণ সেই পক্ষী-প্রিয়াকেও দেখতে পেলেন কবি। আর একটা গাছে বেশ সপ্রতিভভাবে সে ব'সে আছে, যেন কেউ তাকে ডাকছে না। কবি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। শুরু করলেন কবিতা আবার। এবার পাখীর ভাষায় নয়, বাংলা ভাষায়।

যদিও পুরুষ পাখী তবু যেন কিশোরী
বাদামী গায়ের রঙ, কালো মাথাটি
পুচ্ছের পাখীটি জাপানী, না, মিশরী
(তোমরা তা ঠিক কর আমি জানি না)
আমি জানি চুরি ক'রে খাবে আতাটি।

চুরি ক'রে ফল খায়, চুরি ক'রে ডিম খায়,
প্রেয়সীর কাছেতেই শুধু হিমসিম খায়,
খোশামোদী সুর জাগে গলাতে
মনে হয় যেন আমতলাতে
বৃন্দাবনের সুর বাজল
বাঁশরীর সুরে বুঝি শ্রীরাধিকা সাজল।

ক-অক্‌রিং ক-অক্‌রিং ক-অক্‌রিং—
ল্যাজ-ঝোলা পাখীটাই ছুলে ছুলে ডাকছে
মাঝে মাঝে চুপ ক'রে থাকছে।
ভাবছে, প্রিয়ার কথা ভোল্‌ না
আবার ছুলিয়ে দেহ দোল্‌ না

পুনরায় ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং,
ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং।

উঁচু ডাল থেকে পাখী নিচু ডালে নামছে
মাঝে মাঝে ডাকছে ও থামছে।
গাছের সবুজে রোদ জ্বলছে
মদন-দহনে পাখী বলছে
ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং।

সহসা বেসুরা ডাক—চ্যা চ্যা চ্যা—
বিবেকই বলছে বুঝি ছ্যা ছ্যা ছ্যা
আর কত খোশামোদ করবি
আর কত ডেকে ডেকে মরবি
বাড়িয়ে সুরের হাত আর কত পায়ে তার ধরবি।
একটুও নেই তোর লাজ হায়।
ল্যাজের বাহার দিয়ে উড়ে গিয়ে বসল
ফল-ভারে নত আমগাছটায়।

ক্ষণ পরে দেখি পুন ডাকছে
ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং।

কবিতাটা শেষ ক'রে কবি অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন চুপ ক'রে। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল। মানুষ ছাড়া আর কেউ বুড়ো হয় না। গাছেরা পাখীরা প্রতি বছর বার্ধক্যের খোলস ফেলে দিয়ে যৌবনের সাজে সজ্জিত করে নিজেদের। নবমুকুলে সজ্জিত বৃদ্ধ আমগাছটার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি মুগ্ধ নেত্রে। ল্যাজ-ঝোলা পাখীটা সমানে ডেকে চলেছে। ওর বয়স কত সে প্রশ্নই মনে

জাগছে না, যৌবনসুলভ আনন্দে ও মেতে উঠেছে—এইটেই এই মুহূর্তে ওর শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ডানার কথা মনে হ'ল। ডানাও ফুরিয়ে যাচ্ছে, তার আবির্ভাব তাঁর কল্পলোকে যে উৎসবের সাড়া তুলেছিল তা দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে তুবড়ির মত। ডানা আর তাঁর কবিতার খোরাক যোগাতে পারবে না ভেবে কষ্ট হতে লাগল।

"এবার চলুন হুজুর—"

গাড়োয়ানের আগমনে সহসা নূতন জগতে নীত হলেন তিনি।

৯৯

সেদিন মোটরে ভাস্করের সঙ্গে ডানার আর কোনও কথা হয় নি। দুজনেরই মন নানা কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু দুজনেই ইতস্তত করছিল। শীতকালে জলের ঘটিটা মাথায় ঢালার আগে অনেকে যেমন ইতস্তত করে, অনেকটা তেমনি। দুজনেই বুঝতে পেরেছিল, কথাটা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে তখন শেষ করতেই হবে। কোথায় শেষ হবে এই অনিশ্চয়তাটাই দুজনকে আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় দোলাচ্ছিল। দুজনেরই মনে হচ্ছিল, অসাবধানে বেফাঁস কিছু ব'লে ফেললে সুরটা কেটে যাবে হয়তো। তাই কেউ কিছু বলছিল না। তা ছাড়া, চাপরাসীটা পিছনে ব'সে ছিল।

নিজের বাংলোর কাছাকাছি এসে ভাস্কর বললেন, "এখানেই নাববে, না, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব?"

"পৌঁছেই দাও। আমার কাজ আছে একটু।"

"এত রাত্রে আবার কি কাজ?"

"পাখীগুলোর খবর নিতে হবে একটু। আজকের ডাকটাও দেখা হয় নি। অমরেশবাবুর বা রত্নাদির চিঠি আসতে পারে।"

"চল, তা হ'লে পৌঁছে দিই। আলোচ্য বিষয়টার আলোচনা কখন করবে ?"

"করলেই হবে একদিন। ব্যস্ত কি ?"

"আমার কিন্তু একটু তাড়া আছে।"

"কিসের তাড়া ?"

"এক মিনিটের জন্য নেবে এস, দেখাচ্ছি, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।"

বাংলোর ভিতর ঢুকেই ডানা বুঝতে পারল, বাড়িতে স্ত্রীলোক নেই কেউ। জিনিসপত্র সবই আছে, কিন্তু সেগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা নেই। ড্রয়িং-রূমের মাঝখানে একটা বিশ্রী কালো টেবিলের উপর আধ-খোলা সুটকেস একটা। ভাস্কর সেইটেই হাঁটকাতে লাগলেন এসে। কাগজপত্র, রুমাল, টাই ছড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর। সুটকেস থেকে একগোছা খাম বার করলেন ভাস্কর বসু।

"এই দেখ। একটা খুলে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।"

খুলতেই একটি সুশ্রী মেয়ের ফোটো বেরিয়ে পড়ল।

"প্রত্যেক খামেই একটা ক'রে ফোটো আছে। আরও আসবার সম্ভাবনা আছে। কোথাও কোনও জবাব দিই নি। কিন্তু কত দিন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে ?"

"আচ্ছা, পরে কথা হবে এ বিষয়ে। আজ আর নয়।"

মুচকি হেসে ডানা বেরিয়ে গেল। বাইরে সে যতটা সপ্রতিভতা দেখাল, মনে মনে কিন্তু ঠিক ততটা সপ্রতিভ সে থাকতে পারল না। হঠাৎ কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ল, আর সেজন্য লজ্জিতও হ'ল মনে মনে।

ভাস্কর তাকে বাড়িতে নামিয়ে রেখে চ'লে গেলেন। ডানা চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও কেউ নেই। চাকরটাও

নেই। মনে হ'ল, যেন অসীম নির্জনতার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে তাকে আবার। আবার নূতন ক'রে নবলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে হবে বুঝি। পুরাতন পরিবেশেই কিন্তু ফিরে আসতে হ'ল পর-মুহূর্তে। চাকরটা এল। কেরোসিন তেল আনতে গিয়েছিল।

"মুন্সী এসেছিল কি?"

"এসেছিল।"

"কিছু ব'লে গেছে?"

"আরও দু-একটা পাখী ম'রে গেছে বললে।"

চুপ ক'রে রইল ডানা। সে যদি ভাস্করের সঙ্গে না গিয়ে পক্ষী-নিবাস পরিদর্শন করতে যেত তা হ'লে যে ওরা বাঁচত তা নয়, কিন্তু তবু ডানা নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে গেছে যার উপর তার কোনও হাত নেই। বন্দী পাখীদের স্বাস্থ্য-নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য তার নেই, অথচ ওই তার চাকরি।

"চা খাবেন মা?"

"কর একটু। পিওন এসেছিল?"

"এসেছিল। একটা চিঠি আছে।"

ডানা ঘরের ভিতর ঢুকে অনেকটা যেন আরাম বোধ করল। এতক্ষণ যেন সে রাস্তা হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চিঠি লিখেছিলেন অমরেশবাবু। ডানা খামখানা উলটে-পালটে দেখলে। মনে হ'ল, কাশ্মীর থেকে লিখেছেন। ভাবলে, স্নান সেরে ভাল ক'রে পড়া যাবে।

স্নান শেষ ক'রে চা খেতে খেতে সে এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল যে, অমরেশবাবুর চিঠিখানার কথা মনেই রইল না তার আর। কেন সে অন্যমনস্ক হয়েছে তা নিজেও সে বলতে পারত না। সজ্ঞানে

সে কিছুই ভাবছিল না, ভাস্করের কথাও নয়। তার মনটা যেন অন্ধকার ঘরের মত হয়ে ছিল, সচেতন ভাবে কিছুই যেন পরিস্ফুট হচ্ছে ছিল না সেখানে। অন্যমনস্ক হয়ে সে কেবল চায়ের পেয়ালায় ছোট ছোট চুমুক দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ অন্ধকার ঘরে আলো জ্ব'লে উঠল, সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। ভাস্কর আসার পর থেকে কয়েকদিন তাঁর খোঁজ নেওয়া হয় নি। তাঁর সম্বন্ধে যে সব বিস্ময়কর খবর সে সংগ্রহ করেছে, তা মনে পড়তেই সে উঠে দাঁড়াল। মনে হ'ল, মস্ত বড় একটা কর্তব্য যেন অসমাপ্ত রয়েছে। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশের তলায় যে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য আত্মগোপন ক'রে আছেন, তার রহস্যটা আবিষ্কার করতেই হবে। প্রাক্তন জমিদার সহায়রাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক আছে কি না, সেটা জানাও যেন দরকারী মনে হ'ল তার। টর্চ নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। চাকরটাকে ব'লে গেল, সে একটু বেড়াতে বেরুচ্ছে, খুব জরুরী দরকারে কেউ যদি আসে, সে যেন অপেক্ষা করে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে ফিরে আসবে।

সন্ন্যাসীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে ডাকলে, "বিশ্বনাথবাবু বাড়ি আছেন?" কোনও উত্তর এল না। বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল ডানার। চ'লে গেছেন না কি ভদ্রলোক! আর একবার ডাকলে, কোনও সাড়া নেই। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে, কপাটটা খোলা রয়েছে, ঘরের ভিতর কেউ নেই। টর্চের আলোয় শাবলের ডগাটা চক্‌চক্‌ ক'রে উঠল। সেটা একটা কোণে ঠেসানো ছিল। কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর মনে হ'ল, হয়তো চরে কোথাও গেছেন। তিনি সাধারণত কোথায় গিয়ে বসেন তা ডানার জানা ছিল। চরের উপর পায়েচলা পথও হয়েছে আজকাল। একটু খুঁজে দেখলে ক্ষতি কি! চরের দিকে এগিয়ে গেল সে।

চরে ভীষণ অন্ধকার। নিঃশব্দ নয়, বাঙ্ময়। অসংখ্য ঝিল্লী ডাকছে। ঝিল্লীও বোধ হয় এক রকম নয়, নানা রকম শব্দ হচ্ছে। তার সঙ্গে মিশছে ভেকের ডাক, পেচকের কর্কশ চীৎকার, টিট্টিভ পাখীদের 'ডিড্-হি-ডু-ইট্' (Did-he-do-it)। 'চোখ গেল' পাখীও ডাকছে একটা। গাংচিলদের কলরব শোনা যাচ্ছে। আর একটা কি পাখী মাঝে মাঝে ডাকছে আর থামছে। মনে হচ্ছে সাপে বুঝি ব্যাঙ ধরেছে—কুঁক্ কুঁক্ কুঁক্, তিন-চারবার ডেকেই থেমে যাচ্ছে। কোন রকম প্যাঁচা কি? ডানার মনে হচ্ছিল, বিরাট অন্ধকারই যেন নানা ভাবে কথা কইছে। দিনে আলোর নানা লীলায় প্রকৃতি যে বার্তা আমাদের মনের মধ্যে পৌঁছে দিতে চায়, অন্ধকারে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে শ্রুতিপথে কি সেই বার্তাই পাঠাচ্ছে প্রকৃতি? না, এ অন্য কিছু? অন্ধকারকে মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলে চমকে দেবার চেষ্টা করছিল ডানা। অন্ধকার কিন্তু চমকাচ্ছিল না। তার বিরাট অতিকায় রূপের নিকষে এতটুকু দাগ পড়ছিল না। ক্ষুদ্র আলোর রেখাটাই যেন অপ্রতিভ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছিল তার সীমাহীন বিশালতার কাছে। হঠাৎ ডানার মনে হ'ল, যা আমরা অসীম বা অনন্ত ব'লে কল্পনা করি তা কি আলোহীন? আলোয় আমাদের বুদ্ধি দৃষ্টিসীমায় আটকে যায়, আদি এবং অন্ত আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। অন্ধকারে তা পাই না, অন্ধকারই আমাদের মনে অসীমের আভাস জাগিয়ে তোলে। টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে নানা রকম এলোমেলো ভাবনার ঘাত-প্রতিঘাতে অন্যমনস্ক হয়ে ডানা এগিয়ে চলেছিল অন্ধকারে। তার ভয় করছিল না; সে জানতে পারছিল না যে, তার মনের নেপথ্যে এক শক্তিমান পুরুষ অমোঘ আকর্ষণে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করবার শক্তি তার ছিল না। চলতে চলতে হঠাৎ সে থেমে গেল। গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল, নদীর মৃদু কলধ্বনি শোনা গেল। সে বুঝতে পারল যে, চরের শেষ

প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছে, সামনেই নদী। নদীর জলে টর্চ ফেলতেই একদল হাঁস কলরব ক'রে উড়ে গেল। ডানার মনে হ'ল, হাঁসেরা এখনও ফেরে নি নাকি নিজেদের দেশে? ডাক শুনে মনে হ'ল চখা। মনে পড়ল, চখারা অনেক দিন পর্যন্ত এ দেশে থাকে। তারপর মনে হ'ল, হাঁসেদের স্বদেশ ব'লে কিছু আছে কি! সমস্ত পৃথিবীটাই তো তাদের দেশ, যখন যেখানে ভাল লাগে তখন সেখানে থাকে। হিমালয়, রাশিয়া, উত্তরমেরু, ভারতবর্ষ, ইয়োরোপ, আমেরিকা ওদের কাছে যেন এ-পাড়া ও-পাড়া। আমরাই কেবল একটা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বাস ক'রে এটা স্বদেশ ওটা বিদেশ, এ আত্মীয় ও পর—এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করি। টর্চের আলোটা এদিকে ওদিকে ফেলে নদীর ধারে ধারে এগিয়ে যেতে লাগল সে। ছোট-বড় বালির ঢিপি, ঝাউগাছ, মাঝে মাঝে দু-একটা শেয়াল দেখা যাচ্ছে। একটা শেয়াল তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চ'লে গেল। সন্ন্যাসী যেখানটায় সাধারণত বসেন সেখানে উপস্থিত হ'ল সে অবশেষে। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে। মনে হ'ল, দূরে—অনেক দূরে কে যেন গান গাইছে। সন্ন্যাসী কি? উনি একা ব'সে অনেক সময় গান করেন। এগিয়ে চলল ডানা সেই দিকে। বালি ভেঙে ভেঙে অনেক দূর যেতে হ'ল। গিয়েও কিন্তু সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়া গেল না। ডানা টর্চ ফেলে ফেলে নির্ণয় করবার চেষ্টা করতে লাগল, গানটা গাইছে কে, আর কোথায় ব'সেই বা গাইছে। হঠাৎ দেখতে পেল, নদীতে একটা নৌকো ভেসে চলেছে। নৌকো থেকেই গানটা ভেসে আসছে। গানের লাইনগুলো সুন্দর। এ গান আর কোথাও শুনেছে ব'লে মনে পড়ল না।

স্রোতে তরী ভাসিয়েছি তাই
নাইক আমার পথের চিনা রে,

ভরসা আছে স্রোতই আমায়
নিয়ে যাবে সাগর-কিনারে।

সন্ন্যাসী আছেন নাকি ওই নৌকোতে? চ'লে যাচ্ছেন এখান থেকে?—এই প্রশ্ন মনে জাগবামাত্র একটা অপ্রত্যাশিত সত্যের সম্মুখীন হ'ল সে। সন্ন্যাসী যে তার মনে কতখানি স্থান জুড়ে ব'সে আছেন তা সে বুঝতে পারল।

"বিশ্বনাথবাবু—ও সন্ন্যাসী ঠাকুর—"

চীৎকার ক'রে ডাকল সে একবার। কিন্তু সেই বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার নিজের কানেই হাস্যকর শোনাল। নদীর বাঁকে নৌকো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, টর্চ ফেলে ফেলে এইটেই দেখতে লাগল সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গান ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল, তারপর আর শোনা গেল না। নৌকোও মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। ডানার পা দুটো ব্যথা করছিল, সে ব'সে পড়ল বালির ওপর। অনেকক্ষণ ব'সে রইল চুপ ক'রে। (অসীম অন্ধকারের মধ্যে ব'সে ব'সে তার মনে হতে লাগল, নবজন্মের প্রতীক্ষায় সে যেন ব'সে আছে, মাতৃজঠরের অন্ধকারে ভ্রূণ যেমন থাকে।) লক্ষ লক্ষ ঝিল্লীর কণ্ঠে অন্ধকারের ভাষা শুনতে লাগল। মনে পড়ল, সন্ন্যাসী অনেক দিন আগে বলেছিলেন—তুমি মানুষ, ওই ঝিল্লীর গানের যে-কোনও অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা আছে তোমার। ডানার মনে হ'ল, অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা হয়তো আছে, কিন্তু সেই অর্থটাই যে ঠিক অর্থ তা কে ব'লে দেবে। তা নির্ণয় করবার মানদণ্ড কি? হঠাৎ একটা শব্দ হ'ল—বুম্-ও-বুম্। চমকে উঠল ডানা। মনে হ'ল, কে যেন কথা কইল। টর্চ ফেলেই কিন্তু দেখতে পেলে হুতোম প্যাঁচাটাকে। নদীর উপর ঝুঁকে-পড়া একটা গাছের ডালে ব'সে ছিল, টর্চের আলো পড়তেই উড়ে গেল। নদীর উপর দিয়ে, প্রায় নদীর জল

ছুঁয়ে ছুঁয়ে, গাংচিলের মত উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্যাঁচাটাকে দেখে হঠাৎ অমরেশবাবুর কথা মনে প'ড়ে গেল। তাঁর কাঁধে উঠে সে একবার একটা প্যাঁচার বাসা দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, অমরেশবাবুর যে চিঠিটা এসেছে সেটা খোলা হয় নি এখনও। আর ব'সে থাকতে পারল না, উঠে বাসার দিকে ফিরতে লাগল। ফিরতে ফিরতে একটা কথাই বার বার মনে হতে লাগল, সে সন্ন্যাসীর খোঁজে এসেছিল কেন? শুধু কি নিছক কৌতূহল? নিছক কৌতূহল কি তাকে এই অন্ধকারের চরের মধ্যে ঘোরাতে পারত? কেন এই আকর্ষণ?

ডানা যখন ফিরল, তখন প্রায় এগারোটা বাজে। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চাকরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে উঠিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে অমরেশবাবুর চিঠিখানা নিয়ে বসল সে। চাকরটা বললে, খানিকক্ষণ আগে রূপচাঁদবাবুর ঠাকুর এসেছিল, পাখীর খাঁচাটা রেখে গেছে।

"খালি খাঁচা?"

"না, পাখীটাও আছে।"

"কোথায় রেখেছ?"

"আপনার শোবার ঘরে।"

ডানা অমরেশবাবুর চিঠিটা পড়তে শুরু করল এবার—

কল্যাণীয়া ডানা,

এখন ভূস্বর্গে এসেছি, সুতরাং লৌকিকতার ছদ্মবেশ খুলে ফেললাম। তোমাকে আর 'আপনি' বলব না, 'তুমি' বলব। এ ব্যাপারে রমা অনেক আগেই সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছে। অনুর থেকে আমিও হলাম। কাশ্মীরকে যে কেন ভূস্বর্গ বলে তা ব'লে বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। আনন্দবাবু একটা কবিতাতেই

যা পারতেন, পাতার পর পাতা লিখে গেলেও আমি তা পারব না। সুতরাং সে চেষ্টাও করব না। ছোট্ট একটি ইংরেজী কথায় কেবল বলব, লাভ্লি! আমাদের এ কাশ্মীর ভ্রমণে মহত্ত্ব বা রোমাঞ্চকর কিছু নেই। সার্ ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাস্ব্যাণ্ডের মত দুর্গম গিরি-কান্তার পার হয়েও আমরা কাশ্মীরে প্রবেশ করি নি। সার্ ফ্রান্সিস্ পিকিং থেকে হাঁটাপথে উনিশ হাজার ফুট উচ্চ তুষারাচ্ছন্ন 'মুস্তাঘ্ পাস' অতিক্রম ক'রে বাল্টিস্তানে এসে পৌঁছেছিলেন। পথ চলতে চলতে তাঁকে বিছানা কেতলি প্রভৃতি সব ফেলে দিতে হয়েছিল। তাঁর তাঁবু ছিল না। আকাশের নীচে মাটির উপর শুয়ে থাকতেন তিনি হিমালয়ের বুকের উপর। নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, জুতো পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ভ্রমণ-কাহিনী লেখবার মালমসলা ভাগ্যবানদের ভাগ্যেই জোটে। আমার সে রকম ভাগ্য নয়। আমি রেল গাড়ি, মোটর গাড়ি, টোঙ্গা এবং হাউসবোটের সহায়তায় আরামেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তুমি এবং আনন্দবাবু যদি সঙ্গে থাকতে তা হ'লে ভ্রমণটা আরও মনোরম হ'ত। রত্না বড় বেশী গম্ভীর লোক তো, খুব কম কথা বলে। মনে যখন খুব বেশী কথা জ'মে ওঠে, তখন চোখের দৃষ্টি দিয়ে তা উপচে পড়ে। ভ্রমণকালে ওর চেয়ে আর একটু কম নীরস সঙ্গী থাকলে বেশী জমত। রত্নাও সে কথা কাল বলছিল। রত্নার মুখে তোমার বিপদের কথা শুনে কৌতুক অনুভব করলাম। আশা করি, বিপদ এতদিনে কেটে গেছে। এখন আমরা শ্রীনগরে একটা বোটহাউসে আছি। যখন সিমলায় ছিলাম তখন সেখানকার দু-চারটে পাখীর খবর আনন্দবাবু [illegible]। এখানেও সে সব পাখী আছে। তবে কাল সন্ধ্যার দিকে 'চাক্ চাক্ চাক্ চাওয়াক্' এই শব্দ শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। ঠিক এ ধরনের পাখীর ডাক আগে শুনেছি ব'লে মনে পড়ল না। বেরিয়ে এলাম। দেখি খাঁচা নিয়ে একটা লোক ব'সে আছে। কি পাখী আছে খাঁচায় জিজ্ঞাসা করাতে সে

বললে—'চুকর'। দেখলাম, পাখীটি এক রকম পাহাড়ী তিতির। চমৎকার দেখতে। সালেম আলির বইয়ে ছবি আছে দেখো। ও-দেশে অনেকে যেমন শখ ক'রে তিতির পোষে, ও-দেশে যেমন তিতিরের লড়াই হয়, এ-দেশেও শুনলাম চুকরকে নিয়ে ঠিক একই কাণ্ড। চুকরকে কেন্দ্র ক'রে অনেকে টাকা হাত বদল করে এখানে। আমি ভাবছি, এই চুকর আমাদের কাব্যের চকোর নয় তো। চাঁদ বা জ্যোৎস্নার সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ আছে কি না জানি না। খোঁজ করব। তুমি আনন্দবাবুকেও জিজ্ঞাসা ক'রো, কাব্যের চকোরের কোনও বর্ণনা কোথাও তিনি পেয়েছেন কি না। আমার লাইব্রেরিতে গিয়ে অভিধানখানা একবার উলটে দেখো। যদি কোন খবর পাও জানিও। এখানে আর এক রকম পাখী দেখছি। লালমাথা লাফিং থ্রাশ। সিমলায় যে লাফিং থ্রাশ দেখেছি তা অন্যরকম। তার নাম স্ট্রায়েটেড্ লাফিং থ্রাশ। এখানকার পাখীদের পুরো পরিচয় এখনও পাই নি তেমন। এই গরমের সময়টা হিমালয়ভ্রমণের পক্ষে অনুকূল নয়, তবু যখন এসে পড়েছি যতটা পারি দেখে যাব। তবে এখানে কতদিন থাকব তার স্থিরতা নেই। কিছু টাকার যোগাড় হ'লে বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। রত্নার মুখে শুনলাম, তুমি আর আনন্দবাবু খুব মন দিয়ে কাজ করছ। আমারও তোমাদের মত কাজ করতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু এক জায়গায় বেশীদিন ভাল লাগে না। মনটা ছটফট করে অন্য কোথাও যাবার জন্যে। হয়তো সব জায়গা দেখা হয়ে গেলে কোথাও মন স্থির ক'রে বসতে পারব। কিন্তু পারব কি? অত টাকা আর সময় কোথা পাব? ডাকের সময় বেশী নেই। সুতরাং এইখানেই শেষ করি। তুমি আর আনন্দবাবু আমার প্রীতি ও নমস্কার নিও। ইতি

তোমাদের অমরেশ

চিঠিটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুয়ারে টোকা দিয়ে কপাটটা ঠেলে রূপচাঁদ প্রবেশ করলেন। মুখে মৃদু হাসি, হাতে জলন্ত সিগারেট।

"সিগারেটটা ফেলেই দিয়ে আসি—"

বেরিয়ে গিয়েই ফিরে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"কপাটটা বন্ধ ক'রে দেব ?"

"কেন, খোলাই থাক্ না।"

"ভেজানো থাক্ তা হ'লে। চাকরটা বাইরে নেই। তাকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছি।"

ডানা উঠে দাঁড়াল।

"এত রাত্রে কি দরকার আপনার ?"

তার কণ্ঠস্বরে যেন ধনুকের টঙ্কার ধ্বনিত হ'ল। রূপচাঁদ ক্ষণকাল তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে, "বলছি। ভয় পাবার মত কিছু নয়। দু-চার দিনের মধ্যেই চ'লে যাব, তাই বিদায় নিতে এসেছি। তোমার কাছে এটা হয়তো সামান্য ব্যাপার, কিন্তু আমার কাছে এটা অসামান্য। তুমি আমার জীবনের কতখানি—না, থাক্, সস্তা কবিত্ব করব না। তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে দশজনের সামনে মেকি হাসি হেসে ছোট্ট নমস্কার ক'রে তোমার কাছে বিদায় নেওয়া চলে না। এর জন্যে খানিকটা নির্জন নিবিড় সময় চাই। সেই জন্যেই এখন এসেছি। একটু আগেও এসেছিলাম। তুমি তখন ছিলে না। ভয় পেয়ো না, ব'স।"

এর পর না-বসাটা একটু অশোভন। ডানাকে বসতে হ'ল।

"আপনি যে এখন এখানে আসবেন—এ কথা আপনার স্ত্রী জানেন ?"

"না। সে জানে আমি এখানে নেই, আপিসের কাজে বাইরে গেছি। তাকে ব'লে গিয়েছিলাম, হলদে পাখীটা আজ সন্ধ্যেবেলা যেন ফেরত পাঠানো হয়। পাঠিয়েছে কি ?"

"পাঠিয়েছে। রত্নাদি আপনার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছেন পাখীটা। ওটা ফেরত দিচ্ছেন কেন?"

"আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার রত্নাদির চাক্ষুষ পরিচয় পর্যন্ত নেই। তিনি হঠাৎ উপহার দিতে গেলেন কেন, তা আমার মাথায় ঢুকছে না। এই হ'ল প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তাঁরই ষড়যন্ত্রের ফলে আমাকে এখান থেকে বদলি হ'তে হ'ল। তিনি গুপ্ত সাহেবের কাছে আমার বিরুদ্ধে কি যেন ব'লে গেছেন। বদলির অবশ্য সময় হয়েছে আমার, কিন্তু গুপ্ত সাহেব ইচ্ছে করলে আমাকে এখানে আরও কিছুদিন রাখতে পারতেন। কিন্তু তোমার রত্নাদির জন্যে সেটা আর হ'ল না। আই হেট দ্যাট ওম্যান। উপহার দেওয়ার ছলে অপমান করেছেন আমাকে তিনি। এসব টাকার গরম, আর কিছু নয়।..."

সত্য কথাটা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না ডানার। বকুলবালা মানা ক'রে গিয়েছিলেন, তাই চুপ ক'রে থাকতে হ'ল। রূপচাঁদের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল, চোখ দিয়ে আগুনের ঝলক বেরুচ্ছিল।

"এর সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত একটা। খাঁচাটা কোথায়?"

"ওই খাটের নীচে আছে।"

রূপচাঁদ খাঁচাটা বার করলেন।

"কি করবেন ওটা নিয়ে এখন? পাখীটা পাঠিয়েই দেব তাঁকে।"

"পাখীর গলাটা মুচড়ে দেব। রক্তাক্ত মরা পাখীটা পাঠিয়ে দিও। ব'লে দিও, আমি স্বহস্তে ওর গলা মুচড়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। আই উইশ আই কুড রিং হার নেক টু।"

রূপচাঁদ সত্যিই খাঁচাটা খুলে খাঁচার ভেতর হাত ঢোকাতে যাচ্ছিলেন। ডানা বাধা দিল, তাঁর হাতটা ধ'রে বললে, "ছি ছি, কি করছেন আপনি! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি আপনার?"

ডানার হাতের স্পর্শে সহসা অভিভূত হয়ে পড়লেন রূপচাঁদ। খাঁচার ভিতর থেকে হাতটা বার ক'রে খাঁচাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।

"মাথাই খারাপ হয়ে গেছে আমার। তুমিই আমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছ।"

ডানা একটু সঙ্কুচিত হয়ে হাতটা সরিয়ে নিলে। তারপর নিজের অজ্ঞাতসারে চোখ নীচু ক'রে কোলের উপর হাত দুটি রেখে এমন একটা মোহিনী ভঙ্গীতে ব'সে রইল যে, রূপচাঁদ আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, আবার তার হাত দুটো ধরতে গেলেন। ধ'রেই ফেললেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "আমার উপর রাগ ক'রো না, লক্ষ্মীটি। জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না তোমার সঙ্গে। আমার বিদায়-মুহূর্তটা অন্তত মধুর ক'রে দাও, সেইটুকুই অন্তত যথেষ্ট মনে করব আমি। তারই স্মৃতি শাশ্বত অমৃতের উৎস হয়ে থাকবে আমার জীবনে। রাগ ক'রো না, স'রে এস।"

ডানা হাতটা ছাড়িয়ে নিল বটে, কিন্তু আর কিছু করল না। উঠে দাঁড়াল না, বাইরে চ'লে গেল না, চাকরটাকেও ডাকল না। সেও কেমন যেন একটু সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল। একটা সমর্থ পুরুষের এই আত্মনিবেদন সে যেন উপভোগই করছিল। সে আনতচক্ষে ব'সেই রইল।

রূপচাঁদ বলতে লাগলেন, "তুমি যখন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পথের ধারে ব'সে ছিলে, তখন আমিই তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে। কিন্তু আমার দিকে তুমি একবারও ফিরে চাও নি। তুমি আনন্দমোহনের কবিতার খোরাক জুগিয়েছ, অমরেশবাবুর চাকরি করেছ, ওই লোফার সন্ন্যাসীটাকে পর্যন্ত আমল দিয়েছ,—বঞ্চিত করেছ কেবল আমাকে। বঞ্চিত হয়েই কি চ'লে যেতে হবে? একটুও দয়া করবে না? লোকে ভিক্ষুককেও একটা পয়সা দেয়। আমাকে কিছুই করতে দেবে না তুমি?"

ডানা এইবার যেন হঠাৎ সচেতন হ'ল। বিপদ আসন্ন বুঝে দাঁড়িয়ে উঠল সে।

"আপনাকে তো অনেকবার বলেছি, আপনি যা চাইছেন তা দিতে পারব না। আমি ভদ্রবংশের মেয়ে, ওসব নোংরামির মধ্যে যাওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। আপনি বাড়ি যান।"

"অনেকবার হতাশ হয়ে ফিরেছি, আজ আর ফিরব না। তুমি স্বেচ্ছায় যদি না দাও, জোর ক'রে কেড়ে নেবার শক্তি আমার আছে।"

পর-মুহূর্তেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে ডানাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন তিনি। কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটল। বল্লমহস্তে বকুলবালা প্রবেশ করলেন।

ডানা চীৎকার করছিল—"ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন—"

রূপচাঁদ ছাড়তে চাইছিলেন না, কিন্তু মাথায় দারুণ আঘাত পেয়ে ছাড়তে হ'ল; শুধু তাই নয়, প'ড়ে গেলেন তিনি। বল্লমের ক্ষত থেকে রক্ত প'ড়ে জামাকাপড় রক্তাক্ত হয়ে গেল তাঁর।

বকুলবালার এই আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ ওই হলদে পাখীটি। তিনি জানতেন, রূপচাঁদ বাইরে গেছেন, রাত্রে ফিরবেন না। রূপচাঁদের হুকুম অনুসারে পাখীটা তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাখীটার জন্যে এত মন-কেমন করতে লাগল যে, বল্লম আর লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত। বল্লমটা এনেছিলেন আত্মরক্ষার্থে, কিন্তু সেটা আর্তরক্ষার্থে কাজে লাগল। রূপচাঁদকে দেখে ক্ষেপে গেলেন বকুলবালা। ঈর্ষায় যে নারী একদিন বঁটি দিয়ে এক ছাগশিশুকে হত্যা করেছিল, সে-ই যেন বহুদিন পরে আবার আবির্ভূত হ'ল তাঁর মধ্যে।

"তুমি! তুমি এখানে কেন? তুমি সদরে গিয়েছিলে না?"

রূপচাঁদ নিরুত্তর। বকুলবালা ডানার দিকে সপ্রশ্ন অলন্ত নিক্ষেপ ক'রে বললেন, "ব্যাপার কি ?"

"ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন। রাত-দুপুরে হঠাৎ এসে উনি যে এ কাণ্ড করবেন, তা আমি ভাবতেই পারি নি। ওঁকে বাড়ি নিয়ে যান, ছি-ছি-ছি-ছি।"

ডানা আর ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, বেরিয়ে গেল। চাকরটাকে ডাকল একবার, কিন্তু তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সম্ভবত রূপচাঁদ কোনও কৌশল ক'রে আগে থাকতেই সরিয়ে দিয়েছিল তাকে। ডানা বাইরে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এগিয়ে গেল খানিকটা, ঘরের ভিতর আর ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। ঘরের ভিতর থেকে একটা আর্তনাদ শোনা গেল। দ্রুতপদে ফিরে এসে আবার ঘরে ঢুকল সে। যা দেখল, তা ভয়াবহ। বকুলবালা স্বামীর বুকের উপর ব'সে বাঁ হাতে তাঁর চুলের মুঠি ধ'রে ডান হাত দিয়ে ক্রমাগত ঘুষি মেরে চলেছেন, আর্তনাদ করছেন রূপচাঁদ, প্রতিরোধ বা প্রতিকার করবার শক্তি নেই।

"উঠুন, উঠুন—ওঁকে নিয়ে বাড়ি যান আপনি। ছি-ছি, কি করছেন ?"

বকুলবালা কর্ণপাত করলেন না তার কথায়।

"আমি থানায় খবর দিতে যাচ্ছি তা হ'লে।"

টর্চ এবং হাত-ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এল ডানা। আবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। সত্যি সত্যি থানায় খবর দেবার জন্যে সে বেরোয় নি, থানা যে কোথায় তাই সে জানত না, সে ভয় দেখিয়ে বকুলবালাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল। হয়তো এতেই বকুলবালা নিরস্ত হবেন। কিন্তু হলেন কি-না তা দেখবার ধৈর্য তার আর ছিল না, সে কোথাও ছুটে পালাতে

চাইছিল, কিন্তু কোথায় যাবে? সন্ন্যাসী কি ফিরেছেন? টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে সে সন্ন্যাসীর ঘরের দিকেই চলতে লাগল। গিয়ে দেখল, সন্ন্যাসী নেই। ঘরের দ্বার খোলা। হু-হু ক'রে হাওয়া একটা বইছে চর থেকে। ডানা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মনে পড়ল ভাস্করের কথা। রাত একটার পর সদরে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে, সে শুনেছিল। স্টেশনের দিকেই চ'লে গেল সে। মিনিট কুড়ি পরে গাড়িও পেয়ে গেল। গাড়ি যখন ছাড়ছে তখন হঠাৎ নজরে পড়ল, সন্ন্যাসী একটা তোরঙ্গ ঘাড়ে ক'রে ওভারব্রিজে উঠছেন। এখনই সদরের দিক থেকে যে গাড়িটা এল, তাতেই এলেন না কি? সদরে কি জন্যে গিয়েছিলেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার উপায় ছিল না। ডানার একবার ইচ্ছে হ'ল, নেমে পড়ে। কিন্তু তারও উপায় ছিল না। ট্রেন চলতে শুরু করেছিল। যে কোনও অবস্থাতেই মানুষের মন ক্রমশ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। বর্মার জঙ্গলে ডাকাতের হাতে প'ড়েও নিতে হয়েছিল। আজকের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটার সঙ্গেও তার মন আপোস ক'রে ফেললে। ট্রেনের কামরায় এক কোণে ব'সে ব'সে ক্রমশ বরং তার মনে হ'ল যে, ঘটনাটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। রূপচাঁদবাবুর কাছ থেকে অন্য রকম আচরণই বরং অপ্রত্যাশিত হ'ত। তাঁর রক্তাক্ত বিধ্বস্ত চেহারাটা চোখের উপর ভেসে উঠল। একটু দুঃখই হ'ল ভদ্রলোকের জন্যে। বকুলবালার কাণ্ড দেখে সে কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোন নারীর মধ্যে এ রকম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সে আর দেখে নি। হঠাৎ মনে হ'ল, জোয়ান অব আর্ক হয়তো অনেকটা এই রকম ছিল। আর একটা কথা হঠাৎ মনে হ'ল তার। এই ঘটনাটা যদি না ঘটত, তা হ'লে এত শীঘ্র সে কি ভাস্করের কাছে যেত? যেত না। তার সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে সে মনে মনে উদ্‌গ্রীব, তার শোভনতা বজায় রাখবার জন্যেই তাকে আরও কিছুদিন দেরি করতে হ'ত।

অশোভন আগ্রহ দেখিয়ে এর শালীনতা ক্ষুণ্ণ করবার প্রবৃত্তি তার হ'ত না। সে প্রবৃত্তি থাকলে ওই ডাকবাংলোয় ব'সেই তো সে কথা শেষ ক'রে দিতে পারত। তার নিজের কোনও অভিভাবক নেই, ভাস্করেরও নেই, ভাস্করের আগ্রহ যে অটুট আছে তা-ও সে বুঝতে পেরেছিল ; কিন্তু তবু সে শেষ কথা দেয় নি হয়তো শালীনতার জন্যে কিংবা হয়তো ভাস্করকে আর একটু ভাল ক'রে চেনবার জন্যে, কিংবা—(এ কথাটা মনে হওয়াতে নিজের কাছেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল সে)—কিংবা হয়তো তার গোপন নারী-সত্তা কামনা করছিল, ও আর একটু খোশামোদ করুক, অত সহজে ধরা দেব কেন। কিন্তু আজকের এই ঘটনাটা ঘটাতে ব্যবধানের প্রাচীরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, শালীনতার সূক্ষ্ম ওড়নাটা উড়ে গেল, তার নিরাশ্রয় মন যে আশ্রয় পাবার জন্যে উন্মুখ হয়েছিল সেইদিকেই অতি দ্রুতবেগে ছুটতে হ'ল তাকে। সন্ন্যাসী যদি বাসায় থাকতেন তা হ'লে হয়তো আজই এমন ভাবে ছুটতে হ'ত না, কিন্তু তিনিও বাসায় ছিলেন না। এটা বিধাতার ইঙ্গিত, না, আকস্মিক যোগাযোগ একটা। তোরঙ্গ-কাঁধে সন্ন্যাসীর ছবিটা ভেসে উঠল মনে। সদরে কেন গিয়েছিলেন উনি ? তোরঙ্গ এনেছেন কেন ? উঞ্ছবৃত্তিধারীর তোরঙ্গের দরকার কি ? ফিরে এসে খোঁজ করতে হবে। চ'লে যাওয়ার আয়োজন করছেন না কি ? সহায়রাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক আছে কি না সেটাও জানতে হবে।...ট্রেন হু-হু ক'রে চলেছে, গাড়ির কামরায় কেউ নেই, হু-হু ক'রে হাওয়া ঢুকছে জানলা দিয়ে, বাইরে গাঢ় অন্ধকার, আকাশে অসংখ্য তারা, নিজের মনকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে ব'সে রইল ডানা...হঠাৎ আর একটা কথা মনে হ'ল তার। বিপদে প'ড়ে কবির কাছে তো সে যেতে পারত। গেল না কেন ? যাবার কথা মনেই হয় নি। এর কারণ সম্ভবত মন্দাকিনী। এই রাত্রে সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বলা যেত না, বললে কেলেঙ্কারির ভয় ছিল। রূপচাঁদ আনন্দমোহনের বন্ধু একজন।

আর একটা কারণও ছিল বোধ হয়। কবি বলেছিলেন, যে জোয়ারটা এসেছিল সেটা নেবে যাচ্ছে। যে কবিতাটা দিয়েছিলেন তাতেও ওই ধরনের কথা ছিল। তাঁর কাছে সে এখন অলীক স্বপ্নমাত্র। এ লোকের কাছে বাস্তবের সমস্যা নিয়ে যাওয়া অর্থহীন; নানা রকম ভাবতে ভাবতে চলেছিল ডানা। মনে হচ্ছিল সে যেন নূতন কোনও দেশে চলেছে, পুরাতন বন্ধু ভাস্করের কাছে নয়।

২০

ডানা একটা রিক্‌শায় চেপে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ির গেটের সামনে যখন এসে পৌঁছল, তখনও ফরসা হয় নি। রিক্‌শাওলা তাকে নামিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। ডানা দেখল, গেট ভিতর থেকে বন্ধ করা রয়েছে, বাড়িটাও গেট থেকে বেশ একটু দূরে। গেটে দাঁড়িয়ে চীৎকার করলে কেউ যে শুনতে পাবে তা মনে হয় না। কাছেপিঠে কোনও লোক বা চাকরও দেখা গেল না। ডানা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে জ্বেলে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগল, ভিতরে কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কি না। পাওয়া গেল না। বাংলোটা দেখা যাচ্ছে, লোকজন কেউ নেই। এভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। ডানা তখন কাছে-পিঠে অন্য কোন আশ্রয়ের সন্ধান করবার জন্যে এগিয়ে গেল। কাছেই আর একটা বাড়ি ছিল রাস্তার ধারে। সেইটেরই বারান্দার উপর গিয়ে বসল সে। এ বাড়িতেও লোকজনের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। যদি কেউ থাকে, ঘুমুচ্ছে তারা নিশ্চয়। ডানা খানিকক্ষণ ব'সেই বুঝতে পারল, এখানে ব'সে থাকা যাবে না। ভয়ঙ্কর মশা। উঠে দাঁড়াল এবং পথে পথেই ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাস্তার দু ধারে বড় বড় গাছ, দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। কেউ ধীরে ধীরে

মাথা দোলাচ্ছে, কেউ আবার কথাও কইছে পেচকের ভাষায়। মাঝে মাঝে দুই-একটা গাছের উপর থেকে ফিঙেরও মিষ্টি গান শোনা যাচ্ছে। একটা গাছের উপর খুব আস্তে একটা কোকিল 'কু-উ' ক'রে একবার ডেকেই থেমে গেল। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার লাইন মনে প'ড়ে গেল ডানার—'দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান কুহরে'। এর পরই কিন্তু কাব্যলোক থেকে সহসা তার পতন হ'ল। সামনেই একদল মহিষ। ধীর মন্থর গতিতে চলেছে—একটির পর আর একটি। প্রায় নিঃশব্দেই, পায়ের খুরের শব্দ হচ্ছে শুধু। সর্বশেষ মহিষটির পিঠের উপর ব'সে আছে রাখালটি, হাতে তার প্রকাণ্ড একটা লাঠি। ডানা পথ ছেড়ে দিয়ে রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। মহিষের দল যখন চ'লে গেল, তখন আবার সে পথ চলতে শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর—এক মুরগীর উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল রাস্তার ধারের একটা ঘর থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডানা। মনে হ'ল মুরগীটা যেন তাকে আর অগ্রসর হতে মানা করছে, সে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে কোথাও। মনে পড়ল, অনেক দিন আগে রাত্রি দশটার পর সে একবার পথ ভুলে একটা ব্যাঙ্কের সামনে এসে পড়েছিল। ব্যাঙ্কের প্রহরী চীৎকার ক'রে উঠেছিল—হুকুম দার। (Who comes there)? এই মুরগীও যেন বলছে—হুকুম দার। ডানা সত্যিই ইতস্তত করতে লাগল, আর অগ্রসর হওয়া উচিত কি না। পর-মুহূর্তেই একযোগে অনেকগুলো পাখী একসঙ্গে ডেকে উঠল, তার এই ইতস্তত ভাব দেখে একযোগে হেসে উঠল যেন একদল তরুণী অন্ধকার যবনিকার আড়াল থেকে। ডানার চোখে পড়ল পূর্বাকাশে উষার অরুণিমা আভাসিত হয়েছে। আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে হ'ল না তার। সে ফিরতে লাগল। আবার যখন ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর কাছে ফিরে এল, তখন বেশ আলো হয়েছে। গেট কিন্তু তখনও খোলে নি। যে বারান্দার উপর প্রথমে ব'সে

ছিল, সেখানে গিয়েই বসল আবার। অনেকক্ষণ ব'সেই রইল। মনে হতে লাগল, এভাবে কোনও খবর না দিয়ে চ'লে আসাটা ঠিক হয় নি। এও হতে পারে যে, ভাস্কর এখানে নেই, কোনও জরুরী দরকারে আবার বেরুতে হয়েছে তাকে রাত্রে। এই সব ভাবছে, এমন সময় এক কাণ্ড হ'ল। একটি অল্পবয়সী কালো মেয়ে ভাস্করের গেট খুলে বেরিয়ে এল। মেয়েটি কালো, কিন্তু সুশ্রী। পিঠের উপর লম্বা বেণী দুলছে। ডানার হঠাৎ একটা উপমা মনে হ'ল— 'কালভুজঙ্গিনী'। মেয়েটি তার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। পরনে একটা ছাপা শাড়ি, গায়ের জামাও ছাপা সিল্কের। খুব ডগ্‌মগে রঙ। চোখে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ, যেন সমস্ত রাত ঘুমোয় নি। আরও যখন কাছে এল, তখন ডানাকে উঠে দাঁড়াতে হ'ল। ওর বাড়ির বারান্দাতেই সে ব'সে আছে না কি? দেখা গেল, সত্যিই তাই। মেয়েটি কাছে এসে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডানার দিকে চাইতেই ডানা হেসে হাত তুলে নমস্কার করলে।

মেয়েটি উত্তর দিলে ইংরেজীতে। ইংরেজীতেই আলাপ হ'ল।

"গুড মর্নিং। কোন দরকার আছে কি?"

"আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে, "আমি নার্স। এইখানেই থাকি।"

"এ বাড়ি আপনার?"

"হ্যাঁ। ভাড়া। আমি বিদেশিনী, এখানে প্র্যাকটিস করবার জন্যে এসেছি।"

"ও। আপনাকে ওই বাড়ির গেট থেকে বেরুতে দেখলাম। মিস্টার বসু কি অসুস্থ না কি?"

আবার মুচকি হাসল মেয়েটি।

"অসুস্থ হয়েই কাল রাত্রে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, বিশেষ কিছু নয়। একটু বেশী 'ড্রিংক' করে-

ছিলেন। কথাটা বলা হয়তো উচিত হ'ল না। কথাটা অনুগ্রহ ক'রে গোপন রাখবেন। আপনি কেন এসেছেন জানতে পারি কি ?"

"আমি ওঁর পুরাতন বান্ধবী। দেখা করতে এসেছি।"

"আই সি। উনি ঘুমুচ্ছেন এখন। আপনি ভিতরে গিয়ে ড্রইং-রুমে অপেক্ষা করতে পারেন। এর আগে এসেছিলেন কখনও ?"

"একবার এসেছিলাম।"

"আচ্ছা, এক্স্কিউজ মি।"

আর কোন কথা না ব'লে মেয়েটি ভিতরে চ'লে গেল। মনে হ'ল, কথার ধরনে এবার যেন একটু উষ্ণতা প্রকাশ পেল।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। যে ভেলাটি অবলম্বন ক'রে সে ভাসছিল, সেটাও ডুবে গেল নাকি ?

ড্রইং-রুমে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি ডানাকে। চাপরাসীর মারফৎ নামটা পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্কর বসু বেরিয়ে এলেন।

"এ কি! ডানা! এ যে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য! এখন কি ক'রে এলে ?"

"ট্রেনে।"

এর পর কি বলবে ডানা ভেবে পেল না, চুপ ক'রে গেল। এমন অসময়ে কোনও খবর না দিয়ে চ'লে আসার সত্য হেতুটা অকপটে বিবৃত করা সমীচীন হবে ব'লে তার মনে হ'ল না। কিন্তু কি বলবে তাও সে ভেবে আসে নি। চুপ ক'রেই রইল তাই।

"ট্রেনে ? তার মানে রাত আড়াইটের সময় এখানে পৌঁছেছ। ব্যাপার কি ?"

"কিছুই নয়, এমনি। ইচ্ছে হ'ল, চ'লে এলাম।"

"বেশ করেছ। চল, চা খাওয়া যাক। আমাকে আবার এখুনি বেরুতে হবে। একটা গ্রামে দাঙ্গা হয়ে গেছে।"

এবার ডানা যেন একটু আত্মসচেতন হ'ল। কেতা-দুরস্ত ভাষায়

বললে, "আমি আসাতে তোমার কর্তব্যে কোন বাধা সৃষ্টি হবে না আশা করি।"

"বাধা হবে কেন? তুমিও সঙ্গে থাকবে আমার। আমার নীরস কর্তব্য সরস হয়ে উঠবে তা হ'লে। আর কালকের যে আলোচনাটা মুলতুবি আছে, সেটাও হয়তো সেরে ফেলা যাবে। আমার কাজ খুব বেশী নেই, শুধু একবার যাওয়া দরকার। পুলিস যা করবার ক'রে ফেলেছে এতক্ষণ। এস, চা-পর্বটা সেরে ফেলা যাক। চান করবে না কি?"

"কাপড়চোপড় তো আনি নি। হাত মুখ ধুয়ে নিলেই চলবে।"

"এস তা হ'লে। আমিও কামিয়ে নিই।"

প্রায় ঘণ্টা চারেক পরে ডাকবাংলোর প্রশস্ত বারান্দায় একটা ক্যাম্প-চেয়ারে আনত নয়নে ব'সে ছিল ডানা। ভাস্কর বসু পাশেই আর একটা ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়ে কথা ব'লে চলেছিলেন। তাঁর কথার ধরনে যে সরল আন্তরিকতা ফুটে উঠছিল, তা ডানার হৃদয়কে স্পর্শ করছিল কি না তা তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। ডানা নির্বাক হয়ে আনত নয়নে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। বুঝতে পারছিলেন না ব'লে ভাস্করের বক্তব্য যেন আরও আবেগময় হয়ে উঠছিল।

ভাস্কর বলছিলেন, "তোমাকে বিয়ে করব ব'লেই আমি এতকাল প্রতীক্ষা ক'রে আছি। কেন জানি না, আমার বিশ্বাস ছিল তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। বিয়ে করবার অনেক সুযোগ পেয়েছি, এখনও পাচ্ছি; কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব—এ কল্পনা কখনও করি নি। তুমি কোনও কথা বলছ না যে? যদি কিছু জানতে চাও আমার বিষয়ে, বল সেটা।"

ডানা হেসে বললে, "যা জানতে ইচ্ছে করছে তা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচও হচ্ছে যে। যাদের বিয়ে করবার সুযোগ তুমি পেয়েছ বা পাচ্ছ, তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি রকম?"

ভাস্করের চোখের দৃষ্টিতে কৌতুকের ছটা লাগল।

"তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। বার্মা থেকে চ'লে আসার পর অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে আমাকে। বার্মা থেকে পালিয়ে এসে আমি মিলিটারিতে যোগ দিয়ে নানা দেশে ঘুরেছি। তারপর বিলেতে পড়াশোনা করেছি। তারপর এই চাকরি। আমি সমর্থ যুবক, দৈহিক ক্ষুধার দাবি আছে, সে দাবি মেটাতে আমি ইতস্ততও করি নি কখনও—হাটে বাজারে হোটেলে রেস্তোরাঁয় যখন যেখানে যেমন জুটেছে। তবে ওগুলো নিতান্ত দৈহিক, সাময়িক ব্যাপার, মনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও অসুখও আমার হয় নি।"

ডানার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল সে।

ভাস্কর আবার বললেন, "ওসব বিষয়ে আমার কুসংস্কারও নেই। মানে, তোমারও জীবনে যদি ওসব ঘ'টে থাকে সেটাকে নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা ব'লেই আমি মেনে নেব। শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক আমি নই।"

ডানা তবু নীরবে ব'সে রইল। একটা কথাই তার মনে হতে লাগল, রূপচাঁদই নবরূপে দেখা দিয়েছে আবার।

"একেবারে চুপ ক'রে গেলে যে? কোনও কথাই বলছ না?"

মৃদু হেসে ডানা বললে, "বলবার আর কি আছে। চল, এবার ওঠা যাক।"

"আমার প্রস্তাবটা তা হ'লে—"

"পরে জানাব। এখন চল। এখনি ট্রেন আছে একটা, আমি চ'লে যাই। তুমি আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দাও।"

ডানার মুখের দিকে চেয়ে ভাস্কর আর কিছু বলতে সাহস করলেন না।

২৭

ডানা একা একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় ব'সে ছিল। ভাবছিল, যা সে এতদিন কামনা করছিল তার সবই হ'ল, রূপচাঁদ শাস্তি পেয়ে তার জীবন থেকে স'রে যাচ্ছেন, কবির কল্পনা-স্রোত অন্য খাতে বইছে—তাকে নিয়ে তিনি আর কবিতা লিখবেন না, তার কলেজের বন্ধু ভাস্কর ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফিরে এসে তাকে বিয়ে করবার জন্যে সাধাসাধি করছে ; কিন্তু সে যেমন ছিল তেমনি র'য়ে গেল, তার জীবনের সমস্যার সমাধান হ'ল কই ? কিছুই তো হ'ল না। নিজেকে নিতান্ত রিক্ত নিঃস্ব মনে হতে লাগল। হঠাৎ মনে হ'ল, আর কেউ না থাক্, সন্ন্যাসী ঠাকুর আছেন। সন্ন্যাসীর নানা কথাই ঘুরে ফিরে জাগতে লাগল ,মনের ভিতর। মেঘের মত প্রসারিত হতে লাগল নানা আকারে।

বাড়ি এসে যখন পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় তিনটে। দেখল, চাকরটা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার ডাকে উঠে বসল সে।

"রূপচাঁদবাবু আর তাঁর স্ত্রী কতক্ষণ ছিলেন কাল ?"

"তা তো জানি না মা। আমি এসে দেখলাম, কেউ নেই। পাখীটাও নিয়ে গেছেন।"

"আজ কেউ এসেছিল ?"

"একটু আগে ওই গঙ্গার ধারের বাবাজী এসেছিলেন। তিনি একটা বাক্স আর চিঠি রেখে গেছেন।"

"কি বাক্স ?"

"ঘরে রেখে দিয়েছি। খুব ভারী। নতুন তোরঙ্গ একটা।"

একটি খামের চিঠি সে ডানার হাতে দিল। চিঠিটা হাতে ক'রে ডানা ঘরের ভিতর ঢুকেই দেখতে পেল তোরঙ্গটি। এইটেই তো কাঁধে ক'রে কাল আসছিলেন তিনি। চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল সে।

শ্রীমতী ডানা,

আমি এবার চললাম। আর সম্ভবত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমার কিছু সম্পত্তি এখানে ছিল, তারই ব্যবস্থা করতে এসেছিলাম। কিন্তু কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ হয়ে গেল সব। তুমি বিপন্ন মুখে বার বার আমার কাছে আসতে সাহায্যের জন্য, উপদেশের জন্য। কিন্তু আমি সামান্য মানুষ, নিজেই অসহায়, তোমাকে কি সাহায্য করব তা ভেবেই পেতাম না। অথচ কিছু করবার জন্যও মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠত। তুমি একদিন বলেছিলে যে, কিছু টাকা পেলে নাকি তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেই দিনই আমি ভেবেছিলাম যে, এখানে আমার যা কিছু আছে তা তোমাকেই দিয়ে যাব। কিন্তু দেব বললেই চট ক'রে দেওয়া যায় না। অনেক দিন ধ'রে এর জন্যে আয়োজন করতে হয়েছে। একটা সামান্য শাবল যোগাড় করতেই বেশ কয়েক দিন লেগে গেল। যে ঘরটায় তুমি আছ, আর এই ভাঙা ঘরটা যেখানে আমি আছি—এ দুটোই আমার সম্পত্তি। এর সংলগ্ন কিছু জমিও। ঠিক কত জমি আমার জানা নেই, তুমি পুরাতন দলিল খোঁজ করলেই জানতে পারবে। আমি সদরে গিয়ে আমার এখানকার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে দানপত্র ক'রে দিয়ে এলাম। পোস্ট-আপিসের টাকাগুলোও তুমি পাবে। এই তোরঙ্গের ভিতর সমস্ত দলিল আছে। আমি সদরের উকিল হরনাথ মল্লিককে আমার 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' দিয়ে এসেছি। তিনি রেজেষ্ট্রি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার ক'রে দেবেন। এ ছাড়াও আরও কিছু টাকা তোমাকে দিয়ে গেলাম। মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলাম তাতে লেখা ছিল যে, গঙ্গার ধারের এই প'ড়ো বাড়িটার মেঝেতে এক ঘড়া মোহর আছে। আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ নাকি এটা সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলেন। মোহর আছে কি না দেখবার জন্যেই শাবল সংগ্রহ করতে হ'ল আমাকে। চিঠির

নির্দেশ অনুসারে খুঁড়ে দেখলাম, সত্যিই আছে। একটা প্রকাণ্ড তামার ঘড়ায় দু হাজার মোহর। মোহরগুলো তোমাকে দেবার জন্যে একটা মজবুত তোরঙ্গ কিনতে হ'ল। ওর ভিতর সমস্ত মোহরগুলো, আমার পোস্ট-আপিসের পাস-বই এবং প্রয়োজনীয় দলিল ও চিঠিপত্র সব রইল। এখন আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব। সমস্ত মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সর্বান্তঃকরণে তোমার মঙ্গল কামনা ক'রে আমি বিদায় নিলাম। ভগবান তোমাকে সুখী করুন। ইতি

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

ডানা স্তম্ভিত হয়ে ব'সে রইল।

২২

তিন মাস কেটে গেছে। ঘনঘোর হয়ে নেমেছে বর্ষা। শ্রাবণের নিবিড় সমারোহে আকাশ-বাতাস থমথম করছে। নদী কূলে-কূলে ভরা। সবুজের বান ডেকেছে বনে বনে। চাতক পাখী ডাকছে একটা। সমস্ত সকাল ধ'রে ঘুরে ফিরে ডাকছে, কখনও এ-গাছে কখনও ও-গাছে, কখনও কাছে কখনও দূরে। বিদেশী পাখী, বর্ষার সময় এ দেশে আসে। কবি পাখীটাকে নিয়েই মেতে আছেন সারা সকাল। দূরবীন দিয়ে দেখে দেখে তাঁর সাধ যেন আর মিটছে না। কালো পাখী, মাথায় ঝুঁটি, ল্যাজটি লম্বা, ল্যাজের ডগায় সাদা সাদা বিন্দু, বুকটি সাদা—এক কথায় অপরূপ। পাখীটা যখন দূরবীনের সীমা ছাড়িয়ে চ'লে গেল তখন কবি কবিতা লিখতে বসলেন। অনেক ভেবে ভেবে আরম্ভ করলেন—

নব জলধর হতে আসিলে কি নামিয়া
ওগো ও চাতক পাখী, ওগো মেঘবরণী,
ছায়া-মেঘনার স্রোতে ভাসাইয়া তরণী

একটু না থামিয়া
গাঢ় সবুজের স্রোতে খুঁজিতেছ সরণী
কিছুই না মানিয়া
গাছে গাছে ঘুরে কাছে কার অভিসারে গো
বল না বাখানিয়া
ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্—পিয়ো, পিয়ো, পিয়ো, পিয়ো
ডাকিছ কাহারে বারে বারে গো।

বাধা পড়ল। পিওন এসে দেখা দিল। একটা খামের উপর অমরেশবাবুর হস্তাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন কবি। তিনি কাশ্মীর থেকে ইয়োরোপ চ'লে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কোনও চিঠিই লেখেন নি ভদ্রলোক। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুললেন। ছোট চিঠি।

প্রীতিভাজনেষু,

অনেক কিছু দেখে দেশে ফিরেছি। এখন আছি লছমনঝোলার একটা ধরমশালায়। বর্ষার সময় এ জায়গা মনোরম নয়। আমি এখানে এসেছি ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারের (Verditer Fly-catcher) বাসার সন্ধানে। আর একটু আগে এসে পৌঁছতে পারলে ভাল হ'ত। মে-জুনেই ওদের বাসা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। লণ্ডনে একজন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। পাহাড়ী পাখীর বিষয়ে সে গবেষণা করছে। তারই অনুরোধে ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারের বাসা আর ডিমের সন্ধান করছি এখানে। যদি পাঠাতে পারি খুব খুশী হবেন তিনি। আমাদের সঙ্গে তিনি যে রকম ভদ্র ব্যবহার করেছেন তা অবর্ণনীয়। তিনি সাহায্য না করলে আমরা সমুদ্রের নানা রকম পাখী দেখতেই পেতাম না। অনেক নোট্‌স্ আর ফোটো এনেছি। সব দেখাব। একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছে কাল। পাহাড়ে কিছু দূর উঠে একটা ঝরনার ধারে

ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ডানাকে দেখতে পেলাম। ময়লা একটা গেরুয়া রঙের কাপড় প'রে ঝরনা থেকে জল তুলছে। আমার চোখকে বিশ্বাসই করতে পারি নি আমি প্রথমে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ, ডানাই। জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি, তুমি এখানে? সে মৃদু হেসে বললে, আমি আর চাকরি করতে পারলাম না। আনন্দবাবুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে চ'লে এসেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি করছ? বললে, এমনই আছি। বেশ আনন্দেই আছি। নমস্কার। আমাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে জলের ছোট কলসীটি তুলে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ফিরে এসে খবরটা রত্নাকে বললাম। লোকজন পাঠিয়ে খোঁজও করলাম কিন্তু আর তাকে ধরতে পারি নি। আমরা দুজনেই খুব বিস্মিত হয়েছি। ব্যাপারটা কি হয়েছে জানাবেন। আমরা বোধ হয় মাসখানেক পরে ফিরব।' নমস্কার জানবেন। ঠিকানা আলাদা একটা কাগজে লিখে দিলাম। পত্রপাঠমাত্র উত্তর দেবেন। ইতি

আপনাদের

অমরেশ

কবি পত্রপাঠমাত্রই উত্তর লিখতে ব'সে গেলেন।—

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠিখানা পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। আপনাদের কোনও খবর না পেয়ে খুব ভাবছিলাম। শ্রীমতী ডানার আচরণ সত্যই খুব বিস্ময়কর। সে কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। যাওয়ার আগে আপনার পক্ষী-নিবাসের সমস্ত পাখীগুলোকেও ছেড়ে দিয়ে গেছে। সে চ'লে যাওয়ার পরদিন তার চাকরটা এসে খবর দিলে যে, মাইজী কাল রাত্রে ফেরেন নি, এখনও পর্যন্ত তাঁর দেখা নেই। রাত্রে তাঁর জন্যে রান্না ক'রে রেখেছিলাম, সে খাবারটা নষ্ট হয়েছে। আবার রাঁধব কি? আমি

গিয়ে টেবিলের উপর ছোট একটা চিঠি পেলাম। সেটা হুবহু নকল ক'রে দিচ্ছি।—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু, এখানে প'ড়ো বাড়িতে যে সন্ন্যাসী থাকতেন, তাঁর চিঠিটা প'ড়ে দেখলে তোরঙ্গ-রহস্য বুঝতে পারবেন। আমি আর চাকরি করব না, আমিও চললুম এখান থেকে। যাওয়ার আগে পক্ষী-নিবাসের পাখীগুলোকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি, এ অধিকার রত্নাদি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী যে অর্থ আমাকে দিয়ে গেছেন, তা আমি নিলাম না। আমার অনুরোধ—আপনি, অমরেশ-বাবু আর রূপচাঁদবাবু টাকাটা ভাগ ক'রে নিয়ে নেবেন। (আপনাদের তিনজনেরই মুখে একাধিক বার শুনেছি যে, টাকা পেলে আপনারা প্রত্যেকেই নিজেদের আকাশে নাকি আরও ভালভাবে ডানা মেলতে পারবেন। আমারও আগে তাই ধারণা ছিল, এখন আর নেই।) তাই টাকাগুলো আপনাদের তিনজনকেই দিয়ে গেলাম। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য যে সহায়রাম ভট্টাচার্যের উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর বাড়ি আর জমির যে কোনও সুব্যবস্থা করবার অধিকার আমি অমরেশবাবুকে দিয়ে গেলাম। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। আপনারা আমার জন্যে যা করেছেন তার স্মৃতি চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমার মনে। আপনি ও বউদিদি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। একটি অনুরোধ, আমাকে খোঁজবার চেষ্টা করবেন না, কিংবা পুলিসে খবর দেবেন না। ঘরের চাবি চাকরটার কাছেই রইল। টাকাকড়ির ব্যাপার তার কাছে থেকে গোপন রেখেছি। আবার প্রণাম জানাচ্ছি। ইতি আপনাদের ডানা।"

ডানার চিঠির সঙ্গে সন্ন্যাসীর চিঠিও ছিল। সেটা না টুকে আনিই পাঠিয়ে দিচ্ছি। কারণ ডাকের বেশী সময় নেই। টুকতে গেলে ডাক পাব না। ওটা হারাবেন না যেন। তোরঙ্গটা তুলে নিজের কাছে এনেছি। মোহরগুলো বড় আয়রন সেফে রেখেছি।

আপনি এলে তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। আপনারা তাড়াতাড়ি চ'লে আসুন। এখানকার অন্যান্য খবর সব ভাল। খাজনা ভালই আদায় হয়েছে। গ্রামসংস্কারের কাজে লেগেছি। সেটাও ভাল চলেছে। আপনারা উভয়ে আমার নমস্কার জানবেন। ইতি

শ্রী তিবন্ধ
শ্রীআনন্দমোহন

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি। তারপর কবিতা লিখলেন—

কৃষ্ণচূড়ার চূড়ায় চূড়ায়
বহ্নিনিশান উড়িয়েছিল যে
আজকে দেখি শ্রাবণ-মেঘে
বৃষ্টি ঝরায় সে।

বৈশাখেতে দোয়েল শ্যামা
বনে বনে যে সুর সেধেছিল
টুনটুনি আর বুলবুলিরা
যে নীড় বেঁধেছিল
চাতক পাখীর কণ্ঠে ওগো
তাই কি আজি জল-তরঙ্গে বাজে
ছায়ায় ঢাকা মেঘলা দিনের
নিবিড়তার মাঝে।

একই বাণী, ওগো রসিক,
বলছ তুমি নানান সুরে সুরে,
সামনে যখন বৃষ্টি ঝরে, দেখি
রোদ উঠেছে দূরে।

॥ সমাপ্ত ॥

করকমলেষু

বনফুল

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৭৬
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শ্রীললিত মোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৮৯, লেক রোড
কলিকাতা—২৯
রূপসজ্জা ও প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

বন্ধুবর শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র

বিরূপাক্ষেষু

—নিবেদন—

মৎপ্রণীত 'বনফুলের কবিতা' নামক গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ অনেকদিন পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ব্যঙ্গ কবিতা-গুলি আরও কয়েকটি নূতন ব্যঙ্গ কবিতা যোগ করত রসিক সমাজের করকমলে সেগুলি দিলাম।

"বনফুল"

১৭ই আষাঢ় ১৩৫৬
গোলকুঠি
আদমপুর
ভাগলপুর।

ভাদুড়ী

যদিও কবিতা লিখি, ব্যবসা আমার
ঠিকাদারি ; আমি ঠিকাদার।
বিবাহ হইল যবে,
মন্ত্র, বাদ্য, শঙ্খ-ঘণ্টা-রবে,
বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী,
নিদ্রাহীন কত রাত্রি,
গোলমাল, গালমন্দ,
ভাঙা জোড়া কত ছন্দ,
কত যশ, অপযশ,
ব্যবসার কিছু loss,
তারি মাঝে কিছু রস
পাইলাম :—আমি ঠিকাদার
বুঝিলাম সার,
ফুরনেতে ঢুকিয়াছি, নূতন ব্যাপার !

আমার যা-কিছু আছে হইবে তাহার,
তাহার সর্ব্বস্বে মোর হবে অধিকার।

২

কভু চড়া কভু মন্দা,
কভু দ্রুত মধুছন্দা,
দাম্পত্য-বাণিজ্য ক্রমে
ওঠে জমে' জমে'!
চরমে উঠিল যবে, ব্যঞ্জন ডাইল
হইল লবণ-দগ্ধ। দাম্পত্য 'ফাইল'
উল্টাইয়া দেখিলাম, সর্ব্বস্বের এক কিস্তি মোর
হয়নি প্রিয়ারে দেওয়া। করি রব ঘোর
প্রিয়া-পাশে আসি'
কহিনু সম্ভাষি',
"এসো প্রিয়ে, বিম্ব-ওষ্ঠে মারি এক ঘুঁষি!"
কি আশ্চর্য্য, প্রেয়সী উঠিল মহা রুষি!
ফুরান মাফিক্
সোহাগ লয়েছে যদি, ঘুঁষিটাও নিক্!
আমার যা-কিছু আছে—সর্ব্বস্ব আমার,
প্রাপ্য যে তার!
অথচ কহিল প্রিয়া কম-কণ্ঠে কাঁপাইয়া পাড়া,
"এই কি ব্যাভার তোর—ওরে লক্ষ্মীছাড়া!"

৩

অতি ক্রোধে বাহিরিনু পথে,
হনহনি' পদযুগ-রথে।

দূরেতে দেখিনু'
আসিতেছে ও পাড়ার তিনু।
ছোক্‌রা সে
থাকে নানা বেশে!
চুল, গোঁফ, দাড়ি ও সময়,
এ চারিটি বস্তু লয়ে নানা সমন্বয়
করা বারম্বার
স্বভাব তাহার!
বলিলাম তারে আমি সকল খুলিয়া।
সে কহিল
"যেই বিম্ব-ওষ্ঠ তিনি রেখেছেন রাঙাইয়া
পান-দোক্তা দিয়া,
যেথা নিত্য চিত্তহরা কত না মাধুরী
(যাহা দেখি' কাহিল ভাদুড়ী—ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী!)
যেই বিম্ব-ওষ্ঠ তলে ফোটে রাশি রাশি,
কত রাগ অনুরাগ সোহাগের হাসি,
সহজ সরস,
সেই বিম্ব-ওষ্ঠে তিনি চান তব—ঘুঁষি নহে—গোঁফের পরশ!
হোক্ সে কোমল কড়া, প্রজাপতি-ছাঁটা,
কামানো বা কাটা!
প্রিয়াদের ঝোঁক খালি গোঁফেরই উপর—"
বলি' সে চলিয়া গেল! ভীষণ দুপর
কিরণ-মুদ্গর হানে, মোর টাক্ মাথা,
সাথে নাই ছাতা!
ফিরিলাম গৃহে ; দেখিলাম ফুরন-ব্যাপার
বোঝে না প্রেয়সী মোর। তাই আরবার

রেঁধেছে নূতন করি (ছিল না ফুরন),
সুখেতে করিনু দোঁহে উদর পূরণ !

৪

সেই হ'তে অয়ি প্রিয়ে, মোর কাব্যটিকে' !
গড়েছি তোমারে ঘিরে—ছিল নাক 'ঠিকে' !
ফুরন ছিল না এতে, তবু এটা ঠিক,
তোমারি সর্ব্বাঙ্গ পানে চেয়ে অনিমিখ,
(জানিত ভাদুড়ী—ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী,
নাহি যার জুড়ি।)
করে গেছি কাব্য চর্চ্চা
করি বহুবিধ খর্চা !
প্রিয়া মোর, সখী মোর, তোমা পানে চেয়ে
চিত্ত মোর উঠিয়াছে নিত্য গান গেয়ে !
প্রেমতীর্থ ভরেছি উৎসবে
বেণু-বীণা-রবে !
তব রূপ-যমুনার তীরে
খুঁজিয়াছি রাধিকারে ফিরে ফিরে ফিরে ;
আকুল উন্মুখ-প্রাণ
গাহিয়াছি গান—
"মোর নেশা হয় যদি লাল,
আর সবুজ রঙের মন যদি পাই
গোলাপী রঙের গাল।"
পেকেছে তোমার কান, দন্ত ব্যথিয়াছে,
খোস, ছুলি সকলেই বাসা বাঁধিয়াছে
শ্রীঅঙ্গে তোমার। মোর ছন্দ তবু

হয় নাই ম্লান কভু।
দেহের দুর্দ্দশা তব
করিয়াছে কলরব,
আঁখির সম্মুখে মোর,
তবু সখি, গাহিয়াছি হয়ে ভাবে ভোর—

"হয়ে যায় যদি কল্পনা মম
সাঁঝের সোনালি সাগরের সম
খুলে দিতে পারি মনের তরণী
তুলে দিতে পারি পাল!"

তোমার অম্বল হ'ল! তদুপরি
মহাঘটা করি'
আসিল ভাদুড়ী (ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী)
করি নানা বাহাদুরি
জোটালো 'হোমিওপ্যাথি'!
মহাবৃদ্ধি হল তাতে ব্যাধি,
বাড়িল যন্ত্রণা পেটে পিঠে,
'সোডা' খেয়ে গেল শেষে মিটে!
জানে তিনু,
কি আবেগে গেয়েছিনু—
"ঘন কালো তার আঁখিতারা যদি
চাহনি-চমক হানে,
অভিমানে ভরা ভুরু দুটি যদি
ঝটিকা ঘনায়ে আনে।"
চির রুগ্ন হলে তুমি—অস্থিচর্ম্মসার!
বসন্ত শরৎ শীত এল বার বার
নানারূপ রসাবেশে!

আবার গানেতে গেনু ভেসে :

"সোহাগের সেই তুমুল তুফানে,
ভাসিতে ভাসিতে মল্লার গানে,
ডুবে যাব আমি, ডুবে যাবে তরী
ডুবে যাবে ইহকাল !
সবুজ রঙের মন যদি পাই
গোলাপী রঙের গাল।"

ক্রমে ক্রমে শুনিনু 'রিউমার',
পেটে তব হয়েছে 'টিউমার' !
এবারও ভাহুড়ী (ও পাড়ার তরুণ ভাহুড়ী)
হানিতে চাহিয়াছিল 'হোমিও' হাতুড়ী !
আমল না দিয়া তারে আনিনু 'সার্জ্জন' !
সে আসি' হাজার টাকা করি উপার্জ্জন
পেটেতে বসাল ছুরি—একদা প্রভাতকালে আসি,
তবু থামে নাই মোর বাঁশী
তোমারে ঘিরিয়া !
গাহিনু নূতন গান প্রিয়া :

"মন-মৌ-বন সফল করিয়া
এস গো সাকী,
পুরান কুসুমে নূতন বরণ
দাও গো আঁকি' !"

সহসা পাশের ঘরে তোমার গোঙানি
হারাইল বাণী !
ছুটে গিয়ে দেখি
হায় এ কি !
চলে গেছ মোরে ফাঁকি দিয়া,

হে আমার প্রিয়া।
ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী একাকী বসিয়া আছে
অতি কাছে!•
ফুরন মাফিক সখী, চলেছিনু যবে,
রাগ করেছিলে তবে!
ফুরন ভাঙ্গিয়া যবে অফুরন্ত সুরে
ডাক দিনু, তাও গেলে দূরে!
এ যে কি ব্যাপার
বুঝি নাকো আমি ঠিকাদার।
শ্মশানে যাবার কালে দেখি
একি!
কি ঘোর চাতুরী,
সরেছে ভাদুড়ী!

অবিনাশ

১

অবিনাশ মৌলিক
লৌকিক
নাম তার,
আসলে সে মানব-আত্মার
শোভন বিকাশ।
—এম, এ পাশ!
দর্শন-শাস্ত্রেরে করিয়া ধর্ষণ
সপ্তাহেতে তিন দিন করেন বর্ষণ

বক্তৃতা মুষলধারে !
ছাত্রদল কাতারে কাতারে
সেই ধারাপাত
মুখস্থ করিয়া সারা রাত
নানা ভাবে হইয়াছে কাবু,
মুগুর ভাঁজিছে কেহ,—কেহ খায় সাবু !
অবিনাশ, প্রফেসর কলেজে'র ।
বহুবিধ 'নলেজের'
তীব্র তাড়নায়
হায়,
কখনো 'নেক্‌টাই' পরে, কখনো খদ্দর,
অথচ ভদ্দর !
নয় সে সংসারী,—এখনও কুমার ;
প্রণয়-চুমার
কেতাবি বর্ণনা ছাড়া অন্য জ্ঞান মোটে নাই,
ভাগ্যে তার জোটে নাই
রোগা বা নধর কোনো অধর পরশ ।
তবুও যে লোকটা সরস,
কারণ তাহার,
সুলতা নাম্নী নাকি কোন মহিলার
হয়েছিল সঙ্গ লাভ,
কিন্তু যেই হল love,
বাহির হইল তথ্য—
সুলতা যে বাগদত্ত !
হবু-স্বামী কি এক মিষ্টার,
বিলাত-প্রবাসী এক আধা-ব্যারিষ্টার !

অবিনাশ দূষিল না আপনার ভাগ্যে,
কেবল কহিল হেসে—যাক্ গে !
সেই হতে রসজ্ঞান, তার
অলঙ্কার।

২

একদা অবিনাশ,
শেষ করি প্রাতরাশ,
'পত্রিকা' প্রভৃতি নানা দৈনিক লইয়া,
সাংবাদিক রোমন্থনে মশগুল হইয়া
ছিলেন যখন,
ঠিক আসিল তখন
পত্র একখানি।
তার বাণী
সাংঘাতিক
অবিনাশ মৌলিক
চক্ষুকে বিশ্বাস করা অনুচিত কি না
ভাবিতেছিলেন ; কিন্তু মনোবীনা
অকস্মাৎ তুলিল যে তুমুল ঝঙ্কার
বারম্বার !
নেবুতলা লেন,
সেথাকার স্নেহলতা সেন
লিখেছেন,
"হে দেবতা, আশাপথ-চেয়ে তব, চিত্ত যে উতলা,
তুমি মম পরানপুতলা
বহু জনমের !

তোমারে চিনেছি আমি—সয়েছিও ঢের !
সখা, এইবার
বিবাহ আমার
নাহি হ'লে,
হয় জলে—নয় স্থলে,
তেয়াগী পরাণ
রাখিব এ প্রেমের সম্মান !"
প্রফেসর অবিনাশ রহিলেন যদ্যপিও কুঁচকাইয়া ভুরু,
হৃদয়ের মাঝে কিন্তু হ'ল তাঁর শুরু
দুরু দুরু !
ভাবিলেনও গর্ব্বভরে,
"স্বলতার স্বয়ম্বরে
হয়েছিল মর্ম্মচ্ছেদ,
স্নেহলতা আজি মোর মিটাল সে খেদ !
কিন্তু কেন ?"—এই বলি মুছিলেন কপালের স্বেদ !
তার পর বহুক্ষণ বহু ধীরে ধীরে,
সিগারেট ধূম দিয়ে ঘিরে,
মনোরম চিন্তাটিরে
নানা রূপে দিলেন প্রশ্রয় !
বিবেক আসিয়া তারে কয়—
"বাড়াবাড়ি ভাল নয় !
স্নেহলতা স্বলতারই জাতি
আবার খাইবে শেষে লাথি !"

৩

এবং তখুনি
বিবেক বকুনি
বাধ্যই করিল যেন তাঁরে।
তুলিয়া কলমটারে
অবিলম্বে লিখিয়া দিলেন
"স্নেহলতা সেন
খবরদার,
চিঠিপত্র আর
লিখো না আমায়,
লেখ যদি বাধ্য হব তোমার বাবায়
জানাতে সে কথা,"
কিন্তু বড় ব্যথা
পাইলেন অবিনাশ পণ্ডিত প্রবর।
এবং দুদিন পরে খবর জবর
হল ছাপা,
রহিল না চাপা।
নেবুতলা লেন,
সেথাকার হারাধন সেন—
আত্মহত্যা করেছেন
কন্যা তাঁর!
পুরাতন মামুলি প্রথার
পুনরভিনয় করি',
পড়েছেন সরি'
বে-দরদী দুনিয়ার কবল হইতে হায়
এক ঝট্‌কায়!

১১

৪

শুনি এ বারতা
অবিনাশ কি যে হল বলিতে পার তা ?
বলিতে পারি না আমি,
শুধু দেখি দিবা যামী,
চতুর্দিকে কুণ্ডলিছে সিগারেট ধূম,
তার মাঝে বসে' আছে অবিনাশ—গুম্ !
অনুতাপ-তাপে
(সিদ্ধ ভাপে
মাংসের মতন)
অবিনাশ মন
হল বিগলিত।
হারাধন সেন তাঁর পূর্ব্ব-পরিচিত !
কতবার গৃহে তাঁর
শুনেছে সে বেহালা, সেতার,
সে স্নেহলতার !
করিয়া চা পান
মূর্ত্ত করি তুলিয়াছে রাশিয়া, জাপান,
চায়ের টেবিল 'পরে
শুধু বাক্যভরে !
হারাধন, নিরীহ সে, বুঝিত না অতশত কিছু,
শুধু ক'রে মাথা নীচু
গুম্ফ গুছাইত,
আর সায় দিত।
হায় সে বেচারা,

কন্যাশোকে বিনা-দোষে কেঁদে কেঁদে সারা !
"কি ক'রে তাঁহার কাছে দেখাইব মুখ,"
এই ভেবে অবিনাশ শুক !
(আহা যেন আহত শামুক !)

৫

তার পর বহুদিন গেছে কেটে !
ছিল যারা বেঁটে
হয়েছে তাহারা লম্বা বয়স বাড়িয়া।
অবিনাশ কলেজ ছাড়িয়া
প্রথমতঃ রেখেছিল টিকি।
(গভীর শোকই কি
গুচ্ছ গুচ্ছ কেশরূপে,
মূর্দ্ধাপরে চুপে চুপে,
উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাসের মত
ধরেছিল অত
মোটা ঘন কালো দেহ ?
—সে কথা বলিতে নারে কেহ)
কিছুদিন টিকি লয়ে মহা হৈ চৈ !
কোশাকুশি, ধূপধুনা, বাতাসা ও খৈ,
স্তূপে স্তূপে
হাজির হইল যেন সে টিকির মোসায়েব-রূপে !
কত না নিরীহ ফুল হাসিতে হাসিতে
চড়িল সে টিকির ফাঁসিতে !

টিকিওলা বহু পুরোহিত
অবিনাশে দলে পেয়ে হারাল সম্বিৎ !
সবে তারে ঘিরে,
দীর্ণ করি বিংশ শতাব্দীরে,
চীৎকার করিল সুরু নানাবিধ সুরে
অবিনাশ-পুরে !
বর্ষার দাদুরী যথা ঘোলা জল পেয়ে
ওঠে গান গেয়ে !
কিন্তু শেষ চমকিল অবিনাশ-পিলে,
যবে সবে মিলে
কহিল আসিয়া তারে "দাদা,
দাও কিছু চাঁদা !"
একবার দিয়া তাও পেল না নিস্তার।
নিত্য নব আবির্ভাব চাঁদার খাতার
ধর্ম্ম জগতের
প্রার্থী নগদের !
দেখি হুলুস্থুল
অবিনাশ চুপে চুপে টিকিটিরে করিল নির্ম্মূল
বিচলিত হিয়া,
অন্য কোন্ পন্থা দিয়া,
স্নেহলতা শোকাবেগ করিবে নির্ব্বাণ,
ভাবিতে ভাবিতে, মনে হল—গান !
কণ্ঠ তার করিয়া সজল,
নির্ঘাৎ সে গাহিত গজল,
কিন্তু হায়, একি—ইস্,
সহসা হইল তার 'ল্যারিন্‌জাইটিস্' !

কোথা গান? কণ্ঠবাঁশী
ছাড়িছে কেবল কাসি
বেসুরা—বেতালা,
হায় একি জ্বালা।
দিল শিস্।
মিটিল না আকুলতা—কণ্ঠ তার করে নিস্ পিস্
অস্ফুট আবেগভরে।
অকাতরে
করিল সে অর্থব্যয় চিকিৎসার তরে;
কিন্তু হায়—সকলি বৃথায়।
প্রাণ যবে করে গাই গাই,
কণ্ঠ শুধু করে সাঁই সাঁই!
শেষে অবরুদ্ধ শোক তার জমে'
ক্রমে ক্রমে
যেইরূপে দেখা দিল সে অতি ভীষণ।
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
আশ্রয় করিয়া
খাইতে লাগিল মুর্গি উদর ভরিয়া!
"ধর্ম্মকর্ম্ম"-কাগজেতে প্রবন্ধের ভারে,
সম্পাদকটারে
জর্জ্জরিত করি,
হঠাৎ পড়িল সরি
পণ্ডিচেরি।
শুনিতেছি, আজকাল খাইতেছে শেরী,
কাপড় পরে না আর,—ঢিলা ঢিলা পায়জামা পরে,
বাহিরে ও ঘরে!

রটাইছে বন্ধু-মহলে,
মৃতা স্নেহলতা নাকি নানা ছলে বলে
আসে রাতে, আপাদমস্তক তার চাদরেতে মুড়ি'
এসে পায়ে দেয় সুড়সুড়ি !

পলিটিক্স আপ-টু

জ্বলে' গেল অঙ্গ,
বঙ্গ-ভঙ্গ !
মরমেতে বাজিল রে সুগভীর বেদনা
জাগিল রে চেতনা।

যত দেশ-ভক্ত
"রক্ত রক্ত"
চীৎকার করি' মোরা ছুঁড়িলাম পট্‌কা,
—বেড়ে গেল খট্‌কা।

উপদেশ সস্তা
বস্তা বস্তা
"জোর করে' পারবি না, তোরা এক রত্তি !"
···দেখিলাম, সত্যি !
"মুখ তুলে চাওগো,
দাওগো দাওগো,
ঘুচাইয়া দাও এই অধীনতা-বন্ধন,"
—করিলাম ক্রন্দন।

হাত জুড়ি' বক্ষে,
চক্ষে চক্ষে
বহে গেল ভক্তির দরদর দরিয়া
—"দাও দাও" করিয়া।

তবু মন পাই না!
"চাই না চাই না"
তুলিলাম রব তাই হয়ে গেছে শিক্ষা
চাই না ও ভিক্ষা।

ঘুরালাম চরকা
ঘরকা, পরকা,
পারিলাম যদ্দুর—পরিলাম খদ্দর,
আপামর ভদ্দর।

খদ্দরে, ঘর্ম্মে,
চর্ম্মে চর্ম্মে
চুলকানি ঘামাচিতে হল সবে অস্থির!
উপায় কি স্বস্তির!

হয়ে উনমত্ত
যত্ত-পত্ত
—জ্ঞান-লোপ পেল ফের ছুঁড়িলাম পিস্তল।
তাও হল নিষ্ফল!

শোনা গেল লণ্ডন,
ঝনঝন ঠনঠন

স্বাধীনতা-বণ্টন করিছেন নগদাই,
যার যাহা 'হক্' তাই !

জাহাজেতে চাপিয়া,
বাপ্পে কাঁপিয়া,
রবার-বেলুন সম গেল এক গুচ্ছ,
আশা ছিল উচ্চ !

লণ্ডন বৈঠক,
টক্‌টক্ টক্‌টক্
আল্‌পিন দিয়ে খোঁচা দিল টুপ্‌টুপ্‌ সে,
গেল সব চুপ্‌সে !

তবু বুক বান্ধি'
"গান্ধি গান্ধি"
চীৎকার করিতেছি মোরা দেশ-সুদ্ধ,
আত্ম-প্রবুদ্ধ ।

মহাত্মা লোক সে,
ভুলিবে না hoaxএ,
এই ভেবে মোরা শুধু করিতেছি নির্ভর
রোগা লোকটির 'পর !

নিষ্ক্রিয় ভক্তি
মহাত্মা শক্তি
শোষণ করিছে, মোরা ভক্তিতে প্রহ্লাদ !
—নহি মোরা জল্লাদ !

সব জেল ভর্ত্তি !
ঝড়্‌তি পড়্‌তি

দু' একটা আছে যা-ও, তা-ও নাকি রুগ্ন,
—প্রাণ-রস শুক্‌নো !

শেষকালে ভাগ্যে,
ভাববো না যাক্‌ গে,
ভাবনার কোন দিন মিলিয়াছে অন্ত ?
আপনারা ক'ন তো ?

অন্নদা সরকার

১

গৃহ-কোণে মূর্ত্তি দেখি' ভগ্ন চরকার,
সহসা পড়িল মনে—অন্নদা সরকার।
চমৎকার ছেলে,
সেদিনই তো P. R. S. পেলে।
লেখাপড়া ছাড়া
অন্য কোন বিষয়েতে প্রাণ তার দিত নাকো সাড়া
যে রকম প্রচণ্ড বিদ্বান,
সকলেই ছিল আস্থাবান,
এইবার বড়-গোছ চাকরি জুটিবে,
অচিরাৎ ফাঁপিয়া উঠিবে।
কিন্তু হঠাৎ
সকলের আশা-তরী করি দিয়া কাৎ,

অন্নদা সরকার
হইল চরকার
মহাভক্ত।
অহিংস-সংগ্রামে তার ধমনীর রক্ত
ভীষণ বেতালা ভাবে নাচিয়া উঠিল।
ফলে, তার লেখনী ও রসনা ছুটিল
উন্মাদ উদ্দাম সুরে,
নিকটে ও দূরে,
কাগজে ও মাঠে।
সকলে ব্যাকুল হ'ল শ্রবণে ও পাঠে।
উদ্দাম সে সঙ্গীত দম নিল শেষে
দম্‌দমে এসে।
অর্থাৎ, শেষ কালে ছেলে
গেল জেলে।
দু' বৎসর ছয় মাস
হল কারাবাস।

২

অন্নদার ব্যবহারে দেশসুদ্ধ লোক লাখে লাখ
মানিল অবাক।
কিন্তু সে বিস্ময় আরো হইল গভীর,
যবে সেই বীর
জেল থেকে ফিরে এল ইয়া ভুঁড়ি নিয়ে।
সকলে কহিল তারে—একি তব ইয়ে,
এত বড় ভুঁড়ি,
কদাচিৎ মেলে এর জুড়ি।

সকলে মিলিয়া তারে
বারে বারে
প্রদক্ষিণ করি'
নিরীক্ষণ করিল সে ভুঁড়িটিরে দুই চক্ষু ভরি'।
দেখা গেল, ভুঁড়িটির আছে দু'টি স্তর,
তার মাঝে নাভিদেশে গভীর গহ্বর,
তদুপরি কালো কালো আবক্ষ-বিস্তৃত বহু রোঁয়া,
অন্তরে যে অগ্নি জ্বলে—একি তারি ধোঁয়া ?

৩

অন্নদা সরকার,
জেল থেকে বের হয়ে ভেবেছিল—"দরকার
স্বদেশবাসীরে মোর করা সচেতন।
জমিয়াছে বহু আবেদন
চরকা বিষয়ে, জেলে বসে' ভাবিয়াছি যাহা।"
কিন্তু আহা,
কাল হল ভুঁড়ি তার !
সকলেরই এক কথা—"দেখেছ হে অন্নদার
ভুঁড়ির বহর ?"
ডাক্তার রামলাল ধর
একদিন কহিলেন সবে
—"ভেবেছে কি ওর দ্বারা আর কিছু হবে ?
অত বড় পেট যার জালার সমান,
সে তো একটা অপদার্থ ! ভাল যদি চান,
ব্যায়াম করুন আর খাওয়াটা কমান।"

এই ভাবে অন্নদা যতই
চরকার ব্যাখ্যা করে, সকলে ততই
ভুঁড়িটাই লক্ষ্য করে—কিছু নহে আর ;
দেখে শুনে ভারি দুঃখ হ'ল অন্নদার।

৪

দুটি মাস পরে ঠিক
চারিটাকা মূল্যের একটি মাসিক
করিল বাহির।
প্রবন্ধ ও কবিতাতে পাতে পাতে করিল জাহির,
ভুঁড়িতে ও চরকাতে নাহিক বিরোধ।
এমন কি হ'য় যদি আব কিম্বা গোদ,
তাহলেও স্বরাজ-স্বর্গর
একমাত্র জয়-ধ্বনি চরকা-ঘর্ঘর !
ভুঁড়ি, আব, গোদ, পিলে—দৈহিক কোনরূপ স্ফীতি,
পারিবে না কমাইতে প্রীতি
কাহারো চরকার"
লিখিতে লাগিল তুড়ে অন্নদা সরকার।

৫

কিন্তু তার ফলে,
আর্টিষ্ট মহলে
জাগিল স্পন্দন।
কার্টুন আঁকিল তারা—"সরকার নন্দন
বিপর্য্যস্ত ভুঁড়িভারে
চরকা কাটিছেন। চারিধারে

ভৃত্য সারে সারে
মোটা অন্নদারে
ক্রমাগত করিতেছে হাওয়া।
খস্‌খসে ছাওয়া
চারিপাশ,
ঘর্ম্মাক্ত তবুও ভুঁড়ি, শ্লথ নীবি-বাস।
মুগ্ধ-নেত্র ভক্তবৃন্দ দেখিতেছে সুতা-আবির্ভাব,
কার ও গোদ, কার ও পিলে, কার ও গালে-আব।
স্বরাজের শুভ সূত্রপাত
হেরিছে নিস্পন্দ নেত্রে—নাহি দৃক্‌পাত।"
এইরূপ নানাবিধ ছবি ও বিদ্রূপ
অন্নদারে করাইল চুপ।

৬

অন্নদা বেচারা শেষে
গ্রামে ফিরে এসে,
নির্জ্জন নদীতীরে একদা সন্ধ্যায়
ভাবিতে লাগিল হায়,—
"জন্মলাভ করিয়াছি ভাগ্যহত দেশে।
হেথায় সবার দৃষ্টি এসে
কি আশ্চর্য্য, ঠেকে গেল ভুঁড়িতে আমার,
এগোল না তার বেশী আর!
অন্তর্দৃষ্টি নাই কারো চোখে,
ছি ছি গেছি ভারি ঠকে',
জন্মলাভ করিয়া এখানে।
এদেশের লোক শুধু জানে,

তাড়াতাড়ি বিয়ে করে'
তার পরে
বংশবৃদ্ধি করা অবিরত ;
পরে খেয়ো কুকুরের মত
কামড়াইয়া ইহারে উহারে,
চলে যাওয়া যমের দুয়ারে।
যাই হোক, এ দেশেতে জন্মলাভ করেছি যখন,
তখন
বিয়ে-করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।
অতএব চেষ্টা করি তাই।"

৭

কিছুদিন পরে,
শুনিল সে হাঁওড়া নগরে
আছে এক সুরবালা—তরুণী, শিক্ষিতা,
আধুনিক-মন্ত্রে সুদীক্ষিতা,
সুতরাং গল্প-লেখা বাতিকটা আছে !
অন্নদা তাহার কাছে
পত্র-যোগে করিল প্রকাশ—
"পড়ি' আপনার লেখা মনে মোর জন্মিছে বিশ্বাস,
সাহিত্যের ইতিহাসে আপনার সম্রাজ্ঞীর পদ
কিছুতেই হইবে না রদ।
আলতামস মারা গেলে আপনিই হবেন রিজিয়া।"
শুনি, সে বালার মন উঠিল ভিজিয়া।
নানাবিধ পত্রালাপ হল ক্রমে সুরু,
খাম পুরু পুরু ;

চিঠি লিখে লিখে
প্রেমটিকে
পুষ্ট যবে করিয়াছে অন্নদা সরকার,
তখন হইল হুঁস্—"যাওয়াটা দরকার
একবার সশরীরে
অশরীরী প্রেমটিরে
শারীরিক ভাষ্য-দেওয়া মন্দ কি এবার !"
এই ভেবে অন্নদা সেবার
গেল হাওড়ায়,
কিছু 'বাসে'—কিছু হাঁটা-পায় ।
মানসীর প্রথম দরশ,
সেই নত-দিঠির পরশ,
অন্নদারে করিল আকুল,
হাওড়াকে হল তার ভুল
পারস্য বলিয়া ।
অন্তরের গজল গলিয়া
দেখা দিল সর্ব্ব-অঙ্গে ঘাম,
খুলিল সে কোটের বোতাম ।

৮

ফিরিবার পথে
'বাস'—'জয়রথে'
দেখা হল সহপাঠী সুরেশের সাথে ।
তার হাত রাখি হাতে
অন্নদা কহিল তারে—"ভাই,

তোমারে খুলিয়া বলি সকল কথাই।
হাওড়ায় সুরবালা বোস নামে আছে একজনা,
মানে, অত্যন্ত প্রকৃষ্টমনা
মহিলা সে।
তারি সাথে আলাপের আশে
ক্ষণিকের সঙ্গ-পিপাসায়
এসেছিনু আজি হাওড়ায়।"
কহিল সুরেশ, "সুরোকে তো চিনি আমি, সেও মোরে চেনে,
থাকি এক লেনে।"
অন্নদা কহিল তারে, "হও না রে ভাই
ঘটক তাহলে। বিবাহ করিতে চাই
তারে।
নিজ মুখে কথাটারে
প্রকাশ করিতে পাই লাজ,
তুমি ভাই কর এই কাজ।"
"বেশ তো বেশ তো" বলি সুরেশ তো রাজী,
"কথাটা পাড়িব আমি আজই।"
দিন দুই পরে এল সুরেশের পত্র
মাত্র কয় ছত্র!
"আশা তার ছাড়ো,
স্বামীর আদর্শ তার Ramon Novarro.
তোমার ও ভুঁড়ি দেখে (খোলা ছিল জামার বোতাম)
প্রেম তার হ'য়ে গেছে numb.
কহিছে সে, অত বড় ভুঁড়িওলা লোক,
নিশ্চয় অতি আহাম্মোক;
যতই সে P. R. S. হোক।

সুতরাং ভাই,
আশা কিছু নাই।"
পত্র পড়ে, অন্নদা কি মনে ভেবে শেষ
অকস্মাৎ হল নিরুদ্দেশ।

৯

বহুকাল পরে, শোনা গেল—অন্নদা ফিরেছে দেশে
অপরূপ বেশে
দলবেঁধে গিয়ে বাড়ী তার
দেখিলাম, কঠিন ব্যাপার!
দেখা গেল যাহা,
তাহা
কল্পনার সীমার ওপারে।
অন্নদারে
চেনা শক্ত!—ভুঁড়ি নাই মোটে,
সর্ব্বাঙ্গের পেশী তার ফুলে ফুলে ওঠে
যেন ক্রুদ্ধ অভিমান ভরে।
শিরোপরে
একগাছি চুল নাই—সমস্ত কামানো একেবারে।
গর্দ্দানে রদ্দার চিহ্ন সারে সারে সারে।
বিস্তৃত উরস তার—কঠোর বদন,
ফেলিতেছে ক্রমাগত 'ডন্,'
চারিপাশে ডাম্বেল, মুগুর।
বৈশাখের বিষম দুপুর
অগ্রাহ্য করিয়া
চলিয়াছে শুধু 'ডন্' দিয়া।

পরনেতে কাচ্ছা শুধু—নগ্ন সর্ব্ব দেহ
ঘর্ম্মাপ্লুত।—চোখে-মুখে নাই কোন স্নেহ!
যোদের দেখিয়া
'ডন' থামাইয়া
কহিল—"কি চাও"—
কি বলিব ভাবিতেছি। হেনকালে সে কহিল—"আও"!
পা' দুইটি ফাঁক করি', উরু 'পরে চাপড়াইয়া করতাল দু'টি,
একটু ঝুঁকিয়া, ভুতোটার ধরি ঝুঁটি
দিল গাঁট্টা!
হিন্দিতে কহিল হাসি'—"চলে আও পাঠ্‌টা"—

*　　*　　*

পাগ্‌লা গারদে আছে অন্নদা সরকার,
পেশীময় সুস্থ দেহ ভুঁড়ি নাই আর।

সর্ব্বদা

যবে　উঠিতে বসিতে হাসিতে কাসিতে,
তব্‌লা-বেহালা-সেতার-বাঁশিতে,
সর্ব্বদা—
ধরিতে চেয়েছি হয় তো পাইনি,
আধপেট ছাড়া কখনো খাইনি,
সর্ব্বদা—
যবে　সোহাগে সরমে কাঁদিয়া রাগিয়া,
কাগজে কালীর আখর দাগিয়া
অর্থাৎ—

নাগ্‌রা নোলকে আঁচলে চাবিতে,
চিবুকে অধরে কোমরে নাভিতে
সর্ব্বদা—
পেয়েছি কিম্বা পাইতে পাইতে,
জীবন কাটিবে চাইতে চাইতে
ঠিক্ তা—
বুঝ্‌তে পারিনি শোনই না হয়'
ভাব্‌বে আমারে যা হয় তা হয়
সর্ব্বদা—
জানলা ধরিয়া কিম্বা 'বাসে'তে,
এসেছিল মোর মনের পাশেতে
ঠিক্ তা—
ধরিতে পারি নি—হয় তো স্বপনে,
সাম্‌না-সাম্‌নি কিম্বা গোপনে
অর্থাৎ—
শেষ-বরাবর কবিতা গল্পে,
চিন্তা করিয়া অল্পে অল্পে
সর্ব্বদা—
ছাড়িব-ছাড়িব এমন সময়,
শুনবেন সবি ? থাক্ আর নয়
অর্থাৎ—
মেয়েটা বেজায় বুঝলেন কি না,
ঠিক্ একালের নয় আশা, বীণা,
চপলা !
অর্থাৎ যেন কেমন গোব্‌দা,
হয়নি তাতেও মনের ক্ষোভ তা'
সত্যিই ;

ক্ষোভ হল ঠিক যখন শেষটা,
ব্যর্থ করিয়া সকল চেষ্টা

হায় রে—

(প্রেম নাহি হয় এ পোড়া বঙ্গে)
শেষ-কালটায় আমারই সঙ্গে

উদ্বাহ !

মশাই, শেষটা বিয়ে হল মোর
মেয়েটার সাথে ! আজও তার ঘোর

সর্ব্বদা—

রয়েছে ঘিরিয়া স্বপনে শয়নে,
এ-পাশে ও-পাশে নয়নে নয়নে

সর্ব্বদা—

সর্ব্বদা আছি, আছে সর্ব্বদা,
আর কিছু নয়, খালি সর্ব্বদা,

এন্‌তার !

ট্রাজেডি-বৃক্ষের আর একটি ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

'বাসে' চড়ে বীণা রায়
চলেছেন বেহালায়,
পড়িতেছে টিপি টিপি বৃষ্টি ;
আর কে চলেছে সাথে ?
লক্ষ্য নাইকো তাতে
পুস্তকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি !
(চলেছে গোবর্দ্ধন মিত্র ।)
নয়নের কিনারায়
এল যবে বীণা রায়
ঝুম্‌কো ঝুলায়ে দুটি কর্ণে ;
চরণে নাগরা পরা,
শাড়িটি ঘাগরা-করা
সুর্মা মাখান আঁখি-পর্ণে ।
(দেখিল গোবর্দ্ধন মিত্র ।)
এলো-খোঁপা চুলগুলি,
হাতে শুধু সরু রুলি,
কণ্ঠে চিকণ চারু হার গো ।
গালেতে লাগেনি চুন,
কিম্বা ধরেনি ঘুণ
পাউডার ওটা পাউডার গো !
(বুঝিল গোবর্দ্ধন মিত্র ।)

বয়স কতই হবে ?
সে কথা কেই বা কবে,
দেখিতে নেহাৎ রোগা তন্বী,
তবু ওই দেহ ঘিরে,
দেখা যায় শিখাটিরে
ভিতরে জ্বলিছে যার বহ্নি !
(ভাতিল গোবর্দ্ধন মিত্র ।)

বদনের সদরেতে,
রাঙা রাঙা অধরেতে
ভদ্র হাসিটি আছে তৈরী,
চোখে যেন আছে ভাষা,
বুকে যেন আছে আশা,
স্বাস্থ্যটা শুধু তার বৈরী ।
(গলিছে গোবর্দ্ধন মিত্র ।)

ভাষাহীন সে ভাষার,
সীমাহীন সে আশার,
মূর্ত্তি দিবে সে কোন্ শিল্পী ?
নহে এ তো সাধারণ
দোকানের পুরাতন
চির-পরিচিত বাসি 'জিল্‌পি' ।
(আকুল গোবর্দ্ধন মিত্র)

এ যে বাঙালীর মেয়ে,
নব 'কালচার' পেয়ে,
চপ ও সুক্তো এক সঙ্গে ।
দাঁতগুলি চক্‌চকে,
ঠোঁটে রঙ্ টকটকে,

ধন্য করিছে এই বঙ্গে।
(মুগ্ধ গোবর্দ্ধন মিত্র।)
সহসা কাটিল তাল
ছিঁড়িল স্বপন জাল,
মহাকাল করিলেন রঙ্গ।
'বাসে' 'বাসে' কলিশন
হয়ে গেল কি ভীষণ
চট্ করে হল রস-ভঙ্গ!
—(ব্যাকুল গোবর্দ্ধন মিত্র।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চোখ বুজে বীণা রায়
শুয়ে আছে বিছানায়,
মেডিক্যাল কলেজের কক্ষে।
"বেশী কিছু নাই ভয়"
ডাক্তার এসে কয়,
যন্ত্র লাগায়ে তার বক্ষে।
(পার্শ্বে গোবর্দ্ধন মিত্র।)
তিন দিন, তিন রাত,
শুয়ে থেকে দিনরাত
পুলকিয়া সকলের মন গো—
ভাল হল বীণা রায়,
ফিরে গেল বেহালায়
ট্রামেতে করিয়া আরোহণ গো।
(সঙ্গে গোবর্দ্ধন মিত্র।)

ছুটি মাস না কাটিতে,
বেহালার সে বাটিতে
বাজিয়া উঠিল নানা বাজনা,
বীণা রায় করে বিয়ে
সারা দেহ মন দিয়ে,
শুধিবারে সমাজের খাজনা!
(বর সে গোবর্দ্ধন মিত্র।)

উপসংহার

গোবর্দ্ধন মিত্র মোর বাল্য সহচর।
বিবাহের দু' বছর পর
সেদিন তাহার সাথে দেখা হল হেদুয়ার ধারে।
নানাবিধ গল্প হল ; অবশেষে কহিলাম তারে,
—"চা খাবি তো চল্,
দেখ তো এ আধুলিটা ভাল না অচল!
ওটাই সম্বল!"
ম্লান হেসে
কহিল সে
—"মেকি কিনা
বলিতে পারি না।
মেকি ধরা শক্ত ভাই—যদি পারিতাম,
তাহলে কি বিয়ে করিতাম?"
ধরি তার হাত
শুধানু—"অর্থাৎ?
—এটা কি বলিস্!"
সে কহিল, "স্ত্রীর মোর বয়স চল্লিশ!

১৯০৯ সনে,
সে মোর বাবার সনে
করেছিল 'এনট্রান্স' পাস্।
বিয়ে করে শেষে দেখি আরে সর্ব্বনাশ!"
কিছুক্ষণ পরে গবু কহিল আবার,
"এখন কেবল ভাই সান্ত্বনা আমার
এই দেখ্—" বলিয়া সে একখানি রুমাল খুলিয়া
সম্মুখেতে ধরিল তুলিয়া,
এবং কহিল পুন—"এমব্রয়ডারি ভাল করে,
—ওইতেই আছি ভরপুর!"
দেখিলাম, রুমালেতে আঁকা এক কুঞ্জ ময়ুর!

রূপান্তর

বহু বৈজ্ঞানিক
গবেষণা করিয়াই করেছেন ঠিক,
পৃথিবীতে রূপান্তর ঘটিছে নিয়ত।
পুরাতনে করিয়া নিহত
নূতনের অভ্যুদয়
নিত্য হয়।
বীজ হতে বৃক্ষ হয়, মন্ত্র হতে মন্ত্রী দেয় হানা,
গুটিকা-খোলস ছাড়ি' প্রজাপতি মেলে তার ডানা,
উজল বিজলী হতে জন্ম লভে কঠিন কুলিশ,
শান্তিরক্ষা করে শেষে থানা ও পুলিস।

অণ্ড হতে মুর্গী হয়, ষণ্ড হতে পাদুকা-উদ্ভব,
প্রিয়া সে নন্দন ছাড়ি' করে শেষে রন্ধন উৎসব
পাচিকার বেশে।
সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব দেশে,
অবস্থা বিপাকে
রূপান্তর ঘটে থাকে।
গাণ্ডীবী অর্জ্জুন হ'য়েছিল বৃহন্নলা,
ভীমসেন সূপকার। কিছুই যায় না বলা
রূপান্তর হবে
কার কবে।
দুর্নিবার এই রূপান্তর।
—যার বলে দস্যু রত্নাকর
বিরচিল রামায়ণ।
যার ফলে বৃদ্ধ শ্যামধন—
কৃপণ, কুশীদ-জীবী, শুষ্ক নিষ্করুণ
(হায় কিংকরুণ)
বলি-রেখাঙ্কিত মুখ সাবানে মাজিয়া
দেখা দিল তরুণ সাজিয়া।
ফেলি' তার ভাঙা ছাতা,
খেরো-বাঁধা খাতা,
আদ্দির পাঞ্জাবী পরি' তবলায় করিল সঙ্গৎ।
আয়ত্ত করিয়া বহু গৎ।
কারণ ?
আইন তারে করে না বারণ
পঞ্চাশোর্দ্ধে বিবাহ করিতে।
তাই সে ত্বরিতে

সুদ্‌খোর হতে হল তবলা-বাদক
সঙ্গৎ সাধক।
অদ্ভুত এ রূপান্তর।
যার ফলে উষর প্রান্তর
হয়ে ওঠে শ্যামময়ী কানন-বীথিকা
সঙ্গীত হইয়া যায় রেকর্ড-গীতিকা।
চিকিৎসক হয়ে পড়ে ঔষধ-বিক্রেতা,
বৈরাগী সে হয় দেশ নেতা।
আল্‌ট্রা ভায়লেট রশ্মি দীপ্তি রবীন্দ্রের
ভাইটামিন রূপে হায় কত কবিদের
কল্পনারে মোটা করে।
আর তার ভরে
পটাপট্‌ ছিঁড়ে যায় তার
বাণীর বীণার।
রূপ হতে রূপান্তরে অরূপের অপরূপ সুর
চিরকাল বাজিছে মধুর।

তফাৎ হইতে আমি এতকাল ধরি'
নির্ব্বিকারে চিত্ত মোর ভরি',
নিরীক্ষণ করিয়াছি অরূপের নিত্য নব প্রসাধন-সাধ।
কিন্তু এবে ঘটেছে প্রমাদ।
আজ আর
নহি নির্ব্বিকার।
আমার বালিকা-বধূ (বয়স 'নাইন')
(হয়নি তখনো দেশে সর্দা আইন)
গৌরীদান-পুণ্যফল ঘটায়ে পিতার

পুন্নাম নরকের দ্বার
রোধ করিবার আশে,
দাঁড়ালেন আসি মোর পাশে,
বাদ্যোদ্যমে মহা ঘটা করি'
—ছোট্ট নোলক পরি।
সমৃদ্ধ সে সমারোহ
আনিতে পারেনি কোন মোহ
মোর মনে। তাহার প্রমাণ,
—আন্দামান।
বিবাহের পরে
স্বদেশ উদ্ধার তরে
উন্মত্ত আবেশে
আন্দামানে গিয়েছিনু ভেসে।
কিন্তু আন্দামানে
চিত্ত মোর ভরেছিল বিরহের গানে
বালিকা বধূর তরে।
কত দিন স্বপ্নভরে
গেছি তার কাছে হায়,
কচি মুখখানি তার চুমায় চুমায়
দিয়াছি ভরিয়া।
তারেই স্মরিয়া
"মেঘদূত" পড়িয়াছে মনে
আন্দামান জেলে ক্ষণে ক্ষণে।
অশ্রুসিক্ত মোর অনুভূতি
ভাষার লাগিয়া শুধু করেছে আকুতি
নির্ব্বাক রসনা 'পরে।

যাপিয়াছি কারাবাস বাণীহীন বেদনার ভরে।
আন্দামান সেরে যবে ফিরিলাম বাড়ী,
দেখিলাম, প্রেয়সীর গজায়েছে দাড়ী
অসহ্য বিস্ময়ে আমি শুধালাম সবে
এও কি সম্ভবে ?
ডাক্তার আসিয়া
করে গেল সমর্থন হাসিয়া হাসিয়া ;
দেখাইল অনেক নজীর,
মোর চক্ষুস্থির !
এই মোর প্রিয়া ?
যার লাগি বিচলিত হিয়া
কত না ব্যাকুল সুরে গেয়েছিল গান
মুখরিত করি আন্দামান !
যার লাগি
কত নিশি কাটিয়াছে জাগি',
যার মুখখানি
আমার তৃষিত বুকখানি
ভরেছিল আকুল স্মৃতিতে
প্রেম ও প্রীতিতে।
সেই কিনা শেষে
হাজির হইল আসি' বলিষ্ঠ এ দাড়িওলা বেশে !
—পুষ্ট দাড়ী—নেহাৎ অল্প না
কল্পনাও করেনি কল্পনা।
বিস্ময় কাটিল যবে—মন যবে কিছু শান্ত হ'ল,
কহিলাম ধীরে তারে—"নোলকটা খোল।"

ব্রহ্মার বিধানে

১

চিত্ত তার মোটে স্থির নাই,
হাতির হয়েছে সখ শিখিবে সেলাই।
(সূক্ষ্মতম সূচীকার্য্য তা'ও !)
গণ্ডারে ধরিল, "মোরে শিখাইয়া দাও।"
গণ্ডার কহিল—"ভাই,
সময় যে মোটে নাই,
ব্যস্ত আছি বেহাগ সাধিতে।
ওস্তাদের সন্ধান পার কোন দিতে ?"
হস্তী কয়—"কোকিলের যে সুন্দর গলা,
সে হয়ত জানে কিছু, যায় না তো বলা।"
গণ্ডারও কহিল তারে,
—"ভুলেই যে গেছি আরে
সেলাই শিখিতে পার মাক'শার কাছে।
তার তুল্য শিল্পী আর আছে ?"

২

হস্তদস্ত ছুটিল গণ্ডার,
বেহাগ-রাগিণী শেখা নিতান্ত দরকার !
কিন্তু হায়,
সকলি বৃথায়।

গণ্ডার দেখিল গিয়া, কোকিলের ঝোঁক
'টাইপ রাইটিং' শিখে হবে বড়লোক!
তারি হায়, দিবারাত্রি দেখিছে স্বপন;
চীৎকারিছে মাঝে মাঝে, "কোথা রেমিংটন্?"

৩

হাতীও হতাশ হল মাক'শার কাছে।
মাক'শার সময় কি আছে?
কি হইবে জাল বুনে হায়—
স্বাস্থ্যই সার ধন এই দুনিয়ায়।
এ কথা সে পড়েছে যে স্বাস্থ্য-পাঁজিতে;
চায় তাই ডাঁম্বেল ভাঁজিতে।
পর্ব্বতে ও জঙ্গলেতে সারাটা দুপুর
খুঁজিয়া ফিরিছে কোথা ডাম্বেল মুগুর।

৪

পর্ব্বতে ও বনে
চতুষ্টয় প্রতিভার নব আন্দোলনে
সাধারণ পশু পাখী (গৃহস্থ যাহারা)
ব্যস্ত হল তারা।
অবশেষে ব্রহ্মার দরবারে গিয়া
হাজির হইল সবে বিচলিত-হিয়া,
"ত্রাহি, ত্রাহি, কর প্রভু ত্রাণ,
(গেল বুঝি প্রাণ!)
সঙ্গীত-গাণ্ডীবে নিত্য বেহাগের বাণ

ছুঁড়িছে গণ্ডার,
সহ্যের সীমানা হ'ল পার।
ওদিকেতে ভীমকায় হাতী
করিতেছে মহা মাতামাতি।
সকলেরে কহে গিয়া, "শিখাও সেলাই,
কিচ্ছু শুনিতে নাহি চাই।"
ছুঁচাদেরও করে জ্বালাতন
"ছুঁচ দাও" "ছুঁচ দাও" কহে অনুক্ষণ।
কোকিল ভুলেছে 'কুহু',
বলিতেছে মুহুর্মুহুঃ,
—"চাই মোর রেমিংটন খাস্।"
মাক'শা হইতে চায় হিপোপটেমাস্।

৫

ব্রহ্মার ডাকে
কোকিল ও গণ্ডার, হাতী—মাক'শাকে
হাজির হইতে হ'ল দেব-দরবারে।
পিতামহ হাস্যমুখে শুধান সবারে,
"বৎসগণ
এ কি আচরণ?"
সকলে কহিল তারা,—"পিতামহ, করিও না কোপ,
জঙ্গলে ত দাও নাই 'স্কোপ'
আমাদের মত হায়, বিদ্রোহীর তরে।
অন্তরে যে গুমরিয়া মরে
বহির্মুখী বিবিধ প্রতিভা;
কহ করি কিবা?

কহ—শীঘ্র কহ—"
ব্রহ্মা ক'ন—"রহ।"
পরে ধীরে কহিলেন—"মনে পড়ে সৃজন-স্বপন!
প্রত্যেকেরই মাঝে আমি করেছি বপন
একটি বিশিষ্ট শক্তি, যার প্রতিভায়
বৈশিষ্ট্য সে লভিবে ধরায়।
কেহই ত নহ অকিঞ্চন,
কেন তবে অসম্ভব এই আকিঞ্চন?
এক একটি গুণ লয়ে সকলেই তোমরা যে গুণী।"
এই কথা শুনি'
সমস্বরে চারিজন করিল চীৎকার,
"স্পেশালাইজেশন মোরা করি না স্বীকার।"
শুনি চতুর্ম্মুখ
হইলেন মূক।

৬

কিছুক্ষণ পরে পুনঃ ক'ন
—"তা' হইলে ত্যাগ কর বন,
বাঙালী হইয়া কর জনম গ্রহণ।
তাহাদের মাঝে আমি জানি
কবি সে ডাক্তারি করে, ডাক্তার দোকানী।
দোকানী সেতার সাধে,
সেতারী লাঙল কাঁধে
কৃষকের লয়েছে ভূমিকা,
প্রেমিকা সে হয়েছে লেখিকা।

তাহাদেরি জীবনে প্রচুর
একসাথে চাষ হয় জুঁই ও কচুর।
একটানে পান করি সুরা আর সাবু
নানাবিধ বাবু
আতরের ছিটা দেয় ময়লা কাপড়ে
শতকরা আশীজন—গড়ে।
তোমরাও তেয়াগি' জঙ্গল
সেখানেই পাকাও দঙ্গল।"
—বলি পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ ভরি'
হাসিলেন অনেকক্ষণ ধরি'!

বেল ও বোল্‌তা

বেল কয়, "কাছে আয় ওলো সই বোলতা।
কি করে হলুদ রঙ্‌ পেলি তুই খোলতা!
হলুদ বরণ তোর গিনি-সোনা-জিনিয়া,
মোর মরমের রঙ্‌ নেছে যেন চিনিয়া!
কাছে এসে ভালো করে চেয়ে দেখ ভিতরে,
বাহিরে সবুজ মোর ভিতরে যে পীত রে।
সবুজে ও পীতে হল যে প্রণয়-পিত্ত,
হজম করিবে সে যে প্রেয়সীর চিত্ত।
আয় সখী গায়ে বোস্",
—এই শুনি পেয়ারা
কহিল, "ভুলো না যেন হুলটা যে বেয়াড়া।

—বিষে আছে ভরে তা' !"

বেল কয়, "রে পেয়ারা, ছাল মোর শক্ত,
না হলে কি হই কভু বোল্‌তার ভক্ত !
—তুই শুধু সরে যা !"

বিরহের সাথী

গভীর জ্যোছনা-রাতে,
আমারো নয়ন-পাতে,
স্বপন ঘনায় আজো,—কলিকাতা সহরেও !
বরণে ও ধরণেতে,
ঠিক্ সুরে মরমেতে,
রঙীন রাগিণী তোলে, ছোট নয় বহরেও !

২

সেদিন শারদী নিশি,
টাঙাইয়া 'নেট্' দিশি,
একা-একা শুয়েছিনু খোলা-ছাদে দোতালায় ;
আকাশের তারা আর
মশারির কারাগার,
মনটারে ফেলেছিল অপরূপ দোটানায় !

৩

রিক্সার ঠুন্‌ঠুন্,
মশকের গুন্ গুন্,

মোটরের হর্ণের নিখাদ বা গান্ধার ;
কচিৎ বা শোনা যায়,
(এত কম গোনা যায় !)
পাশের বাড়ীর মেয়ে থামায়েছে গান তার !

৪

পুরাতন মরতের,
পুরাতন শরতের,
পুরাতন সেই হাসি পুরাতন চাঁদিমার,
পুরাতন মোর হিয়া,
দিল বেশ দোলাইয়া,
জাগে পুরাতন সাধ সাধিবার, কাঁদিবার।

৫

সেই ভালোবাসিবার,
অকারণে হাসিবার,
হারিয়াও বার বার হারাবার অভিযান,
পুরাতন সেই স্মৃতি,
সেই ব্যথা, সেই প্রীতি,
বিরহ-মিলন-ময় সেই মান অভিমান !

৬

এমন জ্যোছনা-রাতে,
একা শুয়ে বিছানাতে,
কতখন জাগি আর একলার চেষ্টায় !

ক্রমাগত উঠে হাই,
পাশের বালিশটাই
সম্বল হল হায়, আজ রাতে শেষটায় !

৭

চাদরে আবরি' দেহ,
ঢালিয়া সকল স্নেহ,
বালিশই নিলাম টেনে,—ঠিক হেন কালে হায়—
হঠাৎ পড়িল চোখে,
ছাদের কোণেতে ও কে,
আমারি পানেতে যেন চাহিয়া রয়েছে ঠায় !

৮

এমন চাঁদিনী রাতে,
এ কি মহা উৎপাত এ,
ভূত এসে শেষকালে করিল না কি রে ভর ?
পা এবং মাথা জুড়ি',
চাদরটি দিয়া মুড়ি,
রাম-নাম করিলাম ক্রমাগত পর-পর !

৯

সহসা হইল মনে,
সে যেন কানের কোণে,
অতি ধীরে চাপা-সুরে কথা কয় ফিস্-ফাস্ !

ভয় আরো হল গাঢ়,
চাদরটি মুড়ে আরো,
চুপ করে রহিলাম রোধ করি' নিশ্বাস !

১০

বলিতে লাগিল ভূত,
"এ তো ভারি অদ্ভুত,
এ যুগের হে রমণী, হেন রাতে নিদ যাও !
খোল গো মশারি খোল,
চাদরের ঢাকা তোল,
আমি যে এসেছি দেখ—হয়ো নাকো পিছ্‌পাও।

১১

শরতের এই শশী
একে ত মরমে পশি'
লালায়িত করে দেহ—মনেও দিয়েছে ঘা ;
তদুপরি তব লেখা !
ঘরেতে গেল না টেকা,
উঠেছি 'পাইপ্‌' বেয়ে ছড়েও গিয়েছে গা !

১২

আজি নিশি মনোহরা,
স্বপন দেখিছে ধরা,
দেখ সখী, চাঁদ আর চকোরেতে চুম খায়।

স্বামীটা তো নাই আজ,
তবে সখী কিবা লাজ ?
তিনি ত গ্যাছেন 'টুরে' জানি আমি তুমকায়।"

১৩

চাদরের ফাঁকে ফাঁকে
দেখিলাম ভূতটাকে,
গৃহিণীর male friend সুতরুণ যত্নু সুর !
তখন মশারি তুলি'
কহিনু তাঁহাকে খুলি',
"তিনি তো বাড়ীতে নাই গিয়াছেন মধুপুর।

১৪

নানাকাজে আজ ভাই
'টুরে' যাওয়া ঘটে নাই,
ক্ষতি নাই—এস দোঁহে—হই আজ মশগুল।
এসো ভাই খুলে প্রাণ,
তুজনেই গাই গান,
আমি গাই নিধু বাবু, তুমি গাও নজরুল !

১৫

লজ্জা পেও না বাবু,
বিরহে আমিও কাবু,
তাঁর তো ফিরিতে দেরী অন্ততঃ দিন চার !

কোথায় লেগেছে দেখি,
আহা, আহা, ছি ছি এ কি !
নিয়ে আসি থামো আছে আইওডিন্ টিনচার !"

* * *

সহসা পথের 'পরে
ভীষণ শব্দ করে'
ছুটন্ত মোটরের টায়ার ফাটিল কার !

জনপ্রিয় জনার্দ্দন

প্রস্তাবনা

অত্যন্ত জনপ্রিয় জনার্দ্দন জোয়ার্দ্দার,
এমন কি যে সময় নাই খাওয়া কিম্বা শোয়ার তার !
ঊর্দ্ধ-শ্বাসে সর্ব্বদাই
পরোপকার পর্ব্বটাই
করত সুখে হাস্যমুখে
একমাত্র গর্ব্ব তাই !
ও অঞ্চলে ছিলই নাক পাল্লা দিতে দোহার তার !
চন্দ্র-তারা-সূর্য্যময়ী সুন্দরী এ ধরিত্রীর
চমৎকার সৃষ্টি ও ! চমৎকার মতিস্থির !
মস্তকেতে একটি জ্ঞান
চিত্তে শুধু একটি ধ্যান
সবার ধন সোনার ধন

'পপুলার' সে জনার্দ্দন
পরোপকার জানত আর
করত তাই দনাদ্দন !
রাত্রি দিন শ্রান্তিহীন ক্লান্তি নাই শরীরটির !

পটোত্তোলন

১

রামবাবু যান আপিসেতে, তাঁর
ন'টার সময় চাই যে খাবার,
জনু করে দেয় ভোরেই বাজার
ভেবো না তাহারে যা-তা।

আবার তখুনি বাজারটা রেখে
ছুটে চলে যায়, ডাক্তার ডেকে
আনে তাড়াতাড়ি, কাল রাত থেকে
সুধার ধরেছে মাথা !

কাহার কিনিতে হবে ঘটি ঘড়া,
সারাইতে হবে কার চটি জোড়া,
পোড়াইতে হবে কোথা বাসি মড়া,
জনার্দ্দনকে ডাকে।

ও পাড়ার পিসী কহিলেন, "জনু
শশাগুলো সব খেয়ে গেল হনু"
অমনি সে জনু বিগলিত তনু
লাঠি হাতে বসে' থাকে।

২

সকলের তরে হায়,
জনার্দ্দনের সকাল-হুপুর
সন্ধ্যা বহিয়া যায় !

মাঠে আজ সোর-গোল !
হাওড়ার 'টিম্' খায় হিমসিম
বল হরিহরি বোল !
'উত্তর পাড়া' বাজায় নাকাড়া
ঠুকে দিয়ে তিন 'গোল' !

জনার্দ্দন সে কই ?
বরফ ছুঁড়িছে ওই যে দাঁড়ায়ে
কর্ণার ঘেঁসে ওই !
থাকিতে পারে কি থির ?
জম্নু যে কর্ম্ম-বীর !

৩

কমলি কহিল—"ভাই   পটলি চল্ না যাই
জম্নুদা'কে বলি এক ফাঁকে
'সিনেমা'য় আজ রাতে   যাবো মোরা হু'জনাতে
টিকিট কিনিয়া যেন রাখে !"
একথা শুনিল যেই   দিশাহারা পুলকেই
দশটি দশন বিকশিয়া
কহিলেন জম্নু-দাদা'   "এতে আর কিবা বাধা,
আমাকেও সাথে যাস্ নিয়া !

টাকা ? আমি দেব সব, তা না হলে কি গৌরব
জনু-দাদা হয়ে আর বল ?”
শুনিয়া কিশোরী দু'টি হেসে হল কুটিকুটি
জনু-আঁখি করে ছল ছল !

৪

শোন শোন কর অবধান,
জনার্দ্দন পথে পথে গাহিতেছে গান !
কি মিঠা গলার স্বর,
লজ্জা করিয়া দূর
খুলি দিয়া সব বাতায়ন,
ছিল যত পুরনারী
দাঁড়াইল সারি সারি
আগ্রহে আকুল প্রাণ-মন !
জনার্দ্দন গাহিতেছে ঢালি দিয়া প্রাণ
শোন শোন কর অবধান !
'হার্ম্মোনিয়াম' ঝুলাইয়া কাঁধে
জনার্দ্দন যে গান গেয়ে কাঁদে
—'পপুলার' ছেলে লোকে বলে সাধে ?
—নিজেই বেঁধেছে গান !
ভিক্ষার লাগি' পথে পথে ওই
গান গেয়ে গেয়ে করে হৈ হৈ,

উৎকলে নাকি জল থই থই
এসেছে সেথায় বান।
"দাও পুরজন দাও কিছু দাও
দয়া করে কর দান!"

৫

শেষ হল পথে কাঁদা হায়রে, তবুও চাঁদা
হল না যে মনোমত কিচ্ছু,
আজকাল লোকগুলো কেউ গাধা, কেউ হুলো
কেউবা কেউটে, কেউ বিচ্ছু!
দাঁড়াইল জানালায় পয়সা দিল না হায়,
মনে মনে জম্বু ভাবে, "আচ্ছা,
পয়সা আদায় করে' দেবই দেবই ওরে
হই যদি মানুষের বাচ্ছা!"

* * *

শোনা গেল রবিবার ক্লাবে হবে থিয়েটার
"সীতা" আর বাছা বাছা নৃত্য।
শুনি 'পাবলিক্' মন হইল রে উচাটন
দয়ার্দ্র হল সব চিত্ত!
'উৎকল'-বেদনায় গুটি গুটি সন্ধ্যায়
ছেলে-মেয়ে কচি-কাঁচা বৃদ্ধ,
ক্লাবের টিকিট-ঘরে ধাইল আবেগ ভরে
হল জম্বু-মনোরথ সিদ্ধ!

কহিলেন সকলেই, "মনে কোন ক্ষোভ নেই,
নাই খেদ, নাই কোন সন্দ!
এ খরচ সার্থক" কহে ছেলে-বুড়া-তরু
জম্বু সেজেছিল রামচন্দ্র!

পট-পরিবর্ত্তন

জনার্দ্দন জোয়ার্দ্দার ভারি অভিভূত!
ক্রমাগত পৃষ্ঠ-দেশে পড়িতেছে জুতো
ক্রুদ্ধ পিতার!
তিনি বার বার
জুতান ও জিজ্ঞাসেন তারে
"বল্ নারে
কতবার 'ম্যাট্রিক' কর্ব্বিরে ফেল
ওরে রাস্কেল?"
এই বলি পুনরায় করিয়া গর্জ্জন
করিলেন পাদুকা-বর্ষণ!
ধরিয়া চুলের ঝুঁটি করি রব ঘোর
শুধালেন—"ওরে ও শুয়োর
এত বড় জুল্‌ফি কেন তোর?
কি এমন মহাবীর সেনাপতি তুই
রেখেছিস্ জুল্‌ফি হাত দুই?
দুদিকের গোঁফটাকে ছেঁটে
ওরে বোম্বেটে
কি এমন কন্দর্প হয়েছিস্ বল্!
হতভাগা বংশের মুষল!

গাধা…খাসি…হাতী !”
এই বলে চালালেন লাথি
লক্ষ্য ছিল নিতম্বের 'পরে !
Skip করে'
জনার্দ্দন প্রণম্য পিতায়
সার্কাসি কায়দায়
Salute করি'
গেল সরি !

মানে, গল্পই

দাম্পত্য জীবন-মম
আঁটা-সাঁটা গেঞ্জি সম
যদিও 'টাইট্' ভাবে ধরেছিল আ-কোমর গলা,
চঞ্চল হয়নি মোর প্রীতি অচঞ্চলা !

গেঞ্জিটা পরেছি প্রায় পনের বছর,
ঠিক গত যুদ্ধের পর ।
যুদ্ধটা হ'ল যেই শেষ
আমিও পরিনু বর-বেশ ।
পাঁচটা বছর গেছে এদিকে ওদিকে,
প্রেম পত্র পড়ে' আর লিখে'
কিন্তু তার পর
পুরাপুরি দশটি বছর
(একশ' কুড়িটি মাস, মানে,)

মোরা দোঁহে দুজনের পানে
Almost পলক-বিহীন
চাহিয়া রয়েছি নিশিদিন।
নাকে নাকে করি ঠেকা-ঠেকি
অবিচ্ছিন্ন দশ বর্ষ চলিয়াছে এই দেখা-দেখি!
যদিও আপিস্ ছিল সকাল বেলাই
গৃহিণীরও ছিল নিত্য পুত্র-কন্যা রান্না ও সেলাই,
বিধবা পিসিমা ছিল,—বাজারেতে ছিল কিছু ধারও,
সব অতিক্রমি' তবু গাঢ় প্রেম হ'ল গাঢ় আরও
কিছু না কমিয়া!
বিগলিত মোম যেন বসিল জমিয়া!
সব তুচ্ছ করি'
গলাগলি করি' দোঁহে এ সংসার-তরী
বাহিয়া চলিতেছিনু, না জানিয়া কবে হব পার;
ভাঁটাহীন প্রেম-নদী, উচ্ছ্বসিত কেবলি জোয়ার!

হেন কালে হায়রে হঠাৎ,
নীলাম্বর হতে হ'ল পীতবর্ণ মহাবজ্রপাত
অর্থাৎ, এল 'টেলিগ্রাম'!
খুলে দেখি আরে 'রাম রাম',
পক্ষাঘাত
হয়েছে হঠাৎ
মোর শ্বশুরের!
তাল-ভঙ্গ হ'ল হায় জমাটি-সুরের!
দেখাইনু প্রেয়সীরে অকরুণ 'তার'
মোর কণ্ঠ ছাড়ি' প্রিয়া নিজ কণ্ঠ ছাড়িল এবার!

তার-স্বরে করিল ক্রন্দন,
দোহার হইল তার দুহিতা, নন্দন।
শোকাবেগে গুছাইল যাবতীয় গহনা-কাপড়
বুঝিলাম এইবার দিবে সিধা রড়
বেনারস্ পানে,
(পিত্রালয়ে, মানে)
অনাগত বিরহের ত্রাসে
বেগ সঞ্চারিত হ'ল নিশ্বাসে প্রশ্বাসে !

২

পরদিন প্রেয়সীরে চড়ায়েছি গাড়ী
ফিরিয়া আসিতেছিনু বাড়ী,
মানসে হইতেছিল ক্রমে ক্রমে ভীতির সঞ্চার
মনে হল', বাড়ী গিয়া দেখিব এবার
বিরহ পাতিয়া ওৎ বসে' আছে বিছানার 'পরে !
যেমনি ঢুকিব আমি ঘরে
অমনি সে মোরে
চিৎ করি' ধরি'
হৃদয়টি চিবাইবে কুচ্ কুচ্ করি !
প্রেয়সী চলিয়া গেল, বিরহের পাত্তা নাই তবু,
এ কথা কি শাস্ত্রে লেখে কভু ?
কিন্তু হায়, শাস্ত্রবিধি নাকচ করিয়া
কি আশ্চর্য্য, বিরহ তো রহিল সরিয়া !

৩

অধিকন্তু মনে হ'ল যেন বাঁচিলাম ;
এতদিন আমি যেন বন্দী আছিলাম
অনির্দ্দিষ্ট নিষেধের ডোরে !
পরদিন উঠিয়াই ভোরে
(ছিল রবিবার)
জুটাইয়া বহু বন্ধু, অবেলায় করি স্নানাহার,
চা খাইয়া বার বার,
ধম্‌কাইয়া চাকর ঠাকুর
বন্দীত্বের কিছু গ্লানি করিলাম দূর।
বিস্মৃত সেতারটার
লাগালাম তার।
বন্ধুগণ
বার বার খেল নিমন্ত্রণ।
ইচ্ছামত যথা-তথা যতক্ষণ খুশী আড্ডা দিয়া
দুইটি সপ্তাহ গেল সুখেতে কাটিয়া।

৪

ক্রমশঃই ময়লা হ'ল চাদর বিছানা।
চাবিটা কোথায় গেছে কিছুতেই পাই না ঠিকানা।
টেবিলের 'পরে
থরে থরে
বই বাটি খাতা ছাতা হ'ল স্তূপাকার !
চতুষ্কোণ মশারিটি হ'ল উটাকার !

মৈথিল ঠাকুর দিল ধর্ম্মে-কর্ম্মে মন
সুতরাং দাইল, ব্যঞ্জন
হইয়া আ-লোনা,
রসনারে করিল ছলনা।
চতুর্দ্দিক ধূলিপূর্ণ! দাসী আর দেয় নাকো ঝাড়ু।
—হারাইল গাড়ু!
কুকুরে আসিয়া রাতে খেয়ে গেল হাঁড়ি,
মুখময় গজাইল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।
ধোপা ও গোয়ালা আসি টাকা করে দাবী,
হিসাবের খাতা নাই, হারায়েছি চাবি!

৫

পত্র এল অমিয়ার।
পুণ্য-ঘাটে মণিকর্ণিকার
স্নান করি রোজ তারা
হইতেছে আত্মহারা!
তাহারি বর্ণনা করি লিখিয়াছে দীর্ঘ রামপট!
চাহিয়া রহিনু কট্‌মট্‌
পত্রটার পানে!
কবে যে আসিবে তাহা লেখে নাই মোটে কোনো খানে।

৬

স্বপন দেখিনু রাতে'
অমিয়া গিয়াছে ডুবে মণিকর্ণিকাতে!
মাতৃহারা পুত্র কন্যা মোর

দিশাহারা চীৎকারিছে ঘোর।
আতঙ্কেতে শিহরিয়া ভেঙে গেল ঘুম ;
বাহিরেও দেখিলাম লাগিয়াছে ধুম।

৭

গগন ভরিয়া নেমেছে বাদল
মাদল বাজিছে মেঘে,
পবন পূরবী কেতকী-স্মুরভি
বহিয়া আনিছে বেগে।
মত্ত দাছুরি পাশের পুকুরে
মুখরিছে চারিদিক—
স্মুযোগ বুঝিয়া বিরহ আসিয়া
চাপিয়া ধরিল ঠিক।
এমন সময় ছুয়ারের কড়া
নড়িল বারম্বার,
পিওন সেথায়, কি সর্ব্বনাশ!
এনেছে জরুরি তার!

৮

খুলে দেখি লিখেছে অমিয়া,
"দাও পাঠাইয়া
পঞ্চাশটি টাকা পত্রপাঠ।"
সামালিনু আপনারে ধরিয়া কপাট!
নিশ্চয়ই বিপদ কিছু—ঘটিয়াছে কোন সর্ব্বনাশ,
কর্জ্জ করি' তার যোগে পাঠানু পঞ্চাশ।

তার-যোগে পুছিলামও—ব্যাপার কি জানাও সত্বর,
"ভয় নাই, ভাল আছি," আসিল উত্তর।

দিন-দুই পরে আসি' অমিয়া নিজেই
কহিলেন যাহা তার সার মর্ম্ম এই :—
"সস্তায় বিক্রি ছিল দুল জড়োয়ার
তারি তরে হয়েছিল জরুরি দরকার
পঞ্চাশ টাকার!"

—হাসিমুখে করিল বর্ণন।
এবং তখনি ঠিক ঘন ঘোর করিয়া গর্জ্জন
গগনেও নামিল বরষা!
পূরবী পবন পুনঃ কেতকীরে করিল সরসা!
পার্শ্ববর্ত্তী জলাশয়ে যতেক দর্দ্দুর
জমাইল বরষার সুর।

চীৎকারিয়া কহিলাম—"এদেরি ধাপ্পায়
হয়েছি বেকুব আমি হায়!
ইচ্ছে করে জুতো মেরে মেঘ-ফেগ চুরমার করি!"
কিন্তু তাহা অসম্ভব স্মরি'
সগর্জ্জনে কহিলাম ডাকি চাকরেরে,
"ডোবার এ ব্যাংগুলো তাড়া তো রে মেরে!"

দিক্‌-ভুল

ফুল-বনে গেল হুলো মার্জ্জার,
সেথা নাকি তার ছোট ভার্য্যার
নবম ছেলে,
'কলা'র চর্চ্চা করিছে ঠেলে !
"বিড়াল-বংশে একি জুটলো রে,"
বলি বুড়ো হুলো মহা হুল্লোড়ে
ধাইল বেগে,
ফুলের বাগানে হতাশে রেগে।
গিয়ে দেখে ছেলে তবু ভালো, যাক্‌,
ফুল-কলি পানে করি খালি তাক
ঝাঁপায়ে পড়ে
ইঁদুর ভাবিয়া ফুলের 'পরে।
হুলো কয়, "ওরে, ইঁদুর ধরাই
সখ যদি তোর, চল তবে যাই
গর্ত্তে আছে।
ইঁদুর ফলে কি ফুলের গাছে ?"

যুগল সমজদার

১

প্রথম বাগানে ধরেছে আম,
দেখি ও দেখাই সবে,
মনের মহোৎসবে ;
সুখের স্বপন মাথার ঘাম
বুঝিবা সফল হবে !

পাশের বাড়ীতে মহিম সেন
শুনেছি, সমজদার !
"বাগানেতে একবার"
কহিনু তাঁহারে, "যদি আসেন !"
দ্বারস্থ হয়ে তাঁর।

রবিবারে এল মহিম সেন
বাগান দেখিতে মোর ;
দিল তিন চক্কোর।
ভাবিলাম বুঝি হয়ে গেলেন
মুকুলগন্ধে ভোর।

সোনালি রোদেতে চমৎকার
সুললিত সৌরভে
হাসিতেছে গৌরবে।

মহিম সেন তো সমজদার
—সবাই মুগ্ধ হবে।
কহিলেন তিনি, "যে কাঁটা-তারে
ঘিরেছিস চারিধার
ভারী তো চমৎকার
কোন্ ঠিকানায় পাইব হাঁরে
হুন্দর কত তার ?

২

পাকিল যখন আম, সব দুখ ভুলিলাম,
হরষেতে হইনু অধীর ;
দুই কূল ভাসিয়াছে, জোয়ার যে আসিয়াছে
পুলকিত পরাণ-নদীর !
গরমে পরম সুখে মোর কাননের বুকে
বাঁধিয়াছি পাতার কুটীর,
প্রাণের উৎসব সে কি ! দেখি আর শুধু দেখি
ক্লান্তি নাই নয়ন দুটির।
মাটি আর আম গাছে একি কাব্য রচিয়াছে,
বাক্যহীন একি বাচালতা !
গাছে গাছে নানা বেশে হাসে যেন রসাবেশে
ডেকে ডেকে কহে যেন কথা !
বৃন্ত-বাঁধন 'পরে থাকিতে চাহে না ওরে
বলে মোরে, "লহ গো পাড়িয়া,
দেহ-ভরা রসভার বহিতে পারি না আর,
লহ লহ লহ নিঙাড়িয়া"

পাড়িয়াই লইলাম পাকা পাকা যত আম
গন্ধে বর্ণে রঙীন মদির,
খাওয়াই কাহারে ডেকে আম্র-রসিক সে কে,
তারি লাগি পরাণ অধীর !
শোনা গেল, ও পাড়ার হরিহর হালদার
খাদ্য-রসিক খুবই নাকি,
কচু কলা মাছ মুড়ি সবই খান, নাই জুড়ি,
ফুল ফল পাতা পশু পাখী
অবলীলাক্রমে খান (অবশ্য যখন পান !)
—এই শুনি' তখনি তাঁহারে
করিলাম নিমন্ত্রণ ; কহিলেন বন্ধুগণ
সুখ পাবে ভুঞ্জাইয়া তাঁরে।
দেখিলাম, ঠিক তাই, দু'টি ঘণ্টা ছুটি নাই,
নাই কোন নড়ন চড়ন,
আসনেতে করি ভর হালদার হরিহর
(ছিপ্ছিপে দোহারা গড়ন)
অবিরাম চলে খেয়ে কভু চেয়ে, আধ-চেয়ে,
কখনো বা মুদিয়া নয়ন,
কভু চুষে কভু চেটে হরিহর এক পেটে
খেল আম এগারো ডজন।
হাত চেটে হরিহর কহিলেন তার পর,
"যাই বল, কাঁঠালের মত
ফল নাই দুনিয়ায় !— কার সাধ্য এত খায়
এক-একটা দমে ভারি কত।"

প্রণয়-মিতি

১

তোমারে বেসেছি ভাল তাহার প্রমাণ যদি চাও,
এবং না-ছোড় হয়ে নিতান্তই বাঁকিয়া দাঁড়াও,
"ওষ্ঠ বাড়াও"—
বলিব না ;—ভয় নাই, কারণ তা' পুরানো নেহাতই।
সাহায্যও লইব না জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতির
প্রমাণ করিতে সখি, সরলতা, উচ্চতা, স্থিতির
আমার প্রীতির।
হাসিবে সবাই শুনে ছোট বড় শহুরে দেহাতি!

২

স্বর্ণকারে ডাকিব না, দেখাইতে হে সখি, ফি-সনে
অলঙ্কারে কত টাকা ব্যয় করি প্রণয়-'মিশনে'
তোমার পিছনে—
ডাকিলে ঠকিয়া যাব, কিছুই তো দিইনি বিশেষ!
পুত্রকন্যা তব অঙ্কে কতগুলি দিছি উপহার,
প্রণয়-দাখিলা রূপে আনিব না হিসাব তাহার
ছোট্ট 'আহা'র
বিপুল সংঘাতে তাহা টিকিবে না একটি নিমেষ।

৩

এতকাল স্ত্রৈণ বলি' যারা সব করিত নালিশ—
ভয় নাই, ওগো সই, মানিব না তাদের সালিস,
প্রেমের পালিশ
জানি আমি নষ্ট হয়, এভাবের টানা ও হেঁচড়ে!

এত দিন যা' গেয়েছ,—শুনে গেছি,—করিনি বাহানা,
ভৈরবী, পূরবী, পিলু, কানাড়া বা ইমন সাহানা,
করিয়া না "হাঁ" "না" !
শুনে গেছি, বলি নাই—"থাম, থাম, পেকেছ এঁচড়ে" ।

৪

একথা প্রমাণ-সহ করি যদি এখনি হাজির,
জানি তাহা মনোমত হইবে না তরুণী কাজির
এ কারসাজির
উপরন্তু প্রতিফল পেতে হবে দিবস রজনী !
করিব না সুতরাং ;—কাজ নাই সত্যের ভাষণে—
স্বীকার করাই ভাল—ভয় করি তোমার শাসনে,
সমাজ-আসনে
আপীল-অতীত তুমি সনাতন শাসক, সজনি !

৫

কুপথে সুপথে সখি, যে পথেই করি না গমন,
সকলি সমান জানি, শেষকালে আছেই শমন
তবুও দমন
করিয়াছি আপনারে, সে কেবল তোমারে স্মরিয়া ।
ঐ অসহায় ভাব,—কণ্ঠে চির-নির্ভরের সুর
তোমার প্রধান অস্ত্র,—শৃঙ্খলিত করেছে অসুর
সে বন্য পশুর
নখদন্ত ভগ্নপ্রায়, উদ্দামতা যেতেছে মরিয়া ।

৬

এত বড় স্বীকারোক্তি !—তাও তুমি বলিবে—"ও বাজে ?"
(দিব্যদৃষ্টিময়ী তুমি,—ধর্ম্মপ্রাণ মানব সমাজে !)
সুতরাং লাজে
বুদ্বুদিত উচ্ছ্বাসের শেষ হোক ব্যর্থ আবেদন !
প্রেমের প্রমাণ চাও !—বুদ্ধি তব সত্যই শ্রেয়সী
একটি প্রমাণ তবু দিব আজ, হে মোর প্রেয়সি,
যুক্তির সে অসি
আশা করি সমূলেই করি' দিবে সংশয় ছেদন !

৭

সকালে, দুপুরে, সাঁঝে, রজনীর গভীর যামেতে,
এ যাবৎ যত চিঠি লিখিয়াছি রঙীন খামেতে
তোমার নামেতে,
তাহার উল্লেখ সখি, না করিয়া করিব প্রমাণ—
ভালবাসি, ভালবাসি, তোমারেই ওগো ভালবাসি—
যদিও টাট্‌কা নহ, হইয়া গিয়াছ কিছু 'বাসি',
অয়ি সর্ব্বনাশি,
তোমারি লাগিয়া তবু হইয়াছি নিতান্ত 'কমান্' !

৮

ভাল না বাসিলে বল কোন জোরে দিন রাত ভোর
প্রতিদিন তব সাথে ঝগড়া করি বাঁধিয়া কোমর
প্রেয়সী ও মোর !
—অতি তুচ্ছ বিষয়েতে অতি উচ্চকণ্ঠের কলহ !

শত্রু মিত্র কারো সাথে—এতটা তো উঠে না চরমে !
প্রেম না থাকিলে সখি, খোলাখুলি এতটা কি জমে ?
অয়ি মনোরমে,
মুখ টিপে না হাসিয়া, ঠিক কিনা তুমিই বলহ !

ঘুঁটে

'ঘ' এবং 'ট' রয়েছে দেহ মোর জুড়িয়া—
তবু বন্ধু ঘট নহি, নহি ঘটোৎকচও ;
'ঘাট'ও নহি হায় কবি, যাহা লয়ে তুমি
প্রণয়ের দু'-চারিটি পদাবলী রচ !
ঘটকী, ঘোটকী নহি—মোর কাছে কেন ?
এমন কি, নহি হায় সাধারণ ঘটি ;
গোবর হইতে হায় (নহি পদ্মফুল !)
জনম লভিয়া আমি ঘুঁটে নামে রটি !
কবি কহে, "তুমি যে গো অতি-আধুনিকী,
প্রয়োজনে প্রাণ দাও, আছে তাই দরও,
আধুনিক জগতের 'প্রলিটারিয়েট'—
জন-সাধারণ-হিতে পুড়ে পুড়ে মর !
আমি সেকালের লোক, উৎসাহ চাই।"
এই শুনে ভিজে ঘুঁটে এত অবিরাম,
এতই ছাড়িল ধোঁয়া এত রকমের,
কবির নয়নে জল, সারা দেহে ঘাম !

মার্জ্জার-মূষিক ইত্যাদি কথা

এই মহাভারতীয় গল্পের প্লটটি বেহারের ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত একটি ভগ্নস্তূপের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছি।

১

বিদুরের ক্ষুদ ইঁদুরে খেয়েছে, তারি সন্ধানে পার্থ
গাণ্ডীব নিয়ে গর্ত্তে ঢুকেছে বাহির হয় না আর তো।
রন্ধনালয়ে একথা শুনিয়া ফেলিয়া হাতের খুন্তি
আকুল নয়নে বাহিরে এলেন পার্থ-জননী কুন্তী।
আসিয়া দেখেন, কিমাশ্চর্য্য সকলেই উদ্বিগ্ন,
সকলেরই সুখে ঘটিয়াছে যেন বেশ কিছু কোন বিঘ্ন
ধর্ম্মপুত্র যদিও তেমনি হাই তুলে দেন টুস্‌কি,
পাঞ্চালী চুলে চিরুণী চালায়ে তেমনি তুলিছে খুস্‌কি,
ভীম সে মত্ত গুলতি খেলায়, নকুল বকুল-কুঞ্জে,
সহদেব দেন কিঙ্করে গালি, 'পানে এত বেশী চূণ যে!'
কিন্তু তবুও সকলেরই মুখে শঙ্কার ছায়া পষ্ট,
কোন্ সে গর্ত্তে ঢুকেছে পার্থ সকলেরি মনে কষ্ট।

২

'পেপারে' কিন্তু বাহির হইল মোটা অক্ষরে মস্ত,
বিদুর-বিপদ শুনিয়া কুন্তী ধরি' পার্থের হস্ত
বলেছেন, "যাও যাও রে বৎস, করহ মূষিক ধ্বংস,
পাণ্ডু-রাজার বংশের তুমি গৌরব-অবতংস!"

কৃষ্ণাই না কি স্বহস্তে তারে পরায়ে দেছেন বর্ম্ম,
বলেছেন, "নাথ, পালন করিয়া এস ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম।"
বাকী চার জনও যাইতেছিলেন করিতে সে মহাযুদ্ধ,
এমন সময় বিদুর আসিয়া কহিলেন, "সব সুদ্ধ
গর্ত্তে ঢোকাটা সমীচীন নহে, তোমরা সবাই তিষ্ঠ,*
আপৎ কালেতে ধৈর্য্যই বল—একমাত্র সে ইষ্ট।"
খুল্লতাতের আদেশ তাঁহারা করেছেন শিরোধার্য্য,
এবং রুখিয়া আছেন তাঁদের বীর্য্য সে অনিবার্য্য।

৩

বিদুর-বিপদ-বার্ত্তা রটি' গেল ক্রমে
দেশ হতে দেশান্তরে অমিত-বিক্রমে।
বিদুরে বিরক্ত করে ইঁদুর জুটিয়া!
শুনিয়া সবার রক্ত উঠিল ফুটিয়া।
কোশল, মগধ, কাশী, অঙ্গ, বঙ্গদেশ,
কলিঙ্গ, পাঞ্চাল, কাঞ্চি, সমস্ত প্রদেশ
নানা ভাবে চিন্তা করি এর প্রতিকার
স্থির করিলেন শেষে, পাঠাও মার্জ্জার।
রাজা-প্রজা, পাত্র-মিত্র, ধনী ও নির্ধন
আকুলিত চিত্তে করে মার্জ্জারান্বেষণ;
দিগ্বিদিকে ক্রমাগত সে চেষ্টার ফলে
জুটিল মার্জ্জার আসি বহু দলে দলে;
এবং ছুটিল তারা দূর হস্তিনায়
বিদুর ইঁদুর-তাপে বিধুর যেথায়।

৪

এদিকে হস্তিনাপুরে বেচারা বিদুর
(একেই বিরক্ত তারে করেছে ইঁদুর !)
বহু বিড়ালের মহা সমাগম দেখি
বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে কহিলেন—"এ কি !"

স্ফীত-গণ্ড, পীত-চক্ষু, কপিশ-বরণ,
স্থূল-পুচ্ছ হুলো-হুলী বিবিধ ধরণ
বক্র-কর্ণ, চক্র-মুখ যতেক মার্জ্জার—
দেখিয়া বিদুর ভাবে—হ'ল কি ব্যাপার !

জুটিল আসিয়া ক্রমে সাদা, কালো, মেটে,
নির্লোম, রোমশ, খেঁকি, রোগা, মোটা, বেঁটে,
পীন-নাসা, ক্ষীণ-কায়, কেহ বা বিশাল,
পুষ্ট-গুম্ফ, রুষ্টানন বিবিধ বিড়াল।

আসিয়াই তারা সব করি' সমারোহ
খ্যা-খ্যা-রবে জুড়ি দিল তুমুল কলহ।
সে কলহ-কলরব ওঠে সব ঠেলে,
বিদুর কহেন শেষে—"আরে, কচু খেলে !"

এবং সভয়-চিত্তে চিন্তান্বিত মন,
পাণ্ডব-আলয়ে তিনি করেন গমন।

৫

হস্তিনার দুগ্ধ দধি করিয়া ভক্ষণ
কহে বিড়ালের দল, "এবার রক্ষণ
করা যাক্ চল ভাই—বিদুর-ভাণ্ডার।"
সেথা গিয়া দেখে তারা, বিপুল ভাণ্ডার
আস্ফালন করি'
ভীমসেন দাঁড়াইয়া স্বয়ং প্রহরী,
স্বল্প ভাষে কহিলেন তিনি,—
"হে বন্ধু, সবারে আমি চিনি,
সুতরাং অনধিক বাক্য-ব্যয় করি'
সিধা পড় সরি'।"
"হেন গোঙারের সাথে তর্ক করা নিরাপদ নহে,"
চিন্তা করি' কয়েকটি বৃদ্ধ-বিড়াল,
চ্যাংড়া বিড়ালদের ডাক দিয়া কহে,
"প্রটেষ্ট মীটিং মোরা চল করি কাল।"

৬

'আরে রে আরে রে'-রবে সচকিত করি সবে
মূষিক-বিবরে পশি', বাড়াইয়া 'নেক্'টি
পার্থ দেখিল হায়, যতদূর দেখা যায়
একটি ইঁদুর নাই,—ক্ষুদও নাই একটি!
মুখটি করিয়া উঁচা কহিল জনেক ছুঁচা,
"সকল ইঁদুর প্রভু, খেয়ে গেছে সর্পে"
শুনিয়াই অর্জ্জুন রাগিয়া হইল খুন,
'সাপই মারিব তবে' কহিল সে দর্পে।

কিন্তু কোথায় সাপ, হায় একি পরিতাপ'
 গহ্বরে বসি বসি ভাবিলেন পার্থ,
করি এত আয়োজন ফিরিব না-করি রণ,
 শুধু হাতে যায় নাকো ফেরা হায় আর তো !'
নানা দিশি খোঁজ করি' জানিলেন—হরি, হরি,
 সর্পকে খাইয়াছে শ্রীগরুড়-পক্ষী !
বিনতার নন্দন শ্রীগরুড় কম নন,
 বহিয়া বেড়ান পিঠে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী।
গরুড়কে ঘাঁটাইতে সহসা কাহারো চিতে
 সাহস হয় না বড়, লোক অতি বদ্ যা' ;
অথচ কিছু না করি' ধনু-শর সম্বরি'
 অর্জ্জুনও ফিরে যাবে—এও ভারি লজ্জা !

৭

সুতরাং শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীবিষ্ণুর দরজায় ঠক্ ঠক্ ঠক্
করিলেন 'নক্'।
বিষ্ণু মানে কৃষ্ণই, (পুরাতন সখা পাণ্ডবের)
সহসা এ আবির্ভাব হেরি অর্জ্জুনের
কহিলেন, "আরে,
কোন্ কার্য্য-ব্যপদেশে আমার সখারে
আসিতে হয়েছে মোর দ্বারে ?
কেন সখা বিষণ্ণ বদন ?
কুশলে তো আছে পৌরজন ?"
ভূমিকা না করি' কিছু পার্থ তারে কন,

"তোমার বাহন
পলাতক আসামীরে করিয়াছে আশ্রয় প্রদান,
চাই আমি তাহারি সন্ধান।
না পাইলে···তুমি তো জানই মোরে মিতা,
দ্রোণাচার্য্য শিষ্য আমি,—আদ্যোপান্ত বুঝিয়াছি গীতা।"
অর্জ্জুনের হেরি রুষ্ট মুখ,
কৃষ্ণের মনে মনে উপজে কৌতুক!
কহিলেন, "আরে বস, টেনে নাও তাকিয়া সট্‌কা,
ভাল কথা, খেয়েছো ভড্‌কা?
খাসা 'রাশিয়ান্‌' মাল, আনায়েছি কাল এক 'কেস্‌'—
বলশেভিকি নেশা জমে দিব্য সরেস!"
কিন্তু অর্জ্জুন
পৃষ্ঠে তাঁর শরপূর্ণ তূণ—
কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন তাঁরে,
"আগে বন্ধু বল তো আমারে
গরুড় কোথায়?
কৃষ্ণ কন, "কি আশ্চর্য্য, কেন বল হায়
তোমাদের এ মনোবিকার!
আমাদের বাহন-শিকার-
করাই যদ্যপি তব একমাত্র প্রেয়,
হে কৌন্তেয়,
বুঝাইয়া দেহ মোরে
কিসে চড়ে'
ত্রিভুবন করিব ভ্রমণ?
'টুর' করা মোদের যে নিত্য প্রয়োজন।
এখনি ষষ্ঠী দেবী মহা ক্ষোভে আসিয়াছিলেন

হস্তিনায় নাকি ভীম-সেন
সপ্ত-দশ অক্ষৌহিণী মেরেছে মার্জ্জার !
আর্য্যার
বিপন্ন মুখখানি ভাসিতেছে চোখে !
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে, ভেবেছিনু O. K.
থাকিবে তোমরা সব, মিটেছে বিবাদ।
এখনও যুদ্ধের হায় মেটেনি কি সাধ ?"
তখন অর্জ্জুন তাঁরে quote করি fact ও figure
বুঝাইল, কেন তার ক্ষত্রিয়-'ভিগার'
আলোড়িছে দশ দিক।
আনুপূর্ব্বিক
শুনিয়া সকল কথা, কহিল কেশব,
"এসব
পাপের ফল,
আন্দোলিত তাই হায় ধর্ম্মের কল।
যাই হোক্ আমাদের আত্মীয় বিদুর,
দুঃখ তার করিবই দূর।
অর্থাৎ লম্বা এক 'টুর'
দিব হস্তিনায়,
তুমি গিয়া থানায় থানায়
এই বার্ত্তা করগে প্রচার।
—গরুড়কে ঘাঁটায়ো না আর।"

৮

বিদুর-দুঃখ হ'ল বুঝি দূর,
স্বয়ং কেশব করিছেন 'টুর'—
হ'ল কৃতার্থ, হ'ল ভরপুর
সর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্ত।
তেত্রিশ কোটি দেবতাও ঠিক
জুটিলেন আসি কায়দা মাফিক,
ধন্য বিদুর, ধন্য মূষিক
ধন্য রে তোর গর্ত্ত!

*   *   *

সিংহদ্বারে হস্তিনার,
দলে দলে সারে সার
দাঁড়াইয়া বহু লোক বাড়াইয়া গ্রীবা ;
বাজিছে ডুবকি ঢোল,
উঠে 'জয়' 'জয়' রোল,
মাল্য-পতাকা লয়ে উৎসাহ কিবা!
হস্তিনার ময়দানে বসিয়াছে সভা—
শ্রীকৃষ্ণ সভাপতি (কানে গোঁজা জবা!)
মীটিং হইবে স্থরু—অ্যাজেণ্ডা প্রস্তুত,
হেনকালে আসি কহে বিদুরের দূত,
হলে অনুমতি—
বিদুর বলিতে চান সংক্ষেপে অতি
দু' চারিটি কথা মহাশয়।"
সকলে বলিয়া ওঠে, "অবশ্য, নিশ্চয়।"

*   *   *

কৃতাঞ্জলি, গলবস্ত্র, দেহ কম্পমান,
শঙ্কিত বিদুর ধীরে হয়ে আগুয়ান
কহিলেন, হে কেশব' রক্ষা কর মোরে,
উপকার করিও না আর দয়া করে' ;
উপকারী-সঙ্ঘ হতে কর মোরে ত্রাণ,
আজীবন গেয়ে যাব তব জয়-গান।"
বলিয়া, গেলেন মূর্চ্ছা মহাত্মা-বিদুর,
দিগন্তে হইল গাঢ় সন্ধ্যার সিঁদুর।

*　　*　　*

তখন হইল ঠিক—চলুক কীর্ত্তন
অনুক্ষণ—
মূর্চ্ছিত এ বিদুরে ঘিরিয়া
ঘুরিয়া ফিরিয়া।
—জমিয়াছে বহুবিধ পাপ
হয়ে যাক্ সাফ!

বেগুন ও সেগুন

১

সেগুন বেগুনে কয়, "ওলো সখি বাইগন,
এমন চেহারা তোর, মন এত মুক্ত,
লোহার কড়াতে চেপে তুই না কি শেষটা
হয়ে গেলি তরকারী—চচ্চড়ি, সুক্তো!

আম্রিও কি পেয়েছি রে মোর যাহা হক্ তা'
(বক বক করি খালি নিষ্ফল বক্তা !)
আমারে ধরিয়া শেষে করে দিল তক্তা,
আস্‌বাব বানাইতে করিল নিযুক্ত।
শ্রীহীন ছিলাম নাকি কাষ্ঠ-রূপেতে সই
'টেবিল' 'দেরাজ' রূপে হয়েছি শ্রীযুক্ত।"

২

বেগুন কাঁদিয়া কয়, "কি কপাল বঁধুয়া,
আমাদের দুজনের মিল কত স্পষ্ট।
অথচ সরিষা তেল, ঠাণ্ডা বা স-ধুঁয়া
অন্তরে পশি' মম দিল কত কষ্ট !"
অমনি কহিল 'টীক' "ঠিক সখী ঠিক্ তো !
কাঁটা আর কজায় মোরও হিয়া তিক্ত,
আস্‌বাব-রূপে মোরে করি অভিষিক্ত
'জীনিয়াস্' খানা মোর করে দিল নষ্ট !"
এই বলে শেষ করে' সপ্তম চুম্বন
উদ্যত হইল সে আহরিতে অষ্ট !

পলিটিক্যাল প্রেম

১

মোটা আর বেঁটে, কুচকুচে কালো, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি,
তাহাদের যবে আমল দিল না যুবতী রূপসী-নারী,
মেলিয়া দশন জুটিল তখন পরিয়া সেলিম জুতো,
রোগা ও লম্বা ফর্সা-কান্তি কামানো যুবক-যূথ !

যুবতীরা মৃদু হেসে
তাদেরও কহিল, "কষ্ট পাবে মা ! মিছিমিছি আর এসে
সময় নষ্ট করিও না রাত দিন !"
রোগা-মোটা-বেঁটে-লম্বা-ফর্সা-কালো গুঁফো-গোঁফহীন
চীৎকার করি তর্জ্জনী তুলি' কহিল, আচ্ছা, বেশ !
অ্যান্টি-যুবতী মুভমেণ্ট করি' জাগাব আমরা দেশ !"

২

স্বপ্নে শুনিনু হাটে মাঠে বাটে চেঁচাইছে কংগ্রেস্,
"যুবতীর মোহ আজি হতে হায় হউক বিনিঃশেষ !
চাহি নাকো ষোল, চাহি না সতেরো, চাহি না উনিশ-কুড়ি
ভাল আমাদের সেকেলে ঠান্‌দি—পাকা, বনিয়াদি বুড়ী !
যুবতী-নয়ন-শর
হইতে রক্ষা কর কর দেশ !—ধর মোহ-মুদ্গর !"
স্বপ্নে দেখিনু, হুজুকে যুবকদল
বুড়ীদের সাথে প্রণয় করিয়া ঘামিছে অনর্গল !
এবং ভাবিছে স্বদেশের তরে মহাত্যাগ করিয়াছে,
প্রণয়-ব্যাপারে যুবতী ছাড়িয়া বৃদ্ধারে বরিয়াছে !

৩

কিন্তু হায়রে জব্দ হল না চপল যুবতীদল,
প্রতিটি অঙ্গে আছে যে তাদের মনোহরণের ছল !
মনের মানুষ আসিল তাদের রঙীন ফানুষে চুলে
তন্বী-নয়ন-বহ্নিতে প্রাণ সঁপিতে সকল ভুলে !

হুজুকে যুবকগণ
জীর্ণ বুড়ির শীর্ণ গালেতে যত করে চুম্বন,
কিছুতেই যেন জমেনা প্রণয় হায় !
হৃদয় তাদের যুবতীরই পায়ে লুটায়ে পড়িতে চায়।
অমনি আসিয়া ঠান্‌দির দল—অহিংসা ঠোনা তুলি
চুম্‌কুড়ি দিয়া শোনায় তাদের গীতার মামুলি বুলি।

* * * *

ঘুম ভেঙ্গে দেখি ঘামে ভিজে গেছে খদ্দরের ফতুয়াটি
পকেটেতে ছিল কাঁচি-সিগারেট তাও হয়ে গেছে মাটি !
তবু ধরাইয়া তাই
স্বপনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তুলিতে লাগিনু হাই !

বরষা বিদ্ধ

১

গগন ছাইল মেঘে, পবন বহিছে বেগে,
আসরেতে নেমেছে আষাঢ়।
গুরু গরজন হয় মনেতে ঘনায় ভয়,
ওদিকে যে আমার বাসার
চালেতে নাহিক খড়, বৈশাখীর কাল ঝড়
করে গেছে সেথা মহারণ,
ঘরেতে ঢুকিবে জল, বাতায়ন অনর্গল,
প্রাচীরেও ধরেছে ভাঙন !
পাশেই পুকুর-পানা উপচিয়া তার কানা
আসিবে যা' নহে তা' অমিয়

পাড়াগাঁয়ে করি বাস, না করিয়া পরিহাস
ওহে বন্ধু, আমারে ক্ষমিও।
ডেলি-প্যাসেঞ্জার ভাই, চাকুরি করিয়া খাই
মাহিনাও গিয়াছে কমিয়া,
আষাঢ়ের সমাগমে ওরে ভাই, তাই ক্রমে
অতিশয় গিয়াছি দমিয়া।

কালিদাস পড়িয়াছি, এম-এ পাশ করিয়াছি,
জানি বর্ষা-মঙ্গলের গান ;
আষাঢ়ের মেঘোৎসবে অশনির ঘন রবে
প্রাণও মোর করে আনচান।
কিন্তু সে-ভাবে নয়, যে-ভাবে করিলে হয়
সুমার্জ্জিত কবিতা পোষাকী—
হেরি ঘোর মেঘোদয় প্রেম নয়, জাগে ভয়,
কহ সখা, করিছ গোসা কি ?
ইন্দ্রনীল মণিময় শৈল-বিহারিণী নয়,
কেরানী ঘরণী মোর প্রিয়া
নাহি লীলা-শতদল (শতমুখী তার বল !)
কভু বাম পদাঘাত দিয়া
ফোটায়নি অশোকেরে, সোহাগিয়া বকুলেরে
মুখমদে করেনি বিকাশ।
খায় দায় চুল বাঁধে ছেলে পোষে ভাত রাঁধে
অসুখেতে ভোগে বারমাস !
আসন্ন-প্রসবা প্রিয়া সাতটি সন্ততি নিয়া,
বক্ষে বহি দুঃখ অগণন,

যে ভাবে কাটায় কাল তার ছন্দ লয় তাল
মেঘদূতে করেনি বর্ণন।
প্রেয়সীর কথা স্মরি' মরমে যেতেছি মরি,
হয়ত সে এতখন উঠে
ভারাক্রান্ত দেহটারে আস্ফালিয়া চারিধারে
ছুটে ছুটে সামালিছে ঘুঁটে।

২

আকাশে ঘনায় মেঘ কমিছে ট্রেনের বেগ
'মশাগ্রাম' পড়িল আসিয়া,
দুটি ক্রোশ এ বাদলে যেতে হবে পায়দলে
তবে বাড়ী পঁহুছিব গিয়া।
ষ্টেশন হইয়া পার দেখিলাম আঁধিয়ার
চারিধার কালো মেঘে ঢাকা,
ক্ষেত-ভরা কচি ধান করে যেন ধারা-স্নান
মেলিয়া সবুজ কচি পাখা।
দেখি কিছু দূর গিয়া উঠিয়াছে শিহরিয়া,
কদম্ব তরুটি ফুলে ফুলে,
কেতকী সুরভি নিয়া বায়ু বহে পুরবীয়া
বাঁশবন ওঠে দুলে দুলে,
আঁধার ঘনায়ে আসে ঝিল্লীরব আশে পাশে,
ডাকে দূরে উন্মাদ দাদুরী,
সামালিয়া সিক্ত বাসে মোরে হেরি মৃদু হাসে
ছুটে চলে ধোপানী 'আদুরী'
বোঝাটি বহিয়া তার, পিছু ফিরে আর-বার
মোর পানে দেখিল তাকায়ে,

আকাশে বিজলী-রেখা কালো মেঘে কি যে লেখা
লিখে গেল আঁকায়ে বাঁকায়ে !
আনিতে ভুলেছি ছাতা, চলিয়াছি খালিমাথা,
জল ঝরে মুষল-ধারায় ;
ধুয়ে মুছে গেল সব মনে হল কি উৎসব...
—কেরানীরও পরাণ হারায় !
মনে হল দারিদ্র্যের 'চিত্রকূটে', বিরহের
তমসায় রয়েছি একাকী ;
আষাঢ়ের মুগ্ধ হিয়া পড়িতেছে বিগলিয়া
দয়িতার মিলিবে দেখা কি ?
সহসা পড়িল মনে যৌবনের শুভক্ষণে,
একদিন মেঘের আশায়
কবি সত্যেন্দ্রের সাথে গলা মিলাইয়া ছাতে,
আমাদের মেসের বাসায়
ঢালি দিয়া প্রাণ-মন 'যক্ষের নিবেদন'
তারস্বরে করেছিনু পাঠ

"পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রায় মূরতি ধরি আজ, মন্দ্র-মন্থর বচন কও !"

একদিন এ কবিতা স্বপ্নময় প্রথম যৌবনে
বহু বর্ষ আগে,
উদ্বোধিত করেছিল উচ্ছ্বসিত কত আকুলতা
মুগ্ধ অনুরাগে।
ব্যথিত গগন 'পরে বিছাইয়া শ্যামস্নেহ-স্তর
আজিও এসেছে ওই আষাঢ়ের নব জলধর
দিগন্ত ব্যাপিয়া

কেতকী-কদম্ব বনে আজও দেখি আমার অন্তর
মরিছে কাঁপিয়া !

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
ধ্বনিতেছে বর্ষণের সুর,
পারাইয়া মাঠ বন চলিয়াছি আনমন
অলকাপুরী সে কত দূর ?

*

"অস্মিন্ দেশে—"

১

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে কই জল, কোথা জল
কোথাও যে নাই জল-বিন্দু,
শূন্য যে খাল বিল, শূন্য ইঁদারা কল,
শূন্য যে নদী-নদ-সিন্ধু !

'সুজলা মোদের দেশ'
মুখস্থ ছিল বেশ
তৃষ্ণার বেলা দেখি সব জল নিঃশেষ !
আছে নাকি কিছু হায়
করিমের বদনায়
আমারে দিবে না, আমি হিন্দু !

২

দীঘি সে লজ্জাবতী পানার বোর্খা দিয়া
ঢাকিয়াছে ঘোলাটে সে রংকে,
কিন্তু তা'-বলে' তা'রে ভেবো না নিঠুর-হিয়া,
শুনিয়াছি নাকি তার অঙ্কে

মশকের 'লারভা'রা
পাইয়াছে ঠাঁই তারা ;
পলাতক পিতামাতা, কচি কচি অনাথারা
দীঘির অনাথালয়ে
উঠিতেছে বড় হয়ে
শ্যাওলার ঘন স্নেহ-পঙ্কে !

৩

বলেছিল দেশ-নেতা—"কোথায় পাইবে জল ?
বড়লোকে শুষে নিল দেশটা,
সেমিজ, পাজামা, ধুতি কাচিছে খুলিয়া কল !
কিছু যা-ও বাকী ছিল শেষটা
শিশি হাতে ডাক্তার
এসে নিল ভাগ তার,
পুরাইতে বড় বড় ওষুধের দাগ তার !
রাস্তায় ঢালে জল
নহিলে 'কার' অচল,
চটে যায় বিষ্টু ও কেষ্টা !"

৪

গেলাম নেতার কাছে, কহিলাম, "আসিয়াছি
হে দেবতা, বহু দুখ ভুঞ্জি'—
বাণী শুনে এতকাল বড় ভালবাসিয়াছি
ওগো করুণার চেরাপুঞ্জী,

সুরু কর ধারাপাত
সারাদিন সারারাত
তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে কর কর দৃক্‌পাত !
ভারতের গৌরব,
তুমি নাকি পার সব
এই কথা ক্রমাগত শুন্‌চি !"

৫

কহিলেন নেতা হেসে—"ভাল করিয়াছ এসে
সত্যই বড় জলকষ্ট !
বরাবর বলিয়াছি ও পোড়া বাঙ্‌লা দেশে
সকলেই করে জল নষ্ট !

দেখিতেছি সত্যই
তুমি তৃষ্ণার্ত্তই
কিন্তু বাঙালী ভাই, মোর কাছে জল কই ?
অল্পই আছে যাহা
পারিবনা দিতে তাহা
কারণটা বলি শোন পষ্ট।

৬

হাড়িদের মেথরের বাগ্‌দি ও মুচিদের
গায়েতে হয়েছে এত গন্ধ
বুকে টেনে নিতে বাধে সাত্ত্বিক ও শুচিদের
রুমালেও করি নাক বন্ধ।

ময়লা যে চাপ-চাপ
(—বিধাতার অভিশাপ !)
শপথ করেছি আমি করিবই তাহা সাফ,
আটা ও রুমাল বেচে
সাগর এনেছি সেচে
সাবানও জোটেনি কিছু মন্দ !

৭

আমার যা জল তাহা 'রিজার্ভ', পারি না দিতে
হে তৃষিত, করিওনা দুঃখ।
খেজুর পাইতে পার যদি তাহা চাও নিতে
হয়তো লাগিবে কিছু রুক্ষ !

খাও যদি খর্জ্জুরই
'রিলেটিভিটি'তে মুড়ি
বুঝিবে তখন তুমি কেউ নাই ওর জুড়ি !
বিশেষ তফাৎ নাই
জলে ও খেজুরে ভাই,
চিন্তা করিয়া দেখ সূক্ষ্ম !"

৮

কহিলাম, "দাও দাও—জয় তব জয় হোক্
কোথায় খেজুর কই—কোনটা ?"
সত্য না স্বপ্ন এ ? ইহ না এ পরলোক ?
প্রলাপ কি বকিতেছে মনটা ?

—কিংবা এ শুধু তার
তৃষ্ণায় হাহাকার,
পিপাসার জল চায় বুকে বসি সাহারার !
সহসা আঁখির জল
ঝরিল অনর্গল
খেয়ে দেখি তা-ও হায় লোন্‌টা !

মাসের পয়লা

নিজেরে বুঝিয়ে বলি—ওরে শোন শোন
এ যে তোর সৃষ্টিছাড়া পণ !
নাগালেতে নাই যাহা কেমনে তা পাবি—
এ যে তোর অসম্ভব দাবী !
ঘন গাঢ় দানাদার খাঁটি ভালবাসা
পেতে তোর আশা !
তুই চাস্‌, পৃথিবীর জীবন-যাপন
হোক্‌ শুধু একখানি রাগিণীর মধু-আলাপন !
একখানি বিবাহ করিয়া
'রোমান্স' করিতে চাস্‌, জীবন ভরিয়া !
তুই চাস্‌, তুহার বনিতা,
নানাবিধ করিয়া ভনিতা,
কখনও প্রেয়সী বেশে,—কখনো বা পাচিকা সাজিয়া
হিসাব রাখিয়া কভু, কখনো বা বাসন মাজিয়া,
জীর্ণ দেহটারে তার ইক্ষুসম নিঙাড়িয়া দিক্‌ !

কখনো বা ফুর্সৎ মাফিক
গাহিয়া নাচিয়া
নিত্য তোর চিত্ত হতে ফেন্সুক চাঁছিয়া
সর্ব্ববিধ সকল ময়লা !
মাহিনা মিলেছে আজ মাসের পয়লা,
সুতরাং ঝোলা গোঁফে তা'দিয়া দুবার,
মানি আমি, চিত্ত তোর হয়েছে দুর্ব্বার
চন্দ্রালোকে,—ক্ষণিক উচ্চাশে
সফেন উচ্ছ্বাসে !
এও মানি হায়,
দু' 'পেগ্' টানিলে পরে—(বিশেষতঃ পরের টাকায় !)
মন হয়ে ওঠে 'দিল'—চক্ষু হয় 'আঁখি'
রঙীন-কাপড়-পরা যে-কোনো রমণী হয় সাকী
আপনারে মনে হয় যেন কোন অবজ্ঞাত hero !
হিট্‌লার, মুসোলিনি, নাদির চেঙ্গীজ কিংবা Nero,
কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু,
মনে হয় মোর কাছে নাবালক শিশু !

প্রাণ মোর আকাশেতে উড়ে যেতে চায়,
যে আকাশে হায়
সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, নাই গ্রহ-তারা,
কেহ নাই শুধু আমি ছাড়া !
কিন্তু হায় বৃথা তুই মরিস কাঁদিয়া
দড়াদড়ি দিয়া তোরে রেখেছে বাঁধিয়া !
অন্তরস্থ ভুখা ভগবান
মাগে পরিত্রাণ !

পাছে করে পলায়ন, চারিদিকে তাই
দারা-পুত্র-পরিজন, মাসি পিসি, ভাগিনা ও ভাই
সারি সারি রচিয়াছে ব্যূহ।
ভুলে যাই আমি সেই কেনারাম গুহ,
কাজ করি 'মেকেঞ্জি লায়েলে'
সাহেব ধমকায় মোরে ন'টায় না এলে !"
বুঝায়ে মনেরে বলি—"বুঝি আমি সব,
কিন্তু ওরে যাহা অসম্ভব
হয় তাকি কভু ?"
মৌন রহি ক্ষণকাল, মন বলে, "বুঝি সব ; তবু—।"
সুতরাং বল্গা আলগা করি কল্পনায়
গিরিদরি মাঠ-বন হইলাম পার।

* * *

নন্দন কাননে বসি কোলে করি উর্ব্বশী
শুঁকিতেছিলাম পারিজাত ;
অপ্সরীরা গাহে গান মন্দাকিনী কলতান
ধীরে ধীরে করে তারি সাথ !
উর্ব্বশী হাসিয়া কহে, "ওহে সখা কহ ত হে,
পদ্মার ইলিশ মাছ নাকি
সুধা হতে মিষ্টতর, তা হতে উৎকৃষ্টতর
নাই কোনো কীট পশু পাখী !
সুতরাং খেতে চাই কহ, নাথ, কোথা পাই ?"
শোনামাত্র তখনি ছুটিয়া
শিয়ালদহতে গিয়া ভাল দু'টি মাছ নিয়া
নিজ হস্তে দিলাম কুটিয়া।

মেলি কুন্দ-দন্ত-রাজি উর্ব্বশী ফেলিল ভাজি',
মেনকা ও রম্ভারে ডাকিয়া
প্রেম-গদগদ-মুখে খাইতে লাগিল সুখে
রসাবেশে চাখিয়া চাখিয়া।

* * * *

সহসা রম্ভা তুলিলেন সুর,
"আমি প্রিয়তম খাব চানাচুর,
কখনো খাইনি, এ দুঃখ দূর
কর গো !
টানি পুনরায় পিরীতির জের
কিনিয়া আনিয়া চানাচুর ফের
কহি রম্ভারে "তব দুঃখের
অবসান হোক্—ধর গো !"

* * * *

মেনকা কহিল সলাজ হাসিয়া,
'আমি যাহা চাই দিবে কি ?
আপনারে আমি দিতে চাই সখা
নিবে কি ?
স্নেহে ও সোহাগে নিজেরে ছানিয়া
দিতে চাই তব চরণে আনিয়া
বঙ্গদেশের হে মহামানব,
হে ব্রহ্মচারী বিবেকী !
মোরে নিবে কি ?

* * * *

চুম্বন করিয়া মোরে মেনকা সুন্দরী
বারম্বার কর্ণমূলে কহিল গুঞ্জরি',

"হে বাঙালী।
আমি ভিখারিণী তব—প্রেমের কাঙালী !
ফিরায়ো না, লহ সখা, রাখ মোরে পায়ে।"
সহসা হইল মনে, মেনকার গায়ে
কুকুরের গন্ধ কেন ছাড়িছে বেজায় !
কাছে টেকা দায় !
···আরে মোলো,—গোঁফ চাটে কেন ?
প্রণয়ের নিদর্শন হেন
মেলেনি কোথাও।
"পাপিয়সি,—দূরে সরে যাও।"
বলে' যেই মেনকারে ঠেলে দিনু দূরে
কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ—সকরুণ সুরে
স্বপন টুটিল মোর ; দেখিলাম হায়
পড়ে আছি একেবারে ড্রেনের তলায় !

অন্তর্ধ্যান

১

কনক বরণ পরম কান্তি
তপন উঠিল ভোরে ;
সোনালি সোহাগে স্বপন ঘনায়ে
কহিতে লাগিল মোরে

"সন্ধ্যা-উষার রক্তিম রাগে
গানেতে গলিয়া পড়িতে যে আগে
সেই মন তব হরণ করিল
কহ, কোন মন-চোরে ?"

২

সারাটি ভুবনে জ্যোছনা ছড়ায়ে
সুদূর গগনে বসি'
হাসিয়া হাসিয়া কহিল একদা
নিশীথ রাতের শশী ;

"ওগো পৃথিবীর খেয়ালিয়া কবি,
আমার কথা কি ভুলিয়াছ সবি ?
আমারে ঘেরিয়া ছন্দ তোমার
ওঠেনা তো উচ্ছ্বসি !"

৩

অভিমান ভরে মাথা দোলাইয়া
কহিল গাছের ফুল—
"আমারে যে আগে ভালোবেসেছিলে,
করেছিলে সে কি ভুল ?

কুঞ্জে কাননে তেমনি করিয়া
নিতি নিতি ফুটে যাই যে ঝরিয়া,
তুমি তো আস না আর তো তেমন
তন্ময় ভাবাকুল !"

৪

লুটি' নীপবন কহে সমীরণ,
"কই কবি তব বাঁশী
বাজাও না কেন ? ফুরায়ে গেল যে
বকুল ফুলের হাসি !"

কহে রূপসীর কাজল নয়ন,
"আমার মনের রঙীন স্বপন
আর তো দাও না ছন্দে ছন্দে
কবিতায় পরকাশি' !"

৫

আমি ভাবিতেছি একি জ্বালাতন
এ কি মহা জঞ্জাল !
আমার মাঝারে কবি যে আছিল
মারা গেছে বহুকাল !

সেই সুকুমার তরুণ কিশোর,
চিহ্নও তার নাই মনে মোর
ভুসির দালালি করিয়া বেড়াই
আমি রামধন পাল।

বিদগ্ধ

লইয়া বিক্ষত পৃষ্ঠ বিমর্দ্দিত শ্রবণ-যুগল,
ধারাপাত সিক্ত করি বিগলিত অশ্রু-ধারাপাতে
কত কিছু শিখিলাম ! ইতিহাস, গণিত, ভূগোল,
সাহিত্য ও স্বাস্থ্য-পাঠ দণ্ডধারী পণ্ডিতের হাতে !

'প্রবেশিকা' সীমা-রেখা অতিক্রমি' পিতৃ-পুণ্যফলে
'নলেজ'-লোলুপ হয়ে উত্তরিনু কলেজ-প্রাসাদে ;
নানাবিধ ভাব সেথা জুটিয়া কহিল দলে দলে,
"মস্তিষ্ক-কোটরে ওরে অবিলম্বে মোদের বাসা দে।"

আমি অতি ক্ষুদ্র নর—ক্ষুদ্রতর মস্তিষ্ক আমার,
তারি মাঝে ভাব-বৃন্দ বসিলেন গাদাগাদি করি ;
চকিতে ফলিল ফল !—বুক ফাঁক হইল জামার,
পাদুকার চাকচিক্যে দর্পণ কহিল, মরি মরি !

দেশ-প্রেম, রুষ-প্রেম, চর্চ্চা করি নানারূপ প্রেম
রাজা ও উজির কত মারিতেছি হ'য়ে এক জোট ;
সহসা মরিল পিতা ! সঙ্গে সঙ্গে এবং (ও, শেম !)
পরীক্ষায় ফেল করি' পাইলাম নিদারুণ চোট !

ক্রমশঃ বুঝিতে হ'ল মিথ্যা মায়া প্রেম জামা জুতো
পিওনের ঘন ঘন আনাগোনা থেমে গেল সব ;
চতুর্দ্দিক হ'তে লভি' বহুবিধ উপদেশ-গুঁতা
'নোট'-ভেলা 'পরে চড়ি' পারাইনু পরীক্ষা-অর্ণব !

অর্ণব হইয়া পার দেখিতেছি ধূ ধূ বালুরাশি
শ্রম-ক্লিষ্ট দেহ হায় মাগিতেছে ক্ষুধার খাবার,
শিরোপরে ভাব-গুচ্ছ (কলেজে যা জুটেছিল আসি')
দ্বীপবাসী বৃদ্ধ সম তাড়না করিছে বারম্বার।

সিন্দবাদ সম মোর নাহি বীর্য্য নাহি বুদ্ধি বল,
ভাব ভাবনার ভার বহিতেছি পিঠে চিরকাল ;
ক্ষুধা-খিন্ন দুর্ব্বলের একমাত্র ডিগ্রীটি সম্বল
তাই লয়ে খুঁজিতেছি 'wanted' সন্ধ্যা ও সকাল।

শ্যালা

সামান্য মনুষ্য নহ, নহ শুধু গৃহিণীর ভ্রাতা,
হে শ্যালক, হে স্বভাব-শালা,
বঙ্গদেশে বহু বেশে বহুবার দেখেছি তোমারে
রচিয়াছি তব জয়-মালা।

বহুবার করে গেছ অকিঞ্চন-চিত্ত পরশন
সভামঞ্চে নেতৃবেশে, হে শ্যালক, সৌম্যদরশন,

প্রাণের আবেগে যবে বক্তৃতা করেছ বরষণ
সে বাণীর জ্বালা
বহু করতালি যোগে প্রাণ মন করি ধরষণ
কর্ণ-দুটি করিয়াছে কালা !
হে শ্যালক হে স্বদেশী শালা ॥

কখনও শ্মশ্রু-গুম্ফে আবরিয়া ও চাঁদবদন,
জটা-মৌলি গুরু-বেশে অঙ্গে দেছ গৈরিক বসন,
(নির্ভেক নির্ভীক কভু !) সানুগ্রহে ভক্তের সদন
করিতেছ আলা
আত্মার্ অঙ্গুষ্ঠ রূপ, গীতা, গান, বিজ্ঞান-বচন,
বিতরিছ উপদেশ-মালা,
হে শ্যালক, হে ধার্ম্মিক শালা ॥

কুর্দ্দনে, নর্ত্তনে, লাস্যে লক্ষজনে লাগাইয়া তাক্
কখনো সিনেমা-পটে, হে রসিক, সভঙ্গী সবাক্
গুণ্ডা-বেশে, কবি-বেশে, কাঁপাইছ সেই চোখ নাক
একই ছাঁচে ঢালা !
পিতৃধন ধ্বংস করি' ছাত্র-ছাত্রী দেখিছে অবাক,
নাবালকে ভাঙিতেছে তালা,
হে শ্যালক, হে আর্টিষ্ট শালা ॥

উৎসর্গিয়া আপনারে কখনও বা শিল্প-পাদ-মূলে
বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ তার সমাপিছ সর্ব্ব-দ্বিধা ভুলে ।
সার্থক ধরেছ তুলি ! ক্রমাগত রং গুলে গুলে
হে শিল্প-দুলালা,

কণ্ডূয়ন-উন্মাদনা আন্দোলিয়া তুলিতে অঙ্গুলে
আঁকিছ নিতম্ব-স্তন-মালা !
হে শ্যালক, হে পটুয়া শালা ॥

নির্লিপ্ত উদো-র পিণ্ড গিলাইয়া সন্ত্রস্ত বুধোরে
সাহিত্য রচনা করি' শুনাও তা ক্ষেন্তি বা ভুতোরে ;
কোটর-প্রবিষ্ট আঁখি, গামছা-বাঁধা ক্ষুধার্ত্ত উদরে,
রসনায় লালা !
কন্টিনেন্টালি ঢঙে ডাক দাও কামারে, ছুতোরে,
বক্ষে চাপি ধর বস্তি-বালা !
হে শ্যালক, হে বাস্তব শালা ॥

কখনও উকীল বেশ ! (মূর্খ জনে কহিবে বঞ্চক !)
অনর্থ-কে অর্থ-যোগে নানা সর্ত্তে করিছ সার্থক !
কখনও দালাল তুমি, কখনও বা মহা চিকিৎসক
কভু বাড়ী-বালা,
কংগ্রেসে, মন্দিরে, মঠে, সর্ব্ব ঘটে হে পরম বক
নানা পুষ্পে ভরিতেছ ডালা !
হে শ্যালক, হে শিকারী শালা ॥

অনবদ্য তব কণ্ঠ কভু শুনি বিচিত্র ভঙ্গীতে
বেতারে, বৈঠকে, মাঠে, সভাস্থলে, রেকর্ড-সঙ্গীতে ;
কর্ণের পটহ ভেদি' ধৈর্য্যসীমা চাহে যে লঙ্ঘিতে,
প্রাণ ঝালাপালা ।
শ্মশানে, মশানে, রণে, পরাজয়ে, বিজয়ে, সন্ধিতে,

চলিয়াছে বেসুরো বেতালা,
হে শ্যালক, হে ওস্তাদ শালা ॥

হে মোর আসল শালা, হে প্রকৃত, নির্জলা, নির্ঘাৎ
তোমারে বলিনি কিছু (ভাষা খুঁজে পাইনি অর্থাৎ),
ভাবিলেই তব কথা শিরে রক্ত চড়ে অকস্মাৎ,
অঙ্গে ধরে জ্বালা,
জুতা হস্তে ছুটে যাই ! কাছে গেলে শিথিল সে হাত,
মুখে তব মধু হাসি ঢালা !
হে শ্যালক, হে আদৎ শালা ॥

দেশের দশের অর্থ শত হস্তে করিয়া লুণ্ঠন,
ভব্যতারে নগ্ন করি' সভ্যতার খুলিয়া গুণ্ঠন,
কভু হাস, কভু কাঁদ, কভু তব মৃদুল কুন্থন
একই সুরে ঢালা।
"অর্থ চাই, অর্ঘ্য চাই, বৃদ্ধি চাই, ওহে জনগণ,
তৃপ্তি নাই, আনো ছালা ছালা !"
হে শ্যালক, হে কৌশলী শালা ॥

অপরিচয়ের মাঝে থাকো তুমি অ-শ্যালক বেশে,
ঘনিষ্ঠ হলেই তব শালা-মূর্ত্তি বাহিরায় এসে।
আত্ম-বন্ধু-পরিজন কাছে গিয়ে দেখি, হায় শেষে
শালা—সব শালা !
দিন যায় ক্রমে দেখি শালা-সাগরেতে এসে মেশে
ছনিয়ার যত নদী নালা—
হে শ্যালক, হে অনন্ত শালা ॥

সেকালিনী

চৈত্র মাসেতে হায় প্রবাসীর পাতাতে
শ্রীমতী অপরাজিতা নানা ছুতা-নাতাতে
কবিগুরু রবিদা'কে হাত-মুখ নাড়িয়া
দেখিতেছি ফেলেছেন একেবারে পাড়িয়া !
যদিও বয়স তাঁর সত্তর পারায়ে
বুদ্ধিটা একেবারে যায় নি তো হারায়ে !
নাৎনীর কাছে তাই নানা রসে রসিয়া
হার মেনে কর-জোড়ে পড়েছেন বসিয়া।
'শিভাল্‌রি' এরে যদি নাহি চাহ বলিতে,
বলিও না !—সব কিছু হতে পারে কলিতে !

কিন্তু শ্রীমতী তুমি ভাবিও না তা' বলে
ভুলাইবে আমারেও আবোলে বা তাবোলে,
আমার বয়স আজও তিরিশের কোঠাতে
(সুরু করিয়াছি সবে কিঞ্চিৎ মোটাতে !)
বুদ্ধিও হয়ত বা নয় খুব তীক্ষ্ণ,
তবুও বুঝিতে এটা হয়নি তো বিঘ্ন—
এ-কালিনী নহ নহ, তুমি সেকালিনী গো
স্বামী সহধর্ম্মিণী, তনয়-পালিনী গো !
অবশ্য এ-কালের হাব-ভাব ফ্যাশনে
আয়ত্ত করিয়াছ প্রাণপণ প্যাশনে !

কবিতা লিখিতে চাও—যোগ দাও তর্কে
ফুলুরি হয়ত খাও বিঁধে বিঁধে 'ফর্কে' ;
স্কার্ট-পাড়-শাড়ী তব নানাবিধ কোঁচেতে
রমণীয় ভাবে আঁটা কমনীয় ব্রোচেতে,
চা-পানি বানাতে পার জাপানীয় কাঁচেতে
খদরি ব্লাউস্ পর লণ্ডনি ধাঁচেতে।
এরোপ্লেনে যদি চড়, পাঁজি দেখে চড় গো
মনে সদা ভয়-ভয়, সদা পড়-পড় গো !
হয়তো বা ড্রাইভারে বল নাকো 'থাম্ থাম্'
মনে মনে অবিরত জপিতেছ রাম নাম।

এ-কালিনী হতে যদি পাকা-পাকি ওজনে
বিলাসে, ব্যসনে, বেগে, বিহারে বা ভোজনে ;
তাহাদের মত যদি থাকিত সে 'ড্যাশ'টা
যার বলে তারা এই পৃথিবীর ব্যাসটা
বেদ-ব্যাসের কোন বিধান না জানিয়াই
পার হয়ে যেতে চায়, নানা বাধা মানিয়াই।
গোল্লায় যেতে পারে—যেতে চায় 'মার্সে'
উদাসিনী বসে থাকে অচেনার পার্শ্বে।
রবিবারে ভালবাসে প্রাণ দিয়া যাহারে
সোমবারে হাসিমুখে ত্যাগ করে তাহারে !
এ-কালিনী হতে যদি চিন্তার জগতে
রবিদা'র পাওনাটা মিটাইতে নগদে।
পুরাতন নজীরের জের টেনে আনিয়া
সেকালের সেই পচা-কাহিনীকে টানিয়া

দেখাতে না একালের-সেকালের মিল গো,
এ-কালিনী শোনে যদি হয়ে যাবে নীল গো।

এ-কালিনী সেকালের তোয়াক্কা রাখে না
মিল যদি থাকে থাক, সেটা গায়ে মাখে না !
অন্ততঃ তাই নিয়ে বাজায় না ঢাকটা
এ-কালের গর্ব্বেই উঁচু তার নাকটা !
"আমি ত সেকেলে নই !"—এই তার গর্ব্ব
তুমি সেটা শেষকালে করে দিলে খর্ব্ব।
সেকালের মত যদি একালের জগতই
'প্রগতি' বলিছ কেন ? বল তবে 'অগতি' !
সেকালের দোহাইটা মিছে পেড়ে, উতলে,
এ-কালিনী শালীনতা লুটাইলে ভূতলে !
মনে হয় তাই তুমি একালিনী নহ গো
সেকালের গৌরব আজও বুকে বহ গো !

এ-কালিনী সকলেরে করেন না বিধি যে,
অধিকাংশই হায় পিসি মাসী, দিদি যে !
এবং বাঁচোয়া সেটা ! অন্ততঃ আমাদের
অর্থাৎ Dick-Tom. যদু-রামা-শ্যামাদের।
এ-কালিনী রমণীরে সিনেমা বা নাটকে,
যুদ্ধের শিবিরে বা রাশিয়ার ফাটকে
দেখিয়া তৃপ্ত হব, দিব হাততালিও ;
ঘরেতে কিন্তু চাই সে পুরাকালীয়

রাগে অনুরাগে ভরা অঙ্গন-লক্ষ্মী
আধুনিক ডিম্বেতে সনাতন পক্ষী !

সুতরাং এই তব অতীত-প্রশস্তি
আনিয়া দিয়াছে মনে শাস্তি ও স্বস্তি ;
খুশী আছি এই ভেবে আমাদের দেশেতে
দিদিমারা বেঁচে আছে নাৎনীর বেশেতে।

নামানি

সে যেন সঞ্চিত ধন অদৃষ্ট যক্ষের !
পুত্র যেন তৃতীয় পক্ষের
বৃদ্ধ বিধাতার।
সুতরাং তার
দেশ যেন স্বর্গভূমি। যদিও তা মর্ত্ত্যেতে বিরাজে,
ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা বসুন্ধরা মাঝে
শ্রেষ্ঠতম তবু তাহা ;
বুলবুল, পিউ-কাঁহা,
পিক, দহিয়াল,
কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিয়া বকুল, পিয়াল,

হারায়ে সম্বিৎ
ক্রমাগত গাহিছে সঙ্গীত !
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি
ক্রমাগত পুষ্প 'পরে পড়িতেছে ঢলি
কিছু না মানিয়া ;
আশ্চর্য্য ! অভূতপূর্ব্ব ! কবিকণ্ঠ কহে বাখানিয়া
মাতৃবক্ষে সে দেশেতে বিশেষ করিয়া
স্নেহ দিয়াছেন বিধি ভরিয়া ভরিয়া
সে দেশের ভাই,
নাহি তারো কোনো তুলনাই ।
সে দেশের নদীনদ সাপ ছুছুন্দর
সমস্ত সুন্দর ।
তা লয়ে 'কোরাস্' ধরি উদ্বেলিত হৃদয়ে উদ্বাহু
ভগ্ন-কণ্ঠ হল শত শর্ম্মা, সেন, সাহু ।
বিশীর্ণ যদিও দেহ—কিন্তু ওগো সেই অশ্রুপাতে
অন্তর যে পূর্ণ তার নানা অজুহাতে ।
চক্ষু দিয়া গ্রাস করে ছাপার অক্ষরে
এবং বিশ্বাস করি পায় সে মোক্ষরে
মানে সে 'মোক্ষম্'
ম্যালেরিয়া, T. B. দেহে, মন তার নহে তো অক্ষম !
বিচিত্র সাধনা ;
লক্ষ্মীরে কামনা করে ভারতীর করি' আরাধনা,
ভারতীও অপরূপা, সাদাসিধা নহে বীণাপাণি,
নহে তা কমল-বন-বাণী ।
হস্তে নাহি বীণা ;
ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি তার—মাথামুণ্ডহীনা !

আপন শোণিত পিয়া
তাথিয়া তাথিয়া
নৃত্য করে উন্মাদিনী ; তারি চারি পাশে
লক্ষ্মীরে কামনা করি ভারতীর অর্ঘ্য বহি আসে
মুগ্ধ লুব্ধ ভক্ত বৃন্দ যত
আবৃত্তি করিয়া নিত্য পুঁথিগত মন্ত্র শত শত !
নাহি তার মহিমার সীমা
জানে তাহা যে-কোনো পিসীমা !
'মেকলে' পারেনি তাহা কিছুতে কমাতে,
মিস্ মেয়ো, পারেনি দমাতে !
সঙ্গে সঙ্গে উত্তর সে করিয়া প্রদান
করেছে প্রমাণ
তাহারা মহজ্জাতি ।—আর্য্য-গর্ব্ব উত্তরাধিকারী
সাক্ষী তার আছে সারি সারি
অতীতের বনিয়াদে পোঁতা
সকলের থোঁতা মুখ হয়ে গেছে ভোঁতা !
অন্তরে ঐশ্বর্য্য তার—বাহিরে সে যদিও কাঙালী ।
নাম কি বাঙালী ?

* *

সে যেন সাঁতারু বীর নিতান্ত নির্ভীক
অপার জলধি বক্ষে সাঁতারিয়া চলিয়াছে ঠিক ।
চলিয়াছে সোজা
পৃষ্ঠে বহি গুরুতর বোঝা
বিরাট সংসার !
ছেলে মেয়ে বউ বোন মাসি পিসি সব সারে সার

সানন্দে বসিয়া আছে দুলায়ে চরণ,
সাঁতারু চলেছে সোজা তুচ্ছ করি জীবন মরণ!
কেহ তারে দেয় না রেহাই।
আসে রোগ, আসে 'বিল', আসেন বেহাই
মাঝে মাঝে নামে অকস্মাৎ,
মনিবের রুদ্র পদাঘাত।
নামে বারম্বার
যুযুধান রুষ্টা প্রিয়ার
তীক্ষ্ণবাক্যবাণ;
কোন দিকে নাহি দিয়া কান
উত্তাল তরঙ্গমালা, গর্জ্জমান মহাঝঞ্ঝাবাত
না করিয়া কিছু দৃক্‌পাত
সাঁতারু চলেছে সোজা—মুখে নাহি বাণী।
নাম কি কেরানী?

* *

যে মালা পরায় প্রিয়া নিজ প্রিয়তমে
সোহাগে সরমে,
সে মালার
সেই মালাকার।
অন্তরালে থাকি নিজে দুইখানি অচেনা অন্তর
পরিচয়-বন্ধনেতে বাঁধে নিরন্তর!
যেন সে 'হাইফেন'
কবি ও কাগজ মাঝে যেন 'ফাউনটেন'!
একের মনের বার্ত্তা অপরের বুকে
বহি আনে সুখে!

শুধু ভূগোলেতে যেন যোজক; প্রণালী,
যুক্ত করি চলিয়াছে খালি
দেশে দেশে, সাগরে সাগরে
ক্রেতা আর বিক্রেতায় নাগরী, নাগরে।
যদি আসে কাছে
মনে হবে, আছে আছে আছে
এ জগতে আছে একজন
যার কাছে খোলা চলে মন!
আকাশের চাঁদ পেড়ে দিতে পারে হাতে
যদি পায় তাতে
কিছু কমিশন!
সবুজে করিতে পারে অনায়াসে লাল।
নাম কি দালাল?

* *

তবু চাই তাকে
করিতে পারে না কিছু তবু তারে ডাকে।
আছে ইতিহাস:
বহু অর্থ করিয়া বিনাশ,
বহু লজ্জা, বহু ঘৃণা, বহু প্রেম করিয়া হজম;
দিবা নিশি করি বহু শ্রম
লভিল সে যাহা
কি যে বস্তু তাহা
বলিল না কখনো খুলিয়া।
রহস্যের আবরণ দিয়া
আপনারে রাখিল ঢাকিয়া।

সতত সবার চিত্ত উৎসুক সদাই
বলে, 'তাকে চাই!'
গন্ধ যেন প্রকাণ্ড ক্রমশঃ,
আম্‌সি আচার যেন যতবারই চোষ
কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাকো;
কিছু হইলেই তাই বলে তারে, "ডাকো।"
এবং ডাকিলে সেও আইসে ছুটিয়া
প্রাপ্য তার টাকা-কটি নিয়া,
লিখে যায় চালায়ে কলম
সার্টিফিকেট কভু, কখনো বা মিকশ্চার, মলম,
উঁচু করি বিজ্ঞ নাক তার,
—নাম কি ডাক্তার?

* *

পৃথিবী যে রঙ্গমঞ্চ—একথা সে বুঝেছে প্রচুর
ইংরেজ-বিদ্বেষী আজ, কল্য তাই রায়-বাহাদুর!
নিত্য নব অভিনয় সখ
রাম বা রাবণ কভু, কভু মন্ত্রী, কভু বিদূষক!
সে যেন বুঝেছে ভূমা
উচ্চ-নীচ, ভাল-মন্দ, চড় কিম্বা চুমা
আসল নকল
তার কাছে সমান সকল।
কিন্তু নয় আইনষ্টাইন
(যদিও সে নানাবিধ জ্ঞানের 'মাইন')
ভেদ-বুদ্ধি আছে কিছু চিতে।

টাকাতে ও খোলামকুচিতে
আছে যে তফাৎ
সে কথাটা ভুলিতে সে পারে না হঠাৎ।
'মাইনাস'-ওইটুকু সমদৃষ্টি সবতাতে তা'র
সত্যি মিথ্যা তার কাছে স্পষ্ট একাকার !
মিথ্যা, প্লাস কিছু টাকা হয়ে যায় সত্যের সমান।
নিত্য তাহা করিছে প্রমাণ।
কভু হস্ত জোড় করি' কখনও বা উঁচাইয়া কিল
—নাম কি উকিল ?

*   *

প্রিয়ার নয়ন-কোণে যেন সে পিঁচুটি !
কারণ বিছুটি
লাগায়েছে মকর-কেতন,
অথচ পকেটে নাই তেমন বেতন !
নাই সেই রজত-নিক্কণি
যার জোরে হওয়া যায় নয়নের মণি
কোন রমণীর !
কিম্বা যদি—বীর
হইত সে, যৌবনের আবেগে অধীর,
আনিত লুণ্ঠন করি' কোন রূপসীর
সমস্ত হৃদয় !
কিন্তু হায়, বিধাতা নির্দয়
দেহ তার কিছুতেই হলনা সবল,
লম্বা চুল, জুলফি, গোঁফ, ব্যর্থ সকল !
ফ্রয়েডি মুখস্ত বুলি হল অনর্থক
ভেজেনা তাহাতে চিপিটক !

তাই
পিঁচুটির মত আছে লাগিয়া সদাই
কিছুতেই না দমে
বার বার পুছে ফেলে—পুন এসে জমে,
যৌবনের 'প্যারডি' সে, অথচ করুণ,
নাম কি তরুণ ?

দ্বন্দ্ব

যাহারে বেসেছি ভালো, বাসিব রে কিম্বা
আম, আতা, আনারস, কুল, কচু, নিম বা
সয়গল, উমাশশী, ডগলাস্, ময়না
হিট্‌লার হরিজন গারবো বা গয়না
ভাটিয়া, ইহুদি, আগা, মাড়োয়ারি, পার্সি
ভিটামিন, সোভিয়েট, চশমা বা আরসি
লাল পানি, তামাক, চা, মোদক বা গাঞ্জা,
কিশোরী, যুবতী, বুড়ী, পতিহীনা, বাঞ্জা,
টু-সীটার, পুলোভার, ডিম, কিমা, নিম্‌কি ;
সুভাষ, সাপ্রু, রবি, শিশির বা সিম্‌কি
বাছুর, ছাগল, ভেড়া, চার্লি বা মার্লেন ;
জি. বি. এস. কুপ্‌রিন্ বুনিন্ বা আরলেন ;
ট্যাক্সি, ফোন বা লেক ক্যামেরা বা তুলি গো,
ভাইঝি, বৌদি, মাসী, ভাগিনী, মাতুলী গো ;

করপোরেশন, রেস, বীমা আর মাসিকে
কংগ্রেস, রায় বেঁশে, সেতার বা বাঁশীকে,
ক্রয়েড, আর ভেরোনফ, co-ed বা কুলপি
স্বরাজ, বেতার বাণী, গজল বা জুলফি,
শাঁসাল শ্বশুর, শালী, প্রেয়সীর ওষ্ঠ,
সাঁতার, বিমান বীর, নাইডু বা গোষ্ঠ
খাদি বা টুইল মুগা, আদ্ধি, গরদ গো
সকলেরই তরে মোর গভীর দরদ গো ;
কান ধরে উঠ-বোস্ করাইছে নিয়ত।
উদ্ধার যদি থাকে বাংলায়ে দিওত।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ

"খামখা কয়েক বাল্তি জল ঢালি উলঙ্গ শরীরে
ভেবেছিস্ কি রে
পাইবি নিস্তার ?
আশা নাই—ওরে মূর্খ—আশা নাই তার !
তোর চৌদ্দ পুরুষের দফা
করিয়াছি রফা
তোরও দফা করিব নিকাশ
আছে এ বিশ্বাস।

স্নান কর, পাখা চালা, যত খুসী খা' তুই বরফ
ফলে শুধু বৃদ্ধি হবে কফ !
লাভ নাহি ইথে,
ভাল করে জেনে রাখ চিতে,

মোর হস্ত হতে তুই পাবি না নিস্তার
অক্ষুণ্ণ প্রতাপ মোর এ দেশেতে করেছি বিস্তার।
দেহ তোর, মন তোর, মনুষ্যত্ব, বিবেক—বেবাক্
আমার জারকরসে করি পরিপাক
অবশেষে পাঠাব চুলিতে
গেন্‌ডুয়া খেলিব তোর মাথার খুলিতে।

—ইতিহাস আছে কি স্মরণ?
করি আস্ফালন
আর্য্য নামে জাতি এক এসেছিল এদেশে একদা।
সিন্ধু-গঙ্গা-গোদাবরী-কাবেরী-নর্ম্মদা
তোলপাড় করিয়া সর্ব্বদা
অনার্য্যের শিরে হানি বিজয়ীর গদা
কত কিছু করিল তাহারা!
—কোথা আজ তারা?
এ দেশেতে আজ যারা বাঁধিয়াছে ঘর
সাদা, কালো, মেটে, মোটা রোগা বা নধর
ভুঁড়ি, পিলে, বহুমূত্র, যক্ষ্মা, বিসূচিকা
টাক, টিকি টুপি, টিকা
ধুতি, প্যান্ট, লুঙ্গি, লেংটি—মিল বা খদর—
এরাই কি আর্য্যবংশধর
করিতেছে যারা কিল্‌বিল?
কোথা সে নয়ন নীল?
পিঙ্গল কোথা সে কেশদাম?
ঋজু দেহ কোথায় সুঠাম?
কোথা সেই দৃপ্ত তেজ?—কোথা বীর্য্য বল?

সত্যাগ্রহী জ্ঞানবৃদ্ধ কই ঋষিদল ?

ঢাল্ ঢাল্ যত খুশী ঢাল্ তুই জল
এড়াইতে পারিবি না আমার কবল !

মনে আছে ? এসেছিল পাঠান মোগল ?
"যাদের চরণ ভরে ধরণী করিত টলমল !"
কোথা তারা ?
কোন শূন্যে হল তারা হারা !
ক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্র শক্তিমান সেই বীরগণ
'দীন্' 'দীন্' 'দীন্' 'দীন্' —বিজয়ীর ঘন গরজন
কোথা আজ তাহা ?
হাহা হাহা হাহা হাহা হাহা হাহা…
বদনা পিক্‌দানিমাত্র করিয়া সম্বল
দর্জিতে চালায় কল
কোচম্যান হাঁকাইছে গাড়ী
পশু শবদেহ ঘিরি কশাইরা করে মারামারি !"

নিদাঘের তীব্র তীক্ষ্ণ স্বর !
শুনিলাম ধ্বনিতেছে ভরিয়া অম্বর !

পদি পিসি

জান না বন্ধু, পদি পিসি কোথা থাকে ?
—দেখনি কখনো তাঁকে !
অর্থাৎ যিনি সবার বাড়ীতে
কাঠি দিতে চান প্রতিটি হাঁড়িতে,

কায়দা মাফিক ফোড়ন ছাড়িতে
সকল কথার ফাঁকে
দেখনি কখনো তাঁকে ?

শোন নি কি তাঁর অভিজ্ঞতার বাণী !
সবেতেই 'জানি' 'জানি'।
নিমোনিয়া হল বীরেন পালের
পদি পিসি কন, "নিমের ছালের
পুলটিস্ দাও পুরান চালের
সঙ্গে হলুদ ছানি।"
অভিজ্ঞতার বাণী !

গাছ থেকে পড়ে' মরিল মথুর মাঝি,
পদি পিসি খোলে পাঁজি !
ত্র্যহস্পর্শ'-'ত্রিপাদ' প্রভৃতি
দেখিয়া সবার উপজিল ভীতি,
"প্রায়শ্চিত্ত করাটাই রীতি,
—ব্যবস্থা কর আজই !"
পদি পিসি খোলে পাঁজি !

মকদ্দমায় পড়েছে বিপিন রায় ;
পদি পিসি বলে, "হায়
উকীল-টুকিলে হবে না কিছুই
নিরামিষ খেয়ে থাকো দিন দুই
কবচটা পর ! তুমি হিন্দুই
তোমারে বল কে পায়"
পদি পিসি দিল রায় !

বসন্ত রোগ হল যবে চারিদিকে
নিজে নিল পিসি টিকে
অথচ মাথাটি নাড়ি ঘন ঘন
কহিল, "পাড়ার সকলে শোন
শীতলা পূজার কর আয়োজন
বুঝি না ও টিকে-ফিকে !"
নিজে নিল পিসি টিকে !

মারা গেল যবে রাধু ঘোষালের নাতি,
ফুলায়ে মস্ত ছাতি
পদি পিসি কন—"জান্‌তাম, আরে
বারণও করেছি ছেলেটার মা'রে
জোলাপ কখনও খায় গুরুবারে !
—ডাক্তারী, না এ হাতী !"
কহিল ফুলায়ে ছাতি !

দেখনি বন্ধু, আজো তুমি পিসিটিকে ?
দেখ তবে ওই দিকে !
আরে যা' হেসেই হলে দেখি খুন,
ওই পদি পিসি, পরি পাৎলুন !
ওরি এত কথা, ওরি এত গুণ
ওরি জোরে আছি টিকে
দেখে রাখ পিসিটিকে !

লেখা পড়া জানা ভারি নাকি পণ্ডিত ও !
ডিগ্রীতে মণ্ডিত !
টিকি ঢাকা আছে টুপিতে সোলার

কণ্ঠি ঢাকিয়া রেখেছে 'কলার'
যায় নাকো দেখা জামার তলার
চাবি-বাঁধা উপবীত !
ভারি নাকি পণ্ডিত ও !

লেখা পড়া জানা মস্ত ও বিদ্বান—
চুলভরা ছুটি কান !
হেসোনা বন্ধু, চেয়ে দেখ ফের
পুংলিঙ্গই পিসিমা মোদের !
নস্য টানিছে হাঁড়ল নাকের
কিবা মরি-বাঁচি টান ;"
চুল-ভরা ছুটি কান !

পিসি আমাদের নানাবেশে দেন দেখা
কভু সোজা, কভু বেঁকা !
নানাবেশে তার চির অভিসার
কখনও কেরানী, কভু অফিসার
কভু ডাক্তার, কভু প্রফেসার
কভু পাজি, কভু ন্যাকা !
নানারূপে দেন দেখা ।

ওরে ও বাঙালী

ওরে ও বাঙালী, ওরে ও কাঙালী ওরে ওরে ভিক্ষুক,
পরের দুয়ারে হস্ত পাতিয়া আজো কি রে পাস্ সুখ!
কেরানীর জাতি বলি মারে লাথি উপহাস করে সবে
মানুষের মত যোগ দিবি কবে জীবনের উৎসবে!
সত্যিকারের মানুষ হায় রে সত্যি কি নাই দেশে
মনুষ্যত্ব বিকায়ে সবাই চাক্‌রিই চায় শেষে!
হায় রে কপাল হায়,
চাক্‌রি না পেলে বাঙালী-জীবন শুকায়ে মরিয়া যায়!

উৎসাহ, মান, প্রিয়া, সন্তান, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, বল,
বাঙালীর হায় সবার মূলেতে চাক্‌রিই সম্বল!
কাউন্‌সিলেতে, করপোরেশানে, রাজদরবারে হায়,
বাঙালীর ছেলে দু'হাত পাতিয়া চাক্‌রি কেবল চায়।
প্রেমের তাগিদে বলেছিল মীরা, "চাকর রাখ গো মোরে"
পেটের তাগিদে বাঙালী-চাকর বেড়ায় চরণ ধরে'!
হায় রে কপাল হায়,
চাক্‌রি না পেলে বাঙালী-জীবন শুকায়ে মরিয়া যায়।

চাক্‌রি পাইবে বলিয়া তাহার পরীক্ষা পাস করা,
ডিগ্রী জুড়িয়া নামের শেষেতে গর্ব্বে তুলিয়া ধরা!
কিন্তু অধুনা ডিগ্রী হলেই চাক্‌রি মেলে না, মিতা,
সুতরাং বুলি ধরেছে বাঙালী লেখাপড়া শেখা বৃথা!

লেখাপড়া শেখা বৃথা ওরে তোর, কেরানী না হলি যদি,
প্রবন্ধে লেখে বাঙালী-লেখনী এই কথা নিরবধি!
হায় রে কপাল হায়,
চাকুরি না পেলে বাঙালী জীবন শুকায়ে মরিয়া যায়!

মাড়োয়ারী হল বড়লোক নাকি করিয়া দোকানদারি,
মাড়োয়ারী-মোহ বাঙালী-মনেতে প্রভাব করেছে জারি!
লেখাপড়া শিখে লাভ নাই কিছু, দোকান খুলিয়া বোস্,
কিন্তু হায় রে ক্যাপিটাল কই এযে মহা আফশোষ।
অগত্যা শেষে বাঙালী-বালক পিসা বা মেসোকে ধরে
চাকুরি চেষ্টা করিয়া বেড়ায় প্রতি আপিসের দোরে!
হায় রে কপাল হায়
চাকুরি না পেলে বাঙালী-জীবন শুকায়ে মরিয়া যায়!

মানুষ হওয়া যে আগে দরকার, বাঙালী ভুলেছে তা' কি!
সত্যিকারের মানুষ হলেই কতটুকু থাকে বাকী।
মনুষ্যত্ব বিকশিত হলে বোঝা যায় নিমেষেই
জীবন ধারণ করিবার তরে বেশী প্রয়োজন নেই।
অল্প যা' কিছু আছে প্রয়োজন, মানুষ হলে তা' মেলে
আপিসে দোকানে স্বদেশে বিদেশে ঘরেতে কিম্বা জেলে,
মানুষ হওয়া যে চাই,
মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই।

মানুষ হবার সাধনা কোথায়? কই চরিত্র বল?
জীবন-পথের কোথা ওরে তোর সেই সেরা সম্বল?
নির্ভীক প্রাণ, শিক্ষিত মন—কই সে কর্ম্ম-বীর?
এ যে দেখি শুধু চাকুরি-লোলুপ ভিখারীর যত ভীড়।

ভিখারী কখনও পায় কি শ্রদ্ধা ? কে দেবে তাহারে মান,
যে জন নিজেরে জীবনে কখনও করিল না সম্মান।
মানুষ হওয়া যে চাই,
মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই।

নেপোলিয়নের কীর্ত্তি পড় নি ? বুকার ওয়াশিংটন
ফোর্ড, এডিসন, গান্ধি, প্রতাপ, যতীন্দ্র, নেলসন্
আরো কত আছে—ভেবে দেখ তোরা জীবনে ইহারা সবে
মানুষ হবার সাধনা করিয়া ধন্য হয়েছে তবে।
মানুষের কাছে বিঘ্ন বা বাধা কিছু দুস্তর নয়,
বীর্য্যবন্ত রামচন্দ্র কি করেনি সাগর জয় ?
মানুষ হওয়া যে চাই,
মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই।

চাক্‌রির লোভ ছাড়রে বাঙালী, চাক্‌রির মোহ ভোল,
কুসুমের মত জগতের মাঝে নিজেকে ফুটায়ে তোল।
ফুল তো কাহারো চাক্‌রি করে না, পাখী তো কেরানী নয়
অথচ তাহারা কোন্ সুধারসে চির আনন্দময় ?
আকাশ হইতে আলোর বারতা মরমে তাদের পশে,
সার্থক তারা প্রকৃতির কোলে ধরণীর প্রাণরসে।
মানুষ হওয়া যে চাই,
মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই।

মুগ্ধ হইলাম,
কহিলাম,
ধন্য কবিবর,
এতকাল অন্তর-বিবর
ছিল অন্ধকারে।

আলোকিত তুমি তারে
করেছ আজিকে
কবিতাটি লিখে।
কি করিতে পারি, বন্ধু, কহ প্রতিদানে?"
চাহি মোর পানে
কহে কবি তুলি কণ্ঠ ক্ষীণ
"স্যর, I mean,
সার্থক কবিতা মোর, চিত্ত তব করিয়াছে জয়,
কিন্তু স্যর পাইলে অভয়
মনের কথাটি মোর কহি অকপটে।
কবিতা লিখেছি বটে
কিন্তু অন্তরে
যে কথাটি গুমরিয়া মরে
নিত্য রহি রহি
অভয় দেন ত যদি কহি;
I mean,
চাকরি একটি দয়া ক'রে জুটাইয়া দিন"

প্রেম-পত্র

প্রিয়ে,

উচ্ছৃংখল অন্তরের উদ্ভ্রান্ত উৎসাহ
(নির্য্যাস যেন রে হায় করঞ্জ ফুলের!)
উচ্চকণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া কহে, "কি প্রদাহ।"
মর্ম্ম মার্গে স্পর্শ-সুখ কবোষ্ণ চুলের।

কত যে আবেগ-ভরে চিত্রিত সুন্দরী
পদ্ম-কণ্ডুয়ন করে বিম্ব চঞ্চুঘাতে,
যে-অশ্ব ভ্রমরসম উঠে গো গুঞ্জরি'
অশ্বিনী-স্বপন-মুগ্ধ,—বন্দী মন্দুরাতে।

উদ্ধত যে নিষ্ঠাভরে উদ্ধত 'কাইজার'
মহাযুদ্ধে অবতরি' বিনষ্ট হৈল,
বৈষ্ণবের মনোব্যথা (বৈষ্ণবী নাই যার!)
অকথ্য যে কষ্ট সহি তিল দেয় তৈল।

নভ-পুষ্প-বাচ্য সব? উদ্বেলিত প্রাণ
ধাক্কা মারে পঞ্জরের প্রতিটি অস্থিতে।
কহে মোরে, "উত্তিষ্ঠত, করহ উত্থান,
ঝেড়ে ওঠ! নাহি দিব রহিতে স্বস্তিতে।"

অচিরাৎ ফাউন্টেন করি আস্ফালিত
অভীপ্সা-বুদ্বুদে করি কাগজে স্থাপন
রদ্দা মারি' পদ্ম-পুষ্প কর বিস্ফারিত,
কর কর হৃৎপিণ্ড-ব্রত উদ্‌যাপন!'

উদ্বোধিত চিত্তে তাই উদ্দাম উদ্দেশে
উত্তোলন করিয়াছি 'পার্কার' সম্ভ্রমে,
এরোপ্লেন ঘর্ঘরিয়া—ওড়ে যথা শেষে
অম্বর করিয়া লক্ষ্য প্রত্যহ দমদমে!

উদাস বসিয়া আছি আন্দোলিয়া জানু;
মস্তিষ্কে উদ্বৃত্ত নাহি কিঞ্চিৎ বল, ধী।

উদিবে না চিত্তে মোর আজি কাব্য-ভানু
উত্তরিয়া অন্তরের উত্তাল জলধি ?

উত্তেজনা, উদ্দীপনা, উল্লাস, উদ্বেগ,
উচ্চারিছে সমস্বরে, "কিচ্ছু শুনব না"
সামান্য দর্দ্দুর ক্ষিপ্ত ঈক্ষণিয়া মেঘ !
উন্মাদ অর্ব্বুদ-সুরে গর্জ্জিছে উন্মনা।

ইরম্মদে মহানন্দে আয়ত্ত করিয়া
সঙ্গীত-গমক সাথে নিষ্পেষিত করি'
উদ্‌ভ্রান্ত উৎকণ্ঠা-খানি শব্দে সম্বরিয়া
দিব রে সম্ভব হলে 'এনভেলাপে' ভরি।

উদ্যাস্ত উৎক্ষিপ্ত চিত্ত গর্জ্জিছে—গুড়ুম্,
সমস্ত সত্তারে চাহে করিতে উৎখাত,
মূর্ত্তি পরিগ্রহ কর শব্দ-কল্প-দ্রুম !
ঈপ্সা দহে, শব্দ নাই অসহ্য উৎপাত।

উচ্ছিষ্ট উপমা লয়ে করিব উচ্ছ্বাস।
কোন দিন সেই শখ বান্দার নাহি তা'—
অথচ করিব কাব্য তাও তো উচ্চাশ !
চার্ব্বাকীয় চরিত্রের চলিষ্ণু চাহিদা !

উড্ডীন গগনে তাই চিত্ত উৎক্রোশ
বিন্দুবৎ প্রতিভাত বিস্তার সিন্ধুর,
বিরহ-মার্জ্জার কহে, "হায় কি আফশোষ
পিতৃগৃহে অবস্থিছে ঈপ্সিত ইন্দুর।"

বিরংসা-ভুজঙ্গী করে দংষ্ট্রা-প্রদর্শন,
আত্মা-পৃথ্বী কম্পমান ভূমিকম্প ভরে।
চিদাকাশে পুঞ্জীভূত উষ্মা-প্রভঞ্জন
পুষ্যা-চিত্রা-স্বাতী-জ্যেষ্ঠা অবলুপ্ত করে।

সমস্ত সলিলে কিন্তু হবে রূপান্তর
—মৎকুণ-যন্ত্রণা হবে নিঃশেষ প্রভাতে,
নিতান্ত নির্জ্জন যেন এ চিত্ত-প্রান্তর
মাতাল পতঙ্গ বৃন্দ গুঞ্জরিছে তাতে।

ইচ্ছা করে সে প্রান্তরে কাব্য-'মনুমেণ্ট'
প্রতিষ্ঠিব শাক্তমতে করি নিষ্ঠাচার,
বক্তৃতা করিয়া হব রক্তারক্তি, 'কেণ্ট'!
—ত্যক্ত করে তিক্ত যত ভাক্ত শিষ্ঠাচার!

তিতিক্ষার শিক্ষা নাই; ভিক্ষাও সঙ্কট,
দীক্ষা-গুরু পিতৃগৃহে! ইন্দ্রিয়-বল্মীক
বাল্মীকি করিল মোরে উদগ্র উৎকট
তৃষ্ণায় বক্ষের তক্ষ কহে—ধিক্ ধিক্!

প্রাক্তন মঞ্জুষা-স্থিত মুক্তা বা পান্নার
খরিদ্দার নহি আমি;—বুভুক্ষায় মরি!
দন্ত কড়মড়ি তাই দুর্দ্দম কান্নার
অশ্রুধারে রাজবর্ত্ম পিচ্ছিল যে করি।

পরিষ্কার বুঝিতেছি নিষ্কাম গীতার
পরিচ্ছন্ন তত্ত্বে মোর নাহি কিচ্ছু দাবী।

রাত্রিকালে দুগ্ধ চাহি সন্ধান কি তার
প্রলানিবে কুত্র আছে দুগ্ধবতী গাভী ?

শঙ্খ বাজে,—কঙ্ক ওড়ে সন্ধ্যার অম্বরে
উজ্জ্বল বৃশ্চিক-দৃশ্য নির্দ্দিষ্ট ত্রেকোণে
শকট-চক্রেতে ওঠে ক্রন্দন কঙ্করে,
ভয়ঙ্করী দুর্বাসনা কচ্ছ ধরি টানে !

মুক্তি-মুষ্টি-বৃষ্টি করি' রক্ষিব আত্মায় !
গোল্লায় যাব না আছি সংযম-কেল্লাতে।
মুগ্ধ মোল্লা আল্লা-নাম স্মরিছে রাস্তায়
পাল্লা দিয়া ঝিল্লিকুল লেগেছে চেল্লাতে।

খৈয়াম হাক্সলি রবি লরেন্সের সাথে
সহজিয়া তত্ত্ব-রস জ্ঞান-পাত্রে টানি
(অ্যাণ্ডি সহযোগে খেলে ক্ষতি কিবা তাতে ?)
বেদনার অস্ত নহে বেদান্তের বাণী !

চিন্তা করি' চক্ষু-পক্ষ্ম হয় যে সজল,
অথচ চিন্তারে নারি করিতে বর্জ্জন।
ভাবি কোন গণ্ডারেরা ফুৎকারে গজল ?
কামনারে কে করায় কামান-গর্জ্জন ?

বৃদ্ধ নহি, রিক্ত নহি, রেস্ত আছে কিছু,
অকস্মাৎ মনশ্চক্ষু করিছে ক্রন্দন।
মদমত্ত হস্তী যেন শুণ্ড করি' নীচু
সাশ্রু-নেত্রে ঈক্ষণিছে শৃঙ্খল-বন্ধন।

মস্তক ঘর্ঘর ঘোরে !—মর্ম্ম-ঝুম্‌ঝুমি
গর্জ্জমান শব্দে কহে, এই তো নিয়ম !
উচ্চারিছে চিকিৎসক—"শান্তি পাবে তুমি
তুখ বৎস, সাল্‌ফ অব ম্যাগনেসিয়ম !"

ডাকের সময় হ'ল ! তূর্ণ করি শেষ,
অন্যথায় পত্র-প্রাপ্তি অসম্ভব হবে,
অতীতে মিলন-ঘণ্টা বেজেছিল বেশ
বর্ত্তমান প্রদর্শিছে অঙ্গুষ্ঠ নীরবে !

অস্বচ্ছন্দালাপ

এই রাতে ঠাণ্ডায় ওই রোগা স্বাস্থ্যে
একফালি চাঁদ ওঠে আহা কত আস্তে !
যক্ষ্মাই হয়েছিল লেখা আছে শাস্ত্রে
'নাইট-ডিউটি' তবু ঘুচিল না হায় রে !
অথচ সূর্য্য দেখ গোলগাল চেহারা
সন্ধ্যা-বেলায় রোজ ঘরে ফিরে যায় রে।

* * *

'অগস্ত্য' আছে দক্ষিণে আর 'ধ্রুবতারা' আছে উত্তরে
কেউ কি কাহারো খুঁত ধরে ?
যুগ-যুগান্ত বসিয়াই আছে ঠায় !
'সপ্তর্ষি' যে 'কাশ্যপা'কে 'ফলো'ই করিছে দিন-রাতই
কাটিছে তাহাতে কার ছাতি ?
মোটেই তো কেহ গ্রাহ্য করে না হায় !

* * *

"এর নাম অবিচার
এবং কারণ তাঁর
আকাশেতে 'ডেমোক্র্যাসি' নাই"
কহিল সমস্বরে মাধাই জগাই !
"থাকিত যদ্যপি সেথা কোন 'বলশেভিক'
নিশ্চয় এ গোলযোগ হ'য়ে যেত ঠিক ।
চক্‌চকে তারাগুলি
কারো মুখে নাই বুলি
সব যেন সং !"

*　*　*

"এবং"
কহিলেন চামচিকা করি' কির্চমিচ
বুদ্ধি নিলে মানুষের
হইত উন্নতি ঢের !
ছায়াপথে এতদিন ঢালা হত 'পিচ' !"

*　*　*

আকাশ-সমস্যা লয়ে চিন্তা করি আকাশ-পাতাল ;
অথচ তো হইনি মাতাল !

*　*

চুলগুলি চুলকায়
ত্বক্ সে তকমা চায়
পিঠ শুনে পিট পিট চায় রে !
হিয়া যেন টিয়া পাখী
কপচায় থাকি' থাকি'
মানে তার নাহি বোঝা যায় রে ।
পরিয়া সবুজ শাটি

হাঁটু করে হাঁটাহাঁটি
বুকের উপরে মোর হায় রে !
ফুস্ ফুস্ তাই দেখে হসতি !
সহসা কি হল ভাই,
কাঁধে নাই মাথাটাই
মাথা করে মাতামাতি পকেটে !
নাসিকা কাসিছে খালি !
কান দেয় করতালি
'লিভার'টি দোল খায় লকেটে
না বলিয়া কোন কিছু
আঁখি কার পিছু পিছু
চলে গেছে খালি রেখা 'সকেটে' !
চড়ুই করিছে সেথা বসতি !

শকুনি

বসে' আছে যত লুব্ধ শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া ;
কৃষক বসিয়া চাহিছে আশায়
নদীতে কখন পড়িবে চড়া ।
নদীর পাঁজর বাহির হইবে পড়িবে পলি,
উঠিবে চাষার অনেক আশার ফসল ফলি' !
ভাবিছে রাঁধুনি কাঁচা কাঠগুলা উঠিলে জ্বলি,'
পেঁয়াজকলি
কুটিয়া ভাজিবে পেঁয়াজি বড়া !

বসে আছে যত ক্ষুব্ধ শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

ভাবে ডাক্তার অসুখে মানুষ পড়িবে কবে
উকিল ভাবিছে কাছারির বেলা কখন হবে
অলি কি আসিবে ফুলেরা ভাবিছে মাটির টবে ;
গণিকা সবে
ভাবিছে কখন নড়িবে কড়া।
উড়িয়া উড়িয়া ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া ?

রঙে ও ঢঙেতে ঢলিয়া পড়িছে প্রবীণা বুড়ী,
মদের দোকানে গান্ধির ছবি টাঙায় শুঁড়ি,
আধ-পেটা খেয়ে দিন কাটে যার চিবায়ে মুড়ি।
—মুড়ি ও গুড়ই,—
চক্‌চকে তার চূড়া ও ধড়া !
মুখে মৃদুহাসি ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

ভুলাতে পাঠক, লেখক বসিয়া লিখিছে যা'তা',
স্নেহ-ক্ষুধাতুর জননী চিবায় ছেলের মাথা,
দয়ালু জনের ভিজাইতে হায় নয়ন-পাতা
—চাঁদার খাতা
ভিখারী আসিয়া কাটিছে ছড়া !
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

হাসে বড়বাবু হেরি কেরানীর প্রতিভা-জ্যোতি,
আপিসে কলম না পিষে তাহার কোথায় গতি !

ঘরে ও বাহিরে কুমারী খুঁজিছে আবেগে অতি
শাঁসালো পতি,
শাঁস দেখে চাই প্রেমেতে পড়া !
কটাক্ষ হানি' ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

অন্যায় যাহা স্বপক্ষে তারি লড়িছে বীর,
'শোণিতের স্রোতে ভেসে গেল কত উচ্চশির !
কত অর্জ্জুনে ভুলাইল কত উর্ব্বশীর
নয়ন নীর
হইল শেষটা গহনা গড়া !
ছন্দে ও গীতে গাহিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

দর্জ্জির মত বসে আছে কবি কাব্য-কলে,
ফরমাস-মত কবিতা ফতুয়া বানায়ে চলে !
শিল্পীর সেরা ভিড়েছে কুম্ভকারের দলে,
আর্টের ছলে
মূর্ত্তি ফেলিয়া গড়িছে ঘড়া !
গুমরি' গুমরি' ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

পাণ্ডা পুরুৎ কাটিয়া তিলক রেখেছে টিকি ;
সিনেমা দেখায় যুবক, যুবতী, 'মাউস্ মিকি'
দালাল বলিছে, 'বলুন না স্যার আনিব কি কি'
—পাই না, ঠিকই !

এক সাথে সব টনকনড়া !
ঝরিতেছে লালা—ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।
মহাজন বসে' সুদের হিসাব কষিছে রোজ ;
গুরুদেব কন, 'ভগবান পাবি চোখটা বোজ'
ইয়ার বলিছে, 'চিৎপুরে আজ জমিবে ভোজ,
নে 'অটো রোজ'
ফুলের মালাটা গলাতে জড়া।'
উদ্‌গ্রীব হয়ে' রয়েছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

হস্ত-লিখন বিচার করিছে গণৎকার'
টং টং টং উঠিছে টাকার টনৎকার,
সমরাঙ্গণে বাজিছে অসির ঝনৎকার
চমৎকার !
সবারই গলায় ফাঁসীর দড়া !
অট্ট হাসিয়া কহে মহাকাল
সবাই শকুনি সবাই মড়া।

তোমারেও নমি হে শঙ্করি।

১

গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্তশীতে
সকল ঋতুতে, সকল কালে,
নিত্য যাঁহারে প্রণাম করি গো
কৃত-কৃতার্থ-আনত ভালে,

দিবসে নিশীথে যাঁহার স্বপ্ন
তন্ময় চিতে নিত্য হেরি,'
ওঠে জয়গান জগৎ জুড়িয়া
যাঁহার দীপ্ত মূরতি ঘেরি',

যাঁহার পূজায় কত বলিদান,
কত না আরতি, মন্ত্র কত,
কত ঋত্বিক, কত পুরোহিত,
কত আয়োজন লক্ষ শত,

আকার তাঁহার যেমনই হউক
নানাভাবে করি টাকারই পূজা,
হোক্ না তাঁহার যেমন চেহারা
বংশীবদন বা দশ-ভুজা।

অয়ি মৃন্ময়ী, অতসীবরণী,
ভিখারী ঘরণী শিবানী অয়ি ;
রূপার তলায় চাপা পড়ে' গেছ,
তোমার পূজার মন্ত্র কই।

টাকার পূজায় মত্ত সবাই
তোমারি পূজাও টাকার পূজা,
লক্ষ্য নহ গো উপলক্ষ্যই,
ওগো মৃন্ময়ি, হে দশভুজা।

২

সুদখোর ওই হারু পোদ্দার,
বাড়ীতে তাহার পূজার ধুম,

কাড়া ও নাকড়া ঢাকের জ্বালায়
পাড়ার লোকের নাহিক ঘুম !

তাহার নিকট কর্জ্জ করিয়া
পূজার বাজার করেছি সব
অর্থ নইলে জমে কি জননী,
তোমার পূজার এ-উৎসব ?

অর্থ পুড়িছে আতস বাজীতে
আলোকমালায় জ্বলিছে টাকা
ঘণ্টার রবে টাকাই বাজিছে
প্রণাম না করে' যায় কি থাকা ?

বড় সাহেবেরে সেলাম বাজাই,
রাজারাজড়ায় প্রণাম করি
হারুর বাড়ীতে তেমনি জননী
তোমারেও নমি হে শঙ্করি।

অর্থাৎ কিনা হারুকেই নমি,
কারণ তাহার টাকা যে আছে,
দুর্গা কৃষ্ণ যাই সে পূজিবে
আমরা নমিব তাহারই কাছে !

বিদ্রোহ

সামান্য পয়সা-লোভে আধুনিকতম বেশে
হস্তে বহি কাগজ-নিশান,
অর্ব্বাচীন শিশু দল আর্ত্তনাদ করে পথে পথে
পথিকের ঝালা-পালা কান !

চীৎকার করিছে হায় ভাড়া-করা শিশু ক'টি শুধু
চক্ষে দৃষ্টি ত্রস্ত শশকের,
জীর্ণ অঙ্গে মলিনতা শীর্ণ মুখে লোলুপতা মাখা
ক্ষীণ-প্রাণ ক্ষুদ্র মশকের !

একটি চপেটাঘাতে স্তব্ধ হয় বাণী যাহাদের
তারা আজ বাণী-বার্ত্তাবহ !
হাঁচিলে কাসিলে জোরে শিবনেত্র হয় যাহাদের,
তারা কহে, "ভয় কিবা কহ" !

পুরান হুঁকার জল শ্যামপেনের করে অভিনয় !
হেলে চাহে হইতে গোক্ষুর,
আজও হায় দাঁড়কাক ময়ুরের দেখিছে স্বপন !
ক্লান্তি নাই কল্পনা চক্ষুর !

দলে দলে সারি সারি মাতিয়াছে দেশ-প্রেমে সব
আত্মহারা, যতেক উৎসবী,
"বিদ্রোহ বাঁচিয়া থাক"—চীৎকারিছে ভীতকণ্ঠে হায়
শিশু যত লজেঞ্চুস্-লোভী !

শুনিতেছি জয় জয়—জয় রবে গগন মুখর
জয়নাদে সার্থক জীবন,
অনেক বৎসর ধরি রাখিয়াছি টিঁকাইয়া মোরা
ছিন্ন-কন্থা করিয়া সীবন !
সেই ছিন্ন কন্থা দিয়া আবরি রেখেছি হায় আজও
শব-দেহ—জীবিত সে নয় !
"বল হরি হরি বোল"—প্রাণ ধরে পারিনা বলিতে
আর্ত্তকণ্ঠে করি জয় জয় ।

চন্দ্র-চকোরম্

চাঁদেরে ডাকিয়া কহিল চকোর,
"আর কত কাল দূরেতে রবে,
কত পূর্ণিমা আসিল ও গেল,
স্বপ্ন কবে গো সফল হবে !

সুদূর ধরার ক্ষুদ্র বিহগী
কেন তার মনে দিয়েছ হানা ?
উড়ে যেতে চাই কিছু দূর গিয়া
ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে ডানা ।

জ্যোৎস্না-সাগরে যাই যে ডুবিয়া
আলোক পাথারে হারাই দিশা,
আর কত দূরে আছ বল তুমি
আর কত কাল বহিব তৃষা ?"

চকোরে থামায়ে কহিল চন্দ্র,
"বকর বকর কোরো না মিছে,
এক আধটি নয়, সাতাশ পত্নী
অহরহ আছে আমার পিছে !"

মুচকি হাসিয়া কহিল চকোর
"একটি পত্নী থাকিলে পরে
হয়তো আসিতে সাহস হ'ত না
দ্বিধা সংশয়-সরম ভরে।

সাতাশ পত্নী আছে বলিয়াই
এসেছি আমি যে নূতন সাকী
সাতাশের পরে আটাশের পালা
ও গো, কলঙ্কি, জান না তা কি ?"

"আরে চুপ চুপ শুনিতে পাবে যে"
কহিল তখন হাসিয়া শশী
তার পর যাহা ঘটিল তা লিখে
বৃথা করিব না নষ্ট মসী।

কেন

১

টুস্‌কি বাজায়ে শুনি ধন্নুকের টঙ্কার,
তব্‌লা বলিয়া ভাবি টেবিলের কাঠকে,
লাগ্‌বগাবগে শুনি সেতারের ঝঙ্কার,
খাগ্যের চেয়ে কেন ভালবাসি চাট্‌কে,

২

লেখনীকে কেন হায় মনে করি বন্দুক,
গোলাগুলি কেন ভাবি আছে সব ওষ্ঠে,
বস্তিবালাকে ডেকে বলি 'তোর কোন্ দুখ ?
দয়া করে এসে বোস্ পরাণ-প্রকোষ্ঠে' !

৩

লম্বা হাত পা কেন আঁকাবাঁকা আঙ্গুল,
কান-ঢাকা বুক-খোলা কেন যত চিত্র
লেজ নাই তবু মোরা কেন নাড়ি লাঙ্গুল,
যাবতীয় সেন, সোম, শর্ম্মা ও মিত্র

৪

পিলে রোগা প্রেয়সীর বিবর্ণ অঙ্গের
মলিন শাড়িতে হেরি শ্যাম্পেন্ বর্ণ
এবং মাতাল হই ! মনে হয় বঙ্গের
অঙ্গনে মূর্ত্ত বা ইব্‌সেনি স্বপ্ন !

৫

সুখী হই কেন ভেবে শালিকের চীৎকারে
শঙ্কিত সিংহেরা আছে নত মস্তে,
স্বয়ং ঐরাবৎ পলায়েছে ধিক্কারে,
কম্পিত শ্রীগরুড় আছে জোড় হস্তে !

৬

বিজ্ঞান, আর্টের যত বুলি বিশ্বের
মুখস্থ কেন করি টাটকা ও সদ্য
পেটেতে অন্ন নাই তবু কেন নিঃস্বের
ঋণ করে চাই রোজ পান করা মদ্য !

৭

হেসো নাকো মানে আছে এ জবরদস্তির
কেন যে কবিতা লিখি না মানিয়া ছন্দ
কেন মোরা দল বেঁধে হইয়াছি অস্থির
গোবরের মাঝে পেতে গোলাপের গন্ধ

৮

এক ঘেয়ে জীবনের এ নরককুণ্ডেই
হে বন্ধু, মাঝে মাঝে চাই বৈচিত্র্য ;
চরণ উর্দ্ধে তুলি' নীচু করি মুণ্ডেই
ঘোষালকে মাঝে মাঝে ভাবি তাই মিত্র্ ।

বিরক্তিকর ব্যাপার

মনের মানুষ মনেতে থাক্,
বাহিরে তাহার বৃথাই খোঁজ,
নাগাল তাহার পাইলে হায়
দেখিবি হয়তো চ্যাপ্টা nose !
দেখিবি মানস-প্রতিমা, তার
রক্ত-মাংস-অস্থি-সার !
থোড়বড়ি খাড়া উচ্ছে পুঁই,
ঘুরিয়া ফিরিয়া বারম্বার !
বাহিরে তাহারে চাস্ না আর,
তাহারে চাস্ তো নয়ন বোজ !

দাঁত বার করে পশুটা কয়,
"রয়েছে আমার প্রচুর লোভ,
আমি তো খুঁজিব দুনিয়াময়
নাহলে আমার মেটে না ক্ষোভ !
এ কি ছোঁক্ ছোঁক্—কি নিস্‌পিস্,
ক্ষুধার জ্বালায় অহর্নিশ !
এ সাধ মিটায়ে মরিতে চাই,
হোক্ সে অমিয় হোক্ সে বিষ !
চাঁদের কিরণ, শ্যামার শিস্,
মনের সায়রে ফেলিছে টোপ !

দেবতা এবং অসুর হায়
ঝগড়া করিছে চিরটা কাল,
তবুও ফুল তো ফুটিতে চায়
চাঁছিতে চাই যে কামান গাল !
আমি যে প্রেমিক গোবর গুঁই,
হৃদয় বলতো কোথায় থুই ?
বিছানা ভরেছে ছারপোকায়,
স্বপনের আশে তাতেই শুই !
থোড়বড়ি খাড়া উচ্ছে পুঁই
সবাই আমারে করিছে ঘাল !

কোথায় কাহার ডাগর চোখ,
কোথায় কাহার দোদুল দুল,
অমনি হায় রে আমি না-হক্
করিয়া ফেলি যে হিসাব ভুল !
কোথায় কখন কলতলায়,
কাহার কণ্ঠ কলকলায়,
অমনি হায় রে চিত্ত মোর
মাগুরের মত খলবলায় !
নয়ন দুটিও ছলছলায়,
ছাঁটিয়া ফেলি যে ঘাড়ের চুল !"

বলিনু তাহারে, "সাম্‌লে চল ,
বড়ই তোর যে বেড়েছে বাড়,
প্রেমের পথ যে খুব পিছল,
পিছলে গেলেই খাবি আছাড় !

ভাঙিবে হাড় ও ভাঙিবে মন,
খুঁজিবি তখন অনুক্ষণ,
কোথায় আফিং, কোথায় লেক'
কোথা ডাক্তার—কোথায় 'ফোন'!
আমার গোপন যুক্তি শোন,
মানস প্রতিমা ট্রতিমা ছাড়!"

ভাবিলাম বুঝি এ বিদ্রূপ
শুনিয়া যা হোক থামিল চোর,
বদল হইল মুখের রূপ
ঝরিতে লাগিল নয়ন লোর!

হঠাৎ থামিল কলেজ 'বাস,'
অমনি আবার সর্ব্বনাশ,
বাহির করিয়া দন্ত সব,
দেখিনু ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস!
ইচ্ছা করিছে একটি ঠাস্
চড়েতে তাহার ভাঙাই ঘোর!

রূপসীর প্রতি

বরবর্ণিনী অতখানি তুমি দিওনা ধরা
সম্বৃত হও, আর একটুখানি আড়ালে থাকো
তুমি নও জেনো, স্বপন তোমার পাগল করা
ওগো সুন্দরী, রহস্যলোকে নিজেরে ঢাকো।

ও বরতনুর নয়ন ভোলানো মহিমাগুলি
যখন তখন যেখানে সেখানে খোরোনা তুলি
গোপন যে কথা সরমে মরমে উঠিছে দুলি
স্পষ্ট করিয়া নাই বা বলিলে—গোপনে রাখো
স্বপন কুহেলি ছিঁড়িয়া বাহিরে এসো না ভুলি'
স্বপন ভাঙিলে গুমোর তোমার টিকিবে নাকো ॥

দুর্লভ ছিলে : তোমার পায়ের নখর হেরি
মুগ্ধ কবির লেখনী রচিত কত স্তব
কোথা সেই কবি ? আজ দেখিতেছি তোমারে ঘেরি
দালাল দোকানী খরিদ্দারের মহোৎসব।

সুলভ তোমার প্রকাশ আজিকে রূপসী, অয়ি,
সিনেমায়, নাচে, বিজ্ঞাপনেতে লাস্যময়ী
ভাবিছে পশুটা এতদিনে আমি হয়েছি জয়ী
বস্তা বস্তা রূপসী মিলিছে—সস্তা সব।
ভীড় বাড়িতেছে : মনের মানুষ মিলিল কই ?
কহ বিজয়িনি কেন শোচনীয় এ পরাভব।

অক্ষম

লেখার তাগাদা দিতে ভাই
তোমাদের কোন দ্বিধা নাই।
পোষ্টকার্ড কিম্বা খামে
নানাবিধ লেখকের নামে

ঠিক বা বেঠিক
মিষ্টিক, কমিউনিষ্টিক
রিয়াল বা আইডিয়ালিষ্টিক
যে যেখানে আছে
সকলের কাছে
এক একটি চিঠি ছাড় তাই।
আমরা যে লেখা কোথা পাই
সে কথা ভাব না একবার
মনে হয়—ওইরে আবার—
আসিছেন দশভূজা আস্ফালিয়া দশ-প্রহরণ
কি উপায়ে করা যায় শির-সম্বরণ !

তোমাদের তাগাদার চোটে উর্দ্ধশ্বাসে
গল-লগ্নী-কৃতবাসে
হাজির হইয়াছিনু কল্পনা মন্দিরে
হতাশা-বিধ্বস্ত-চিত্তে আসিয়াছি ফিরে।
বন্ধ কপাট সেথা—দ্বারে খাড়া দ্বারী !
শুনিলাম মুখে তাঁরই
হয়েছে বিপদ
কল্পনার শ্রীপদে শ্লীপদ
লাম্বেগো কোমরে
নাচিতে অক্ষম তিনি ভুলাইতে পাঠক-ওমরে

আমি জানি ওটা ভান।
যে তাণ্ডব-নৃত্য তিনি নাচিবারে চান
ঝটিকা-ঝঞ্ঝনা-ছন্দে, সমুদ্র-মন্থন-লাস্য ভরে
এ আসরে

সে নাচ নাচিতে মানা,
দ্বীপদের করিয়া বাহানা
সরিয়া আছেন তাই বন্ধ করি' দ্বার
এখন খ্যামটা নাচে রুচি নাই তাঁর।

অথচ তোমরা ঝাঁকে ঝাঁকে
সিনেমা দেখার ফাঁকে ফাঁকে
ডালমুট কিনে,
অথবা ক্যান্‌টিনে
অর্দ্ধ-নগ্ন তন্বী-হস্তে চা পান করিয়া সমাপন,
অথবা সারিয়া কোন 'সোশাল ফাংসন,'
ভিখারীর ভীড় ঠেলে বাজাইয়া মোটরের হর্ণ,
এড়াইয়া মিলিটারী বাঁচাইয়া আঙ্গুলের corn,
পার হয়ে 'কিউ',
ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে—রামা শামা ইউ—
সুরসিক সিগারেট-মুখ
সাহিত্য-চর্চ্চার লাগি' রয়েছ উৎসুক।
শুয়ে বিছানায়
সুরঞ্জিত পূজা-সংখ্যা মাসিকের রঙীন পাতায়
কাহিনী গিলিতে চাও প্রেম-তুলতুলে
ঘুমে ঢুলে ঢুলে।

বুঝি অবস্থাটা।
ঘা রয়েছে দগদগে কাটা
অবিশ্রান্ত পড়িতেছে নুন
কি মজা কি মজা বলি' হাসিয়া হইতে হবে খুন

তবু তোমাদের নাকি,
উড়াইয়া পচা তাড়ি, জড়াইয়া রঙ-মাখা সাকী
হুল্লোড়ে মাতিয়া তাই থাক ভরদিন,
ক্ষুব্ধ-চিত্তে কাব্য-মরফিন
খুঁজে ফের আনাচে কানাচে
সকলের কাছে।

থাকিলে দিতাম ভাই—আপত্তি ছিল না
কিন্তু হায়, কল্পনা যে আমোল দিল না।

ভৌতিক

[শ্রীভূতনাথ ভড় একজন অতি-আধুনিক কবি। তাঁহাকে একদিন 'প্রভাতের শিশির' বিষয়ক একটি কবিতা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করাতে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সঙ্গে একটি কাগজের টুকরায় লেখা ছিল—'আপনার জন্য সুবোধ্য করিয়া লিখিলাম।' তথাপি কিন্তু আমার মাথায় কিছুই ঢুকিল না। অতি-আধুনিক-কাব্য-সমালোচক বহু ডিগ্রীধারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হর্ষোৎফুল্ল মাইতি মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি অনুগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে টীকা লিখিয়া দিয়াছেন। পড়িয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা একা ভোগ করিয়া সুখ হয় না, সেই জন্য আপনাদেরও আহ্বান করিতেছি—আসুন, ধন্য হউন।]

নব দূর্ব্বাদল-শীর্ষে আকম্পিত শিশির-কণিকা—
রাবীন্দ্রীয় ভাষায়, ক্ষণিকা!
আমি আধুনিক কবি,
এই ছবি

মোর চক্ষে দীপ্যমান হয় নব-রূপে
শতাব্দীর কূপে
যে কূপমণ্ডুক
আপিঙ্গল হর্ষোচ্ছ্বাসে নিজ দুঃখ সুখ
রোমন্থন লাগি
ধ্যানমগ্ন কর্কটেরে করেছে বিবাগী,
বর্ষা স্ফীত তারই অহঙ্কার
বারম্বার
উদ্বেলিত করে বারি রুষে,
যেথা মরে ফুঁসে
(সন্ধানিয়া শঙ্খচিল-ছল)
পল্লব-আগ্রহী লক্ষ বাদুরের দল,
উৎসারিয়া ম্যমির মিনারে
(ভূর্জ্জ-মুগ্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়ন-কিনারে)
টেরোডাক্‌টাইলের অতীত-ভবিষ্য-লক্ষ্য
অধুনা-বিলুপ্ত-পক্ষ
যার বাণী
বলে, সাজো—সাজো
হে মালকোষ, এরোপ্লেনে বাজো
কমিউনিজম-ক্ষুব্ধ বাজো মধুটুসি
তন্দ্রালু পতঙ্গ-বক্ষে বাজো মহাখুশি
বাজো সব, কোন ভয় নাই
দন্ত-হীন হে দন্তুর, ফোঁপরা ফাস্তুসে মার ঘাই'
নির্ব্বিশেষে পার যতক্ষণ
গিরগিটির পুচ্ছ-প্রান্তে ই-বোটের তোল শিহরণ।
বল তুমি বল হে বিদ্রোহী

পাংশু নিদ্দা সহি
শিশিরের ক্ষুদ্র বুকে শালিকেরা হেরে বিশ্বরূপ!
সহসা নিশ্চুপ…
নিঃশেষ হইয়া আসে নাৎসীর ধূপ
শতাব্দীর কূপ!
পর্ব্বত সমুদ্র নদী খাল বিল খানা ডোবা চর
সমস্ত ধূসর।

[টীকা: স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, কবি এখানে শতক্রন্দীর কথা চিন্তা করিতেছেন। নিজস্ব আধুনিক পদ্ধতিতে শতক্রন্দীর এমন বর্ণনা অন্য কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই।]

ধূসরের আধূম্র নীলিমা
অতিক্রমি হরিদ্রাভ সীমা
আকপিশ গোলাপীর তীরে আসি থামে
বল্লরী-বল্লভ-দেহ ভিজিয়াছে ঘামে।
কহে বারে বারে
'ঘোলা জলটারে
থিতাইতে দাও'
এ বাণী যে বলেছিল নহে সে ফারাও!
চেনো তারে?
লাউৎজেরে?
জরথুস্ত্র হাসে অট্টহাসি
সে হাস্যে উচ্ছ্রিত হয় শড়া, গলা, বাসী
(আহিরমন্ ভয়ে কম্পমান)
আগ্রহ-তৎপর বজ্র করেছিল যার অবসান
চেনো তারে?
হেরিছ নীহারে॥

প্রায়-মানব, ভঙ্গশীলা, শব্দব্রহ্ম, সাকী হে শর্করা
(সাবেক 'পুরাণ' লয়ে আধুনিক বাজারে দর করা।)
চন্দনিত শিব-লিঙ্গে অন্ধভক্তি গন্ধ-বণিকের
নহে ক্ষণিকের
নহে আবশ্যিক
আবার ধূসর চারিদিক।

[টীকা : ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর orville Wright একটি বাই-প্লেনে প্রথম আকাশ-যাত্রা করেন ১২ সেকেণ্ডের জন্য। এই ঘটনাটির আভাস যদিও উক্ত লাইনগুলির ফাঁকে ফাঁকে আপনারা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, কবি তাঁহার অনুপম ভঙ্গিতে 'Mendelian conception of gametic differentiation'কেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন।]

পুনরায় দেখা যায় কচি কচি আলো
(ঈষৎ পেট্রোল গন্ধী, আতপ্ত,প্যাঁচালো—)
মাইরি মোহন দ্বীপ
জিপ্ জিপ্ জিপ্ জিপ্
হাঁসের বাসর-ঘরে হাঙরের হাসি !
হরিকেলে বাস করে আসি
ইচিং—চৈনিক
জ্ঞান-মার্গী আজব সৈনিক
অতি দূর সপ্ত শতাব্দীর !
পাঞ্জাবি আব্দির
মান-রক্ষা করে যথা জাল গেঞ্জিগুলি,
নাতি-শীতোষ্ণ পুলি
পিসীমার,
জীবন-বীমার

অন্তর্লীন আত্মা জেনো ডাক্তার তেমতি,
ডিগ্রী-ডাহুকেতে চড়ি এরা নাহি হ'লে শুভ-মতি
ঘনিষ্ঠ ঘুণেরা আসি সাফ ঝাঁপতালে
নিঃশেষ করিয়া দিত জালা-ভরা চালে,
খঞ্জ নাহি হইত খঞ্জন
কাদাখোঁচা হইত না কর্দ্দমরঞ্জন,
শফরী-নয়না কভু নাহি হ'ত গবাক্ষ প্রেয়সী
মৃত্যু-মুখী মোটরেতে বসি।
হাসিতেছে ধাঙড় মুস'র
সমস্ত ধূসর।

[টীকা: এই অংশটিকে মন্ত্র-সপ্তকে Pataeozoic বলা চলিতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু মূল সংস্কৃত রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডের সহিত তুলনা করিলে এই অংশটাই জিতিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। শঙ্করাচার্য্য এবং কন্‌ফ্যুসিয়সের বিখ্যাত উক্তিগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য]

ধূসর কুয়াশা পুন কাটে
বসি মহাকাল-খাটে
চালাইয়া ত্রিকাল-কঙ্কতী
জটা সংস্কারে মন দিয়াছেন ধূর্জ্জটি সম্প্রতি।
কঙ্কতিক-ভরা
অসংখ্য উকুন পড়ে ধরা
জেপেলিন, এরোপ্লেন কিলবিল করে ঝাঁকে ঝাঁকে
কঙ্কতিকা-দন্ত ফাঁকে ফাঁকে ;
ক্ষিপ্ত মহেশ বুঝি হয় নটরাজ !
'চোখ-খেকো, নাই তোর লাজ'
উদ্যত করিয়া ঠোনা কহিল কল্পনা
'স্পর্দ্ধা তোর দেখি তো অল্প না।

ভাল ক'রে দেখ আরবার
একি কারবার !
উক্ত চিত্র উক্তভাবে সে-কালীয় কবি দেখিবেন।
তুই দেখ যেন বিগ বেন
ভাগ্‌নরীয় উচ্ছ্বাসেতে মধ্যরাত্রি করিছে ঘোষণা ;
সে ক্যাপিট্যালীয় ছন্দ মরম-শোষণা
প্রোলিটারিয়েট-মার্কা পুকুরের ধারে
আছাড়ি পড়িছে বারে বারে
বুর্জোয়া-ভঙ্গিমাভরে আথালি-পাথালি,
(নিষুতি নয়ন 'পরে নিদালি রাতালি)
বোকনো মাজিবার ছলে যেথা আবলুশিকা
চতুরা মূষিকা
নিত্য ফেলে কাটি ;
মর্ম্ম-পেটিকাটি ;
যে রক্ত-গোধিকা
ধরণী-শোধিকা
যে স্বর্ণ-দর্দ্দুর
স্বর্ণকার-দর্প করে চুর,
এরা তুচ্ছ যার কাছে
তুই দেখ তাহার ছোঁয়াচে
জল স্থল অন্তরীক্ষ বিশ্ব চরাচর
সমস্ত ধূসর।'

[টীকা : মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ নাম দিয়া বিবেকানন্দ ১৫৬ পৃষ্ঠাব্যাপী যে চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াছেন, তাহা কত সংক্ষেপে কত সুন্দরভাবে এবং কত নূতনত্ব সহকারে বলা যায়, এই লাইনগুলি পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে। ইহা ছাড়া, কবি-মনে সাধারণ বস্তুনিচয়

sublimated হইয়া যে কি অপরূপ অদ্ভুত আকার ধারণ করে, তাহাও এই অংশটিতে দ্রষ্টব্য। Theory of Relativity, fourth dimension, pre-existence of time সমস্তই কত সহজে ব্যক্ত হইয়াছে !]

ধূসরের যবনিকা কে আবার তোলে !
পুনরায় দোলে
বিনতা-অগুজ মায়া
অসমাপ্ত অরুণের কায়া
বরুণের বাষ্প-দেহে তুলিতেছে কিজিন্ন ফচলায়ে।
দেখিলে কচলায়ে
যদিও ধূসর সব
মাঝে মাঝে তবু যেন করি অনুভব
অধূসরও আছে কিছু এই ধরণীতে।
সরণীতে
শরাবখানায়
'ভিব্‌জিওর' মাঝে মাঝে হয়তো মানায়।
আমি কিন্তু কভু তারে করি না স্বীকার
মধ্যবিত্ত এ রুচি-বিকার
নহে মোর মজ্জাগত,
ক্রথনক-শঙ্কাহারী আমি জয়দ্রথ
প্রতিবাদ অনিবার্য্যের,
ফুলঝুরি-বেড়া-দেওয়া বুটিদার কারুকার্য্যের
আমি কর্ত্তা করণ কারক,
হায়েনার বুকভরা থুক কাসি আমার স্মারক।
শ্যামল উষর
মোর কাছে সমস্ত ধূসর।

[টীকা : মুচুকুন্দফুলের সৌরভে যাঁহারা মুগ্ধ হন, তাঁহারা এই অংশ-টুকুর অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। মঙ্গলগ্রহে ইউরোফোনাস ফস্‌ফরিকা নামে এক প্রকার গন্ধগোকুল জাতীয় প্রাণীর পুচ্ছাগ্র হইতে যে অপার্থিব সৌরভ নিঃসৃত হইবার কথা, কবি তাহারই গন্ধে বিভোর হইয়া উক্ত পংক্তিগুলি রচনা করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বটে যে অবচেতন লোক হইতে বহির্মুখী ঈপ্সাকে চাপিতে গিয়া এই কাণ্ড হইয়াছে। তাহা যে সত্য নয়, তাহার প্রমাণ Frost control করিয়াও কবির কল্পনা Clyde Bank-এর Ship yard-এর অবস্থা প্রাপ্ত হইল কি করিয়া? নানাবিধ হায়াসিন্থ ফুলের বর্ণ-গৌরবও বা এমন মুন্সিয়ানার সহিত এই অংশটির প্রতি ছত্রে প্রকট করিলেন কি করিয়া যদি ইউরোফোনাস্ গন্ধ-মদিরা তাঁহাকে বিহ্বল না করিয়া থাকে!]

ঈষন্ন্যাকা কোকিলের খানদানি ক্ষোভ-ক্লান্ত স্বর
ফ্যাকাশে ধূসর।
সে ধূসরে ব'সে আছে কাবুলিয়া মেনি
পিচুমর্দ্দ-শাখে বসি কাঁদে যাজ্ঞসেনী।
বাজায়ে রবাব
রাহু খায় চাঁদের কাবাব :
আমরুল-চাপ
রোধ করে অ্যামিবা-প্রতাপ :
কিসের আশ্বাসে
পাণ্ডবেরা হাসে!
অপরাহ্ণ গত
বৃষ্টি পরে ছোবলের মত।
সন্ধ্যা নামে
ট্রামে।
যাযাবর কাকে!

পাউডার-পাকে
সিনেমা-সখীরা হাঁচে
অলিম্পিক নাচে।
ঠারেঠোরে
পাখা ঘোরে।
মেকি বেঁকি চুড়ি পরি ঢেঁকিতে পা দিয়া
এক্সের প্রিয়া
এক্স ছাড়া সকলেরে করে আবাহন
বাঁজায়ে কাঁকন ;
ঝাঁকে ঝাঁকে
হুঁকা ডাকে।
কম্বুকণ্ঠ মিতা
অসীম আগ্রহে খোঁজে ফিতা
বাণীহীন বাণীকণ্ঠ লাগি,
লণ্ঠনের ফিতা নাই অন্ধকারে রয়েছে সে জাগি।
মরে হেসে ডাক-টিকিটেরা
উকিল মক্কেল করে জেরা।
ফলসাগাছের বাঁকে
ঝাঁকে ঝাঁকে
মাছের ছানারা
চেলো-যন্ত্রে বাজায় কানাড়া।

[টীকা : Xenophone স্মরণ করুন।]

নৈঋত উৎসাহভরে জম্বুক অশ্লীল হয় ,
অবিমিশ্র ভয়
হয় তিক্ত
হয় সিক্ত।

নিরঙ্কুশ নভস্থলে
শ্রেণীবদ্ধ আরসোলা সামরিকভাবে উড়ে চলে
লক্ষ লক্ষ সারে সারে
গুজব বাজারে
নারীরে করিতে জব্দ পৃথিবীর ক্ষিপ্ত পুংগণ
ছাড়িয়াছে অগণন
সুদক্ষ আরসোলা।
ব্যাঙ কোলা
শিক্ষা লভিতেছে বসি গুপ্ত কোন শিবির-ভিতরে
বাহিরিবে পরে।
অতি-সান্ত বেদান্তের অপূর্ব্ব চিন্তন!
মিল ও অমিলে চলে চুলাচুলি দ্বন্দ্ব চিরন্তন
বাসী গজকচ্ছপীয় সুরে,
হে কাশ্যপ, আছ কত দূরে!
হেনকালে রগ-প্রান্তে
বিয়াত্রিচে সহ আসি বসিলেন দান্তে।
ইতালীয় গোনাডের ঝড়ে
রগ ছিঁড়ে পড়ে।
মুখ বুজি
মনীষা-ঠেকনো গুঁজি
রুখিলাম তাহা।
তারপর দেখিলাম, আহা,
বিয়াত্রিচে-আঁখি দুটি, মাই গড, গুজরাটি-ধূসর!
সুষমা-সু-শর।
নাতিদীর্ঘ ধূসরের আমন্থর পট-ভূমিকায়
জাগে কবি

খোশামোদ-লোভী।
ভি শার্পে শোনা যায় বাস্তুঘুঘু-স্বর
"আমি আছি, ভয় নাই যাহা খুশি কর—"
দেখিলাম শেষ করি লিখা
নব দূর্ব্বাদল-শীর্ষে শুকায়েছে শিশির-কণিকা।

[টীকা : ইকনমিক্সের সহিত জুওলজির প্রকৃত সম্পর্ক কি এবং সে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও কি করিয়া আলুচাষ করা সম্ভব, তাহাই এই অংশটুকুর মূল বক্তব্য।]

জেমস জইস

নীল টুকরো জানলার জাফরি খানায়
কাশ্মীরী শাল, বাতাবি, চাবির রিং,
ফিকে হাসি মেস জানে সে জানত না
আদা কবীর আর কাদা কাদা ঘি
চলতে হবে

জাবালি ছিল এসে এবং উপরন্তু কমা
নতুন ছি ছি অ্যানাটমি সেমিকোলনের
কবে কবে চলছি নাকচ তাবৎ দুর্দ্ধর্ষ
শ্যাম্পেন চুণকাম ফিরিস্তি বাদুশাই
যাচ্ছে যাচ্ছে

নবীন বাদামী পুরু কবুলতি-কশাই
রিকসা গণিকা নিরন্তর অস্থি-লোপ
চব্বিশ-ঘণ্টা ঘণ্টা চব্বিশ ওঁলটানো
ফাঁকি কিনারা ইসারা পঁচিশ শিলিঙ
চলছে সে

তাৎক্ষণিক

(বীজ-রূপ)

সংবাদ-ক্লান্ত মানস-লোকে
বৃহদারণ্যকীয় যাজ্ঞবল্ক্যোদয়,
চাটনি·।
ঘেউ ঘেউ ঘেউ—
আ-টেরিয়র শুন।
উত্থান
(ঈজি—চেয়ার থেকে)!
ডোরা-ছিটের ফতুয়া-ঢাকা পিঠ,
নেপথ্যে জীর্ণ ক্যাম্বিস জুতো।
কানের পাশ দিয়ে
তোবড়ানো-বালতির কানা-দর্শন!
সে······
পিড়িং
চড়ুই পাখী।

ফরফর
রঙীন কাগজ।
…ঘুড়ি, ছেলেবেলা, অমূল্য পণ্ডিত,
অমূল্য উকিল, বত্রিশ টাকা, অচল টাকা,
বাজার—
কাঁচকলা, উচ্ছে, লাউ, শসা, শিম।
জ্যাঠামশায়, বহুমূত্র, ডাক্তারের ফী।
ট্রিং ট্রিং…সাইকেল,
হুড়মুড়…গরুর গাড়ি,
এক জোড়া ছুটন্ত ছোকরা ষাঁড়
হেতু পা,
ন্হাঁ ন্হাঁ ন্হাঁ।
ড্রেন-ঘেঁষা দিলদার মিঞা
বয়েত, আতর, ফাহা।
দুঃসময়,
গ্রীবা-চালনা।
(যাজ্ঞবল্ক্যীয় ঘাই!)
প্রায়-নগ্ন নারী—
ছবি, বিজ্ঞাপন, বাঁধানো, টাঙানো।
ঝোঁটা মার, ঝোঁটা মার, ঝোঁটা মার—
(যাজ্ঞবল্ক্য ডুবলেন)
পাশের বাড়ি।
দুটি ছবি
তন্বী, তম্বুরী
বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে।
ছড় ছড় ছড় ছড়— বাচো ধাক্কা—

একার সারি—
উকিল, মোক্তার, মক্কেল,
শিক্ষক, ছাত্র, কেরানী……
দৃষ্টি পরিবর্ত্তন—
কুশনের ময়লা ওয়াড়,
ধোপা, সোমবার, ক্লাব,
এইচ, জি, ওয়েল্‌স
নোম্যাড্‌স, সাম্রাজ্যবাদ, পুরোহিত,
বিজ্ঞান।
খুট্—
পিওন,
দাড়ি-নেই নিরীহ-গোছের মুসলমান।
চক্ষু-চড়কগাছকারী চিঠি!
সদলবলে জনার্দ্দন।
গৃহিণী,
রাঁধুনি,
(যাজ্ঞবল্কের পুনরুক্তি)
আদেশ।
উৎপাটিত-গাত্র ভৃত্য,
রোদের ফালি,
ক্যাম্বিসের জুতো শুকানো।
অভিনেত্রী
সবুজ ঘর,
আভ্যন্তরিক অপ্রস্তুতি,
ছি—ছি—।
কর্ণকণ্ডুতি—সহসা

আঙ্গিক আকুতি।
কনিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস,
আপেক্ষিক পরিধি-সঙ্কট।
কাঠি চাই...... ।
পাঁচ মিনিট্।
শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু,
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন,
তাৎক্ষণিক।

(বৃক্ষ-রূপ)

বৃক্ষ-রূপ, মানে ব্যাখ্যা-রূপ
অসংস্কৃত অনাধুনিক প্রাকৃত
পাঠক-সম্প্রদায়ের জন্য।
বিদগ্ধ-সমাজে
বীজরূপই যথেষ্ট রসোদ্বেলক।
সংক্ষিপ্ত অক্ষর-বাহিত ভাব বীজ
উপ্ত হয় মস্তিষ্ক-টবে
দৃষ্টির মারফৎ।
সার যদি থাকে,
যদি থাকে হৃদয়-তাপ,
সময়-মাফিক স্বতঃই
অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত হয়
সিজন্-ফুলদল।
বৃক্ষ-ব্যাখ্যা তাদের জন্য,
যারা অমাবস্যার অন্ধকারে

পূর্ণিমা-চাঁদ-রুটি
রস-ঝোলে ডুবিয়ে খেতে পারে না
কায়দা ক'রে।
ইতি ভূমিকা।

ফরফর ক'রে উড়ছিল
খবরের কাগজের পাতাগুলো ;
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আর যুদ্ধ—
চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ক'রে ক'রে
মানসিক রসনা হতস্বাদ,
দন্ত ক্লান্ত।
ঔপনিষদিক চাটনি চাটলে
যদি কোন ফল হয় এই ভেবে
ঈজি-চেয়ারে শুয়ে
বৃহদারণ্যকের গুরু-গম্ভীর আবহাওয়ায়
তা দিচ্ছিলাম যাজ্ঞবল্ক্য-ডিম্বে।
ঘেউ ঘেউ ঘেউ—গররররর
ডেকে উঠল ট্যাস টেরিয়ার কুকুরটা !
উঠলাম,
উঠতেই চোখে পড়ল চাকরের পিঠ
ডোরা ছিটের ফতুয়া-ঢাকা !
মানস-নয়নে দেখতে পেলাম,
নেপথ্য-বিহারী ক্যাম্বিসের
জুতো-জোড়াকে
খড়ি মাখানো হচ্ছে।

চাকরের কানের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে
তোবড়ানো বালতির কানাটা।
মনে পড়ল তাকে
যার জন্যে কানাটা তুবড়েছিল একদিন,
সে······
সে ভেসে গেল
নবাগত তরঙ্গ-তাণ্ডবে।
নাচতে নাচতে ছুটে এল
পিড়িং ক'রে চড়ুই পাখী,
ফরর করে রঙিন কাগজের টুকরো
মনে পড়ল ঘুড়ি, মনে পড়ল ছেলেবেলা,
মনে পড়ল অমূল্য পণ্ডিত ;
তারপর অমূল্য রায় উকিল
বত্রিশ টাকা দিতে হবে তাকে !
টাকা—
একটা টাকা চলে নি আজ বাজারে।
বাজার—
কাঁচকলা, উচ্ছে, লাউ, শসা, শিম।
এসব ছাড়া জ্যাঠামশায়
আর কিছু খান না
বহুমূত্র,
ডাক্তার আসে,
ফী চায়।
ট্রিং ট্রিং ট্রিং
(দৃশ্য বদলাল,
সচেতন মনের পালা এইবার)

সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে গেল সাইকেল ।
তারপরই
হুদ্দাড় হুড়মুড় ক'রে একটা গরুর গাড়ি,
এক জোড়া যুবক বলীবর্দ্দ উন্মাদ হয়ে
ছুটে চলেছে।
না ছুটে উপায় নেই
অভিজ্ঞ গাড়োয়ান
পুচ্ছের পাশ দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে
খরখরে পা৷
নিরুপায় নাভি-নিম্নে,
জিহ্বা তালু এবং নাসা সহযোগে
অমানুষিক শব্দ করছে
ন্‌হাঁ ন্‌হাঁ ন্‌হাঁ ।
ড্রেনের ধার ঘেঁষে
ত্রস্ত হয়ে সরে দাঁড়াল
দিলদার মিঞা,
মখমলী গোল টুপি,
কালো পারসী কোট,
কেয়ারি-করা পাকা দাড়ি
আতর ফেরি করে ।
চোখোচোখি হ'লেই
আদাব ক'রে
হাসিমুখে এগিয়ে আসবে এক্ষুনি,
ফাহা ক'রে আতরের নমুনা দেবে,
আওড়াবে ফারসী বয়েত
এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়তো

কিনিয়ে ছাড়বে কিছু।
দুঃসময় যাচ্ছে,
ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলুম।
চোখে প'ড়ে গেল
(অবচেতন মনে যাজ্ঞবল্ক্য ঘাই মারছে)
চোখে প'ড়ে গেল
অনাবৃত-দেহা
কুব্জ-ভঙ্গিনী মেয়েটিকে,
মানে মেয়ের ছবিটিকে
বিজ্ঞাপন এসেছিল,
বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছি।
(মরিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ফুটি ফুটি করছেন)
ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার
পাশের বাড়ীর কর্ত্রী।
(যাজ্ঞবল্ক্য ডুব মারলেন
অচেতন মানস-পাথারের অতল থেকে
আবির্ভূতা হলেন সচেতন রঙ্গমঞ্চে
খড়কে-ডুরে-পরা
মৃদুহাসিনী
তন্বী একটি,
এবং তার পাশেই গহনা-গ্রস্তা
জমকালো বেনারসী-পরা
বীভৎস-কান্তি
গলদঘর্ম্মা
আর একজন।
একই ব্যক্তি—

প্রাগ-বিবাহ, বিবাহোত্তর।
ছড় ছড় ছড় ছড়
বাচো ধাক্কা—বাচো ধাক্কা—
উকিল মোক্তার মক্কেল
শিক্ষক ছাত্র কেরানী
সুস্থ অসুস্থ
রসিক বেরসিক
সকলকে বহন ক'রে ছুটে চলেছে
এক্কার সারি।
কেমন যেন শিরশিরিয়ে উঠল
পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত,
দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।
নিতেই
চোখে পড়ল কুশনের ওয়াড়,
ময়লা হয়েছে,
ধোপা সোমবার—
সোমবারে ক্লাবে বই ফেরত দিতে হবে
এইচ. জি. ওয়েল্‌স
নোম্যাড.স, সাম্রাজ্যবাদ, পুরোহিত,
বিজ্ঞান……।
খুট—
পিওন ঢুকল।
লোকটা মুসলমান,
কিন্তু ঠিক যেন হিন্দু
দাড়ি নেই,
নিরীহ চেহারা।

চিঠি দিয়ে গেল,
চিঠি পড়ে চক্ষু চড়কগাছ—
সদলবলে জনার্দ্দন আসছে পরশু,
এক সপ্তাহ থাকবে।
ফুটে উঠল মানসপটে
ক্রোধ-কুন্ত হাস্যমুখ গৃহিণী-আলেখ্য,
পলাতক মৈথিল রাঁধুনিটাও
আবছাভাবে।
(যাজ্ঞবল্ক্য আবার উঁকি দিচ্ছেন)
চাকরকে আদেশ করলাম,
ওরে, বামুন দেখ একটা এখুনি
গাত্রোত্থান করলে বেচারী,
খড়ি-মাখানো ভিজে ক্যাম্বিসের
জুতা-জোড়াকে
রোদের ফালিটুকুতে শুকুতে দিয়ে
চ'লে গেল।
জুতো-জোড়ার পানে চেয়ে
অপ্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ল
অভিনেত্রীদের—
গ্রীনরূমে।
না না, ছি ছি
আলজ্জিত হলাম মনে মনে।
হঠাৎ সুড়সুড়িয়ে উঠল কানের ভেতরটা,
ঢোকাতে চেষ্টা করলাম কড়ে আঙুল
কানের গর্ত্তে।
গর্ত্ত ছোট,

আঙুল মোটা
আকুল চিত্তে উঠলাম
কাঠির সন্ধানে

শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুর ব্যাখ্যা অনুসারে
লিখলাম এই কবিতা।
বলেছিলেন তিনি,
আমাদের সচেতন ও অবচেতন মনে
প্রতি মুহূর্ত্ত যে ছাপ এঁকে যায়
তার অকুণ্ঠিত যথাযথ প্রকাশই
আধুনিক কাব্যের লক্ষণ,
সাজিয়ে গুছিয়ে বলাটা সেকেলে কাণ্ড।
পাঁচ মিনিটের ছাপ আঁকলাম
এই কবিতায়!
এর নামকরণ করেছেন
শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন
তাৎক্ষণিক।

বকিতা

ক্ষমা করুন ১৯৪১ দেবী,
খিলছি বকিতা
(কবিতা লিখত সেকালে)
কে ÷ তুমি ?

ইস { কু (জল ÷ জ) } পালানো (ম × ন) নিয়ে
খেদেছি খোচ
(চোখ দেখত সেকালে)
ব্লাক জাপান ? না,
বিস্‌মার্ক ব্রাউনও নয় !
সি [একার × মণ্ট] ক × আকার × লো।
Log উনমন
Tan উসখুস
তা ছাড়া
$\sqrt{\text{সে – নয় – তবু – সে}}$
রোদ – ০
জ্যোৎস্না + ?
প্রদোষ × !
এবং···অথচ – রেকারিং !
মিয়ঁ, না মিয়, 'মিয় ?
যাই হোক
(আমি + তুমি)²
=
আ² মি² + তু² মি² + ২ আতুমি²
এর মার নেই।
অবশ্য
(আমি × তুমি) ÷ সমাজ
অথবা
(এক্‌স – তাহারা) ÷ রাষ্ট্র
গোলমাল বাধাবে একদিন।

কিন্তু
আকাশ-গলিতে শোনা যাচ্ছে ঘড়ঘড়ানি
এরোপ্লেন-ছ্যাকড়ার :
এল ব'লে
প্যারাশুট-মার্কা আবেগে
তাই
হে ১৯৪১ দেবী
খোচ খেদে খিলছি বকিতা !

চকোর-শিক্ষা

আকাশে আকাশে টো-টো ক'রে আজও জ্যোৎস্না করিস পান ?
ছি ছি রে চকোর-দল,
নেহাত পুরোনো সাবেক সেকেলে ধাঁচা।
যা বলছি বাপু, মন দিয়ে শোন্,
ইজ্জতটাকে বাঁচা।
জ্যোৎস্না খাবি কি !   'লাপসি'-ভোজন করি সমাপন
কলের জলেতে আঁচা।
তারপর ছুটে চল্
সেলুনেতে ঢুকে দাড়ি-ফাড়িগুলো চাঁছা,
ল্যাজ-ফ্যাজগুলো ছাঁটা,
তার পর সেটা নাচাতে চাস তো হিসেব-মাফিক নাচা।
বুকে-পেটে-পিঠে লেবেল-টেবেল সাঁটা।

তার পর গিয়ে শিক্ষা নে

ভিক্ষা নে

দীক্ষা নে…

টানতে শেখ্, মানতে শেখ্,

শুষতে শেখ্, ভুসতে শেখ্,

হাফপ্যাণ্ট্ প'রে নানান নামতা ঘুসতে শেখ্।

তার পর ?

কর ফরফর, নয় ফড়ফড়।

উড়তে চাস তো ডানা দুটো মুড়ে লাফিয়ে চড়—

রয়েছে 'প্লেন

ষ্টীমার ট্রেন

বাইক কার

চমৎকার

(কিনবি ? আমার রয়েছে একটা নতুন 'বুইক্'।)

উড়তে উড়তে বাট্‌নহোলের কিস্-মি-কুইক

মাঝে মাঝে শোঁক্

পিড়িং পিড়িং ভোঁ পঁ্যাক পোঁক

বাজনা বাজা—

ওরে ও খাজা

জরদগব ভব্য হ

কাগজ পড়, 'ইজম' শেখ্, সভ্য হ।

জানেন ?

"জানেন ? আমরা সিংহ ছিলাম
মধ্য এশিয়া দেশে,
যদিও এখন আঁদাড়ে পাঁদাড়ে
ঘুরিতেছি এই বেশে
চক্ষে মোদের থাকিত আগুন,
মাথায় কেশর-তাজ,
নখরে জ্বলিত ছোরার দীপ্তি,
কণ্ঠে বাজিত বাজ।
লম্ফে লম্ফে হতাম আমরা
গিরি মরুভূমি পার,
থাবার আঘাতে মেরেছি কতই
হাতী ঘোড়া গণ্ডার।
জানি না মোদের পূর্বপুরুষ
কিসে যে ভুলিয়া গেলেন,
খাইবার পাস অতিক্রমিয়া
এ দেশে চলিয়া এলেন।
বহু শতাব্দী এই পোড়া দেশে
বাস করিবার পর
এই দশা হায় হয়েছে মোদের
কণ্ঠে ফোটে না স্বর।
ধোঁয়ার ভয়েতে পালাই এখন,
পাখার বাতাসে ডরি,

আঁধারে আড়ালে লুকাইয়া থাকি,
শিশুর চাপড়ে মরি।
এই দুর্দশা হয়েছে জানেন
জল-বাতাসের গুণে—"
কর্ণকুহরে কহিল মশক।
অবাক হইনু শুনে।

সোনাটা

অস্তিত্বের পাঁজরে লেগেছে ঘা।
নিরবলম্ব আত্মারামেরা
তবু ছাড়বে না
বাঁধা-বুলি কপচানো।

চূর্ণ আয়নার সহস্র কুচিতে
একই মুখ দেখি সহস্রায়িত হ'ল
"গেলাম, মলাম, দ্বার খোলো দ্বার খোলো"
আর্ত্ত ক্ষুধিত শাণিত গজল
আসমুদ্র-হিমাচল
গাইছে আব্রাহ্মণ মুচিতে—
কৃষ্ণ বিষ্ণু রাম শ্যাম—নিশ্চিহ্ন আরামে।
তাল কাটছে না
স্বয়ং বেতাল ডুগি বাজাচ্ছেন যদিও

মন্দ নয় এ সময় গ্রাম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মশার কামড়, পচাপুকুর, ঘেঁটুবন
বন্ধকী জমি, ভাঙা হাল, মরা মন
রোগা গরুর ল্যাজ ধ'রে আউস আমনের স্বপন
মন্দ লাগবে না নেহাত।
গজলের পর কীর্ত্তন উচিত জমা।
জমলেই কিন্তু খরচ
খচ খচ
তবু জমুক—আহা, জমুক!

জমেই আছে।
চোখে ছানি, সর্ব্বাঙ্গে খোস
জরাজীর্ণ দেদো খোলস,
গায়ে আত্মসম্মানের ছেঁড়া কাঁথা,
আশে পাশে গোবর, কেলে হাঁড়ি, তোবড়ানো হাতা
ভাঙা তক্তাপোশ
নেই কি?
গ্রাম-বুড়ি বিড় বিড় করে' কি আওড়াচ্ছেও যেন!

হয়তো রূপকথা—হয়তো প্রলাপ
হয়তো অভিশাপ,
হয়তো বৈদিক মন্ত্র,
মারণ-তন্ত্র হয়তো,
কিম্বা প্রলয়ঙ্কর যন্ত্রের স্বপ্ন-ছড়া কোনও
কিম্বা.........
হয়তো.........
ফুটকি ফুটকি ফুটকি এবং ফুটকি।

তবু আসল কথা হচ্ছে—হেঁ হেঁ—
আমরা আছি এখনও ঈশ্বরেচ্ছায়।
ভালই আছি
এবং আছে কোলাকুলি, মিষ্টিমুখ
প্রণাম, আশীর্ব্বাদ,
খাম, পোষ্টকার্ড,
গদ্য পদ্য॥
দন্তসার হাসিও ফুটছে কঙ্কালদের মুখে
বাহবা কি বাহবা!

ফুটবে বই কি!
সাবাস সাবাস—শতং জিউ।
মড়া কিউ,
"বাবারে বাবারে গেলাম মলাম"
টেক্কা, গোলাম
আসুক যাক বা থাক
আমরা যতক্ষণ আছি
বলবই কেয়াবাত, কেয়াবাত।

সমালোচনা

সরঞ্জাম যদি থাকে কালি-বুরুশের
সঙ্গতি যদ্যপি থাকে পূর্বপুরুষের
লেগে পড়
(নেপথ্যে—পড়েছি)

মাতৃগর্ভে জন্ম যার সেই তো রসিক
মাংস যদি পেয়ে থাক জুটিবেই শিক
খাশা হবে
(নেপথ্যে—হি হি)
লোভনীয় লেংগিই তো বীরত্বের ঠাট
লোপাট কাহারে করে অশ্বতর-চাঁট
ভেবো না তা
(নেপথ্যে—আরে ছুৎ)
চনমনে কখনও বা চটচটে চাটু
চর্বণ লেহন কর চরণ বা হাঁটু
জ'মে যাবে
(নেপথ্যে—হেঁ-হেঁ)
নাসিকায় তৈল দিও কানে দিও তুলা
নাভিতে আঁটিও বেল্‌ট্ পিঠে বেঁধো কুলা
বাস্।
(নেপথ্যে নীরবতা)

ইতিহাস

১

ভুতুয়ার বাপ ছিল কুতুয়া
বইত সে সাহেবের জুতুয়া
পেয়ে টাকা টন টন
কীর্ত্তির লণ্ঠন

জ্বালাল
লজ্জা শরম দূরে পালাল ;
এবং সে টাকাতে
জুতো-বওয়া কড়াগুলো ঢাকাতে
রইল না কোনও খুঁতখুঁতুয়া।

২

পটল তুলিল যবে কুতুয়া
গদি-সমাসীন হ'ল ভুতুয়া
খ্যাদসের শিরোমণি
দুনিয়াকে সরা গণি
হাসিল
অপরূপ ভঙ্গীতে কাশিল,
ভুতুবাবু যে-সে লোক নয় তাই
দিন-রাত শোনে 'জয় জয়' তাই
তিন পারিষদ সাথে রয় তাই
জল-উঁচু জল-নীচু, তুতু আ।

পিতার উক্তি

আরে আরে মশাই, বাঁচি সামলে গেলে
কার সঙ্গে জুটে কি যে কোথায় খেলে
বিগড়ে গেছে মাথা
জড়িয়ে গায়ে কাঁথা
খাচ্ছে খালি কচু ভেজে কলের তেলে।

বলছে থেকে থেকে,
চল্ না এঁকে বেঁকে,
সোজা চলিস কেন ?

ভাল করে হ্যাংচা !
বলছে ডেকে ডেকে
ভদ্রলোক দেখে
প্রণাম করিস কেন ?
ক্রমাগত ভ্যাংচা !
ফুলিয়ে রোগা ছাতি
বলে, মারব হাতী
দেখ না মেরেছি তো
মশা মাছি ব্যাং ছা
সাগর ফেলব শুষে
এবং ফেলব চুষে
চকোলেটের সঙ্গে
সরু মোটা ল্যাংচা।
আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন তো গিন্নি
বলুন দেখি দাদা, কোথায় মানি সিন্নি !

সপ্তক

১

সম্বলের শেষ প্রান্তে আসিয়া ধনেশ
পূজিল গণেশ।

২

"গ্যাং গ্যাং গ্যাং গ্যাং গ্যাং গো
ব্যাং মোরা ব্যাং মোরা ব্যাং গো—
দেখিলাম মন-চোখে
নব বিভীষণ লোকে
ভেক-ভেকী নাচিতেছে ট্যাঙ্গো।

৩

দধীচি হবেন নিজেই বৃত্র
কন কবিরাজ বায়ু বা পিত্ত
আজ যে শত্রু কাল সে মিত্র
চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র।

৪

একাকী করিতেছিনু ধানাই-পানাই
রেডিওতে আচম্বিতে বাজিল শানাই
বোতল বগলে দেখি চলেছে কানাই
আবার পড়িল মনে কেরোসিন নাই।

৫

বশিষ্ঠ মরীচি আর পাঁচটি সঙ্গীরা
(পুলহ পুলস্ত্য ক্রতু অত্রি ও অঙ্গিরা)
কোথা কোন্ তৈল দিয়া সপ্তর্ষি হলেন
গম্ভীরা সভায় বসি চিন্তেন পংখীরা।

৬

স্বর্গীয় সব বোমারুবৃন্দ প্ল্যানচেট মারফৎ
শুনিলাম না কি ফতোয়া করেছে জারি

অগ্নিযুগের তোমরা যাহারা আজিও প্রদীপবৎ
টিম টিম ক'রে জ্বলিতেছ সারি সারি
প্রবন্ধ লিখে সময় নষ্ট করো না আর
শুধু মনে রাখো কালো-বাজার কালো-বাজার
গা-ঢাকা-দেবার মতন সেখানে অন্ধকার
আগুন মার্কা তোমরা যে ধ্বান্তারি।

৭

প্রবীণ মাধব নবীন মাধবে কন
বাঁশী বাজাইও দুপুর বেলায় ঠিক
নবীন মাধব হাসিলেন ফিক ফিক
কোথায় যমুনা কোথায কীচক বন
কোথায় শ্রীমতী কোথা শ্রীমতীর মন
বৃথাই বাঁশরী বৃথাই গাহিছে পিক
রাধার নয়নে জাগে বোমা আণবিক
নবীন মাধব প্রবীণ মাধবে কন
ইউরেনিয়ম বল দেখি কত টন।

খিচুড়ি-প্রসঙ্গ

১

চালের ডালের বাছিয়া কাঁকর
হিমসিম খায় দাসী ও চাকর
'এটা দে ওটা দে এ কর্ তা কর্
মসলা আন্'

সারা রাজবাড়ি কম্পমান !
বসিয়া ছাতে
রাজার মহিষী খিচুড়ি রাঁধেন
নিজের হাতে ।

২

'পাক-প্রণালী'র পাতা উল্‌টান
ক্ষীর মেওয়া হিং ঘৃত জাফরান
হাতের কাছেতে যখন যা পান
ছাড়েন সব
হাঁড়ির ভিতরে মহোৎসব !
পড়িয়া বই
রাজার লাগিয়া খিচুড়ি রাঁধেন
রাজার সই ।

৩

মস্তকে পরি মুকুট কনক
সভায় ছিলেন প্রজার জনক
সহসা তাঁহার নড়িল টনক
—খিচুড়ি নাকি ?
গন্ধ পাইয়া পরাণ-পাখি
মেলিল ডানা,
রাজসভা ছাড়ি অন্তঃপুরে
দিলেন হানা ।

৪

বুড়া রাঁধুনীরে শুধান নৃপতি
'গন্ধ কিসের বল তো শ্রীপতি ?'

কহিল শ্রীপতি করিয়া প্রণতি
ঝাড়িয়া গলা,
'খিচুড়ির প্রভু ধরেছে তলা।'
প্রমাদ গণি
রাজ্ঞী-সকাশে যান গুটিগুটি
নৃপতিমণি।

৫

দেখিলেন যাহা নহে তা খিচুড়ি
মেতেছে মেখলা, বাজিতেছে চুড়ি,
চূর্ণ অলক পড়িতেছে উড়ি
চোখে ও মুখে
কাঁচুলি বুঝি বা রহে না বুকে।
আপনাহারা
বাজুর দোলক ছুলিয়া মরিছে
পাগলপারা।

৬

ষোড়শী রূপসী ধরম-কান্তা
ঘরম-সিক্তা পরম শ্রান্তা
ঈষৎ ঝুঁকিয়া খুন্তি ছান্তা
ঝনৎকারি
রাঁধিছে খিচুড়ি চমৎকারই!
বাহবা তোফা
গালেতে কাজল, লুটায় আঁচল
শিথিল খোঁপা।

৭

অপাঙ্গে রাণী চাহি পতি পানে
কহিলেন হাসি, 'কি হ'ল কে জানে !'
রাজা কহিলেন, 'গন্ধের টানে
এসেছি ছুটে,
বহু ফুল যেন উঠেছে ফুটে,
আ মরি মরি,
চাখিয়া দেখিব দাও তো একটু
প্রাণেশ্বরি !'

৮

চাখিয়া রাজার রোমাঞ্চ জাগে
নয়নে কিসের নেশা যেন লাগে
কহিলেন রাজা গাঢ় অনুরাগে,
'অপূর্ব এ !
কাহিনী শুনেছি পড়েছি বইয়ে,
খাই নি কভু,
হয়ে গেল যেন সহসা আজিকে
ছিল যা হবু।

৯

'এর পর যাহা আসিছে অধরে
বলিতে চাহি না এ খোলা সদরে
তা ছাড়া বাখানি সে গদগদ রে
নাই সে বাণী !

অন্দরে তুমি চল গো রাণি,
খিচুড়ি থাক,
ও অনবদ্য সুধার অংশ
সকলে পাক।'

১০

তারপর যাহা ঘটেছে তাহার
বর্ণনা জানে কুলি ও কাহার
যে কোন বামুন বৈদ্য সাহার
মুখেতে শুনো,
শুনেছে সবাই শহুরে বুনো,
বেতার-যোগে
পাশাপাশি ব'সে শুনেছে সকল
বাঘে ও ঘোগে।

১১

রাণীমা রেঁধেছে খিচুড়ি জবর
কাগজে কাগজে ছেপেছে খবর
বেজেছে নাকাড়া দাদামা দগড়
ডুবকি ঢোল,
কীর্তন সাথে বেজেছে খোল।
খিচুড়ি-গাথা
নানান ছন্দে ভরেছে সকল
মাসিক-পাতা।

ভাবী মন্ত্রীর অবশ্যম্ভাবী বক্তৃতা

১

তোমাদের ভালবাসি ভাই
বারম্বার বলেছিনু তাই
হেন বেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিও না গোল্লা অভিমুখে।
ক্ষণেক দাঁড়াও দেখি রুখে,'
হে ভ্রান্ত স্বদেশবাসি, বারেক শ্রবণ কর হিতকথাগুলি।
চল্লিশ কোটি বৃদ্ধাঙ্গুলি
আন্দোলিয়া
সেই গোল্লা অভিমুখে পুনর্ব্বার চলিলে ছুটিয়া।

২

তোমাদের ভালবাসি ভাই,
নব রসে মাতি তাই
স্মরিয়া শ্রীহরি
ভাসালাম তরী
নব-পরিকল্পনার স্রোতে,
গান্ধিজিরে নমি দূর হ'তে।
এ কৃষি-প্রধান দেশে হয়তো বা হবে উপকার
ইহা ছাড়া গতি কিবা আর।
অতীত পতিত হতমান
গোল্লা-অভিমুখী বর্ত্তমান।

এই নব আঁচে
ভিয়ান ওতরায় যদি, ভবিষ্যৎ বাঁচে।
একমাত্র আশা ভবিষ্যৎ
সুতরাং নাহি অন্য পথ।

৩

তোমাদের ভালবাসি ভাই
সেরেফ কর্ত্তব্য-বোধে ইচ্ছা করে তাই
শুধু চাবকাই,
থামে বেঁধে
মুখে ছাতু গেদে
চোখে লঙ্কা গুঁজে
রক্তে পুঁজে
করাইয়া স্নান ;
করি খান খান
অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকের,
কুড়াইয়া সেগুলিরে ফের
তাল করে থুড়ি :
হস্ত পদ বক্ষ ভুঁড়ি মুড়ি
করি কুঁচি কুঁচি ;
উচ্চ নীচ আব্রাহ্মণ-মুচি
সনাতন, আধুনিক,
শ্রমিক, ধনিক,
চাকুরে, বণিক,
নাহি করি ভেদাভেদ নাহি রাখি সীমা
বিলকুল করে' ফেলি কিমা।

বিরাট ভারতবক্ষ তার পর করিয়া কর্ষণ
সেই কিমা-চতুর্দ্দিকে করে দি বর্ষণ।
সাফ হয়ে যাবে আবর্জ্জনা
চুকিবে যন্ত্রণা।
তাহা ছাড়া হবে সার
চমৎকার।
হবে ভুট্টা হবে ছোলা যব গম ধান
সুখে রবে ভবিষ্যৎ ভারত-সন্তান।

তোমরা যারা

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দেবে
কামান দেগে উড়িয়ে দেবে
দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম···।

আমরা অতি ক্ষুদ্র
শূদ্রাদপি শূদ্র
এক ধমকে দৌড়ে পালাই
বাসন মাজি লাঙল চালাই
ডলাই মলাই চোলাই ঢালাই
আমরা করি

ঘোরাই ঘানি, ঘোরাই জাঁতা
সবার শিরে নানান ছাতা
আমরা ধরি
তোমরা যখন যুদ্ধ কর
আমরা মরি

দিও দিও দিও
তোমরা যারা চাবুক চালাও
কামান চালাও
হুকুম চালাও
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিও
কামান দেগে উড়িয়ে দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম।

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
পিঠ চাপড়ে নাচিয়ে দেবে
মিষ্টি কথায় বাঁচিয়ে দেবে
দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম···।

আমরা অতি মূর্খ
নেই বুদ্ধি সূক্ষ্ম
আমরা কুলি মজুর চাষা
পাই না দিশা পাই না ভাষা

কিন্তু তবু পারের আশা
আমরা করি
পাল ফাঁসলে ঝড়ের মুখে
ভগ্ন-তরীর হালটা রুখে
আমরা ধরি
তোমরা যখন তর্ক কর
আমরা মরি

দিও দিও দিও
তোমরা যারা বুকনি চালাও
হুজুক চালাও
কাগজ চালাও
পিঠ চাপড়ে নাচিয়ে দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম ॥

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
ডুবিয়ে দেবে উঠিয়ে দেবে
ঝরিয়ে কিংবা ফুটিয়ে দেবে
শোন
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম··· ।

চাবুক-ধারী শুম্ভ
কিম্বা দরদ-কুম্ভ
নাই কারুকে চিনতে বাকী
আদ্দি রেশম খদর খাকী

কোন দেবতার ধরণটা কি
আমরা বুঝি
দন্ত-হাসি কয় কি বাণী
ভুক্ত-ভোগী আমরা জানি
আমরা বুঝি
নিজের মাঝে শক্তি কেবল
আমরা খুঁজি

শোন শোন শোন
তোমরা যারা ভদ্রবেশী
ছদ্মবেশী
অর্দ্ধ-দেশী
ডুবিয়ে দেবে ? উঠিয়ে দেবে ?
ঝরিয়ে কিম্বা ফুটিয়ে দেবে ?
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম সেলাম !

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
দাবড়ানিতে দাবিয়ে দেবে
চোমরানিতে কাঁপিয়ে দেবে
শোন
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম… !

সার বুঝেছি ভাই রে
শক্তি যে নেই বাইরে
নিজের জোরে উঠব মোরা

নিজের জোরে ছুটব মোরা
নিজের জোরে ফুটব মোরা
ডরব না কো
দয়া কিম্বা দাবড়ানিতে
আহ্লাদে বা ঘাবড়ানিতে
মরব না কো
দমব না কো থামব না কো
সরব না কো

শোন শোন শোন
তোমরা যারা শক্তিধারী
বক্তৃতারই
তকৃতিধারী
কোনও চালই চলবে না কো
কোনও ডালই গলবে না কো
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম।

একটু শুধু

১

তোমার অঢেল পয়সা আছে
মানছি তা
এবং আছে খুঁটির জোরও
তাও জানি,

২

হয়তো তুমি কাগজ-ছাপাও
হয়তো দাপাও
হয়তো লাফাও
গলার জোরে ভুবন কাঁপাও
মানলাম,

৩

পয়সা নিয়ে সবার গাঁটের
মদের চাটের
স্যুটের ছাঁটের
দেখাও জানি নানান ঠাটের
কেরদানি,

৪

মানছি তুমি মস্ত মরদ
বাজাও সরোদ
ওড়াও গরদ
চোখ রাঙিয়ে দেখাও দরদ
বক্তৃতায়,
মানছি গো,

৫

গিলতে পার কোপ্তা কাবাব মণ্ডা প্যাঁড়াও
শাক-সবজি মাছ-মুরগী ছাগল ভেড়াও
একটু শুধু
সঙ্গে সঙ্গে গা দুলিয়ে

বুক চাপড়ে ঠোঁট ফুলিয়ে
ডুকরে ডুকরে কাঁদতে পার অন্নহানের জন্য,
খদর প'রে মোটর' প্লেনে দাবড়ে বেড়াও
ধন্য তুমি ধন্য,
সব ঠিক—

৬

নগদ টাকা ব্যাঙ্কে তোমার লাখ লাখ
করবে কেন গুড় গুড় বা ঢাক ঢাক
চুটিয়ে তাই খেলছ খেল
দিচ্ছ তেল নিচ্ছ তেল
হরদম
লাগিয়ে তাক
পিটিয়ে ঢাক
ঘাঁটছ পাঁক
কর্দম
দেখছি তো,

৭

ঢলছ এবং ঢলাচ্ছ
বলছ এবং বলাচ্ছ
নূতন রকম ঠুংরিতে
নোংরা এবং স্নুংরীতে
ধ্বংস ক'রে পিতৃধন
জমিয়েছ যে কি কীর্তন

হারিয়ে 'মিক্কি মাউস'কে
মাতিয়ে দিলে হাউসকে
দেখছি তা,
কাত করেছ পোলাও-ভরা
ডেকচিটা !

৮

দিচ্ছে সবাই হাততালি
নাই যে কার ও পাত খালি !

৯

সবাই সবই জানছে তো
সবাই তবু মানছে তো
এবং ক'ষে টানছে তো
দিনরাত,
লুসছে এবং শুষছে
তোমার মুখের মন্ত্রগুলো
তার-স্বরে ঘুষছে
ঠিক বাত !

১০

আকাশ তোমার নাইক জানা
নাই কাকলী নাইক ডানা
তবু তোমায় বলছে সবাই
পক্ষীটি
টাকার জোরে সব ত্যাঁদড়ই হচ্ছে ঢিট্,
একটি কথা কিন্তু শোন

লক্ষ্মীটি ,
এক মিনিট,
জাল ফেলেছ অনেক ঘাটে
কিন্তু কিছু ধরছ কি ?
বন্ধ ক'রে ঘরের দ্বার
চোখটি বুজে একটি বার
একটু শুধু চিন্তা কর
করছ কি !

অদৃশ্যলোকে

'বনফুল'

উৎসর্গ

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কাকাবাবু

শ্রীচরণেষু

ভাগলপুর

অদৃশ্যলোকে

১

একমুখ গোঁফ দাড়িওয়ালা লোক—মাথায় বাবরি চুল কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—চোখে দুটোতে অস্বাভাবিক রকম প্রখর দীপ্তি। হঠাৎ দেখলে কাপালিক বলে' সন্দেহ হয়। সাইকেল চড়ে' রোজ আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে যায়—মাড়োয়ারীর তেলকলের কেরাণী।

২

শ্মশানে একদিন দেখেছি তাকে। মড়া পোড়াতে গিয়েছিলাম, দেখি লোকটি দূরে দূরে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে একা একা। আমাদের দেখে সরে' গেল।

৩

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। 'লু' বইছে। পাশের যোগেন বাবুর বাড়ীর বাইরের ঘর থেকে নারী-কণ্ঠের চাপা

কান্না কানে এল। গিয়ে দেখি যোগেন বাবুর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে এক মলিনবসনা বধূ। রূপ নেই—স্বাস্থ্য নেই—অশ্রু ছাড়া আর কিছু নেই!

যোগেন বাবু দয়ালু লোক।

মেয়েটিকে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললেন—আচ্ছা, শিবুকে আমি ধমকে দেব। রাতদুপুরে শ্মশানে যায় কেন!

শুনলাম শিবু সেই লোকটির নাম—সেই তেল-কলের কেরাণী।

৪

তন্ত্রের একটা বই হাতে এল।

পড়ে দেখলাম সাধনা করলে নাকি অদৃশ্যলোক থেকে ভামরী ঝামরী ডামরী নানা দেব দেবী ডাকিনী যোগিনী দেখা দেন অদৃশ্যলোকের অপরূপ ঐশ্বর্য্য নিয়ে। সিদ্ধ হয় সাধনার অনুরূপ। যে, যে কামনা নিয়ে সাধনা করে, সে, সেই সেই রূপে নাকি পায়। প্রিয়া-রূপেও নাকি পাওয়া যায়—যদি সাধনার জোর থাকে।

যদি জেরা করেন সদুত্তর দিতে পারব না।

মনে কিন্তু গল্প জাগে।

দিনের আলোয় দৃশ্যমান জগতে শিবু তেলকলের সামান্য কেরাণী, কুৎসিৎ হাড়পাঁজরা-বার-করা স্ত্রীর স্বামী, একপাল রুগ্ন ছেলেমেয়ের পিতা; অধিকাংশ লোকেই গ্রাহ্য করে না তাকে, গাল দেয় অনেকে। দিনের আলোয় সে নগন্য। শ্মশান-সাধনায় কিন্তু সে উত্তীর্ণ হয়েছে। রাতের অন্ধকারে তার কাছে অদৃশ্যলোক থেকে নেমে আসে পদ্মিনী, গলায় পরিয়ে দেয় বরমাল্য।

রাত দুপুরে

রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, খোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না-লোকিত নীল আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, শুভ্র একখণ্ড লঘু মেঘ ছায়াপথের পাশ দিয়ে অলস মন্থর

গতিতে এগিয়ে চলেছে রেবতী নক্ষত্রের দিকে। ঝাউবনের মর্ম্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

সহসা মনে হল—সে আসে নি। আসতে পারত কিন্তু আসে নি।

উঠে বসলাম বিছানায়। দূর চক্রবালরেখালগ্ন পর্ব্বত-শ্রেণী রহস্যময় হয়ে উঠেছে স্বপ্নপুরীর মোহ-মহিমায়—অব্যক্তের ইঙ্গিত যেন উঁকি দিচ্ছে দৃষ্টি সীমানার ওপার থেকে।

ধীরে ধীরে বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এ কি!

দিনের বেলা যে তালগাছ দুটোকে প্রান্তরের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি—তারা কাছাকাছি সরে এসেছে—একজন আর একজনের কানে কি যেন বলছে চুপি চুপি।

সহসা তারা যেন টের পেয়ে গেল আমি দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল তারা প্রান্তরের দুই প্রান্তে, দুষ্টু ছেলের মতো। ডেকে উঠল একটা নাম-না-জানা পাখী—যেন হেসে উঠ্‌ল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে।

অবর্ত্তমান

সমস্তটা দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে একটা চখার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিলাম। যাঁরা কখনও এ কার্য্য করেননি তাঁরা বুঝতে পারবেন না হয়তো যে, ব্যাপারটা ঠিক কি জাতীয়। ধু ধু করছে বিরাট বালির চর, মাঝে মাঝে ঝাউ গাছের ঝোপ, একধার দিয়ে শীতের শীর্ণ-গঙ্গা বইছে। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। হু হু করে তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে একটা। কহল-গাঁয়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় ক্রোশ দুই বালির চড়া ভেঙে আমি এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম সকালবেলা। সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বালির চড়া ভেঙে ভেঙে কতখানি যে হেঁটেছি, খেয়াঘাট থেকে কতদূরেই বা চলে এসেছি তা খেয়াল ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল সারাজীবন ধ'রে যেন হাঁটছিই, অবিশ্রান্ত হেঁটে চলেছি, চতুর চখাটা কিছুতেই আমার বন্দুকের মধ্যে আসছে না, ক্রমাগত এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে পালাচ্ছে।

আমি এ অঞ্চলে আগন্তুক। এসেছি ছুটিতে বন্ধুর

বাড়ীতে বেড়াতে। আমি নেশাখোর লোক। একটি আধটি নয়, তিনটি নেশা আছে আমার। ভ্রমণ, সঙ্গীত এবং শিকার। এখানে এসে যেই শুনলাম খেয়াঘাট পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই গঙ্গায় পাখী [illegible] যাবে, লোভ সামলাতে পারলাম না, বন্দুক কাঁধে ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। লোভ শুনে মনে করবেন না যে আমি মাংস খাবার লোভেই পাখী মারতে বেরিয়েছি। তা নয়। আমি নিরামিষাশী। আলুভাতে ভাত পেলেই আমি সন্তুষ্ট।

খেয়াঘাট পেরিয়ে সকালে চরে এসে প্রথম যখন পৌঁছলাম তখন হতাশ হয়ে পড়তে হল আমাকে। কোথায় পাখী! ধূ ধূ করছে বালির চড়া আর কোথাও কিছু নেই। গঙ্গার বুকে দু একটা উড়ন্ত মাছরাঙা ছাড়া পাখী কোথায়! বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় কাঁআঁ শব্দটা কানে এল। কয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার আর অয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার দিয়ে যে শব্দটা হয় চখার শব্দটা ঠিক সে রকম নয় তবে অনেকটা কাছাকাছি বটে। কাঁআঁ শুনেই বুঝলুম চখা আছে কোথাও কাছে-পিঠে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ ঠিক, চখাই বটে—কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম মাত্র একটি দেখে।

চখারা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় থাকে। বুঝলাম দম্পতীর একটিকে কোন শিকারী আগেই শেষ করে গেছেন। এটির ভব-যন্ত্রণা আমাকেই ঘোচাতে হবে। সাবধানে এগুতে লাগলাম।

কাঁআঁ—

চখা উড়ে গেল। উড়বে জানতাম। চখা মারা সহজ নয়। দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। বেশ খানিক-ক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে আরও খানিকটা দূরে গিয়ে বসল। বেশ খানিকটা দূরে। আমি আবার সাবধানে এগুতে লাগলাম। কাছাকাছি এসেছি, বন্দুকটি বাগিয়ে বসতে যাব আর অমনি কাঁআঁ—

উড়ে গেল। বিরক্ত হলে চলবে না, চখা শিকার করতে হলে ধৈর্য্য চাই। এবার চখাটা একটু কাছেই বসল। আমিও বসলাম। উপর্য্যুপরি তাড়া করা ঠিক নয়—একটু বসুক। একটু পরেই উঠলাম আবার। আবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম কিন্তু উল্টো দিকে। পাখীটা মনে করুক যে আমি তার আশা ছেড়ে দিয়েই চলে যাচ্ছি যেন। কিছুদূর গিয়ে ওধার দিয়ে ঘুরে তারপর বিপরীত দিক দিয়ে কাছে আসা যাবে। বেশ কিছু দূর ঘুরতে হল—প্রায় মাইল খানেক। গুঁড়ি মেরে মেরে খুব

কাছেও এসে পড়লাম। কিন্তু তাগ্ করে ঘোড়াটি যেই টিপতে যাব আর অমনি—

কাঁআঁ—

ফের উড়ল। উড়তেই লাগল অনেকক্ষণ ধরে। কিছুতেই আর বসে না। অনেকক্ষণ পরে বসল যদি কিন্তু এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় বসল যে সেখানে যাওয়া মুশকিল। যাওয়া যায়, কিন্তু গেলেই দেখতে পাবে। আমার কেমন রোক চড়ে গেল, মারতেই হবে পাখীটাকে! সোজা এগিয়ে চললাম। আমি ভেবেছিলাম একটু এগুলেই উড়বে, কিন্তু উড়ল না। যতক্ষণ না কাছাকাছি হলাম, ঠায় বসে রইল। মনে হল অসম্ভব বুঝি সম্ভব হয়; কিন্তু যে-ই বন্দুকটি তুলেছি আর অমনি—কাঁআঁ।

এবারেও এমন জায়গায় বসল যার কাছে-পিঠে কোন আড়াল আব্ডাল নেই—চতুর্দ্দিকেই ফাঁকা। কিছুতেই বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে হল। এবার গিয়ে বেশ ভাল জায়গায় বসল। একটা ঝাউবনের আড়ালে আড়ালে গিয়ে খুব কাছাকাছিও আসতে পারলাম—এত কাছাকাছি যে তার পালকগুলো পর্য্যন্ত দেখা যেতে লাগল—ফায়ার করলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লাগল না। ঝোপে ঝাপে যা দু একটা ছোট পাখী ছিল তারাও উড়ল, মাছরাঙাগুলোও চেঁচাতে শুরু ক'রে দিলে। সমস্ত ব্যাপারটা থিতুতে আধঘণ্টারও ওপর লাগল। নদীর ঠিক বাঁকের মুখটাতেই বসল আবার চখাটা গিয়ে।

—আমি বসেছিলুম একটা বালির ঢিপির উপর, মুশকিল হল—উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। উঠলাম না। শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে হেঁটে এগুতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর গেছি, আর অমনি কাঁআঁ—

আমার মাথাটাই দেখা গেল, না, বালির স্তর দিয়ে কোন রকম স্পন্দনই গিয়ে পৌঁছল তার কাছে তা বলতে পারিনা। উঠে দাঁড়ালাম। রোক আরও চড়ল।

হঠাৎ নজরে পড়ল সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর জল রক্ত-রাঙা। পাখীটা ওপারের চরে গিয়ে বসেছে। সমস্ত দিন আমিও ওকে বিশ্রাম দিইনি—ও-ও আমাকে দেয়নি। এখন দুজনে দুপারে। চুপ করে বসে রইলাম।

সূর্য্য ডুবে গেল। অস্তমান সূর্য্য-কিরণে গঙ্গার জলটা যত জ্বলন্ত লাল দেখাচ্ছিল সূর্য্য ডুবে যাওয়াতে ততটা আর রইল না। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল চতুর্দ্দিক। সমস্ত অন্তরেও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্য জেগে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। পূরবী রাগিণী যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠল আকাশে, বাতাসে, নদীতরঙ্গে। হঠাৎ মনে পড়ল—বাড়ী ফিরতে হবে।

কত রাত হয়েছে জানিনা।

ঘুরে বেরাচ্ছি গঙ্গার চরে চরে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। মধ্য গগনে পূর্ণিমার চাঁদ—চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে শেষে বসলাম একটা উঁচু জায়গা দেখে। অনেকক্ষণ চুপ করে' বসেই রইলাম। এমন একা জীবনে আর কখনও পড়িনি। প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল যদিও, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ভয়ের বদলে মোহ এসে আমার সমস্ত প্রাণ মন সত্তা অধিকার করে বসল। আমি মুগ্ধ হয়ে বসে রইলাম। মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম।

মনে হল কত জায়গায় কতভাবে ঘুরেছি, প্রকৃতির এমন রূপ তো আর কখনও চোখে পড়েনি। রূপ নিশ্চয়ই ছিল, আমার চোখে পড়েনি। নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে হতে লাগল। তারপর সহসা মনে হ'ল আজীবন সব দিক দিয়েই আমি বঞ্চিত। জীবনের কোনও সাধটাই কি পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে? জীবনের তিনটি সখ ছিল—ভ্রমণ, সঙ্গীত, শিকার। ভ্রমণ করেছি বটে—ট্রেণে স্টীমারে চেপে এখানে ওখানে গেছি, কিন্তু তাকে কি ভ্রমণ বলে? হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, সাহারার দিগন্ত প্রসারিত অনিশ্চয়তায়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে, হিমশীতল মেরুপ্রদেশের ভাসমান তুষার-পর্ব্বতশৃঙ্গে যদি না ভ্রমণ করতে পারলাম তাহলে আর কি হল! সঙ্গীতেও ব্যর্থকাম হয়েছি। সা রে গা মা সেধেছি বটে; কিন্তু সঙ্গীতের আসল রূপটি আলেয়ার মতো চিরকাল এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে আমাকে। সেদিন অত চেষ্টা করেও বাগেশ্রীর করুণগম্ভীর রূপটি কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না সেতারে।

ঠিক ঘাটে ঠিক ভাবেই আঙুল পড়ছিল; কিন্তু সেই সুরটি ফুটল না যাতে আত্মসম্মানী গম্ভীর ব্যক্তির নির্জ্জন-রোদনের অবাঙ্‌ময় বেদনা মূর্ত্ত হয়। শিকারই

কী কি এমন করেছি জীবনে? সিংহ হাতী বাঘ গণ্ডার কিছুই মারিনি। মেরেছি পাখী আর হরিণ। আজ তো সামান্য একটা চখার কাছেই হার মানতে হল।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

চমকে উঠলাম। ঠিক মাথার উপরে চখাটা চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখীরা সাধারণতঃ রাত্রে তো ওড়ে না—হয়তো ভয় পেয়েছে কোনরকমে। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কাঁআঁ—কাঁআ—

আরও খানিকটা নেবে এল।

হঠাৎ বন্দুকটা তুলে ফায়ার ক'রে দিলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লেগেছে ঠিক। পাখীটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল মাঝগঙ্গায়। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম—দেখলাম ভেসে যাচ্ছে।

—যাক্। জীবনে যা বরাবর হয়েছে এবারও তাই হল। পেয়েও পেলাম না। সত্যি, জীবনে কখনই কিছু পাইনি, নাগালের মধ্যে এসেও সব ফসকে গেছে।

চুপ করে বসে ছিলাম।

চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করছে বালি, গঙ্গার কুলুধ্বনি অস্পষ্ট-ভাবে শোনা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। শিকার, চখা, বন্দুক, সমস্ত দিনের শ্রান্তি কোন কিছুই কথাই মনে হচ্ছিল না তখন, একটা নীরব সুরের সাগরে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দীর্ঘকায় ঋজু দেহ এক ব্যক্তি নদী থেকে উঠে ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গামছা দিয়ে গা মুছতে লাগলেন। অবাক হয়ে গেলাম। কোথা থেকে এলেন ইনি, কখন বা নদীতে নাবলেন, কিছুই দেখতে পাইনি।

একটু ইতস্ততের পর জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কে?"

লোকটি এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্যই করেননি।

আমার কথায় মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেল; ফিরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল—তারপর বললেন—"আমি এখানেই থাকি। আপনিই আগন্তুক, আপনিই পরিচয় দিন।"

পরিচয় দিলাম।

"ও, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন আপনি? আসুন আমার সঙ্গে, কাছেই আমার আস্তানা।"

দীর্ঘকায় ঋজুদেহ পুরুষটি অগ্রগামী হলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। একটু দূর গিয়েই দেখি একটি ছোট্ট কুটির। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি, এটা চোখে পড়েনি আমার। ছোট্ট কুটীরটি যেন ছবির মতন—সামনে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ—চতুর্দ্দিকে রজনীগন্ধার গাছ—অজস্র ফুল। অনাবিল জোৎস্নায় ধরণীর অন্তরের আনন্দ সহসা যেন পুষ্পায়িত হয়ে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধার উর্দ্ধমুখী বিকাশে। মৃদু সৌরভে চতুর্দ্দিক আছন্ন। আমিও আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি এসেই ঘরের ভিতরে ঢুকেছিলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন এবং শতরঞ্জি গোছের কি একটা পাততে লাগলেন।

"বসুন।"

বসে দেখলাম শতরঞ্জি নয়—গালিচা। খুব দামী নরম গালিচা। তিনিও একপ্রান্তে এসে বসলেন। বলা বাহুল্য আমার কৌতুহল ক্রমশঃই বাড়ছিল। তবু কিছুক্ষণ চুপ করে' রইলাম, তিনিও চুপ করে রইলেন। শেষে আমাকেই কথা কইতে হল।

"সমস্তদিন এ অঞ্চলে ঘুরেছি কিন্তু আপনার দেখা পাইনি কেন-ভেবে আশ্চর্য্য লাগছে।"

"সব সময় সব জিনিষ কি দেখা যায়?"

মুখের দিকে চেয়ে ভয় হল—চোখ ছুটো জ্বলছে—মানুষের নয়, যেন বাঘের চোখ।

"একটা গল্প শুনুন তাহলে। রাজা রামপ্রতাপ রায়ের নাম শুনছেন?"

"না।"

"শোনবার কথাও নয়। ছুজন রামপ্রতাপ ছিল—ছুজনেই জমিদার—একজন সুদ-খোর আর একজন সুর-খোর।"

"সুরখোর?"

"হ্যাঁ—ও রকম সুর-পাগল লোক ও অঞ্চলে আর ছিল না। যত বিখ্যাত ওস্তাদের আড্ডা ছিল তাঁর বাড়ীতে। আমার অবশ্য এসব শোনা কথা। আমার পাঞ্জাবে জন্ম, পাঞ্জাবী ওস্তাদের কাছেই গান বাজনা শিখেছিলুম। বাংলাদেশে এসে শুনলুম, রামপ্রতাপ নামে নাকি একজন গুণী জমিদার আছেন যিনি সুরের প্রকৃত সমঝদার। প্রকৃত গুণীকে কখনও ব্যর্থমনোরথ হতে হয়নি তাঁর কাছে—গাড়ীতে একজনের মুখে কথায়

কথায় শুনলুম। তখনই যদি তাঁকে ঠিকানাটাও জিগ্যেস করি তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়—কিন্তু তা না করে আমি সপ্তাহখানেক পরে আর একজনকে জিগ্যেস করলুম—রাজা রামপ্রতাপ রায় কোথায় থাকেন। তিনি বলে দিলেন সুদ-খোর রামপ্রতাপের ঠিকানা। ডানকুনি ষ্টেশনে নেবে দশ ক্রোশ হাঁটলে তবে নাকি তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে। একদিন বেরিয়ে পড়লাম তাঁর উদ্দেশ্যে। ডানকুনি ষ্টেশনে যখন নাবলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। সেদিনও পূর্ণিমা। ষ্টেশনে নেবে আর একজনকে জিগ্যেস করলাম। সুদ-খোর রাম-প্রতাপ ও অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লোক, সবাই চেনে। যাকে জিগ্যেস করলুম সে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে সোজা চলে যান। চলতে লাগলাম। কতক্ষণ চলে-ছিলাম তা ঠিক বলতে পারিনা। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম একটা বিরাট প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হাঁটছি —চারদিকে কেবল মাঠ আর মাঠ—আর কোথাও কিচ্ছু নেই। মনে হল যেন শেষও নেই।

"কিছুদূরে গিয়েই হঠাৎ সামনে প্রকাণ্ড রাজবাড়ীটা দেখা গেল, যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হল—সাদা ধবধব করছে, মনে হল যেন মর্ম্মর পাথর দিয়ে তৈরী। মিনার,

মিনারেট, গম্বুজ, সিংহদ্বার সমস্ত দেখা গেল ক্রমশঃ। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ—তারপর এগিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের তুপাশে দেখি তুজন বিরাটকায় দারোয়ান বসে আছে—তু'জনেই নিবিষ্টচিত্তে গোঁফ পাকাচ্ছে বসে। ভিতরে ঢুকব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কোন উত্তরই দিলে না, গোঁফই পাকাতে লাগল। একটু ইতস্ততঃ ক'রে শেষে ঢুকে পড়লাম, তারা বাধা দিলে না। ভিতরে ঢুকে দেখি—বিরাট ব্যাপার, বিশাল জমিদারবাড়ী জমজম্ করছে; প্রকাণ্ড কাছারি বাড়ীতে বসে' আছে সারি সারি গোমোস্তারা। কেউ লিখছে, কেউ টাকা গুণছে, কেউ কেউ কানে কলম গুঁজে খাতার দিকে চেয়ে আছে—সবারই গম্ভীর মুখ। সামনে চত্বরে বসে আছে অসংখ্য প্রজা সারি সারি। সবাই কিন্তু চুপচাপ, কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। আমি তানপুরা ঘাড়ে করে' এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইলে না, আমারও সাহস হ'লনা কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে, আমি ঘুরেই বেড়াতে লাগলাম। আমার মনের ইচ্ছে রাজা রামপ্রতাপকে গান শোনাব, কিন্তু—হঠাৎ দেখতে পেলাম কিছুদূরে ছোট্ট

একটা বাগান রয়েছে—বাগানের মধ্যে ধবধবে সাদা মার্ব্বেল পাথরের উঁচু চৌতারা আর সেই চৌতারার উপরে কে একজন ধবধবে সাদা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গড়গড়ায় তামাক খাচ্চেন। গড়গড়ার কুণ্ডলী-পাকানো নলের জরিগুলো জ্যোৎস্নায় চক্‌মক্ করছে। বাগানে ছোট্ট একটি গেট, গেটের দুধারে উর্দ্দি-চাপরাশ-পরা দুজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেন পাথরের প্রতিমূর্ত্তি। কেমন করে' জানিনা, আমার দৃঢ় ধারণা হল ইনিই রাজা রামপ্রতাপ। এগিয়ে গেলাম। দারোয়ান দুজন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাধা দিলেনা। রাজা রামপ্রতাপের কাছাকাছি এসে ঝুঁকে প্রণাম করলাম একবার।

"তিনি গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়লেন একবার শুধু। আস্তে আস্তে বললাম—হুজুরকে গান শোনাব বলে এসেছি, যদি হুকুম করেন—

"তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, হাতের ইঙ্গিতে আমাকেও বসতে বললেন। তারপর কখন যে আমি দরবারি কানাড়ার আলাপ শুরু করেছি আর কতক্ষণ ধরে' যে সে আলাপ চলেছে তা আমার কিছুই মনে নেই। যখন হুঁস হ'ল তখন দেখি, এক ছড়া মুক্তোর মালা তিনি

আমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। মালাটা দেখবেন ?” কুটিরের ভিতর ঢুকে গেলেন তিনি, পরমুহূর্ত্তেই বেরিয়ে এলেন এক ছড়া মুক্তোর মালা নিয়ে। অমন সুন্দর এবং অত বড় বড় মুক্তো আমি আর দেখিনি কখনও।

“তারপর ?”

“আমাকে মালা পরিয়ে দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। আমি চুপ ক'রে বসেই রইলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কিছু মনে নেই। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি রাজবাড়ী, কাছারি, চৌতারা লোকজন—কোথাও কিচ্ছু নেই—ফাঁকা মাঠের মাঝখানে আমি একা শুয়ে ঘুমুচ্ছি।'

“একা ? কি রকম ?”—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

“হ্যাঁ। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একা—কেউ নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গুণী রাজা রামপ্রতাপ অনেকদিন হল মারা গেছেন। বেঁচে আছে সেই সুদখোর ব্যাটা। তার বাড়ীর পথই সবাই আমাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল গুণী রামপ্রতাপকে গান শোনাবার, তাই তিনি মাঠের মাঝখানে আমাকে দেখা দিয়ে আমার গান শুনে বখ্‌শিষ দিয়ে গেলেন।”

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে রইলাম। কতক্ষণ তা মনে নেই। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"গান শুনবেন?"

"যদি আপনার অসুবিধে না হয়—"

"অসুবিধে আবার কি। সুরের সাধনা করবার জন্যেই আমি এই নির্জ্জনবাস করছি—"

আবার উঠে গেলেন। কুটিরের ভিতর থেকে বিরাট এক তানপুরা বার করে বললেন—"বাগেশ্রী আলাপ করি শুনুন।"

শুরু হয়ে গেল বাগেশ্রী। ওরকম বাগেশ্রীর আলাপ আমি কখনও শুনিনি। যা নিজে আমি কখনও আয়ত্ত করতে পারিনি কিন্তু আয়ত্ত করতে চেয়েছিলাম তাই যেন শুনলাম আজ। কতক্ষণ শুনেছিলাম মনে নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা-ও জানিনা, ঘুম ভাঙল যখন, তখন দেখি আমি সেই ধূ ধূ বালির চড়ায় একা শুয়ে আছি, কোথাও কেউ নেই। উঠে বসলাম। উঠতেই নজরে পড়ল চখাটা চরে' বেড়াচ্ছে, মরেনি।

আমরা তিনজনেই সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের গল্পটা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে ছিলাম। শিকার উপলক্ষ্যেই আমরা

এ অঞ্চলে আসিয়া সন্ধ্যাবেলা এই ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়াছি। পাশের ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন। আলাপ হইলে আমরা শিকারী শুনিয়া তিনি নিজের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্পটি আমাদের বলিলেন। অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই বটে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তারপর ?"

"তারপর আর কিছু নেই। রাত হয়েছে, এবার শুতে যান, আপনাদের তো আবার খুব ভোরেই উঠতে হবে। আমারও ঘুম পাচ্ছে—"

এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ প করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ আমার কৌতূহল হইল কোন্ অঞ্চলের গঙ্গার চরে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল জানিতে পারিলে আমরাও একবার জায়গাটা দেখিয়া আসিতাম। জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। চতুর্দ্দিকে দেখিলাম—কেহ নাই।

ডাকবাংলার চাপরাশিকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলাম, পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি কোথাকার লোক। চাপরাশি উত্তর দিল, পাশের ঘরে তো কোন লোক নাই, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এখানে আর কেহ আসে নাই। এ ডাকবাংলায় কেহ বড়

একটা আসিতে চায়না—বলিয়া সে অদ্ভুত একটা হাসি হাসিল।

শেষ-কিস্তি

সেই সবে ডাক্তারি পাশ করেছি। চিকিৎসা-শাস্ত্রে এবং নিজের নৈপুণ্যে তখন অগাধ বিশ্বাস। রোগী একটা পেলেই হয়। সাজ সজ্জা করে' রাস্তার ধারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। বুড়ো দীনু ডাক্তারেরই যত 'কল'—অথচ লোকটা যতদূর সেকেলে হতে হয়—অতি-আধুনিক আবিষ্কারের ধার ধারেন না কোন। নাড়ী টিপে, জিব দেখে, পেট টিপে, অত্যন্ত অনাড়ম্বর পদ্ধতিতেই বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন, অথচ আমরা—যাক্ সে কথা। ওই দীনু ডাক্তারই আমাকে ডাকলেন একদিন তাঁর একটা 'কেসে'। সে 'কেসে' দুজন নামজাদা ডাক্তার এসেছিলেন। আমাকে ডাকা হয়েছিল রাত জাগবার জন্যে। রোগীর কাছে সর্ব্বদা একজন কৃতবিদ্য ডাক্তারের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন সবাই। রাত্রির ভারটা আমার উপর দিয়েছিলেন

দীনুবাবু। সম্ভবত আমার দাদামশায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল বলে'।

গিয়ে দেখি হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড। আশপাশের যত নামকরা ডাক্তার সবাই সমবেত হয়েছেন। কোলকাতা থেকে শুধু দু'জন ডাক্তারই নয়, নার্সও এসেছেন। আমিও গিয়ে হাজির হলাম। অথচ ছেলেটির হয়েছে ম্যালেরিয়া—ম্যালিগ্‌নান্ট টাইপের অবশ্য—কিন্তু তবু ম্যালেরিয়ার জন্যে এত ধুমধাম কেন বুঝলাম না। গ্রেন কয়েক কুইনিন দিলেই তো চুকে যেত।

সাড়ম্বরে অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে' মোটা মোটা ফি নিয়ে বড় বড় ডাক্তাররা বিদায় নিলেন। ঠিক হল একজন নার্স শয্যা-পার্শ্বে মোতায়েন থাকবেন, আমি থাকব পাশের ঘরে, দরকার বুঝলে আমাকে ডাকা হবে, তাছাড়া দুঘণ্টা অন্তর নাড়ীও পরীক্ষা করতে হবে ঘড়ি ধরে'—শ্বাস প্রশ্বাসও গুনতে হবে। যাবার আগে দীনু ডাক্তার বলে গেলেন—"তুমি এখানে আসবার আগে, আমার সঙ্গে দেখা কোরো একবার—"

"আচ্ছা।"

রাত্রে সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে নানারকম

ইনজেক্‌সনের সরঞ্জাম ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়লাম। দীনু ডাক্তার বাইরের ঘরে একা বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

"এস, ব'স। একটা কথা বলবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। পাল্‌স রেস্‌পিরেশন গোনা ছাড়া আর যেন কিছু করতে যেও না তুমি। কোন ইন্‌জেক্‌শন ফিন্‌-জেক্‌শন দিও না যেন—"

"পাল্‌স্‌টা যদি খারাপ হয়, একটা ষ্ট্রিক্‌নিন্‌ বা ক্যামফার ইন্‌ ইথার দিলে ক্ষতি কি—"

"কিছু ক'রো না—বদনাম হয়ে যাবে—"

মিনিট খানেক গড়গড়া টেনে বললেন—"ও ছেলে বাঁচবে না—"

"ম্যালেরিয়া হয়েছে, কুইনিন পড়ে গেছে, না বাঁচ-বার কোন কারণ দেখছি না তো—"

"কিছুতেই বাঁচবে না। এর আগে ছ'টা মরেছে। ওর ছেলে বাঁচে না।—"

"ছ'টা মরেছে!"

"হ্যাঁ। এক একটা ছেলে জন্মায়, সাত আট বছর বেঁচে থাকে, তারপর একটা কিছু হয় আর পট্‌ করে' মরে যায়। কোনবারই চিকিৎসার ক্রুটি হয় নি।

মরে যাবার বছর খানেক পরেই আবার একটা ছেলে জন্মায়—বছর কয়েক বাঁচে—তারপর অসুখ হয় আর মরে' যায়। আমার হাতেই ছ'জন গেছে—এটাও যাবে। খরচ করাতে আসে খালি—"

বৃদ্ধ গম্ভীর মুখে তামাক টানতে লাগলেন।

আমার মনে হল বুড়োর বোধহয় ভীমরতি হয়েছে। ছ'জন মরেছে বলে সপ্তমকেও যে মরতে হবে—একি একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি হ'ল। আর কিছু যদি নাই করতে হয়, তাহ'লে শুধু শুধু আমাকে একশ' টাকা দেবার মানে কি? আমার মনে যাই হোক বাইরে চুপ করে রইলাম। বুড়োর সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি।

২

গভীর রাত্রে নার্স এসে ডাকলে।

গিয়ে দেখি খোকার বাবা—এ অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী বৃদ্ধ জগৎ সেন—বিছানার একধারে চুপ করে বসে আছেন। তাঁর দিকে কটমট্ করে' চেয়ে খোকা বলে চলেছে—"ডাক্তারের একশ' টাকা আর নার্সের

পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাওনা, আমি চলে যাই। কেন আর আটকে রেখেছ আমাকে, দিয়ে দাও শিগ্‌গির আমি আর থাকতে পারছি না—শিগ্‌গির দিয়ে দাও—শিগ্‌গির দিয়ে দাও—"

বিছানা ছেড়ে ঠেলে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। তু'জনে মিলে চেপে ধরতে হ'ল তাকে।

"শিগ্‌গির দাও—শিগ্‌গির দিয়ে দাও—"

যেন আট বছরের ছেলের কণ্ঠস্বর নয়—একজন প্রবীন বুড়ো যেন খন খন করে' কথা বলছে! এ অবস্থায় হায়োসিন হাইড্রোবোম্ দেওয়া উচিত না মরফিন্ দেওয়া উচিত ভাবছি—এমন-সময় জগৎ বাবু এক কাণ্ড করে বসলেন। হঠাৎ তিনি মাটিতে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে বলে উঠলেন—"নবীন বাবু দয়া করুন আমাকে—আমি সুদ-সমেত পাই পয়সা সব শোধ করে দিচ্ছি—আপনি যাবেন না, থাকুন, দয়া করুন আমাকে—"

"না, জোচ্চরের বাড়ী আমি থাকি না—"

"ওরে খোকা, বাবা আমার—"

আর্ত্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন জগৎ বাবু।

খোকা আবার ঠেলে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল।

"শিগগির ফিস দিয়ে দাও এঁদের—"

"দিচ্ছি দিচ্ছি—"

আলু থালু বেশে উঠে পড়লেন জগৎ বাবু। তাড়াতাড়ি 'সেফ' খুলে টাকা বার করে' আমাকে আর নার্সকে দিলেন।

খোকা যেন তৃপ্ত হয়ে চোখ বুজল।

সে চোখ আর খুলল না।

মালাবদল

গভীর রাত্রি। আকাশে জ্যোৎস্নার পাথার। একরাশি ছোট ছোট সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে একধারে। একরাশি শুভ্র চন্দ্রমল্লিকা যেন।

দ্বিতলের বাতায়নে বন্দনা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে একা। আজ তার জীবনের পরম রাত্রি। স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে। ঠিক প্রথম নয়, তবু প্রথম। বাসর ঘরের ভীড়, ফুলশয্যার অস্বাভাবিকতা, সমাজের কলরব সমস্ত চুকে গেছে। আজই প্রথম প্রকৃত মিলন-রাত্রি।

…নিরালা জ্যোৎস্না-যামিনী নিবিড় হয়ে আসছে।

চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল—

ধাপে ধাপে সুর চড়িয়ে ডেকে উঠল পাখীটা। জ্যোৎস্নায় শিহরণ লাগল। খোঁপা থেকে বেলফুল পড়ে গেল একটা। ফুলটা হাসছে…।

আকাশের ছোট ছোট মেঘগুলি রূপান্তরিত হয়েছে। চন্দ্র মল্লিকার রাশি নেই, এক জোড়া রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে পাশাপাশি। স্বপ্নলোক যেন।

স্বপ্নলোকই তো। বন্দনার স্বপ্ন সফল হয়েছে অমন রূপবান গুণবান স্বামী তাকেই পছন্দ করেছেন। বাংলা দেশে মেয়ের অভাব ছিল না। কত রূপসী কত বিদুষী, কত ধনীর দুলালী এসেছিল ভীড় করে'। কিন্তু তার সুরের কাছে পরাভব মানতে হয়েছিল সবাইকে।

…একটা সূক্ষ্ম গর্ব্ব গোলাপী নেশার মতো সঞ্চারিত হ'তে লাগল তার মনে। হবে না? মনে পড়ল কি কৃচ্ছসাধনই না সে করেছে। সেতার, এস্রাজ, বীণ্। দিবারাত্রি গলা সাধা। তানপুরার সঙ্গে বড় বড় রাগ-রাগিণীর আলাপ। জীবনে আর তো কিছুই সে করেনি। গত ষোল বৎসর সুরের সাধনাই করেছে কেবল একাগ্রচিত্তে। সুরের ঝরণাতলায় দেখা হ'লো স্বামীর সঙ্গে। স্বামীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ফুটে

উঠতে লাগল মানস-পটে ধীরে ধীরে। আজ রাত্রে বাগেশ্রী আলাপ করে' শোনাবে সে। সেতারটা পাশের ঘরে এনে রেখেছে।

...ঝন্ করে শব্দ হ'ল একটা। সেতারের তারটা ছিঁড়ে গেল নাকি? ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল বন্দনা। পাশের ঘরের দরজায় একটি তন্বী রূপসী দাঁড়িয়ে আছে। অপরূপ রূপসী।

"আমি চললুম।"

"কে আপনি?"

"তোমার গানের সুর। এতদিন আমাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে ছিলে তাই তোমার কাছে ছিলাম। এখন তুমি আর একজনের গলায় মালা দিয়ে তারই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছ। আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি চললুম।"

বন্দনাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে বেরিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল যেন। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বন্দনা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।...

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে চোখ পড়ল। সমিথুন নেই। স্বচ্ছ-বসনা একটি পরী উড়ে চলেছে

যেন অজানার উদ্দেশে। ওড়নাটা উড়ছে আকাশ জুড়ে…।

হঠাৎ সে চমকে উঠল। পিছনের দিক থেকে চোখ দুটো টিপে ধরছে কে। নিঃশব্দচরণে স্বামী এসে প্রবেশ করেছেন সে টের পায়নি।

দুই ভিক্ষুক

বারাণসীর জনবহুল পথের ধারে অন্ধ ভিখারীটি বসে থাকে। পোড়া পোড়া কালো চেহারা। যেন ঝলসানো। অল্প কয়েকদিন হ'ল এসেছে। কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। এমন কি, অন্যান্য ভিখারীরাও তার সম্বন্ধে অজ্ঞ। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। রাস্তার একধারে ছেঁড়া কাপড়টি পেতে সসঙ্কোচে বসে থাকে শুধু। ভিক্ষাও চায় না। হাত পেতে বসে থাকে শুধু নীরবে। তবু ভিক্ষা মেলে। কাশীতে পুণ্যার্থীর ভীড়, পুণ্যসংগ্রহের জন্যেই লোকে আসে এখানে, ভিক্ষা দিতে কার্পণ্য করে না। নীরব ভিখারীটির ছেঁড়া কাপড়ও ভরে ওঠে রোজ নানাজনের

নানা দাক্ষিণ্যে। আধলা, পয়সা, ডবলপয়সা, আনি দুয়ানি, সিকি এমন কি আধুলিও পড়ে মাঝে মাঝে। গোটা টাকাও পড়েছিল একদিন একটা। খাবারও জমে নানারকম। ভিখারি কিন্তু বসে থাকে নীরবে। অন্ধ চোখের দৃষ্টি নির্ব্বিকার। গভীর রাত্রে রাস্তাঘাট নির্জ্জন হ'লে ধীরে ধীরে ওঠে। কাপড়ের উপর সঞ্চিত সমস্ত জিনিস পুঁটুলি করে' বেঁধে লাঠি ঠুক ঠুক করে' গঙ্গার ঘাটে যায়...তারপর গঙ্গাগর্ভে ফেলে দিয়ে আসে সব। সে যা চায় তা পায় নি। কাপড়টি থিছিয়ে আবার বসে এসে রাস্তার ধারে। কতদিন বসে থাকতে হবে কে জানে!

২

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পথ জনবিরল হয়ে এসেছে। আর-একটি ভিখারীর আবির্ভাব হ'ল সেই পথে। ন্যুব্জদেহ স্থবির। গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো। মাথায় জট প'ড়ে গেছে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। এই ভিখারীটি এসে

প্রথম ভিখারীর কাছে দাঁড়াল এবং নিজের ভিক্ষার থলিটি তার কাপড়ে উজাড় করে' ঢেলে দিলে। ঢেলে দিয়ে দাঁড়াল না, চলে যাচ্ছিল, সহসা প্রথম ভিখারী পুলকিত হ'য়ে উঠল। দেখতে দেখতে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল তার। গায়ের রং টক্‌টকে ফরসা হ'য়ে গেল··· মাথার চুল সোনালি। চেহারাই বদলে গেছে একেবারে। উঠে দাঁড়িয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠল—"আমায় ক্ষমা ক'রে যাও মহারাজ, চলে যেও না। আমি ক্ষমা চাইছি, হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইছি—"

ন্যুব্জদেহ ভিখারী ঘুরে দাঁড়াল।

সাহেব বলতে লাগল—"ক্ষমা কর আমাকে মহারাজ। কতদিন যে তোমার আশায় বসে আছি! অভিশপ্ত-জীবন আর বইতে পারছি না। কত রৌরবে পুড়েছি, কুম্ভীপাকে ঘুরেছি। এখন আমার উপর আদেশ হয়েছে, ভারতবর্ষে ভিখারী-জীবন যাপন কর গিয়ে যদি কোনদিন তার হাতে ভিক্ষা পাও তবেই তোমার রূপান্তর ঘটবে। সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে তাহ'লেই তোমার মুক্তি। আমায় ক্ষমা কর মহারাজ···"

ন্যুব্জদেহ ভিখারীর মুখও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যাক, এতদিনে দেখা পাওয়া গেছে তাহ'লে।

"মিষ্টার হেষ্টিংস? তোমাকে আমিও তো খুঁজছি জন্মজন্মান্তর ধরে'। তোমাকে যে আমি ক্ষমা করেছি তা তোমাকে না জানানো পর্য্যন্ত আমারও যে মুক্তি নেই!"

"ক্ষমা করেছ?"

"নিশ্চয়!"

দেখতে দেখতে ন্যুব্জদেহ স্থবির ভিখারী সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হল।

ওয়ারেন হেষ্টিংস আর মহারাজ নন্দকুমার পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রমাণ

ভদ্রলোক কোথা থেকে এসেছিলেন। কেউ জানত না। বাইরের কোন ভড়ং ছিল না। জটা, গেরুয়া, প্রাণায়াম, বক্তৃতা কিছু না। তিনি যে আধ্যাত্মিক মার্গের পথিক তা কেউ সন্দেহও হয়ত করত না যদি না তিনি শহর ছেড়ে গঙ্গার ধারের পোড়ো বাড়ীটাতে আশ্রয় নিতেন। প্রথম প্রথম লোকে অন্য রকমও ভেবেছিল। কেউ ভেবেছিল ফেরারি আসামী, কেউ ভেবেছিল গোয়েন্দা। উর্ব্বর মস্তিষ্কের অভাব নেই। নানাবিধ কল্পনা করেছিল লোকে। কিন্তু অনেকদিন কেটে যাবার পরও যখন চমকপ্রদ কিছু ঘটল না, তখন সবাই মানতে বাধ্য হল লোকটা ভালই সম্ভবত—সাধু-সন্ন্যাসী গোছ কিছু একটা হবে। কিন্তু লোকেদের এ ধারণাকেও তিনি প্রশ্রয় দেন নি। কেউ হাত দেখাতে এলে বলতেন—আমি কিছু জানি না। দেব ঔষধ চাইতে এলে বলতেন—জানি না। ভগবান সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে বলতেন—জানি না। উদ্ধতভাবে বলতেন

না। অত্যন্ত সসঙ্কোচে মৃদুকণ্ঠে বলতেন। কৌতূহলী জনতা বারবার তাঁর কাছে গিয়ে হতাশ হয়ে নিরস্ত হয়েছিল শেষটা।

নিরস্ত হন নি কেবল হারাধন বাবু। তিনি ফাঁক পেলেই যেতেন। এই অনাড়ম্বর নির্জ্জনতাপ্রিয় নির্ঝঞ্ঝাট লোকটিকে বড় ভাল লাগত তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে চুপ করে' বসে থাকতেন। তাঁর কেবলই মনে হ'ত লোকটির মধ্যে ঐশ্বর্য্য আছে কোন। কি ঐশ্বর্য্য আছে জানবার চেষ্টা করেন নি কোন দিন। কাছে গিয়ে বসলেই সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। কথাবার্ত্তা অল্পই হ'ত। যা হ'ত তাও অতি সাধারণ। যুদ্ধের কথা, দুর্ভিক্ষের কথা—এই সব। ভগবদ্-প্রসঙ্গ একদিন উত্থাপন করেছিলেন হারাধন বাবু।

"আচ্ছা, ভগবানের সম্বন্ধে কি ধারণা আপনার—"

"কি বলব—"

একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করে' রইলেন তিনি।

"আপনি কখনও কিছু দেখেন নি ?"

"আমি ? আপনি যা দেখছেন আমিও তাই দেখেছি। আকাশ-সমুদ্র-নদী-প্রান্তর-ফল-ফুল-সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রময় বিরাট বিচিত্র চেতনা—এর বেশী আর তো কিছু দেখি না।"

"এই তাহ'লে ভগবান ?"

"কি জানি।"

সসঙ্কোচে চুপ করে' রইলেন।

কিছুক্ষণ বসে' থেকে হারাধন বাবু উঠে এলেন।

ফিরবার পথে নরেন বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। নরেন বাবু বিদ্বান লোক।

"কোথা গেছলেন হারাধন বাবু ?"

"গঙ্গার ধারের সেই সাধুটির কাছে।"

"কে সাধু ? সেই পোড়ো বাড়ীটাতে থাকে যে লোকটা ?"

"হ্যাঁ।"

"সে সাধু কে বললে আপনাকে ! আস্ত ইডিয়ট একটা। পাছে বিদ্যে ফাঁস হয়ে যায় বলে' পারতপক্ষে কথা বলে না। বোগাস্ !"

হারাধন বাবু মৃদু হাসলেন একটু। নরেন বাবুর সঙ্গে তর্ক করবার সামর্থ্য নেই তাঁর।

নরেন বাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন— তার সাধু-ত্বের প্রমাণ পেয়েছেন কোন ?"

"না।"

"তবে ?"

হারাধনবাবু চুপ করেই রইলেন।

এই ভাবেই কাটছিল। হারাধন বাবু তবু সময় পেলেই যেতেন তাঁর কাছে। আর সকলের কৌতূহল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, হারাধন বাবুরই হয় নি।

•

কিন্তু কিছুদিন পরে হারাধন বাবুও যাওয়া বন্ধ করলেন। অন্য কোন কারণে নয়, তাঁর একমাত্র ছেলেটির টাইফয়েড হয়েছিল বলে'। তারই চিকিৎসা ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে অন্য কোন দিকে মন দেবার অবসরই পান নি তিনি। ছেলের অসুখ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠতে লাগল। চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেন নি তিনি। সাধ্যের অতীত হলেও শহরের সমস্ত নামজাদা চিকিৎসকদের একত্রিত করে' তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলছিলেন। অসুখ কিন্তু বেড়েই চলল। দিন কাটে ত রাত কাটে না। একদিন বিকেলে ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেলেন। আশা নেই, রাত কাটবে কিনা সন্দেহ। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হারাধন পুত্রের মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসে' চতুর্দ্দিকে অন্ধকার ছাড়া

আর কিছুই দেখতে পেলেন না। হঠাৎ সেই সাধুটির কথা মনে পড়ল। আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

······রাত তখন অনেক হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ মেঘের স্তর ভেদ করে' সবে উঠেছে। গঙ্গার জল কুলে। কুলে ভরা। হাওয়া উঠেছে একটা। কল-কল ধ্বনিতে গঙ্গাতীর মুখরিত। হন্তদন্ত হারাধন পোড়ো বাড়ীটাতে এসে হাজির হলেন। দেখলেন সাধুটি জেগেই আছেন। গঙ্গার ধারটিতে চুপ করে' বসে আছেন তন্ময় হয়ে।

"আমার ছেলেকে বাঁচান আপনি—"

তাঁর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন হারাধন বাবু।

"কে, হারাধন বাবু! ও কি—উঠুন—উঠুন—কি হয়েছে কি—?"

সব শুনলেন। শুনে বললেন—"আমি কি করব বলুন—আমার কি ক্ষমতা আছে—"

হারাধন বাবু অবুঝের মত কাঁদতে লাগলেন।

"দয়া করুন, দয়া করুন, আমার একমাত্র ছেলে—"

সাধু চুপ করে' রইলেন।

"বাঁচাবার কোন উপায় নেই? কোন আশাই নেই?"

"তার আয়ু যদি নিঃশেষ হয়ে থাকে—" এই পর্য্যন্ত বলে' আবার নীরব হলেন তিনি।

হারাধন বাবু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

"আমার একমাত্র ছেলে। কিছু একটা করুন আপনি। ইচ্ছে করলেই আপনি পারেন। সত্যি কোন উপায় নেই—নিশ্চয় আছে কিছু—দয়া করুন আপনি—"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাধু বললেন—"শুনেছি অপরে কেউ যদি নিজের আয়ু দান করে তাহ'লে নাকি আয়ুহীন লোক বাঁচতে পারে কিছুদিন। কিন্তু তা কি করে সম্ভব?

"আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন—দয়া করুন।"

সাধুর পায়ে ধরে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন হারাধন বাবু।

বিব্রত সাধু নিজের পা সরিয়ে নিয়ে অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন "ভগবানকে ডাকুন, তিনি যদি দয়া করেন সব হ'তে

পারে। তিনিই একমাত্র ভরসা, তাঁকেই ডাকুন। আমরা কে—"

অনেক করে' বুঝিয়ে হারাধন বাবুকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

হারাধন বাবু বাড়ী ফিরে দেখলেন ছেলের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দেখে বিস্মিত হলেন—নাড়ির অবস্থা ফিরেছে, আর ভয় নেই। ক্রমশঃ ভালর দিকে যেতে লাগল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মেঘ যখন কাটতে সুরু করে তখন যেমন দেখতে দেখতে সব পরিষ্কার হয়ে যায় হারাধন বাবুর ছেলের অবস্থা তেমনি দেখতে দেখতে ভাল হয়ে উঠল। পরদিন বেলা দশটা নাগাদ ডাক্তারেরা বললেন—"আর ভয় নেই, টালটা সামলে গেছে। এ যাত্রা বেঁচে যাবে বলেই মনে হচ্ছে—"।

উল্লসিত হারাধন বাবু সাধুটিকে খবর দিতে ছুটলেন। সেখানে পৌঁছে কাউকে দেখতে পেলেন না। ডাকলেন —সাড়া পেলেন না। ভিতরে ঢুকে দেখলেন আপাদ-মস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। আবার ডাকলেন উত্তর পেলেন না। ঠেললেন—তবু সাড়া নেই। গায়ের চাদরটা সরিয়ে চমকে উঠলেন। প্রাণহীন

মৃত-দেহটা পড়ে আছে শুধু—মুখে অদ্ভুত একটা প্রশান্ত হাসি।

•

অধরা •

অন্ধকারে একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম মাঠে। সে-ও সঙ্গে ছিল। তার-অঙ্গসৌরভ, বলয়-নিক্কণ, নিশ্বাসের মৃদু শব্দ সমস্তই অনুভব করছিলাম। পাশাপাশি ছিল, অতিশয় কাছাকাছি। মুখে কথা ছিল না। আমারও না, তারও না। আলাপ বন্ধ ছিল না তবু। দু'জনেই কথা কইছিলাম। কিন্তু নীরবে। তার সমস্ত অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল আমার কল্পনায়। তাই যখন নীরব ভাষায় সে আমাকে প্রশ্ন করলে—"আমাকে তুমি তো কখনও দেখনি, তবু চাইছ কেন এত করে?"—

তখন আমি অসঙ্কোচে উত্তর দিলাম—"তোমাকে আমি জানি।"

"কি করে' জানলে ?"

"কি করে' তা জানি না, কিন্তু জানি।"

নিবিড়তর হয়ে উঠল অন্ধকার।

পাশাপাশি হাঁটলাম অনেকক্ষণ···কতক্ষণ মনে নেই। মনে হচ্ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে।··· সহসা তার আর একটা নীরব প্রশ্ন সঞ্চারিত হল আমার মনে।

"এত করে' চাইছ যদি নিচ্ছ না কেন।"

"ধরা দিলে কই ?"

মদিরতর হয়ে উঠল তার অঙ্গ সৌরভ।

মনে হল তার চকিত দৃষ্টির চাহনি বিদ্যুতের মতো চিরে চলে গেল অন্ধকারকে। চতুর্দ্দিক্ বিদ্যুতায়িত হয়ে উঠল ক্ষণকালের জন্য।

"সর্ব্বদা ধরে রেখেছ, তবু বলছ ধরা দিইনি !"

"আমি যেখানে চাই সেখানে দাওনি।"

"কোথায় চাও ?"

"ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে।"

দ্রুততর হয়ে উঠল তার নিশ্বাস। স্পন্দিত হয়ে উঠল অন্ধকার···মনে হল খুব কাছে সরে' এসেছে···

তার চোখের জল গালে পড়ল আমার···এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল···বরফের মতো ঠাণ্ডা···

সহসা সচেতন হলাম, বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ির দিকে ফিরলাম। সে-ও চলেছে। মুষলধারা নামল। ছুটছি··· সে-ও ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে। সহসা অতিশয় কাছে এসে পড়ল যেন···তার ভিজে শাড়ীর স্পর্শ পেলাম মনে হল।···পাশাপাশি ছুটে চলেছি। নির্জ্জন পথ ঊর্দ্ধশ্বাসে পার হলাম নীরবে।—তারপর সুদীর্ঘ গলিটা। নীরন্ধ্র অন্ধকার। গলির শেষে আমার প্রকাণ্ড নির্জ্জন বাড়িটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এখনই গ্রাস করবে আমাকে। দ্রুতপদে বারান্দায় উঠলাম। সে-ও উঠল। ঘুরে ঢুকলাম, সে-ও ঢুকল। সুইচ্ টিপলাম তাড়াতাড়ি —তীব্র আলোয় ভরে উঠল চতুর্দ্দিক। দেখি, কেউ নেই।

প্রজাপতি

নীল শেড দেওয়া ইলেকট্রিক বাতিটার উপর কয়েকদিন থেকে একটি প্রজাপতি এসে বসছে। যতক্ষণ আমি টেবিলে বসে লেখা-পড়া করি ও শেড্‌টির উপরে চুপ করে' বসে থাকে। আশা মারা যাবার কিছুদিন পর থেকে ওই আমার সন্ধ্যাবেলার সঙ্গী হয়েছে।

বন্ধু সোমেশ্বর এসে প্রবেশ করলেন। ইদানীং প্রায় আসছে। ওকে দেখলেই আমার ভয় করে। ওর বোন বেলার সম্বন্ধে আজকাল যে একটু দুর্ব্বলতা পোষণ করছি সেটা ও টের পেয়ে গেছে। বেকায়দায় পড়ে গেছি। সোমেশ্বর এসেই কাজের কথা পাড়লে একেবারে

"বেলার সম্বন্ধে কি ঠিক করলে?"

চুপ করে' রইলাম।

"যা হোক একটা ঠিক করে' ফেল ভাই"—তারপর একটু থেমে বললে—" শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে তো করবেই সবাই করে, বেলাকে যদি কর; আমি নিশ্চিন্ত হই বেলা তোমাকে ভালও বাসে—"

সবই ঠিক—তবু চুপ করে রইলাম। আশা যখন বেঁচেছিল তখন তাকে বলেছিলাম যে আর কখনও বিয়ে করব না—এখন বুঝতে পারছি বিয়ে করতে হবে—বেলাকেই করতে হবে—কিন্তু দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না কিছুতেই।

"চুপ করে আছ কেন? তোমার সত্যি যদি মত না থাকে আমি জোর করতে চাই না। খুলে বলো সেটা। তাহলে দ্বিজেনের সঙ্গে চেষ্টা করি। তুমি রাজী হলে অবশ্য আর কোথাও যাব না আমি। দ্বিজেনের ভাব ভঙ্গী থেকে মনে হয় সে আপত্তি করবে না, তবে···"

ওই খোঁচা-গোঁফ-ওলা দ্বিজেন বেলাকে বিয়ে করবে! ওর সে মতলব আছে না কি?

বললাম—"দ্বিজেনের কাছে যাবার দরকার নেই। আমিই বিয়ে করব। তবে কিছুদিন সময় দাও ভাই।"

"তুমি কথা দিলে অপেক্ষা করতে পারি।"

চুপ ক'রে রইলাম।

"কথা দিচ্ছ তো?"

"দিচ্ছি।"

"বেশ। বেলাকে সুখবরটা দিয়ে আসি তাহলে।"

সোমেশ্বর চলে গেল।

এরপর যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য।

হঠাৎ আশার কণ্ঠস্বরে কে যেন বলে উঠল—"তাহ'লে আমার দায়িত্বও ফুরোল—আমিও চললাম।"

প্রজাপতিটা উড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

একই ব্যক্তি

বাক্স খুলে তাঁর এই চিঠিখানা পেলাম।

শ্রীমতী অসীমাসুন্দরী দেবী

প্রাণাধিকাসু,

দেখ তো, মিছি মিছি আমায় এত ভাবিয়েছিলে। কত রকম ‘হয়তো’ যে এসে আমায় চিন্তিত করে তুলেছিল তার আর ঠিক নেই। বড় চিঠি না লিখলে উত্তর দেবে না? কত বড়? ক’হাত লম্বা ক’হাত চওড়া চিঠি চাও? শেলী, রবীন্দ্রনাথই তো তোমার প্রিয় কবি জানতাম, হঠাৎ ‘মিলটনি’ ফরমাস করে’ বসছ কেন, বুঝতে পারছি না। যাক্—চেষ্টা করব তবু।

রাগ করেছি কি না? তুমি এ অবস্থায় কি করতে! রাগের চেয়ে আমার ভয়ই বেশী হয়েছিল কিন্তু। আমার গা ঘেসে আশঙ্কাও থাকে যে। আমি কয়েকদিন থেকে রোজই তোমার চিঠি আশা করছি। দু’একদিন পোস্টাফিস পর্য্যন্ত গেছি। চিঠি না আসাতে সত্যিই খুব খারাপ লাগছিল।

আচ্ছা, তোমার কাসি এখনও সারছে না কেন বলত? কাসি একেবারে না সারা পর্য্যন্ত গান গেয়ো না। সেরে গেলেই গাইতে হবে কিন্তু। তুমি লিখেছ, "ভগবান বোধহয় দয়া করে' বিয়ের সময়টুকু পর্য্যন্ত গানের গলাটা একেবারে নষ্ট করে' দেন নি। ভগবানের অসীম দয়া। আজকাল ভাবছেন এখন আর গান দিয়ে কি দরকার……"

তোমার অসীম দয়াময় ভগবানকে বলো—প্রভু যা যা করবার তা'তো করেইছ, এখন দয়া করে' তোমার দয়াটুক ফেরত নাও, আমি একটু গান গেয়ে বাঁচি। না হয় তোমায় কিছু 'সিন্নি' দেব! তোমার এই করুণাময় ভগবানটির সঙ্গে আমার যে আলাপ নেই—থাকলে আমিই আমার সিমুর জন্যে অনুরোধ করতাম একটু। সেতার বাজানোটা ছেড়ে দিলে সত্যি সত্যি? টাকার জন্যে ভাবছ কেন? তোমার টিউটারের মাইনে আমি যেমন করে' হোক পাঠাব। লিখছ—পরে শিখব। কিন্তু আমার নিজের জীবনে দেখেছি যেটা পরে শিখব বলে' ফেলে রেখেছি তা আর শেখা হয় নি। টাকার জন্যে ভেবো না তুমি, অত সঙ্কোচেরও দরকার নেই, অবিলম্বে আরম্ভ কর সেতার।

…এখন রাত্রি অনেক। রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়েছে। বারোটা বেজে গেছে বোধ হয়। বোধ হয় বলছি তার কারণ আমার প্রৌঢ় 'টাইম পীস'টি কেন জানি না হঠাৎ সাতটা এগারো মিনিটে থেমে গেছেন। কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। পথ-চলতি পথিক যেন হঠাৎ কিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে, কিম্বা হঠাৎ কোন স্মৃতি এসে মনের গতি-রোধ করে দিয়েছে ওর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে এই ঘড়ি যখন দোকানদারের গ্লাস কেসে বন্ধ ছিল তখন হয়তো কোন একটি সুন্দর সোনার হাত ঘড়ি এর পাশে থাকত। দুজনের ভাবও হয়েছিল হয়তো। হয়তো ভেবেছিল কোনদিন ছাড়াছাড়ি হবে না। সুন্দর স্বচ্ছ কাচের ঘরটিতে পাশাপাশি দিনের পর দিন কেটে যাবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন খরিদ্দার এসে হাজির। গরীব খরিদ্দার আমি কিনে নিলাম 'টাইম পীস্'টিকে। সোনার হাত-ঘড়ি গিয়ে অলঙ্কৃত করল কোন ধনীর মণি-বন্ধ। আজ চাঁদনি রাত, আমার 'টাইম পীস্' হয়তো তার সঙ্গিনীর কথা ভেবে ৭টা ১১ মিনিটের ঘরে থেমে আছে—খেয়ালই নেই যে সময় বয়ে চলছে। থাক, একে আজ দম দিয়ে চালাব

না? সোনার হাত ঘড়িটিও কি এর কথা ভাবছে আজ? ...অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে। আমার কিন্তু জ্যোৎস্নার চেয়ে ঘনঘোর বর্ষা বেশি ভাল লাগে। "আজু মধু চাঁদনী প্রাণ উন্মাদনী"—সত্যি কথা, কিন্তু এর চেয়েও—

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া

এই অবস্থাটা আরও বেশি ভাল লাগে আমার। অনেক কবি চাঁদের সঙ্গে প্রিয়ার মুখের তুলনা করেছেন। আমার এতকাল প্রিয়া ছিল না, জিনিসটা পড়েই এসেছি, মন্দও লাগেনি। এখন কিন্তু সিমুর মুখের সঙ্গে চাঁদের কোন রকম সাদৃশ্য আছে ভাবলেও রাগ হয়। একটুও নেই, থাকতেই পারে না। প্রথমতঃ, চাঁদের আলো ধার-করা, সিমুর আলো সিমুরই। দ্বিতীয়তঃ, চাঁদ তার এই ধার-করা রূপ নিয়ে আকাশে সমস্ত রাত 'ধরণা' দিয়ে পড়ে আছে, খেয়ালী-হাওয়ায় ভেসে-আসা যে কোন চল্‌তি মেঘ তাকে জড়িয়ে ধরে' যতক্ষণ খুশি থাকছে রূপালী নেশায় বিভোর হয়ে। চাঁদের এতটুকু

লজ্জা-সরম নেই। এ যেন কোন পথচারিণী অভিসারিকা পাউডার পমেড মেখে রূপের বেসাতি করতে বেরিয়েছে। এর সঙ্গে কি আমার সিমুর লজ্জামাখা সুন্দর মুখখানির তুলনা সম্ভব? আমি চোখের সামনে মুখখানি দেখতে পাচ্ছি যে। লজ্জা হলে' আবার চোখে হাত দেওয়া হয়। আমার চোখে-চোখে চেয়ে কতদিন কথা বল নি মনে আছে? এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়েছিল তোমার। শুভদৃষ্টি পর্য্যন্ত করনি—কম দুষ্টু নাকি তুমি। তোমার সঙ্গে চাঁদের তুলনা চলতেই পারে না। হ্যাঁ, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একটি কবি চাঁদের সম্বন্ধে বড় খাঁটি কথা বলেছেন। ভারতচন্দ্র। লোকটা সত্যিই প্রিয়াকে ভালবাসত।

"কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা
পদ-নখে পড়ে' তার আছে কতগুলা॥"

…আজ অনেক কথা লিখতে ইচ্ছে করছে।…কত কথা। এই গভীর রাত, চারিদিকে জোৎস্না, একা ঘর, বেচারি ঘড়িটি পর্য্যন্ত চুপ করে' চেয়ে আছে, তার মৌন ব্যথিত দৃষ্টিতে যেন আমার মনের কথাটি ফুটে রয়েছে।

ঠিক এই মূহূর্ত্তে তুমি আমার মনের কত নিকটে আছ…অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে…অথচ দুজনের দেহের

মধ্যে প্রায় ৪০০ মাইল ব্যবধান। ব্যবধান সত্ত্বেও কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে পেয়েছি, এসেছ তুমি আমার কাছে। দেখতে পাচ্ছি তুমি শুয়ে ঘুমচ্ছ··· এলোমেলো কয়েকটা চুল কাঁপছে কপালের উপর···কান দু'টি চুল দিয়ে ঢাকা···চোখ বুজে আমারই বালিশে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছ···

কুড়ি বছর আগেকার চিঠি।

একি শুধু, কথাই? মনের কথা নয়? কি জানি আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। বিয়ের পূর্ব্বে এঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম, বিয়ে করে' দেখলাম ঠিক সে-রকমটি নন তিনি। কেমন যেন ভালমানুষ গোচের। সর্ব্বদাই আমার সামান্যতম অসুবিধা দূর করবার জন্যে ব্যস্ত। তারপর ক্রমশঃ কতদিন কাটল। ক্রমশ কেমন বদলে গেলেন যেন। এখন মনে হচ্ছে ওঁকে চিনতে পারি নি। অথচ একসঙ্গে কুড়ি বচ্ছর একাদিক্রমে এক ঘরে বাস করেছি। এক বিছানায় শুয়েছি। এঁরই সাতটি সন্তানের জননী আমি। পাড়া-পড়শী আত্মীয়-স্বজন সকলের চক্ষেই আমরা আদর্শ দম্পতি ছিলাম।

কিন্তু একথা আজ স্বীকার করছি, আমাদের মনের মিল হয় নি। উনি যে-জগতের লোক ছিলেন, সে জগতে আমি অস্বস্তি বোধ করতাম। চিঠিতে ওঁর যে কান্ত-কোমল রূপ ফুটে উঠেছে, আসলে কিন্তু সেরকম লোক ছিলেন না উনি। অত্যন্ত রাশভারি কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। পান থেকে চূণ খসবার উপায় ছিল না। দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন এবং নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন। কাছাকাছি কেউ জোরে কথা বললেও বিরক্ত হতেন। বকতেন, এমনকি মারধোরও করতেন। ছেলেমেয়েরা এর জন্যে কত বকুনি খেয়েছে, ঝি-চাকর কতবার লাঞ্ছিত হয়েছে। অসুস্থ হলে পশুরা যেমন নির্জন স্থান খুঁজে আশ্রয় নেয়, কারও সান্নিধ্য পছন্দ করে না, ওঁরও অবস্থা অনেকটা তেমনি ছিল। এক-আধ দিন নয়, সারাজীবনই উনি এমনিভাবে কাটিয়েছেন। অথচ শরীর ওঁর বেশ সুস্থই ছিল। কেন যে এমন করতেন জানি না। মোট কথা, আমি বুঝতে পারিনি ওঁকে। একটা জিনিষ কিন্তু বলব—খুব কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনে কখনও কোন অকর্তব্য করেন নি। আমাদের আধিভৌতিক কোন অসুবিধা ঘটতে দেন নি। যতদিন বেঁচে ছিলেন,

আমাদের কোন কষ্ট ছিল না। মৃত্যুর পরও কোনও কষ্ট নেই। ছেলেদের মানুষ করে' গেছেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গেছেন, শহরে পাকা বাড়ি করে' গেছেন, লাইফ ইন্‌সিওরেন্স করে, গেছেন। সেদিক দিয়ে আমার কোন কষ্ট নেই। তবে এতদিনের সঙ্গীকে হারিয়ে একটা অভাব বোধ করছি বই কি। আর একটা কথা। তিনি মুখে যদিও বলেন নি কিছু কখনও (চিঠিতে অত কথা লিখতেন, মুখে কিন্তু বলতেন না কিছু) তবু এটা আমি অনুভব করতাম যে. তিনি আমাকে ভালবাসেন। মৃত্যুদিনের সে ঘটনাটা ভুলব না কখনও।

ডাক্তারবাবু আসতেই বললেন, চিকিৎসার জন্যে নয়—দেখা করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। চল্লুম—

"কোথায়?"

"কোথায় আবার। হুকুম এসেছে,—"

"ওসব কথা বলছেন কেন। কোন কষ্ট হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, বুকের কাছে একটু। ওসব কিছু নয়, সিমু তুমি একটা গান গাও—"

"কোন্‌টা গাইব।"

"যেটা খুশি।"

ডাক্তারবাবুর দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন—"হ্যাঁ, গান' না।"

ধরলাম—"জীবন-মরণের সীমানা ছড়ায়ে···"

গান শুনতে শুনতেই মারা গেলেন তিনি।

•

আজ নীলিমা আসবে। অত্যন্ত অধীর-চিত্তে তার প্রতীক্ষা করছি। নীলিমার অদ্ভুত ক্ষমতা, তার শরীরে নাকি প্রেতাত্মা ভর করে। যে-কোন লোকের প্রেতাত্মা সে নাকি আনতে পারে। সেদিন বকুল মাসীকে আনিয়েছিল নাকি। বকুল মাসীর গলার স্বর নাকি অবিকল শুনতে পেয়েছিল তার ছেলেরা।

নীলিমার চোকমুখ হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল। চোখের দৃষ্টিও কেমন হয়ে গেল যেন।

একি, এ যে ঠিক তাঁরই দৃষ্টি। নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে।

"আমাকে ডেকেছ কেন?

অবিকল তাঁরই গলার স্বর।

একটু ইতস্ততঃ করে' বললাম, "আমাকে চিনতে পারছ না?"

"না।"

"একবারেই চিনতে পারছ না?"

"না।"

"আমাদের মনে পড়ে না তোমার?"

"না।"

"একটুও না?"

"না।"

তাজমহল

প্রথম যখন আগ্রা গিয়েছিলাম তাজমহল দেখতেই গিয়েছিলাম। প্রথম দর্শনের সে বিস্ময়টা এখনও মনে আছে। ট্রেণ তখনও আগ্রা স্টেশনে পৌঁছয় নি। একজন সহযাত্রী বলে' উঠলেন—ওই যে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালাম।

ওই যে—

দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দ'মে গেলাম। চূণ-কাম-করা সাধারণ একটা মসজিদের মতো! ওই তাজমহল। তবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। হাজার হোক তাজমহল। শা-জাহানের তাজমহল।.......... অবসন্ন অপরাহ্নে বন্দী শা-জাহান আগ্রা দুর্গের অলিন্দে বসে' এই তাজমহলের দিকেই চেয়ে থাকতেন। মমতাজের বড় সাধের তাজমহল।......আলমগীর নির্ম্মম ছিলেন না। পিতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি তিনি...... মহাসমারোহে মিছিল চলেছে............সম্রাট্ শা-জাহান চলেছেন প্রিয়া-সন্নিধানে?...আর বিচ্ছেদ সইল না... শবাধার ধীরে ধীরে নামছে ভূগর্ভে ... ওই তাজমহলেই মমতাজের ঠিক পাশে শেষ-শয্যা প্রস্তুত হয়েছে তাঁর। আর একটা কবরও ছিল...হয় তো এখনও আছে...... ওই তাজমহলেরই পাশে। দারা সেকোর...

চূণকাম-করা সাধারণ মসজিদের মতো তাজমহল দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠে নি। জ্যোৎস্নার পূর্ব্বাভাষ দেখা দিয়াছে পূর্ব্ব দিগন্তে। সেই দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে।

অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্ম্মর-ধ্বনি কানে এল। ঝাউ-বীথি থেকে নয়—মনে হল যেন সুদূর অতীত থেকে, মর্ম্মর-ধ্বনি নয়, যেন চাপা কান্না। ঈষৎ আলোকিত অন্ধকারে পুঞ্জীভূত তমিস্রার মতো স্তূপিকৃত ওইটেই কি তাজমহল? ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। মিনার, মিনারেট গম্বুজ স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশঃ। শুভ্র আভাষও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে'। তারপর অকস্মাৎ আবির্ভূত হল—সমস্তটা মূর্ত্ত হয়ে উঠল যেন সহসা বিস্মিত চেতনা-পটে। চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজ-রাজেশ্বরী শাজাহান-মহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম।

তারপর অনেক দিন কেটেছে

কোন্ কনট্রাক্‌টার তাজমহল থেকে কত টাকা উপার্জ্জন করে, কোন্ হোটেল-ওলা তাজমহলের দৌলতে রাজা বনে' গেল, ফেরিওলাগুলো বাজে পাথরের ছোট ছোট তাজমহল আর গড়গড়ার মতো সিগারেট পাইপ বিক্রি করে' কত পয়সা পেটে রোজ, নিরীহ আগন্তুদের ঠকিয়ে টোঙাগুলো

কি ভীষণ ভীষণ ভাড়া নেয়—এ সব খবরও পুরানো হয়ে গেছে। অন্ধকারে, জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যায়, উষায় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে বহুবার বহুরূপে দেখেছি তারপর তাজমহলকে। এতবার যে আর চোখে লাগে না। চোখে পড়েই না। পাশ দিয়ে গেলেও নয়। তাজমহলের পাশ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয় আজকাল। আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি। তাজমহল সম্বন্ধে আর মোহ নেই। একদিন কিন্তু—গোড়া থেকেই শুনুন তাহলে।

সেদিন 'আউট ডোর' সেরে বারান্দা থেকে নামছি, এক বৃদ্ধ মুসলমান গেট দিয়ে ঢুকলো। পিঠে প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি বাঁধা। ঝুড়ির ভারে মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে বেচারীর। ভাবলাম কোনও মেওয়া-ওলা বুঝি। ঝুড়িটা নামাতেই কিন্তু দেখতে পেলাম ঝুড়ির ভেতর, মেওয়া নয়, বোরখাপরা মহিলা বসে' আছে একটি। বৃদ্ধের চেহারা অনেকটা বাউলের মতো, আলখাল্লা পরা, ধপধপে সাদা দাড়ি। এগিয়ে এসে আমাকে সেলাম করে' চোস্ত উর্দ্দু ভাষায় বললে—নিজের বেগমকে পিঠে করে' বয়ে এনেছে সে আমাকে দেখাবে বলে'। নিতান্ত গরীব সে। আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে 'ফি' দিয়ে

দেখাবার সামর্থ তার নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে'—

কাছে যেতেই দুর্গন্ধ পেলাম একটা। হাঁসপাতালের ভিতরে গিয়ে বোরখা খুলতেই (আপত্তি করেছিল সে ঢের) ব্যাপারটা বোঝা গেল। ক্যাংক্রাম্ অরিস! মুখের আধখানা পচে' গেছে। ডানদিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎস-ভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ান যায় না। দূর থেকে পিঠে করে' ব'য়ে এনে এ রোগীর চিকিৎসা চলে না। আমার ইনডোরেও জায়গা নেই তখন। অগত্যা হাঁসপাতালের বারান্দাতেই থাকতে বললাম। বারান্দাতেও কিন্তু রাখা গেল না শেষ পর্যন্ত। ভীষণ দুর্গন্ধ! অন্যান্য রোগীরা আপত্তি করতে লাগল। কম্পাউণ্ডার, ড্রেসর এমন কি মেথর পর্য্যন্ত কাছে যেতে রাজী হল না। বৃদ্ধ কিন্তু নির্ব্বিকার। দিবারাত্রি সেবা ক'রে চলেছে। সকলের আপত্তি। দেখে সরাতে হ'ল বারান্দা থেকে। হাঁসপাতালের কাছে একটা বড় গাছ ছিল। তারই তলায় থাকতে বললাম। তাই থাকতে লাগল। হাসপাতাল থেকে রোজ ওষুধ নিয়ে যেত। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ইনজেক্সান দিয়ে আসতাম। এভাবেই চলছিল।

একদিন মুসলধারে বৃষ্টি নামল। আমি 'কল' থেকে ফিরছি হঠাৎ চোখে পড়ল বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দুহাতে ধরে' দাঁড়িয়ে আছে। চাদরের তলায় রয়েছে বেগম সাহেব। নির্ব্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা! মোটর ঘোরালাম। সামান্য চাদরের আচ্ছাদনে মুষলধারা আটকায় না। বেগম সাহেব দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে। কাঁপছে ঠক ঠক করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বললাম—হাসপাতালের বারান্দাতেই নিয়ে চল আপাতত। বৃদ্ধ হঠাৎ প্রশ্ন করলে—এর বাঁচবার কি কোনও আশা আছে হুজুর।

সত্যি কথাই বলতে হল—না।

বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম।

পরদিন দেখি গাছতলা খালি। কেউ নেই।

আরও কয়েকদিন পরে—সেদিনও কল থেকে ফিরছি —একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে বুড়োকে

দেখতে পেলাম। কি যেন করছে বসে' বসে'। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। কি করছে বুড়ো ওখানে? মাঠের মাঝখানে মুমূর্ষু বেগমকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে না কি? এগিয়ে গেলাম। কতকগুলা ভাঙ্গা ইট আর কাদা নিয়ে বুড়ো কি যেন গাঁথছে।

"কি হচ্ছে এখানে মিয়া সাহেব—"

বৃদ্ধ স-সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।

"বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।"

"কবর?"

"হাঁ হুজুর।"

চুপ করে' রইলাম। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি থাক কোথায়?"

"আগ্রার আশে পাশে ভিক্ষে করে' বেড়াই গরীব-পরবর।"

"দেখিনি তো কখনও তোমাকে। কি নাম তোমার?"

"ফকির শা-জাহান।"

নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হিসাব

ছুই আর ছুই যোগ করে' যতক্ষণ চার হয় ততক্ষণ কোন গোল থাকে না। কিন্তু যদি কোন কারণে তা না হয় তাহলেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। পদির ব্যাপারে তেমনি বিভ্রান্ত হয়ে আছি।

ভাল নাম পদ্মাবতী, ডাক নাম পদি।

অত্যন্ত গরীবের মেয়ে। উপযুক্ত সহৃদয় আত্মীয়স্বজন এমন কেউ নেই যে 'ভার' নেয়। গরীবের মেয়ে হলেই বাধ্য হয়ে গৃহকর্ম্মনিপুণা হতে হয়। তা না হলে বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা, রান্না করা, উঠোন ঝাড় দেওয়া, ঘর নিকানো, গোয়াল পরিষ্কার করা কে করবে। পদি নিজের ঘরের কাজ তো সব করতোই, পাড়াপড়শীর ফরমাসও শুনত। কারো বড়ি দিয়ে দিচ্ছে, কারও সেলাই করে দিচ্ছে, কারো ছেলে আগলাচ্ছে। মামাদের অবস্থা একটু ভাল। কিন্তু তাঁরাও এমন লক্ষ্মী মেয়ের 'ভার' নিতে চান না। পাত্র কোথায়? তাছাড়া চারদিকেই লকলক্ করছে আগুন—ঘৃত-কুম্ভের ভার নেবে কে?

দুই আর দুই যোগ করে' ঠিক চার হয়ে যাচ্ছিল, আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম।

পদির নামে একটা কলঙ্ক রটল, পাড়ায় দু' একটা ছোঁড়া তাকে ইসারাও করল।—চলছিল। হিসেবে ভুল হয়নি।

আমরা জানতাম পদির বিয়ে হবে না এবং শেষ পর্য্যন্তও—সম্ভব্য পরিণতিগুলোকে স্পষ্টরূপে আর ভাববার চেষ্টা করতাম না। তবুও সেগুলো বিভ্রান্ত করেনি আমাদের, কারণ সেগুলো সব দুই আর দুইয়ে চারের পর্য্যায়ে। হিসেবের মধ্যেই।

হঠাৎ একদিন কিন্তু আচমকা এমন একটা কাণ্ড ঘটল যার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

গ্রামেরই ছেলে রামচরণ ছুটিতে এক-দিন গ্রামে ফিরে এল। রামচরণ নামটা যেমন ঘষা-পয়সার মতো, লোকটা তেমন নয়। বেশ জাঁদরেল লোক। রাজ-সরকারে হাজারখানেক না হাজার দেড়েক টাকা মাইনে পায়। ফার্ষ্ট ক্লাস ছাড়া চড়েনা। প্রত্যেক ছেলের জন্য একজন করে আয়া আছে। চার ছেলে, চার মেয়ে। হঠাৎ স্ত্রী-বিয়োগ হবার পর এই রামচরণ একদিন দেশে ফিরে এল এবং শুনলে

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না—ওই পদিকে বিয়ে করে' বসল।

আমরা চম্‌কে গেলাম বটে কিন্তু অঙ্ক কষে' দেখলাম হিসেব ঠিক মিলেছে। পদ্মাবতী রূপসী ছিল। অবিশ্বাসী মন অবশ্য বাজে তর্ক তুলেছিল দু' একটা। পদ্মার চেয়ে বেশী রূপসী আর একটি মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল তার, নিখুঁত সুন্দরী সে, বংশও ঢের ভাল, ধরেও ছিল তারা খুব—তবু রামচরণ পদ্মাকেই পছন্দ করলে কেন। পছন্দ-অপছন্দর নিগূঢ় হেতুটা কি? মনের এসব বাজে কৌতুহলকে অবশ্য প্রশ্রয় দিই নি। পছন্দ হয়েছে বিয়ে করছে—দুই আর দুইয়ে চার-এর আবার 'কেন' কি!

পদিকে বিয়ে করাতে রামচরণ দেব-পদ-বাচ্য হয়ে উঠল প্রায়। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। পদি খুব খুশি। একগা গয়না, দামী, কাপড়, জামা মাথায় চওড়া সিঁদুর, একমুখ হাসি, তার আলাদা রূপই খুলে গেল একটা।

যাবার দিনে ষ্টেশনে গেলাম সবাই। রিজার্ভ ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ি—ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে সেটাকে। রামচরণ উঠে বসল। ছেলেমেয়েরা পাশের কামরায়

ছিল। পদি উঠেই এক কাণ্ড করে বসল। উঠেই উপরের দিকে চেয়ে 'আঃ' বলে চীৎকার করে' উঠল সে। তারপরই অজ্ঞান। সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। মুখের সমস্ত হাসি মিলিয়ে গেল—ফুটে উঠল আতঙ্ক। উপরের দিকে হাত জোড় করে' বলতে লাগল,—আমার কোন দোষ নেই, আমাকে জোর করে' বিয়ে করেছে, আমি কিছু বলি নি—কিছু কোরো না, তোমার পায়ে পড়ি···।

সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেল সে।

ভূত?

আজকাল ভূত বিশ্বাস করে না কি কেউ!

বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা পদির অবচেতন মন বিশ্লেষণ করে যখন দুই আর দুইয়ে চার করবার চেষ্টায় ছিলেন তখন আর এক কাণ্ড ঘটল।

ছোট্ট একটা মাদুলি পরে পদি সেরে গেল হঠাৎ।

নিম গাছ

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করেছে।
পাতাগুলো ছিড়ে শিলে পিষছে কেউ।
কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।
খোস দাদ হাজা চুলকুনিতে লাগাবে।
চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।
কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।
এমনি কাঁচাই…
কিম্বা ভেজে বেগুন-সহযোগে।
যকৃতের পক্ষে ভারী উপকার।
কচি ডালগুলো ভেঙ্গে চিবোয় কত লোক…দাঁত ভাল থাকে।
কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুসী হ'ন।
বলেন—"নিমের হাওয়া ভাল, থাক, কেটোনা।"
কাটেনা, কিন্তু যত্নও করেনা।
আবর্জ্জনা জমে এসে চারিদিকে।
শান দিয়ে বাধিয়েও দেয় কেউ—সে আর এক আবর্জ্জনা।
হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরণের লোক এল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিড়লে না, ডাল ভাঙ্গলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠল,—"বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি···কি রূপ!

থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার···এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাঃ—"

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।

এপার ওপার

মেয়েটী কালো। যৌবনসীমা পার হয়েছে। তবু সুন্দরী। চোখে মুখে শ্রী আছে। দৃষ্টিতে ভাষা আছে। আমরা যখন গেলাম তখন সে ডিম ভাজবার আয়োজন করছিল আমাদেরই সম্বর্দ্ধনার জন্য। কাছেই হার্ম্মোনিয়ামটা রয়েছে। তার পাশই রয়েছে ফুটফুটে ছোট্ট একটি ছেলে। তার ছেলে নয়, পাশের বাড়ির ছেলে। আমরা গিয়ে বসলাম। মেয়েটি আমাদের দিকে একনজর চেয়ে ছেলেটির সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কইতে লাগল।

"ডিম খাবি একটু ?"

"না।"

"খা না, খেলে জাত যাবে না।"

"খাব না।"

"আচ্ছা, তা হলে গান শুনিয়ে দে এঁদের।"

রাজি হ'ল না। অনেক সাধ্যসাধনা করলে সে—কিছুতেই হ'ল না।

"কাল যে তোকে অত করে শেখালাম গানটা, ভুলে গেলি এর মধ্যে ?"

ছেলেটি উসখুস করতে লাগল। দ্বারের দিকে চাইলে একবার।

মেয়েটি আমাদের দিকে চেয়ে বললে—"আপনারা এসেছেন বলে' লজ্জা পাচ্ছে। তা না হলে আমার কথা ও খুব শোনে।"

ঝি-জাতীয় কে একজন উঁকি দিলে দ্বার প্রান্তে।

"আমাদের বাড়ির খোকন এখানে এসেছে ? ও মা, এই যে ! আমরা চারিদিকে খুঁজে অস্থির। এখানে আসা কেন এমন সময়ে—চল।"

"আমিই ডেকে এনেছিলাম। যাও, বাড়ি যাও।"

উঠে চলে গেল। মেয়েটির মুখখানা কেমন যেন একটু বিমর্ষ দেখাল। আমাদের দিকে ফিরে বললে—"ও আমাকে খুব ভালবাসে, জানেন।"

ডিম ভাজতে লাগল।

নীরবে কাটল কিছুক্ষণ।

কাপ্তেন একটি ছোট বোতল, কিছু মাংস এবং পাউরুটি নিয়ে প্রবেশ করলেন। এসেই বললে—"ঘুগনি করে' রেখেছ তো ?"

"হ্যাঁ।"

খাওয়া সুরু হ'ল। ঘুগনি খুব চমৎকার হ'য়েছিল। প্রশংসা করলাম।

একজন বললেন—"ও খুব ভাল রাঁধতে পারে। সেবার—"

রান্নার গল্প সুরু হয়ে গেল। বিরিয়ানী কবাব কোপ্তার নয়, মধ্যবিত্ত রান্নার। চচ্চড়ি, সুকতো, মোচার ডালনা, মাছের ঝাল, বেগুনের টক, খিচুড়ির গল্প আর শেষ হয় না। অথচ আমরা শুনতে গেছি গজল।

...গজল অবশ্য হ'ল দু'একখানা।

তারপর কথায় কথায় উঠে পড়ল তার বাড়ির কথা। উঠে পড়তেই সে হার্মোনিয়ম ছেড়ে বাড়ির গল্প সুরু করে' দিলে। পাড়াগাঁয়ে বাড়ি তার। বাড়িতে বিধবা মা আছে, বৌদি আছে, খোকন আছে, বুধি গাই আছে। কত গল্প। একটা পল্লীকে মূর্ত্ত করে' তুললে যেন চোখের সামনে।

"পাড়ার লোক আমায় খুব ভালবাসে, জানেন। একবার আমার অসুখ করেছিল, পাড়ার সকলের নাওয়া খাওয়া বন্ধ। নায়েবমশাই কাছারি থেকে

উঠে এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন, পুরুতমশাই রোজ শিবের মাথায় বেলপাতা দিতেন, ডাক্তারের তো কথাই নেই—রোজ তিনবার চারবার আসতেন। কত রকম ওষুধ, ইনজেক্‌সন। আমার মায়ের একটু শুচিবাই আছে, জানেন। বিলিতি ওষুধ ছুঁতেন না কিছুতে। বৌদি পাটের কাপড় পরে' ওষুধ খাওয়াতেন আমাকে—"

"ও সব বাজে কথা ছেড়ে তুমি সেই গজলটা ধর দিকি।" আদেশ করেলন কাপ্তেন।

মুখের হাসি যেন নিবে গেল তার। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। নামজাদা বাইজি অলকা। অলক দুলিয়ে মুচকি হেসে আবার সুরু করে' দিলে—"তেরি নজরিয়া—"

বিয়ে বাড়ি।

বাড়ির বড়বউ সুষমার একমূহূর্ত্ত অবসর নেই। রান্নার সমস্ত ভার তার উপর। আড়ময়লা কাপড়ে হলুদের ছোপ লেগেছে, চুলগুলোও বাঁধা হয় নি ভাল করে। উনুন কামাই যাচ্ছে—দ্রুতবেগে তরকারী কুটছে সে কোলের ছেলেটা কোল পায় নি সমস্ত দিন, কাছে বসে' ঘ্যান ঘ্যান করছে। মাছও কোটা হয় নি এখনও।

"ও ঝি, মাছগুলো কুটে দে না মা—কখন যে কি হবে—"

সুষমার দশ বছরের মেয়ে পুঁটি ছুটে এল উর্দ্ধশ্বাসে। উদ্ভাসিত মুখ তার।

"ও মা—মোটর এসে গেছে। আমাদের শোবার ঘরের জানালা দিয়ে সব দেখা যাচ্ছে। দেখবে? এস না!"

সুষমা তরকারি ফেলে রেখে ছুটল।

তার শোবার ঘরে অনেকেই এসে জুটেছে। যমুনা, মিনু, পদি, রুবি—আরও অনেকে। জানালা দিয়ে আসরটা বেশ দেখা যায়। আসরে লোকে লোকারণ্য। ওই যে নামছে মোটর থেকে। বাঃ কি সুন্দর! রং কালো, কিন্তু কি অপূর্ব্ব মুখশ্রী। শাড়িটা কি চমৎকার, কি মানিয়েছে! ওমা, শ্বশুর নিজে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করছেন। ভট্‌চায্যিমশায় নমস্কার করলেন হাত তুলে সসম্ভ্রমে! করবে না? কত গুণ ওর। আসরের অনেকেই উঠে দাঁড়াল। কেউ ত্রস্ত, কেউ বিস্মিত, কেউ মুগ্ধ। মহিমার দ্যুতি বিকিরণ করে' অলকা দেবী আসরে প্রবেশ করলেন।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুষমা।

যমুনা বললে—"আমরাও ওরই মতো মেয়েমানুষ, কিন্তু কত তফাৎ দেখ দিকি। দাসীবৃত্তি করতে করতেই জীবন কাটল আমাদের।

"পোড়া কপাল আর কি!"—রুবি বললে।

সুষমার মনে পড়ছিল নিজের কৈশোর জীবনের কথা। তার বাবাও ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছিলেন তাকে। খুব ভাল গান শিখেছিল সে। কত প্রশংসা করত সবাই তার গানের।···সভায় সমিতিতে সর্ব্বত্র গান গেয়ে বেড়িয়েছে সে বিয়ের আগে। বাজনাও শিখেছিল কত রকমের। সেতার, এস্রাজ, বেহালা, ব্যাঞ্জো······জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাজনা শুনে মেডেল দিয়েছিলেন একবার। ফুলের মতো ফুটে ফুলেরই মতই ঝরে' গেল জীবনের সে দিনগুলো!···কোথায় গেল?···

হঠাৎ সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ শিহরণ জাগল যেন তার। অলকা দেবী গান ধরেছে। ঠাকুরপো'র বিয়েতে একে এনে খুব ভাল হয়েছে। কি চমৎকার গলা। স্বপ্নলোকে উড়ে গেল সে যেন সহসা।···

"ও বৌমা, উনুনের আঁচ যে বয়ে গেল। কি করছ তুমি এখানে?"

শাশুড়ি প্রবেশ করলেন।

"এই যে যাই।"

সুগৃহিণী সুষমা মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল।

কেন

ছেলে হয় আর মরে।

ডাক্তার কবিরাজ সবাই হার মানলেন।

চতুর্থ শিশুর মৃত্যুর পর বাপ মা লক্ষ্য করলেন যে প্রত্যেকের চেহারা প্রায় একরকম। একটি শিশুই যেন বার বার আসছে আর চলে যাচ্ছে।

কেন? কি চায় ও? যত্ন হচ্ছে না?

পঞ্চম শিশু যখন হল তখন আঁতুড় ঘরেই সৌখিন জামা, নূতন বিছানা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হ'ল তাকে।

বাঁচল না।

অনেকে বললেন ব্রাহ্মণ ভোজন করালে ফল হবে?

ষষ্ঠ শিশুর জন্মদিনে ধুমধাম করেব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হল। এমন কি রোশনচৌকি পর্য্যন্ত বাজল।

বাঁচল না।

অজ্ঞাত কোন পাপ আছে না কি সঞ্চিত ?

সপ্তম শিশুর জন্মের পর প্রায়শ্চিত্ত করানো হ'ল যথাবিধি।

তবু বাঁচল না।

ঠিক একই রকম চেহারার শিশু কখনও ছেলে হয়ে কখনও মেয়ে হয়ে আসছে আর চলে যাচ্ছে।

মায়ের চোখের জল শুকোয় না।

বাপ যাকে পায় প্রশ্ন করে—কেন ?

অষ্টম সন্তান হয়ে গেল, বাপ বললে—ওকে এবার শাস্তি দিয়ে দেব, আর যেন না আসে। আর পারি না আমরা—

মরা শিশুর হাতের এবং পায়ের সব আঙ্গুলগুলো মুড়িয়ে কেটে দিলেন। নবম শিশু গর্ভে এল তবু। যথা সময়ে ভূমিষ্ঠও হ'ল। একটি কন্যা। মুখ অবয়ব সেই একরকম, কিন্তু হাতে পায়ে একটি আঙ্গুল নেই। এ ম'ল না।

এখনও বেঁচে আছে।

কেন ?

্রহ্মধাম্মণী

ীরেন্দ্রবাবু বিখ্যাত শিকারী।

তাঁহার বন্দুকের গুলিতে কত প্রাণী যে নিহত ইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তিনি যে সত্যই ীকারে সিদ্ধহস্ত তাহা বহু পাখী, শূয়ার, সাপ, বাঘ, ালুক, শিয়াল, সজারু, খরগোস, হরিণ, কুমীর, নুমান প্রাণ দিয়া প্রমাণ করিয়াছে। সকলেই তারিফ ়রিত। শুধু ঝোঁক নয়—বাল্যকাল হইতে এ বিষয়ে ্যোগও পাইয়াছিলেন তিনি প্রচুর। শিকার-দক্ষতা াভ করিতে হইলে শুধু ঝোঁক থাকিলেই হয় না—অর্থ এবং অবসর চাই। ধনীর দুলাল বীরেন্দ্রনাথের তাহা ছিল। এসব ছাড়া তাঁহার যোগ্যতাও ছিল। বীরেন্দ্র শুধু যে সাহসী ছিলেন তাহা নয়—সমর্থও ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সুগঠিত দেহে অসুরের মত শক্তি ছিল।

বীরেন্দ্রবাবু কিছুকাল পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতামাতা বহু পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করাতে বীরেন্দ্র-বাবুকে নিজেই সব করিতে হইয়াছিল। শতাধিক

পাত্রী দেখার পর বীরেন্দ্রবাবু মিনতিকেই পছন্দ করিলেন। কেন করিলেন তাহা বলা শক্ত। প্রথমত মিনতি গরীবের মেয়ে—দ্বিতীয়ত অতিশয় রোগা এবং তৃতীয়ত অত্যন্ত ভীরু। ভয়চকিত চঞ্চল চক্ষু দুইটি সম্ভবত তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

বিবাহের পর তিন মাস কাটিয়াছে।

সাঁওতাল পরগণার এক পাহাড়ি জঙ্গলে বীরেন্দ্র-বাবুরই জমিদারী। প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলের প্রান্ত দেশে সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়িটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন—শিকারের সুবিধার জন্যই। শিকারেরজন্য প্রায়ই তাঁহাকে এখানে অসিতে হয়। নানারকম শিকার পাওয়া যায় এই জঙ্গলে। বিবাহের কিঁছুদিন পূর্ব্বে তিনি এই জঙ্গলে প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপ মারিয়াছিলেন।

গভীর রাত্রি নয়—সন্ধ্যার একটু পরেই।

ইতিমধ্যেই কিন্তু চতুর্দ্দিক ঝিল্লী-ধ্বনিতে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। বাড়ীর ঠিক পিছনেই বড় একটা তেঁতুল

গাছ। তাহাতে অসংখ্য বকের বাসা। তাহাদের কলরব ও পক্ষবিধূনন বন্য অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিতেছে। চতুর্দ্দিকে কেমন যেন থম্‌থমে্‌ ভাব।

দূরে একটা ফেউ ডাকিয়া উঠিল।

মিনতির কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল।

শিকারীর-বেশে সজ্জিত বীরেন্দ্রকে সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—ওগো তুমি যেও না—আমার বড় ভয় ভয় করছে!

কোমরের বেল্‌ট্‌টা ভাল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে সহাস্যমুখে বীরেন্দ্র বলিলেন—পাগল না কি! মাচান বাঁধা হয়ে গেছে, 'কিল' হয়ে গেছে—না গেলে কি চলে?

—'কিল' কি?

—'কিল' মানে একটা মোষের বাচ্চাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল—কাল রাত্রে বাঘে সেটাকে মেরেছে। তারই কাছাকাছি একটা উঁচু মাচা তৈরী করিয়েছি—বাঘটা আজও ঠিক আসবে সেখানে।

বেল্‌ট্‌টাকে ভাল করিয়া কসিয়া লইয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া আবার বলিলেন—যদি আসে ফিরে যেতে হবে না বাছাধনকে আজ।

—আমার বড্ড ভয় করছে।

—ভয় কি ? ফাগুয়া ত রইলো !

—লক্ষ্মীটি, তুমি যেও না !

—পাগল নাকি !

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

মিনতি বলিল—আচ্ছা, আজ বিকেলে গরুর গাড়ী করে কি একটা পার্শেল এল। আমাকে দেখতে দিলে না কেন ? লুকিয়ে রেখেছ কেন বল না ?

হাসি চাপিয়া বীরেন্দ্র বলিলেন—রাত্রে নয়—কাল সকালে দেখো।

বীরেন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন।

মিনতি একা বিছানায় শুইয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। তাহার চোখে ঘুম নাই। একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল—একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি ভীষণ স্বপ্ন!—একটা বাঘ দুই থাবা দিয়া তাহার বুক চিরিয়া রক্তপান করিতেছে যেন!······অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া মিনতি শেষে উঠিয়া বসিল। উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ

কি যেন শুনিল। ও কি বকের শব্দ? কক্‌খনো নয়। ভারি মোটা গলায় কে যেন গাছের উপর বসিয়া কথা বলিতেছে। উঃ, এই দারুণ রাত্রি কতক্ষণে প্রভাত হইবে। সহসা তাহার মনে হইল আজ বিকালে কি পার্শেলটা আসিয়াছে দেখা যাক্। তবু খানিকটা সময় কাটিবে। পার্শেলটা উপরের ঘরে আছে। লণ্ঠনটা লইয়া ধীর পদসঞ্চারে মিনতি বাহির হইয়া গেল।

বীরেন্দ্র যখন বাসায় আসিয়া পৌছিলেন তখন সবে ভোর হইয়াছে।

দেখিলেন চাকরদের ঘরে ফাগুয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে গোলমালে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল।

—মাইজি রাত্রে ভয়-টয় পায় নি ত রে?

ফাগুয়া বলিল যে বাবু চলিয়া যাইবার পরই মাইজি সেই যে ঘরে খিল দিয়াছিলেন আর খোলেন নাই।

বীরেন্দ্র আগাইয়া গিয়া বন্ধ দ্বারে করাঘাত করিলেন।

কোন শব্দ নাই।

আরও কয়েকবার করিলেন।

এ বারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অধীর হইয়া শেষে তিনি দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

তথাপি দ্বার খুলিল না।

শেষে কপাট ভাঙিতে হইল।

ভিতরে ঢুকিয়াই প্রথমেই বীরেন্দ্রের চোখে পড়িল খানিকটা রক্ত গড়াইয়া আসিয়া দ্বারের কাছে জমিয়া রহিয়াছে।

কিসের রক্ত? মিনতি কোথায়?

বেশী খুঁজিতে হইল না—সিঁড়ির নীচেই তাহার মৃতদেহটা পড়িয়াছিল। একটু ঝুঁকিয়া বীরেন্দ্র দেখিল—মাথা ফাটিয়া গিয়াছে। নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া সমস্ত মেঝেটা ভিজিয়া গিয়াছে। চাপ চাপ রক্ত! সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া বীরেন্দ্র দেখিলেন কলিকাতা হইতে আগত stuffed ময়াল সাপটা কোণে কুণ্ডলীকৃত হইয়া রহিয়াছে। মিনতিকে সকালে ভয় খাওয়াইয়া মজা

দেখিবে বলিয়া কথাটা তাহার কাছে বীরেন্দ্র গোপন রাখিয়াছিলেন।

কে বলিবে সাপটা জীবন্ত নয়; উহার ভিতরে খড় আর তুলা-ভরা আছে তাহা বলিয়া না দিলে বোঝা অসম্ভব। কাল রাত্রে এই সাপটাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পলাইতে গিয়া মিনতি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিবে সে কল্পনাও করে নাই। বীরেন্দ্র ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাপটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার নকল চক্ষু দুইটি হইতে একটা হিংস্র দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে যেন! কিছু দিন পূর্ব্বে এই সাপটাকেই তিনি জঙ্গলে মারিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রের শিকার অভিযান ব্যর্থ হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরেই বীরেন্দ্রের অনুচরবর্গ হিংস্র শ্বাপদটার মৃতদেহ গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া লইয়া আসিল।

প্রকাণ্ড একটা বাঘিনী।

বীরেন্দ্রের অব্যর্থ লক্ষ্য তাহার মস্তক বিচূর্ণিত করিয়াছে। বীরেন্দ্রের সহসা মনে হইল বাঘটা কোথায়।

ছাত্র

কাঠফাটা রোদ, চতুর্দ্দিকে অগ্নি-বর্ষণ করিতেছে। আমার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার সমস্যা দেড় শত অঙ্ক এবং এক শত পৃষ্ঠা হাতের লেখা। গ্রীষ্মাবকাশের হোম-টাস্ক। থার্ড মাস্টারের রুদ্রমূর্ত্তি, রুদ্রতর ভাষণ এবং রুদ্রতম বেত্রাঘাতের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিবার অবসর নাই। আমি তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া আরও বেশি ভাবনা। সুতরাং নিদারুণ গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করিয়া গৌরীশঙ্কর খুলিয়া বসিয়া আছি। হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া থার্ড মাস্টারই প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম, একটু ভয়ও হইল। শুষ্ক মুখ, মাথার রুক্ষ চুলগুলা খাড়া হইয়া আছে, কোটরগত চক্ষু দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত রক্তবর্ণ। ভাবিলাম, কুঁজো হইয়া বসিয়াছি বলিয়া হয়তো ধমক দিবেন। তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিলাম। কিন্তু সেসব কিছু না করিয়া

তিনি অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারিস বাবা।"

ঘরের কোণে কুঁজায় জল ছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক গ্লাস আনিয়া দিলাম। ঢক ঢক করিয়া নিমেষে তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

"আর এক গ্লাস।"

দিলাম।

তাহাও নিমেষে শেষ হইয়া গেল।

"আর এক গ্লাস চাই। আঃ, বাঁচালি বাবা, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পাবার উপায় নেই কোথাও—।"

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

স্বপ্ন।

বাস্তব কিন্তু আরও নিদারুণ।

পরদিন প্রখর রৌদ্র ও গেঁটে বাতকে উপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ় আমি উত্তপ্ত বালির চড়া ভাঙ্গিয়া তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গা অভিমুখে চলিয়াছি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্কুলে যে থার্ড মাস্টারের নিকট পড়িয়াছিলাম, যিনি আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে

অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছেন—কাল সহসা তাঁহাকে স্বপ্ন দেখিয়া আমি—আপনারা যাহা বলিবেন তাহা আমি জানি, ফ্রয়েড চার্ব্বাক আমিও পড়িয়াছি—নিজের অযৌক্তিক আচরণে নিজেই বিস্মিত হইতেছি, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই—ঘাড়ে ধরিয়া কে যেন আমাকে লইয়া যাইতেছে।

তর্পণ আমাকে করিতেই হইবে।

রূপকথা

শিল্পীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে।

জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সাধনা—এই মর্ম্মর মূর্ত্তি! কত দিবসের, কত নিশীথের আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্ত স্বপ্ন—সহসা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। হতবাক্ শিল্পী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে—যে মর্ম্মর-প্রতিমাটি এত যত্নে সে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা সহসা পাষাণস্তূপে পরিণত হইয়াছে! প্রতিমা অন্তর্হিত হইয়াছে, যাহা পড়িয়া আছে—তাহা পাষাণ! হঠাৎ ভাঙিয়া গেল!

কেন এমন হইল? কে বলিবে? শিল্পীর সাধনা, শিল্পীর স্বপ্ন কখন কোন মন্ত্রবলে নিঃশেষ হইয়া যায় কে তাহার সন্ধান দিবে?

দিবারাত্রির অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যেই তাহার স্বপ্ন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিল, কঠিন পাষাণ যে মুহূর্ত্তে তাহার মানসীতে রূপান্তরিত হইল—যে মুহূর্ত্তে সে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—"যাক্, এতদিনে পরিশ্রম সার্থক হইল"—সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। মানসীর মৃত্যু! ইহাকে কি সে আর ফিরিয়া পাইবে?

প্রতিমা ফাটিয়া গেল—যাহা রহিল তাহা বিদীর্ণ শিলাখণ্ড। মুহ্যমান শিল্পী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

অনুজা ও অভিজিৎ আসিয়া দেখে, শিল্পী তেমনি-ভাবেই বসিয়া আছে। অনুজা শিল্পীর বিধবা দিদি। এই পাগল ভাইটিকে সে জননী-স্নেহে লালন করিয়াছে। সে খাইতে দিলে শিল্পীর খাওয়া হয়—তাহারই অনুরোধে যেন সে বাঁচিয়া আছে।

অভিজিৎ শিল্পীর প্রতিবেশী ও অনুজার প্রণয়ী। তাহাদের দেখিয়া অসহায়ের মত শিল্পী বলিয়া উঠিল—

"দেখ দিদি—দেখ অভিজিৎ—এ কি হয়েছে।"

অনুজা কিছু বলিল না।

অভিজিৎ বলিল—"তোমার মুক্তি হয়েছে। রাজ-শিল্পী তুমি, রাজসভায় যাও।"

…শিল্পী ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেল।

তাহার মানসীর স্মৃতি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল—রাজসভায় নয়, শ্মশানে!

মহাশ্মশান…

কাছে, দূরে চিতা জ্বলিতেছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়—চিতা—কেবল চিতা! নর, নারীর, দেশের, জাতীর, হৃদয়ের! কাহারও অনলশিখা গগনস্পর্শী—কেহ নির্বাপিতপ্রায়—কেহ নিবিয়া গিয়াছে। চিতাভস্ম লইয়া বাতাস উন্মাদ!

…অন্ধকারে মৃদু কলকলধ্বনি!…বৈতরণীর। সেই প্রায়ান্ধকার শ্মশানে শিল্পী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই মহাশ্মশানে তাহার মানসীর সন্ধান মিলিবে কি? মানসী কি মরিয়াছে…তাহাই বা কে বলিয়া দিবে। মানসী

কি মরে? মরিলেও কি তাহার সন্ধান পাওয়া যায়? অন্ধকার উত্তর দেয় না, শ্মশানের চিতা জ্বলে ও নেবে! সহসা শ্মশানভূমি অট্টহাস্যে শিহরিয়া উঠিল। সচকিত শিল্পী চিতার আলোকে দেখিল, হাসিতে হাসিতে একটী মূর্ত্তি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার মুখাবয়ব জটা-শ্মশ্রু-মণ্ডিত—চক্ষু-দুইটী জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায়—মুখে বিকট হাস্য! কণ্ঠে পুষ্পমাল্য—পুষ্পমাল্যকে বেষ্টন করিয়া এক বিষধর সর্প পিচ্ছিল সঞ্চরণে সর্ব্বাঙ্গ আকুঞ্চিত করিতেছে। তাহার এক হস্তে খর্পর—অন্য হস্তে বাঁশরি!—সম্পূর্ণ উলঙ্গ! শিল্পীর নিকটে আসিবামাত্র সে অট্টহাস্যে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া উন্মাদ-নৃত্য জুড়িয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত গান—

দুটো গরুর চারটে পা রে
তিনটে পা তার খোঁড়া,
টিয়ে পাখীর ডিমের মাঝে
ছিল টাট্টু ঘোড়া
আকাশ থেকে চাঁদকে পেড়ে
ভাতে দিলাম সেদিন,

নামিয়ে দেখি শূয়ারমুখো
গিরগিটি দু জোড়া।
শুঁয়ো পোকার সঙ্গে যেদিন
বিয়ে হল রাণীর,
তাই না দেখে মাকড়শাটার
পৃষ্ঠে হল ফোড়া—
হা-হা-হা-হা—

শিল্পী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে?"

"আমি? দেখদিকি ভাল করে?—চিনতে পারছ না?"

"না।"

"হা হা হা হা"—উন্মাদের হাসি।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিল্পী শুনিল—সে বলিতেছে—"আমি যে তুমি। তোমারই আর একটা রূপ আমি।"

"বুঝতে পারলাম না।"

"হা—হা—হা—হা"—আবার সেই অট্টহাস্য!

হাসি থামাইয়া হঠাৎ সে আবার বলিল—"তিনের পিঠে একটু কিছু দিলে একটা সংখ্যা হয় আর ঘোড়ার পিঠে একটা কিছু দিলে জিন্ হয়! কেমন মজা!

তোমার নাম কি বন্ধু?—যদিও আমি জানি,—তবু তোমার মুখে একবার শুনতে ইচ্ছে করছে—"

"আমার নাম চিত্রকারু। আমি শিল্পী—"

"আর বলতে হবে না। তুমি শিল্পী? আমি যদি বলি, তুমি স্বপ্ন!—মিছে কথা হয় তাহলে?—হা হা হা হা"—শিল্পী অভিভূত হইয়া দেখিতে লাগিল, আবার সে নৃত্য জুড়িয়াছে। বাঁশরীর আঘাতে হাতের খর্পরটা যেন হাসিতেছে। তাহার কণ্ঠের বিষধর সর্পের চক্ষে কুসুমের কোমলতা ফুটিয়া উঠিল— পুষ্পমাল্যের এক একটি ফুল যেন স্ফুলিঙ্গ।

হঠাৎ সে আবার নৃত্যগীত বন্ধ করিয়া দিল।

শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করিল—"ফুটবল খেলছিস্ কখনও? আকাশে গিয়ে? সূর্য্য চন্দ্রকে ফুটবল করে? আচ্ছা আর একটু বড় হ—তারপর খেলবি।"

অপরিসীম করুণায় সে শিল্পীর গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চক্ষু-দুইটি হইতে স্নেহ ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছে।

শিল্পী আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে? আপনার নাম কি?"

"আমার নাম 'যা-ইচ্ছে'—"

"যা-ইচ্ছে ?"

"হ্যাঁ—সকলের সঙ্গেই ত আমার আলাপ! তোর কাছেও ত জন্মাবধি আছি। তোর মানসীর চোখের মাঝখানে এতদিন বসেছিলাম, তুই ত বাটালির ঘায়ে আমাকেই অস্থির করে দিয়েছিস্ রোজ—এই দেখ—হা-হা-হা।"

শিল্পীর ভাষা হারাইয়া গিয়াছে। শিল্পী দেখিল, সত্যই ত ইহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন! কে এ?

"আমার মানসীর চোখের ভিতর আপনি ছিলেন?"

আবার পাগল নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে গান—

ভাবের যখন হয় রে অভাব
ভাষা তখন আসর জমায়
নফর যখন হয় রে নবাব
উজীরের সে মাইনে কমায়।
কান এবং নাকে মিলে
কান্নাকে যে জন্ম দিলে
চমকে গেল হায়রে পিলে
চোখের জ্যোতি বাড়ল অমায়।
উজীরের সে মাইনে কমায়—

সে থামিলে শিল্পী আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার কথা শুনুন। আপনি কি আমার মানসীকে চেনেন ?"।

পাগল হাসিয়া বলিল—"আমি তোমাকে চিনি। তুমি এখানে এসেছ কেন বল ত! যদিও আমি জানি, তবু তোমার মুখে শুনতে বেশ লাগে—হা-হা-হা—"

"আমার মানসীর স্মৃতি আমাকে এখানে টেনে এনেছে।"

"হা-হা-হা—মানসীর স্মৃতি! শ্যামা-নাপতিনির নাতনি মারা গেছে—রামময়ের ভাই মরে গেল—চিতা নেবেনি এখনও। তাদের স্মৃতি বুঝি তোমায় আকুল করছে না? কেবল মানসীর স্মৃতি নিয়ে তুমি ব্যস্ত! কেন বাছাধন?

"তাকে যে আমি ভালবাসতাম—"

"আর এদের বাসতে না কেন? আম, আঙুর, আচার এবং মাংস এবং আরো অনেক কিছু ত তুমি ভালবাস একসঙ্গে। মানসীকে ভালবাসবে আর রামময়ের ভাইকে বাসবে না কেন?"

"বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে আবার গান ধরিয়া দিল—

জলের মাঝে পড়লে চিনি
গলেই জেনো যাবে দাদা,
গরম দুধে পাঁউরুটি সে
নিমেষ মাঝে হবে কাদা।
ডাগর চোখে সাগর আছে,
চাউনিতে তার ডাইনি নাচে;
ভূত থাকে যে সেওড়া গাছে
পরনে তার কাপড় সাদা—
গরম দুধে পাঁউরুটী সে
নিমেষ মাঝে হয় যে কাদা।

হঠাৎ সে থামিয়া গেল। বলিল "এইবার আমাকে সরে পড়তে হবে। আমার গানের মানে ক্রমশঃ বোঝা যাচ্ছে!

শিল্পী কহিল—"না, না, আপনি বলে যান—আমার মানসী কোথায়? আপনি ত চেনেন তাকে? সে কোথায়?" "পাগল বলিল—"তাকে তুমিই ত মেরে ফেল্লে! দিন রাত উঠে পড়ে লেগে শেষ করে দিলে। অমনি সে মরে গেল।"

"আর পাব না তাকে?"

"আবার পাবে বৈ কি। আনন্দের দেশে যাও।"

"কোথায় সে দেশ?

খুঁজে বার কর।" তাহার পর কি ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা এই মালাটা গলায় পর। আনন্দের দেশের আভাস একটা পাবে। এ মালা কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবে না—একটু পরে পাখী হয়ে যাবে। তার পরে হাওয়া—"

মালাটি শিল্পীর গলায় পরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি শ্মশানের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল!

শ্মশান-দেবতার বরমাল্য গলায় পরিয়া শিল্পী আনন্দের দেশের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তন্ময় হইয়া গেল। কি অদ্ভুত দেশ!

"ওই দেশে যেতে হলে জ্ঞানরাজ্যে যাও আগে—"

চমকিয়া শিল্পী দেখিল গলার মালা পাখী হইয়া গিয়াছে। উড়িয়া উড়িয়া বলিতেছে—"এস আমার সঙ্গে—"

অনুজা চলিয়াছে।

চলিয়াছে তাহার ভায়ের সন্ধানে। পাগলের মত

কোথায় চলিয়া গেল সে? তাহার সেই অসহায় ভাই! না খাইতে দিলে সময় মত খায় না, বিছানা করিয়া না দিলে যেখানে-সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে! পরিষ্কার পরিচ্ছদ জোর করিয়া হাতে তুলিয়া না দিলে সে বেশ-বাস বদলায় না! এখনও শিশু। সন্তানহারা জননীর আকুলতায় অনুজা পথের শ্রান্তি ভুলিয়াছে।

...সহযাত্রী অভিজিৎ। অভিজিৎ খুঁজিতেছে শিল্পীকে নয়, অনুজাকে। অনুজা তাহার পথ-চলার সঙ্গিনী। পাশাপাশি চলিয়াছে—অথচ আজও সে অনুজার সন্ধান পায় নাই।

দিন যায়—রাত্রি আসে। কত ফুল ফুটিল, ঝরিল। কত চন্দ্র-সূর্য্য উঠিল, ডুবিল। পথের শেষ নাই—দুই জনে পাশাপাশি চলিয়াছে।

জ্ঞান-রাজ্য বহুদূর।

শিল্পী জ্ঞান-রাজ্যে আসিয়াছে।

অসীম এই দেশ। যতদূর দেখা যায় সীমা-রেখা

চোখে পড়ে না। এই দেশে কোথাও অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা—আকাশের সঙ্গে মিতালি করিতেছে। কোথাও মরীচিকাময় মরুভূমি—কোথাও উর্ম্মিসমাকীর্ণ মহাসমুদ্র—কোথাও আবার মনোহর পুষ্করিণী, পদ্মফুলে ভরা। এই দেশের কোথাও কণ্টকময়, কোথাও পুষ্পাকীর্ণ, কোথাও উষর, কোথাও শ্যামল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, ভিড় নাই। একটি বৃক্ষতলে শিল্পী একরাশি জটিল সূতার বাণ্ডিল লইয়া তাহার জট্ ছড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই পারিতেছে না—তাহার হস্তপদ সেই সূতার জালে যেন জড়ীভূত হইয়া যাইতেছে—বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু শিল্পীর চেষ্টার বিরাম নাই। চতুর্দ্দিক প্রখর সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু এই সূর্য্যালোক শিল্পীকে মুগ্ধ করিতেছে না। শিল্পী সূত্র-সমস্যায় মগ্ন। …দূরে সিদ্ধান্ত-শেখর প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন মহাজ্ঞানী। আপনার মনে সূতার জট্ ছাড়াইতে ছাড়াইতে আসিতেছেন—তাঁহার গাত্রে, হস্তে, মস্তকে নানা বর্ণের সূতার জাল। তিনি সূতার জট্ ছাড়াইতে ছাড়াইতে শিল্পীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। শিল্পী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সিদ্ধান্ত-শেখর স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি কে? কতদিন এ দেশে এসেছেন? ইতিপূর্ব্বে আপনাকে দেখেছি বলে ত মনে পড়ছে না!—"

শিল্পী বলিলেন—"আমি আনন্দের দেশের সন্ধানে যাত্রা করেছিলাম। শুনেছি আনন্দের দেশের সন্ধান জ্ঞানরাজ্যে পাওয়া যায়। এখানে এসে আমি আচার্য্য উদ্দীপনের উপদেশ প্রার্থনা করি। তিনি আমায় বললেন, এই যে রাশি রাশি জটিল সূত্র—এদের সমস্যা—এদের জটিলতা যে সমাধান করতে পারবে সেই আনন্দের দেশে যেতে পারবে। আমি তাই তাঁর উপদেশ অনুসারে এই জট্ ছাড়াবার চেষ্টা করছি। কত দিন লাগবে বলতে পারেন?"

সিদ্ধান্ত-শেখরের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"তার কি ঠিক আছে? সে ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। আমার ত বহুবৎসর অতীত হয়ে গেছে—এখনও ত সব বাকী, অধীর হয়ো না। ওই সাদা সূতার জট্ খুলতেই তুমি অধীর হয়ে পড়েছ—এর পর লাল, কালো, নীল, সবুজ, হলুদ—বহুবর্ণের জটিল সমস্যা আছে। একে একে সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে, তবে না আনন্দের দেশের সন্ধান পাবে!"

এই বলিয়া সিদ্ধান্ত-শেখর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

নিকটে দূরে সিদ্ধান্ত-শেখরের মত আরও দুই এক জনকে দেখা গেল। সকলেই সূত্র-সমস্যায় আকুল!

আর ভাল লাগছে না।

শিল্পীর ধৈর্য্য সীমা ছাড়াইয়াছে—হস্ত-পদ ক্লান্ত, অবসন্ন। চোখে ঘুম ঘিরিয়া আসিতেছে। সাদা সূতার জট্ এখনও জটিল হইয়াই আছে। আপন মনেই শিল্পী বলিয়া উঠিল, "আর ত পারি না। এর-যে কোন আদি-অন্তই খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক কষ্টে যদি খেই খুঁজে পেলাম, একটু পরেই আবার হারিয়ে যাচ্ছে। যার জট্ ছাড়িয়ে রেখেছিলাম, খানিকক্ষণ পরে দেখি আবার তাতে নূতন করে জট্ পড়েছে। কি করা যায়? আনন্দের দেশের কোন খবরই ত পাচ্ছি না! সন্দেহের পর সন্দেহ মনে জাগছে! এই জটিলতার মধ্যে কি—" সহসা শিল্পীর চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। হঠাৎ একটি গান কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল, অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর!

উড়ে গেল মন যে আমার
ভ্রমরের ডানায় ডানায়।…

একটি সুশ্রী কিশোরী, পিছনে লীলায়িত সবুজ ওড়না মাথায় বেণী দুলিতেছে, সর্ব্বাঙ্গে চাঞ্চল্য। হাততালি দিয়া গান গাহিতে গাহিতে সেই দিকে আসিল।

শিল্পী তাড়াতাড়ি সূতার বাণ্ডিল ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে?"

কিশোরী তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল মাত্র। কথার উত্তর দিল না, হাততালি দিতে দিতে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে সে গাহিয়া চলিল—

হঠাৎ এই সোনার আলো
নয়নে লাগ্‌লো ভালো
ভরেছে পরাণ আমার
ভরেছে রে কানায় কানায়।
উড়ে গেল মন যে আমার
ভ্রমরের ডানায় ডানায়—!

গান শেষ করিয়া কিশোরী শিল্পীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "যখন কেউ গান করে তখন তা'কে কথা কওয়াতে নেই। এ বুঝি আপনি জানেন না? আচার্য্য উদ্দীপন তা' বুঝি আপনাকে শেখাননি!"

শিল্পী বিস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একটা ঘুরপাক খাইয়া কিশোরী বলিল—"আমার নাম খেয়াল।"

শিল্পী আবার প্রশ্ন করিল—"ক্ষমা করবেন আমাকে। আপনি যে এই গান গাইলেন, এর অর্থ কি?"

"এর অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না। তা-ছাড়া কোন জিনিসের অর্থ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না কখনো! গানের অর্থ যাই হোক্—আপনার এখানে বসে থাকার অর্থ কি?"

"আমি আনন্দের দেশের পথ খুঁজছি—এই জটিলতার সমাধান করতে পারলেই—"

কিশোরী হঠাৎ হাসিয়া কবিতায় উত্তর দিয়া উঠিলেন—

জটিলকে আরো জটিল করিছ
সরল তাহারে করিতে গিয়া,
প্রেম-সমস্যা সমাধান লাগি
নিত্য যেমন করিছ বিয়া।

শিল্পীর মুখে কথা যোগাইল না।

কিশোরী আবার বলিল,—"এই সব বাজে সুতোর বাণ্ডিলে আপনি আনন্দের দেশের সন্ধান পাবেন—কে বলল আপনাকে?"

"আচার্য্য উদ্দীপন।"

"আচার্য্য উদ্দীপন যে একটি বাতুল, তা আপনি শোনেন নি বুঝি? এই দেশটাই ত পাগলের দেশ। পাগল দেখতে বেশ লাগে, তাই। মাঝে মাঝে এখানে আসি। আপনি দেখছি এখনও একটু প্রকৃতিস্থ আছেন—এই বেলা পালান।"

"কোথা যাব?"

"যে দিকে দু'চক্ষু যায়—"

বলিয়া কিশোরী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে শিল্পী বলিল, "একটু দাঁড়ান। আপনি থাকেন কোথায়?"

হাস্যকলরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া কিশোরী কহিল—"চিনতে পাচ্ছেন না আমাকে? আপনার মনের ভেতরই ত আমার বাসা।"

"কৈ, এর আগে কখনও ত দেখিনি আপনাকে—"

"বাঃ—সে দিন যে শ্মশানে দেখা হল রাত্রে! বা-রে বেশ!"

কিশোরী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে।

শিল্পী নির্ব্বাক।

শিল্পী অবশেষে বলিলেন—"আপনি আজ বলছেন এখান থেকে পালাতে। সেদিন ত আপনারই দেওয়া

গলার মালা পাখী হয়ে আমাকে এ দেশে নিয়ে এল—"

"আমি আর আমার মালা—কি এক জিনিস ?"

এই বলিয়া কিশোরী সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

শিল্পীও চলিয়াছে। সূত্রের বোঝা পিছনে ফেলিয়া তাহার মন উধাও হইয়াছে—কোথায় কে জানে!

কিন্তু এ রাজ্যে আর সে থাকিবে না।

কিন্তু বড় পিপাসার্ত্ত সে!

জল কোথায় ?

জল!······ওই যে!

মরু-প্রান্তরের মরীচিকার পিছনে সে ছুটিল:

অনুজা ও অভিজিৎ।

কত দিন' কত মাস, কত বর্ষ পথ অতিবাহন করিয়াছে। এই ত জ্ঞানরাজ্য। কই? এখানেও ত কেহ নাই! অনুজা আজিও তাহার ভাইকে পাইল না—অভিজিৎ অনুজার সন্ধান আজও করিতেছে। পথ-চলার শেষ নাই···কতদূর—!

সহসা অভিজিৎ কৃতার্থ হইয়া গেল।

অনুজা বলিতেছে—সে তৃষিতা, একটু জল চাই।

জল ?

ওই ত নিকটেই একটা কূপ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক ফুল-গাছ দিয়া ঘেরা। জল তুলিবার কোন উপকরণ কিন্তু নাই। অভিজিৎ সেই সন্ধানে অনুজাকে সেই কূপের পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল—"বালতি কিম্বা ঘড়া যাহোক্ একটা যোগাড় করে আনছি আমি। তুমি বোস।"

অনুজা বসিল— অভিজিৎ চলিয়া গেল।

অভিজিৎ আর আসে না। কোথায় গেল সে ?

অনুজার তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে।

সহসা অনুজা বলিয়া উঠিল—"উঃ বড় পিপাসা—আর ত পারি না। আমাকে একটু জল দেয় এমন কেউ নেই এখানে ?"

অনুজার কথা শেষ হইতে না হইতে সেই কূপের ভতর হইতে চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্পমাল্য-বিভূষিত একটি লোক বাহির হইয়া আসিল। অনুজাকে বলিল—"সুন্দর নির্ম্মল জল যদি চান আসুন আমার সঙ্গে"।

"কোথায় যেতে হবে ?"

"এই কূপের ভিতর। কোন ভয় নেই—আসুন।"

"আমার সঙ্গী যে এখনও ফেরেননি।"

"তাহলে অপেক্ষা করুন! আমি যাই—"

"একটু জল এনে দিতে পারেন না দয়া করে'—"

"না, সে জল আনা যায় না।"

"চলুন যাই তবে—"

অনুজা চলিয়া গেল।

অভিজিৎ আসিয়া দেখে অনুজা নাই। একটু দূরে সিদ্ধান্তশেখর সূতার জট্ ছাড়াইতেছেন! অভিজিৎ তাঁহাকেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একজন রমণী এখানে ছিলেন। কোথায় গেলেন তিনি? দেখেছেন আপনি?"

সিদ্ধান্তশেখর বলিলেন—"দেখেছি। তাঁকে সহজে এখন পাবে না। তিনি ধর্ম্মকূপে প্রবেশ করেছেন।"

"ধর্ম্মকূপ? সে আবার কি?"

"ওই যে আপনার সম্মুখেই রয়েছে। ওখানে কোন সরল অসহায় বিশ্বাসপ্রবণ প্রাণ যদি গিয়ে তৃষ্ণার জল চায় তাহলে ধর্ম্মকূপের অভ্যন্তর-বাসী কেউ এসে নির্ম্মল জলের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ওর ভিতরে নিয়ে যায়। একটি স্ত্রীলোককে এক্ষুনি নিয়ে গেছে আমি দেখেছি।"

অভি। আপনি দেখ্‌লেন অথচ বারণ করলেন না?

সিদ্ধান্তশেখর। বারণ করে কোন ফল হয় না বরং উল্টো ফল হয়। আমি আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবকে ওই ধর্ম্মকূপে পতিত হতে দেখেছি। এই জ্ঞান-রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি ওই রকম ধর্ম্ম-কূপ আছে। একবার যদি ওর প্রতি কোন মোহ জন্মায় তাহলে আর নিস্তার নাই। জ্ঞান-রাজ্যে সে আর ফিরে আসতে পারবে না।

অভি। আপনি এতে পড়েন না কেন?

সি। আমি যে নাস্তিক।

অভি। আমি কি প্রবেশ করতে পারব?

সি। তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করুন। আপনাকে যদি যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন—ওঁরা নিজেরাই এসে সমাদরে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

অভি। আমি যদি লাফিয়ে পড়ি?

সি। (হাসিয়া) তা হয় না। ওর কিছুদূর গিয়েই একটা রুদ্ধদ্বার আছে। অবিশ্বাসী নাস্তিকের পক্ষে তা চির-রুদ্ধ।

এই বলিয়া সিদ্ধান্ত-শেখর চলিয়া গেলেন।

অভিজিৎ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না।

তারস্বরে তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করিলেন—কেহ আসিল না।

ভিতরে লাফাইয়া পড়িলেন—কিন্তু উঠিয়া আসিতে হইল।

সর্ব্ব-প্রকার চেষ্টা তিনি করিলেন—কিন্তু ধর্ম্মকূপ তাঁহার নিকট রুদ্ধই রহিয়া গেল।

অনুজা আর ফিরিবে না—?

সে কি!

শিল্পী,—উদ্‌ভ্রান্ত শিল্পী—চলিয়াছে।

চতুর্দ্দিকে হতাশার মরুভূমি—মৃগতৃষ্ণিকার মায়া-সরোবর রচনা করিতেছে। তৃষ্ণার্ত্ত শিল্পী তাহাদেরই উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। তৃষ্ণা ত মিটিল না—কিন্তু শক্তির যে শেষ হইয়া আসিল!

তপ্ত বালুকণার জ্বলন্ত অনুভূতি—ঘূর্ণীবাতাসের উন্মত্ত নর্ত্তন—মরীচিকার ছলনা!

শিল্পীর বিস্রস্ত কেশ, বিক্ষত চরণ। নয়নে তীব্র জ্বালা, বক্ষে নিদারুণ পিপাসা। বিশুষ্ক রসনায় অব্যক্ত হাহাকার—কোথায়—কোথায়—কোথায়—!

ওই যে আর একটু দূরে—ওই ত শ্যাম অরণ্যানীর স্নিগ্ধকান্তি।—জলধারার আভাস পাওয়া যাইতেছে যেন!

মরীচিকার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে সহসা শিল্পী আর পারিল না। তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ তপ্ত বালুকায় লুটাইয়া পড়িল।

কাছে—দূরে মরীচিকার স্বপ্ন রচনা করিতেছে। এখনও!

ধীরে ধীরে একটী মরীচিকা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

…একটি মানবী মূর্ত্তি।

সুন্দরী—যুবতী—তন্বী!

ধীরে ধীরে সে শিল্পীর নিকট আসিল।

ধীরে ধীরে কহিল—"ওঠ, আমি এসেছি"—

ধর্ম্মকূপের অভ্যন্তর।…চতুর্দ্দিক বন্ধ; আলোক-প্রবেশের পথ নাই। ধূপ-ধূনার ধূমে সমাচ্ছন্ন। হোমাগ্নি জ্বলিতেছে। রাশি রাশি মৃত কিম্বা মৃতপ্রায় পুষ্পের শবদেহ। এখানে মহাধার্ম্মিক সকলেই অন্ধ।

এক একজন হাত ধরিয়া তাহাদের লইয়া বেড়াইতেছে। বিবিধ মূর্ত্তি। কাহারও শিখা—কাহারও জটা—কেহ মুণ্ডিত-মস্তক—কেহ পট্টবস্ত্র পরিহিত—কেহ উলঙ্গ—কেহ রক্তাম্বরধারী।

…সিংহবাহিনী-মূর্ত্তির পদতলে অনুজা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সরলতার প্রতিমূর্ত্তি একটী নারী বসিয়া গান গাহিতেছে। তাঁহার নাম বিশ্বাস। এই গানের সুরই ধর্ম্মরাজ্যর প্রাণ-মন্ত্র।

ডাকো শুধু ডাকো—
তাঁহারি চরণে মরম-খানিরে
উজাড় করিয়া রাখো।

বেদনার বোঝা চরণের তলে
ভিজাইয়া রাখ নয়নের জলে
সকল বেদনা ঘুচিবে মুছিবে
যেও না, দাঁড়ায়ে থাকো!

বেদনার কথা লুকায়ে রেখোনা
সরমের কথা বৃথাই ঢেকোনা
কেবল তাঁহার মোহন মূরতি
ব্যথিত মরমে আঁকো!

এই একই মন্ত্রের বিবিধ ভাষা! অন্ধকারে অন্ধের প্রার্থনা। অনুজা অন্ধ হইয়াছে। প্রার্থনা করিতেছে, 'ভাইকে ফিরাইয়া দাও'—পিপাসা কিন্তু মেটে নাই। অভিজিৎ কখন জল আনিবে—মনে মনে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

অভিজিৎ মরুভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অনুজার মত বিশ্বাস তাহার নাই···ধর্ম্ম-জগতে সে স্থান পাইল না। শিল্পীর মত স্বপ্ন নাই, কোন মরীচিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল না। সংসারের সাধারণ মানুষ সে। শিল্পী তাহার বন্ধু ছিল—তাহার পাগলামির জন্যই তাহাকে ভালবাসিত। অনুজাকে সে জীবন-সঙ্গিনী করিতে চাহিয়াছিল। পাইল না। কাহাকেও পাইল না!

হতাশার মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। অভিজিৎ যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—জীবনের সমস্তটা যখন বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে তখন তাহার সহিত এক ফেরিওয়ালার দেখা হইল। নাম তার ব্যসন। অভিজিৎ তাহাকে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল।

"তুমি কে ভাই ?"

"আমি একজন ফেরিওয়ালা !"

অভি। ফেরিওয়ালা ? এই মরুভূমির মাঝখানে ফেরিওয়ালা !

ব্যসন। আজ্ঞে হ্যাঁ। এইখানেই আমার সমঝদার বেশী—

অভি। কি আছে—তোমার কাছে ?

ব্যসন। নানারকম জিনিস আছে। কি চান বলুন ?

অভি। দু'একটা নাম কর দেখি—

ব্যসন। তাস, পাশা, গান, সাহিত্য, সঙ্গীত, মদ।

অভি। মদ আছে।

ব্যসন। আছে ?

অভি। দাম ত আমার কাছে এখন নেই।

ব্যসন। আমার কাছে আসতে হলে অগ্রিম দাম দিয়ে তবে আসতে হয়। তা আমি পেয়ে গেছি। জিনিসটার দাম যথা-সময়ে ও যথা-স্থানে আপনার কাছে আদায় করে নেওয়া হবে।

অভি। (সাগ্রহে) দিন তবে।

বহুকাল পরে অনুজা ও অভিজিতের দেখা হয়।

অনুজা অন্ধ—অভিজিৎ মত্ত।

কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে নাই।

আনন্দের দেশ। চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল। অজস্র ফুল, অজস্র হাসি—অনবদ্য সঙ্গীত—অফুরন্ত আনন্দ। তরুণ-তরুণীর হাট। বিশ্বের যৌবন এখানে অক্ষয় হইয়া আছে।

একটি নির্জ্জন চাঁপা-গাছের-তলায় বসিয়া শিল্পী মরীচিকা-সুন্দরীর কর্ণমূলে স্তুতিগান করিতেছে—"তুমি কত সুন্দর!"

শিল্পীর সেই মর্ম্মর-প্রতিমা?

তাহা এখনও ভগ্ন-বিদীর্ণ!

শ্যাম শৈবালদল আসিয়া তাহার বিদীর্ণ-স্থানটুকু ঢাকিয়া দিতেছে।

স্বপ্ন

নিদারুণ দারিদ্র্য। দুই বেলা অন্ন জোটে না, পরিধানে ছিন্ন মলিন বসন। অপরিচ্ছন্ন পল্লীতে খোলার ঘরে তবু দিন কাটিতেছিল। কিন্তু নূতন একটি সমস্যার উদয় হইয়াছে, পুঁটি আসন্নপ্রসবা। যদিও প্রথম সন্তান, তবু আনন্দ নাই। দীন-দরিদ্রের অভাব অনশনের মধ্যে কোন্ হতভাগ্য আসিতেছে কে জানে! পুঁটি বিপিন উভয়েরই চিন্তার অন্ত নাই। যেদিন ব্যথা ধরিল, সেদিন সেই সরু গলিতে একটি দামী মোটর প্রবেশ করিল এবং মোটর হইতে কাঁচাপাকা-গোঁফ ঝাঁকড়া-ভুরুওয়ালা এক ব্যক্তি অবতরণ করিলেন। লোকটি খর্ব্বাকৃতি। গায়ে দামী শাল, পায়ে দামী জুতা, অনামিকায় দামী আংটি। ভদ্রলোক নামিয়া প্রশ্ন করিলেন, এগারো নম্বর বাড়ি কোন্‌টা ?

পাড়ার এক ব্যক্তি খোলার ঘরগুলি দেখাইয়া দিল।

ওই খোলার ঘরগুলো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ির মালিক সামনের ঘরটায় থাকেন, পেছনের ঘরগুলো ভাড়া দেন। সবগুলোরই এক নম্বর।

কি দুর্দ্দৈব!

অস্ফুট কণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া ভদ্রলোক আগাইয়া গেলেন। বাড়ির মালিক সম্মুখের দাওয়ায় বসিয়া ছিলেন।

আপনিই কি এই বাড়ির মালিক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনার বাড়িতে বিপিন ব'লে কি কোন ভাড়াটে থাকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তার স্ত্রীর নাম কি পুঁটি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি কি আসন্নপ্রসবা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কবে নাগাদ ছেলে হবে বলতে পারেন আপনি?

আজই হতে পারে, শুনছি ব্যাথা ধরেছে।

ও, তাই নাকি? তা হ'লে তো দেরি করা ঠিক হবে না। এই রঘুবীর সিং, তুমি গিয়ে ওদের নিয়ে এস তা হ'লে, জল্‌দি।

মোটর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ভদ্রলোক পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া রোয়াকটা ঝাড়িয়া বসিতে যাইতেছিলেন, বাড়িওয়ালা বাধা দিল।

ওখানে বসবেন না, আমি মোড়া বার ক'রে দিচ্ছি।

মোড়ায় উপবেশন করিয়া ভদ্রলোক একটি সিগার ধরাইলেন এবং বলিলেন; এখানে নহবৎ বসাতে চাই, তার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন ?

নহবৎ ? কেন ?

কেন পরে বলছি। ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন ?

এখানে কি ক'রে ব্যবস্থা হয় এখন !

হুঁ, মুশকিল বটে। আচ্ছা, ফুটপাতে ব'সেই বাজাবে। এপাড়ায় যতগুলো শাঁখ আছে যোগাড় করুন। পুঁটি-মায়ের ছেলে হবামাত্র বাজাতে হবে। প্রত্যেক শাঁখের জন্যে আমি নগদ দশ টাকা ক'রে দেব। যোগাড় করতে পারবেন ?

এক্ষুনি। তা হবে না কেন ?

বিস্মিত বাড়িওয়ালা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

যান তা হ'লে, দেরি করবেন না।

পকেট হইতে এক শত টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া বাড়িওয়ালার হস্তে দিলেন, বাড়িওয়ালা দ্রুতপদে

বাহির হইয়া গেল। বিস্ময়কর খবর রটিতে বিলম্ব হইল না, দেখিতে দেখিতে ভিড় জমিয়া গেল। রঘুবীর সিং আসাসোঁটাধারী জরির পাগড়ি পরা একদল বরকন্দাজ আনিয়া সারি সারি দাঁড় করাইয়া দিল। নহবৎও লইয়া আসিল। তাহারা ফুটপাতে বসিয়াই আশাবরী রাগিণী বাজাইতে লাগিল। একজন ডাক্তার ও নার্স আসিয়া পুঁটির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন।

কৌতূহলী জনতার আগ্রহাতিশয্যে খর্ব্বাকৃতি ভদ্রলোক আসল ব্যাপারটি অবশেষে খুলিয়া বলিলেন।

রাজা নেহাল সিং আমার মনিব ছিলেন। লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি রেখে অপুত্রক অবস্থায় তিনি মারা যান। আমাকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন, সমস্ত সম্পত্তি আমাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। কাল রাত্রে হঠাৎ এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখলাম। আমার মনিব যেন আমাকে বলছেন, ঐশ্বর্য্যের সুখ তো অনেক ভোগ করেছি, দারিদ্র্যের সুখ কি তাও একবার ভোগ করবার ইচ্ছে আছে। কাল আমি এক দরিদ্রের ঘরে জন্মাব, আমার মায়ের নাম পুঁটি, বাবার নাম বিপিন, ঠিকানা এই। ঠিকানাটা দিয়েই তিনি অন্তর্দ্ধান করলেন, আমারও তখন ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকালে উঠে ভাবলাম, একবার

খোঁজ নিয়ে আসি। সত্যিই যদি তিনি আবার আসেন, তা হ'লে তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। খোঁজ নিয়ে দেখছি, স্বপ্ন মিথ্যে নয়। তাই সামান্য একটু ব্যবস্থা করেছি। আপনারা পাড়াসুদ্ধ সকলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করুন, খরচ যা লাগে আমি দেব। বিপিনবাবু এখনও ফেরেন নি? তাঁর ছেলের সম্পত্তিও তাঁর হাতে আমি ফিরিয়ে দিতে চাই, বুঝলেন।

হঠাৎ বাড়ির ভিতর হইতে বহু শঙ্খ একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। রাজা নেহাল সিং জন্মগ্রহণ করিলেন। নহবতে আশাবরী তখন জমিয়া উঠিয়াছে।

নন্দী ক্ষ্যাপা

ট্রেণ থেকে নেবেই একটি দুঃসংবাদ পেলাম—'কনেক্‌সন্' 'মিস্' করেছি। পরবর্ত্তী ট্রেণের জন্য সাত ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। সময় কাটাবার কোন আয়োজন বা উপকরণ সঙ্গে নেই। বন্ধু নেই, পরিবার

নেই, এমন কি একখানা বই পর্য্যন্ত নেই। সম্বলের মধ্যে ছোট একটি সুটকেশ—তাতে খান দুই কাপড়, গামছা, কামাবার সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছু নেই। ষ্টেশনের দিকে চেয়েও সান্ত্বনা পাবার মতো চোখে পড়ল না কিছু। ছোট ষ্টেশন। হুইলার নেই। গোটা দুই ফেরিওলা, কয়েকটা কুলি এবং জন দুই ষ্টেশনের বাবু (তাঁরাও কাজে ব্যস্ত)—এদের কেউ আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। সাত ঘণ্টা চুপ করে' বসে থাকাও তো মুস্কিল।

সুটকেসটি হাতে ঝুলিয়ে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। একটু দূর গিয়েই একটি খাবারের দোকান চোখে পড়ল। ঢুকে কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, এখানে দেখবার মতো কিছু আছে কাছে-পিঠে? সমস্ত দিনটা কাটাই কি করে?"

"এখানে দেখবার মতো আর কি আছে! তবে নন্দী ক্ষ্যাপাকে যদি দেখতে চান চেষ্টা করতে পারেন।"

"সে আবার কে?"

"সাধক একজন, শ্মশানে থাকে। তবে গেলেই যে দেখা পাওয়া যাবে তার কোন মানে নেই।

নদীর চড়ায় কখন কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না—মন মরজি—”

“শ্মশান কত দূর এখান থেকে ?”

“আধ ক্রোশটাক হবে—এই রাস্তা ধরে’ চলে গেলেই দেখতে পাবেন। মা-কালীর মন্দির আছে—”

কি আর করি, শ্মশানের দিকেই অগ্রসর হলাম।

বেশ ভাল লাগল। চমৎকার নির্জ্জন জায়গা। পাশ দিয়ে একটি নদী বইছে। নদীর ধারেই কালী-মন্দির। মন্দিরের চার দিকে পাকা প্রশস্ত বারান্দা। মন্দিরে কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই। মন্দিরের কপাট খোলা রয়েছে। সামনে দাঁড়াতেই কালীপ্রতিমা চোখে পড়ল। লেলিহ-রসনা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি। প্রণাম করলাম। একটা বলিষ্ঠ কালো কুকুর মন্দির থেকে বেরিয়ে এল, ক্ষণকাল আমার দিকে চেয়ে রইল, তার পর চলে গেল। আমি নদীর ধারের বারান্দাটায় গিয়ে চুপ করে’ বসে রইলাম। বারান্দার নীচেই খানিকটা জমি, তারপরই কণ্টকাকীর্ণ নদী তীর, ঝোপ

ঝাড়ে পরিপূর্ণ, গোটাকয়েক গ্রন্থিল আশশেওড়া গাছ নদীর উপর ঝুঁকে আছে। চতুর্দ্দিক কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে, একটি পাখী পর্য্যন্ত ডাকছে না। দিনের বেলাও গা ছম ছম করতে লাগল। তবু কিন্তু উঠে পালিয়ে আসতে পারলাম না। অদ্ভুত একটা আকর্ষণী শক্তি আমাকে যেন টেনে বসিয়ে রেখে দিলে। বসে রইলাম। সমস্ত মনটা উদাস হয়ে আসতে লাগল ক্রমশঃ। কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না—হঠাৎ একটা কান্নার শব্দে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। মন্দিরের সামনের দিক থেকে কান্নাটা আসছে মনে হ'ল। উঠে সেদিকে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা মড়া এসেছে। মড়া বয়ে এনেছে জন ছয়েক লোক, তাছাড়া সঙ্গে দুটি স্ত্রীলোক রয়েছে। একটি কম বয়সী—বছর ষোল হবে—আর একটি প্রৌঢ়া। একজন স্ত্রী, একজন মা। দুজনেই খুব কাঁদছে। শুনলাম সর্পাঘাতে মারা গেছে লোকটি। কে যেন ওদের বলেছে যে নন্দী ক্ষ্যাপা যদি কৃপা করে তাহলে ও বেঁচে যাবে। সেই আশায় এসেছে ওরা।

একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"কতক্ষণ এসেছেন আপনি?"

"প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে!"

"নন্দী বাবার দর্শন পেয়েছেন?"

"না, আমি তো কাউকেই দেখি নি।"

শ্মশানের ডোমটাও এসে জুটেছিল। সে বললে—"এখন ব'স খানিক—উ কখন যে কুথায় থাকে—কেউ বলতে লারে—"

সঙ্গে সঙ্গে মড় মড় করে, শব্দ হ'ল একটা। ফিরে দেখি নদীর ধারের ঝোপ ঝাড় কাঁটা বন ভেঙ্গে আবির্ভূত হচ্ছেন নন্দী ক্ষ্যাপা। বিরাট পুরুষ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। জবা ফুলের মতো লাল চোখ। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখা। বিরাট একটা মত্ত মহিষ যেন। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে। আমিও করলাম।

"কি চাস এখানে?"

ওদের মধ্যে মাতব্বর গোছের একজন এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে ব্যাপারটা নিবেদন করলে। শোনামাত্র লোকটা যেন ক্ষেপে গেল।

"বেরো শালা—বেরো—বেরো—বেরো বলছি এখান থেকে—"

একটা পোড়া কাঠ পড়ে ছিল তাই নিয়ে তাড়া

করলে। পুরুষগুলো ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাল। মেয়ে দুটি বসে রইল।

"তোরা আবার বসে রইলি কেন, যা না—"

তারা নড়ে না।

"ওঠ, ওঠ বলছি—"

তারা মাথা নীচু করে, কাঁদতে লাগল বসে' বসে'। তখন নন্দী ক্ষ্যাপা যা মুখে এল তাই বলে গাল দিতে লাগল। সে ভাষা এত অশ্লীল যে লেখা যায় না। কতকগুলো ইট পড়েছিল কাছে তাই তুলে মারতে লাগল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। আমি আর এ দৃশ্য দেখতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, ভয়ও করছিল। আমি তাড়াতাড়ি মন্দিরের পিছনের বারন্দায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ভাবলাম সবাই চলে গেলে আস্তে আস্তে সরে পড়া যাবে। সমস্ত মনটা ঘৃণায় বিরক্তিতে ভরে উঠেছিল। ইনিই সাধক। এরই এত নামডাক। ছি—ছি—ছি! এই করেই দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে।

হঠাৎ গালাগালির শব্দ থেমে গেল। মন্দিরের ভিতর পদশব্দ পেলাম। তার পরই—

"মা, সত্যিই বড় দুঃখী ওরা—যদি পারিস বাঁচিয়ে

দে ; বাঁচিয়ে দে মা—তুই দয়াময়ী, ইচ্ছে করলে সব পারিস—" নন্দী ক্ষ্যাপার কণ্ঠস্বর।

তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে এলাম। এসে দেখি নন্দী ক্ষ্যাপা মন্দির থেকে নেমে যাচ্ছে। কারও দিকে ফিরে চাইলে না। ঝোপ ঝাড় ভেঙ্গে সোজা নেমে গেল নদীর খাতের মধ্যে।...

ফেরবার সময় দেখলাম মড়া আগলে মেয়ে দুটি তখনও বসে কাঁদছে। কষ্ট হ'ল। একটা বদ্ধ পাগলের উপর বিশ্বাস করে' কি দুর্ভোগ এদের।

ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় বসে ছিলাম। হঠাৎ ষ্টেশনের বাইরে একটা সোরগোল উঠল। বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি ভীড়ের মধ্যে সেই মেয়ে দুটি—তাদের মুখে হাসি ফুটেছে—আর তাদের সঙ্গে একটি যুবক। সবাই বলাবলি করছে—আশ্চর্য্য ক্ষমতা লোকটার। মড়াকে বাঁচিয়ে দিলে? আশ্চর্য্য!

নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সিনেমার গল্প

'বনফুল'

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রাবণ, ১৩৪৭

—সাত সিকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্র
কুমার মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৫১ বি, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা মাসপয়লা প্রেস হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র
ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপক্রমণিকা

অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিলাম।

সহসা বিধাতা সদয় হইলেন। আমার বৈঠকখানায় একদা প্রভাতে বিখ্যাত একটি সিনেমা কোম্পানির বিখ্যাত একজন প্রযোজক আসিয়া দর্শন দিলেন। নমস্কারান্তে যে বার্তাটি তিনি জ্ঞাপন করিলেন তাহা প্রকৃতই আনন্দজনক।

"আপনার '<u>দ্বৈরথ</u>' বইটা আমরা নেব ভাবছি। বইটাতে অনেক 'পসিবিলিটি' আছে—"

বলা বাহুল্য পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

"বসুন—" সিগারেট কেসটি খুলিয়া ধরিলাম।

আসন পরিগ্রহ করিয়া তিনি সিগারেটটি ধরাইয়া ফেলিলেন এবং ধূম উদ্গীরণান্তে বলিলেন—"কিন্তু বইটার কিছু অদল বদল করতে হবে—"

"ও। কি ধরণের অদল বদল।"

"আপনার দ্বৈরথ গল্পটা বিয়োগান্ত। ওটাকে মিলনান্ত করতে হবে। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিলনের পক্ষপাতী। তাঁর মতে দর্শকদের আনন্দ দেওয়াটাই

আমাদের লক্ষ্য। সবাই হু হু করে' কাঁদতে কাঁদতে উঠে যাবে এটা তিনি পছন্দ করেন না"

মনে মনে একটু বিস্মিত এবং বিপন্ন হইলাম।

"তাহলে দ্বৈরথটা নিচ্ছেন কেন? মিলনান্ত আরও অনেক নাটক আছে তো—"

"না, 'দ্বৈরথ'টাই চাই। 'কুনকী'র ভাল লেগেছে—"

"কুনকী? সে আবার কে?"

"আমাদের ম্যানেজিং ডিরেকটারের পেট্ অ্যাক্‌ট্রেস। হিরোইনের পার্টটা সেই করতে চায়। তার মতো করে' লিখেও দিতে হবে পার্টটা আপনাকে—"

আমার চোখের দৃষ্টি সম্ভবত প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন "ও সব বহ্নিকুমারী টুমারি চলবে না। কলেজে পড়া আপটুডেট স্মার্ট মেয়ে করতে হবে। একটু কমিউনিষ্ট গোছের করলে আরও ভাল হয়। আনম্যারেড তো করতেই হবে—"

"কমিউনিষ্ট গোছের মানে?"

শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম।

"মানে গৃহলক্ষ্মী প্যাটার্ণ নয়। দৌড়ধাপ পরোপকার, সভা সমিতি—এই সব আর কি। সমাজের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ, ঝকমকে গয়না আর চকচকে শাড়ি পরে'

বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়ানো—এই সব পাঁচ রকম লাগিয়ে দেবেন। গোড়ায় গোড়ায় তার ভাবটা হবে যেন সে আজীবন কুমারী থেকে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে ঠিক করেছে—শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু প্রেমে পড়িয়ে দিতে হবে—তা না হ'লে বুঝলেন—"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন তিনি।

"আপনি ঠিক পারবেন। তবে নামগুলো বদলে দিতে হবে মশাই। বড় খটমট আপনার দ্বৈরথের চরিত্রগুলোর—। একটু মোলায়েম গোছের করে দেবেন। আর বেশ একটু থ্রিল থাকা চাই—বুঝলেন—"

বুঝিতেই হইল, কারণ অর্থাভাবে পড়িয়াছিলাম।

সিনেমার গল্প

১

শ্রীমোহন ও বলবন্ত পাঞ্জা লড়িতেছেন। কাল প্রভাত, স্থান শ্রীমোহনের সুসজ্জিত বৈঠকখানা। দুইটি মূল্যবান কেদারায় উভয়ে বসিয়া আছেন। শ্রীমোহন দোহারা, শান্ত মুখশ্রী, বলবন্ত ষণ্ডাগোছের উগ্রভাবাপন্ন। শ্রীমতী সোহাগা—শ্রীমোহনের উনিশ-কুড়ি বছরের কলেজে-পড়া সুন্দরী ভগ্নী পাশের ঘর হইতে জানালার ফুটো দিয়া রুদ্ধশ্বাসে এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দেখিতেছেন। এমন সময় উভয়েরই বন্ধু সুজিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

সুজিত

আরে আরে এসব কি!

কেহ কোন উত্তর দিল না।

সুজিত

ব্যাপার কি?

শ্রীমোহন ঘাড় ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন

শ্রীমোহন

বলবন্তের ধারণা আমি ছবি আঁকা নিয়ে থাকি বলে আমার গায়ে নাকি জোর নেই। তাই ওকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমিও নিতান্ত দুর্ব্বল নই।

বলবন্ত জোরে একটা মোচড় দিবার চেষ্টা করিলেন, শ্রীমোহন প্রতি-মোচড় দিয়া তাহা প্রতিরোধ করিলেন।

সুজিত

(হাসিয়া) ছেলেবেলা থেকে তোমাদের এ রেশারেশি আর ঘুচল না।

এ কথার কেহ উত্তর দিলেন না। বলবন্তের নাসা-রন্ধ্র স্ফীত-তর এবং নয়নযুগল অধিকতর ক্রোধ-সঙ্কুল হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীমোহনের রগের শিরাগুলিতেও স্ফীতির লক্ষণ দেখা দিল। সুজিত চেয়ার টানিয়া বসিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কি হইত বলা যায় না কিন্তু মন্নুয়া নামক ভৃত্যটি তিন গ্লাস শরবৎ আনিয়া হাজির করিবামাত্র দ্বন্দ্ব থামিয়া গেল। শ্রীমোহন ও বলবন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে এবং সুজিত শান্তভাবে শরবৎ পান করিতে লাগিলেন। মন্নুয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত

হইয়া অথবা কাক-তালীয়ভাবে শরবৎ আনয়ন করে নাই। পাশের ঘর হইতে জানালার ছিদ্রপথে যুযুধান বীরযুগলের ক্রম-বর্দ্ধমান উষ্মা লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধিমতী সোহাগা এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার কুমারী-চিত্তে সহসা একটা শঙ্কিত আকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনজনে নীরবেই শরবৎ পান করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা সুজিত নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

সুজিত

তোমরা কি ভুলে গেছ যে, তোমরা এখন বড় হয়েছ! এখন তোমরা দুজনেই জমিদার, ছেলেমানুষ নও, ছেলেবেলার সেই রেশারেশি এখনও গেল না তোমাদের। ছি ছি ছি ছি!

বলবন্ত

(গোঁফ চুমরাইয়া) তুমি আদার ব্যাপারী তোমার জাহাজের খবরের দরকার কি! তোমার আদার খবর কি?

সুজিত

সুবিধে নয় ভাই।

বলবন্ত

(সবিস্ময়ে) আর তো কিছুই কর না তুমি, একটা মেয়েকেও বশ করতে পারছ না!

সুজিত

(স-বিষাদে কপালে হাত ঠেকাইয়া) নসীব!

এ কথায় শ্রীমোহন বলবন্ত উভয়েই মৃদু হাস্য করিলেন; শত্রুবৎ নিঃশেষ হইয়াছিল, সুতরাং উভয়ের দ্বন্দ্ব-স্পৃহা পুনরায় জাগরিত হইল।

শ্রীমোহন

(বলবন্তকে) ক্যারাম্ খেলবে না কি?

বলবন্ত

নিশ্চয়!

সুজিত

আমি বসে পাহারা দি, তা নাহলে আবার হয়তো দুজনে মারামারি সুরু করবে!

বলবন্ত

যেখানে পাহারা দিলে কাজ হবে সেইখানে পাহারা দাওগে—

সুজিত হাসিলেন, কিন্তু উঠিলেন না। ভৃত্য মনুয়া আদিষ্ট হইয়া ক্যারম্‌বোর্ড আনিয়া

দিল, খেলা সুরু হইয়া গেল। খেলা চলিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পরে এই খেলাকে কেন্দ্র করিয়া আবার হয়তো উভয়ের রেশারেশি প্রকট হইয়া উঠিত, কিন্তু সে সুযোগ হইল না, একজন উর্দ্দিপরা সিপাহী প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল।

সিপাহী

বলবন্তবাবুর ঘোড়া এসেছে হুজুর।

শ্রীমোহন

এখানে এসেছে ?

বলবন্ত

ওহো ঠিক ঠিক আমিই আনতে বলেছিলাম। আজ আমার পলাশপুরে যাওয়ার কথা, জরুরি কতকগুলো কাজ আছে সেখানে। ফিরে এসে খেলাটা শেষ করা যাবে। আজই ফিরব, যেমন আছে তেমনি থাক, নড়িও না যেন কিছু—

শ্রীমোহন

(হাসিলেন) কোন ভয় নাই।

বলবন্ত চলিয়া গেলে সুজিত পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

সুজিত

তোমাদের কাণ্ড দেখে আমার ভারী অবাক লাগে! তোমাদের দুজনের ঝগড়ার অন্ত নেই, আদালতে দুজনে দুজনের নামে হরদম মোকদ্দমা করছ, অথচ রোজ দুজনে বসে' ক্যারম্ খেলা চাই, একদিন বাদ যাবার উপায় নেই।

শ্রীমোহন

(স্মিতমুখে) মোকদ্দমাটাও আমাদের ক্যারম্ খেলারই মত, তবে সেটা বৈঠকখানায় হয় না, আদালতে হয়। যাক সে কথা, তোমার এখন হঠাৎ আগমনের কারণ?

এই কারণটি ব্যক্ত করিবার জন্য সুজিত মনে মনে ওৎ পাতিয়াছিলেন, সুতরাং বেশী ভূমিকা করিলেন না।

সুজিত

তোমার বোন সোহাগার জন্য একটা সম্বন্ধ এনেছি। তোমার বোনের উপযুক্ত পাত্র, শেরগঞ্জের জমিদারের ছেলে, এম-এ পাশ, সুন্দর দেখতে। ফোটোও যোগাড় করে এনেছি।

সুজিত পকেট হইতে একটি ফোটো বাহির

করিয়া শ্রীমোহনকে দিলেন, শ্রীমোহন তাহা অবলোকন করিয়া মৃদু হাসিলেন।

সুজিত

হাসছ যে?

শ্রীমোহন

আমার আপত্তি হবে না, যদি ছেলেটি সত্যিই ভালো হয়, কিন্তু সোহাগার মতটাই আগে নেওয়া দরকার।

সুজিত

তার আবার মতামত আছে নাকি?

শ্রীমোহন

খুব আছে। আমি জোর জবরদস্তিও করতে পারি না, কারণ বাবার মৃত্যুকালে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—

শ্রীমোহন ছবির মতো করিয়া পিতার মৃত্যুকালীন ঘটনাগুলি বর্ণনা করিলেন। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি শ্রীমোহনকে দিয়া শপথ করাইয়া লইয়াছিলেন যে, সোহাগার মতের বিরুদ্ধে কোথাও যেন তাহার বিবাহ না দেওয়া হয়, সোহাগাকেও শপথ করিতে হইয়াছিল যে, সে-ও যেন

শ্রীমোহনের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোথাও বিবাহ না করে। অর্থাৎ পাত্রটি যেন উভয়েরই মনোমত হয়। বর্ণনা শেষ করিয়া শ্রীমোহন বলিলেন,

"এখন মুশকিল হয়েছে এই যে, আমি যত পাত্র এনে জোটাচ্ছি সোহাগার কাউকে পছন্দ হচ্ছে না। ওর বোধহয় বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই, নারী-রক্ষা সমিতি নিয়েই ও থাকবে"—

সুজিত

তাই নাকি ?

শ্রীমোহন

কুড়িটা সম্বন্ধ ভেঙে গেছে।

সুজিত

তাহলে তো ভারী মুশকিলে পড়লাম আমি—

শ্রীমোহন

তোমার আবার মুশকিলটা কি !

সুজিত

আরে ভাই সোহাগার বিয়ে না হলে দুলালী বিয়ে করবে না বলছে।

শ্রীমোহন

(হাসিয়া) ও, তাই তুমি সোহাগার বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ ! দুলালীর এ রকম করার মানে কি ?

সুজিত

তুমিই বল তো ভাই, এর কোন মানে হয় ! সখীর কাছে নাকি শপথ করেছে যে, তার বিয়ে না হলে সে, কিছুতে বিয়ে করবে না। সোহাগাই বা এমনটা করছে কেন ?

শ্রীমোহন

কি জানি।

সুজিত একটু বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিল।
সহসা তাহার মনে একটা প্রশ্ন জাগিল।

সুজিত

আচ্ছা, বলবন্তের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করেছ কখনও ?

শ্রীমোহন

(সবিস্ময়ে) হঠাৎ এ প্রশ্ন তোমার মনে জাগবার মানে ?

তোমার বোনটি যেরকম পুরুষ প্রকৃতির, তাতে বলবন্তের সঙ্গে ওকে মানাতো ভালো—

শ্রীমোহন

সে অসম্ভব। বলবন্ত নিজে মুখ ফুটে যদি এ প্রস্তাব করে তাহলে আমি রাজি হতে পারি। কিন্তু আমি নিজে যেচে বলবন্তকে এ কথা বলতে পারব না। বাল্যকাল থেকে বলবন্তের সঙ্গে সে সম্পর্ক নয়। আমি কখনও কোন বিষয়ে তার কাছে মাথা নোয়াই নি, নোয়াতে পারব না।

সুজিত

এতে নোয়ানোয়ির কি আছে!

শ্রীমোহন

না, সে হয় না।

সুজিত

(মাথা চুলকাইয়া) এ তো ভারী মুশকিল দেখছি তাহলে।

শ্রীমোহন

দুলালীকে তো তোমার বাবাই মানুষ করেছিলেন, না? ওর বাপ মা তো ওর ছেলেবেলাতেই মারা গিয়েছিল, শুনেছি।

সুজিত

হ্যাঁ। দুলালীর বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। সেইজন্যে দুলালী যখন অনাথ হয়ে পড়ল তখন বাবাই ওর সব ভার নিলেন। ওর নিজের বলতে কেউ নেই, এক বুড়ি দিদিমা ছিল সে-ও মরে গেছে। আমি এক গানের মাষ্টারণী রেখে দিয়েছি ওর অভিভাবকস্বরূপ। গানও শেখায় পাহারাও দেয়—

শ্রীমোহন

(হাসিয়া) এত করছ তবু তোমার একটা কথা রাখছে না!

সুজিত

বোঝ! ওই নারী-রক্ষা সমিতিই আমার দফা সেরেছে!

সুজিতের মানসপটে নারী-রক্ষা সমিতির কার্য্যাবলী-চিত্র পর পর ফুটিয়া উঠিল। একটি কুটিরের অভ্যন্তরে জনৈকা রুগ্না বৃদ্ধা মলিন শয্যায় শুইয়া কাতরাইতেছে, সোহাগা, দুলালী ও আরও দুই একজন নারী ভলাণ্টিয়ার তাহার সেবা করিতেছে। মাতাল স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে,

দলবলসহ সোহাগা ও দুলালী আসিয়া হাজির হইল এবং মাতালটাকে শাসন করিয়া দিল। বালিকা বিদ্যালয়ে সোহাগা ও দুলালী ছোট ছোট মেয়েদের পড়াইতেছে, জিম্‌ন্যাসিয়ামে ব্যায়াম করাইতেছে ইত্যাদি। সুজিতের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

সুজিত

হুজুক নিয়ে থাকলে কি আর বিয়ে করবার দিকে মন থাকে কারও। তাছাড়া আমার আশ্রিতা, জোর করতে পারি না বেশী, ভাববে—

শ্রীমোহন

(হাসিয়া) ভারী মুশকিলে পড়েছ, বল।

সুজিত

আরে ভাই তুমি জীবনে প্রেমের স্বাদ পেলে না কোনদিন, ছবি আঁকা আর ক্যারম্‌ খেলা নিয়েই কাটালে, পেলে বুঝতে কি যন্ত্রণা ভোগ করছি। ফোটোখানা দিয়ে গেলাম একটু চেষ্টা করো। (মিনতি সহকারে) একটু চেষ্টা কোরো ভাই—

শ্রীমোহন

আচ্ছা।

সুজিত

আমি তাহলে চলি এবার।

শ্রীমোহন

এস।

সুজিত চলিয়া গেলেন। শ্রীমোহন বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, যে অর্দ্ধনগ্ন নারীমূর্ত্তিটি তিনি সম্প্রতি আঁকিয়াছেন সেটির কি নাম দিবেন, "মথুরার পথে শ্রীমতী" না, "পাইথাগোরাসের স্বপ্ন"—এমন সময় উর্দ্দিপরা সিপাহী পুনরায় প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল।

সিপাহী

ম্যানেজার সাহেব গোপীনাথকে নিয়ে এসেছেন হুজুর।

শ্রীমোহন

ভেতরে আসতে বল।

ম্যানেজার নাটুবাবু ও গরীব প্রজা গোপীনাথ প্রবেশ করিল। নাটুবাবু বেটেখাটো চতুর লোক। গোপীনাথ ভাল মানুষ গোছের। উভয়েই ঝুঁকিয়া শ্রীমোহনকে অভিনন্দন করিল।

নাটুবাবু

হুজুরের হুকুম অনুযায়ী গোপীনাথকে ডাকিয়ে এনেছি।

শ্রীমোহন দেখিলেন বিনীত গোপীনাথ করজোড়ে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখপানে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

শ্রীমোহন

আচ্ছা, গোপীনাথ তোমার মেয়ের সঙ্গে গণেশলালের ছেলের বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেছে ?

গোপীনাথ

এখনও ঠিক হয়ে যায় নি, তবে বলবন্তবাবু বলেছেন যে, তিনি গণেশলালকে হুকুম দিয়েছেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

শ্রীমোহনের মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীমোহন

তা কি করে হতে পারে। গণেশলালের ছেলের সঙ্গে আমি যে আমার একটি প্রজার মেয়ের বিয়ে সব ঠিক করে ফেলেছি। গণেশলাল কথা দিয়ে গেছে আমাকে—

গোপীনাথ

আমি গরীব মানুষ হুজুর, আমি কিছুই জানি না, আপনারা যা ঠিক করবেন তাই হবে।

শ্রীমোহন

তোমার কি এতে আপত্তি আছে ?

গোপীনাথ

আপনাদের কথার বিরুদ্ধে আমি আপত্তি করব কোন সাহসে হুজুর। আমি বলবন্তবাবুকে কিছু বলি নি, তিনি একদিন আমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমার মেয়ে সুন্দরি তখন রাস্তায় খেলা করছিল, তার ফুটফুটে চেহারা দেখে তিনি ঘোড়া থেকে নাবেন—

গোপীনাথ বর্ণনা করিল কি ভাবে বলবন্ত বাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া সুন্দরিকে আদর করিয়াছিলেন এবং সে ঘোড়া দেখিয়া ভয় পায় নাই বলিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন। তারপর যখন তিনি শুনিলেন যে, সুন্দরির বিবাহ হয় নাই এবং গোপীনাথ অর্থাভাব-প্রযুক্ত মেয়ের বিবাহ দিতে পারিতেছে না তখন তিনি বলিলেন যে, তিনি গণেশলালের

ছেলের সহিত তাহার বিবাহ ঠিক করিয়া দিবেন।

সব শুনিয়া শ্রীমোহন পুনরায় মৃদু হাস্য করিলেন।

শ্রীমোহন

কিন্তু কালই যে গণেশলাল আমার কাছে এসে কথা দিয়ে গেছে যে, সে আমার প্রজা বসন্তকুমারের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দেবে।

গোপীনাথ

কি জানি হুজুর।

শ্রীমোহন

তোমার মেয়ের বিয়ের ভার আমি যদি নিই তাহলে তোমার কোন আপত্তি আছে?

গোপীনাথ

কিছুমাত্র না হুজুর! আপনাদের জমিদারি পাশাপাশি, এ অঞ্চলের সবাই আমরা আপনাদের দুজনের আশ্রয়ে আছি। আপনারা যা করবেন তাই আমরা মাথা পেতে নেব।

শ্রীমোহন

গণেশের ছেলেকে ছেড়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই তাহলে ?

গোপীনাথ

আজ্ঞে না—

শ্রীমোহন

বেশ, তোমার মেয়ের ভাল পাত্রে আমি বিয়ে দিয়ে দেব। নাটু ভাল পাত্র একটা খোঁজ কর তো—

নাটু

যে আজ্ঞে—

আভূমি অভিবাদন করিয়া নাটু ও গোপীনাথ চলিয়া গেল। শ্রীমোহন ছবির কথা ভাবিতে লাগিলেন।

দুই

অন্তঃপুর। নায়িকা শ্রীমতী সোহাগার কক্ষ। সোহাগা আঁটশাঁট করিয়া কাপড় পরিয়া আছে, অনেকটা কিরাত-বেশ, গুনগুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে একটি ধনুকে ছিলা পরাইতেছে। সোহাগার বুড়ি ধাই রুকমিনিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল এবং সোহাগার বেশ-বাশ ধনুক দেখিয়া দ্বারপ্রান্তেই গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর চোখো-চোখি হইতে কথা কহিল।

রুকমি

(সবিস্ময়ে) আচ্ছা !

সোহাগা

অবাক পরে হ'স, আগে এক গ্লাস জল দে দিকি।

রুকমি

এ রকম বেশে তীর ধনুক নিয়ে যাচ্ছিস কোথা ?

সোহাগা কোন উত্তর না দিয়া ধনুতে শর-যোজনা করিয়া জানালা দিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। রুকমি জল গড়াইয়া দিল।

রুকমি

নে জল নে।

সোহাগা তীর ধনুক রাখিয়া জলপান করিল এবং জলপানান্তে স্ফূর্ত্তিসহকারে তীরধনুক লইয়া বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রুকমি

এই শোন শোন, কি শিকার করতে যাচ্ছিস ?

সোহাগা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

রুকমি

কোথা যাচ্ছিস ?

সোহাগা

টারগেটিং।

রুকমি

সে আবার কি !

সোহাগা

(হাসিয়া) চাঁদমারি। নারীরক্ষা-সমিতির মেয়েদের আজ লক্ষ্য-ভেদ করতে শেখান হবে। এই রকম করে'—

এই বলিয়া সোহাগা লীলাভরে ধনুতে শর-যোজনা করিয়া রুকমিনিয়ার ললাটদেশে লক্ষ্য করিল। রুকমিনিয়া সভয়ে পিছাইয়া যাইতেই সোহাগা কলকণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিল এবং অধিকতর স্ফূর্ত্তিসহকারে বাহির

হইয়া গেল। রুকমিনিয়া তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া হতাশভাবে মাথা নাড়িল। তাহার মনে হইল সময়ে বিবাহ না হইলে মেয়েদের কি দশাই হয়, তাহার আরও মনে হইল সোহাগার অন্তরে যে স্বপ্নটি জাগি-জাগি করিতেছে তাহা সফল হইবে কি? সোহাগার অন্তরে একটি স্বপ্ন যে জাগি-জাগি করিতেছিল তাহা রুকমিনিয়ার অজ্ঞাত ছিল না। রুকমিনিয়া সোহাগাকে মানুষ করিয়াছে যে!

তিন

পলাশপুরের কাছারি। কাছারি বাড়ির বাহিরে বিরাট জনতা এবং ভিতরে বিশাল দরবার। এই দরবারে নায়কোচিত মহিমার সহিত বলবন্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। একটু দূরে একটি টেবিলের সামনে ম্যানেজার শ্যামানন্দ বসিয়া রহিয়াছেন। দরবার-শোভন আরও লোকজন রহিয়াছে। বলবন্তের মোসায়েব মুকুন্দলালও একধারে বসিয়া আছেন এবং বলবন্তের প্রতি কথার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষাকরতঃ মুখভঙ্গী করিতেছেন।

প্রজাদের বিচার হইতেছে। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনই বলবন্তের নীতি। রাঘব নামক একজন অশিষ্ট প্রজাকে তিনি জমিদারি হইতে দূর করিয়া দিলেন, অনেক গরীব প্রজার খাজনা মাপ করিলেন। ইহা ছাড়া তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়ে সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, গ্রামের পুষ্করিণী সংস্কারের আদেশ দিলেন, কয়েকজন ব্রাহ্মণকে অর্থসাহায্য করিলেন। এসব ব্যাপার চুকিয়া গেলে ম্যানেজার শ্যামানন্দ বলিলেন,

"গণেশলালকে ডাকিয়ে এনেছি। সে বসন্তকুমারের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের সম্বন্ধ ঠিক করেছে এ খবর কি সত্যি—"

এই সংবাদ শুনিবামাত্র বলবন্ত নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল যে, সকালে তিনি

শ্রীমোহনকে পাল্লায় হারাইতে পারেন নাই। উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইল।

বলবন্ত

(বজ্র নির্ঘোষে) ডাক গণেশলালকে—

সঙ্গে সঙ্গে একজন বরকন্দাজ বাহির হইয়া গেল এবং কম্পিতকলেবর গণেশলালকে ধরিয়া আনিল। গণেশকে দেখিয়া বলবন্তের ক্রোধ আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, উঠিয়া গিয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন। গণেশলাল কোনক্রমে টাল সামলাইয়া দাঁড়াইল, বলবন্ত রোষে ফুলিতে ফুলিতে গিয়া আসন-পরিগ্রহ করিলেন।

বলবন্ত

(তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া) গোপীনাথের মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে আমি যখন ঠিক করে দিয়েছি তখন কার হুকুমে তুমি সে সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছ তার জবাব দাও।

গণেশ

(মাথা চুলকাইয়া) হুজুর শ্রীমোহনবাবু একদিন আমাকে ডেকে বললেন—

বলবন্ত

তুমি আমার জমিদারিতে বাস করে' আমার হুকুম অগ্রাহ্য করে' শ্রীমোহনবাবুর কথা শুনবে? তোমার স্পর্দ্ধা তো কম নয় দেখছি।

গণেশলাল নীরবে মাথা চুলকাইতে লাগিল।

বলবন্ত

(আদেশের ভঙ্গীতে) শ্রীমোহনবাবু ট্রিমোহনবাবু ভুলে যাও। যা বলেছি তা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন কর গিয়ে। তা নাহলে মহা বিপদে পড়বে।

গণেশলাল প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। একটি পদাঘাতের গুরুত্বেই সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বলবন্তের ক্রোধ অধিককাল স্থায়ী হইল না, গড়িয়ার মেলায় যে ঘোড়াটি তিনি পছন্দ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা ক্রীত এবং সজ্জিত হইয়া কাছারি বাড়ির সম্মুখে আনীত হইয়াছে শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে তিনি উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ক্ষণপরেই দেখা গেল অশ্বারোহী বলবন্ত ধূলা উড়াইয়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

চার

গ্রামের বাহিরে একটি প্রান্তর। দূরে গোলাকৃতি টিনে রং-মাখানো একটি টার্গেট দেখা যাইতেছে। সোহাগা, দুলালী এবং দশ বারোজন গ্রাম্য কিশোরী মাঠের মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দভরে নৃত্য-গীত-চর্চ্চা করিতেছে। সাধারণ গ্রাম্য নৃত্য-গীত হইলেও বেশ উন্মাদনা-জনক। নিকটেই একটি বৃক্ষশাখায় কতকগুলি ধনুক ঝুলিতেছে, নীচে কয়েকটি শরপূর্ণ তূণও দেখা যাইতেছে। নৃত্য-গীত শেষ হইলে সোহাগা একটি মেয়ের দিকে চাহিয়া লীলা-ভরে হাস্য করিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিল।

সোহাগা

মাধুরী, তুমি একবারও ঠিক লক্ষ্য-ভেদ করতে পার নি, নাচগান তো হল, এইবার এসো আরও খানিকক্ষণ প্র্যাকটিস করা যাক।

মাধুরী আগাইয়া গেল, ধনুকে শরযোজনা করিয়া ছুঁড়িল, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করিতে পারিল না। এইরূপে একে একে সকলে আসিল, কেহ পারিল, কেহ পারিল না। দুলালী পারিল না।

সোহাগা

এই দেখ, এমনি করে' ছুঁড়তে হয়।

দেখাইয়া দিল, তীর গিয়া লক্ষ্য ভেদ করিল।

দুলালী

(হাসিয়া) দেখি এবার আমি পারি কি না।

সোহাগা

(স-শ্লেষে) তুই যে লক্ষ্য ভেদ করেছিস অন্যদিকে তোর আর মন নেই তাই পারছিস না!

সকলে একযোগে হাসিয়া উঠিল।

দুলালী

(একটু অপ্রস্তুতভাবে) লক্ষ্যই ভেদ করি আর যা-ই করি তোমার বিয়ে না হলে আমি বিয়ে করছি না!

সোহাগা

(মুচকি হাসিয়া) দেখা যাবে।

দুলালী অনেকক্ষণ তাক করিয়া তীর ছুঁড়িল, লাগিল না।

সোহাগা

তোর দ্বারা হবে না, অমন করে ধরছিস কেন, এই দেখ এমনি করে। এ আর এমন শক্ত কি, অভ্যেস করলে চোখ বুজেও মারা যায়।

মাধুরী

সোহাগা দি, তুমি চোখ বুজে মারতে পার ?

সোহাগা

চেষ্টা করলে পারি বোধ হয়। (হাসিয়া) আচ্ছা আমার চোখটা বেঁধে দে তো, দেখি একবার চেষ্টা করে।

মাধুরী একটি রুমাল দিয়া সোহাগার চোখ বাঁধিয়া দিল। সোহাগা সেই অবস্থায় তীর ছুঁড়িল।

পাঁচ

ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে বলবন্ত আসিতেছিলেন, সোহাগা-নিক্ষিপ্ত তীর গিয়া তাঁহার পায়ে বিঁধিল। কাতরোক্তি করিয়া তিনি ঘোড়া থামাইলেন এবং পা হইতে তীরটা টানিয়া তুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্থানটা রক্তে ভিজিয়া উঠিল। বলবন্ত এদিক্ ওদিক চাহিয়া প্রান্তরের অপর-প্রান্তে সোহাগার দলকে দেখিতে পাইলেন এবং সেইদিকে অশ্ব-চালনা করিলেন।

সোহাগার তীর লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারে নাই, তীরটা কোথায় গেল তাহাই সকলে অনুসন্ধান করিতেছিল এমন সময়ে তীর-হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে বলবন্ত প্রবেশ করিলেন।

বলবন্ত

(তীরটি তুলিয়া) এ তীর কি আপনারা কেউ ছুঁড়েছিলেন ?

সোহাগা

(সলজ্জ) হ্যাঁ আমিই ছুঁড়েছিলাম। আপনি কি করে পেলেন এ তীর ?

(স-হাস্যে) আমার পায়ে গিয়ে বিঁধেছিল। এই যে—

রক্তাক্ত স্থানটা দেখাইয়া দিলেন।

সোহাগা

(সভয়ে) ওমা, তাই না কি।

সোহাগার মুখ-পটে ক্ষোভ-শঙ্কা-অনুতাপ-মিশ্রিত এমন একটি সকরুণ আকৃতি ফুটিয়া উঠিল যাহা প্রকৃতই অনির্ব্বচনীয়। অপরাধীর মতো আনতচক্ষে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে পুনরায় বলবন্তের মুখ-পানে চাহিল, দেখিল বলবন্ত তাহারই দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া আছেন।

সোহাগা

(অনুতপ্ত কণ্ঠে) আমায় ক্ষমা করুন।

বলবন্ত

তা না হয় করলুম। কিন্তু আপনারা এখানে এরকম তীর ছোঁড়াছুঁড়ি করছেন কেন জানতে পারি কি ?

সোহাগা

নারী-রক্ষা-সমিতি থেকে আমি গ্রামের মেয়েদের ধনুর্ব্বিদ্যা শেখাচ্ছিলুম।

বলবন্ত

উদ্দেশ্যটা কি ?

সোহাগা ক্ষণকাল বলবন্তের মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থির অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর দিল।

সোহাগা

আমাদের দেশের মেয়েরা কত অসহায় তা' কি জানেন না আপনি ? তারা এত অসহায় যে, তাদের আত্মরক্ষা করবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য নেই। সেইজন্য আমাদের সমিতি থেকে ঠিক করেছি যে, আমরা এ অঞ্চলের সব মেয়েদের ধনুর্বিবদ্যা, লাঠিখেলা এমন কি অসিচালনা পর্য্যন্ত শেখাব।

বলবন্ত মুগ্ধ হইলেন। আরও কিছুক্ষণ সোহাগার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

বলবন্ত

আপনি কি এই গ্রামেরই মেয়ে ? আপনাকে ঠিক যেন—

সোহাগা

আমার দাদার নাম শ্রীমোহনবাবু।

বলবন্ত

(সোচ্ছ্বাসে) ওহো, তুমিই সোহাগা! সেই ছেলেবেলায় তোমাকে দেখেছিলাম, তারপর তো তুমি পড়াশোনার জন্য বরাবর বিদেশে বিদেশেই কাটিয়েছ, তোমাকে চিনতেই পারি নি, কি মুশকিল! ঠিক ঠিক আমি শুনেছিলাম বটে যে, তুমি এসে গ্রামে একটা নারী-সমিতি স্থাপন করেছ। বড় সুখী হলাম।

সোহাগা সলজ্জ অথচ সপ্রতিভভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সোহাগা

ছি, ছি বড় লজ্জিত আমি। আসুন আপনার পায়ের ওখানটা বেঁধে দি—মাধুরী ছুটে গিয়ে আমাদের ফার্স্ট এড সেটটা নিয়ে আয় তো।

বলবন্ত

থাক তার দরকার নেই, একটু আধটু আঁচড়ে বলবন্তের কিছু হয় না। তোমার নারী-সমিতি দেখে খুব খুশি হলাম। কিন্তু রাস্তার ধারে এরকমভাবে চাঁদমারি-চর্চ্চা

করলে নিরীহ পথিকদের একটু মুশকিল। আচ্ছা আমিই নিজের খরচে এখানটা ঘেরিয়ে দেব—

অন্তঃপৃষ্ঠে নিস্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। সোহাগা সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

দুলালী

(হাসিয়া) সোহাগা, খুব জবর লক্ষ্য-ভেদ করেছ কিন্তু এবার।

সোহাগা ছদ্ম-কোপ-কটাক্ষে তাহার পানে চাহিল।

ছয়

দুলালীর বাড়ীতে একটি কক্ষ। দুলালী অর্গ্যান বাজাইয়া সুললিত কণ্ঠে একটি প্রেম-সঙ্গীত গাহিতেছে। প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী নিকটে বসিয়া শুনিতেছেন। বাহিরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া সুজিতও তন্ময়-চিত্তে শুনিতেছে। গান শেষ হইয়া গেলে সুজিত আসিয়া প্রবেশ করিল। শিক্ষয়িত্রী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শিক্ষয়িত্রী

নমস্কার সুজিতবাবু, আসুন, কাল আপনি আসেন নি যে বড়।

সুজিত

কাল আমি অমরপুরে গিয়েছিলাম, শ্রীমোহনের বোন সোহাগার জন্যে একটি পাত্র সন্ধান করতে।

শিক্ষয়িত্রী

ও, শ্রীমোহনবাবু বলেছিলেন বুঝি—

সুজিত

না বললেও, বন্ধুলোক তার বোনের জন্যে—

শিক্ষয়িত্রী

ঠিক তো, ঠিক তো।

দুলালী ও সুজিতের মধ্যে একটা দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল, শিক্ষয়িত্রী দেখিতে পাইলেন না।

শিক্ষয়িত্রী

আপনি তাহলে দুলালীর গান শুনুন। ওকে কাল বেহাগের খুব ভাল একটা গান শিখিয়েছি, শুনুন সেটা। আমার কয়েকটা চিঠি লেখবার আছে লিখে ফেলি গিয়ে—

শিক্ষয়িত্রী চলিয়া গেলেন। দুলালী বেহাগ-সুরে গান আরম্ভ করিতে যাইতেছিল, সুজিত বাধা দিল।

দুলালী

কি করব তবে।

সুজিত একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সুজিত

একটা খবর তুমি জানো না বোধ হয়।

দুলালী

কি?

সুজিত

ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিট, ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন, ত্রিশ দিনে এক মাস, বারো মাসে এক বছর, বারো বছরে এক যুগ হয়—জানো ?

দুলালী

জানি তো।

সুজিত

তাহলে এ রকম করবার মানেটা কি ! সময় হু হু শব্দে চলে যাচ্ছে, অথচ—

দুলালী

(ভ্রূভঙ্গী করিয়া) আবার ওই কথা !

সুজিত

সোহাগার বিয়ে হল না হল তাতে তোমারই বা কি আমারই বা কি !

দুলালী

(অভিমান ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে) বা রে আমার কথার দাম নেই বুঝি। সোহাগাকে আমি কথা দিয়েছি যে—(ঠোঁট ফুলাইল)

সুজিত অধীরভাবে উঠিয়া পরিক্রম করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা থামিয়া বলিলেন, "সোহাগা যদি বিয়ে না করে—"

দুলালী

করবে না কেন, নিশ্চয়ই করবে। (সহসা) কাল একটা ভারী মজা হয়েছে, জানো ?

সুজিত

কি—

দুলালী সালঙ্কারে চাঁদমারি-ঘটনা বর্ণনা করিল।

দুলালী

আমার মনে হয় সোহাগা আর বলবন্তবাবুর যদি আরও দু'একবার দেখা হয়, ঠিক তাহলে—(হাসিল)

সুজিত

(সোৎসাহে) সত্যি, বলছ ?

দুলালী

সত্যি।

সুজিত

দেখা হওয়া আর বিচিত্র কি ! (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) এ আর বেশী কথা কি, বলবন্তবাবুর জলকর গহিরাতে চল না, একদিন একটা বনভোজনের আয়োজন করা যাক। বলবন্তকে আমি নেমন্তন্ন করে' আসি, তুমি সোহাগাকে কর, তোমার নারী-সমিতির মেয়েদেরও

নাও। গহিরা জঙ্গলে একটা নদীও আছে, বেশ সুন্দর হবে।

সুজিত উৎসাহভরে উঠিয়া পড়িলেন।

দুলালী

উঠছ যে?

সুজিত

যাই সব ব্যবস্থা করি গিয়ে তাহলে।

দুলালী

(অভিমান ভরে) বারে, আমার গানটা শুনবে না বুঝি—

সুজিত

ও হ্যাঁ হ্যাঁ।

গাও—(বসিলেন)

দুলালী প্রেম-সঙ্গীত ধরিল।

সাত

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। বলবন্ত ও শ্রীমোহন তন্ময় হইয়া ক্যারম খেলিতেছেন, উভয়েরই মুখভাবে জেদ-জনিত উষ্মা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলবন্ত ষ্ট্রাইক করিয়া চলিয়াছেন, গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে শ্রীমোহন তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। শ্রীমোহনের আর মাত্র দুটি গুটি অবশিষ্ট আছে, কিন্তু বলবন্তের লক্ষ্য যেরূপ অব্যর্থ তাহাতে শ্রীমোহনের শঙ্কা হইতেছে যে, উক্ত গুটি দুইটি গহ্বরস্থ করিবার সুযোগ আর বুঝি মিলিবে না। জানালার ফুটো দিয়া পাশের ঘর হইতে সোহাগা নিরুদ্ধ নিশ্বাসে ইহাদের খেলা দেখিতেছে।

খট্ খট্ খটাস—

শেষ গুটিটি গহ্বরে ফেলিয়া বিজয়ী বলবন্ত দৃপ্ত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল শ্রীমোহনের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,

বলবন্ত

"এইবার ওঠা যাক, রাত হয়েছে ;"

শ্রীমোহন

"আচ্ছা,"

সহসা শ্রীমোহনের নজরে পড়িল বলবন্তের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

শ্রীমোহন

পায়ে কি হয়েছে ?

বলবন্ত

ও, কিছু নয়, সামান্য—

বলবন্তের মানসপটে ধনুর্ব্বাণধারিণী সোহাগার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল, ক্ষণিকের জন্য তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

বলবন্ত

চলি এবার।

শ্রীমোহন

আচ্ছা, কাল আসবে তো ?

বলবন্ত

নিশ্চয়।

বলবন্ত চলিয়া গেলেন, ক্যারমবোর্ডের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত শ্রীমোহন বসিয়া রহিলেন। রুকমিনিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

রুকমিনিয়া

শ্রীমোহন তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি—

শ্রীমোহন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন।

শ্রীমোহন

কি ?

রুকমিনিয়া

সোহাগার বিয়ে দাও।

শ্রীমোহন

পাত্র কই ?

রুকমিনিয়া

বলবন্তের সঙ্গে সম্বন্ধ কর।

শ্রীমোহন

অসম্ভব।

ক্যারম বোর্ডের দিকে চাহিলেন।

রুকমিনিয়া

অসম্ভব কেন ?

শ্রীমোহন

(দৃঢ়কণ্ঠে) অসম্ভব। আমি নিজে মুখে এ কথা বলবন্তকে বলতে পারব না।

উভয়ে উভয়ের দিকে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ চাহিয়া রহিলেন। পাশের ঘরে সোহাগার প্রফুল্ল-কমলবৎ আনন সহসা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল।

আট

বলবন্তের ব্যায়াম কক্ষ। ব্যায়ামের নানাবিধ সরঞ্জাম দেখা যাইতেছে। একটি বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমৃদ্ধ-পেশী বলবন্ত 'ডেভোলাপার' ভাঁজিতেছেন। এই পরিশ্রমজনক কার্য্য করিতে করিতেও কিন্তু তাঁহার হৃদয়-আকাশে মধ্যে মধ্যে সোহাগা-মুখচন্দ্র উদিত হইতেছে।

ম্যানেজার শ্যামানন্দ গলা-খাঁকারি দিয়া প্রবেশ করিলেন।

শ্যামানন্দ

একটা বিশেষ জরুরি সংবাদ আছে তাই হুজুরকে এ সময়ে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।

বলবন্ত

কি ?

শ্যামানন্দ

আমাদের প্রজা গণেশলাল সপরিবারে শ্রীমোহনবাবুর জমিদারিতে উঠে গেছে, সে এখন চকদীঘিতে তাঁরই হেফাজতে বাস করছে।

বলবন্ত

তাই না কি !

শ্যামানন্দ

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁ ছাড়া আমাদের গোপীনাথকেও শ্রীমোহনবাবু বিগড়ে দিয়েছেন।

বলবন্ত

কি রকম ?

শ্যামানন্দ

সে-ও আর গণেশলালের ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না।

বলবন্ত

কেন ?

শ্যামানন্দ

শ্রীমোহনবাবু না কি বলেছেন যে তাঁর মেয়ের অন্য জায়গায় ভাল বিয়ে দেবেন।

বলবন্ত যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন।

বলবন্ত

তা কিছুতেই হতে পারে না (প্রায় ক্ষিপ্তকণ্ঠে) বুঝেছ, তা কিছুতেই হতে পারে না। শোন এক কাজ কর—

ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে অধীরভাবে তিনি পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা বলিলেন—

শোন এক কাজ কর, গোপীনাথের মেয়েটাকে চুরি করে পাহাড়পুর কি জামুটি কাছারিতে চালান করে দাও আর আমাদের মুকুন্দলালকে পাঠিয়ে দাও তার তত্ত্বাবধান করতে। তারপর একদিন গণেশলালের ছেলেটাকেও 'গুম' করে সেখানে নিয়ে চল, সেইখানেই পুরুত ডেকে ওদের বিয়ে দেব আমি। বুঝলে ?

শ্যামানন্দ

যে আজ্ঞে

বলবন্ত

যাও দেরি করো না—

শ্যামানন্দ চলিয়া গেলেন। বলবন্ত দর্পণে ভ্রূকুটিকুটিলমুখে নিজ প্রতিবিম্বের পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দর্পণ জুড়িয়া স্নিগ্ধহাস্যময়ী সোহাগার স্মেরানন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

নয়

বনপর্ণী নদী। একটি সুসজ্জিত নৌকায় সোহাগা, দুলালী এবং নারীরক্ষা সমিতির কয়েকজন কিশোরী গহিয়া বনকর অভিমুখে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। সুজিত আস্তিন গুটাইয়া দাঁড় বাহিতেছে।

দশ

শ্রীমোহনের চিত্রশালা। সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ নগ্ন ঈষৎনগ্ন নানাবিধ নারীচিত্রে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। শ্রীমোহন তন্ময়চিত্তে 'নৃত্যপরা মেনকা' নামক চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। প্রথম দৃষ্টিপাতেই মনে হয় মেনকা বোধ হয় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িতা, কিন্তু তাহার অসম্বৃত বেশবাস, স্খলিত অঞ্চল ও ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ঘাগরা দেখিয়া সে কথা ভুলিয়া যাইতে বিলম্ব হয় না। রাঘব আসিয়া প্রবেশ করিল।

শ্রীমোহন

(ঘাড় ফিরাইয়া) কে তুমি, কি চাও ?

রাঘব

(প্রণিপাত করিয়া) আশ্রয় চাই হুজুর।

শ্রীমোহন

তার মানে ?

রাঘব

বলবন্তবাবু হুজুর আমাকে তাঁর জমিদারি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

শ্রীমোহন

তা আমি কি করব ? কি করেছিলে তুমি—

রাঘব

কিছুই না হুজুর, মিছিমিছি একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে—

শ্রীমোহন

বুঝেছি, এখানে কিছু হবে না, দুশ্চরিত্র লোকের এখানে স্থান নেই।

রাঘব সবিস্ময়ে ছবিগুলি দেখিতে লাগিল।

শ্রীমোহন

কি দেখছ ?

রাঘব

ছবি।

শ্রীমোহন

কেমন লাগছে ?

রাঘব

খুব চমৎকার হুজুর, এমন ছবি আমি দেখিনি কখনও।

শ্রীমোহন বিগলিত হইলেন।

শ্রীমোহন্

বাইসিকিল্ চড়তে পার ?

রাঘব

খুব পারি।

শ্রীমোহন

আচ্ছা থাক তাহলে তুমি আমার কাছে।

পুনরায় ছবি আঁকায় মন দিলেন।

এগারো

গহিরা বনকরের মধ্যে একটি ফাঁকা অংশ। ফাঁকা হইলেও তাহা যে বনেরই অংশ তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। কিছু দূরে একটি গাছের তলায় কয়েকটি ইঁটের উনানে রান্না হইতেছে, দুই তিনটি কিশোরী তাহার তদারকে ব্যস্ত। নিকটেই একটি উঁচু পাথরের উপর বসিয়া সোহাগা এবং আর একটি মেয়ে একটি দ্বৈত প্রণয়-সঙ্গীত গাহিতেছে। অদূরে কাঁটাবনের ভিতর একটি পুষ্পশোভিত কৃষ্ণচূড়ার গাছ রহিয়াছে। আর একটি বৃক্ষতলে বসিয়া সুজিত ও দুলালী তরকারি ছাড়াইতেছে। বলবন্ত এখনও আসিয়া পৌছান নাই।

সুজিত

কই বলবন্ত এখনও এল না কেন বুঝতে পারছি না, সেদিন বলে এলুম অত করে'।

দুলালী

(মুখ টিপিয়া হাসিয়া) ঠিক আসবে।

সুজিত

আচ্ছা, সোহাগা কি জানে যে বলবন্ত আসবে ?

দুলালী

না।

সুজিত

(এদিক ওদিক চাহিয়া) কই বলবন্তের চিহ্নমাত্র নেই। ভুলে গেল না তো, ঘাটটায় গিয়ে একবার দেখে আসব ?

দুলালী

(ধমক দিয়া) তুমি যা করছ কর।

অগত্যা সুজিত আলু ছাড়াইতে লাগিল।

সুজিত

(আলু ছাড়াইতে ছাড়াইতে, অর্দ্ধ-স্বগত) একেই বলে আকাশ-বৃত্তি। বলবন্ত আসবে, সোহাগার প্রেমে পড়বে, তাকে বিয়ে করবে, তার পরে—

দুলালী

বলবন্ত বাবু এলে আমি কিন্তু তাঁর সামনে বেরুব না, আমার ভারি লজ্জা করবে, উনি আমাদের কথা সব জানেন—

সুজিত

আরে, আগে আসুকই তো !

একটি কিশোরী ছুটিয়া আসিল।

কিশোরী

দুলালী দিদি, আমরা সবাই কেষ্টচূড়ার ফুল পাড়তে যাব, তুমিও এস।

দুলালী

(সুজিতকে) তুমি তাহলে এগুলো ছাড়াও আমি যাই—

দুলালী চলিয়া গেল। সুজিত তরকারীর স্তূপের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বারো

কৃষ্ণচূড়ার গাছের নিকটে সোহাগা সদলবলে সমবেত হইয়াছে। গাছের চতুর্দ্দিকে ঘন কাঁটাবন।

প্রথম কিশোরী

বাবা অত উঁচুতে চড়ব কি করে!

দ্বিতীয় কিশোরী

সত্যি বড্ড উঁচু!

সোহাগা

(সবিস্ময়ে) তোমরা কেউ গাছে উঠতে পার না?

তৃতীয় কিশোরী

ছোট গাছে পারি, এ যে বড্ড উঁচু!

সকলে হাসিয়া উঠিল।

সোহাগা

দুলালী তুই?

দুলালী

আমি পারব না বাবা।

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল

সোহাগা

আচ্ছা, আমি চড়ছি—

সোহাগা দক্ষতার সহিত বৃক্ষে আরোহন করিল এবং অবলীলাক্রমে শাখায় শাখায় সঞ্চরণ করিয়া ফুল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া নীচে ফেলিতে লাগিল। তুলালী এবং অন্যান্য কিশোরীগণ মহানন্দে মাথায় ফুল গুঁজিল। সোহাগাও বৃক্ষশাখায় বসিয়া বসিয়া নিজেকে পুষ্পশোভিত করিতে করিতে দেখিতে পাইল, দূরে বিমর্ষ সুজিত বসিয়া আলু ছাড়াইতেছে। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর সোহাগার নামিবার ইচ্ছা হইল।

সোহাগা

সর—আমি লাফিয়ে নামব এবার।

মেয়েরা সরিয়া গেল। সোহাগা লাফাইয়া নামিতে গিয়া নিকটবর্ত্তী কণ্টকবনে নিপতিত হইল। বেশবাস কণ্টক-বিজড়িত হইয়া গেল। তুলালী ও মেয়ের দল নারী-সুলভ ভীতি সহকারে চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্ত্তী বন্যপথ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বলবন্ত আসিয়া অকুস্থলে

প্রবেশ করিলেন এবং সোহাগাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আকুলিত চিত্তে কণ্টক বনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সোহাগার বসন কণ্টক-মুক্ত করিতে লাগিলেন। সুজিত তরকারি ছাড়াইতে ছাড়াইতে এই দৃশ্য দেখিয়া পুলকিত চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সোহাগা

(সবিস্ময়ে) বলবন্তবাবু আপনি কোথা থেকে এলেন! (সলজ্জভাবে) থাক থাক আপনি ছেড়ে দিন, আমি ঠিক করে নিচ্ছি—

বলবন্ত ছাড়িলেন না, সোহাগাকে কণ্টকমুক্ত করিয়া উদ্ধার করিয়া আনিলেন। বেশবাস সম্বৃত করিয়া সোহাগা বলবন্তের দিকে চাহিয়া ঈষৎহাস্য করিল, তাহার পর বলবন্তের নবক্রীত অশ্বটিকে মুগ্ধ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সোহাগা

চমৎকার ঘোড়াটি আপনার।

বলবন্ত

(গদগদভাবে) ঘোড়া ভাল লাগে তোমার ?

সোহাগা

(সোচ্ছ্বাসে) খুব।

বলবন্ত

ঘোড়ায় চড়তে পার ? তীর ছুঁড়তে পার সে প্রমাণ তো পেয়েছি একদিন।

সোহাগা

(সলজ্জ হাস্যভরে) ঘোড়ায় চড়তেও পারি।

বলবন্ত

তোমার দাদার মতো ছবি টবি আঁকার সখ নেই বুঝি তোমার ?

সোহাগা

আমার দাদাও তো খুব ভাল ঘোড়সোয়ার।

বলবন্ত

(হাসিয়া) তা জানি।

সোহাগা

আমার দাদার মতন আমি ছবি আঁকতে পারি না বটে, কিন্তু গান আমি খু-ব ভালবাসি।

বলবন্ত

(মুগ্ধকণ্ঠে) তা তো হবেই।

সোহাগা

আসুন আপনাকে আমাদের সমিতির মেয়েদের গান শোনাই।

বলবন্ত

চল, তোমার গানও শুনব কিন্তু।

সোহাগা

(হাসিয়া) এক সঙ্গেই গাইব সবাই। আপনার কাছে অবশ্য গাওয়া বৃথা, আপনি তো শুনেছি কোমল কোন কিছুই পছন্দ করেন না!

বলবন্ত

(সবিস্ময়ে) কে বললে ?

বলবন্তের অভ্যাগমে অন্যান্য মেয়েরা সকলে সরিয়া গিয়া অদূরে অন্য একটি বৃক্ষতলে

দাঁড়াইয়াছিল। দুলালী লুকাইয়াছিল একটা ঝোপের আড়ালে। বলবন্ত ঘোড়াটাকে একটা গাছের ডালে বাঁধিয়া সোহাগার সহিত আগাইয়া গেলেন এবং নারী সমিতির মেয়েদের দলে গিয়া যোগদান করিলেন। সুজিত সোৎসাহে একটি শতরঞ্জি বিছাইতে লাগিল। সকলে উপবেশন করিলে সোহাগার নির্দেশমত সঙ্গীত আরম্ভ হইল। বলবন্ত মুগ্ধভাবে শুনিতে লাগিলেন; গান চলিতেছে এমন সময় বনের ভিতর হইতে একটা তীর আসিয়া কিছুদূরে মাটিতে গাঁথিয়া গেল। বলবন্ত তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গীত থামিয়া গেল।

বলবন্ত

(বজ্র নির্ঘোষে) কো-উন্ হ্যায়রে—

বন ভেদ করিয়া ভীল জাতীয় দুইজন পক্ষী-শিকারী ধনুর্বাণ হস্তে বাহির হইয়া আসিল এবং বলবন্তকে দেখিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিল।

বলবন্ত

ও, কালুয়া, ভুলুয়া, মানুষ খুন করবি নাকি তোরা!

কালুয়া

(সেলাম করিয়া) না দেবতা, হামরা জানতোম না যে, আপনারা হেথায় রইছেন।

বলবন্ত

দেখি তোদের তীর ধনুক।

কালুয়া ভুলুয়া তীরধনুক দিল।

বলবন্ত

(সোহাগাকে) চাঁদমারি প্র্যাকটিস করবে নাকি এখানে ?

সুজিত

সোহাগাকে তুমি হারাতে পারবে না বলবন্ত, যতই চেষ্টা কর—ওর লক্ষ্য অব্যর্থ।

বলবন্ত

বেশ, দেখা যাক—

বলবন্ত সোহাগাকে একটা তীরধনুক আগাইয়া দিয়া নিজে একটা তুলিয়া লইলেন। দুইজনের তীরে দুই রকম পালক লাগানো।

সোহাগা

(হাসিয়া) কি লক্ষ্য করবেন বলুন।

বলবন্ত

(এদিক ওদিক চাহিয়া) ওই দিকে একটা বেল গাছে অনেক বেল আছে সেইগুলোকে লক্ষ্য করা যাক চল।

সোহাগা

(হাসিয়া) বেশ, চলুন।

সুজিত ইসারা করিয়া আর সকলকে যাইতে নিষেধ করিল। বনের অপর একটি অংশে গিয়া বেলগাছটিকে দেখা গেল। প্রথমে বলবন্ত এবং পরে সোহাগা বেল লক্ষ্য করিয়া শর-সন্ধান করিলেন। কেহই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিলেন না।

সোহাগা

(হাসিয়া) কারোই লাগে নি।

বলবন্ত

চল তীরগুলো খুঁজে আনা যাক তাহলে—

তীর অনুসন্ধান করিতে করিতে উভয়ে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। গভীর অরণ্যের ভিতর একটি পাকা ঘর দেখা গেল।

ঘরটির একটিমাত্র ক্ষুদ্র দ্বার আছে, সেটিও রুদ্ধ, প্রকাণ্ড একটি তালা ঝুলিতেছে। অবশিষ্ট তিনটি দেওয়াল নিশ্ছিদ্র। দেওয়ালের গায়ে কাঠের ফলকে লেখা রহিয়াছে—"গারদ ঘর"।

সোহাগা

(সবিস্ময়ে) গভীর জঙ্গলের মধ্যে এ ঘরটা কিসের ?

বলবন্ত

বদমায়েস্ প্রজাদের সায়েস্তা করবার জন্যে ওটা আমার গারদ ঘর।

সোহাগা

এখানে কেন ?

বলবন্ত

(হাসিয়া) পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ! বনপর্ণী নদী না পেরিয়ে এ জঙ্গলে আসা যায় না, খেয়াঘাট এখান থেকে দশ মাইল দূরে।

সোহাগা

আমরা যে নৌকাটায় পেরিয়ে এলাম সেটা তবে কি ?

বলবন্ত

ওটা আমার প্রাইভেট নৌকা—

সোহাগা

ও !

সোহাগা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই প্রকাণ্ড তালাটি পুনরায় তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

সোহাগা

(সহাস্যে) এত বড় তালার চাবিও নিশ্চয় খুব বড়, চাবিটা কার কাছে থাকে, আপনার কাছে ?

বলবন্ত

চাবিও এইখানেই থাকে, অত বড় চাবি কে বয়ে নিয়ে বেড়াবে !

দেখা গেল দরজার পাশেই দেওয়ালের গায়ে একটি ছোট বাক্স সুকৌশলে দেওয়ালের সহিত এমনভাবে গাঁথা রহিয়াছে যে, সহসা তাহার অস্তিত্ব বোঝা যায় না। বলবন্ত গুপ্ত স্প্রিং টিপিয়া তাহার ডালাটি খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহার ভিতর হইতে বৃহৎ চাবিটি বাহির করিয়া সোহাগাকে দেখাইয়া আবার রাখিয়া দিলেন।

সোহাগা

এখান থেকে চাবি যদি কেউ নিয়ে যায় ?

বলবন্ত

কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে ! তাছাড়া এই স্প্রিংএর খবর আমি আর আমার ম্যানেজার শ্যামানন্দ ছাড়া আর কেউ জানে না। তৃতীয় ব্যক্তি তুমি জানলে।

সোহাগা সলজ্জ স্মিতহাস্য সহকারে মস্তক অবনত করিল।

বলবন্ত

চল, তীরগুলো কোথায় গেল, খোঁজা যাক—

উভয়ে তীর খুঁজিতে লাগিলেন। একটু পরেই বলবন্ত-নিক্ষিপ্ত তীরটা পাওয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিবার পর সহসা বলবন্তের নজরে পড়িল সোহাগা-নিক্ষিপ্ত তীরটা একটা বিরাট মহীরুহের কাণ্ডে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বলবন্ত

(সোহাগাকে দেখাইয়া) তোমার তীর ছোটখাটো জিনিষ স্পর্শই করে না দেখছি !

সোহাগা সলজ্জভাবে পুনরায় মস্তক অবনত করিল। বলবন্ত তীরটি পাড়িয়া আনিলেন এবং উভয়ে আবার যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তাঁহারা সেই স্থানে আসিয়া পড়িলেন যে-স্থানে বলবন্তের অশ্বটি বৃক্ষশাখায় বাঁধা ছিল। প্রভুকে দেখিয়া অশ্ব হ্রেষাধ্বনি করিল।

সোহাগা

(মুগ্ধভাবে) চমৎকার আপনার ঘোড়াটি।

বলবন্ত

গড়িয়ার মেলা থেকে সেদিন ওটা কিনেছি, নাম রেখেছি 'তিলক'। চড়বে ?

সোহাগা সহাস্তে সম্মতি জ্ঞাপন করিল এবং আশ্চর্য্যজনক নিপুণতা সহকারে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইল। বলবন্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দূরে বৃক্ষতলে সমবেত কিশোরীবৃন্দের কলহাস্তে তাহাদের চমক ভাঙিল। ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখে বলবন্ত সোহাগার মুখপানে চাহিয়া মৃদুহাস্ত করিলেন, সোহাগা ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল।

তেরো

বন-ভোজনের ভোজন-পর্ব্ব কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বনপর্ণী নদীসৈকতে একটি পুষ্পিত গুল্মের অন্তরালে দুইটি প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসিয়া বলবন্ত ও সুজিত আলাপ করিতেছেন।

বলবন্ত

সোহাগা মেয়েটি বেশ।

সুজিত

(সোৎসাহে) নিশ্চয় নিশ্চয়, ও রকম মেয়ে এ অঞ্চলে নেই! কলেজে লেখাপড়া যথেস্ট করেছে অথচ দেখ—

বলবন্ত

হ্যাঁ কলেজে লেখাপড়া করলে অধিকাংশ মেয়ে কেমন যেন রোগা পটকা ঠুনকো বিলিতি পুতুলের মতো হয়ে যায়, এ সে রকমটা হয় নি।

সুজিত

(অধিকতর উৎসাহে) মোটেই না!

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। সোহাগার সম্বন্ধে বলবন্ত যে ধারণাটি মনে বদ্ধমূল

করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে যে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই তাহাই ব্যক্ত করিবার মানসে পুনরায় তিনি কথা কহিলেন। সুজিত সুযোগ পাইল।

বলবন্ত

না, সত্যিই মেয়েটি বেশ।

সুজিত

(একটু ইতঃস্তত করিয়া) ওকে বিয়ে কর না !

ইহা শুনিবামাত্র বলবন্তের মেরুদণ্ড ঋজুতর এবং অধর প্রকম্পিত হইতে লাগিল, বিস্ফারিত নয়নে সুজিতের মুখের পানে তিনি চাহিয়া রহিলেন। পুষ্পিত গুল্মটির অপর পার্শ্বে ইহাদের অলক্ষিতে সোহাগা আসিয়া প্রবেশ করিল। বলবন্তের বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল।

বলবন্ত

বিয়ে ! সে কি করে হবে !

সুজিত

তুমি একবার মুখের ফাঁকে শ্রীমোহনকে কথাটা বললেই হয়ে যায়।

বলবন্ত

(রুদ্ধকণ্ঠে) সে অসম্ভব !

সুজিত

কেন ?

বলবন্ত

শ্রীমোহনের কাছে আমি কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে পারব না।

সুজিত

(শশব্যস্তে) এতে অনুগ্রহ প্রার্থনার কি আছে ?

বলবন্ত

(শিরশ্চালনা করত) না, না সে হয় না, সে হয় না—

সুজিত

শ্রীমোহনের কাছে কখন কোন জিনিস প্রার্থনা কর নি তুমি ?

বলবন্ত

(সদর্পে) আজ পর্যন্ত করি নি এবং কখনও করব না যদি না করতে বাধ্য হই।

সুজিত

'বাধ্য হই' মানে কি ?

বলবন্ত

মানে নিজের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, অপরের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য, দরকার হলে শুধু শ্রীমোহন কেন যে কোন লোকের অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে পারি।

বাম গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিলেন।

সুজিত

(মিনতি করিয়া) না, না সোহাগাকে তুমি বিয়ে কর ভাই, ওসব বাজে কথা ছাড়।

বলবন্ত

বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই, সোহাগাকে আমার ভালও লেগেছে খুব, কিন্তু শ্রীমোহনকে আমি সে কথা বলতে পারব না। বাধ্য না হলে শ্রীমোহনের কাছে কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে পারব না। আত্ম-সম্মান আমার কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ।

সুজিত

(বিব্রতভাবে) এ তো ভারী মুশকিল দেখছি তোমাকে নিয়ে।

পুষ্পিত গুল্মের অন্তরাল হইতে সাবধান-পদক্ষেপে সোহাগা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

চৌদ্দ

গোপীনাথের কুটিরাভ্যন্তর: রাত্রিকাল: গোপীনাথের নবম-বর্ষীয়া কন্যা সুন্দরি বিছানায় শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। মুখোসপরা কতকগুলি লোক প্রবেশ করিল, একজন আচম্বিতে মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া ধরিল। মেয়েটি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল: পাশের ঘর হইতে সচকিত গোপীনাথ ছুটিয়া আসিল। আর্ত্তচীৎকার ও কলরবের মধ্যে মুখোসপরা লোকগুলি সুন্দরিকে লইয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল প্রান্তরের মধ্য দিয়া একটি পালকি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সামনে পিছনে মুখোসপরা লোক-গুলিও ছুটিতেছে। তাহাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল।

পনেরো

বাইসিকিলে চড়িয়া রাঘব বনবন করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ, বড় বড় গ্রাম, লম্বা লম্বা পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে সে একটি বটবৃক্ষ সমীপে উপস্থিত হইল। বটবৃক্ষতলে ধুনি জ্বালাইয়া একজন সঙ্গীতজ্ঞ সন্ন্যাসী উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরবিষয়ক একটি সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন। রাঘব বাইসিকিলটি বৃক্ষকাণ্ডে ঠেসাইয়া রাখিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গীত শেষ হইলে, রাঘব সবিনয়ে সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করিল, "কোন পালকি এ দিক দিয়ে যেতে দেখেছেন?" সন্ন্যাসী কহিল, নিশ্চয়, পাহাড়পুরের দিকে গেছে সে পালকি—ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া রাঘব বিদায় লইল।

ষোল

শ্রীমোহন তন্ময়চিত্তে চিত্রচর্চ্চা করিতেছেন। পরিধানে ঢিলা কিমোনো, মুখে লম্বা পাইপ, হস্তে তুলি। চিত্রটির নাম 'দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উড়িষ্যা', চিত্রে দেখা যাইতেছে অজন্তা-চিত্র-ধর্ম্মী বহু নারী একস্থানে জটলা করিতেছে।

গণেশলাল আসিয়া প্রবেশ করিল।

শ্রীমোহন

ও, গণেশ এসেছ, তোমাকে একটা কথা বলবার জন্যে ডেকে আনিয়েছি। রাঘব খবর এনেছে যে, গোপীনাথের মেয়েটিকে বলবন্তই হরণ করে পাহাড়পুর কাছারিতে রেখেছে, তোমার ছেলেটিকেও সে নাকি চুরি করে নিয়ে যাবার মতলবে আছে।

গণেশলাল ভীত হইল।

গণেশলাল

তাহলে, উপায় !

শ্রীমোহন

একটি উপায় আমি ঠাউরেছি। এক কাজ কর, তোমার ছেলেটিকে আমার দুর্গানগর কাছারিতে পাঠিয়ে দাও। সে পাহাড়ে জায়গা, কেউ টের পাবে না।

গণেশলাল

কার সঙ্গে যাবে হুজুর অত দূরে ছেলেমানুষ।

শ্রীমোহন চিত্রে মন দিয়াছিলেন এই কথায় ঘাড় ফিরাইলেন, মুখে শান্ত স্মিত হাসি।

শ্রীমোহন

সে ব্যবস্থা কি না করেই ডেকেছি তোমায়! আমার একজন কর্ম্মচারী, একজন রাঁধুনি এবং কয়েকজন সিপাহী যাবে তোমার ছেলের সঙ্গে, পালকির ব্যবস্থাও করেছি। তোমার আপত্তি নেই তো?

গণেশলাল

(হৃষ্ট) কিছুমাত্র না।

শ্রীমোহন

যাও তাহলে।

গণেশ চলিয়া গেল।

সেই দিনই গণেশলালের বাসার সম্মুখে একটি পালকি থামিল, গণেশলালের পঞ্চদশ-বর্ষীয় কান্তিমান পুত্র তাহাতে চড়িয়া বসিল এবং শ্রীমোহনের লোকজন সমভিব্যাহারে দুর্গানগর অভিমুখে রওনা হইয়া গেল।

সতেরো

পাহাড়পুর কাছারির একটি কক্ষ। রোরুদ্যমানা সুন্দরিকে মুকুন্দলাল ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে।

মুকুন্দ

খাবার খাবি, এই নে, এই দেখ, কি মিষ্টি সন্দেশ এনেছি, কেমন রসগোল্লা—

মিষ্টান্ন প্রদর্শন করিল।

সুন্দরি

(অনুনাসিক স্বরে) না—

মুকুন্দ

আচ্ছা থাক থাক। পুতুল, নিবি, এই দেখ কেমন সুন্দর পুতুল, পেট টিপলে কেমন আওয়াজ হয়—

রবার নির্ম্মিত পুত্তলির উদর প্রদেশে চাপ দিতেই প্যাক প্যাক শব্দ নির্গত হইল।

মুকুন্দ

নিবি ?

সুন্দরি

(সরোদনে) না, আমি বাড়ি যাব—

মুকুন্দ

হ্যাঁ, বাড়ি তো যাবেই। ততক্ষণ এই পুতুলটা নিয়ে খেলা কর না। নিবে? নাও—

সুন্দরি

(পুতুল দূরে নিক্ষেপ করিয়া) না নেব না—অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—

ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া মুকুন্দলাল এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

মুকুন্দ

(অর্দ্ধ স্বগত) বেরাল ছানাটা কোথায় গেল আবার। এই রামধারী—

বিরাটকায় রামধারীর প্রবেশ।

রামধারী

কেয়া হুজুর

মুকুন্দ

বিল্লিকা বাচ্ছাঠো কাহা—

রামধারী

নেহি মালুম।

মুকুন্দ

নেহি মালুম বললে চলবে কি করে'। ওইটে নিয়ে খানিকক্ষণ ভুলে ছিল যে। খোঁজ, খোঁজকে লে আও, বাহারমে দেখো—

রামধারী

বহুত খুব

রামধারী চলিয়া গেল। সুন্দরি অবিচ্ছিন্নভাবে কাঁদিতে লাগিল এবং মুকুন্দলাল বিড়াল শাবকসহ রামধারীর আগমন প্রত্যাশায় বারম্বার দ্বারের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রামধারী কিন্তু আসিল না, সুন্দরির ক্রন্দনও ক্রমশঃ উচ্চতর হইতে লাগিল, নিরুপায় মুকুন্দলাল অবশেষে মেঝের উপর হামাগুড়ি দিয়া মার্জ্জার শাবকের অভিনয় করিতে লাগিলেন।

মুকুন্দ

এই দেখ, মেঁও মেঁও মেঁও মেঁও, এই দেখ মেঁও মেঁও মেঁও মেঁও—

সুন্দরি

(চক্ষু বুজিয়া) ওগো মাগো, বাবা গো, অ্যাঁ অ্যাঁ, অ্যাঁ অ্যাঁ—

আঠারো

বলবন্তের বৈঠকখানা সংলগ্ন একটি কক্ষ। বলবন্ত ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে শ্যামানন্দের দিকে চাহিয়া আছেন। শ্যামানন্দ বিমর্ষ।

বলবন্ত

কোন কর্ম্মের নও তুমি, তোমার চোখের সামনে দিয়ে গণেশলাল নিজের ছেলেটাকে পার করে দিলে অথচ—

পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

শ্যামানন্দ

আমি কিছুই টের পাইনি হুজুর !

বলবন্ত

(সহসা থামিয়া) তা পাবে কেন ! এখন শোন—

আবার পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

শ্যামনন্দ

বলুন,

বলবন্ত

আজই যেমন করে হোক ওই গণেশলালকে ধরে নিয়ে এসে গহিরা জঙ্গলের গারদ ঘরে আটক কর। যতক্ষণ

না সে বলে যে তার ছেলে কোথায় ততক্ষণ তাকে আটক রাখ, শুধু তাই নয়, একদানা খাবার অথবা এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত যেন তাকে দেওয়া না হয়।

শ্যামানন্দ

যে আজ্ঞে।

বলবন্ত

যাও-

শ্যামানন্দ ত্বরিতপদে চলিয়া গেলেন

বলবন্ত

(অর্দ্ধ স্বগত) আমার সঙ্গে চালাকি !

এই কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে সোহাগার নানা চিত্র ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—কণ্টকাকীর্ণ। সোহাগা—অশ্বারূঢ়া সোহাগা—হাস্যলাস্যময়ী সোহাগা! বাতায়ন নিম্নে রাঘব আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল। সে এই গুহ্য সংবাদটি শুনিয়া বাইক চড়িয়া অন্তর্দ্ধান করিল।

ড্রইং

দুলালীর কক্ষ: দুলালী সেতার বাজাইতেছে, প্রৌঢ় শিক্ষয়িত্রীটি নিকটে বসিয়া শুনিতেছেন। পিছনের দ্বার দিয়া সুজিত সন্তর্পণে প্রবেশ করিলেন। দুলালী দেখিতে পাইল না, শিক্ষয়িত্রী দেখিতে পাইয়া কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সুজিত ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করত ইঙ্গিত দ্বারা সঙ্গীত চর্চ্চায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে নিষেধ করিলেন এবং সন্তর্পণে গিয়া একটি কেদারায় উপবিষ্ট হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সেতার বাজানো শেষ হইল।

শিক্ষয়িত্রী

দুলালীকে এবার সেতার শেখাচ্ছি।

সুজিত

(সোৎসাহে) বেশ তো, বেশ তো।

দুলালী

(ঠোঁট ফুলাইয়া) আঙুলে বড্ড লাগে।

সুজিত

আঙুলে লাগে না কি ?

দুলালী

কেটে গেছে।

সুজিত

তাই না কি, কই দেখি।

দুলালী উঠিয়া আসিয়া অঙ্গুলি প্রদর্শন করিল।

শিক্ষয়িত্রী

ও প্রথম প্রথম লাগবে, তারপর ঠিক হয়ে যাবে।

সুজিত

(আকুলভাবে) কিন্তু এ যে বড্ড লাল হয়ে উঠেছে !

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য

খোপা এসেছে।

শিক্ষয়িত্রী

চল, যাচ্ছি

শিক্ষয়িত্রী ও ভৃত্য চলিয়া গেলে সুজিত দুলালীর আহত অঙ্গুলিতে ফুৎকার দিবার ছলনায় চুম্বন করিলেন, দুলালী ক্ষিপ্রতার সহিত হস্ত সরাইয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া

একটি কেদারায় উপবেশন করিল। সুজিত অভিমানক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, সহসা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল।

দুলালী

(মুচকি হাসিয়া) কি ?

সুজিত

কোনই আশা দেখছি না।

দুলালী

(অজ্ঞতার ভান করিয়া) কিসের আশা ?

সুজিত

সোহাগার বিয়ের। আজ আবার আমি শ্রীমোহনের কাছে গিয়েছিলাম, সেদিনের সে ফোটো সোহাগার পছন্দ হয় নি। এদিকে শ্রীমোহনও বলবন্তকে বলতে রাজি নয়, বলবন্তও শ্রীমোহনকে বলতে রাজি নয়, দুজনেই কাঠ গোঁয়ার—

দুলালী

(লীলাভরে মাথা দোলাইয়া) তবু ঠিক বিয়ে হবে, দেখো—

সুজিত

আর হয়েছে! (স-ক্ষোভে) আহা, এই সোজা কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন—যে মেয়ে ও রকম সুদক্ষ ঘোড়সোয়ার সে কি কখনও বিয়ে করতে চায়! (মিনতিভরে) না, না দুলালী, তুমি ওসব ছেলে-মানুষি ছাড় (সহসা টেবিলের নিকট গিয়া পঞ্জিকা উল্টাইতে উল্টাইতে) এই তেইশে একটা ভাল দিন রয়েছে—

দুলালী

(মাথা নাড়িয়া) না, না।

সুজিত

আচ্ছা, তাহলে সাতাশে, ঊনত্রিশেও একটা দিন আছে—লক্ষ্মীটি—

দুলালী

(সুর করিয়া)

ভয় কি ভয় কি ভয় কি
দিনরাত আছি এত কাছাকাছি
তাই যথেষ্ট নয় কি!

সুজিত আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, পঞ্জিকা ফেলিয়া দুলালীকে ধরিবার জন্য

তাড়া করিলেন। দুলালীও আত্মরক্ষা করিতে লাগিল, ফলে লুকোচুরি খেলার মত একটা হুড়াহুড়ির সৃষ্টি হইল। চেয়ার উল্টাইল, ফুলদানী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। অবশেষে দুলালী ধরা পড়িল এবং সর্ব্বাঙ্গ আঁকাইয়া বাঁকাইয়া কলকণ্ঠে ক্রন্দন মিশ্রিত হাস্য করিতে লাগিল।

সুজিত

বিয়ে করবে কি না বল।

দুলালী

সোহাগার বিয়ে না হলে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। ছাড় বলছি—

সুজিত তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দুই হস্তের উপর শির ন্যস্ত করতঃ নিকটস্থ চেয়ারে হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গীতে উপবেশন করিলেন

কুড়ি

সোহাগার কক্ষ : সোহাগা আবেগ-ভরে একটি বিরহ-সঙ্গীত গাহিতেছে : ঝাড়ু দিতে দিতে ধাই রুকমিনিয়া বসনাঞ্চল দিয়া মধ্যে মধ্যে উদ্গত অশ্রু রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এমন সময় হাহাকার করিতে করিতে আলুথালু-বসনা গণেশলালের পত্নী যশোদা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং সোহাগার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

সোহাগা

(শশব্যস্ত) কি কি, ব্যাপার কি—

যশোদা

আমার স্বামীকে বলবন্তবাবু জোর করে ধরে নিয়ে গারদ ঘরে আটকে রেখেছেন।

সোহাগা

(ঘৃণাভরে) কক্‌খনো হতে পারে না, কে বললে যে, বলবন্তবাবু তোমার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছেন, দেখেছ তুমি ?

যশোদা

না।

সোহাগা

তবে, কি করে জানলে যে, বলবন্তবাবু তোমার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছেন? এমন হীন কাজ তিনি কখনও করতে পারেন না।

যশোদা

(কাঁদিতে কাঁদিতে) সবাই বলছে।

সোহাগা

ওসব বাজে গুজবে বিশ্বাস কোরো না।

যশোদা

আপনি নারী-রক্ষা সমিতির মালিক, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনি যেমন করে হোক যেখান থেকে হোক, আমার স্বামীকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করে দিন—

আকুলভাবে আবার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

সোহাগা

ওঠ, ওঠ, আচ্ছা ব্যবস্থা আমি করছি, কোন ভয় নেই

তোমার। এখুনি আমি থানায় খবর দিয়ে দিচ্ছি, তাঁরা ঠিক ব্যবস্থা করবেন, যদি টাকা পয়সা কিছু খরচ হয় আমরা দেব।

রুকমিনিয়া

ওঠ বাইরে চল—

রুকমিনিয়া শোকাকুলা যশোদাকে ধরিয়া ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। সোহাগা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার মানস-পটে বলবন্তের দৃপ্ত মুখচ্ছবি অপরূপ ছটায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

এক

দুর্গানগরের কাছারি-বাড়ি-সংলগ্ন একটি কক্ষে গণেশলালের পুত্র যোগেন নিদ্রিত, নিকটেই ভৃত্যজাতীয় একজন প্রহরী উপবিষ্ট। যোগেন স্বপ্ন দেখিতেছে—একটি পালকি চলিয়াছে, পালকির অভ্যন্তরে বর-বধূ বসিয়া আছে। বর সে স্বয়ং নিজে, বধূ গোপীনাথ-কন্যা সুনরি। পিছনে বাজনাদাররা বাজনা বাজাই-তেছে। সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে উঠিয়া বসিল এবং উদাস দৃষ্টিতে বাতায়ন পথে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ভৃত্য

ঘুম ভাঙল নাকি, ভাবছ কি ?

যোগেন

কি আর ভাবব, ভাবছি আমার বাবার দুর্ব্বুদ্ধির কথা। দিব্যি বিয়েটি হয়ে যেত, বলবন্তবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে' মাঝ থেকে এ কি এক ঝগড়া দেখ দিকি! ছি ছি ছি, বুড়ো হলে মানুষের—

ভৃত্য হাসিল।

বাইশ

পাছাড়পুর কাছারি : মুকুন্দলাল ও সুন্দরি। সুন্দরি পোষ মানিয়াছে, তাহাকে কাপড়চোপড় পরাইয়া মুকুন্দলাল বেশ সাজাইয়াছে।

মুকুন্দলাল

তারপর কেমন মজা হবে, পালকি করে' সুন্দরি বিয়ে করতে যাবে, হাতি আসবে, ঘোড়া আসবে, বাজনা বাজবে ড্যা ড্যাং ড্যাং, ড্যা ড্যাং ড্যাং, ড্যা ড্যাং ড্যাং।

সুন্দরি হাসিতেছে।

তেইশ

বলবন্তের মন্ত্রণাকক্ষের অলিন্দ। বলবন্ত ও শ্যামানন্দ।

বলবন্ত

পুলিশে খবর পেয়েছে? ঠিক জান?

শ্যামানন্দ

হ্যাঁ হুজুর।

বলবন্ত

কি করে জানলে তুমি?

শ্যামানন্দ

থানার হাবিলদারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, সেই গোপনে বললে যে, দারোগা সায়েব গারদ-ঘরে সার্চ্চ করতে যাবেন।

বলবন্ত

কি করে খবর পেলে তারা?

শ্যামানন্দ

হাবিলদার সায়েব তা ঠিক করে বলতে পারলেন না।

বলবন্ত

নিশ্চয় এ শ্রীমোহনের কাজ

শ্যামানন্দ

তাহলে এখন—

বলবন্ত

(দৃপ্তকণ্ঠে) কুছপরোয়া নেই, আমি নিজে রাইফেল নিয়ে গারদ-ঘর পাহারা দেব। আমার দেহে যতক্ষণ একবিন্দু শোণিত থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেউ গারদ ঘরে হাত দিতে পারবে না! তুমি এদিকে বন্দোবস্ত কর পুলিশ যাতে নদী পেরোতে না পারে। নৌকো টৌকো সব হটিয়ে দাও—। যাও—

শ্যামানন্দ

যে আজ্ঞে।

শ্যামানন্দ ত্রস্তভাবে এবং বলবন্ত দৃপ্তভঙ্গীতে বাহির হইয়া গেলেন। সম্মুখস্থ পথ দিয়া অনৈকা রূপসী বৈরাগিনী খঞ্জনী বাজাইয়া সংসারের অনিত্যতা বিষয়ক একটি ভজন গাহিয়া গেল।

চব্বিশ

শ্রীমোহনের বৈঠকখানায় শ্রীমোহন ও তাঁহার ম্যানেজার নাটুবাবু কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। পাশের ঘরে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া সোহাগা সব শুনিতেছে।

শ্রীমোহন

বলবন্ত গণেশলালকে গারদঘরে আটকে রেখেছে এ কথা ঠিক?

নাটুবাবু

রাঘবের তাই খবর।

শ্রীমোহন

পুলিশে খবর পেয়েছে এ কথাও ঠিক?

নাটুবাবু

ঠিক।

শ্রীমোহন

পুলিশে খবর দিল কে?

নাটুবাবু

তা তো জানি না।

শ্রীমোহন

এ তো ফ্যাসাদ হল! আমি আর্টিষ্ট মানুষ, পুলিশ টুলিশের হাঙ্গামা আমার সহ্য হয় না। অথচ বলবন্ত ভাববে—যাক, বাজে কথা আর ভাবতে পারি না। আমার ষ্টুডিওটা খুলে দিতে বল। আচ্ছা, পুলিশে যদি গণেশকে গারদঘরে পায় মনে কর, বলবন্তের কি শাস্তি হতে পারে—

নাটুবাবু

জেল পর্য্যন্ত হতে পারে।

ঈষৎ বিরক্ত ঈষৎ চিন্তিত মুখে ধীর পদসঞ্চারে শ্রীমোহন নাটুবাবুর সহিত ষ্টুডিও অভিমুখে চলিয়া গেলেন। পাশের ঘরে সোহাগার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

পঁচিশ

শ্রীমোহনের চিত্রশালা : শ্রীমোহন ছবি আঁকিতেছেন : সবেগে রুকমিনিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

রুকমিনিয়া

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে) সোহাগা ঊর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে চলে গেল।

শ্রীমোহন

(সবিস্ময়ে) সে কি, কোথা গেল।

রুকমিনিয়া

বলে গেল গারদঘরে যাচ্ছি—

শ্রীমোহন

সে কি ! আমার ঘোড়া ঠিক করতে বল।

উঠিয়া পড়িলেন।

ছাব্বিশ

বনপর্ণী নদীর ঘাট ঃ ছুটিতে ছুটিতে সোহাগা আসিয়া উপস্থিত হইল ঃ ঘাটে নৌকা নাই দেখিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সন্তরণ করিতে লাগিল। নদী পার হইয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। এবং পুনরায় ছুটিতে লাগিল। পদতল ক্ষতবিক্ষত, বসনাঞ্চল ছিন্ন ভিন্ন হইল, মাঝে মাঝে হিংস্র জন্তু দেখা যাইতে লাগিল, সোহাগার ভ্রূক্ষেপ নাই। এইভাবে কিছুক্ষণ ছুটিয়া অবশেষে সে গারদ-ঘরের সম্মুখীন হইল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই, প্রকাণ্ড তালাটা ঝুলিতেছে। অরণ্যের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহসা ঘরের ভিতর হইতে গণেশের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। ক্ষিপ্রতা সহকারে স্প্রিং টিপিয়া সোহাগা চাবি বাহির করিল এবং তাহা উন্মোচন করিয়া দিল। গণেশ বাহিরে আসিল।

সোহাগা

শিগ্‌গির পালাও।

গণেশলাল

(হতভম্ব) কোথায়—

সোহাগা

যেখানে হোক, পালাও শিগগির—

গণেশ অন্তর্হিত হইল।

গণেশ অন্তর্ধান করিলে সোহাগা নিজের সিক্ত বেশবাস সম্বন্ধে সচেতন হইয়া কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় পদশব্দ শোনা গেল। পদশব্দ শুনিবামাত্র সচকিত সোহাগা গারদ-ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। রাই-ফেল হস্তে বলবন্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং রাইফেলটি একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেসাইয়া রাখিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। কেহ কোথাও নাই। সহসা তাঁহার নজরে পড়িল গারদ-ঘরের তালা খোলা। বিস্মিত হইয়া ত্বরিতপদে আগাইয়া গেলেন। দ্বারের সম্মুখে আসিতেই সোহাগা ভিতর হইতে দ্বার ভেজাইয়া দিল।

বলবন্ত

গণেশ—

ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিল না।

বলবন্ত

গণেশ—

ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিল না।

বলবন্ত

এই গণেশ, তালা খুললে কে—

কোন সাড়া নাই।

বলবন্ত

(উচ্চতর কণ্ঠে) গণেশ—

কপাটে ধাক্কা দিলেন, কপাট খুলিয়া গেল। বলবন্ত ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হুটাপাটি-জনিত একটা শব্দ শ্রুত হইল, ক্ষণপরেই বলবন্ত বিস্রস্তবাসা সোহাগাকে টানিতে টানিতে বাহির করিয়া আনিলেন।

বলবন্ত

(সবিস্ময়ে) তুমি সোহাগা, তুমি এখানে !

সোহাগা

(বেশবাস সম্বৃত করিতে করিতে ক্ষোভ-ব্যাকুল কণ্ঠে) আপনি এ কি করলেন, আমার ইজ্জত নষ্ট করলেন, ছি ছি দাদাও এসে পড়েছেন—

অকুস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে শ্রীমোহনের প্রবেশ।

শ্রীমোহন

(সবিস্ময়ে) এ সব কি, বলবন্ত, সোহাগা—

বলবন্ত শ্রীমোহনের দিকে এবং শ্রীমোহন বলবন্তের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন। বলবন্তের প্রথমে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল।

বলবন্ত

ঘোড়া থেকে নাব, সব বলছি—

শ্রীমোহন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন।

শ্রীমোহন

সোহাগা, কেন এল এখানে ?

বলবন্ত

তা আমিও ঠিক জানি না। কিন্তু (সহসা আবেগ-কম্পিত স্বরে) ভাই শ্রীমোহন, তোমার কাছে জীবনে কোনদিন কিছু প্রার্থনা করি নি, আজ একটা জিনিস চাইছি, দেবে ?

শ্রীমোহন

কি ?

বলবন্ত

সোহাগাকে। সোহাগাকে আমি ভালবেসেছি, কিন্তু তাহলেও হয়তো মুখ ফুটে তোমার কাছে চাইতে পারতুম

না, কিন্তু আজ না জেনে আমি ওর গায়ে হস্তক্ষেপ করে ওর ইজ্জৎ নষ্ট করেছি—

শ্রীমোহন

(সবিস্ময়ে) তার মানে ?

বলবন্ত

কি করে যে কি হল তা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু ওই অন্ধকার ঘরে ওর গায়ে হাত দিয়ে ওর ইজ্জৎ যে আমি নষ্ট করেছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই, সে ইজ্জৎ আমি পুনরুদ্ধার করে দিতে পারি, যদি তুমি ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও। (আবেগরুদ্ধ আগ্রহে) দেবে ভাই, দেবে ?

শ্রীমোহন কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার মুখে স্নিগ্ধ স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীমোহন

আমার আপত্তি নেই, সোহাগার যদি কোন আপত্তি না থাকে। এ যাবৎ বিয়ের যত সম্বন্ধ এসেছে, সোহাগাই সব ভেঙে দিয়েছে।

সঙ্কুচিত সোহাগা এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। এই কথায় হাসিয়া মস্তক অবনত করিল।

বলবন্ত

(সহর্ষে) তুমি রাজি তাহলে ?

শ্রীমোহন

আমারও একটা অনুরোধ আছে কিন্তু—

বলবন্ত

কি ?

শ্রীমোহন

গোপীনাথের মেয়েটিকে ছেড়ে দাও।

বলবন্ত

(হাসিয়া) বেশ, গণেশের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

শ্রীমোহন

বেশ ! (সহসা) গণেশ কোথায় গেল ?

বলবন্ত

চুলোয় যাক গণেশ !

সোহাগা

(সলজ্জকণ্ঠে) আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি।

বলবন্ত শ্রীমোহন ইহা শুনিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সোহাগাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সিনেমার পর্দা

ইহার পর যথোচিত জাঁকজমক সহকারে তিনটি দম্পতীর চিত্র পর পর প্রদর্শিত হইল।

১। সোহাগা বলবন্ত

২। দুলালী সুজিত

৩। সুন্দরি যোগেন

সানাই বাজিল

উপসংহার

মাস দুই পরে পাণ্ডুলিপি ফেরত পাইলাম। পাণ্ডুলিপির সহিত প্রযোজক মহাশয় একটি পত্রও লিখিয়াছিলেন। প্রথমাংশ এইরূপ—

নমস্কারান্তে নিবেদন,

অতিশয় দুঃখের সহিত সিনেমার গল্পের পাণ্ডুলিপিটি ফেরত পাঠাইতেছি। ছায়া-জগতে যাহাকে রূপায়িত করিবার জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টার এই গল্পটি লিখাইয়াছিলেন সেই কুনকীই মরিয়াছে। সোহাগার ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারে এমন অভিনেত্রীও বর্ত্তমানে আমাদের নাই। আজকাল যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পেট অ্যাকট্রেস তিনি নৃত্যগীতপটিয়সী মাইকেল-মোহিনী। বঙ্কিকুমারীকে সোহাগা করিয়াছেন, সোহাগাকে যদি বাইজিতে পরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে হয়তো বইখানা আমরা 'প্রডিউস' করিতে পারি। কথা কি একেবারেই অসম্ভব? ভাবিয়া দেখিবেন।.........



বনফুল

রচনাবলী ০৮